বদরীনাথের মন্দির

তুষারতীর্থ কেদারনাথ

ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির

হরিদ্বার

শ্রীতুঙ্গনাথ মন্দির (১৩০০০ ফুট)

দেবতাত্মা হিমালয়

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
কলিকাতা
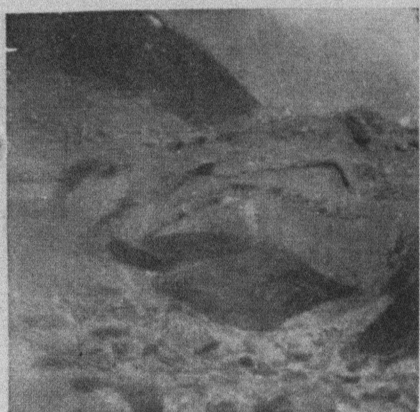
গোমুখের হিমবাহ—গঙ্গোত্রী

বদরীনাথের পার্শ্বদৃশ্য

সাধারণ চটির ধার

বিষ্ণুগঙ্গার পাবর্ত্যপথ—গাড়োয়াল
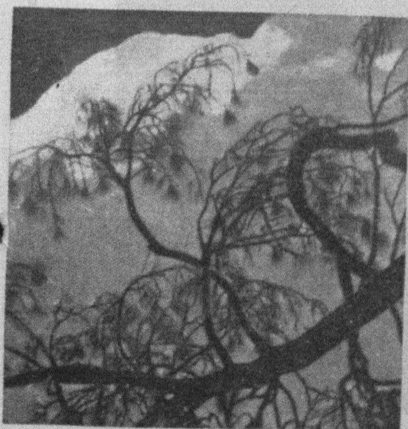
চিড়বন—গাড়োয়াল
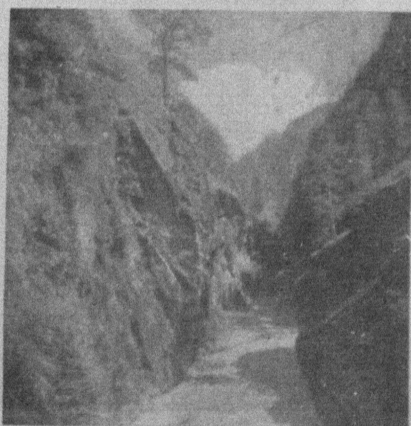
দুধগঙ্গার প্রবাহ—গাড়োয়াল

[এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ]

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬২

প্রকাশক ঃ
সুনন্দ ভট্টাচার্য
জি. এ. ই. পাবলিশার্স
১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩/১ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

উখীমঠ—পুরাকালে বানরাজার কন্যা শ্রীমতী উষার স্মৃতিনগর ও মন্দির

তুঙ্গনাথ থেকে হিমালয়ের চিরতুষারের দৃশ্য

— সূচিপত্র —

— সূচিপত্র

খাইবার গিরিসঙ্কট থেকে আফগানিস্তানের প্রবেশপথ
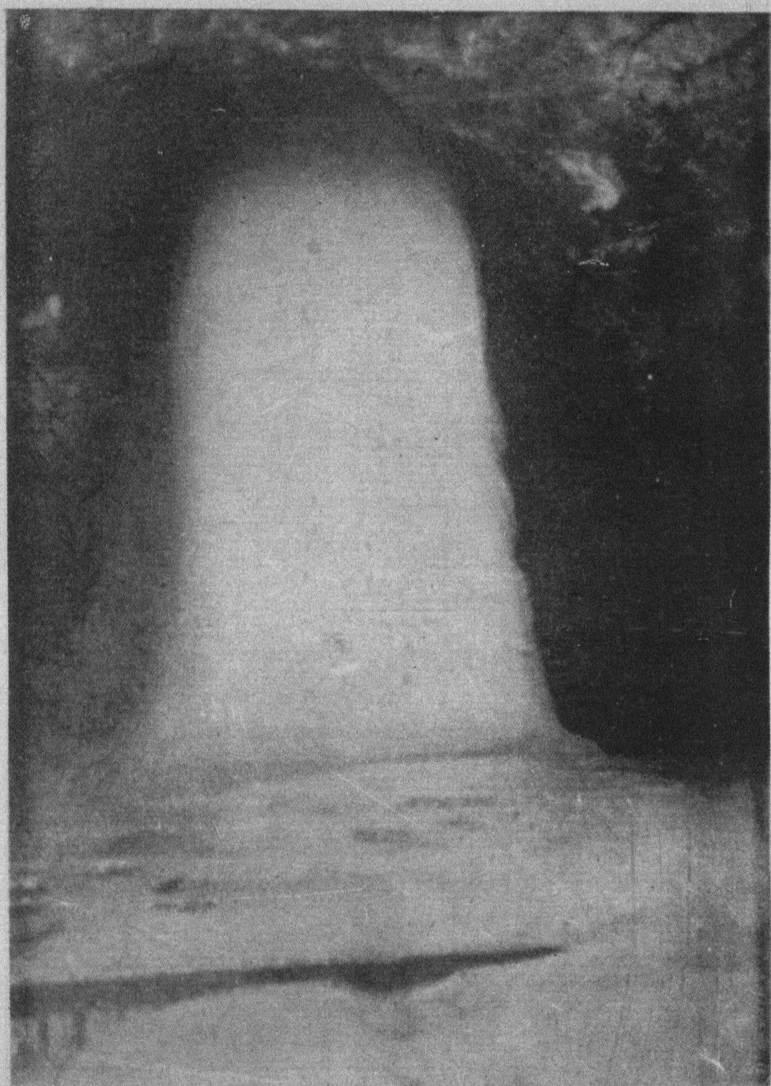
শ্রী অমরনাথের পূর্ণ লিঙ্গ

উৎসর্গ

স্বর্গতা জননী
বিশ্বেশ্বরী দেবী
স্মরণে---

শেষনাগের তুষারশৃঙ্গ—
নীচে নীলগঙ্গার অবতরণ

অমরনাথের গুহামুখ

পামির
গিলগিট
শ্রীনগর
অমরনাথ
পেশোয়ার
মারি
জম্মু
চম্বা
বৈজনাথ
মণ্ডি
কাংড়া
লাহোর
সিমলা
মুসৌরী
দেরাদুন
হৃষিকেশ
হরিদ্বার
রাণীক্ষেত
দিল্লী
আগ্রা
সিন্ধু নদ
করাচী
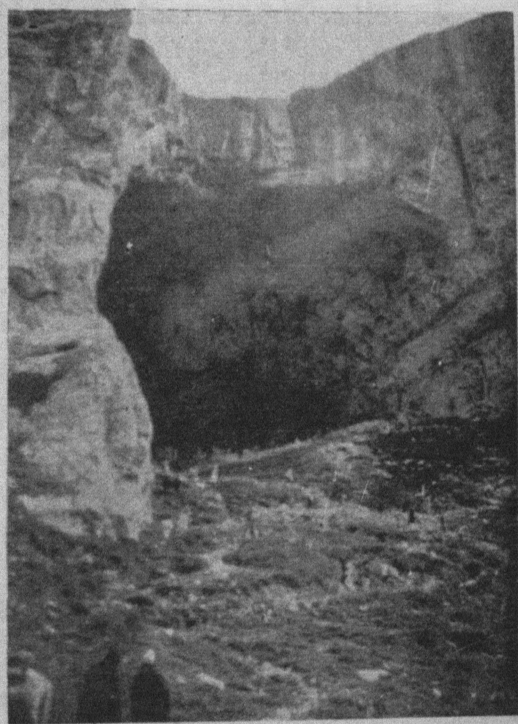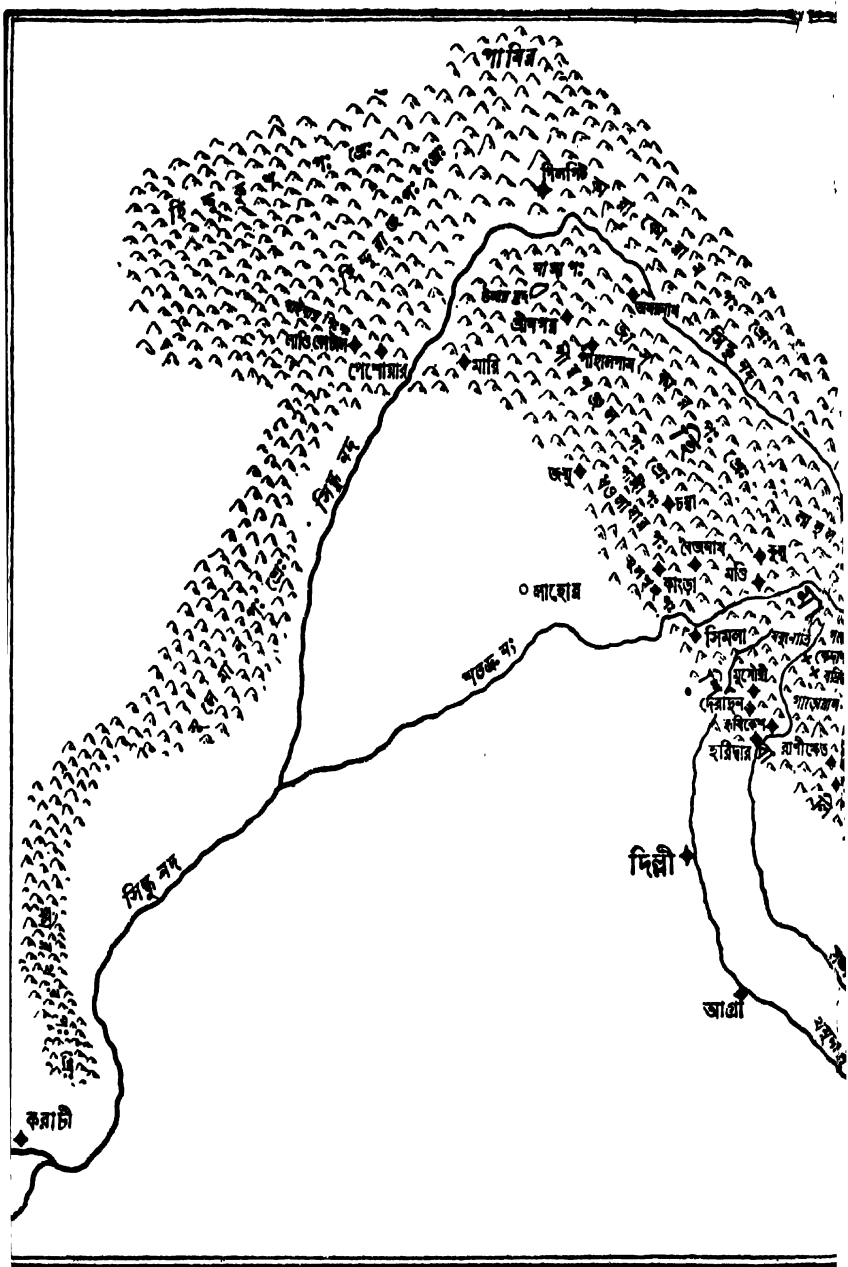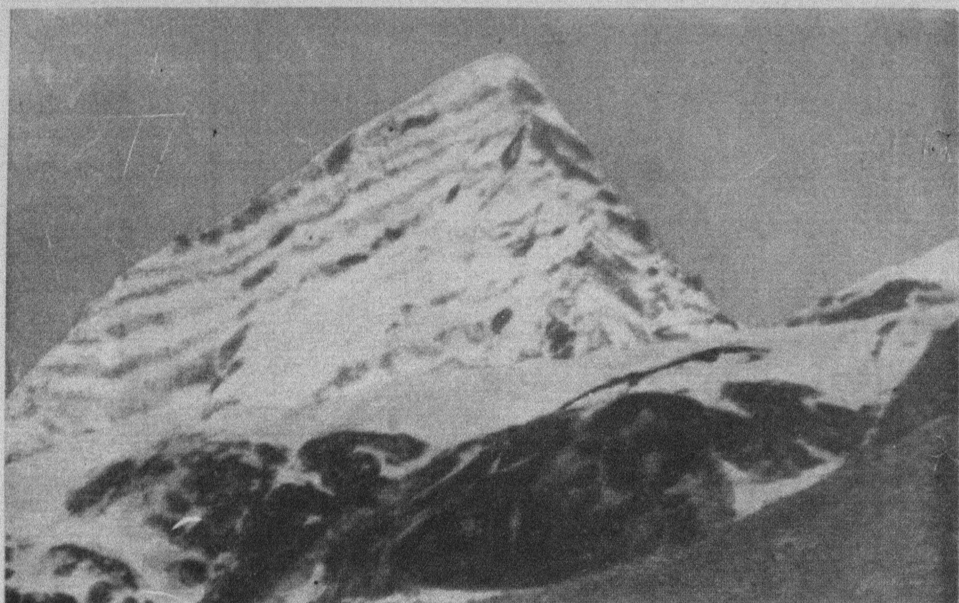
কোলাহাই হিমবাহ
[পহলগাঁও থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে]

অমরনাথের পথে
বায়ুযান
তুষারাচ্ছন্ন নদীপথ

দেবতাত্মা হিমালয়
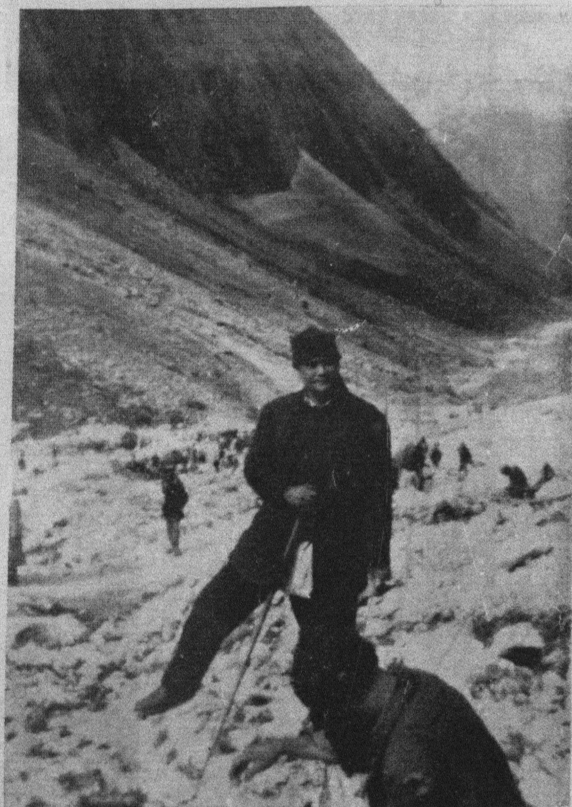
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
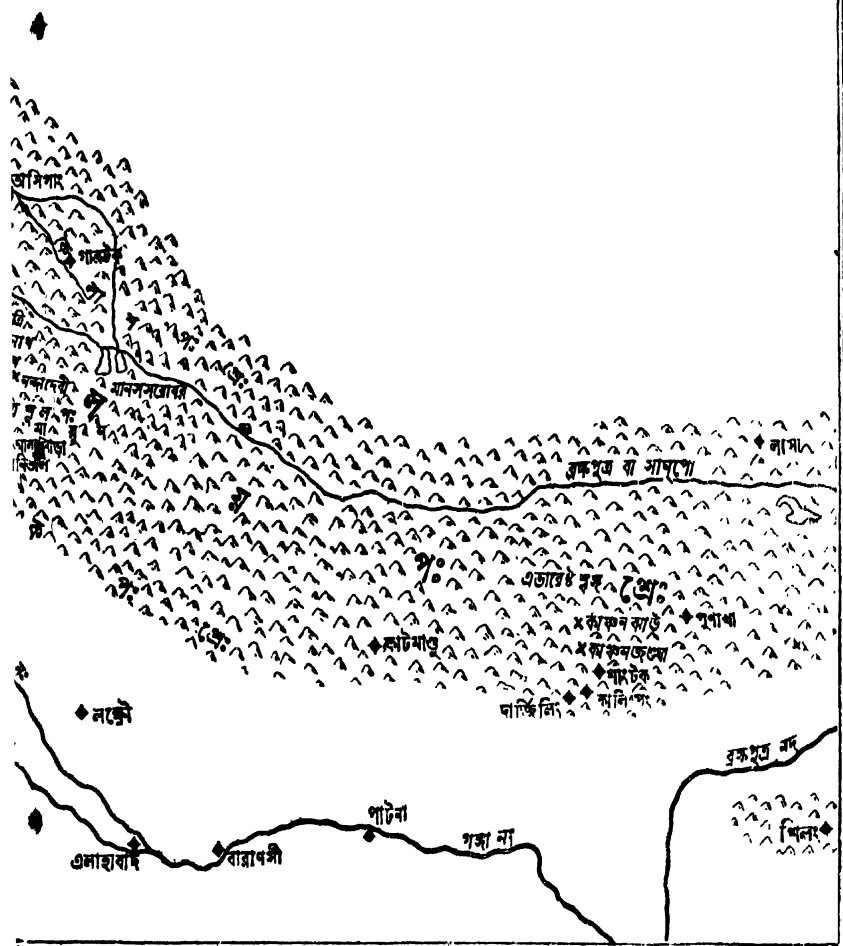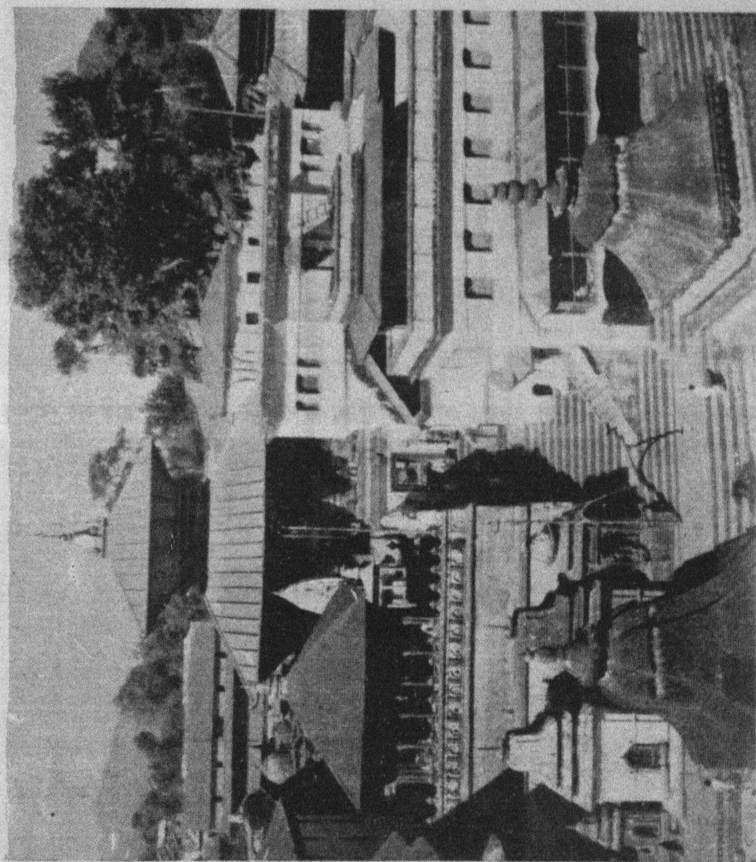
বাগমতি নদীর তীরে শ্রীপশুপতিনাথের মন্দির

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্যস্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

—কালিদাস

অমরনাথের পথে চন্দনবাড়ী তাঁবুতে জনৈক সুইডিস ও বাঙ্গালী মেডিকেল ছাত্র সহ লেখক
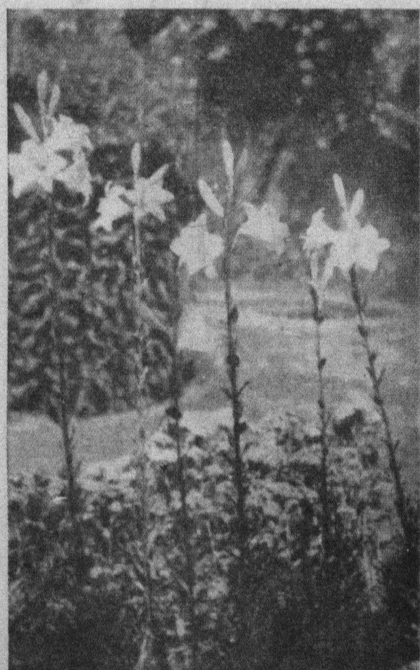
কাশ্মিরী ফুল

কাশ্মিরী তরুণী

পূর্বভাষণ

[প্রথম খণ্ড]

বছর দুই আগে কাশ্মীর থেকে ফিরছিলুম। পরলোকগত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তখন দিল্লীতে। তিনি তাঁর অফিসে বসে আমাকে তিরস্কার করেন, হিমালয়-ভ্রমণকথা আমি আজও কেন লিখছিনে; ভ্রমণ-কাহিনী না লিখলে আমার নিস্তার নেই। কিন্তু তারও অনেক আগে 'দেশ' সম্পাদক বন্ধুবর সাগরময় ঘোষ 'দেবতাত্মা হিমালয়ের' জন্য আমার নিকট বারম্বার স্মারকলিপি পাঠান, এবং আমার প্রয়োজনের মতো অনেকগুলি ফটোও পাঠিয়ে দেন। এমনি করে তাল-বাহানায় তিন বছর কাটে। গত বছর 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রথম খণ্ড 'দেশ'-এ ছাপা হয়। দুঃখ রইলো এই, বাঙলার লেখক ও সাংবাদিক গোষ্ঠীর পরম অকৃত্রিম বন্ধু সুরেশবাবুর হাতে এ বই তুলে দিতে পারলুম না। সেই লোকান্তরিত শুভানুধ্যায়ীর উদ্দেশে আমার সকরুণ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এই গ্রন্থের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিমালয়প্রেমিক শ্রীযুক্ত জওয়াহরলাল নেহরু মহাশয় একটি মুখবন্ধ রচনা করে দিয়েছেন। তাঁর নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো। প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর ভারতের কোনও ভাষার কোনও গ্রন্থ সম্বন্ধে অদ্যাবধি তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেননি; এজন্য মাসকয়েক আগে এই গ্রন্থের একটি মুখবন্ধ লিখে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলুম। আমি তখন দিল্লীতে। কিছুকাল পরে তিনি জানান : হিমালয় তাঁকে বিস্ময়াবিষ্ট করে এসেছে চিরদিন। আমি যে হিমালয় নিয়ে গ্রন্থ রচনায় বসেছি এজন্য তিনি অতিশয় আনন্দিত। এমন গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারলে তিনি খুবই খুশী হতেন, কিন্তু বাঙলা না জানার জন্যই অসুবিধা।—অতঃপব 'দেবতাত্মা হিমালয়' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। এই সংবাদটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের কানে ওঠে। তিনি সোৎসাহে শ্রীযুক্ত নেহরুর সহিত পত্রালাপ করেন এবং সম্প্রতি কর্মসূত্রে দিল্লীতে থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়েও এ বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। আমার হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের এই সস্নেহ ঔৎসুক্য ও উদ্দীপনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বাঙলার এই পুরুষসিংহের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বত্রিশ বছর আগে আমার মা গিয়েছিলেন হরিদ্বারে তীর্থদর্শনে। আমি সঙ্গে ছিলুম। সেই আমার প্রথম হিমালয় দর্শন। সেটি ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস। সাধারণত যে-জগতে এবং যে-সমাজে আমার চলাফেরা ছিল, হিমালয় তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং সেদিনকার সেই তরুণ বয়সের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে সমগ্র হিমালয় আমার চোখে এক বিচিত্র অভিনব আবিষ্কার মনে হয়েছিল। নূতনের আকস্মিক আবির্ভাবে চমক লেগেছিল আমার জীবনে। ফলে, যিনি আমাকে প্রথম হিমালয় চিনিয়েছিলেন, সেই জননীর অজ্ঞাতসারেও আমাকে বারকয়েক হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। কারণ তিনি জেনেছিলেন এ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। অতঃপর ভারতীয় সৈন্যবিভাগে

মারীপর্বত

দেবপ্রয়াগের সঙ্গমতীর্থ

চাকরি নিয়ে প্রায় দেড় বৎসরকাল আমি হিমালয়ে বাস করেছিলুম। সেটি পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর কো-মারী নামক অঞ্চলে,—অধুনা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি হলো কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমে। এখানে বসবাসকালীন আমি সীমান্তের নানা পার্বত্য অঞ্চলে ঘোরাফেরা করি। আমার পিছন দিকে তখন সমগ্র ভারতবর্ষে 'সাইমন কমিশন' বয়কট করার ব্যাপার নিয়ে তুমুল রাজনীতিক ঝড় ঝাপটা চলেছে। সেটি ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ প্রান্ত। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু কন্‌গ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। সেইকালে হিন্দুরাজ পর্বতমালার দক্ষিণপূর্ব উপত্যকা অর্থাৎ খাইবার গিরিসঙ্কটের শেষপ্রান্ত লাণ্ডিকোটালে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডের দুই রাজনীতিবিদ্ স্যর জন সাইমন ও মিঃ এটলীকে মুখোমুখি দেখেছিলুম। তাঁরা তখন ডূরান্ড লাইনের পরিমাপ করছিলেন। অতঃপর ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমি কেদার-বদরী তীর্থযাত্রা করি এবং চারশো মাইলের কিছু বেশী আমাকে পায়ে হেঁটে পরিক্রমা শেষ করতে হয়,—সেই পরিক্রমা হৃষিকেশ থেকে আরম্ভ, এবং আলমোড়া জেলার রানীক্ষেত নামক পার্বত্য শহরে তার শেষ। মোট আটত্রিশ দিনে এই যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। এই কাহিনীটি নিয়েই লেখা হয়েছিল 'মহাপ্রস্থানের পথে'। কিন্তু এইখানে আমার থামবার জো ছিল না। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ অবধি বারম্বার অবিশ্রান্তভাবে আমি হিমালয়ের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করি এবং এই সময় থেকেই অদ্যাবধি নানা অবস্থায় আমার একাধিক বন্ধু ও বান্ধবীর সঙ্গ ও সহযোগিতা লাভ করে আসছি। তাঁদের অনেকেই স্বনামে এবং ছদ্মনামে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' এসেছেন এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আরও অনেকেই আসবেন।

হিমালয় ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে আমি সুদীর্ঘকাল ধরে একাধিকবার ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াই, সে-পথ আজও শেষ হয়নি। এ প্রসঙ্গে সে-সব আলোচনা বেমানান। কিন্তু হিমালয় তার আপন স্বকীয়তা ও স্বভাবের বৈচিত্র্যে আমার কাছে পরম বিস্ময়-জনক বিষয়বস্তু। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট, পশ্চিম ভারতের আরাবল্লী, মধ্যভারতের বিন্ধ্যগিরিশ্রেণী, এবং রেবা-শিপ্রা-বেত্রবতী-নর্মদা-তপতী ও হায়দরাবাদ অঞ্চলের বহু পার্বত্যালোকে ঘোরাফেরা করে দেখেছি, কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় অপার এবং অনন্ত বিস্ময় আর কেউ বহন করে না। এই গিরিশৃঙ্গমালার তলায় তলায় বিচরণ করতে গিয়ে হৃদয়বান পর্যটকের নিজস্ব প্রকৃতি আচরণ চিন্তাধারা ধ্যানধারণা,—সমস্তই সাময়িক কালের জন্য পরিবর্তিত হয়, এটি বার বার অনুভব করেছি। যে-আত্মগত ভাবটি পর্যটককে পেয়ে বসে, সমতল জগতে সেটি দুর্লভ। আমাব বিশ্বাস, ভাবনার এত বড় আশ্রয় হিমালয় ছাড়া আর কোথাও নেই।

পঁচিশ বছর আগে হিমালয় নিয়ে আজকের মতো এত আলাপ আলোচনা এবং গবেষণা ছিল না। সেদিন অবধি বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রধানত যাঁরা হিমালয়কে সুপরিচিত করেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গত জলধর সেন, সত্যচরণ শাস্ত্রী এবং শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁরা ছাড়াও অনেকে আছেন, যাঁরা এঁদেরই মতো হিমালয়ের এক একটি বিশেষ অঞ্চলে তীর্থযাত্রা করে এসে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এ ভিন্ন যে সকল ইউরোপীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে হিমালয়ের অগণ্য শিখর-বিজয়ের অভিযান করেছেন তাঁদের অনেকের রচনা জনসাধারণের কৌতূহলকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে হিমালয়কে নিয়ে আলোচনা উঠেছে সম্প্রতি,—কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও কয়েকখানি হিমালয়-সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার
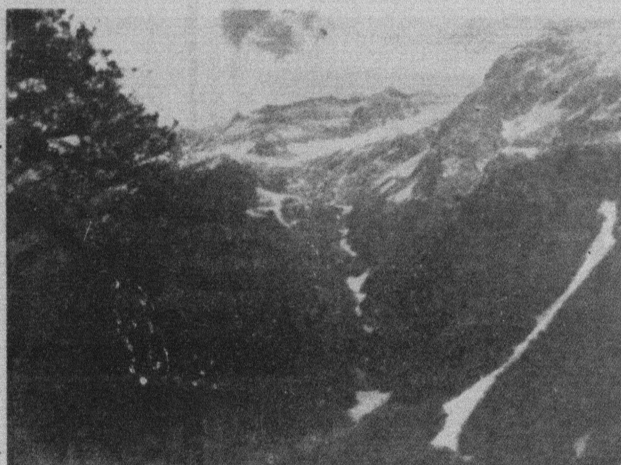
বন্দরপঞ্চ পর্বতের তুষার দৃশ্য [২০,৭২০ ফুট] এখান থেকে ত্রিশূলাকারে যমুনার উৎপত্তি

যমুনোত্তরী ও তপ্তকুণ্ডের বাষ্প
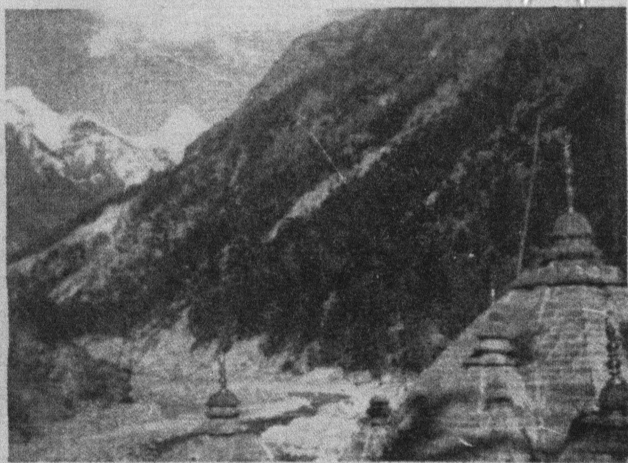
গঙ্গোত্তরীর মন্দির উত্তরে গোমুখের পর্বত

সাহায্যে। এ ছাড়াও আরেকটি কারণ আছে। এতকাল ধরে হিমালয়ের সমগ্র চেহারাটা ছিল দুস্তর, দুরতিক্রম্য এবং নিরুৎসাহকর। ইদানীং পেট্রল-চালিত যানবাহনাদির সহায়তায় হিমালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর অনেকটা সুসাধ্য হয়েছে। আজ সমুদ্রসমতা থেকে নয় হাজার ফুট উঁচু অবধি মোটরগাড়ি চলাচল করতে পারে। আনাগোনা কতকটা সহজ হয়েছে বলেই শিক্ষিত সাধারণের ওদিকে চোখও পড়েছে।

হিমালয় নামটি নতুন; এর আদি পৌরাণিক নাম হলো মহাহিমবন্ত। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, মাত্র ছয় কোটি বছর আগে সমুদ্রগর্ভের নীচেকার প্রাকৃতিক আলোড়নের ফলে হিমালয় ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফলে, গঙ্গা উপত্যকার সঙ্গে উত্তরপূর্ব পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর উপত্যকার সৃষ্টি হয়, এবং গঙ্গা মহীতলে অবতীর্ণা হন। এখনও হিমালয়ের দুই-তৃতীয়াংশই নাকি ভূগর্ভে। এই মহাহিমবন্তের শাখাপ্রশাখার আরম্ভ ব্রহ্মদেশ থেকে চীন-তিব্বত সীমানা এবং সেখান থেকে আসাম বাঙলা নেপাল হয়ে কুমায়ুন পাঞ্জাব কাশ্মীর হিন্দুকুশ ও আফগানিস্তান হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের প্রান্তে চলে গেছে। সমগ্র হিমালয়ের দৈর্ঘ্য কমবেশী পাঁচ হাজার মাইল, এবং প্রস্থে কোথাও পাঁচশো মাইল, অথবা কোনও কোনও স্থলে তারও বেশী। পৃথিবীর অপর কোনও পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা চলে না। কোনও ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে সমগ্র মহাদেশপ্রসারিত এই গিরিশ্রেণীর আগাগোড়া পরিভ্রমণ করা সম্ভব নয়।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছাড়াও হিমালয়ে শত সহস্র দেবমন্দির বিদ্যমান। এদের অধিকাংশই প্রাচীন মহিমার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। আধুনিক কালের কোনও ধনপতি হিমালয়ের কোনও গহনলোকে গিয়ে দেবস্থানের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ দৃশ্য চোখে পড়ে না। তবে ধর্মশালা এবং মন্দিরসংস্কারাদি কোথাও কোথাও দেখেছি বটে। সে যাই হোক, হিমালয়ের হিন্দুতীর্থই আমরা জেনে এসেছি, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনদের তীর্থমন্দিরও যে অগণ্য, একথাটিও মনে রাখা দরকার। ভগ্নী নিবেদিতা এককালে এ নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনাও করে গেছেন। খ্রীস্টানদের কীর্তি কিছু নেই, তবে প্রায় প্রত্যেক পার্বত্যশহরে একটি অথবা একাধিক গির্জা বর্তমান। মসজিদের সংখ্যা পূর্ব হিমালয়ে একেবারেই নগণ্য, তবে পশ্চিম হিমালয়ের দিকে কোথাও কোথাও চোখে পড়েছে। মন্দিরের পথ যত দুস্তর, ততই তার আকর্ষণ; মসজিদের পথ যত সুসাধ্য, ততই তার জনপ্রিয়তা। হিমালয়ের কোনও দুর্গম অঞ্চলে একটিও মসজিদ নেই।

হিমালয় পর্যটক বলেই যে আমি সঠিক তীর্থযাত্রী—একথা সত্য নয়। তীর্থযাত্রাটা গৌণ, হিমালয় পর্যটন হলো মুখ্য। লক্ষ্যটা আনন্দের, উপলক্ষ্যটা তীর্থের। হিমালয়ের রং মেখেছি আমি সর্ব দেহে মনে, রস পেয়েছি সর্বত্র। ইংরেজী ভাষায় এই পরিভ্রমণের সত্যকার সংজ্ঞা হলো এইস্‌থেটিক্‌। কেবলমাত্র তীর্থযাত্রা করাই যদি মূল উদ্দেশ্য হতো, তাহলে যেদিন বদরীনাথের মন্দিরে ঢুকে বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করলুম, সেইদিনই আমার গাড়োয়াল দেখা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। সমগ্র কুমায়ুনে আমাকে আট দশবার ভ্রমণ করতে হয়েছে। হিমালয়ের সকল তীর্থদেবতা দর্শন মোটামুটি দশ বছরেই শেষ হয়, কিন্তু বত্রিশ বছরেও আমার কাছে হিমালয় শেষ হয়নি। আমি ভক্তিভাসমান নই যে, মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর দেখামাত্র ভাবাপ্লুত চক্ষে অসাড় হয়ে যাবো। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ে কোথাও অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র দেখলে আমি আনন্দ পাই। ওর মধ্যে মানুষেরই মহিমাকে দেখতে পাই—যে-মানুষ দুঃসাধ্য পথে গিয়ে দেবস্থান বানিয়েছে। ঠাকুর-দেবতার কাছে

শীত ঋতুতে স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্ট

লালটিব্বার উপর থেকে মুসৌরী শহরের একাংশ

আমার কোনও বস্তু কাম্য নেই।

মোট কথা, আমার দৃষ্টি হিমালয়ের সামগ্রিক চেহারাটাব দিকে। এর আনুপূর্বিক বিশালতাকে আমার মনের মধ্যে ধারণ করবো,—এই ছিল লক্ষ্য। হিমালয়ের যে-অংশটাকে বলা হয় 'মহাভারতীয়'—যেটা হিন্দুভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক—সেটার নাম হলো শিবলিঙ্গ পর্বতমালা। ইংরেজিতে একে বলা হয়, শিউয়ালিক্ রেন্জ। এর দৈর্ঘ্য ছয়শো মাইলের কম নয়, কিন্তু এর বাইবে হিমালয় অনেক ব্যাপক। দুই হাজার বছর আগে ভারতের মানচিত্রের যে সঙ্কেত পাওয়া যায়, তাতে তার পশ্চিম সীমানা নির্দিষ্ট হয় সোলেমান গিরিশ্রেণী, এবং উত্তর পশ্চিমে হিন্দুরাজ পর্বতমালার সীমানা অবধি। রাজনীতিক কারণে যুগে যুগে মানচিত্র পবিবর্তিত হয়, এ আমরা জানি। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, মাত্র একশো বছর আগেও পামীর উপত্যকার একটা অংশ ভারতের অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ হিন্দুকুশ এবং কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরিশ্রেণী ভারতের উত্তর প্রাকার হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। এই দুই পর্বতমালার অপর প্রান্তে পামীর মালভূমি পড়ে বলেই সম্ভবত পামীরকে আমরা হাবিয়েছি। অবশ্য একথাটা মনে রাখা দরকার, হিমালয়ের বহু অঞ্চল আজও অনধ্যুষিত,—তাদেরকে 'no man's land' বললে ভুল হবে না। কিন্তু কালক্রমে যদি কেউ আগে-ভাগে গিয়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে বসে, তবে পরবর্তীকালে তাকে হটিয়ে দেওয়াও অসুবিধাজনক। দু-একটি উদাহরণ এখানে দিই। বদরীনাথের মন্দির থেকে কিছু দূরে অবস্থিত মানা-গ্রামের অধিবাসীরা তিব্বত গভর্নমেন্টের দরবারে আজও রাজস্ব দেয় কেন, আমার বুদ্ধির অগম্য। লাডাক প্রদেশকে পশ্চিম তিব্বত বলা হয় কেন, এ এক সমস্যা। কাশ্মীরস্থিত নাঙ্গা এবং দেবসাই পর্বতশ্রেণীর ওপারে গিলগিট অঞ্চলে সিন্ধুনদের তীরে হিন্দুতীর্থ রামঘাট বিদ্যমান, কিন্তু এই গিলগিট অঞ্চলে কাশ্মীর-ভারতের সীমানা আজও অনেকখানি অনির্দিষ্ট। এ ছাড়া কৈলাস পর্বতমালার সম্বন্ধেও কিছু কথা থেকে যায়। পুরাকাল থেকে কৈলাস ও মানস সরোবর, রাবণ হ্রদ, গুরলা মান্ধাতা ইত্যাদি হিন্দুতীর্থগুলির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি আত্মিক যোগাযোগ ছিল, সেই আত্মীয়তা অদ্যাবধি বর্তমান। ভারতের পুরাণে কাব্যে উপকথায় এমন কি ইতিহাসের কোনও কোনও ক্ষেত্রেও এর উল্লেখ দেখতে পাই। কিছুকাল আগেও কৈলাস ও মানসসরোবরের তীর্থযাত্রীরা তাক্লাকোট থেকে ভারত সরকারের সাহায্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতেন, চীন এবং তিব্বতের আধিপত্যের কথা তখন উঠতো না। কেবল তাই নয়, কেদার-বদরী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর মতই কৈলাস ও মানসসরোবরের সমস্ত দেবদেবী এবং পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠানাদির পরিচয় এখনও সমগ্রভাবেই ভারতীয়। অনেকের ধারণা, কৈলাস পর্বতমালার সমান্তরাল—যার ভিতর দিয়ে লাডাক থেকে তাসিগঙ ও গারটক হয়ে প্রাচীন ক্যারাভান্ পথ সোজা দক্ষিণে নেমে চলে গিয়েছে মানসসরোবরের দিকে,—সেইটিই হলো ভারতের আদি সীমানা। দেখা যাচ্ছে অদ্বৈতবাদী ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যের ফলে যুগযুগান্ত কাল ধরে ভারতভূমি বারম্বার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে চলেছে, এবং এক এক যুগে এক এক টুকরো ভূভাগ কেটে নিয়ে যাচ্ছে বাইরের লোকে। সুতরাং আজ যদি কেউ বলে ভারতের উত্তর ভূভাগ হিন্দুকুশ, কারাকোরাম এবং কৈলাস পর্বতমালার দ্বারা প্রাকারবেষ্টিত, আমি তাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করবো না। পুরাকালের আর্যরা যদি ভারতের ঐক্যসাধনার আচমনীমন্ত্রে সাতটি নদ-নদীর সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রকেও সংযুক্ত করতেন, তাহলে ভুল ঘটতো না।

কালিম্পঙের গৌরীপুর প্রাসাদে
রবীন্দ্রনাথ-টেলিফোনের সাহায্যে
বেতারে 'জন্মদিন' কবিতাটি
আবৃত্তি করছেন ১৯৩৮
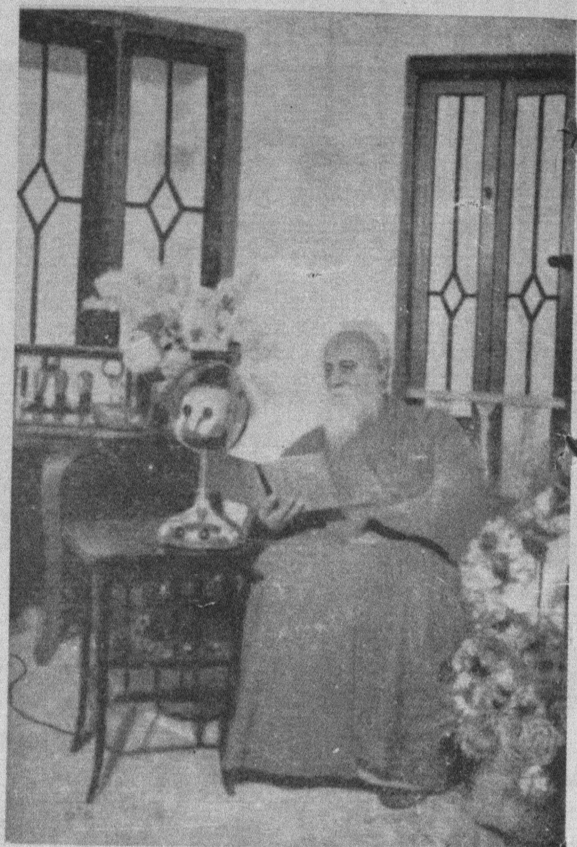
তিস্তা নদীর
উপর সেবক
(করোনেশন) পুল

কিন্তু ভৌগোলিক আলোচনা আমার এই উপক্রমণিকার মূল উদ্দেশ্য নয়। হিমালয়কে নিয়ে আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলা চলেছে,—সে সম্বন্ধেও কোনও বক্তব্য প্রকাশ করা আমার লক্ষ্য নয়। এই গ্রন্থে সমগ্র হিমালয়কে তার স্বভাব ও সৌন্দর্যসহ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। আমি যতদূর জানি, ভারতের কোনও ভাষায় হিমালয়ের সমগ্র ভৌগোলিক রূপ নিয়ে কোনও লেখক আজও এ ধরণের প্রচেষ্টায় হাত দেননি। নগাধিরাজ হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গমালা দেবভূমি ভারতের শিয়বে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে কল্পে কল্পান্তে। কতবার চেয়ে থেকেছি, দূর দূরান্তরে প্রসারিত তার শাখা-প্রশাখা একদিকে মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের হিমবায়ুর সর্বনাশা ঝাপটার থেকে ভারতকে প্রতিনিযত রক্ষা করছে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সাগরের মৌসুমী বায়ুর পথ উত্তর দিকে অবরোধ করে সমগ্র ভারতকে শস্যশ্যামলতায় সে প্রাণময় করে রেখেছে। এই কারণে দেবতাত্মা হিমালয় ভারতের নিত্য রক্ষক ও প্রতিপালক। বেদে উপনিষদে পুবাণে মহাকাব্যে এবং ইতিহাসের পর্বে পর্বে তিনি ভারতের পূজা পেয়ে এসেছেন। বিশাল-বিস্তৃত গিরিরাজের শাখা-প্রশাখাগুলি সংখ্যাতীত নামে প্রকাশ। সহস্র সহস্র গিরি-নদী নির্ঝরিণী এদের স্তরে-স্তরে প্রবাহিত। চিরতুষারমণ্ডিত শতসহস্র মাইল বিস্তৃত এর অগম্য অঞ্চল। হাজার হাজার বর্গমাইল ব্যাপী এর ভীষণ গহন অরণ্যানী। এদের সঙ্গে মিলে রয়েছে হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, হায়না, হরিণ, গণ্ডার, সম্বর, বাইসন, চমরী,—ইত্যাদি বহু জানোয়ার, এবং শতসহস্রবিধ সরীসৃপের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হলো হিমালয়ের মর্মে মর্মে। ইতিহাসের চোখের আড়ালে কত ধর্মসংগ্রাম ঘটে গেছে হিমালয়ে, কত রাজভিখারী কেঁদে বেড়িয়েছে এর নির্জন গিরিনদীর তীরে তীরে, কত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী পদ্মাসনে চোখ বুজে বসে অবশেষে পাথর হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, একটির পর একটি সভ্যতা আবির্ভাব ও তিরোভাব, বীরবিক্রম নরসিংহদলের অনাবিষ্কৃত একটির পর একটি কাহিনী,—হিমালয়ের পাথরে পাথরে চিহ্নিত। এই মহাপুণ্য গিরিমালার স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ করে গেছেন আর্যঋষিগণ। তারপর একে একে গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, রামানন্দ, সম্রাট অশোক, আচার্য শঙ্কর, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, মহাকবি কালিদাস, গুরু নানক, কবীর,—এবং একালেও দেখেছি রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, জওয়াহরলাল প্রভৃতি মনীষীরা কোনও না কোনও সময়ে হিমালয়ে নিজ নিজ অস্থায়ী বাসা বেঁধেছিলেন। অনেকের কাছেই হয়ত অবিদিত, চিরতুষারমৌলী ত্রিশূলশৃঙ্গের সম্মুখবর্তী কৌসানী পাহাড়ের চূড়ায় বসে গান্ধীজি তাঁর অনাসক্তিযোগ গ্রন্থের কয়েকটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। অনেকে হয়ত ভুলতে বসেছে, মুক্তেশ্বরের তীর্থপথে রামগড় পাহাড়ের চূড়ায় বসে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অবধি কাব্যরচনা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বভাব-বৈরাগ্য হেতু কিশোর বয়সে সন্ন্যাস নেবার কল্পনায় হিমালয়ে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া যে সত্যকাহিনী আজও খ্রীস্টান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেটি হলো স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট তাঁর তরুণ বয়সে অহিংসবাদী গৌতম বুদ্ধের মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি নেপাল এবং হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চল ভ্রমণ করে পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যের দিকে চলে যান। পণ্ডিতগণের কাছে এর তথ্যপ্রমাণাদি আজও বর্তমান।

সমগ্র হিমালয়ের নানা অঞ্চলে বহু সহস্র প্রাচীন দেবদেউল, মন্দির ও বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হিন্দুকুশে, হিন্দুরাজ পর্বতমালায়, পীরপাঞ্জালের পশ্চিম অংশে,—যে

সমস্ত অঞ্চল আজ পাকিস্তান ও পাঠান মুলুকের অন্তর্গত,---সেখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে শত শত দেবমন্দির, মঠ ও গুম্ফা এখনও বিদ্যমান। তারা সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি নানা ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এই আদিঅন্তহীন গিরিশৃঙ্গদলের আশেপাশে যুগ-যুগান্তকাল থেকে লক্ষ লক্ষ সংসারবিরাগী সাধু, সন্ন্যাসী, জীবনবৈরাগী, বাউল, তপস্বী, জ্ঞানপিপাসু, তীর্থবাসী, সত্যসন্ধানী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর মানুষ আপন আপন শান্তিনীড় রচনা করে রয়েছে,—বিরাট বনস্পতির শাখাপ্রশাখায় কোটরে জঠরে যেমন বাসা বেঁধে থাকে ছোট ছোট পাখি। এই হিমালয়ের শৃঙ্গবিজয় অভিযানে কতবার এসেছে পৃথিবীর কত শত অভিযানকারী; কতদিনের কত মৃত্যুবরণের পর গৌরীশৃঙ্গবিজয়ে আজ তারা সাফল্যলাভ করেছে। এই হিমালয়ের অনাবিষ্কৃত ঔষধিবনে মৃতসঞ্জীবনী আবিষ্কার করা এই শতাব্দীতে সম্ভব—বহু বিজ্ঞানী একথা মনে করেন। বীরের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে, সন্ন্যাসীর একাগ্র তপশ্চর্যায়, তীর্থযাত্রীদলের পূজা-বন্দনায়, কবি শিল্পী দার্শনিকের সৌন্দর্য-কল্পনায়---দেবতাত্মা হিমালয় মানুষের চিরবিস্ময়।

সমতল জগতে ছুটি কোথাও নেই,—আমাদের চোখ মন চিন্তা কল্পনা—-এরা নিত্যই বিভ্রান্ত; প্রতি মুহূর্তে মন ছোটে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে; দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে একটির থেকে অন্যটিতে। কিন্তু হিমালয়ের আশ্চর্য জগতে আমাদের মনের ছুটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত,—সেই কারণে বাহিরের থেকে দৃষ্টি ফিরে আসে আপন অন্তরে; সেই দৃষ্টি আনন্দের পরম আস্বাদে মধুর। পলায়নী মনোবৃত্তির কথা এখানে বলা হচ্ছে না, কিন্তু আধুনিক কালের জটিল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এবং ক্লান্তিকর জীবনযাত্রার থেকে যারা মাঝে-মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেতে চায়, হিমালয় তাদের পক্ষে একটি পরম আশ্রয়। একথা স্বীকার করবো বইকি, হিমালয়ের অরণ্যজটলা তার মাটি পাথর তুষার নির্ঝর সমস্ত মিলিয়ে আমার চেতনার জড়ত্বকে অনেকবার মুক্তি দিয়েছে,—উৎসুক উন্মুখ মনকে চঞ্চল করে তুলেছে বারম্বার। হিমালয়ের ডাক দুঃখ দেয় অনেক সময়ে, কিন্তু দুঃখের মধ্যে প্রাণ-পার্বণের উদ্বোধনও ঘটায়। মনে মনে আনন্দ-উৎসবের যে সাড়া পড়ে যায়,—বাইরের লোকের কাছে সেটি হয়ে থাকে দুর্বোধ্য। ধ্বনিকে ধারণ করে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি, যে নিত্য উৎকর্ণ। সবাই সে-ডাক শোনে না।

'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে তাঁদের কথা স্মরণ করি, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে যাঁরা মধ্যে-মাঝে আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এখন জীবিত নেই, এবং অনেকের খোঁজখবরও জানিনে। আমি যে একজন লেখক ও গ্রন্থকার,--এ পরিচয়ও অনেকের নিকট গোপন করা ছিল। আজ সেই সব নামহারা বাঙালী ও অবাঙালী নরনারীকে মনে পড়ছে,—যাঁদের সঙ্গে একত্রে কেটেছে অনেকদিন এবং যাঁদের সেবা করে আমি আনন্দ পেতুম। কোনওকালে হিমালয় নিয়ে তাঁদেরই জনৈক সহচর গ্রন্থরচনা করবে,---এ অনেকের ধারণা-বহির্ভূত ছিল। আমার সেইসব অজ্ঞাত অখ্যাত অপরিচয়ের সঙ্গী ও সঙ্গিনী—জীবিত ও মৃত—যাঁরা এক-এককালে আমার পথের পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন,—এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্কালে তাঁদের সকলের উদ্দেশে আমার আন্তরিক প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

গ্রন্থকার

গান্ধী-জন্মতিথি
অক্টোবর ২, ১৯৫৫

পূর্বভাষণ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

'দেবতাত্মা হিমালয়' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশকালে প্রথমেই জানাই, আমার হিমালয ভ্রমণকথা আপাতত এই খণ্ডেই সমাপ্ত হলো। কিন্তু এই বিষয়টি এমন বিশাল এবং বিস্তৃত যে, এই গ্রন্থ রচনাকালে এব প্রারম্ভ ও পবিশেষ কল্পনা করে অনেক সময় যেন কতকটা উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করেছি। সুদীর্ঘকাল ধরে ডায়েরীর পৃষ্ঠায় এবং কতকগুলি ছিন্নভিন্ন কাগজের টুক্‌রোয ভ্রমণকথাগুলি টুকে রেখেছিলুম। কিন্তু কোনওকালে সেগুলি একত্র করে গ্রন্থরচনায হাত দেবো, একথা মনে থাকলে আরও খুঁটিয়ে নানাকথা সযত্নে লিখে রাখতুম। ফলে এই হলো, অনেক মানুষ হারিযে গেছে, অনেক কাহিনী বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে এবং অনেক তথ্যও আব একত্র কবা গেল না। অপ্রকাশিত থেকে গেল প্রচুর, এবং যা অসমাপ্ত থেকে গেল তাব পবিমাণও কম নয়। শুধু তাই নয়, তাদের সঙ্গে রইলো আমাব ত্রুটিবিচ্যুতি, খর্বতা, ক্ষুণ্ণতা ও কৃপণতা। বস্তুত, হিমালযেব সঙ্গে আমাব মানসিক ঘনিষ্ঠতা যেন নিতান্তই ব্যক্তিগত; পরস্পবের এই আত্মীযতা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বোঝানো কঠিন বলেও মনে হয়েছিল। সেই কাবণে এই ভ্রমণকথাগুলি দুই খণ্ডে শেষ কবাব পব কেমন একটি প্রিযবিচ্ছেদবেদনা অনুভব করছি। যে ছিল একান্তই আপন, সে যেন হযে গেল সর্বসাধাবণেব। যাব সঙ্গে আমার হৃদযের নিভৃত মধুব সম্পর্ক, সে যেন এসে দাঁড়ালো প্রকাশ্য মঞ্চেব উপবে নাচের্ আসবে। পাঁজবেব কোণে একটু ব্যথা লাগে বইকি। যদি কেউ তার সুখ্যাতি করে ত করুক, আমাব চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হবে। ওর সঙ্গে আমাব অনেক সুখদুঃখেব ইতিহাস জড়ানো।

হিন্দুকুশের উপত্যকা থেকে পার্বত্য আসাম অবধি হিমালযেব যে বিস্তৃত ভৌগোলিক উত্তর-প্রাচীর আমরা মানচিত্রে দেখি তাব প্রত্যেকটি ভূভাগ আমার ভ্রমণের মধ্যে এলেও এদের সম্বন্ধে আলোচনাকালে প্রত্যেকেব প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ সুবিচার করা সম্ভব হয়নি। এখানে ওখানে অনেক ক্ষেত্রে আমাব অক্ষমতা রয়ে গেল। এই অক্ষমতাকে অপসারিত করার জন্য ভবিষ্যৎ কালের সর্বসাধক পরিব্রাজকেব পথ চেয়ে বইলুম। তবু প্রথম খণ্ডের পূর্বভাষণে যা বলেছি, এখানেও তাব পুনরুক্তি কবে বলি, মানুষেব এক-জন্মে সমগ্র হিমালয় আনুপূর্বিকভাবে ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এ কাজ আয়ুষ্কালের একশো বছরেও কুলোয না।

মোটামুটি সাতাশটি পর্বে হিমালয়কে ভাগ করে এই ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ করেছি, কিন্তু চব্বিশটির বেশী দুই খণ্ডে আর দেওয়া গেল না। যথাসময়ে এর একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা রইলো।

এই গ্রন্থের দুই খণ্ডেই ইতিহাস ভূগোল রাজনীতিক তথ্য, সামাজিক সংস্থা, লোকাচার প্রবাদ উপকথা রূপক পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটু-আধটু আলোচনা করা হয়েছে। হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছিল তাই নিয়েই কাজ চলে গেছে। কিন্তু একথা

মনে ছিল, এই গ্রন্থ কোনও বিশেষ বিষয়ের গবেষণাক্ষেত্র নয়। চলমান মনের উপরে যারা ছায়া ফেলেছে তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রামাণ্য নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। নতুন নতুন গবেষণার ফলে ইতিহাস বার বার ব্যাখ্যা বদলায়, এটি দেখতে পাওয়া গেছে। আমার এ গ্রন্থ ইতিহাস ভূগোল দর্শন পুবাণ—এদের কোনওটাই নয়। শুধু একটি কথা বলি, ঐতিহাসিক রাজনীতিক বা সামাজিক তথ্য পরিবেশণ-ব্যাপারে আমার নিজের ভাষ্য যোগ করেছি অল্পই, কেননা তারা নিজেদের পরিচয় নিজেরাই বহন করেছে। আমার হাতে তারা একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গী পেয়েছে মাত্র।

ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য, ভূতত্ত্ব, এবং হিমালয়ের প্রাকৃতিক ভূগোলেব তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের রচনা থেকে মধ্যে মাঝে অল্পস্বল্প সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের নামও গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। সেই সব জীবিত ও মৃত বিশেষজ্ঞগণের উদ্দেশে আমাব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার অন্যান্য বক্তব্য এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'পূর্বভাষণে' এর আগে বলে এসেছি।

—গ্রন্থকার

কলিকাতা-৩১
সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৫৬

দেবতাত্মা হিমালয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মপুরা গাড়োয়াল

প্রায় দেড় হাজার বছর হতে চললো।

সিংহাসন থেকে নেমে এসে সম্রাট হর্ষবর্ধন অভিবাদন কবলেন পরিব্রাজক হুয়েন সাংকে,—মহাত্মন্, বিদায় নেবার আগে এই অখণ্ড সমগ্র মহা-ভারত আপনার আশীর্বাদ কামনা করে।

প্রণত বিনয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ হুয়েন সাং জবাব দিলেন, এই যোগাসীন ধ্যান-নিমীলিত প্রাচীন ভারতের আশীর্বাদ আমিও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, রাজন্। ভূ-স্বর্গময় এই ভারত। হিমালয়ের ওই ব্রহ্মপুরায় দাঁড়িয়ে বারম্বার আমি সেই ভূ-স্বর্গলোক দর্শন করেছি।

ভারতের প্রাচীন আর্যসভ্যতার আদি মন্ত্র লাভ করেছিল এই ব্রহ্মপুরা। হাজার হাজার বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই ব্রহ্মপুরার পথ দিয়ে গেছে মুনি ঋষি যোগী সন্ন্যাসী পরিব্রাজক আর পর্যটক। হিমালয়ের এই দুস্তর ও দুরারোহ পর্বতের প্রান্তে কোনো এক নির্ঝরিণী-তীরস্থিত তপোবনে বসে মহামুনি বেদব্যাস রচনা করেছিলেন শিবপুরাণ তথা কেদারখণ্ড। অন্যান্য পুরাণেও এই ব্রহ্মপুরাকে বলা হয়েছে ভূস্বর্গ। মহাকবি কালিদাস এই ব্রহ্মপুরাকে বলেছিলেন স্বপ্নপুরী। সমগ্র মহাভারতের বিরাট কাহিনী এই ব্রহ্মপুরায় বসে লেখা হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য, তারপর অশোক, তারপর সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল—ইতিহাসের সেই গৌরব-মহিমার কালে ব্রহ্মপুরা ছিল ঋষিগণের তপস্যালোক, আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্র। এই ব্রহ্মপুরার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে গোমুখী নিঃস্রাবিত জননী জাহ্নবী, গেছে দেবলোক প্রবাহিনী অলকানন্দা, গেছে ব্রহ্মালোকবিধৌতা মন্দাকিনী। এখানকার সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-কিরীট হিমালয়ের প্রথম স্তর হলো ব্রহ্মালোক—পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে; তার নীচে যেখানে শিবলিঙ্গ পর্বতমালার দুরতিক্রম্য স্তর, সেটি দেবলোক, দেবগণের বিচরণ-ক্ষেত্র। ভাগীরথী যেখানে উপলাহতা ঊর্মিমুখরা হয়ে ঋষিকুলের আশ্রমসীমান্তে বয়ে চলেছেন—সেই স্তরটিকে চিরদিন ঋষিরা বলে এসেছেন তপোলোক। তার নীচে যেখানে দিগন্তপরিব্যাপ্ত হিমালয়ের পাদমূল, যে-স্তর হলো অরণ্যময়—যেখানে গঙ্গা প্রসারিত—তার নাম হলো মর্ত্যলোক, সেখানে নর-বানর, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গর অবারিত লীলাভূমি। সেই ভূভাগে নেমে গঙ্গা উপত্যকার নাম হয়েছে গঙ্গাবতরণ; গঙ্গা সেখানে জীবলোকে অবতরণ করেছেন। তিনি নেমেছেন আর্যাবর্ত প্রতিপালনে। ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে।

আমার প্রথম তারুণ্য তার চোখ মেলেছিল ব্রহ্মপুরার ওই শিবলিঙ্গ পর্বতমালার নীচে গঙ্গাবতরণের প্রান্তে। বত্রিশ বছর আগে সেদিন প্রথম হিমালয়ের পাদমূল স্পর্শ করি। কিন্তু সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার ব্রহ্মপুরা এখন আর নেই, আছে তার স্থলবর্তী একটি নাম—গাড়োয়াল। মাত্র চারশো বছর আগে রাজা অজয়পাল সমগ্র ব্রহ্মপুরার বাহান্নটি দুর্গ একত্র করে এর নামকরণ করেছিলেন গড়বাল। অর্থাৎ দুর্গপ্রধান। সেদিন চোখ মেলেছিলুম, কিন্তু কিছু দেখিনি। আবিষ্কার করেছিলুম নতুনকে, বিচিত্রকে, ভারতের

শ্রেষ্ঠ মহিমাকে,—তাই দৃষ্টি ছিল নিমেষ-নিহত, একাগ্র। শুধু দেখে এসেছিলুম তার নীল ধারা,—এক রহস্য থেকে ভিন্ন রহস্যলোকের ভিতর দিয়ে কোন্ পর্বতমালার তলা দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেদিন আমার মন বাঙ্ময় ছিল না তাই আস্বাদ আর উপলব্ধির পথ দিয়ে ক্ষুধাতুর প্রাণ কেবল আপন খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরেছিল। তবু তার মধ্যেও উপলব্ধি অপেক্ষা আবিষ্কারের চেষ্টা ছিল প্রধান।

তারপর কতবার গেছি এই ব্রহ্মপুরার প্রান্তসীমায়, ওই গাড়োয়ালের পাহাড়তলীর নীচে নীচে, নীলধারার তীরে তীরে, ওর বনে-বনান্তরে, গিরি গুহালোকে, ওর মনোরম বসন্তশোভার ভিতর দিয়ে, ওর উন্মাদিনী নির্ঝরিণীর প্রস্তরসঙ্কুল তটে তটে। কত মধ্যাহ্নের একান্ত ভাবনা, কত প্রভাতের নিঃসঙ্গ নির্জনতা—আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাক্ষর রেখে গেছে ওর ওই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে, এখানে ওখানে, মন্দিরে, তপোবনে, উপত্যকায়, আর গভীর গহ্বরে, আজ তাদের ইতিহাস আর মনে নেই। কিন্তু ওখানে আমি বার বার দেখতে চেয়েছি যা দৃষ্টিগোচর হয় না, ভাবতে চেয়েছি যা ভাবনাতীত, জানতে চেয়েছি যা জ্ঞানের সীমানার মধ্যে নেই। বিজন ভীষণ গিরিগহ্বরের নীচে শিলাতলে গিয়ে নিঃসঙ্গ বসেছি, দেখেছি কতবার বসন্তশোভা কলস্বনা দিশাহারা স্রোতস্বিনীর এপাশে ওপাশে, তারপরে সহসা কোথাও কোথাও তৃণগুল্ম শৈবালে আকীর্ণ অন্ধকার গুহাগর্ভের দিকে চেয়ে ছমছমিয়ে এসেছে সর্বশরীর, আবার ফিরে এসেছি ভয়ে ভয়ে। হয়ত ওদের মধ্যে ছিল ভয়াল ময়াল, কিংবা কোনো অনাবিষ্কৃত অতিকায় জন্তু, কিংবা কোনো অটল অচল যোগতন্দ্রাচ্ছন্ন মহাঋষি,—জটাজটিল ধ্যানমৌন মহাস্থবির। হায় হায় করে উঠেছে প্রাণ, হায় হায় করেছে সমগ্র জীবন। কিন্তু তারপর আবার গিয়েছি নিজের পথ দিয়ে। মনে হয়েছে আমার পিছু নিয়েছে সেই হাজার হাজার বছর আগেকার অশরীরী ছায়ামূর্তির দল। তারা শুনতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের পায়ের শব্দ, তারা দেখতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের প্রকাশ, জানাতে চেয়েছে আমার মধ্যে দিয়ে তাদের আশীর্বাদ। অবশেষে ছায়ামূর্তিরা বিলীন হয়েছে যেন আমার এই কায়া মূর্তিরই মধ্যে।

গাড়োয়ালের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ সামান্য নয়। যোশীমঠ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়, হনুমান চটি ছাড়ালে তার পরিচয় মেলে। মেয়ে-পুরুষের চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখতে দেখতে যায় বদলে। গৃহপালিত পশুদের আকারেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন নেপালে, যেমন পূর্ব কাশ্মীরে, যেমন সমগ্র সিকিম ও ভূটানে,—তেমনি উত্তর-পূর্ব গাড়োয়াল যেখানে মিলেছে তিব্বতের পাহাড়ে, যেখানে তার ছোঁওয়া-ছুঁয়ি কিছু বেশী। সেখানে আচার-আচরণ, সামাজিক প্রথাদি, আচ্ছাদন-পরিচ্ছদেই যে কেবল তিব্বতকে এড়ানো যায়নি তা নয়,—তিব্বতের প্রবল প্রভাব পড়েছে হিমালয়ের বহু মন্দিরে ও স্থাপত্যে। যোশীমঠ বলো, উখীমঠ বলো, কেদার ও বদরিনাথের মন্দির বলো,—তিব্বতের গুম্ফা ও মন্দিরের যে সমস্ত স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় আছে, তাদেরই প্রভাব পড়েছে এই সব মন্দিরে। কাশ্মীরের লাডাকে এই কথা, কুলু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে এই চেহারা, উত্তর আলমোড়াতেও এরই পুনরাবৃত্তি। তুর্কীস্তান ও পামীরের মালভূমি থেকে যাদের আসতে দেখেছি, যে সকল হূনজাতির লোককে একদা দেখেছি ঝিলম্ নদী ও সিন্ধুনদের তীর ধরে এসে সীমান্তে পৌঁছেছে—তারাও এই শাক্ত-শৈব-বৌদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে আজও এড়াতে পারেনি। তিব্বতী অথবা কোনো বড় গুম্ফায় ঢুকে দেখো, সেখানে শক্তিরূপিণী মহাকালী রয়েছেন হয়ত ভিন্ন নামে, এবং হিমালয়ের

নানা মন্দিরে প্রবেশ করে দেখো বৌদ্ধ-প্রভাবের কী চমৎকার পরিণতি! ভারতের সঙ্গে পশ্চিম তিব্বত একাকার।

এই গাড়োয়ালের সমগ্র উত্তর সীমানা তিব্বত ও কাশ্মীর থেকে পৃথক করে রেখেছে শতদ্রু নদী। মানস সরোবর থেকে নেমে কৈলাস পর্বতের পাদমূল বেয়ে অনধ্যুষিত গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে শতদ্রু নদী চলে গেছে তিব্বত পেরিয়ে গাড়োয়ালের উত্তর দিয়ে উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে। যেমন কাশ্মীরের নীলগঙ্গা। এদের মূলধারাকে কি কেউ অনুসরণ করেছে? শত সহস্র গিরিনদী নির্ঝরিণী, শত সহস্র শাখা-প্রশাখায় কোন্ পথ দিয়ে কোথায় এদেরকে নিয়ে চলেছে কেউ কি জানে? এদের এপারে ওপারে এমন অনেক অনাবিষ্কৃত গিরিসঙ্কটসঙ্কুল ভূভাগ রয়েছে যেখানে আজও কোনো মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি। জন্তু সেখানে জন্মায় না; কীটপতঙ্গ সরীসৃপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই নিষ্প্রাণ তৃণতরুলতাহীন অসাড় পার্বত্যলোকের নির্জনতা বিভীষিকার মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি কতদিন!

কিন্তু গাড়োয়ালে এর কিছু ব্যতিক্রম। একটি পর্বত ছাড়িয়ে অন্য পর্বত অতিক্রম করো, এক চূড়া থেকে অন্য চূড়ায়—রুক্ষতা নেই কোথাও। তুষারের সমান্তরাল বাদ দাও,—শুধু চেয়ে থাকো সমগ্র ব্রহ্মপুরার দিকে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ঘননীলের আভা, চারিদিকে সবুজের সমারোহ। যত চাও নদী, যত চাও জলধারা, যত তাকাও এখানে ওখানে,—পুষ্পস্তবকাবনম্রা! পৃথিবীর সব ফুল এখানে ফোটে স্তবকে স্তবকে। যেখানে যাও, যেদিকে চাও,—তপোবন! ওই যেখানে বাঁকা আলো পড়েছে গুহার পাশ দিয়ে লতাবিতানের ছায়ার তলায় ঝরনার ঠিক ধারেই,—ওখানে উদ্বেলিত হচ্ছে করুণ কবিতার ব্যঞ্জনা! ওই ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত নিকুঞ্জে বাকি জীবন কাটানো যায় বৈকি! তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে চলেছ, পথের কোন একটি বাঁক ঘুরেই তোমার কানে পৌঁছবে জলধারার মৃদু কলতান! রঙ্গীন পাখায় প্রজাপতিরা ছেয়ে ফেলেছে উপত্যকা, রক্তরঙ্গীন আপেল আর আনার বিরাট পাহাড়ের গাত্রদেশকে রক্তপ্লাবিত করেছে—তুমি দেখে নাও পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। পাখিদের দিকে দেখো,—যাদের দেখোনি তুমি কোনোদিন, যাদের বর্ণসুষমা তোমার কল্পনাকে নিয়ে যাবে নন্দনকাননে,—চোখ ভরে তাদের দেখে নাও। চেয়ে থাকো সুনীলনয়না নদীর দিকে,—অনন্ত উদার গগনলোকের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে যার জলরাশিতে। সে রোমাঞ্চ-কৌতুক তোমার পক্ষে অবিস্মরণীয়। উত্তুঙ্গ পর্বতের চূড়ায় ওঠো,—চূড়া থেকে চূড়ায়,—চিরতুষারমণ্ডিত ত্রিশূল পর্বত আর নয়নাভিরাম নন্দাদেবীর শোভা তোমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। চেয়ে থাকো পিন্দার হিমবাহের দিকে, চেয়ে দেখো নন্দকোট। যেখান থেকে নেমে এসেছে পিন্দার গঙ্গা, যেমন এসেছে রামগঙ্গা গাড়োয়াল থেকে আলমোড়ায়। তোমার দুটি অপলক চোখ।

গাড়োয়ালের প্রকৃত রূপ হলো গাঙ্গেয়। উত্তর ব্রহ্মপুরায় গোমুখী থেকে গঙ্গার উৎপত্তি জানি। কিন্তু জানা গেল কি কোথা থেকে এলো অলকানন্দা আর সরস্বতী? জেনেছি কি ধবলীগঙ্গার জন্মস্থল? সহজে কিছু জানা যায় না! কিন্তু অসংখ্য নামে অগণ্য জলস্রোত পরিণামে গিয়ে মিলেছে গঙ্গায়,—যে-গঙ্গাকে আমরা জেনেছি হরিদ্বারে চণ্ডীপাহাড়ের পাদমূলে। মনে পড়ে গেল চণ্ডীর পাহাড়তলীকে—শিবলিঙ্গ পর্বতমালার পাদমূল। দেরাদুন উপত্যকার সীমানা। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অন্ধকার অরণ্যলোক চলে গেছে যতদূর দৃষ্টি যায়। উপরের চূড়ায় রয়েছে চণ্ডী অসুরনাশিনী। নদীর এপারে

শিবপূজায় ব্যস্ত হরিদ্বার, ওপারে চলেছে শক্তিপূজা! কনখলে যাবার পথে মায়াবতীর পাশ দিয়ে গঙ্গার মূলধারার তীরে তীরে পথ। আশ্চর্য, এই নদীর উপরে দাঁড়ালে উত্তর দিগন্তে সোজা দেখা যায় তুষারমৌলী বদরিনাথের পর্বতচূড়া—আকাশপথে হয়ত পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। এই গঙ্গার দুই তীরভূমি থেকে তুলেছি কত বিচিত্রবর্ণের নুড়ি,—নিটোল মসৃণ মোলায়েম পাথরের টুক্‌রো। হরিদ্রাভ, রক্তিম, নীল, সবুজ, লোহিতনীলাভ, কৃষ্ণ,—আরো কত রং। নুড়ি তুলেছি অনেক, হিমালয়ের নানা অঞ্চলে। নুড়ি তুলেছি রং-পো আর রায়ডাক আর তিস্তার তীরে—যেখান দিয়ে পথ হারিয়ে গেছে সিকিমে ভূটানে আর নাথু-লা গিরিসঙ্কটে, নুড়ি তুলেছি ব্রহ্মপুত্রে আর বাগমতীতে, গোমতী আর কৌশল্যার তীরে, নুড়ি তুলেছি শারদায় আর সরযূতে, নুড়ি তুলেছি বিতস্তায় বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়। অজানা অনামা নদীর উৎস অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল চিরকালের জন্য, শুধু তাদের থেকে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ালুম।

নদী পার হয়ে গেছে চণ্ডীপাহাড়ের পথ। কতকটা চড়াই। এপার থেকে দেখতে অনেক চড়াই,—ওপারে গিয়ে কিছুদূর উঠলে অতটা আর মনে হয় না। পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণে নদী,—আর সব দিক ঘন অরণ্যে নিবিড়। চড়াই পথে বাঁহাতি কালীর মন্দির,—যতদূর মনে পড়ে, ওঁর নাম দক্ষিণাকালী। মন্দির প্রাচীন,—যেমন গাড়োয়ালের বহু শত মন্দিরই প্রাচীন। মন্দিরের পূজাও অকিঞ্চনের। শৈব হরিদ্বার কেড়ে নেয় সব উপাচার, কালী আর চণ্ডীর জন্য থাকে সামান্য। এখানে বিধি হলো বলিদান। পাকদণ্ডী পথ বেয়ে উঠতে থাকলে অবশেষে পাওয়া যায় চণ্ডীর মন্দির। লোহার রেলিং ঘেরা প্রদক্ষিণকরা বাবান্দা। ভিতরে চণ্ডীর মূর্তি। উনি আনন্দ পান অসুরের হিংসায়, দংষ্ট্রায়, নখরে, রক্তপিপাসায়। সমগ্র সৃষ্টি ওঁর সংহারের লীলাক্ষেত্র। দুষ্কৃতের বিনাশ, অকল্যাণের ধ্বংস—এই ওঁর মন্ত্র। উনি ভৈরবী—ভীরুতার বৈরী। ভয় হলো মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, তাই উনি ভয়নাশিনী। উনি ভয়ভীষণা, তাই অভয়মন্ত্র দান করেন।

পথ ভুলে নেমেছি পশ্চিম দিকে। কিন্তু সেই পথে পাওয়া গেল তাদের, যারা গুহাবাসী সাধু। ওরা চিরকাল থাকে এই হিমালয়ে—সংসার থেকে দূরে যেখানে জনসমাগম নেই, প্রত্যহের জীবনসমস্যায় ওরা অলোড়িত নয়। ওরা কি খায়, কে ওদেরকে খাওয়ায়, সব খবর রাখিনে। ওরা জানে সূর্যের উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়নের কাল, ওরা জানে চান্দ্রমাসের নির্ভুল হিসাব। গ্রহ নক্ষত্র শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ গণনা করে ওরা জানতে পারে, কবে কোথায় ওদেরকে যেতে হবে। ওরা বুঝতে পারে কবে প্রয়াগ-ত্রিবেণীর সঙ্গমে কিংবা পঞ্চবটীতে পূর্ণকুম্ভের মেলা, বুঝতে পারে ঝুলন পূর্ণিমায় কবে তুষারতীর্থ অমরনাথের পূর্ণাঙ্গ দর্শন। শিবরাত্রিতে পশুপতিনাথ, অক্ষয়তৃতীয়ায় বদরিনারায়ণ, কবে অর্ধোদয় যোগ, কবে সূর্যগ্রহণ! ওরা পথে-পথে খায় আর ঘুমোয়, পথে পথে ওদের জীবন-মৃত্যুর খেলা,—ওরা উলঙ্গ দরিদ্র সর্বত্যাগী স্নেহমোহমুক্ত অদ্বৈতবাদীর দল,—কিন্তু ওরা বেঁধে রেখেছে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের ঐক্যসংহতিকে। ওরা ধরে রেখেছে সন্ন্যাসী যোগী ভারতের আবহমানকালের ধর্মসংস্কৃতিকে। ওরা ওই ভস্মমাখা নগ্নদেহে যখন ব্রহ্মপুরার পাহাড়ে-পর্বতে শীতাতপ সংস্কারবর্জিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন বুঝতে পারিনে ওরা কোন্ অঞ্চলের, কোন্ জাতির, কোন্ সমাজের, কোন্ ধরনের। বুঝতে পারিনে ওরা আর্য কি অনার্য, মঙ্গোল কি দ্রাবিড়, মারাঠা কি তিব্বতী। ওদের কোনো জাত নেই, ওরা সন্ন্যাসী। ওদের কোনো ধর্ম নেই,—ওরা হলো বিশ্বদার্শনিক। গুহামুখে ওদেরকে কখনও দেখেছি

আত্মনিমজ্জিত, তুষার প্রান্তরে কখনও দেখেছি ওরা আপন মনে বসেছে জপে, কখনও দেখেছি এই ব্রহ্মপুরার পাহাড়তলীর কোনো প্রাচীন অশ্বত্থের তলায় নিষ্কাম ব্রত নিয়ে আপন মনে পড়ে আছে মাসের পর মাস, কখনও বা কোথাও তাকিয়ে রয়েছে আপন মনে অপলক চক্ষে। কাছে গিয়েছি, বসেছি, গাঁজা টিপে ছিলিম সাজিয়ে পাশে রেখেছি, ভাঙ বেটে গুলি পাকিয়ে দিয়েছি, আটা মেখে রুটি সেঁকে বসেছি,—কিন্তু দিনের পর দিন গেছে, কোনোটাই স্পর্শ করেনি।—পা ছুঁইনি ভয়ে, পাছে লাথি মারে; গা ছুঁইনি, পাছে কামড়ায়, অন্যমনস্ক হইনি, পাছে হঠাৎ আক্রমণ করে। তারপর একদিন গিয়ে দেখি, সব ফেলে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে! কিন্তু এই ব্রহ্মপুরা, এই গাড়োয়াল,—এ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও ওরা স্থির থাকতে চায় না। এখানে ওরা সংখ্যায় বেশী, এখানকার পাহাড়-পর্বতেই ওদের অবিশ্রান্ত আনাগোনা। পাঠান মোগল ইংরেজ,—কারো আমলে কেউ ওদের ঘাঁটায়নি, ওদের তপোভঙ্গ করতে সাহস করেনি। অমন যে গোঁড়া মুসলমান সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তিনিও গুরু রামরায়কে এই ব্রহ্মপুরার উত্তরে মোহন গিরিসঙ্কটে একটি সন্ন্যাস আশ্রম নির্দেশ করে দিয়েছিলেন।

সাধুদের আশ্রম-সীমানা ছেড়ে নামলুম নদীর বালুভূমে। কিন্তু অপরাহ্নে সেই অরণ্য সীমান্তে বালুপথেব ওপর ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দেখে গা ছমছম করে উঠলো। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। বাঘের পায়ের দাগগুলি অতি স্পষ্ট হয়ে চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সম্ভবত একটু আগেই গেছে। সুতরাং বিভ্রান্ত দ্রুতপদে অরণ্যের বাঁক পেরিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেলুম।

রাজা অজয়পালের মৃত্যুর পর থেকে ব্রহ্মপুরা তার স্বাতন্ত্র্য গৌরবে ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে থাকে। গাড়োয়ালীরা প্রধানত হলো 'চ্ছত্রী' ব্রাহ্মণ,—ওরা স্বপাক ভিন্ন অপরের হাতে খাদ্য গ্রহণ করে না। যেমন কাশ্মীরের দেহাতী সরল মুসলমান সম্প্রদায়। তারা ভয় পায় পাছে কাশ্মীরী পণ্ডিতের রান্না কিছু খেলে তাদের জাত যায়। কিন্তু কৌতুকের কথা এই, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কাশ্মীরী মুসলমানকে পাচক ও পরিচারক রাখে। যে কোনো হিন্দু ও পাঞ্জাবী হোটেলে মুসলমান পাচক ও ভৃত্য—এতে কারো কোনো আপত্তি ওঠে না। যে কোনো উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের ঘরে কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কাজ করে,—কোনো আপত্তি ওঠে না। সে যাই হোক, ক্ষাত্র-ব্রাহ্মণ বলেই গাড়োয়ালীরা ব্রহ্মপুরার নাম বদলে একদা ক্ষাত্রপুরা নামকরণ করে। বিচ্ছিন্ন ও বহুখণ্ডিত ব্রহ্মপুরাকে সংহত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে রাজা অজয়পালই নতুন নাম প্রবর্তন করলে—গড়বাল। রাজা অজয়পালের গোষ্ঠী এই চন্দ্রবংশীয় রাজারাই তখন কূর্মাঞ্চল অর্থাৎ আধুনিক কুমায়ুনের প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি। এর পর সুসমৃদ্ধ গাড়োয়ালের চেহারা দেখে হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যও ধীরে ধীরে গড়বালের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলো। ক্রমে ভূস্বর্গ গড়বালকে কুক্ষিগত করার জন্য তিব্বতী লামারা তৎপর হতে লাগলো। ভারতে তখন মোগল সাম্রাজ্য চারিদিকে আপন আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এই পার্বত্য রাজ্যের দিকে পাঠান অথবা মোগলেরা কেউই হাত বাড়াতে সাহস করেনি। তখন হিমালয়ের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের রাজনীতিক যোগাযোগ ছিল কম; সেদিন আজকের মতো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কথা ওঠেনি। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাবর শাহ থেকে উনিশ শতাব্দীর বাহাদুর শাহ পর্যন্ত হিমালয়কে নিয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামাননি। কেবল তাঁরা পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে

মোটামুটি সদ্ভাব রেখেই চলেছিলেন।

ইতিহাস বলতে আমি বসিনি। কারণ এতে আছে অনেক ফাঁকি, অনেক কারচুপি এবং বহুরকমের পক্ষপাতিত্ব। বলা বাহুল্য, ইংরেজের লেখা ইতিহাসেই সবচেয়ে বেশী হের ফের, কেননা এগুলোর মধ্য থেকে সূক্ষ্মতম মিথ্যার অদৃশ্য জাল বোনা। স্থূল কথাটা সহজে বলে না ইংরেজ। উনিশ শতাব্দীর প্রথমে গুর্খারা যখন গড়বাল আক্রমণ করে, এবং রাজা প্রদ্যুম্ন শাহকে দেরাদুনে এসে হত্যা করে—তখন ইংরেজ গিয়েছিল গড়বালকে সাহায্য করতে। গুর্খারা পরাজিত হলো, কিন্তু ইংরেজ পেয়ে গেল পূর্ব গাড়োয়াল। টেহরী গাড়োয়াল রইলো পশ্চিমে টেহরী রাজধানীকে কেন্দ্র করে। মেহলচৌরী হলো সেই টেহরী ও বৃটিশ গাড়োয়ালের প্রাচীন-সীমানা। লর্ড লান্সডাউনের নামে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য শহর তৈরী হলো হিমালয়ে—সেখানে বসানো হলো গাড়োয়াল রেজিমেন্ট। লান্সডাউনের কথা পরে বলবো।

এই ব্রহ্মপুরার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে গেছে চারটি প্রধান তীর্থপথ। কেদারনাথ, বদরিনাথ এবং উত্তরকাশী হয়ে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথ। নদীমাতৃক হলো ভারত। নদী তার জননী। তিনি জলদান করেন ভারতকে। জল মানেই জীবন। সমগ্র অখণ্ড ভারতের জীবন-সূত্র এসেছে হিমালয়ের থেকে। আচার্য শঙ্কর তাই একদা এসেছিলেন এই উত্তরধামে, এই ব্রহ্মপুরায়। ব্রহ্মলোক থেকে যে নদী প্রথম দেবলোকে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সন্ধিস্থলে আচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতীক দেবাদিদেবের মন্দির, পাশে বসিয়েছেন পার্বতীকে। নদী হলো পার্বতী, মহাদেবের জটা হলো চূড়া। ওই জলধারার প্রবাহে নেমে এসেছে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন ও যোগ, ভারতের প্রসন্ন শান্তি ও ত্যাগধর্ম। যাঁরা চিরদিন ভারতের এই সংস্কৃতি, দর্শন, যোগ ও ত্যাগধর্মকে ধারণ করেছেন, বহন করেছেন, প্রচার করেছেন,—তাঁরা মন্ত্র নিয়েছেন ওই ব্রহ্মপুরা থেকে। তাঁরা একদা বৃক্ষবল্কল ত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন গৈরিক বাস। সেই গৈরিক বর্ণের পরিচ্ছদ আজও রয়েছে অম্লান। ঋষিকুলে যাও, গুরুকুলে যাও, যাও কনখলে আর লালতারাবাগে, যাও হৃষিকেশে কিংবা দেবপ্রয়াগে, যাও যোশীমঠে কিংবা উত্তরকাশীতে,—দেখবে বিচিত্র এই ভারত ছিল তোমার কাছে অনাবিষ্কৃত! দেখবে নিজের আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার বিচার ন্যায়নীতি—যা কিছু নিয়ে তুমি একটা নিজস্ব মনোবৃত্তি গড়ে তুলেছ,—এখানে এসে তার ব্যাখ্যা যাচ্ছে বদলে। যদি তুমি সত্য ভারতবাসী হও, যদি এদেশের সংস্কৃতির কণামাত্রের সঙ্গে তোমার আপন মানবতার তিলমাত্র সনাক্তিকরণ থাকে, তবে তুমি কেবল বদ্‌লাবে শুধু নয়,—তোমার ইচ্ছা অভিরুচি সংস্কার অভ্যাস আদর্শ, এমনকি তোমার প্রকৃতিগত পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। হিমালয়ের হাওয়ায় তুমি হারিয়ে গেছ।

পথ অনেক দূর, অনেক দুরারোহ। তা হোক, হৃষিকেশ থেকে চলো, ধীরে ধীরে চলো, চলো নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে,—চলো দূর থেকে দূরে। পিছন দিকে একবার তাকাও। চেয়ে দেখো পিছনে, কখন ফেলে এসেছ তোমার স্বকীয়তা, তোমার স্নেহমোহবন্ধন, তোমার প্রত্যহ-জীবনের কত শত তুচ্ছ ভগ্নাংশ। তুমি ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত—পথের অচ্ছেদ্য টান তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কথা বোলো না একটিও, জানতে চেয়ো না কিছু—ধীরে ধীরে ওই হিমালয় তোমার চোখের সামনে নিজেকে প্রতিভাত করবে। প্রলয়পয়োধিজলে এই বিশ্বসৃষ্টি হলো একটি মহাপদ্মপুষ্প। সেই পদ্ম

বিকশিত হয়েছে সত্যনারায়ণ সূর্যের কিরণসম্পাতের দিকে। হিমালয় তেমনি তার সমগ্র আর্যাবর্ত জোড়া বিশাল পদ্মকোরককে একেকটি দল মেলে শতদলে বিকশিত করবে তোমার বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিপথে।

দূর থেকে দূরে যাও। নরেন্দ্রনগর থেকে টেহরী, কিংবা দেবপ্রয়াগ থেকে। যদি 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী' ভাগীরথীকে চাও, তবে দেবপ্রয়াগ থেকে ধরো। টেহরী ছাড়াও, তারপর ডুণ্ডাগাঁও আর উত্তরকাশীর পথে চলো। যদি যমুনোত্তরী যাও তবে সোজা উত্তরে; গঙ্গোত্তরী যদি যাও—তবে ওই পূর্বপথ। পূর্ব থেকে উত্তর। ভাগীরথী তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন তুমি যতদূরে যাবে,—যেখানে যাবে। হিমবাহ্ আছে আরো উত্তরে, আছে বিজন ভীষণ তুষার প্রান্তর—আছে দেবাদিদেবের হিমজটা—যার ভিতর দিয়ে জাহ্নবীর ধারা গোমুখীর দিকে হারিয়ে গেছে। অবশেষে তুমি বিশ্রাম নাও গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গামন্দিরে। চেয়ে থাকো গঙ্গার আদি আর অন্তে—গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর,—প্রায় দু' হাজার মাইল, দেখবে পৃথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতি একটিমাত্র নদীকে এমন করে জাতির প্রত্যেকটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কন্যাকুমারীতে যাও, যাও মাদুরায় আর রামেশ্বরমে, যাও আবু পাহাড়ে আর দ্বারকায়, যাও জগন্নাথে কিংবা পঞ্চবটীতে,—সেখানে তোমার শেষ পুণ্যলাভ ঘটবে গঙ্গাজল দানে। এই গাঙ্গেয় সভ্যতা বিশাল ও বিচিত্র ভারতকে সর্বকালজয়ী বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ—অলকানন্দা থেকে মন্দাকিনী। চারিদিকে কেবল 'গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী'। নীচে নীচে তার বনস্পতির পথ, সুশ্যাম বনানী অনন্ত লতাবিতানে ছাওয়া। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গুপ্তকাশী, তাবপর গৌরীকুণ্ড হয়ে তুষাররাজ্য কেদারনাথ। ফিরবার পথে উখীমঠ চামোলী হয়ে যোশীমঠ,—যোশীমঠ থেকে নেমে বিষ্ণুগঙ্গা পেরিয়ে সোজা বদরিনাথ। সোজা, তবু অত সোজা নয়। ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ, ছিন্ন ভিন্ন মলিন পরিচ্ছদ,—আড়ষ্ট আর অবসন্ন, শ্রমমালিন্য ঢাকা পাণ্ডুর দেহ! কিন্তু ওটাই হলো পুরস্কার। ওই চিরদরিদ্র হতমান অন্নবস্ত্রহীন গাড়োয়ালীদের সঙ্গে নিজেকে মেলানো; ওই সর্বহারা মানহারা জনতাব মধ্যে আত্মপরিচয়হীন হয়ে থাকা,—তবেই ব্রহ্মপুরার সত্য পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের দুই বিরাট কাহিনী এই ব্রহ্মপুরায় এসে মিলেছে। সমগ্র ভারতে ছড়ানো রামায়ণ আর মহাভারত। হিমালয়ে এসে মিলেছে সেই দুই ধারা। লঙ্কায় রাবণকে বধ কবা হলো সত্য, কিন্তু এই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত কি নেই? ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যু হয়েছে দশরথের, কিন্তু পিতৃপুরুষের তর্পণ যে বাকি। রাজা রামচন্দ্র পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলেন দেবপ্রয়াগে। লছমনঝুলার কাছে বসে চার ভাই মিলে মহাদেবের নিকট পূজা নিবেদন করলেন। এপারে তাই বিশ্বেশ্বর, ওপারে নীলকণ্ঠ। চারটি ভাইকে কেন্দ্র করে চারটি স্মৃতি ফলক—তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলো চারটি মন্দির। তবে রামচন্দ্রের মন্দিরটি স্থাপিত দেবপ্রয়াগে। সম্ভবত ভারতের আর কোনো অঞ্চলে এমন শত সহস্র পার্বত্য ও সুপ্রাচীন মন্দির আর কোথাও নেই,—যেমন আছে এই গাড়োয়ালে। অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যলোক, অটুট স্বাস্থ্যশ্রী, অসংখ্য উপত্যকা,—তার সঙ্গে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যামবসন্ত শোভা, গিরিশৃঙ্গতলে উপলখণ্ডময় নদীসঙ্গমের উদার বিস্তার, এবং তারই তীরে তীরে মেঘখণ্ড দলের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম,—আর উপরে অনন্ত গগনে মহামৌন শান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে ওঙ্কার ধ্বনিত

হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মপুরার শত সহস্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে!

পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের আমলে ব্রহ্মপুরার সীমানা কতদূর অবধি প্রসারিত ছিল, সে খোঁজ এখন আর কেউ নেয় না। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখনও পৌরাণিক ব্রহ্মপুরা ঐতিহাসিক গাড়োয়ালে এসে পৌঁছয়নি। অথচ সমগ্র পশ্চিম তিব্বত ভারতেরই একটা অংশ, এটি ঐতিহাসিক সত্য। ধর্মাচরণে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক রীতি ও অভ্যাসে—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কম। এটা অস্পষ্ট নয় যে, তখনকার ব্রহ্মপুরার সীমানার মধ্যে ছিল কৈলাস পর্বতমালা ও তার শিখরচূড়া এবং তার সঙ্গে মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ। গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার জন্য ভগীরথ শিবের তপস্যা করতে গিয়েছিলেন কৈলাসে—এই পৌরাণিক গল্পের ভিতরে যে সকল আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ ভুল বার করতে চান, তাঁরাও কি ভ্রান্ত নন? তাঁরা বলেন, গাড়োয়ালের আধুনিক সীমানাস্থিত গোমুখে যখন গঙ্গা প্রথম দৃশ্যমান হয়, সেইটিই হলো গঙ্গার প্রথম জন্ম! এটা ভুল। গঙ্গার উৎপত্তি নির্ভুলভাবে যেখান থেকে হচ্ছে, অর্থাৎ বিগলিত তুষারস্তর যেখানে প্রথম তারল্যে পরিণত হচ্ছে,—সেই নিশ্চিত ভূভাগটি যে কৈলাস গিরিশ্রেণীর মধ্যে নয়, এর নিঃসংশয় প্রমাণ কারো হাতে নেই। কেদারনাথ ও বদরিনাথের চূড়ার পিছনে তিনটি বিরাট গিরিশিখর দণ্ডায়মান। শ্বেতবরুণ, শিবলিঙ্গ এবং সুমেরু। এই পর্বতচূড়াদলের কেন্দ্রে গোমুখ থেকে নিঃস্রাবিত গঙ্গার শোভা পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও পরম বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল শিখরদেশের উপর দিয়ে যে হিমবাহ স্তরে স্তরে শত শত মাইলব্যাপী প্রসারিত রয়েছে, তার সেই জটিল তলপথের সন্ধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভূতত্ত্ববিদরা এখানেই নিরস্ত হয়ে বলেছেন যে, গঙ্গার উৎপত্তি গাড়োয়াল সীমানার মধ্যেই। বাল্মীকি বলেছেন, বেগবতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহ লক্ষ্য করে কৈলাসপতির টনক নড়ে। যদি অবাধ মুক্তির পথে এই উন্মাদিনী দিশাহারাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে কুলনাশিনীর হাতে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আকাশের দেবতারা ভয়ে কম্পমান, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! কিন্তু সত্যই ইন্দ্রের ঐরাবত যখন ভেসে গেল, তখন দেবাদিদেব কৈলাসপতি আর স্থির থাকতে পারলেন না। গঙ্গাকে সংহত করে তিনি তাঁর জটিল জটারাশির মধ্যে উদ্দামিনীকে ধারণ করলেন। সেই জটারাশির মধ্যে গঙ্গা হারালেন তাঁর পথ। গোমুখের উত্তরভাগে তুষারচূড়াগুলির পার্বত্য জটিলতাকে মহাদেবের জটাজটিলতা মনে করলে ভুল হবে না। তুষার নদী ও হিমবাহস্তরের ফাঁকে ফাঁকে ঘনকৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরচূড়ারা মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে। যেমন সুদূর দক্ষিণে মৈনাক পর্বতশ্রেণী সাগরলহরীর ভিতর থেকে মাথা তুলেছে সেতুবন্ধের সমুদ্রপ্রণালীতে, ঠিক এখানেও তেমনি,—তুষারশুভ্র হিমসাগরের অন্তহীন দিগ্‌দিগন্তের ভিতর থেকে কালো কালো পাথরের চূড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। এখানকার তুষার-তলপথের সঙ্গে কৈলাস পর্বতমালার যোগাযোগ অদৃশ্য কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ভূতত্ত্ববিদের হিসাব থেকেই ধবে নেওয়া যায়, কোনো এককালের প্রলয়ে অর্থাৎ হিমালয়ের অন্তরতলের ভয়াবহ কাঁপনে উপরস্থ পার্বত্যলোকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে! সেই বিপর্যয়ে পাহাড় হয় স্থানচ্যুত, বিদীর্ণ হয় পার্বত্যপ্রকৃতি, নদীনালা তাদের আপন পথ সৃষ্টি করে এবং বন্দিনী ভাগীরথী গঙ্গোত্তরী হিমবাহের বিচিত্র জটিলতা অতিক্রম করে গোমুখ থেকে ছুটে নেমে আসেন নীচের দিকে। সুতরাং এখন গঙ্গার প্রথম প্রকাশ গাড়োয়ালে। কিন্তু এই গাড়োয়ালের উত্তর সীমানা থেকে যেমন উত্তরকাশীর পথ ধরে নেমে এসেছেন ভগবতী গঙ্গা, তেমনি একই অঞ্চল থেকে অলকানন্দা চলে গিয়েছেন বদরিকাশ্রমের দিকে। তারপর

যোশীমঠের নীচে ধবলীগঙ্গার সঙ্গে মিলেছেন। গঙ্গোত্তরীর দিকে গঙ্গার সঙ্গে যে নদীর প্রথম যোগ হয়েছে, তার নাম কেদারগঙ্গা,—এ নদীর উৎপত্তি কেদারনাথ পর্বতের মধ্যে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের সমস্ত কাহিনী ও পরিচয়ের সঙ্গে ভাগীরথীর ইতিহাস আগাগোড়া বিজড়িত। যে হেতু গঙ্গার মূলধারা হিমালয়ের হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত, এবং এর জলধারার চিরস্থায়ী সরবরাহ নিশ্চিত,—সেই কারণে ভাগীরথীর তীরভূমিতে গড়ে উঠেছিল ভারতের প্রথম সভ্যতা। ভারত-সংস্কৃতির প্রথম মন্ত্র হলো গঙ্গার মন্ত্র। প্রথম মন্দির উঠেছিল গঙ্গার কূলে, প্রথম জনপদ সৃষ্টি হয়েছিল গঙ্গার তটে। সহস্রধারা চারিদিক থেকে নেমে এসে গঙ্গায় মিলে যেমন তাকে ঐশ্বর্যশালী করেছে, তেমনি গঙ্গাকে কেন্দ্র করে ভারত-সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সহস্রধারা চলে গিয়েছে নানা দিকে। সগর রাজবংশের ষাট হাজার সন্তানের ভস্মীভূত দেহ গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে জীবনলাভ করেছিল, একথা সেদিনের মতো আজকেও সত্য। কেননা, প্রকৃতির কোনো যাদুমন্ত্রবলে যদি আজ গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুরার কোথাও হঠাৎ শুকিয়ে যায়, তবে ভারতের দশ কোটিরও বেশী নরনারীর জীবন বিপন্ন হবে। গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের যত প্রাকৃতিক সম্পদ, গঙ্গাই হলো উত্তর ভারতবাসীর জীবনের মূলমন্ত্র। গঙ্গা মানে মর্ত্যগামিনী—যিনি গতিশীলা। গতি মানেই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু!

জনৈক বিদেশী পর্যটকের কয়েকটি কথা এই সূত্রে মনে পড়ছে। তিনি গঙ্গা প্রসঙ্গে বলেছেন, "পৃথিবীতে নদীর সংখ্যা কম নয়। দু' হাজার থেকে চার হাজার মাইল লম্বা নদী কয়েকটি আছে বৈকি। আমেরিকায় মিসিসিপি, রাশিয়ায় লেনা, চীনে ইয়াং-সি কিয়াং, দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজন, মিশরে নাইল,—এরা কোটি কোটি মানুষের জন্য ফসল ফলায়, জীবন দান করে, মানুষের ঐহিক উন্নতির পথে এসব নদী প্রধান সহায়! কিন্তু গঙ্গার উদ্দেশে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাদের প্রতিদিনকার জীবনে যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে থাকে, তার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও নেই। স্তবস্তুতি, পূজা, প্রীতি, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ভক্তি ও অনুরাগ,—মানুষের হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রতি সময়ে একটি নদীর প্রতি নিবেদিত হচ্ছে, এই বিচিত্র দৃশ্য বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে যিনি না দেখেছেন, তিনি বিশাল ভারতের মহাজনতাকে কোনদিন চিনতে পারবেন না!" গঙ্গাকে বলা হয় পতিতপাবনী এবং সর্বপাপনাশিনী! পর্যটক মশায় এব ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "এ কথাগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গঙ্গার জলে এমন সব ধাতব পদার্থ মিশ্রিত যে, এর জলধারা কখনও দোষদুষ্ট হয় না, অথবা এর জল দীর্ঘকাল কোনো পাত্রে জমা রাখলে কোনো কীট জন্মে না। গঙ্গায় অবগাহন স্নান করলে শরীরে চর্মরোগ আসে না এবং ব্যাধিবিকার নষ্ট হয়,—মন প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অবগাহনের পর সর্বক্ষণ নিজেকে পবিত্র বলে মনে হতে থাকে। গঙ্গায় কোনো মালিন্য দাঁড়ায় না এবং মড়ক ও মহামারীর বিপজ্জনক বীজাণুকে অতি অল্প সময়ে এর জল নষ্ট করে দেয়। যোগে, পার্বণে, গ্রহণে, পুণ্যতিথিতে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি নদীতে অবগাহন স্নানের মধ্যে করজোড়ে দাঁড়িয়ে প্রভাতসূর্যকে বন্দনা করছে,—এ কাজটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কেননা দেহের প্রতি লোমকূপের দ্বারা একদিকে তারা গ্রহণ করছে ধাতবপদার্থ মিশ্রিত প্রবাহমান জল, অন্য দিকে দুই চোখের একাগ্র দৃষ্টির দ্বারা সূর্যের রঞ্জনরশ্মি। ভারতের সমস্ত শাস্ত্রানুশাসন ও ধর্মানুষ্ঠান পর্যালোচনা করলে বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা স্পষ্টতই চোখে পড়ে!"

গঙ্গার পথই হলো ব্রহ্মপুরার পথ। হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো ব্রহ্মপুরা। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মুকুটমণি হলো ব্রহ্মপুরা,—কোনো সন্দেহ নেই। সমগ্র হিমালয়ে আছে অনেক পর্বতচূড়া, অনেক তুষারকিরীট, কিন্তু ব্রহ্মপুরার গিরিশৃঙ্গমালার মতো পূজা পায় না কেউ। অমন যে গৌরীশৃঙ্গ আর গৌরীশঙ্কর, অমন যে ধবলগিরি আর কাঞ্চনজঙ্ঘা, অমরাবতীর তীরে অমন যে ভৈরবঘাটের নয়নবিমোহন চূড়া, অমন যে ধবলাধার আর নাঙ্গা আর হরমুখ, ওরা ওদের সমস্ত অমর্ত্যমহিমা সত্ত্বেও কেমন যেন অনাদরে পড়ে রইলো এখানে ওখানে। কৃষ্ণগিরির দিকে তাকালে না কেউ, পীর পাঞ্জাল সরে রইলো উপেক্ষিত হয়ে, কোথায় রইলো কোলাহাই আর শেষনাগের হিমবাহ তাদের অভ্রভেদী গৌরব নিয়ে,—কিন্তু সবাই চললো গঙ্গার ধারে ধারে। ব্রহ্মপুরার শিরা উপশিরায় গঙ্গা, শাখা-প্রশাখায় গঙ্গা। প্রতি মানুষের কণ্ঠে, প্রতি জপের মন্ত্রে গঙ্গা। ভক্তির পিছনে আছে কৃতজ্ঞতাবোধ, অনুরাগের পিছনে আছে আনন্দ। গঙ্গার জলে জীবনধারণ করি, তাই গঙ্গা পূজ্য, মেঘের বৃষ্টি থেকে খাদ্যলাভ করি, তাই আকাশ সুন্দর, হিমালয় গিরিশ্রেণী দেশের প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করে, তাই হিমালয় আরাধ্য। উপকার পাই বলেই ভক্তি করি, সঞ্জীবনী রস পাই বলেই ভালোবাসি। আপাতদৃষ্টিতে যেটি অহেতুক, পিছনে হয়ত তার বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গঙ্গার মতো প্রাণদায়িণী নদী আছে বলেই ব্রহ্মপুরা স্বর্গসুষমামণ্ডিত। নচেৎ গঙ্গাহীন গাড়োয়াল মানুষকে কোনোদিন আকর্ষণ করতো না।

ব্রহ্মপুরার মতো হিমালয়েব আর কোনো অঞ্চল মানুষের এত প্রিয় নয়. তাই তীর্থযাত্রীদের কলকণ্ঠে ব্রহ্মপুরা নিত্য মুখরিত। গৌরীশৃঙ্গ মানুষের দৈহিক বিক্রমকে আহ্বান করে, কিন্তু সেখানে তীর্থযাত্রীর আকর্যণ নেই। নেপালে আছেন ভদ্রকালী আর গুহ্যেশ্বরী মন্দির,—পীঠস্থান, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটি একান্ন পীঠের অন্যতম, তার বেশী কিছু নয়। আছেন পশুপতিনাথ, কিন্তু তিনি ব্রহ্মপুরার তুলনায় আধুনিক। কাশ্মীবে আছে গুহাতীর্থ অমরনাথ, কিন্তু এই তীর্থস্থানের বয়স কমবেশী দেড়শো বছর মাত্র। পাঞ্জাব হিমালয়ের কাংড়ায় আছেন বজ্রেশ্বরী, আর কিছুদূব গিয়ে জ্বালামুখীতে কালিধর পাহাড়ের উপরে দেবী জ্বালামুখী অম্বিকা এবং উন্মত্ত ভৈরবের মন্দিব, কিংবা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর মধ্যে বাণগঙ্গার উপরে বৈজনাথের বিশাল মন্দির,—এরা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আকর্ষণ কম। নদীর বহুমুখী ধারা এদের আশেপাশে নেই, স্থানীয় অঞ্চল ছেড়ে তাই বাইরের দিকে এদের যোগাযোগ সামান্যই। হিমালয়ের গিরিজটলা পেরিয়ে বহু দুর্গম অঞ্চলে আছে অগণ্য দেবস্থান, কিন্তু মানুষের কল্যাণকল্পনাকে তারা এমন একান্ত নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণিত করে না—যেমন করে গঙ্গাবিধৌত ব্রহ্মপুরা। সেই কারণে আচার্য শঙ্করের অধ্যাত্ম প্রতিভা তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে এখানে। দেড় হাজার বছর হতে চললো তিনি গিয়েছিলেন উত্তরধামে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরায়, কিন্তু তাঁর যাবার বহু আগে,—তার তারিখও নেই, নিরীখও নেই,—এই গঙ্গাপথ ধরে গিয়েছে ভারতের জনতা যুগযুগান্তকাল ধরে। শুধু প্রস্তরমন্দির তীর্থ নয়, কারণ সে হলো মানুষের তৈরী। নিজের হাতে মানুষ মন্দির বানায়, নিজের হাতে ছেনি দিয়ে কেটে মানুষ মনের মতন বিগ্রহ তৈরী করে,—আবার তারই নীচে ঠোকে নিজের মাথা। মন্দিবটা তীর্থ নয়, এমন কি দেবদর্শনও নয়। কেননা সংখ্যাতীত দেবমন্দির ত হাতের কাছেই রয়েছে। কলকাতা অঞ্চলে অন্তত পাঁচ শো দেবমন্দির দাঁড়িয়ে, কিন্তু কে রাখছে তাদের হিসেব? কাশীতে যাও,—সেখানে তো পথেঘাটে; অসতর্ক পা বাড়ালে শিবের গায়ে হোঁচট খেতে হয়! যেখানে খুশী, যে কোনো প্রদেশে! করাচীতে যাও, যাও

গোয়াতে, পণ্ডিচেরীতে, শ্রীলঙ্কায়, চট্টগ্রামে—কোথায় নেই দেবমন্দির? তবু ভারতের লোকে যুগে যুগে বলে এসেছে ব্রহ্মপুরার তুলনা নেই ভূ-ভারতে! মন্দির নয়, পথই হলো তীর্থ, এবং সেটি হলো গঙ্গাবতরণের পথ। পথ ফুরোলেই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণযাত্রা। মন্দির নয়, দেবতা নয়, তীর্থপরিক্রমা। গঙ্গাপথে যাবো, দেখবো তার উৎপত্তি ব্রহ্মালোকের গিরিসঙ্কটে এবং গঙ্গাকে অনুসরণ করে যাবো যতদূর তার গতি,—এরই নাম তীর্থ পরিক্রমা। এই আনন্দলাভের নাম দেওয়া হয়েছে ভগবৎভক্তি, এই গঙ্গাপথকে বলা হয়েছে তীর্থযাত্রা! কিন্তু পথের সঙ্কেত কই? হৃদয়ানুরাগকে প্রকাশ করবো কোন্ কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে? তীর্থযাত্রার প্রতীক কই? তখন বানানো হলো মন্দির! বিষ্ণু হলেন সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তাঁকে রাখো শীর্ষস্থানে,—তাঁর সঙ্গে গঙ্গাকে জড়িয়ে নাম রাখো বিষ্ণুগঙ্গা। একই ধারা, কিন্তু উত্তরাপথে তাঁর নাম হয়েছে অলকানন্দা। স্বর্গলোকের সমস্ত হাস্যোচ্ছলতা এনেছেন তিনি, এসেছেন উদ্দাম আনন্দে। পলকে পলকে নীলনয়নার অপরূপ নগ্নশোভা ঢাকা পড়েছে আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিতে। হঠাৎ আবার কোথাও তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন—শত শত বৈদুর্যমণির বিচ্ছুরিত জ্যোতির্ময়তা নিয়ে,—এপাশে ওপাশে উপবন আর তপোবন, শত বরনের গোলাপ আর মল্লিকার সুগন্ধে আবেশ লেগেছে তাঁর নয়নের নীলাভায়। কিন্তু সে ক্ষণকাল—তারপর আবার গিরিসঙ্কটের পঞ্জরাস্থি ভেদ করে তিনি চলেছেন মর্ত্য অমরাবতীর আশে-পাশে—যেখানকার চন্দ্রহাসিত মায়াকাননে নেমে আসে অলকাপুরীর অপ্সরীরা যৌবন-উৎসবে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের রহস্যালোকে এই অলকাপুরীর দর্শনপিপাসায় ছোটে মর্ত্যবাসী তীর্থযাত্রীরা। দুস্তর চড়াই পথে বুক ফেটে মরেছে কত মানুষ, নিঃশ্বাসের বায়ু খুঁজে না পেয়ে মরেছে, অভ্রভেদী গিরিচূড়ার সঙ্কীর্ণ সঙ্কটে পদস্খলন ঘটে মরেছে কত লোক, তুষার-ঝটিকায় আহত-প্রতিহত হয়ে মরেছে, ব্যাধি-পথশ্রম-উপবাস সইতে না পেরেও মরেছে কত শত,—ইতিহাসে তার হিসাব নেই কোথাও। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি, বিষধর ভীষণ সর্প ক্ষমা করেনি, তুষারদংশনে ক্ষত-বিক্ষত দেহের অবসান,—তবু কোনোকালের মানুষকে স্থির থাকতে দেয়নি ওই ব্রহ্মপুরার গঙ্গাপথ। গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেমন চলেছে উন্মাদিনী গঙ্গার দুরন্ত জলধারা, তেমনি চলেছে তার পাশে-পাশে দুর্বার গতিতে তীর্থযাত্রী দলের অজেয় প্রাণধারা। সুখ দুঃখ স্নেহ মোহ বেদনা দয়া প্রীতি,—ওরাও চলেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে। চারিদিকে অনন্ত মহামৌন গিরিশৃঙ্গশ্রেণী,—নীচের দিকে তীর্থযাত্রী দলের কলমুখরতায় যেন তার নীরবতা আরো গভীর। কখনও ঝড়ে, বর্ষায়, ঠাণ্ডায়, ঝঞ্ঝায়, মহাসূর্যের অগ্নিস্রাবী প্রখরতায় তারা উদ্‌ভ্রান্ত; আবার কখনও বা ঋতুরাজের নবঘনশ্যাম বসন্ত সমারোহের মাঝখানে তারা দিগ্‌ভ্রান্ত।

ওদের ওই আনন্দ-বেদনার তরঙ্গদোলায় আমিও নিজেকে বার বার মিলিয়ে দিয়েছি। কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায় ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়! ওদের মধ্যে আমি। ওদের আনন্দে, ওদের বেদনায় আমি। ওরা দুই পায়ের যন্ত্রণায় কাঁদতে বসলে আমার চোখে জল আসে; নিঃশ্বাস টানতে না পারলে আমার নিজের দম আটকে যায়। ওরা শত সহস্র, ওরা প্রতি বছরের প্রতি ঋতুর,—কিন্তু ওরা যতকাল ধরে এসেছে এই পথে, আমার ধারাবাহিক হৃদয় এসেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে আমার প্রাণ যুগ থেকে যুগে, কল্প থেকে কল্পান্তে। ওরা সবাই আমারই অভিব্যক্তি, আমারই ইচ্ছা, আমারই একাগ্রতা। আমি এক, কিন্তু আমি বহু ওদের মধ্যে। আমি ওদের সঙ্গে অভিন্ন, অচ্ছেদ্য। ওদের

সবাইকে মিলিয়ে আমারই জীবনের ব্যাখ্যা।

পিছনে গগনচুম্বী মহাহিমবন্তের অসংখ্য শিখরচূড়া, পুরাণে তারা কেউ নাম নিয়েছে কনককান্ত, মণিরত্নাভ, শোণিতশিখর, কেউ বা নাম পেয়েছে স্ফটিকপর্বত। ওদের নাম শুনে এক আবিষ্কার থেকে ভিন্ন আবিষ্কারে যেতে চেয়েছি কতবার। দুই চোখে দুই বাসনার প্রদীপ জ্বেলে জানতে গিয়েছি কোথায় সেই প্রাচীন হৈমবতের হারানো গিরিচূড়া—একদা যাদের নাম ছিল কদম্ব-কুক্কুট, গৌতম আর বাসর, শ্যামাঙ্গ আর শোভিতা! তারা আজও আছে, কিন্তু ভিন্ন নামে। ওদের অন্ধকার গুহাতলে আজও হয়ত সেই সেকালের বন্যশিকড়বিচ্ছুরিত দ্যুতি-শিখা জ্বলে,—যার হিরণ্য আভায় প্রাচীন হিমালয়ের সিংহশিকারী কিরাতের দল আর যক্ষ-রাক্ষসরা লুক্কায়িত রাখতো তাদের চীরবাসা অর্ধনগ্না রমণীগণকে! তুষারাচ্ছন্ন কৈলাস আর মন্দারের প্রত্যন্তদেশে সেই অনবতপ্তার জলরাশি,—পরবর্তী যুগে যার নাম হয়েছে মানস-সরোবর,—তুষারের পটভূমিতে যার হৃদয়ের উপর আজও ফোটে শ্বেত ও রক্তকমল! ওই গন্ধমাদন আর চিত্রকূটের আশেপাশে—ওই যে-অঞ্চলকে সেকালে বলা হোত কিন্নরখণ্ড,—আজও কি সেখানে কলহাস্যমুখরিতা নিরাভরণা মোহিনীদের কণ্ঠস্বরে গুহাবাসী পশুরাজ সিংহ উচ্চকিত হয়? সর্বনাশিনী উর্বশীরা কি আজও সুমেরুশিখরের আশেপাশে বিশ্বামিত্রের তপোবন খুঁজে বেড়ায়?

কিন্তু ব্রহ্মপুরার পথে চলে আজ তীর্থযাত্রীরা। পিপাসার্ত, ক্লান্ত-কাতর, স্বপ্নাবিষ্টচক্ষু—উৎকণ্ঠ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব। পিপীলিকাশ্রেণীর মতো তারা চলে,—যেন চিরকাল ধরে চলেছে,। মুখ ফিরিয়ে নাও, আর যিরে তাকাও,—তারা চলেছে. কিন্তু যেন চলছে না; গতিশীল, কিন্তু গতিবেগ যেন নেই। তারা কখনও ভাগীরথী তীরে, কখনও অলকানন্দায়, কখনও মন্দাকিনী নন্দাকিনী আর বিষ্ণুগঙ্গায়, কখনও পিন্দারে আর নায়ারে, কখনও মূলগঙ্গায় আর নীলধারায়। বিরাটের পটভূমিকায় চলতে চলতে কতবার শুনেছি ওদের জীবনের ছোট ছোট ইতিহাস। সামনে ওদের নন্দাদেবী আর দ্রোণগিরির বিশাল চূড়া; ত্রিশূল আর নীলকণ্ঠ, বন্দরপঞ্চ ও শ্রীকান্ত—অনন্ত গিরিশৃঙ্গমালা ওদের চারিদিকে, কিন্তু পিছন থেকে মাঝে মাঝে ওদের মোহবন্ধনের সূত্রে টান পড়েছে। কেউ হারানো সুখের স্মৃতি এসেছে খুঁজতে, কেউ এসেছে জীবনের জ্বালা জুড়োতে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে স্বামী, সুতরাং প্রথম স্ত্রী চলেছে তীর্থে। সন্তানের অভাবে সম্পত্তি যায় রসাতলে, মস্ত জমিদার চলেছে সন্তান কামনায়। সংসারের কোনো আখড়ায় ঠাঁই হয়নি, গোঁসাইজী চলেছে বৈষ্ণবীকে সঙ্গে নিয়ে। একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে, অশ্রুসিক্তা জননী চলেছে তার সমস্ত বেদনাকে সমগ্র হিমালয়ে প্রসারিত করে দিতে। বিশ্বাসঘাতিনী নারীর মোহ ত্যাগ করে প্রেমিক চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে। সংশয়াচ্ছন্ন দার্শনিক চলেছে আত্মশুদ্ধির কামনায়! বৈরাগী চলেছে আত্মতাড়নায়। ওদের সঙ্গে চলেছে ভ্রাম্যমাণ, ব্যবসায়ী, ফকির, আতুর, বায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোক, নিষ্ঠাবতী গৃহিণী, নায়ক আর নায়িকা, পাঞ্জাবী আর দক্ষিণী, গুজরাটী আর মারাঠী, সাধু আর সন্ন্যাসী। কেউ ফেলে এসেছে ঘরকন্না, কেউ ভেঙে এসেছে অবরোধ, কেউ ছেড়ে এসেছে আরামের শয্যা, কেউ বা ছিঁড়ে এসেছে মোহবন্ধন।

ঐতিহাসিক যুগ ঠিক কবে থেকে ধরা উচিত আমি বলতে পারিনে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখছি, ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে ব্রহ্মপুরাকে বেঁধে ফেলা

হয়েছে। একথা আমরা ভুলতে বসেছি যে, আধুনিক পাঞ্জাবের একটি অংশ, সমগ্র গাড়োয়াল সাহারানপুরের একটি অংশ, দ্রোণাচার্যভূমি (আধুনিক দেরাদুন), কূর্মাঞ্চল (আধুনিক কুমায়ুন), সমগ্র পশ্চিম তিব্বত এবং পশ্চিম নেপাল—এই সম্মিলিত ভূভাগ নিয়ে ছিল ব্রহ্মপুরা। ইতিহাসের কোনো তারিখ নেই, শ্রুতি আর স্মৃতির অতীত, কেউ জানে না কবে বিশাল ভারতের রাষ্ট্র সংহতি এবং ঐক্যের সাধনা এই ব্রহ্মপুরায় প্রথম শুরু হয়। কেউ জানে না কবে এই ব্রহ্মপুরার প্রান্তে বসে মহাকবি ব্যাস সমগ্র বেদশাস্ত্রকে চার অংশে ভাগ করেছিলেন। তারপর ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখি, দক্ষিণ ভারত এসে প্রাধান্য নিয়েছে ব্রহ্মপুরার উত্তরাপথে। আজ সমগ্র গাড়োয়ালে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পার্বত্য মন্দিরে দেখি, পূজারী, মহন্ত ও রাওল—প্রায় সকলেই পুরুষপরম্পরায় দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ। এর কারণ খুঁজতে গেলে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চলে যেতে হয়। সে যুগ হলো বৌদ্ধ ভারতের সঙ্গে সনাতনীদের অধ্যাত্ম সঙ্ঘর্ষের যুগ। বৌদ্ধ যুগের জয়যাত্রা ঘটেছিল সমগ্র হিমাচলের স্তরে স্তরে। তারা তাদের চিহ্ন রেখে গেছে মন্দিরে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে। তারা জয় করতে করতে চলে গেছে হিমালয়ের পরপারে সমগ্র তিব্বতে, চীনদেশে, মঙ্গোলিয়ায় এবং জাপানে। আজও হিমালয়ের বহু অঞ্চলে—যেমন কাশ্মীরে, লাডাকে, কাংড়া-কুলুতে, পূর্ব পাঞ্জাবে, উত্তর গাড়োয়ালে ও কুমায়ুনে, সমগ্র নেপালে, সিকিম, ভূটান ও উত্তর আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে—কী দেখি? কী দেখি নাগা পর্বতে, লুসাই পাহাড়ে, মণিপুর অঞ্চলে এবং ব্রহ্মদেশে? এই হিমালয়কে কেন্দ্র করে প্রাচ্য বিজয়ী বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা। দেখতে পাই হিমালয় এবং তিব্বত অতিক্রান্ত মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের সংখ্যাতীত কীর্তিকলাপ। যে-মন্দির এবং স্থাপত্য দেখি আমরা যোশীমঠে, বদরিকাশ্রমে, ত্রিযুগীনারায়ণে এবং আরো বহু স্থানে—তাদের সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্যের মিল অতি কম। যা দেখা আমাদের অভ্যাস তা আমরা দেখিনে। লাডাকের সঙ্গে সিকিমের মিল দেখি, যোশীমঠের সঙ্গে মিল দেখি তিব্বতের বৌদ্ধগুম্ফার, মানস সরোবরের পথের খেচরনাথের সঙ্গে মিল দেখি উখীমঠের। এই বৌদ্ধ এবং মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যরেখা চলেছে শত শত মাইল। এই রেখা পশ্চিম তিব্বত ছেড়েও গেছে আরো উত্তরে কৃষ্ণগিরি অর্থাৎ কারাকোরাম ছাড়িয়ে পামীর গিলগিট হিন্দুকুশ আফগানিস্তান ও পারস্য দেশ অবধি। দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আর্য, তুর্ক, ইরাণী, এদের উপর দিয়ে একে একে চলেছে বৌদ্ধের জয়যাত্রা। কিন্তু একদা এই ব্রহ্মপুরায় সমস্ত প্রকার ধর্মমতের পরীক্ষা চলে। শৈব শাক্ত জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব—সমস্ত। গুরু নানক, কবীর, মহাবীর, রামানুজ, শঙ্কর, দীপঙ্কর, তুকারাম, কেউ বাদ যায়নি। ব্রহ্মপুরা হলো সেই আদিম কষ্টিপাথর, যেখানে যুগে যুগে ধর্মমত ও বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা হয়ে এসেছে। রামায়ণের সংস্কৃতি এসে এই ব্রহ্মপুরাকে অধিকার করতে চেয়েছে—রামপুর, রামওয়াড়া, রামগঙ্গা, হনুমানচটির রাম মন্দির, অগস্ত্য মুনি, রামনগর, লছমনঝুলা, ভরত ও শত্রুঘ্ন মন্দির তার প্রমাণ। তারপর এসেছে মহাভারত। হরিদ্বারের ভীমগোড়া থেকে তার আরম্ভ। দ্রোণভূমি তার পাশে। এগিয়ে গেলে ব্যাসগুহা ও গঙ্গা। মন্দাকিনীর ধারে ভীমসেন ও বলরাম এবং উখীমঠ। বিষ্ণুপ্রয়াগের পরে পাণ্ডুকেশ্বর। পিন্দার ও অলকানন্দায় কর্ণপ্রয়াগ। তারপর বদরিনাথ ছেড়ে স্বর্গারোহণী পথ। এছাড়া কেদারখণ্ড ও শিবপুরাণের আগাগোড়া আধিপত্য। বৌদ্ধযুগে এসে প্রাধান্য লাভ করেছে ব্রহ্মপুরার একটি অতি দুস্তর পার্বত্য অঞ্চল। কেদারনাথে যাবার পথে বাঁ দিকে গুপ্তকাশী এবং ডানদিকে মন্দাকিনীর পারে উখীমঠ।

এদেরই কেন্দ্র করে নালাচটি ও বেথুয়া চটির চারিদিকে এককালে বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধস্তূপ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হয়। এখানকার প্রসিদ্ধ জয়স্তম্ভের সঙ্গে বৌদ্ধস্তূপের সৌসাদৃশ্য দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, স্বয়ং বদরিনাথ ছিল বৌদ্ধপ্রধান।

কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিদ্যা সামান্য। আমি কেবল দেখে বেড়িয়েছি, কিন্তু বিচার করিনি। বর্ণনা করেছি বার বার, কিন্তু বিশ্লেষণ করিনি। একালে ব্রহ্মপুরার সীমানা সঙ্কীর্ণ হয়েছে; তার নাম বদলে রাখা হয়েছে গাড়োয়াল। কিন্তু তবু তার প্রাচীন প্রকৃতি আজও হারায়নি। এই ব্রহ্মপুরায় এলে, এর তীর্থপথে অভিযান করলে, এর দুর্গম পার্বত্য চড়াই আর উৎরাইতে পা বাড়ালে—কেউ আর কারো অপরিচিত থাকে না। একজন যেন আরেকজনের কতকালের বন্ধু। একই শিক্ষা, একই সংস্কৃতি, একই ভাবনা নিয়ে সবাই চলে। হাজার হাজার নরনারী—যারা তীর্থযাত্রী, সবাইকে মিলিয়ে একই পরিবার। পুরুষের আড়ষ্টতা নেই, মেয়েদের পর্দা নেই, যৌবনের লজ্জাজড়তা নেই। একই আহার, একই স্থানে চালার তলায় রাত্রিবাস, একই পথে সকলের মিলন। হাসি তামাসা ও আনন্দের একই বিষয়, একই দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা ও কায়ক্লেশে প্রত্যেক পরস্পর অপরিচিত যাত্রীর সমবেদনা জ্ঞাপন। পদে পদে পথে পথে দেখেছি হৃদয়ের সুর দিয়ে মেলানো পাঞ্জাব আর বাঙলা, বিহারী আর মারাঠী, তামিলী আর আসামী, সিন্ধী আর মাদ্রাজী। কী আশ্চর্য ঐক্য সমগ্র ভারতের! মন্ত্র, বিদ্যা, পূজা, প্রণাম, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, আচার ও ব্যবহার,—আশ্চর্য সমন্বয়। যার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই, তার কাছে সাহায্য পাচ্ছি পরমাত্মীয়ের মতো। যার সঙ্গে কখনও কথা বলতে ভরসা হোত না রেলগাড়ির কামরায়, এখানে তাদের মধ্যে গায়েপড়া গলাগলি। হোক সম্পূর্ণ অপরিচিত, কি মেয়ে কি পুরুষ,—একজন অবলীলাক্রমে আরেকজনের হাত ধরে এগোয়, কষ্টের সময় জলপান করায়, রান্নায় সাহায্য করে, শয়নের জন্য শয্যা বিছিয়ে দেয়। কেউ কারোকে চেনে না, এক মিনিটেরও পরিচয় নেই, একজনের ভাষ্য অন্য জন জানে না, কিন্তু পরমাশ্চর্য নদীমেখলী পার্বত্য-শোভার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে গেল দুই অপরিচিত মেয়ে আর পুরুষ, পথশ্রমের মধ্যেও হাসি ফুটলো দুজনের মুখে, সাঙ্কেতিক ভাষায় কুশলবার্তা বিনিময় হলো। তারপর ওই বিশাল পটভূমির নীচে দাঁড়িয়ে দুজনের ক্ষণকালের বন্ধুত্ব চিরকালের নিবিড় স্পর্শ রেখে চলে গেল।

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের কৃষ্ণগিরি, দ্বারকা থেকে ব্রহ্মদেশ, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অখণ্ড ভারতের যে ক্ষুদ্র মহাদেশ, তারা গিয়ে পৌঁছয় ওই গঙ্গাপথে, ওই ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে। সকল মত সকল পথ মিলেছে ওখানকার ওই মন্দিরে আর তপোবনে, ওই গঙ্গা ভাগীরথী অলকানন্দা মন্দাকিনীর কূলে কূলে। দেবতাত্মা হিমালয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা পূজ্য এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বন্যশোভাময় ভূভাগ হলো এই অবিভক্ত গাড়োয়াল। বহুকালের প্রচারকার্যের দ্বারা কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। কিন্তু দুই চোখ মেলে যারা কাশ্মীর এবং গাড়োয়ালকে বিচার করেছে, তারা জানে, গাড়োয়ালে অসংখ্য ভূস্বর্গের ছড়াছড়ি। বহির্ভারতীয় পর্যটকরা কাশ্মীরে গিয়ে সুইজারল্যান্ড অথবা আলপাইন আবহাওয়াকে খুঁজে পায় তাই তারা কাশ্মীরের সুখ্যাতিতে শতমুখ। কিন্তু কাশ্মীরী হিমালয়ে দেবতাত্মার স্বাদ কম। কৌতুকে, আনন্দ-পরিভ্রমণে, সুযোগ সুবিধায়, বিলাসে ও ব্যসনে—কাশ্মীর আধুনিক ভ্রাম্যমাণদের কাছে অতীব

আরামদায়ক সন্দেহ নেই; কিন্তু গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুরার প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে আজও আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সভ্যতা আত্মশ্লাঘা প্রচার করে না। এ যেন অনাদ্যন্তকালের আধুনিক, লক্ষ লক্ষ বছরেরও বেশী আধুনিক, এক খণ্ড অনন্তকালকে যেন এ আপন সর্বাঙ্গে ধরে রেখেছে। এখানে এলে চোখে পড়বে ভারতের মৌলিক প্রতিভা, ভারতের আদি সংস্কৃতি, ভারতের সর্বকালজয়ী সংহতি মন্ত্র। এখানে সুখ নেই, আছে আনন্দ। আরাম নেই, আছে অনন্ত মধুর অবকাশ। পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার নেই, আছে বিদুরের খুদ। কাশ্মীর হলো কোটপ্যান্ট; ব্রহ্মপুরা হলো গেরুয়া। গেরুয়া নিয়ে কাশ্মীরে গেলে সেখানকার লোকে একটু অবাক হয়; কোটপ্যান্ট পরে সাহেব সেজে ব্রহ্মপুরায় এলে নিজেকে বেমানান মনে হতে থাকে। ওখানে ভোগ, এখানে ত্যাগ। ওখানে ধনাঢ্যতার প্রাধান্য, এখানে নিঃস্বতার গৌরব। সর্বত্যাগী সাধুরা যাতে সর্বনীতিভ্রষ্ট ভিখারীতে পরিণত না হয়, সেজন্য এই ব্রহ্মপুরাতেই পুরুষশ্রেষ্ঠ 'কালী কম্বলী বাবার' আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি এখানে দেখেছিলেন জীব মাত্রই শিব, নর মাত্রই নারায়ণ। গোমুখী গঙ্গোত্তরী উত্তরকাশী অন্নপূর্ণা বৃদ্ধ কেদার ভৈরবনাথ কিংবা অসি-বরুণা-ভাগীরথী সঙ্গমে, সর্বত্র ওই একই কথা। কেদারনাথে, বদরিনাথে, তুঙ্গনাথে ত্রিযুগীনাথে কিংবা কমলেশ্বরে, গোপেশ্বরে, পাণ্ডুকেশ্বরে—একই পাথরের মন্দির সর্বত্র। কিন্তু প্রতি মন্দিরের বেদীমূলে নিত্য প্রণাম নিবেদন করছে যুগে যুগে ভারতের মহাজনতা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পশ্চিম সীমান্তের হিমালয়

আসামের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে দেবতাত্মা হিমালয়ের জটা স্তরে স্তরে যেমন খুলে ঝুলে পড়েছে দক্ষিণে—যেমন সে-অঞ্চলে তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা পাটকাই, লুসাই, নাগা, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া—ইত্যাদি নামে পরিচিত, তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতেও হিমালয়ের জটিল জটারাশি নেমে এসেছে হিন্দুকুশের দক্ষিণ ভূভাগে। তারা নানা পর্বতমালার নানান শ্রেণীতে এবং বিভিন্ন নামে আমাদের কাছে পরিচিত। যেমন চিত্রলের শস্যশ্যামল এবং মৃৎশোভাসম্পন্ন সুন্দর উপত্যকার কাছে কোহিস্তান ও কাফ্রিস্তান, পঞ্চশির ও সফেদকো,—তারপর পাঘমান, টোচিখেল, মীরনশা,—এবং তারপর পর্বতের নানা শাখা চলে গিয়েছে সুলেমান পর্বতমালার দিকে। এরা সুপ্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুকুশ এবং হিন্দুরাজ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা রূপেই পরিচিত। ভারত সীমান্তে এরা চিরকালই প্রায় অচিহ্নিত রয়ে গেছে এবং সীমানারেখা নিয়ে ভারতবর্ষও হাজার হাজার বছরের মধ্যে কখনও মাথা ঘামায়নি। একথা বেলুচিস্তানে. গিলগিটে, পামীরে, সমগ্র কাশ্মীরে এবং আসামের দিকে চীন ও ব্রহ্মের সীমানাতেও সত্য। যা চলে এসেছে এতকাল, তাই চলছে। আজও তিব্বত-ভারত সীমানা, গিলগিট সীমানা, ভূটান-তিব্বত সীমানা,—এরা খুব স্পষ্ট নয়। এরা রাষ্ট্রীয় কারণে কোনোদিন সমস্যাসঙ্কুল ছিল না বলেই ভারতবর্ষ এতকাল উদাসীন ছিল। একথা বহু জায়গায় প্রমাণসিদ্ধ হয়ে আছে যে, সমগ্র হিমালয় তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। কিন্তু বিভ্রাট বেধে রয়েছে সংখ্যাতীত উপত্যকা এবং অধিত্যকার সমষ্টি নিয়ে। যারা বলে, ধর্মবিশ্বাস থেকে রাষ্ট্রসীমার উৎপত্তি তারা নিতান্ত ভুল বলে না। ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদ এবং ক্রিয়াপ্রক্রিয়া থেকে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-বিচার বদলাতে থাকে। যেমন বৌদ্ধ তিব্বত ও শৈব ভারতের মধ্যে পার্থক্য : যেমন তুর্ক-ইরানীর সঙ্গে আর্যজাতির প্রভেদ। এই প্রভেদ থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রসীমা। কেউ এসে জায়গা পেয়েছিল হিমালয়ের উপত্যকায়, কেউ দখল করেছিল অধিত্যকাভূমি। এইভাবেই পরস্পর আপন আপন অধিকারের সীমানা প্রসারিত করে এসেছে, এবং এই সীমানা থেকেই অচিহ্নিত রাষ্ট্রসীমানা স্থির হয়ে এসেছে এতদিন। পশ্চিম তিব্বতের একটা অংশের উপর ভারতের অধিকার কবে থেকে ঘুচল, এটা এ যুগের গবেষণার বিষয় বৈকি।

গান্ধার থেকে যদি কান্দাহার হয়ে থাকে, এবং পুস্তু ভাষার প্রথম পাঠ যদি এসে থাকে সংস্কৃত ভাষা থেকে তবে ভারতের সাংস্কৃতিক সীমানা আফগানিস্তান অবধি প্রসারিত সন্দেহ কি! আর হিমালয়কে কেন্দ্র করেই ত ভারত সভ্যতার বিস্তার! হিমালয় থেকে নেমে এসেছে নদী, আর সেই নদীর ধারার সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতি। এক প্রান্ত বেষ্টন.করে আছে সিন্ধুনদ, অন্যপ্রান্ত ব্রহ্মপুত্র নদ। ওদেরই আশে পাশে নেমে এসেছে পূর্ব-পশ্চিম হিমালয়ের শাখা প্রশাখা।

পেশাওয়ার রওনা হবার সময় এই মানচিত্রটা ছিল আমার মনে। আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল, পশ্চিম হিমালয়ের প্রান্ত দেখে আসা। জানি লক্ষ্যটা অস্পষ্ট, এবং

অনিশ্চিতও বটে। কিন্তু উদ্দীপনাটা ত অনিশ্চিত নয়। হিমালয়ের জটা-জটিলতা তার অন্তহীন পর্বতমালার ভিতর দিয়ে কতদূর অবধি প্রসারিত, এটা জানা মন্দ কি! হিন্দুকুশের নানা স্তর, চিত্রলের স্বপ্নরাজ্য, কারাকোরাম গিরিশৃঙ্গদলের মধ্যে অসংখ্য নিরুদ্দেশ মন্দির ও গুম্ফা, অগণিত ইতিহাসের 'অর্থলুপ্ত অবশেষ'—এরা যদি নিরন্তর আকর্ষণ করতে থাকে, তবে কেনই বা উদ্দীপনা খুঁজে পাব না। তা ছাড়া হিমালয় সম্বন্ধে আমার আন্তরিক অধ্যবসায়টা হলো সহজাত। শৈশবে রূপকথার রাজপুত্রের গল্প যখন শুনতুম, তার মধ্যে হিমালয়ের নামটা শুনতে পেতুম না। ওটা আমার মনে থাকতো উহ্য একটা প্রশ্নের আকারে। গল্পটার প্রধান বক্তব্য, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, কটিবন্ধে তার তরবারী। কত প্রান্তর, কত অরণ্য, কত নদ ও নদী,—এমন কি সাত সমুদ্র এবং তেরোটি নদী পার হয়ে সাতশো রাক্ষসী'র দেশ—রাজপুত্র সমস্তই অতিক্রম করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুঝলুম, রূপকথায় সবই আছে, নেই কেবল হিমালয়! না থাকার কারণ আছে বৈকি। বাঙালীর পরিকল্পনা এক বস্তু, কায়িক শক্তি ভিন্নপ্রকার।

রাত আন্দাজ নটার সময় রাওয়ালপিণ্ডি ছাউনী স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লো পেশাওয়ারের দিকে। সেদিন কনকনে শীতের রাত। অজানা দেশ, অজানা পার্বত্য-পথ উত্তর অঞ্চলে প্রসারিত। সে যাই হোক, গাড়ি ছাড়লো বটে, কিন্তু যেন চলতেই চায় না। ক্লান্ত চাকায় এরই মধ্যে তার ঘুম জড়িয়ে এসেছে। বাইরে কিছু দেখা যায় না, কৃষ্ণকায়া রাত্রি যেন অন্ধের মতো চোখ বুজে রয়েছে। গাড়ির নীচে চাকার ঘন-ঘর্ষণ কান পেতে শুনলে দুর্ভাবনার সঙ্কেত আনে। বিশালকায় তুর্ক-ইরানী জাতির আফ্রিদীরা যখন লাল টসটসে আপেল চিবোয়, তখন তাদের দুই চোয়ালের ঝকঝকে দাঁতের পাটির ঘর্ষণে এমনি আওয়াজ বেরোতে থাকে। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে আমার মত নাবালক বাঙালীর ভয় করে। সেই রাত্রে গাড়ির মধ্যে যে দু-চারজন সহযাত্রী আমার সঙ্গে চলেছে, তারা যে আমার এই ভারতবর্ষেরই মানুষ, তা জানি বৈকি। কিন্তু তবুও তারা অজানা। আমার ধ্যানধারণা চিন্তা অভ্যাস—আমার কোনটাব সঙ্গেই তাদেব মেলাতে পারিনে। ওদের গায়ের গন্ধে আর ওদের নিশ্বাসে যেন পাই এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস। শক, হূন, তুর্কী-তাতার, এমন কি গ্রীকবিজয়ের কথাও মনে পড়ে, মনে পড়ে নাদির শা, চেঙ্গিস খাঁ কিংবা গজনীর মামুদকে। দেহ যেমন বিরাট, তেমনি আশ্চর্য টানা চোখ, সেই চোখে অনেক সময়েই সুর্মাটানা। ছাঁটা দাড়িতে প্রায়ই মেহেদির রং করা, ছাঁটা গোঁফ ধারালো ছুরির ফলার মতো। বাহু যেমন দীর্ঘ তেমনি কঠিন এবং তার অগ্রভাগের আঙুলগুলো দেখলে ভয় করে। সত্যি কথা বলতে কি, ভয় চলে আমার সঙ্গে সঙ্গে। নতুন জায়গার নামে আমি ভয় পাই। কিন্তু ভয়ের থেকেই আমার সমস্ত উদ্দীপনার জন্ম। সেই তন্দ্রাস্তিমিতগতি ট্রেনের মধ্যে বসে আমার সর্বশরীরে শীতের যে কাঁপন থর থর করছিল, সেটার সমস্তটা ঠাণ্ডার থেকে নয়, ভয়ের থেকেও। দুপাশের ঘন অন্ধকারের মতোই আমার যাত্রা-পথটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভরা। গাড়ির ভিতরের আলোটা দুর্ভাগ্যবশত নিষ্প্রভ বলেই সমস্তটা যেন সংশয়াচ্ছন্ন। তার ওপর দেওয়ালে পড়েছে এই দানবীয় দেহগুলির ছায়া। ওদের প্রত্যেকের পাশে এক একটি গড়গড়া। তামাকু সেবনের আয়োজন ওদের সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। কিন্তু তার বড় বড় চিমটাগুলি লোহার শিকলে বাঁধা থাকে এবং তাদের ধারালো ছুঁচলো ফলাগুলির দিকে তাকালে মাঝে মাঝে গলা শুকিয়ে ওঠে।

তবু আমাকে যেতে হবে, এই হলো আমার নিয়তির নির্দেশ। কাফ্রিস্তানের সঙ্গে

কোহিস্তান কোথায় কোন্ পাহাড়ে মিলেছে, এ আমার দেখা চাই বৈকি। আমার ছোটবেলাকার সেই ভূগোলে পড়া কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী গিলগিটের উত্তর দিয়ে এসে কোথায় মিলেছে হিন্দুকুশ পর্বতমালার সঙ্গে সেই দৃশ্য না দেখলে আমার চলবে কেন? ওদেরই ভিতর দিয়ে এসেছে সিন্ধুনদ। কৈলাস পর্বতমালার থেকে যাত্রা করেছে সিন্ধু, তারপর গিরিগুহাতলের ভিতরে হারিয়ে গিয়ে আবার ছুটেছে লাডাকের আশেপাশে, তারপর গিয়েছে উত্তুঙ্গ নাঙ্গা পর্বতের তলা দিয়ে গিলগিটে—যেখান থেকে উত্তরে চোখে পড়ে রুশ রাজ্য, আর দক্ষিণে কাশ্মীর—সেখান থেকে এসেছে হাজারা জেলায়—তারপরে এই আমি যে পথ দিয়ে চলেছি অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

তক্ষশীলায় নামবার কথা ছিল। ওখান থেকে হাভেলিয়ান এবং আবোট্টাবাদ যাবার সুবিধা আছে। একথা মনে আছে, তক্ষশীলার যাদুঘরের দায়িত্ব নিয়ে যিনি আছেন, তিনি বাঙালী। মোট দুই ঘর বাঙালী আছেন তক্ষশীলায়। কিন্তু আগে থেকে খবর পাঠানো হয়নি বলেই নামা হলো না। তক্ষশীলা থেকে ট্রেন আবার চললো আটক-এর উদ্দেশে। আটক-এর আগে পড়বে ক্যাম্বেলপুর। ক্যাম্বেলপুর থেকে পশ্চিমে যাওয়া যায় কোহাট এবং দক্ষিণে সোজা সিন্ধুনদের তীরে তীরে সমগ্র পাঞ্জাব সীমান্ত পেরিয়ে মুলতান বাহালপুর রাজ্য ছাড়িয়ে সিন্ধুদেশে। কিন্তু আমার দরকার ছিল হিমালয়ের শাখাপ্রশাখাকে জানা। এ দৃশ্য চোখে দেখে আসা দরকার যে, হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম মিলিয়ে পূর্ব আফগানিস্তান পর্যন্ত যে বিরাট ভূভাগ—হাজার বছর আগে জয়পাল রাজবংশ ছিল তার অধিপতি। আমার খুঁজে বেড়ানো দরকার কোহিস্তান আর হিন্দুকুশ জুড়ে হিমালয়ের গুহা-গহ্বরের আশেপাশে, কাবুল আর কুনার নদীর তীরে তীরে সেকালের রাজবংশের অগণিত নরকঙ্কাল বালু-কাঁকর-পাথরের তলায় আজও চাপা পড়ে রয়েছে। কৌতূহল আমাকে নিয়ে গেছে একপথ থেকে অন্যপথে চিরদিন!

সুতরাং অনিশ্চিত, এবং অনিশ্চিত বলেই আশঙ্কা। ক্যাম্বেলপুর অবধি গাড়ি থামবে, তারপর গভীর রাত্রে কোথাও এ গাড়ি থামবার হুকুম নেই। নিতান্ত দরকার যদি থাকে এবং বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত হয়, তবেই রাত্রের দিকে এ লাইনে স্ত্রীলোকের ভ্রমণ সম্ভব। তাও বলা আছে, সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে অক্ষম। লোভ এবং নষ্টামির কথা এখানে আসে না, এটাও এক ধরনের প্রয়োজনের কথা। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব আফগানিস্তান অবধি পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম। যাদের ঘরে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু বেশী, তারাই নাকি সমাজে অভিজাত বলে পরিচিত। ওরা অমিতশক্তিশালী ইংরেজের জগৎজোড়া সামরিক আয়োজনের কাছে কোনদিন বশ্যতা স্বীকার করলো না, কিন্তু একটি দরিদ্র ও গৃহকর্মনিপুণা হরিণ-নয়নার মধুর শাসনের কাছে ওরা চিরকাল ক্রীতদাস হয়ে রইল। ওরা যখন লুট করে, তখন সকলের আগে আনে মেয়ে। স্বভাবে ওরা লক্ষ্মীছাড়া বলেই কারো সুখের ঘর ওদের চোখে কিছুতেই সয় না। তাই ওরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের আক্রমণ করে সকলের আগে তাদের ঘরকন্না জ্বালিয়ে দেয় এবং মেয়েছেলেকে লুট করে এনে তার পায়ের তলায় পড়ে ভালোবাসার জন্য মাথা কুটতে থাকে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মারী পাহাড়ের পথে যাবার সময় দেখেছিলুম একটি কটাক্ষহানা যুবতীকে তুষ্ট করার জন্য অন্তত একশত পুরুষের চোখে মুখে কী উৎকণ্ঠা। মোটর ড্রাইভার ভাড়া নেয়নি, পথের দোকানদার বিনামূল্যে খাবার জুগিয়েছে, ভিখারী আনন্দে গান শুনিয়েছে, কুলিরা তার মোট বয়ে দিয়েছে, কিছু সেবা তার করতে পারলে

সবাই যেন পরম কৃতার্থ।

মধ্যরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠলো। আবছায়া মলিন আলো, হিম-কুয়াশায় বাইরের সমস্তটাই অস্পষ্ট। কিন্তু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেই ছায়ামূর্তিরা চোখে পড়ে। বালু আর পাথরের ঊষর পাহাড়ের শ্রেণী—জনপদের চিহ্ন কোথাও নেই। পাহাড়ে পাহাড়ে কোন ফলন নেই, কোথাও নেই স্নেহের ছায়া। জল, মাটি, আশা, আশ্বাস—কোথাও কিছু চোখে পড়ে না। কাঁটা-লতা আর বনখেজুরের ঝোপ-ঝাড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত চোখ আবার নিজের কাছেই ফিরে আসে।

ক্যাম্বেলপুর থেকে গাড়ি ছেড়ে গেল আটক-এর দিকে। এটা গোরা ছাউনী,—কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না। কান সজাগ থাকলে শোনা যায় অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনা, গুলি-বারুদের বাক্স টানাটানি। অথবা তামাকের গড়গড়ার সঙ্গে লোহার শিকলে বাঁধা চিম্‌টার আওয়াজ। এমন একটা গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যেটা হিন্দুস্থানবাসীদের কাছে অপরিচিত; যে গন্ধটা ওদের তামাকে, স্বভাবে, বন্যতায়, হিংস্রতায় এবং পার্বত্য রুক্ষতায় মিলেমিশে রয়েছে। আমরা আটক-এর দিকে এগিয়ে এসেছি, এর পরেই সিন্ধুনদের পুল। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডির ওয়েস্ট-রীজের কাছে থাকাকালে শুনে এসেছি, এ অঞ্চলের সীমানাটা কেবল যে অনিয়ন্ত্রিত তাই নয়, অচিহ্নিতও বটে। কোহিস্তানের পর্বতমালার নীচে দিয়ে সশস্ত্র আফ্রিদীরা কাবুল নদী পেরিয়ে আটক পুলের আশে-পাশে নাকি লুণ্ঠন করতে আসে। ইতিহাস বলে, ঠিক এইখানে পৌঁছে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার একদা ভারত আক্রমণ করেছিলেন। আফ্রিদীরা লুট করে ট্রেন, শস্যক্ষেত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ধনরত্ন এবং পরিশেষে স্ত্রীলোক—যদি হাতের কাছে পায়। গুহাগহ্বরে ওরা থাকে লুকিয়ে, থাকে কাঁটা-ঝোপের আশেপাশে—সেখান থেকে রাইফেল ছোঁড়ে এবং কে না জানে, লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। একশো বছর ধরে ওরা হয়রান করে এসেছে ইংরেজকে—কামান, বিমান, বোমা-বন্দুককে ওরা থোড়াই কেয়ার করেছে। ওদের কাছে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি—এসব তুচ্ছ। নিত্যঅশান্তি আর আক্রমণ ওদের গা সওয়া। প্রকৃতির কাঠিন্য ওরা এনেছে হিমালয়ের পাথরের থেকে, স্বভাবের রুক্ষতা পেয়েছে ঊষর ধূসর কঙ্কর-প্রান্তরের উত্তরাধিকারসূত্র থেকে। ওরা মার খেয়ে হয় মরেছে, নয়ত পালিয়েছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি। ওরা গুলি করেছে সহোদরকে, সন্তানকে, পিতাকে, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ ছাড়েনি, উচ্ছৃঙ্খলতার মধুর আস্বাদ ছেড়ে ভদ্র-সভ্যতার আশেপাশে মুষ্টিভিক্ষার জন্য হাত পেতে বেড়ায়নি। ওরা চিরকাল ধরে শুনে এসেছে ওরা বর্বর, ওরা নির্দয়, ওরা সভ্য-সমাজের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়, ওদের কোন সমাজ নেই, কোন সংস্কৃতি নেই। এই অপযশের কালিমা ওরা এতকাল ধরে বহন করে এসেছে, কিন্তু তবু ইংরেজের কাছে ওরা আত্মবিক্রয় করেনি। ভয় থেকে অশ্রদ্ধার জন্ম কে না জানে। একজন ইংরেজ টমি একজন দীর্ঘকায় আফ্রিদীর পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপে। এত ক্ষুদ্র, এত সামান্য তার কাছে। ইংরেজ ওদেরকে ভয় করতো বলেই অশ্রদ্ধেয় প্রচারকার্য করে বেড়াত। আফগানীদের সঙ্গে ওদের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এবং সীমান্ত পাহারা দেবার কূটনীতিক কারণে ইংরেজ ওদের মাঝখানে টেনে দিল ডুরান্ড লাইন। কিন্তু তাতে রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক—কোন বিচ্ছেদই ঘটতে পারলো না। লান্ডিকোটালের সরাইখানায় যদি আজও একজন আফগানী এসে দাঁড়ায়, তবে সে আপন মানুষকেই খুঁজে পায়, পরদেশী সে নয়। যেমন আজ কলকাতার মানুষ র‍্যাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে ঢাকায় গিয়ে দাঁড়ালে নিজের মানুষকেই

চিনতে পারে। স্বজনবিচ্ছেদ সাধনের এই কুকীর্তি ইংরেজের পক্ষে নতুন নয়। আয়ার্ল্যান্ডে, প্যালেস্টাইনে, সুয়েজে, বোর্নিয়োতে, কোরিয়ায় এবং আরো বহু জায়গায়—যেখানে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ওপর সূর্য কখনও অস্ত যেত না।

গা ছমছম করতে লাগল, যখন চেয়ে দেখলুম ক্যাম্বেলপুরের পর থেকে আমার কামরায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। সিন্ধুনদের পুল পেরিয়ে গাড়ি চললো পশ্চিমের দিকে। পিছন থেকে ক্ষয়-ক্ষত ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পাহাড়ে পাহাড়ে একপ্রকার মালিন্য ফুটে উঠেছে, যেটাকে স্বপ্ন-নিমীলিত ভাব বললে ভুল হবে, ওটা যেন একপ্রকার মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। হিমালয়ের আর কোথাও এমন নির্জীব অসাড়তা আমার চোখে পড়েনি। পার্বত্যপ্রকৃতির এমন একটা কুটিল বিদ্বেষ এবং হিংস্র ভ্রূকুটি অন্য কোথাও সহসা দেখাও যায় না। আমার ক্লান্তি ছিল অজস্র, যত ঘুম যেখানে আছে, আমাকে ঘিরে ধরছিল। কিন্তু ঘুম এলেই দুর্ভাবনা আসে সঙ্গে। নিদ্রা মানেই ত পরনির্ভরতা, যাকে বলে আত্মবিলোপ। নিজের উপরে দখল রাখার জন্যই জেগে থাকা চাই। সুতরাং চোখ দুটো আমাকে বড় বড় করে সমস্ত হিমাচ্ছন্ন রাতটা জেগে থাকতে হলো। জানলার বাইরে একাগ্র চোখে তাকিয়ে বাইরে ওই হিমাঙ্গী রাত্রির মৃত্যুমলিন যে চেহারাটা নিষ্প্রাণ পার্বত্য প্রান্তরের উপর দিয়ে দেখে যেতে পারলুম,—কে জানে, আর কোনদিন হয়ত এই অবাস্তব দৃশ্যটা আমার চোখে পড়বে না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর আন্দাজ সময়ে নওশেরা পেরিয়ে গাড়ি চললো। সেই তেমনি অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা তেমনি ভীতি উৎপাদন করে। হয়ত শীর্ণ দুর্বোধ্য কারো কণ্ঠস্বরের ভগ্নাংশ, স্বল্পান্ধকারের কোন অতিকায় ছায়ামূর্তির আনাগোনা, জুতোর নীচেকার লোহার নালের চকিত ঘর্ষণ,—তারপর সব চুপ। দূরের থেকে গার্ডের বাঁশী এবং তারপরে আবার বীভৎস এঞ্জিনের আওয়াজ দিয়ে ট্রেনের প্রবল একটা ঝাঁকুনি। গাড়ি ধীরে ধীরে চলে।

ভাবতে ভালো লাগছে, মহাভারতের গান্ধার রাজ্য অতিক্রম করে চলেছি। চন্দ্রবংশীয়দের সেই রাজত্বকাল,—যখন তাদের রাজধানীর নাম ছিল পুরুষপুর, অর্থাৎ আধুনিক পেশাওয়ার। তার পরে এখানে এসে দাঁড়ায় বৌদ্ধসভ্যতা; অসংখ্য বৌদ্ধশাস্ত্রকারের পুণ্য জন্মভূমি। পুরুষপুর ছিল ভারত সভ্যতার লীলানিকেতন।

পেশাওয়ার গোরা ছাউনীতে গাড়ি যখন এসে পৌঁছল, তখন ভোর হয়েছে। উষার প্রথম পাণ্ডুরেখাটা আমার চোখে পড়েনি। চোখ বুজে আমার ক্ষুধার্ত মন ছুটে চলে গিয়েছিল দেড় হাজার মাইল দূরে—যেখানে আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় চৌধুরীদের বাড়ির একজোড়া নারকেল গাছ, তার নীচে শিউলীর ঝাড়। প্রভাতের প্রথম আলো ওদেরই ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। আশ্চর্য, পথে নামলে ঘর আমাকে টানে; ঘরে গিয়ে ঢুকলে পথের আনন্দ আমাকে স্থির থাকতে দেয় না।

ঠাণ্ডাটা জড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে পারি ওভারকোটের নীচে একটা পুলওভার থাকলে এখানে কাজ দিত। পা দুখানা শীতে আড়ষ্ট হয়ে জমে গেছে, কিছুক্ষণ চলাফেরা না করলে শরীরে উত্তাপ আসবে না। অনেক চেষ্টায় সকলের আগে এক বাটি চা সংগ্রহ করা গেল। গোরা-ছাউনী স্টেশন কিছু ভদ্র, সিটি স্টেশন যেমন নোংরা, তেমনি ময়লা মানুষের ভিড়। এখানে পুলিস সাহেব আছেন তিনি বাঙালী, তাঁর ছেলের সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডিতে কাটিয়েছি কিছুদিন। তাছাড়া আছেন একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ডাক্তার—তিনি বিশেষ অতিথিসেবাপরায়ণ। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ। তাঁর প্রভাব, প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠা

এই অঞ্চলে সর্বজনবিদিত। সৈন্যবিভাগে এবং সামরিক হিসাব বিভাগে কিছু কিছু বাঙালী অনেককাল অবধি ছিলেন এবং তাঁদের ঘিরেই গোরা-ছাউনীর আশেপাশে 'বাবুমহল্লা' গড়ে ওঠে। বাবু মানেই বাঙালী, আর বাঙালীর সমাজের পাশেই থাকে একটি করে কালীবাড়ি। লাহোর রাওয়ালপিণ্ডি পেশাওয়ার অমৃতসর—কালীবাড়ি কোথায় নেই? পরে জানতে পারি এই কালীবাড়িগুলির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হলেন চব্বিশ পরগণা নিবাসী স্বর্গত দিগম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সেসব প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ত আজও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাতে কালী আর বাঙালী দুটোর একটাও আছে কিনা জানিনে। বাঙালী হিন্দুর নামে একটি রাস্তা ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে,—শশীভূষণ চ্যাটার্জি স্ট্রীট। আরো ছিল নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, —স্কুল, পাঠশালা, নাট্যসমিতি, প্রসূতি সদন। শিবের মন্দির, কোথাও জলাশয়, কোথাও বা দাতব্য ঔষধালয়। আজও কি তারা আছে? কে জানে! পশ্চিম পাঞ্জাবে বাঙালী হিন্দুর নানা কেন্দ্র ছিল, ছিল নানা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা,—আজ কি তাদের কোন চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে?

ছাউনী আর সিটি—দুই স্টেশনে আকাশপাতাল তফাৎ। একটি বিলেতী, অপরটি দেশী। একটি পাশ্চাত্য, অন্যটি প্রাচ্য। পাহাড়ী জাত একটু এড়াটে, অপরিচ্ছন্ন—কে না জানে! আর পাহাড় মানেই শীতপ্রধান মুলুক। ময়লা ছেঁড়া জামা, ময়লা হাত-পা, ময়লা মুখ আর মাথা—সমগ্র হিমালয় দেখো, এর ব্যতিক্রম নেই। আসামের পাহাড়ে যে চেহারা, গাড়োয়ালের পার্বত্যপথেও তাই। কুমায়ুনের মানুষের শরীরে যে মালিন্য, কাশ্মীরের লাডাকের পথেও সেই একই অপরিচ্ছন্নতা। দেহ বলিষ্ঠ, শক্তি অমেয়, পরিশ্রম করে জন্তুর মতো; কিন্তু চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের ছাপ সর্বাঙ্গে। সমতলভূমিতে নেমে আসতে পাহাড়ীদের ভয় করে, ঘন বায়ুস্তরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে গিয়ে তাদের দম আটকে মরার ভয়। মুসৌরীতে আমার এক পাচক ছিল, নাম গোবর্ধন সিং। চমৎকার রান্না করত। তাকে বললুম, কলকাতায় তুমি চলো, কোন ভাবনা থাকবে না। গোবর্ধনের বাড়ি হলো দেবপ্রয়াগের দিকে, মুসৌরী থেকে পাহাড়ী পথে গেলে চারদিন পৌঁছতে লাগে। গোবর্ধন আমার প্রস্তাব শুনে জবাব দিল, হাজার টাকা বেতন পেলেও যে 'গর্মি মুলুকে' যাবে না। পেশাওয়ারে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করো, তোরা যাবি বাঙলাদেশে? ওরা একবাক্যে জবাব দেবে —না! গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সুলেমান পর্বতের পূর্বপ্রান্ত, সমগ্র সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের বালু আর পাথরের দিকচিহ্নহীন মরুপ্রান্তর জ্বলে পুড়ে যায়,—কিন্তু সন্ধ্যার পরে ঠাণ্ডা,—এমন ঠাণ্ডা যে, কাঁপুনি ধরতে থাকে। এই ঠাণ্ডা আর লঘু বায়ুস্তর ওদেরকে সঞ্জীবিত করে রাখে। ওরা কষ্ট পায়, কিন্তু হাঁপায় না। শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় গাছের পাখি, মাঠের জন্তু এবং ঘরের মানুষ জমে মরে যায়, কিন্তু তবু তারা 'গর্মি মুলুকে' আসবে না।

সকালের রোদ উঠলো। স্টেশনের বাইরে এসে বহুদূর পর্যন্ত ভাঙাচোরা পেশাওয়ার শহর চোখে পড়ে। হঠাৎ বদলে গেছে সব। পশ্চিম পাঞ্জাবের সঙ্গে সীমান্তের কোন মিল নেই। সমস্ত হিন্দুস্থান একদিকে, ওরা একদিকে; ওরা সিন্ধুনদের ওপারকে বলে হিন্দুস্তান। হাজার হাজার বছর ধরেই একথা বলে আসছে, আজ নতুন নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরাও ওদের কাছে ভিন্‌দেশী, নাড়ির যোগ কোথাও কিছু নেই। পাকিস্তানের মুসলমানরা ওদের কাছে হিন্দুস্তানী। তারা দুষমন, তারা ওদের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে। পেশাওয়ারে নামবামাত্র এসব কথা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। ওদের চোখে

মুখে সন্দেহ, কেমন যেন ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভাব, কেমন যেন অসহযোগী মনোবৃত্তি। কাফিখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ওদের ভ্রূভঙ্গিতে উপেক্ষা এবং বৈরীভাব ফুটতে থাকে, খাবারের দোকান কোথায় জানতে চাইলে কেউ বলে দেয় না। টাঙ্গাওয়ালাকে দাঁড়াতে বললে সে কথা না শুনে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয়। পুলিসকে কিছু প্রশ্ন করলে সে বিরক্তিবোধ করে। আমরা হিন্দুস্তানী, আমরা হলুম ওদের দুশমন। স্টেশনের বাইরে এসে একজন হিন্দুস্তানি মুসলমানকে এদিককার তথ্য জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, স্টেশন থেকে এই যে সড়ক গিয়ে মিশেছে খাজুড়ীর মাঠের পথে, তার এপাশে ওপাশে যাবেন না,—ওটা সরকারী এলাকার বাইরে। অর্থাৎ কলকাতার চৌরঙ্গী হলো অধিকৃত এলাকা, কিন্তু গড়ের মাঠের দিকে এক পা বাড়ালেই আমার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা! রেলপথ আর মোটরপথ আমার—মাঠের পথ অন্যের। তিনি বললেন, ওরা অসভ্য আফ্রিদী, ওদের বিশ্বাস করবেন না।

কথাটা শুনে ঈষৎ গা ছমছমিয়ে উঠলো বৈকি। প্রতি পদক্ষেপ সংশয়ে ভরে উঠলো। জীবন এখানে অনিশ্চিত। উটের ক্যারাভান্ আসছে,—ঘেরা-টোপের বাইরে ও ভিতরে একেকজনের হাতে রাইফেল। কুলির হাতে রাইফেল, হোটেলওয়ালার হাতে, মেষপালকের হাতেও। পথের উপরে ঘোড়া আর উট চরে বেড়াচ্ছে, ঘন লোমযুক্ত দুম্বা আর মোরগ,—পথে পথে যাযাবরী ঘরকন্না পেতেছে তুর্ক-ইরানীর দল। কোন কোন মেয়ের সর্বাঙ্গে কালো আল্‌খাল্লা, মুখখানা ছাড়া দেহের আর কোন বাঁক নজরে পড়ে না। ওদের মাঝখানে সুর্মাটানা কাবুলিরা এসে অনায়াসে মিশে গেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে রাইফেল অথবা দু'নলা বন্দুক। ওরা মুরগী ধরে এবং নখের আঁচড় দিয়ে মুরগী ছাড়ায়; বাছুর কাটে 'চাকু' দিয়ে। দাঁত দিয়ে ছাড়ায় ওপরের ছাল, তারপর সেই কাঁচা মাংস নিজের ঝুলিতে রুটির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে বসে। চললো এক দেশ থেকে আরেক দেশে। চললো মধ্য-এশিয়ার তাক্‌লা-মাকানের পথ ধরে তুর্কিস্তানের দিকে কারাকোরামের পাহাড়তলী পেরিয়ে, নয়ত বা চললো জালালাবাদের পথ ধরে হেলমন্দ নদী পেরিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে একেবারে সেই মাঝিয়ারি শরিফ। পাহাড়তলীর পাথরের নুড়িভরা দুর্গম বালুপথ পেলে ওরা খুশী—কেননা অমন রাস্তায় দুশো-চারশো মাইল পথ চড়াই-উৎরাইতে হেঁটে যাওয়া ওদের কাছে দিনানুদৈনিক অভ্যাসের সামিল। শুধু মরুভূমিতে ওরা একটু বিব্রত। সেই কারণে যানবাহন হিসাবে উট হলো ওঁদের কাছে মূল্যবান। উট তাই সম্পদ। উটের সংখ্যা যার বেশী, সে হলো বড় কারবারী। হাজার দেড় হাজার মাইল চললো উটের ক্যারাভান্—সার গেঁথে চললো অসংখ্য উট, তাদের পিঠে রয়েছে শত শত মণ জন্তুর লোম, তামাক, লৌহজাত সামগ্রী, হিং, জন্তুর চামড়া, শুক্‌নো মাংস, দামী দামী পাখি, তুলা ও পাটজাত সামগ্রী এবং আরও অনেক রকম। নদীর ধার যদি পায়, তবে চামড়ায় বেঁধে পানীয় জল নিয়ে যায় উটের পিঠে চড়িয়ে, সেই জল বিক্রী করে নির্জলা অঞ্চলে। এই জীবনযাপন করছে ওরা পাহাড়ে-পাহাড়ে আর বালুভূমে যুগযুগান্ত অনাদি-অন্তহীন কাল। অরুচি নেই, ওঠবার চেষ্টা নেই, উন্নতির আয়োজন নেই। কাঁটা খেজুরের ঝোপ-জঙ্গল পথে-পথে ওরা পায়, তারই আশেপাশে রাত্রিবাস, তারই আনাচে-কানাচে দিনযাত্রা। এর বাইরে ওরা জীবনকে দেখেনি।

পেশাওয়ার থেকে রেলপথ চলে গেছে খাইবার গিরিসঙ্কটের গহনলোকে। মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল আঁকাবাঁকা রেলপথ। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত ষাট সত্তরটি টানেল্ পড়ে

সেই পথে। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। এদের জরীপের ভার ছিল বাঙালীর ওপর, বাঙালী ইঞ্জিনীয়রের পরিচালনায় সুড়ঙ্গপথগুলি কাটা হয়। প্রায় সমস্তটাই বাঙালীর হাতের তৈরী। যখন ঘুমিয়েছিল আর্যাবর্ত আর দাক্ষিণাত্য, তখন বাঙালী যায় এগিয়ে বৃহত্তর হিন্দুস্তানের দিকে, যায় আফগানে, ইরানে, ব্রহ্মে এবং চীনদেশে। বাঙালী বিদ্যাধর ভট্‌চার্যি গিয়েছিল রাজপুতানার প্রান্তে, বাঙালী শ্রীজীব গোস্বামী গিয়েছিল বৃন্দাবনে, বাঙালী রামমোহন আর শরৎ দাস তিব্বতে। বাঙালী দীপঙ্করকেও আজ ভুললে চলবে না। লাণ্ডিকোটালে গিয়ে দেখি, হুগলীর মিঃ ঘোষ আছেন খাইবার গিরিপথের টানেলগুলির পরিদর্শনে, এবং আফ্রিদী শ্রমিকের পরিচালক রয়েছেন চট্টগ্রামের বাঙালী মিঃ মজুমদার। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে যে-পথ অন্তহীন পর্বতমালা পেরিয়ে কাশ্মীরের দিকে চলেছে, তারই একান্তে ঘোড়াগল্লির পাহাড়ে দেখেছি সেদিনকার মিঃ চ্যাটার্জিকে পূর্তবিভাগের কাজ নিয়ে রয়েছেন। ওপারে কাশ্মীর, এপারে ভারত—মাঝখানে অরণ্যলোকে বিজনবাহিনী বিতস্তার খরতর প্রবাহ; তারই তীরভূমে দেওদারেব বনে 'কটেজ-গার্ল'-এর ছিল ডালপালাছাওয়া ছোট্ট কাঠের ঘর। সে ঘরেও একদা এক বাঙালীকে দেখে বিস্ময়বোধ করেছিলুম বৈকি। পাঠান আর মোগল আমল থেকে বাঙালী বেরিয়েছিল দিগ্বিজয়ে, কিন্তু ইংরেজ আমলের মধ্যকালে বাঙালী আরামের চাকরি পেয়ে ঘর থেকে আর বেরোয়নি; ইংরেজি ছাড়া কিছু শেখেনি,—সেইজন্য জীবনটা হয়েছে বদ্ধজলা। অথচ সুবিধা পেলে বাঙালী যে এগোয় না, এ কথাও সত্যি নয়। এই সেদিনও দেখে এলুম সিকিমে, মানে গ্যাংটক শহরে—বাঙালী পানের দোকান দিয়ে বসেছে। পোস্টাপিসে বাঙালী, পি. ডব্‌ল্. ডি.-তে বাঙালী। আর কিছুদূর এগিয়ে নাথু-লা-পাস পেরিয়ে তিব্বতের ধারে য়াটুংয়ে এই সেদিনও বাঙালীরা সামরিক তাঁবু বেঁধে বসেছিল। বাঙালী কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের কথা কে না জানে!

বাঙালী যে মৃত্যুকে ভয় পায় না, ইংরেজ আমলের শেষদিকে এই খবরটা পেয়ে গেছে সীমান্তের খান্-রা, ওই আজকে যাদের নাম পাখতুন—পুস্তু যাদের ভাষা। ওদের চোখে সন্দেহ আর কৌতুকের সঙ্গে তাই কিছু সম্ভ্রম, যেন ঈষৎ বন্ধুভাব। ওরা সব চেয়ে ক্রুদ্ধ পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমান আর শিখদের ওপর। তাদের হাতেই ওদের যত হয়রানি। তাদের সঙ্গেই ওদের লড়াই আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইংবেজ টমী ওদের কাছে শিশু। ক্যাম্প থেকে ছোঁ মেরে টমীকে তুলে নিয়ে ওরা পালিয়েছে, এমন ঘটনা আক্‌ছার। একটি চপেটাঘাতে ইংরেজ টমী প্রাণ হারিয়েছে, এমন ঘটনা একাধিক। তাই দেখা যায় ইংরেজ টমীরা নিরীহ গাড়োয়ালী পল্টনকে সামনে থেকে গুলি করে মেরেছে, কিন্তু আফ্রিদীর মাঝখানে গিয়ে কখনও বেয়নেট্ চার্জ করেনি। টমীর হাতে রাইফেল যখন কাঁপে, তখন পাঠান স্নিপারের রাইফেলের অব্যর্থ লক্ষ্য টমীর কপাল ভেদ করে চলে যায়।

খাইবার গিরিপথের প্রারম্ভে প্রথম দুর্গ হল জমরুদ। চারিদিকে খাজুড়ীর বিশাল প্রান্তর, তার প্রান্তে সমস্ত দিগ্বলয় আচ্ছন্ন করে রয়েছে শফেদকো, সুরাটাক্, পাঘমান, পঞ্চশির, হিন্দুকুশ প্রভৃতি পর্বতমালা। অনেকগুলি চূড়া তাদের দুগ্ধফেন তুষারে আবৃত। এই অন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে জমরুদ দুর্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্ধত হিংস্রতার মতো। পিকেট রয়েছে আশেপাশে। 'শত্রু' রয়েছে চারদিক ঘিরে। কিন্তু দুর্গ হিসাবে জমরুদের কোনো বাহার নেই,—নীরেট কঠিন কাঁকর পাথরের জমাট স্তূপের মতো। পাটনা শহরের মাঝখানে যে ঐতিহাসিক গম্বুজাকৃতি চাউলের ভাণ্ডারটাকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'মনুমেন্ট অফ ফলি'—জমরুদ দুর্গের আকারটাও যেন অনেকটা ওই রকম, অনেকটা যেন নিউ

দিল্লীর মানমন্দিরের চেহারা। সমস্তটাকে ঘিরে শুধু চোরাগর্ত দিয়ে গুলি চালাবার জন্য অসংখ্য ছিদ্রপথ। শত্রু মনে করি বলেই ত এত হিংসার আয়োজন। একের হিংসাবোধ আর বিদ্বেষবুদ্ধি অপরের পশুপ্রকৃতিকে খুঁচিয়ে জাগায়। কিন্তু যদি কারোকে শত্রু মনে না করি? যদি কায়মনোবাক্যে অহিংসাবাদী হই, তাহলেও কি আমার চারিদিকে এই হিংসার আয়োজন চলবে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে পাখতুন সমাজে উঠে দাঁড়ালো এক সর্বচিত্তজয়ী বীর। বীরত্বের শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রসাদ কী? একজন ছাড়া আর কোনো পাখতুন এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না! মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় কী? এই প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ালো ওই বালুপাথর আর অঙ্গারপ্রধান পাহাড়ে পর্বতে; প্রশ্ন ঘুরে বেড়াল কুরমে, মিরনসাহে, ওয়াজিরিস্তানে, ডেরাইস্মাইলখানে, দাউদখেলে, কোহাটে, কোয়েটায় এবং ওই পর্বতের গুহায় গুহায়, আফ্রিদী পাঠানদের পাড়ায় পাড়ায়। সেদিন ওদের মধ্যে সেই একজন মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো অহিংসা আর প্রেম! তাঁর নাম খান আবদুল গফুর খান। তাঁর আবির্ভাবে সমগ্র পাখতুনিস্তান নতুন রসে ভরে উঠল।

সামনের মাঠের আয়তন নাকি প্রায় তিনশো বর্গমাইল। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল পার্বত্য বেষ্টনী। এখানে লড়াই চলে এসেছে চিরকাল। আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ,—তারপর শক হূন তাতার; জয়পাল আনন্দপাল থেকে মহম্মদ ঘোরী, গজনীর মামুদ থেকে বাবর মোগল। এই মাঠের পাথরের স্তরে স্তরে ঐতিহাসিক কঙ্কাল আজও থেকে গেছে; ওই হিমালয় চিরকাল ধরে তার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এই মাঠের প্রান্ত ঘেঁষে চলেছে পায়ে চলা পথ, আর পাশে পাশে রেলপথ। একসময় দুটো পথই মিলিয়ে গেছে দূরে গিয়ে খাইবারের পাহাড়ের জটিলতায়। রুক্ষ অনুর্বর ধূসর পর্বত, না আছে ছায়া, না মায়া। আশ্রয় আতিথ্য আনন্দ—কিছু নেই কোথাও। শুধু ক্যারাভানের উটের গলা থেকে ডিং-ডং-ডিং-ডং ঘণ্টার আওয়াজ দূর থেকে দূরে যায় মিলিয়ে,—সমস্ত চেতনাটার উপরে হাজার হাজার বছরের কেমন একটা ক্লান্ত তন্দ্রা নেমে আসে—হাওয়ার মধ্যে যেন বিগত ইতিহাসের হাহাকার শোনা যায়।

আলীমসজিদ এলাকায় এসে পড়লুম। মসজিদ হয়ত আছে কোথাও পাহাড়তলীতে, তবে এখানে দেখা যাচ্ছে একটি মস্ত কলেজ, নাম ইসলামিয়া কলেজ। অসভ্য জাতিকে সুসভ্য করে তোলার একটা আয়োজন আছে এখানে। পড়াশুনার জন্য বেতনাদি লাগে না, এমন কি ইংরেজ মিশনারীরা যেমন বিনামূল্যে ছাপা বই বিলিয়ে বেড়ায়, আমেরিকান মিশনারীরা যেমন কাগজমোড়া খাদ্য এবং খামে করে টাকার নোট উপহার দিয়ে বেড়ায় —এখানেও প্রায় তাই—পাঠানদেরকে আকর্ষণ করে আনার জন্য নানাবিধ উপঢৌকনাদি বিতরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এত করেও সেই স্কুল-কলেজে ছাত্র জোটে কম। যেমন আরোহী জোটে কম খাইবার রেলপথে। আফ্রিদী পাঠানরা যদি টিকিট না করে ট্রেনে আনাগোনা করে, তবে এই হুকুম বহাল আছে যে, ভাড়া আদায়ের জন্য ওদেরকে যেন পীড়াপীড়ি না করা হয়। ফলে, রেলপথে ওদের অবাধ স্বাধীনতা। আপেলের আর আঙুরের পুঁটলী নিয়ে উঠলো গাড়িতে,—চিবোতে চিবোতে চললো, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোনো দল বা নামলো মাঝপথে। রাস্তা পেরিয়ে কোনো পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথে ঢুকে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে গর্ত দেখা যাবে একটার পর একটা। আরেকটু গলা উঁচু করলে চোখে পড়বে পাহাড়ের প্রাচীরের পাশে ওদের ছোট ছোট ঘর,—জানলা নেই, দরজা নেই, নীরেট দেওয়াল, কিছু সবুজের দাগ, কিছু বা ঘাসলতা,—কিন্তু তাদের

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা গম্বুজ,—ওখান থেকে ওরা তাক করে দুশমনের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য! ওদের প্রত্যেকটি ঘর হলো দুর্গ, প্রত্যেকটি লোক হলো যোদ্ধা, এবং প্রত্যেকটি পাহাড় হলো আত্মরক্ষার প্রাচীর। চেয়ে দেখো, চারিদিক জনহীন, সেই শব্দহীন নির্জনতায় মনে সংশয়াতঙ্ক দেখা দেবে, ধূধূ রৌদ্রে পার্বত্য-প্রান্তরের অঙ্গার-ধূসরতায় ক্লান্ত দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরবে। কিন্তু একটি সাংকেতিক আওয়াজ করো, অমনি উল্কাগতিতে ছুটে বেরোবে পাহাড়ের গহ্বরের ভিতর থেকে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে দুর্ধর্ষ হিংস্র রণোন্মত্ত অসমসাহসিক ওয়াজিরি-আফ্রিদী পাঠানের দল। দূরের থেকে কামান দাগো, বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করো, বিধ্বস্ত করো তাদের ওই সংখ্যাতীত মাটির কেল্লা,—দেখবে শতকরা পাঁচজনও তাদের ধ্বংস হয়নি, তারা অদৃশ্য হয়েছিল পাহাড়ের তলায় সুড়ঙ্গগুলোকে শৃগালের মতো। একথা কে না জানে, ওরা বাগে পেলে মানুষ চুরি করে নিয়ে পালায়। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোতোয়ালী থেকে, ক্যাম্প থেকে এবং পেরিমিটারের বেড়ার ভিতরে ঢুকে গোটা একটা আস্ত সৈন্যকে কাঁধে তুলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে—এমন ঘটনা বহু আছে। রয়াল বেঙ্গল টাইগার যেমন একটি শিশুকে তুলে নিয়ে পালায়, তেমনি ওরা পালাতো ইংরেজ টমীকে নিয়ে জটিল পার্বত্য সুড়ঙ্গের অন্তরালে।

পাহাড়ের পথ সুদীর্ঘ চক্রাকারে ঘুরে গেল। সেই বাঁকে পাওয়া গেল শাগাই দুর্গ। রক্তিমবর্ণ পাথরের তৈরী বিশাল দুর্গ। বিশাল তার তোরণদ্বার, ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে প্রস্তুত। সামনে সশস্ত্র প্রহরী। বুঝতে পারা যায়, এই পাথর এদেশের নয়। আজমীড় থেকে আরাবল্লী পাহাড়ের দিকে ঢুকলে যে সকল ঘোরালো রক্তবর্ণের পাহাড় চোখে পড়ে, কিংবা যোধপুরে, কিংবা সুলেমান পর্বতমালার কোনো কোনো স্তরে,—সম্ভবত এইসব পাথর ওইসব অঞ্চল থেকেই আনা। এদিকে খাইবারের দীর্ঘ বিস্তার। চারিদিকে গগনচুম্বী পর্বতমালা, মাঝখানে দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, এদিক থেকে ওদিকে পথের রেখা চলে গিয়েছে দূর দূরান্তরে। এ অঞ্চল হলো খাইবার গিরিপথের মধ্যকেন্দ্র—এবং শাগাইকে যেহেতু দুইদিক রক্ষা করতে হয় সেই হেতু এখানকার অস্ত্রশালা অনেক বড়। একদিকে জমরুদ, অন্যদিকে লান্ডিকোটাল। কোনকালে শাগাইয়ের পতন যদি ঘটে, তবে পেশাওয়ারের পতনও অনিবার্য। পেশাওয়ারের পতন যদি ঘটে তবে নওশেরা-আটক-ক্যাম্বেলপুর রক্ষা করা দুঃসাধ্য। আজও তাই। পাকিস্তানকেও আজ একই কারণে পাহারা দিতে হচ্ছে। ইংরেজ ওদেরকে বিশ্বাস করেনি, পাকিস্তানও ওদেরকে ঘরে ডেকে স্নেহের কথা বলেনি। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায়, শাগাই থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি সুদীর্ঘ অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে পরস্পর সংযুক্ত।

আবার অগ্রসর হলুম। চারিদিকের ধূসর পর্বত-বেষ্টনীর মাঝখানে রক্তবরণ বিশাল শাগাই দুর্গ পিছনে পড়ে রইল। তারও পিছনে পড়ে রইল ভারতবর্ষ।

শাগাই থেকে লান্ডিকোটাল প্রায় বারো মাইল পথ। চোখে দেখতে পাচ্ছি ভারত আক্রমণের প্রাচীন পথ। ময়ূর সিংহাসন গেছে এই পথ দিয়ে, এই পথ দিয়ে লুট হয়ে গেছে হাজার হাজার আর্য হিন্দু নারী যুগে যুগে, শত শত কোটি টাকা মূল্যের হীরা স্বর্ণ মুক্তো মণিমাণিক্যের সম্ভার গিয়েছে উটের ক্যারাভানে এই পথ দিয়ে। ছড়িয়ে পড়েছে এই পথে কত সোনার আশরফি, কত জড়োয়ার নূপুর, কত ছিন্নভিন্ন জহরতের মালা, কত বুকফাটা লবণাক্ত অশ্রু, বক্ষপঞ্জরের কত বিগলিত রক্তধারা। এই পথে চলেছিল ঘোড়সওয়ার গ্রীক

সেনাপতির দল সিন্ধুবিজয়ে, চলেছিল তুর্কি তাতারের বন্যাস্রোত, চলেছিল গ্রীক-ইসলাম সভ্যতার ভারত বিজয়ী সৈন্যবাহিনী। আবার এই পথ ধরে গিয়েছে গৌতম বুদ্ধের কল্যাণবাণী, মন্ত্রোচ্চারণ করেছে তারা প্রদীপ হাতে নিয়ে এই পথের অন্ধকারে,—ওম্ মণিপদ্মে হুম্! ধর্মম্ শরণং গচ্ছামি! বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি! এই পথে গিয়েছে ভিক্ষু নারায়ণ দেব, অনঙ্গ বোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু আর ধর্মত্রাতা। তারা গিয়েছে সীমান্তে, আফগানে, গান্ধারে, ইরানে, কশ্যপ সাগরের তীরে তীরে।

এ পথে কোন পথিক পাখি আসে না,—বৃক্ষলতার চিহ্ন কোথাও নেই; ক্বচিৎ কখনও দেখা যায় দূর হিমালয়ের থেকে নেমে এসেছে ধূসর ভল্লুক, কখনও এক আধটা হায়না, কিংবা হয়ত একটা ভীষণপ্রকৃতি সর্প—ব্যস, আর কোনো জানোয়ারের দেখা সাক্ষাৎ নেই। চেয়ে দেখছি পূর্বোত্তরে হিমালয়ের দিকে—ভ্রূকুটিকরাল, তৃষ্ণালোলুপ, ভস্মাচ্ছাদিত উলঙ্গ ফকির। বজ্রদণ্ডের ঘোরঘোষণা নেই, মেঘমেদুরতা কল্পনাতীত, ছায়াপথের ছবি ফোটে না কোথাও, নীলনয়না পল্লীবালার বাঁকা কটাক্ষপাতে সরোবরের কোরক শতদলে পরিণত হয় না। চেয়ে দেখছি হিমালয়ের আশ্চর্য পরিবর্তন। মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বারম্বার আনছে রূপান্তর—মানুষের, ভাষার, ভাবের, কল্পনার, প্রকৃতির, এমন কি জন্তুজানোয়ারের।

রেলপথটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে কোন সুড়ঙ্গলোক থেকে। আবার থামছে,—প্রতিপদে একটা করে লুপ। যাচ্ছে, আবার আসছে—জিগ্‌জ্যাগের মতো। সশস্ত্র পাহারা তার পথে পথে, ঘাঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে পিকেট্ বন্দুক তুলে। প্রত্যেকটি পাহাড় অবিশ্বাস্য, প্রত্যেকটি বাঁক সন্দেহজনক। মনে পড়ছে ঠিক এইখানে—এই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের আশেপাশে সীমান্তের ইংরেজ গভর্নর স্যর ওলাফ কারোর উস্কানিতে উৎকোচপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর আফ্রিদী বছর নয়েক আগে পণ্ডিত নেহরুকে আক্রমণ করেছিল। রাইফেল থেকে যখন তাঁর গাড়ির উপরে গুলিবৃষ্টি হতে থাকে তখন মৃত্যুভয়হীন কাশ্মীরী পণ্ডিত জওয়াহরলাল গাড়ি থেকে নেমে পথের উপরে দাঁড়ান মৃত্যুর মুখোমুখি। রয়টারের বিদেশী সংবাদদাতা লিখলেন, "The bravest man of the world before the gravest provocations." তিনি লিখলেন, প্রতি সেকেন্ডে রাইফেলের গুলি ছুটে যাচ্ছে পণ্ডিতজীর শরীরের আশে পাশে, আর সেই মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই অকল্প অপরাজেয় বীর পণ্ডিত নেহরু সহাস্যে ক্ষমা করছেন তাদেরকে। "The dramatic scene was the sight for even the gods to see." সেই নাটকীয় মুহূর্তে পণ্ডিতজীকে প্রসারিত দুই বাহুতে যিনি আলিঙ্গন করে দাঁড়ান, তিনি হলেন সীমান্তকেশরী ডাঃ খানসাহেব।

লান্ডিকোটালে এসে পৌঁছলুম। দূরের বাঁক থেকে কতকটা নীচের দিকে দেখা যাচ্ছিল লান্ডিকোটাল এক উপত্যকায়। তিনদিকে পাহাড়ের অবরোধ, মাঝখানে তাঁবুর সমষ্টি। সমস্তটাই অস্থায়ী, কেননা এ অঞ্চল প্রকৃত সামরিক ঘাঁটি। জালালাবাদ হয়ে কাবুলের দিকে যাবার এই একমাত্র রাজপথ। সৈন্যদলের ঘাঁটি, অধিকার রক্ষার আয়োজন—সুতরাং দোকান-বাজারও অস্থায়ী। স্ত্রীলোক ও শিশু বিকাল চারটার পর আর এ অঞ্চলে থাকবে না—এই নিয়ম। অতএব স্ত্রীলোক ও শিশু কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না কোথাও ঘরকন্না। এখানে কাছাকাছি আছে একটা জলাশয়, দূরের পাহাড় থেকে তুষার বিগলিত হয়ে জল এসে জমা হয়, কিছু বা আছে বৃষ্টির পসলা। এ জল শুকোয় শীত পড়লে,—তখন জল আনতে হয় পেশাওয়ার থেকে। গোরা ছাউনীগুলির অনতিদূরে

অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দুর্গ, জমরুদের অনেকটা সমগোত্রীয়, রয়েছে দাঁড়িয়ে। তার কামানের মুখটা ঘোরানো রয়েছে গিরিসঙ্কটের দিকে। আশে পাশে যাদের দেখছি তারা কে? উৎকোচ পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে এমন পাখতুন অনেককেই দেখছি। তারা ঝাড়ুদার, চাপরাশি, কুলী, ধোবা, জনমজুর। তারা পয়সা পায়, পায় মাংসের টুক্‌রো, তাই পেয়ে সেলাম ঠোকে। কিন্তু তবু তাদেরকে চিনিনে, তারা তুর্ক-ইরানী রক্তে তৈরী। আমি বাঙালী, কিন্তু কাথিয়াবাড়ে গিয়ে সেখানকার মানুষকে পর মনে করিনি, রাজপুতানায় বা গোয়ালিয়রে নিজেকে পরদেশী বলে মনে হয়নি, হায়দরাবাদে মাদুরায় অথবা কৃষ্ণা-রেবা-বেত্রবতী-তপতীর তীরে তীরে যাদেরকে দেখে বেড়িয়েছি—মনে হয়েছে তারা যেন আমার কতকালের আপন। উড়িষ্যায়, আসামে, নেপালের পার্বত্যলোকে, সিকিমের উত্তর প্রান্তে, ভূটানের সীমানায়—স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মন মিলে গেছে। মনে হয়নি তারা আমার অপরিচিত। গ্যাংটকে একটি তিব্বতী দম্পতির সঙ্গে সমানে তিনদিন কাটিয়েছি—কেউ কারো ভাষা জানিনে—কিন্তু কেউ কারো কাছে দুর্বোধ্য ছিলুম না। কিন্তু এখানে ভিন্ন কথা। এরা একেবারে অজানা অচেনা। এদের মুখের রেখায়, চোখের চাহনিতে, ভুরুর ভঙ্গীতে এবং চলন-ধরনে বিশাল ভারতের কোনো চেতনা নেই; আত্মপ্রকৃতির কোন সমগোত্রীয়তা ওদের মধ্যে খুঁজে পাইনি।

দুজন মাত্র বাঙালী এখানে ছিলেন, আগে তাঁদের নাম করেছি। মধ্যাহ্নে মিঃ ঘোষের কাছে আতিথ্য নেওয়া গেল। সঙ্গে নবলব্ধ বন্ধু মিশ্রজী। অন্নব্যঞ্জন সহযোগে আপ্যায়ন করলেন শ্রীযুক্ত ঘোষ। পরে জানা গেল, চাউল আর সবজি এসেছে সিন্ধুনদের ওপার থেকে। এখনকার মূল্যে সেই চাউলের দর মণ প্রতি দেড়শত টাকার ওপব পড়ে। কুলীসর্দার দ্বিতীয় বাঙালী মজুমদার মশাযকে পাওয়া গেল। নামে বাঙালী, বাড়িও চট্টগ্রামে, কিন্তু আচার আচরণে প্রায় পাঠান। তিনি আবল্য গৃহপলাতক। জাহাজের খালাসী হয়ে তিনি ঘুরেছেন ইউরোপ, এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ায়। নিঃস্ব ব্যক্তি বলে আমেরিকার বন্দরে তিনি নামতে পারেননি। ব্যাঘ্র শিকারে তিনি পটু, তবে ব্যাঘ্র একবার তাঁকে শিকার করেছিল। ফলে সেই নরখাদকের নখরের আঁচড়ে আজও তাঁর মুখখানা খতচিহ্নলাঞ্ছিত। প্রকাশ, জনৈক পাঠান সর্দার একদা মল্লযুদ্ধে মজুমদার সাহেবকে আহ্বান করে এবং সেই যুদ্ধে মজুমদার জযলাভ করার পর পাঠান সর্দার সদলবলে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। এই অমিতশক্তিশালী মজুমদার যখন গল্প শোনাচ্ছিলেন, দেখলুম তাঁর সামনের গোটা তিনেক দাঁত নেই। মিঃ ঘোষ সহাস্যে বললেন, তিনটে দাঁতের তিন টুকরো ইতিহাস! সে সব কাহিনী শুনতে গেলে আপনার লান্ডিখানা অভিযান অসমাপ্ত থেকে যাবে!

সরাইখানার দিকে অগ্রসর হলুম। পিছন থেকে উটের দল আসছে এগিয়ে ধুলো উড়িয়ে। অলস মধ্যাহ্নরৌদ্র সেই ডিং-ডং ডিং-ডং ঘণ্টা বেজে চলেছে। কেমন যেন ক্লান্ত উদাস সুর। কিছু স্বপ্ন জড়ানো, কিছু বৈচিত্র্যের আভাস মাখানো। ঘেরাটোপের মধ্যে আছে আফগানী মেয়ের কালো-কালো সুর্মাটানা চোখ। ওরা এসে আজকের মতো সরাইতে বিশ্রাম নেবে।

সরাই তাদের জন্য যারা হিন্দুস্তানে অর্থাৎ ভারতের দিকে যাবে। তোরণের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালুম। নবাগত যাত্রীদের চোখে আমরাও অদ্ভুত জীব। আমাদের দেহ কোমল, হ্রস্বকায়, মুখে আমাদের ভারতীয় ছাঁদ,—যাকে বলে দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়,— আমাদের চেহারায় নধর পেলবতা, ওদের একখানা হাতের মোচড়ে আমাদের হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে

যায়। সুতরাং 'গালীভাররা' চেয়ে রয়েছে আজব 'লিলিপুটেদের' দিকে। আমরা বিচিত্র জীব। ওরা আমাদেরকে মুঠোর মধ্যে পেলে পুতুলের মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে পারে।

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখি বন্য পাঠান আর তুর্কি নরনারীর সমাগম। একদল উট দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে। এধারে রক্তাক্ত মুরগি বালুর ওপর শোয়ানো, ওধারে মরা বাছুরের ছালসুদ্ধ পাঁজর। ভেড়া জবাই হয়েছে, তখনও তার পা নড়ছে। কাঠের আগুনে মাংস পোড়ানো হচ্ছে। পুঁটলী থেকে বেরোচ্ছে মোটা মোটা রুটি শক্ত সিটনো। তামাকের গড়গড়া নিয়ে বসেছে কয়েকটি লোক। মেয়েরা ধরেছে সমরখন্দ থেকে আনা চরসের ছিলিম। রক্তমুখী সুশ্রী মেয়ের কালো ঘোমটার ভিতর থেকে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে চরসের রসে টসটসে। এই সরাইকে মনে করে একদা একটি কবিতা রচনা করেছিলুম।

পাহাড়ের অতিকায় প্রেতাত্মারা
সারি সারি চলেছে দুর্গম নিরুদ্দেশ;
যেন ছিন্নমস্তার আলুলিত ধূসর জটাদল।
ঝামা আর পাথরের স্তূপাকার—
বিবর্ণ, বোবা, তৃষ্ণার্ত,
যেন নিঃশব্দ বিভীষিকার সঙ্কেত।
নেই ছায়াপথের স্বপ্ন,
নেই অরণ্যের নীলাভ স্নেহ।
বালুপথে হারানো প্রাচীন কোনো
পিপাসার্ত জন্তুর কঙ্কাল,—আর
হয়ত কোনো দুঃসাহসিকের শোচনীয়
জীবন-মরণের
করুণ অবশেষ।
শুধু তপ্ত হাওয়ায় আর বালুর কণায়।
শত শত মরুপ্রেতিনীর আর্তনিশ্বাস
গুহায় গুহায় ফিরে বেড়ায় নিভৃতে।

রুদ্রজ্বালা কর্কশ পাথর আর
কাঁকরের ভীড় পেরিয়ে
হারিয়ে গেছে দূরান্তরে
পামীর আর পূর্বতুর্কিস্তানের মৃত্যুপথ।
তাক্‌লা-মাকান্, খোটান্ আর
ইয়ারখন্দ্ নদী যে-অজানায়—
দিগন্তলীন মরুপাথরের স্তবকে স্তবকে
যে পথ অবসন্ন, মন্থর, ভীতগতি।
সেই পথের উপরে
অতিকায় নরখাদকের মরা চোখের মতো
বিবর্ণ আকাশ।
ভারতবর্ষের উপান্তে প্রথম পান্থশালা।
দুর্গম পেরিয়ে আসা ক্যারাভানের দল,

আর দম্‌কা বালুর তাড়নায়
আরণ্যক কাবুলীরা সেখানে আশ্রিত।
তারা পিঙ্গল-নীল চোখে চায়
নিরুদ্দেশ পথের সন্ধানে।
লোলজিহ্বা মরুপথে
দ্বাদশ সূর্যের জ্বলজ্জ্বালা।
তারা উদ্‌ভ্রান্তে খোঁজে ভারতের প্রাচীন তোরণ।

লোহার শিকলে বাঁধা
চিম্‌টার ঝণঝণায়
আর কাঠের গড়্‌গড়ায়।
কাঁচা তামাকের বিযাক্ত ধোঁয়ায়,
তারা বোনে দিবাস্বপ্ন
সুন্দর ভারতের,
অরণ্যময় হিন্দুস্তানের,
নিমীলিত বন্য-চোখে।
উটের গলায় ঘণ্টার করুণ ধ্বনি
দূর থেকে দূরান্তর—অলস আর উদাস—
মরুপথে দোলে মধুর মায়া।
পান্থশালায়—
এখানে ওখানে ছড়ানো মরা ভেড়া
আর কচি তিতিরের রক্ত,
আর বাছুরের রাং—
জটপাকানো রক্তে আর কোনো জন্তুর
স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড।
জ্বলন্ত সূর্যের লেহনে বাষ্প কেঁপে ওঠে
রক্তচ্ছটায়, কপিশ নীলাভায়।
ওধারে বাসি হাড়ে, পোড়া মাংস,
চামড়া আর হিঙের গন্ধ
কুণ্ডলী পাকায়।

তার পাশে কালো বোরখার আড়ালে
রক্তগোলাপ,—কাবুলীমেয়ের উজ্জ্বল কৌতূহল,
এধারে কুক্‌রির ফলকে বক্‌রি জবাই।
ময়লা জরি আর রেশমী পাগড়ি
আর শালোয়ারপরা তরুণ পাঠান—
বর্বর হাসিতে হিংস্র চোখ।
সে-চোখ একদিন হিন্দুস্তানের মাধুর্য পাবে।
এখন সে-দৃষ্টিতে অনাবিষ্কৃত দেশের আদিম ভাষা।
একপাশে খান্‌ গোনে আফগানি আসরফি।

সভ্যতার স্বাদ নেবার আগে ওরা,—
বন্য কাবুলী আর অসভ্য তাতার
আর বোরখাবাসিনী রহস্যময়ী—
ওরা সবাই বিশ্রাম নেয়
কৌতূহল আর ক্লান্তিতে, নিরুদ্বেগ সরাইখানায়।
—শ্রান্ত ক্যারাভানের মধুর অবসাদ।*

রেলপথটি চলে গেছে লাণ্ডিখানার দিকে, সেখানেই পথের শেষ। এখান থেকে মাইল চারেক। কিন্তু বিনা ছাড়পত্রে সেখানে যাওয়া যায় না। পথ বড় বন্ধুর, পানীয় জল নেই কোথাও, খাদ্যও নেই। দু'ধারে এখানে ওখানে কাঁটালতার ঝোপ, এতটুকু আশ্রয় নেই কোথাও। কিছুদূর গিয়ে বাঁকা পথে রেলপথ পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হয়ে যায়। উত্তরে বহুদূর গেলে কাবুল নদী, তারপর কাফ্রীস্তান। হিমালয় এখানে স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণ নেমে এসেছে হিমালয় নানা শাখাপ্রশাখায়, তারই সঙ্গে ব্যবধান রেখে দক্ষিণ হিন্দুকুশ অন্তহীন দিগন্তলোক আচ্ছন্ন করে রয়েছে—তারই মাঝখানে এই জনশূন্য তৃণশূন্য জলশূন্য লাণ্ডিখানার পথ। সেই ভীষণ ভয়াল মরুপ্রস্তরময় চিরনির্জন উপত্যকায় দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে।

কোন দ্রষ্টব্য বস্তু নেই লাণ্ডিখানায়, এমন কি রেল স্টেশনের চিহ্নও নেই। আছে কেবল এপারে আর ওপারে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারা। মাঝখানে একটি প্রণালী, সেইটেই হলো সীমান্ত আর আফগানিস্তানের সীমানা,—ডুরান্ড লাইনের তথাকথিত বাঁটোয়ারা। দুইয়ের মাঝখানে কাঠের সীমানাপোস্ট, ইংরিজী ভাষায় সীমানার সঙ্কেত!

কিন্তু এখানে—ঠিক এইখানে, এই প্রণালীর ধারে, এই দুর্গম বন্ধুর বালুপাথরের পথের কিনারায় পরবর্তীকালে আধুনিক ভারত পুনরায় তার বিচিত্র নাটকীয় ইতিহাস রচনা করে গেছে। সমগ্র বিশাল অবিভক্ত ভারতের পুণ্যতীর্থসঙ্গমক্ষেত্র হয়ে দেখা দিয়েছিল এই অতি ক্ষুদ্র লাণ্ডিখানার সীমানা-প্রণালীটুকু। বেশী দিনের কথা নয়। জনাব জিয়াউদ্দিন নামে একজন সুদর্শন অভিজাত এবং বধিরকর্ণ তীর্থযাত্রী জনৈক সঙ্গীসহ এই পথ পেরিয়ে যেদিন ছদ্মবেশে কাবুলের দিকে তীর্থযাত্রা করলো সেদিন থেকে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস দুশো বছর পরে আবার পাল্‌টে গেল। তীর্থযাত্রা যিনি করেছিলেন তিনি বধিরকর্ণ জিয়াউদ্দিন নন্, তিনি ছদ্মবেশী নেতাজী সুভাষচন্দ্র!

উপত্যকায় আর গিরিগহ্বরের আশে পাশে অন্ধকার ঘনাচ্ছে। হেমন্ত শেষের আকাশ হয়ে এসেছে অবেলার রৌদ্রে রক্তিম। হাতপা-গুলো ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে আমাদের বন্দুক নেবার সুবিধা থাকলেও সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। মৃত্যু অথবা হত্যাকাণ্ড ঘটলে এদিকে পুলিশের তদন্ত বড় একটা হয় না। এখানে হত্যার বদলে হত্যা,—তা নিয়ে মামলা কিছু নেই। তবে কিনা হত্যা করা অপেক্ষা হত্যা হওয়া এ অঞ্চলে বেশী সহজ। পেশাওয়ারের পর থেকে এইটেই রীতি।

অতএব বেলাবেলি পাহারাদারদের সহযোগে লাণ্ডিকোটাল থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বন্ধুরা বিদায় অভিবাদন জানালেন। অন্ধকার গুহাগহ্বর পেরিয়ে পাহাড়ের জটিলতা অতিক্রম করে গাড়ি চললো শাগাই আর জমরুদ ছাড়িয়ে পেশাওয়ারের দিকে।

---

* অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বৈজয়ন্তী' মাসিক পত্রিকায় এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। (১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মায়াপুরী হরিদ্বার

ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই হরিদ্বার। সেই হরিদ্বার—তিন হাজার বছর আগেকার। পরিব্রাজক হুয়েন সাং মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিলেন হরিদ্বারকে দেখে। এখানে তিনি বাস করে গেছেন বহুকাল। এটা কিন্তু আমারও বিশ্রামের জায়গা। এখানে এসে পৌঁছলে গায়ে হাওয়া লাগে, ধীরে ধীরে তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে আসে। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ কর, সমস্ত হিমালয় ছুটে বেড়াও আত্মতাড়নায়—কপাল বেয়ে ঘাম ঝরুক, মুখ দিয়ে ফেনা পড়ুক, মালিন্যময় হোক সর্বাঙ্গ, নিগ্রহ-পাণ্ডুর হোক দেহ,—কিন্তু ফিরে এসো হরিদ্বারে। সুশীতল ওর জলে নবজন্ম, ওর মধুর হাওয়ায় দেহমন স্নিগ্ধ। অত্যন্ত পুরনো সেই হরিদ্বার, কিন্তু ওর নূতনত্ব কাটে না। আমিই যেন ওকে দেখছি হাজার হাজার বছর থেকে—দেহ থেকে দেহান্তরে—এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। তবু নতুন। নিবিড়ভাবে নতুন। মৃতসঞ্জীবনী সুধার মতো ওর নীলজলের স্বাদ। ও যাদু জানে।

যাদু জানে বলেই হরিদ্বারের আদি নাম হলো 'মায়া'। শক্তি ওর মোহিনী,—তাই ইন্দ্রজাল বোনে প্রতি মানুষের মনে। সেই ইন্দ্রজাল—যাকে বলে 'ইলিউশ্যান্'—সেই বস্তুর আকর্ষণ অচ্ছেদ্য। একবার যে হরিদ্বারে গেছে, দ্বিতীয়বার যাবার জন্য তার আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখেছি। একেই বলে মায়ার খেলা। ভক্তরা সেইজন্য ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন মায়াদেবীর মন্দির, তার থেকে মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই মায়াপুরীর সন্ধিস্থল। অনেকবার মনে করেছি যে, হরিদ্বারকে দেখবো পুঙ্খানুপুঙ্খ, কিন্তু বত্রিশ বছর ধরে আনাগোনা করেও সেই দেখা আর হয়ে ওঠে না। হাতের কাছেই ত কলকাতার কালীঘাট, কিন্তু উৎসাহ কম। কাশী গেলেই ত বৈঠকখানা,—অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথকে দেখিনি কতদিন, মনেই পড়ে না। এলাহাবাদে আনাগোনা করি যখন তখন। কিন্তু ওই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ত্রিবেণী পড়ে থাকে, পড়ে থাকে ওই প্রয়াগ দুর্গের তলায় অক্ষয়বট। হরিদ্বারও ঠিক তাই। ওর পথে ঘাটে যখন কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় জ্বল্‌তো তেলের আলো, আর অন্ধকারে এখানে ওখানে হাঁটতে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তুম,—তখন ছিল ওই মায়াপুরী রোমাঞ্চকর। কত লোক বলে, কপিলমুনি এখানে বসে তপস্যা করতেন—এই গঙ্গার ধারে, সে নাকি কঠিন তপস্যা। সুতরাং মায়াপুরীর সঙ্গে হরিদ্বারের আরেকটা নামও জড়ানো আছে, সে হলো কপিলস্থান। কত লোক আসে এখানে কত দেশ দেশান্তর থেকে। তারা দেখে বেড়ায় সূর্যকুণ্ড আর সপ্তধারা, গৌরীকুণ্ড আর পিছোড়নাথ, ভৈরব আর নারায়ণশিলা। ঘাটের ঠিক ধারে যে মন্দিরটি দেখে আসছি এতকাল ধরে, ওর মধ্যে নাকি আছে শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন। আর মায়াদেবীর মন্দির, সেও এক দৃশ্য। দেবী হলেন চতুর্ভুজা দুর্গা, ত্রিমুণ্ড করাল মূর্তি। তাঁর এক হাতে মানবজাতির প্রতি অভয় আশীর্বাদ, অন্য হাতে মহাচক্র, তৃতীয় হাতে নর-কপাল, চতুর্থ হস্তে ত্রিশূল। ওর ব্যাখ্যা জানিনে; জানবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু এ কথা জানি, সমস্ত মূর্তিটি অর্থহীন নয়—ওর মধ্যে কথা আছে, আছে তত্ত্ব, আছে রহস্য। কতদিন ঘুরে

এসেছি ওই বনচ্ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত বিল্বকেশ্বর মন্দিরে, কিন্তু কোনদিন একথা আলোচনা করিনি, ওটার প্রকৃত নাম বিল্লোকেশ্বর, অথবা 'বিল্লকেশর'। কিন্তু পথঘাটের কোলাহল থেকে দূরে ওই মন্দিরটির পরিপার্শ্বে পিপল অশ্বত্থের আবছায়ার তলায় লতাগুল্ম গাঁদা ও সন্ধ্যামণির ঝাড়ের গায়ে প্রাচীন শিবমন্দির—ওরই কাছে গিয়ে পাথরের শিলায় বসে আমার কত প্রভাত গিয়ে মিলেছে মধ্যাহ্নে, কত অপরাহ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে গেছে সন্ধ্যার কোলে। যাত্রীরা এসেই ছোটে হয়ত বীল্লোকেশ্বরে কিংবা কন্‌খলে, কিংবা পঞ্চমুখ-অষ্টবাহু, সর্বন্নাথ শিবদর্শনে। কতদিন ভেবেছি মায়ামন্দিরের বাইরে ওই যে মহাসিদ্ধ বোধিসত্ত্বের মূর্তি,—হয়ত ওরই নাম বিশাল ভারত। অমনি নিমীলিত নেত্র, অমনি তপস্বী, অমনি জ্বরাব্যাধিবিকারহীন অনাদ্যন্তকালের ভারত,—কল্প-কল্পান্তের সমস্ত পতন-অভ্যুদয়ের আদিসাক্ষ্য ভারত।

কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই, হরিদ্বারে এলে আমার ঘুম পায়। এখানে অবকাশ অনন্ত বলেই এত ঔদাসীন্য। এখানে কোন কাজের চাকা ঘোরে না, কেবল পূজার প্রহরের গম্ভীর মধুর ঘণ্টা বেজে বেজে থেমে যায়। সেই আওয়াজ ওই খরস্রোতা নীলধারার ওপর দিয়ে বহু দূর দূরান্তরে হিন্দু দর্শনের বার্তা ঘোষণা করে,—যেদিকে মর্ত্যলোক, যেদিকে দেবতার চেয়ে মানবতার দাম বেশী, জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানের, আনন্দের চেয়ে আহ্লাদের। চলে যায় সেই আওয়াজ পাহাড় থেকে পাহাড়ে, মনসা থেকে চণ্ডী, মায়াবতী থেকে কন্‌খল, লালতারাবাগ থেকে গুরুকুল। আমি গা এলিয়ে পড়ে থাকি ওই শ্রবণনাথ ঘাটের পাশে অশ্বত্থের তলায় রক্তবরণ ঘাটের পাথরের সিঁড়িতে,—ওখানে জলস্রোতের ধারে কম্বল বিছিয়ে শুলে পৃথিবীর সমস্ত ঘুম এসে আমার দুই চোখের পাতা জড়িয়ে ধরে। ওই জলস্রোতের তলায় আছে কিছু একটা ভাষা, কিছু একটা কাব্যের ব্যঞ্জনা; সেটা এত ঘন, এত নিগূঢ়—কিছুটা যেন তার উপলব্ধি করি, কিছু বা তার দুর্বোধ্য। বত্রিশ বছর ধরে শুনেছি ওই কলস্বনা জাহ্নবীর মর্মের ভাষা,—আজও বুঝতে পারিনি। আজও জানতে পারিনি, সে-মন্ত্র কেন আমার রক্তে এমন করে ভেসে বেড়ায়।

সেই হরিদ্বার আজ নেই। সেই পাথরে হোঁচটখাওয়া পথ, সেই ছোট খোলা স্টেশন, আশে পাশে পাহাড়ি গুহাগর্ভে স্থানীয় লোকের বস্তী,—সেই অগণ্য গেরুয়াধারী সাধু-সন্ন্যাসীর ধুনিজ্বালানো আসন এখানে-ওখানে-সেখানে। সেদিনকার হরিদ্বারের প্রাকৃত রূপের সঙ্গে দারিদ্র্যটা যেত মানিয়ে। একটি দুটি পয়সায় প্রচুর সুযোগ সুবিধা মিলে যেত। অন্নসত্র ছিল অবারিত। আহার ও আশ্রয় বিনামূল্যে—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জুটে যেত। কে খাওয়াতো, কে জায়গা দিত, তামাকের আসরে কে ডেকে নিত, কেমন করে জুটে যেতুম কথকের আসরে, কোন্ সাধুর হাত থেকে ভস্মতিলক পাবার লোভে কেমন করে তার পায়ের কাছে ভক্ত হনুমানের মতন বসে যেতুম—সে সব কথা এখন আর ওঠে না। সে মন নেই, সেই আবহাওয়া নেই, সে-হরিদ্বার নেই! এখন গেলে প্রথমে চোখে পড়বে বিড়লা সাহেবের অত উঁচু ঘণ্টা ঘড়ি, ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝপথে নেতাজী সুভাষের প্রস্তরমূর্তি! রাস্তা-ঘাট পিচঢালা, বিজলী বাতির ছয়লাপ, মহাদেবের জটানিঃসৃত গঙ্গার আলোকিত ফোয়ারামূর্তি পথের মাঝখানে। সর্বভারতীয় লক্ষপতিদের তৈরী শতাধিক প্রাসাদ! হাল আমলের স্নানাগার, মার্বেল পাথরের দালান, অসংখ্য মোটরযান, সিনেমা হাউস, রেডিয়ো যন্ত্রে বোম্বাই প্রেমের রসতরঙ্গ সঙ্গীত। সাধু-সন্ন্যাসীরা বহু পালিয়েছে, তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছে পাঞ্জাবের কামিনীকাঞ্চন। গাঁজা-চরসের ধোঁয়া নেই কোথাও, তার

বদলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বোতলে ভরা ঘোলা জল। কথকের আসর উঠে গেছে, দর্শনতত্ত্বের সভা গা-ঢাকা দিয়েছে; ভেট-ভোজনের রেওয়াজ উঠে গেছে,—তারা সব এখন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে রাজনীতির ধাক্কায়। দুধ-মালাইয়ের দোকানের আশে পাশে এখন চা ও কফি পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। ঠাকুর আর মন্দিরের পট উঠে গেছে, তার বদলে কোটপ্যান্ট পায়জামা আর চুড়িদার পরা মেয়েপুরুষ কোডাকের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ধর্মান্বেষী অপেক্ষা এখন স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড় ওখানে। আগে পাওয়া যেত উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক পুরি, এখন দাল্‌দার চপ-কাট্‌লেট। মাছ, মাংস, ডিম—কেউ খায় না হরিদ্বারে। কিন্তু পেঁয়াজটা চালু আছে। আর জোয়ালাপুর যখন হাতের কাছে, তখন সেখান থেকে গোপনে মাছ-মাংস-ডিম এনে যে কোনো ধর্মশালার বন্ধ ঘরের মধ্যে বিনা পেঁয়াজে রাঁধলে কেই বা জানছে? সেই হরিদ্বারের হাওয়ায় চন্দনের গন্ধ আর পাওয়া যায় না।

এগুলো মন্দ কি ভালো—এ আলোচনা থাক্। কিন্তু এগুলো সময়-কালের তরঙ্গাঘাত, সুতরাং মানতে হবে। মানুষ বদ্‌লেছে, সুতরাং হরিদ্বারও বদলাবে বৈ কি। মনসা পাহাড়টা উড়িয়ে দিতে পারলে বর্ষার সময় হরিদ্বার কিছু নিরাপদ হয়, হয়ত কর্তৃপক্ষ একদিন একথা ভাবতে বসবে। এখানকার ঘাটে ঘাটে যে লক্ষ লক্ষ মাছ ঘুরে বেড়ায়—এই মাছ চালান দিলে রাজ্যের প্রচুর আয় বাড়তে পারে, হয়ত একথা লোকের মাথায় ঢুকবে একদিন। সম্ভবত সেদিন বেকার সাধুসন্ন্যাসীরা কাজ পাবে, মন্দিরের মধ্যে মাইনে করা পুরোহিত বসবে, ধর্মশালারা মেহনতি জনতার কোয়ার্টারে পরিণত হবে। এই ত সেদিন কন্‌খলে গিয়ে দেখলুম—দক্ষঘাটের সর্বনাশ। বট-অশ্বত্থের তলায়-তলায় যে নীল জলস্রোত ছুটে যেত প্রমত্ত তুরঙ্গদলের মতো, সে-জলের চিহ্নও নেই। ঘাট শুক্‌নো। তলা থেকে পাথর বেরিয়েছে, সামনে পচা বদ্ধজলা, ওপারে বালুপাথরের ডাঙা। পাণ্ডারা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—না আছে দক্ষঘাটের মহিমা, না আছে সেই প্রাচীন দিনের উদাসী হাওয়া। ভাগ্য ভালো, দাক্ষায়নী বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির এই দুর্দশা দেখে আরেকবার দেহত্যাগ করতেন! পাণ্ডারা বললে, হরিদ্বারের গঙ্গাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এদিকে স্রোতের ধারা ছেড়ে দেওয়াটা এখন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। অতএব কন্‌খলে প্রাণরস অনেকটা গেছে শুকিয়ে। জলের সঙ্গে আসে জীবনের চাঞ্চল্য, তাই প্রবহমান জলধারার ধারে ধারে জনপদ গড়ে ওঠে, মন্দিরে লোকে পূজা দেয়, সংসারযাত্রা হয় ক্রিয়াশীল। আজও সেই দক্ষপ্রজাপতির মন্দিব বৃক্ষচ্ছায়াময় তপোবনে রয়েছে দাঁড়িয়ে, সেই রয়েছে দুর্গপ্রাকারে ভগ্নাবশেষ, সেই পথের সামনে রয়েছে বাঙালী পরিচালিত নাগেশ্বর মন্দির—কিন্তু ঘাটে জল নেই, তাই কোথাও রস নেই! মনে হচ্ছে যেন একটা জগৎজোড়া বিশালকায় বৈজ্ঞানিক দৈত্য—যার নাম আধুনিক—সে যেন দিক-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে এগিয়ে আসছে। সে গ্রাস করবে সব! বিজ্ঞানের শাসনে মনুষ্যজাতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

মোতিবাজার ছাড়িয়ে ভীমগোড়া পেরিয়ে সন্ধ্যার দিকে একা একা যেতে একদিন ভয় করতো, লালতারাবাগের সেই অশ্বত্থতলার গঙ্গার ধারটা ধরে নিরঞ্জনী আখড়ার পাশ দিয়ে একদিন একা একা মায়াপুরীর পথ পেরিয়ে যেতে সাহস হোত না। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন সবটা সহজ, আলোকমালায় সুসজ্জিত। হৃষিকেশের রাস্তাটায় ছিল দেরাদুন উপত্যকার ঘনগভীর অরণ্য,—আজও অনেকটা আছে,—কিন্তু ওই পথে বেরিয়ে দিনমানেও গা ছমছম করতো—কেউ বলতো বাঘের উপদ্রব, কেউ বা বলতো

ডাকাতদলের হানাহানি। আজ আর ও রাস্তায় এসব কথা ওঠে না। আগে ছিল হাঁটা, পরে হলো টাঙ্গা, এখন মোটর। মোটর বাস এখন ধুলো উড়িয়ে অবিশ্রান্ত আনাগোনা করে, সাধু-মহন্তরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। দুঃসাধ্য পথ এখন হয়ে গেছে সহজসাধ্য, অগম্য অঞ্চলই এখন অনেকের গন্তব্যস্থল। আগে হৃষিকেশ থেকে বেরিয়ে কেদারনাথ হয়ে চামোলি পৌঁছতে লাগতো প্রায় বাইশ দিন, এখন লাগে একদিন আর একবেলা—অবিশ্যি কেদারনাথ আর রুদ্রপ্রয়াগ বাদ দিয়ে। চেষ্টা করলে রেলস্টেশন থেকে বদরিনাথ এখন মাত্র পাঁচ দিনে পৌঁছানো যায়।

চেষ্টা করেছি আধুনিক মন নিয়ে হরিদ্বারে বসে থাকবো। কিন্তু সম্ভব হয়নি। এক ফোঁটা হিন্দুরক্ত গায়ে থাকলেই ওটা যেন পেয়ে বসে। অবিশ্বাসীকে একবার থমকে দাঁড়াতে হবে, শ্রদ্ধাহীনকে ভাবতে হবে আরেকবার। সমস্ত আধুনিক উপকরণ সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার অথবা হৃষিকেশে গিয়ে পৌঁছও, ক্রমশ দেখবে সেগুলো তোমার কাজে আসছে না। পোশাক আর পরিচ্ছদের বাহুল্যটা বেমানান লাগছে, প্রসাধন বিলাসটা অর্থহীন মনে হচ্ছে, ভোজনের বিস্তৃত আয়োজনটায় যেন অরুচি আসছে,—আমিষের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছে। পেলে হয়ত খাই, না পেলেও ক্ষতি নেই। তুমি যদি সমস্ত একে একে ত্যাগ করো,—উৎকৃষ্ট ভোজন, আরামদায়ক বাসস্থান, মূল্যবান পোশাক, প্রচুর সম্ভোগের সুবিধা, শরীরকে নিত্য পরিচ্ছন্ন রাখার আয়োজন,—এবং সব ছেড়ে যদি অত্যন্ত দীন-দরিদ্রের মতো পথে পথে বাসা বেঁধে বেড়াও—কেউ প্রশ্ন করবে না। কেননা তোমার এ চেহারাটা এখানকার সঙ্গে মিলবে। বরং বিপরীতটাই মেলানো কঠিন। অনেক রংমাখা পাউডার বুলানো রেশমী মেয়েকে দেখেছি ওখানে পথের ধারে বসে হাসিমুখে বাসন মাজছে,—এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাদের একটুও দেরি লাগে না। আমার মনে পড়ছে, শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবীকে, তিনি একজন বিদুষী লেখিকা। কবিতা ও কাহিনী রচনায় একদিন বেশ নাম হয়েছিল তাঁর। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু তাই বলে কথায় কথায় ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা ঠুকে বেড়ানো তাঁর ধাতে ছিল না। দিল্লী থেকে এসে যেদিন তিনি নামলেন হরিদ্বার স্টেশনে, সেদিন থেকে চটি জোড়াটা আর পায়ে দেননি। পাথর ফুটেছে পায়ের তলায়, হোঁচট লেগে রক্ত বেরিয়েছে, ঠাণ্ডায় কত কষ্ট পেয়েছেন,—কিন্তু যে কদিন ছিলেন, একটি কথাও বলেন নি। অনুযোগ জানালে তিনি নম্র হাসি হেসে বলতেন, জুতো পায়ে দিতে নিজের কাছেই লজ্জা করে! অনভ্যস্ত হাতে রান্না করেছেন, সাবানপ্রসাধন 'শাওয়ার-বাথ' ছেড়ে তিনি লোহার শিকল ধরে গঙ্গায় ডুব দিয়েছেন, কিন্তু একটিবারও নিরুৎসাহ বোধ করেন নি। শুধু এক এক সময় সানন্দে বলতেন, দিল্লী-কলকাতা হলে নিজের এসব আচরণ ভাবতেই পারতুম না। এখানে এলে কিচ্ছু ধরে রাখা যায় না।

মিথ্যা নয়, শ্মশান বৈরাগ্যটাই এখানে মনের ওপর চেপে বসে। ওটা অদ্বৈতবাদের সংস্রব কিনা, ঠিক আমি জানিনে। কিন্তু হরিদ্বারের হাওয়াটা উত্তরের,—দেবতাত্মা হিমালয়ের হাওয়া! যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও সম্পদ—এগুলো প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিই কামনা করে। কিন্তু এখানে এলে ওদের দাম কমে আসে। ওরা দ্বারের বাইরে পড়ে থাকে, কেননা এটা হরিদ্বার। ওদের নিয়ে প্রত্যহের যে কচ-কচি,—এখানে এলে তা তুচ্ছ, এখানে এলেই তারা শান্ত। যেটা অত্যন্ত দরকারি, সেটাই এখানে হাস্যকর। যে বস্তুটা কলকাতায় না হলেই চলে না, সেটার কথা এখানে মনেই পড়ে না। হরিদ্বার থেকে চলে যাও দিল্লীতে,

অমনি ইচ্ছা হবে মন্দোদরীর পাশে সীতাকে বসাও, লঙ্কা হোক স্বর্ণচূড়াময়, ত্রিভুবনের উপর প্রতিপত্তি হোক, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত আমাকে ভয় করুক—আমার সমস্ত সাধ পূর্ণ হোক। হরিদ্বারে কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, আছে স্তব্ধ শান্ত ধ্যানমৌন আনন্দ। এখানে সমস্তটা জড়িয়ে যেন একটি স্তব, একটি ওঁকারধ্বনি,—একটি অখণ্ড মহাকাব্য। যত পৌরাণিক কাহিনী আছে বলে যাও,—বিশ্বাস করবো। যত দেব-দেবতার অবাস্তব আজগুবী রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে—সমস্ত মেনে নেবো। কেননা তাদেরকে এখান থেকে যেন দেখতে পাচ্ছি! এই তাদের লীলানিকেতন, এই দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে। দেখতে পাচ্ছি ভগীরথ গিয়েছিলেন এই পথ দিয়ে, এই পথে এগিয়ে গেলেই কর্ণপ্রয়াগে দাতাকর্ণের তপস্যার সঙ্গম। এই পথ দিয়ে সূর্যবংশাধিপের যাত্রা, এই পথই হলো পাণ্ডবদের। কিচ্ছু অবিশ্বাস করবো না, কারণ এটাই হলো মায়াপুরীর মায়াজাল।

কখনও অসময়ে গিয়ে পড়েছি হরিদ্বারে। থম্‌কে দাঁড়াতে হয়েছে। চারিদিকে নিঃঝুম নির্জনতা। প্রভাতে মধ্যাহ্নে রাত্রে শুধু বেগবতী গঙ্গার দুরন্ত জলপ্রবাহের আওয়াজ। পথে পথে ঘুরে দেখেছি সমগ্র হরিদ্বার তন্দ্রাচ্ছন্ন। ধর্মশালার সিঁড়ির তলা দিয়ে পেরিয়ে গঙ্গায় গিয়েছি, জনহীন মন্দিরের চত্বরে গিয়ে পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছি,—কী যেন নিগূঢ় আশ্চর্য গন্ধ পাথরে পাথরে। কানে কানে কী যেন কথা হয়, কী যেন বীজমন্ত্র জপ করে। পাহাড়ের উপর থেকে চেয়ে থেকেছি, প্রাণীজগতে কোথাও যেন গতিবেগ নেই, চাকা ঘুরছে না, ঘড়ির কাঁটা চলছে না। যতদূর দৃষ্টি চলে একটা উদাসীন অধ্যাত্ম শান্তি ছড়ানো, তার চাঞ্চল্য নেই কোথাও। হয়ত এইটিই ভারতের সত্য পরিচয়। এই শান্তিকে আহত করতে চেয়েছে কত যুগের কত জাতি, কত সভ্যতা, কত দস্যুতা। সাময়িক কালের সেই তরঙ্গাঘাতে হয়ত এই মহাপ্রাচীন ঐতিহ্যের তন্দ্রা ভেঙেছে, দুই চোখে হয়ত জ্বলেছে রুদ্রবহ্নি, হয়ত বা তার তাণ্ডব নর্তনে অসুরের হৃৎকম্প দেখা দিয়েছে—তারপরে আবার ভারতের নিমীলিত নেত্রে এসেছে শান্তি, এসেছে ধ্যানবুদ্ধের অধরে প্রসন্ন স্মিতহাস্য। ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসেছে সেই অনাদি প্রাচীনের চিরনবীন ধারাবাহিকতা। ওই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি, আমার শিরা উপশিরার রক্তের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে সেই তিন হাজার বছরের ইতিহাস। ঝড়ে আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়েছি, অপমানে লুণ্ঠিত হয়েছে মাথা, হিংস্র অসুরের দংষ্ট্রাঘাতে ছুটেছে কত রক্তধারা, বেদনায় আড়ষ্ট হয়েছে সর্ব অঙ্গ, যন্ত্রণায় অশ্রু গড়িয়েছে কত শত বছর,—কিন্তু আঘাতের পরিবর্তে আমি প্রত্যাঘাত হানিনি, হিংসা করিনি, মনুষ্যত্ব বোধের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটাইনি। আজ তিন হাজার বছর পরে সেই আমার সকলের বড় সান্ত্বনা। আমার ওই প্রাচীন বট-অশ্বত্থের কোটরে, ওই হিমালয়ের গুহা-গহ্বরে, ওই সুবিশাল সমতলের অসংখ্য প্রান্তরে, নগরে, জনপদে, নদীপথে, সাগরের বালুবেলায়, অরণ্যের বিজন ভীষণতায়—সংখ্যাতীত সভ্যতা এসে ছোট ছোট বাসা বেঁধেছে। তাদের অনেকে আজও আছে এই ভারত-পথিকের হৃদয়ের মধ্যে। যুগে যুগে তারা সঞ্জীবিত হয়েছে আমার প্রাণরসে।

ওই চণ্ডীর পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরচত্বরে দাঁড়িয়ে কতবার দেখেছি ভারতকে, দূর দক্ষিণে চলে গেছে আমার দৃষ্টি। এই আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই আমিকে। সে চলে গিয়েছে সমগ্র ভারত পরিক্রমায়। মানস সরোবরের থেকে গিয়েছে সিন্ধুনদে, গিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের পথে। সে জপ করে ফিরেছে গোদাবরী, বেত্রবতী ও রেবার উপকূলে পাথরের আসনে-আসনে। দৃষদ্বতীতে চন্দ্রভাগায় বিপাশায় যমুনায় গঙ্গায়—আর্যাবর্তকে

আলিঙ্গন করেছে সে কতবার। সে চলে গিয়েছে পূর্ণায় মঞ্জিরায় ভীমায় কৃষ্ণায় আর বেদবতীর তটে তটে। চলে গিয়েছে সে রামগিরি মধ্যগিরি কৃষ্ণগিরি পেরিয়ে কবরীর অববাহিকা ছাড়িয়ে সেতুবন্ধের দিকে ভারতের আদি সভ্যতার পথের চিহ্ন ধরে। সে-আমি কোথাও স্থির নয়, তবু নিত্য চাঞ্চল্যের মাঝখানেও সে শান্ত, সে উদাসীন, সে যোগাসীন। সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি রক্তপাত রাষ্ট্রবিপ্লব মহামারী শত্রুভয় অরাজকতা—সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের থেকে দূরে। সমস্ত সাময়িক চাঞ্চল্যের বাইরে, সকল উত্থান পতনের সীমান্তে। অনাদি অনন্ত ঐতিহ্যের ধারাবাহী সেই আমি এই ভারতের নিত্য পথিক।

পাহাড় থেকে নেমে এলুম। আপাতত একবার বিদায় নেবো। যোগতন্দ্রায় আত্মনিমজ্জিত থাক্ হরিদ্বার। আমার পায়ের শব্দে তার ঘুম না ভাঙে। মন্দিরে মন্দিরে পারাবতের ক্লান্তকণ্ঠে বৈরাগ্যবোধ অটুট থাকুক। নদী নির্ঝরের আবর্তে আবর্তে তার মূল মন্ত্র নিত্য উচ্চারিত হোক, সামগান-মুখরিত মুনি-কি-রেতীর তপোবনে ঋষির আশ্রমপ্রান্তে বন্য ময়ূরের কেকারব শাঁওনকে আহ্বান করুক,—আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি।

এই গঙ্গা চলুক আমার সঙ্গে, এই গঙ্গাকে চিনে চিনেই আবার আমি ফিরবো। আমি গাঙ্গেয়। এই হরিহরের দ্বার খোলা থাক্, এখানে থেকে আবার এরা সবাই ডাক দেবে। এই নীলধারা, মনসা-চণ্ডী, ওপারের অরণ্য, মায়াপুরীর আশ্রম, অশ্বত্থতলের এই রক্তবর্ণ প্রস্তর সোপান, হৃষিকেশ চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে ওই স্বর্গাশ্রম, ওই অন্তহীন টেহরী গাড়োয়াল ব্রহ্মপুরার পার্বত্য রহস্যলোক—-ওরা ডাক দেবে আমাকে আবার। আপাতত ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিদায় হই!—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুহাতীর্থ অমরনাথ

শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথির আর মাত্র দিন চারেক বাকি। কিন্তু গতকাল অপরাহ্ণ থেকে পহলগাঁওর আকাশ এদিকে ওদিকে মেঘময় দেখা যাচ্ছে, সমগ্র কাশ্মীরে এখনও বৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু বৃষ্টি ত দূরের কথা, আকাশে কোথাও মেঘের টুক্‌রো দেখলেই অমরনাথ-তীর্থের পাণ্ডারা মনে মনে উদ্বিগ্ন বোধ করে। ওই 'বাদলের' ছোট্ট টুক্‌রো থেকেই যাত্রীদের যত তকলিফ—এ তারা জানে।

শিখদের পরিচালিত পহলগাঁও হোটেলে আছি প্রায় স্বর্গসুখে। কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে একবারও থাকিনি, কিন্তু এর চেয়েও তার পরিবেশ কি ভালো? এমন নিজের দখলে সুসজ্জিত ঘর এবং ঘরের প্রত্যেকটি জানলায় আর বারান্দায় নিজের দখলে এমন হিমালয়,—তুচ্ছাতিতুচ্ছ গ্রাণ্ড হোটেল! আমাদের বারান্দাব সামনে লনের নীচে দিয়ে ছুটেছে নীলগঙ্গা,—যার বেয়াড়া নাম দেওয়া হয়েছে লিডার নদী। কাল থেকেই দেখছি নীলগঙ্গার ওপারে—ওই যেদিক দিয়ে চলে গেছে নিরুদ্দেশের পথ আমার হৃৎপিণ্ডটাকে সঙ্গে নিয়ে—ওই ছোট্ট মন্দিরের পিছনে সাধুর আশ্রমের গায়ে পাইনের ঘন অরণ্য উঠে গেছে ন' হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে—ওরই কোলে-কোলে শিশু মেঘেরা বাসা বেঁধেছে—যেন জননীর বক্ষলগ্ন। গত-কালও দেখেছি ওর উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে সহস্রধারায় স্বর্ণরক্তিম রশ্মিদল নেমে এসেছিল নীল গঙ্গায়, তখন সূর্যদেব পশ্চিম পর্বতের অন্তরালে নেমেছেন, লগ্ন গোধূলি, অদূরবর্তী কিষণজির মন্দিরে বেজে গেল আরতির ঘণ্টা---আর সনাতন ধর্মমন্দিরে তখন বেদমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—! তারপরে এলো ধীরে ধীরে ঘন সন্ধ্যার ছায়া—যেন বিরাট একটি শতদল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো। দেখতে দেখতে চটুল মেঘেব ফাঁকে নেমে এলো শুক্ল দশমীর দিকদিগন্ত হিমালয়-ভরা জ্যোৎস্না। ইতর জনতার ভিড় নেই কোথাও আশেপাশে। চতুর্দিকব্যাপী পর্বতমালার ফাঁকে এই পহলগাঁও অঞ্চলটুকু হলো একটি উপত্যকা। নানা ধারায় গিরিনদীরা নেমে এসে একটি ধারার সঙ্গে এখানে মিলে সেটিকে প্রশস্ত করে তুলেছে। পাইন অরণ্যের এমন বিশাল বিস্তার হিমালয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে না। দার্জিলিং শিলঙ মনে আছে। গুলমার্গ কিংবা কুলু উপত্যকা ভুলিনি। ভুলিনি মারী পাহাড় কিংবা কোহালার পথ। কিন্তু এখানকার পাইন অরণ্যের বিশালতার সঙ্গে কেমন যেন জড়ানো আছে এক রাজমহিমা; মন থেকে কেবল যে ভালো লাগে তাই নয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। শুক্লপক্ষের ভরা জ্যোৎস্না হিমালয়ে দেখেছি কত শত বার। এই জ্যোৎস্না ধরে বসে থেকেছি হৃষিকেশে কতবার—ওই যেখানে চক্রাকারে ঘুরেছে নীলধারা সগর্জনে, যার তীরে তীরে ঋষিকুলের তপোবন। এখানে তপোবন চোখে পড়ছে না, কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রির যাদুমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতমালায় আর নীলগঙ্গার অধিত্যকায়। দিনের বেলা স্পষ্ট ছিল পহলগাঁওর শোভা সৌন্দর্য। জলের ধার থেকে উঠে উপত্যকা পেরিয়ে পাইনের বন চলে গেছে পর্বতের দূর দূরান্তরে, যেমন তার সঙ্গে গেছে নিরুদ্দেশ

নীলগঙ্গা,--অতুলনীয় সে-দৃশ্য। কিন্তু জ্যোৎস্নালোকে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি হয়ে গেল মায়াপুরী। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি বাস্তব পৃথিবীর কঠিন প্রস্তরসঙ্কুল পথে, একথা ভুলেছি আমার অজ্ঞাতসারে---আমার সমগ্র অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে এই স্বপ্নলোকে,--চেতনার বিন্দু একেবারে নিশ্চিহ্ন! আশ্চর্য সেই জ্যোৎস্নারাত্রি।

আমি যাচ্ছিলাম অমরনাথে। মনে ছিল হিমালয়ের অভিনবত্বের লোভ। মন্দিরের বদলে এবার গুহা। বিগ্রহ নয়, প্রস্তর শিলা নয়,—একটা তুষার-আয়তন! ধীরে ধীরে সেটা নাকি চান্দ্রমাসের যোগ অনুসারে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই লিঙ্গ দর্শন করে এমনভাবে একদা সমাধিস্থ হন্ যে তীর্থযাত্রীদের অনেকে গিয়ে তাঁকেই অমরনাথ বলে ঠাওরান। সেটি মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আমল। আরও একটা বড় লোভ, এদিকের হিমালয়ের চেহারা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য। হিমালয় কখনও ধূসর, ঊষর, কখনও বর্বর, কখনও বা রুক্ষ। কখনও সে রুদ্রলোচন, কখনও বা নিমীলিতনেত্র। তাকে কখনও দেখলে জ্বালা করে চোখ, কখনও চোখ দুটো মধুর তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে। কখনও সে হিংস্র শার্দুলে ভয়াল ভল্লুকে অথবা উন্মত্ত হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনও সে গৈরিকবাস সন্ন্যাসীদলের তপোবনের প্রান্তে সামগানে মুখরিত। এখানে হিমালয়ের বিচিত্র চেহারা। সমগ্র কাশ্মীর এবং তার চতুর্বেষ্টিনী পর্বতমালার বহুলাংশ হলো মৃন্ময়, প্রস্তরময় নয়। এ চেহারা আমার কাছে নতুন। কাশ্মীর বড় কোমল—এত কোমল আগে মনে হয়নি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। এখান থেকে হিমালয়ের উত্তরদিকে বিস্তার শুরু হলো—সোজা উত্তরে। তিব্বতকে ডান দিকে রেখে উত্তর হিমালয় চলে গেছে কৃষ্ণগঙ্গা পেরিয়ে কারাকোরাম পর্বতমালা অর্থাৎ কৃষ্ণগিরির শেষ পর্যন্ত। আশে পাশে দেখছি অসংখ্য পায়েচলা পথ চলে গেছে উত্তরে ও পূর্বে। কোনোটা গেছে কোলাহাই হিমবাহের দিকে, কোনোটা লাডাকে, কোনোটা লিডারবৎ ছাড়িয়ে সিন্ধু উপত্যকায়; কোনোটা তিব্বতে, কোনোটা বা দক্ষিণ লাডাক হেমিস গুম্ফার দিকে—যেখানে যীশুখ্রীস্টের ভারতভ্রমণের সমস্ত তথ্য-প্রমাণাদি গুম্ফার মধ্যে আজও সযত্নরক্ষিত আছে। অনেক পথ অপ্রত্যক্ষ, সেগুলি পাহাড়ী গুজরদের করায়ত্ত। আমরা যেসব অঞ্চলকে আমাদের অভ্যস্ত সংস্কারের দিক থেকে দুঃসাধ্য ও অগম্য বলি, একজন স্থানীয় মেষপালক তা বলে না। তারা অনায়াসে আনাগোনা করে পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে তিব্বতে লাডাকে পামীরে কারাকোরামের গিরি-সঙ্কটে অথবা মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু এই পহলগাঁও থেকে প্রত্যক্ষ একটি পথ নীলগঙ্গার ধারে ধাবে গেছে শেষনাগের দিকে—যেখানে শেষনাগের বিশাল সরোবর। যেমন শতদ্রু কিংবা সিন্ধু নদের তীর ধরে গেলে পাওয়া যাবে মানস সরোবর। কিন্তু কারো পক্ষে সেই নদীপথ ধরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যাবো শেষনাগের দিকে, শেষনাগের পথ ধরে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়েই অমরনাথের উদ্দেশে আমাদের যাত্রাপথ। অনেকে বলে অমরনাথ এখান থেকে মাত্র তিরিশ মাইল, অনেকে বলে আরো কম। অর্থাৎ মোটামুটি তিনটি পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে গেলে আমরা পৌঁছতে পারবো। আমরা যাবো উত্তর-পূর্ব পথে। আমি নিজের হিসাবে পাই, দেড়দিন অথবা দুদিনে পৌঁছবো। কিন্তু আমার পাণ্ডা পণ্ডিত বদরিনাথ বলে, না, আপনারা চারদিনের দিন পৌঁছবেন, তার আগে পারবেন না। তার কথায় কিছু বিস্ময়বোধ করেছিলুম। তখন বুঝতে পারিনি এ পথের ক্ষেপ আছে, আবশ্যিক বিরতি আছে এবং পথের অনুশাসন মেনে চলতে আমরা বাধ্য।

তরণীযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপিনীগণকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের মধ্যে কার ওজন

কত পরিমাণ! গোপিনীরা মনে করলো, যে যত ভারী তার তত ভালোবাসা। সুতরাং কেউ বললে দেড় মণ, কেউ বললে দু মণ কেউ বা বললে আড়াই মণ। অবশেষে বাজি জিতলেন শ্রীমতী। তিনি বললেন, আমার ওজন এক মণ! এক মন নিয়ে তোমাকে দেখি, আমি একাগ্র একান্ত!

অতএব পহলগাঁও আপাতত থাক্—আমার একমাত্র লক্ষ্য হলো অমরনাথ। আমি একমন।

হোটেলে আমাদের জিম্মায় দুটি ঘর, কিন্তু বাইরে যেতে গেলে আমার ঘরটি পেরিয়ে যেতে হয়। চমৎকার বসবাসের ব্যবস্থা আসবাবপত্র সমেত। বাথরুম, ড্রেসিং রুম আলাদা। দুটি ঘর মিলিয়ে দৈনিক চার টাকা। পাশের ঘরটিতে আছেন আমার সাময়িককালের বন্ধু হিমাংশু বসু। কলকাতার ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্ক অধুনা স্টেট ব্যাঙ্কের হেড আপিসে চাকরি করেন এবং সুবিধা পাবামাত্র তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। সদালাপী এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি; উৎসাহী এবং কর্মঠ। কিন্তু একটু বেশী বয়স অবধি অবিবাহিত থাকলে যা হয়, অর্থাৎ মঠ ও আশ্রমের সাধু-স্বামীজীদের মতো স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি তাঁর সজাগ। এসব লক্ষণ ভালো, পথে-ঘাটে এসব দরকার। তাছাড়া তাঁর শরীরটাও বেশ হাল্কা, পাহাড়-পর্বতে ওটা খুব কাজে লাগে। এখানে একটু অবান্তর কথা বলে ফেলি। বাইরে গিয়ে আমার সামান্য আত্মপরিচয়টুকু চিরদিনই আমি গোপন করি, বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালী সমাজে। ওতে আমার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতাটা অব্যাহত থাকে। কিন্তু দিন তিনেক আগে শ্রীনগর হোটেলের খাতায় আমার নাম সই দেখে হিমাংশুবাবু তেতলা থেকে নেমে আসেন। ভদ্রলোকের মুখের ওপর মিথ্যে বলতে গিয়ে থতিয়ে গেলুম। সেই থেকে আলাপ। পহলগাঁও এসে দ্বিতীয় বিপত্তি। কলেজ স্ট্রীটের পাড়ার দুটি যুবক যাচ্ছিলেন অমরনাথে—তাঁরা আমাকে পথের মাঝখানে চিনে বার করলেন। ফলে পরবর্তীকালে 'কুণ্ডু স্পেশালের' বাঙালী যাত্রীদের মাঝখানে আমাকে যেতে হয়েছিল ভুরিভোজের আসরে। ভাটপাড়া থেকে এসেছেন রেল কোম্পানীর বাবু, ভটচার্যি মশায়ের দল—অতি অমায়িক লোক তাঁরা। তাঁরাও জুটে গেলেন গায়ে গায়ে। এঁরা ছাড়াও দেখি আমাদের হোটেলের একটি শিখ ছোকরা বাহাদুর সিং—স্বত্বাধিকারীর ভাইপো। সে এমন ন্যাওটা হলো, সহজে জট ছাড়াতে পারিনে। রাত্রে নৈশভোজনের আসরে গিয়ে দেখি, কয়েকজন পাঞ্জাবী তরুণ-তরুণীর মাঝখানে বসে আছে বাহাদুর সিং আমাকে পরিচিত করাবে বলে। এপাশে হিমাংশুবাবুর সহাস্যবদন। বুঝলাম ক্ষেত্রটা আগে থেকেই প্রস্তুত করা। হঠাৎ ওদের ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে এলো। তিনি কিন্তু বাঙালী। বুনো হাঁসের মধ্যে রাজহাঁসকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। তরুণীটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে শান্ত কণ্ঠে আলাপ করলেন। মুখ তুলে দেখি সাজসজ্জায়, দৈর্ঘ্যে, প্রসাধনে, ভ্যানিটি ব্যাগে—তাঁকে মানায় চৌরঙ্গীর পাড়ায়, কিংবা সিনেমায়। আঙুলের ডগায় নেইল্-পালিশের ফলে প্রত্যেকটি নখের উপরে যেন রক্তিম হীরার আভা জ্বলছে,—সুশ্রী চেহারার সঙ্গে প্রসাধন-সজ্জার পারিপাট্যে সেই আভা মানিয়ে গেছে।

আহারাদির পর হিমাংশুবাবু নিয়ে গেলেন পান খাওয়াবার জন্য তাঁর দিদির বাংলোয়। দিদি? আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার কেমন অভ্যেস, মেয়েদের সঙ্গে একটু পরিচয় হলেই আমি তাঁদেরকে ভগ্নীর মতন দেখি, দিদি বলি। উনি হলেন শ্রীনগর ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ রায়ের স্ত্রী। উনিও যাচ্ছেন অমরনাথে, সঙ্গে আছেন একটি পাঞ্জাবী যুবক। মহিলা খুব

সামাজিক সন্দেহ নেই।

জ্যোৎস্নার আলোয় পথ চিনে আমরা একটি ফুলবাগান-ঘেরা হোটেলে উঠে এলুম। নীচেই নদীর খরতর প্রবাহ চলেছে। মিসেস রায় মিষ্টহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। পান এনে দিলেন সযত্নে। মুখ তুলে দেখি তাঁর দুই চোখ ঈষৎ সুর্মাটানা। ভদ্রমহিলার বয়স আন্দাজ—না থাক, মহিলাদের বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। তিনি জানালেন, পহলগাঁওর বহু অধিবাসী ও দোকানদার তাঁকে 'বহিনজী' বলে ডাকে। এখানে এলে তাঁর কিচ্ছু নগদ খরচ হয় না। শ্রীনগরে তাঁর স্বামীর কাছে বিল্ চলে যায়,—টাকাটা জমা পড়ে ব্যাঙ্কে, পাওনাদারের একাউন্টে। এখানে আসেন তিনি যখন-তখন। যেখানেই দরকার হবে আমরা যেন বলি শ্রীনগরের 'বহিনজীর' লোক আমরা—ব্যস, আমাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না। আর এই যে মোহন,—আমার পাঞ্জাবী ভাই,—আমিই ওকে বাঙলা শিখিয়েছি অনেক যত্নে।

পান খেয়ে খুশী হয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেলুম। আগামীকাল মধ্যাহ্নে আহারাদির পর আমাদের যাত্রা স্থির হলো।

যা বললুম এতক্ষণ তা আগে-ভাগে বলে রাখা ভালো। এতে আমাদের যাত্রার আবহাওয়াটা বুঝতে পারা যায়। আজ হিমাংশুবাবুর সারাদিনের তৎপরতায় যাত্রার ব্যবস্থাগুলি প্রায় প্রস্তুত। প্রধান হলো দুজনের জন্য চারটি ঘোড়া, দুটি তাঁবু, পাটকরা খাটিয়া,—এছাড়া টুকিটাকি বহু আবশ্যিক সামগ্রী। যে পথে যাচ্ছি সেখানে লোকালয়, খাদ্য, অথবা মানুষ বলতে কিছু নেই, পশুপক্ষীও মেলে না। পাণ্ডারা বলে রেখেছে, চন্দনবাড়ি ছাড়ালে মানুষের চিহ্ন আর পাবেন না। জাস্কার পর্বতমালার গা ঘেঁষে আমরা যাবো জোজিলা গিরিসঙ্কটের দিকে, তারপরেই হলো সিন্ধুনদবেষ্টিত কৈলাসপর্বতমালার উত্তর-বিস্তার। তার আশেপাশে ভারতের মানচিত্রের রাজনীতিক জরীপটা যথেষ্ট স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়।

আমরা আছি লিডার উপত্যকার মধ্যকেন্দ্রে। স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে গিরিনদীরা, এই পহলগাঁওতে তাদের প্রথম অবতরণ, এখান থেকে তারা চললো সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায়। এজন্য এই নদীটির নামও হয়েছে লিডার নদী, ওরফে নীলগঙ্গা। এখান থেকে দুটি পাহাড় অতিক্রম করে গেলে সিন্ধু উপত্যকা,—সেখানে সিন্ধুনদ প্রথম নেমেছে দুর্গম পর্বতমালা থেকে। তার এপাশে আরুবস্তি পেরিয়ে হলো লিডারবৎ এবং ওপাশে কোলাহাই হিমবাহ। চিরতুষারে আবৃত। এখান থেকে আরুর পথ হলো বনময় এবং নির্জন, যেমন পহলগাঁওর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গভীর চিড়ের অরণ্য। আরু গিয়ে লিডার নদী এক সময় পাহাড়ের নীচে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সে স্থলের নাম হলো 'গুরুগুম্ফা'। পহলগাঁও দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে। এক নদীপথের পাশে চলে গেছে শেষনাগের চড়াই, অন্য নদীপথ চলে গেছে লিডারবৎ ও কোলাহাই হিমবাহের দিকে। আমাদের আগামীকালের গতি শেষনাগের উদ্দেশে। শেষনাগের প্রকৃত নাম শ্রীশনাগ, শীর্ষনাগ অথবা শিষনাগ কি না, আমার জানা নেই। রাত্রে এ নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি।

প্রভাতে প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল, আকাশ পরিচ্ছন্ন। এর মতো সুসংবাদ সেদিন প্রভাতে আর কিছু ছিল না। গতরাত্রের জ্যোৎস্না যতবার ঘোলা হয়েছে ততবারই যাত্রীদের মুখ বিবর্ণ দেখেছি। হিমালয়ের আর কোনো দুস্তর তীর্থে এই প্রকারের উদ্বেগ দেখা যায়

না। কেদার বদরির পথে যাও--আশ্রয়ের অসুবিধা কোথাও নেই। কৈলাসের অধিকাংশ পথ—অর্থাৎ লুপুলেক গিরিসঙ্কট পর্যন্ত কথায় কথায় আশ্রয় মেলে। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন যেভাবে দেখা দিক না কেন, দু'চার মাইল পর পর মাথা গোঁজবার জায়গা মিলে যায়। এখানে সব বিপরীত। যাত্রী সংখ্যা বুঝে খাবারের দোকান দু'চারটে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। 'ফার্স্ট এইড্' অর্থাৎ ডাক্তারী সরঞ্জাম সঙ্গে যাবে। তার সঙ্গে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। পাশে পাশে কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় মনোহারি ও পানচুরুটের বিকিকিনিও যাবে।

পাশের ঘর থেকে হিমাংশুবাবু সেই সুসংবাদটি নিয়ে যখন আমার বিছানার সামনে এসে বসলেন,—চা আসছে এক্ষুনি, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, ভেতরে আসতে পারি কি?

আসুন, আসুন—বলে সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে হিমাংশুবাবু গতকাল রাত্রির সেই চৌরঙ্গিনীকে অভ্যর্থনা করলেন। মেয়েটি সোজা সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার অসুবিধে হলো না ত?

বিলক্ষণ, বসুন—

কম্বল ছেড়ে একটু উঠে বসলুম। এমন সময় চা এলো! হিমাংশুবাবু তাঁকেও চায়ে আহ্বান করলেন। আমি একটু বিব্রত বোধ করছি। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। তবু ওর মধ্যেই একটু গুছিয়ে নিতে হলো। হিমালয়ে এলে আমি পরিচ্ছন্ন চেহারাটা রক্ষা করতে পারিনে।

তরুণী বললেন, পহলগাঁও বেড়াতে এসেছিলুম ক'দিনের জন্যে। কিন্তু আজকেই চলে যেতে হচ্ছে শ্রীনগরে। আমার স্বামী আছেন দক্ষিণ ভারতে। আজ গিয়ে তাঁর চিঠি পাবার আশা আছে।

হিমাংশু প্রশ্ন করলেন, কি করেন আপনার স্বামী?

গায়ের ওভারকোটটি গুছিয়ে ঢেকে তিনি বললেন, উনি কাশ্মীরের মিলিটারীতে আছেন। বিমানঘাঁটির গ্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু পদোন্নতির জন্য সেখানে একটি পরীক্ষা দিতে গেছেন। আমরা শ্রীনগরের কাছেই থাকি! দিন আমি আপনার চা ঢেলে দিই।

এবার তিনি দু'খানি হাত বার করলেন। সেই নেইল-পালিশ! কিন্তু আঙুলগুলি দীর্ঘ নধর। অত্যন্ত সহজ ক্ষিপ্রহস্তে তিনি চায়ের ভরা পেয়ালা বিতরণ করলেন। হিমাংশুবাবুর জরুরী হাঁকাহাঁকিতে বয় এসে আরেক কেটলী চা দিয়ে গেল।

প্রথম প্রস্ত চা-পানের পর একটু নড়াচড়া করে বসে তিনি বললেন, লেখকদের লেখা পড়ি মন দিয়ে, কত প্রশ্ন মনে আসে, কিন্তু লেখককে দেখলুম আমার জীবনে এই প্রথম। আপনাকে তাই দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করবো বলে সাহস করে এসেছি। যদি কিছু না মনে করেন—

হাসিমুখে বললুম, একটু ভয় পাচ্ছি—!

হিমাংশুবাবুর সঙ্গে তিনিও হাসলেন, ভয় কেন?

বললুম, প্রশ্নকর্তা সামনে থাকে না তাই অনেক লেখক বেঁচে যায়। আপনার কথাটা আন্দাজ করতে পাচ্ছিনে। তাছাড়া লেখকের পরিচয়টুকু বাঙলা দেশেই ফেলে এসেছি, এখানে আমি হিমালয় যাত্রী!

তরুণী বললেন, আমারটা হিমালয় ভ্রমণেরই প্রশ্ন।

তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। ভুল করেছিলুম কাল রাত্রে। অত্যন্ত আধুনিক

প্রসাধনসজ্জার আড়ালে একটি অতি ভদ্র এবং বিনয়ী মেয়ে রয়েছে। এমন দীর্ঘাঙ্গী তন্বী এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে এযাত্রায় আর চোখে পড়েনি। কিন্তু মনে মনে ভয় ছিল, এই অতি-আধুনিক সাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে কি অনুরূপা দেবীর বাসা আছে? হিমাংশুবাবুর দিদির আঁচলে কি দিদিমা বাঁধা?

কিন্তু এমন মিষ্ট ভূমিকার পর তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, সেটি আমার পক্ষে ক্লান্তিকর। কেননা বিগত বাইশ বছর ধরে সেই একই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হয়রান হয়েছি। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র 'রাণী' মেয়েটি কে? এখন তিনি কোথায়? আপনার সঙ্গে কি আজও তাঁর দেখা হয়? তাঁর আসল পরিচয় কি?

আমার উত্তরটা কিছু রূঢ় পরিহাসপূর্ণ ছিল। উভয় শ্রোতা ও শ্রোত্রী কিছুক্ষণ হেসেই অস্থির। পুনরায় কতক্ষণ চা ঢালাঢালি চললো। পরে তিনি বললেন, আপনারা অমরনাথ থেকে ফিরে কি শ্রীনগরে থাকবেন কিছুদিন?

ইচ্ছে আছে বৈকি। বেড়ানোটা সব এখনও বাকি।

তিনি সসঙ্কোচে বললেন, বলতে ভরসা হয় না। যদি আপনাদের অসুবিধে না হয়, আমার ওখানে থাকলে ভারি আনন্দ পাবো।

হিমাংশুবাবু বললেন, কিন্তু দিদি, আমি যে 'বোট্ হাউসে' থাকবো বলে স্থির করে রেখেছি! আমাকে ক্ষমা করুন।

অতএব আমার দিকে তিনি ফিরলেন। বললেন, আপনি না বললে শুনবো না। অন্তত দু' একদিন আমার ওখানে আপনাকে থেকে যেতে হবে,—এই অনুমতি দিন। আমার স্বামী আপনার কথা শুনলে এত খুশী হবেন কি বলবো।

বললুম, অমরনাথ থেকে বেঁচে ফিরলে তবে আতিথ্য নেবার কথাটা ওঠে।

তিনি সোৎসাহে জানালেন, তাঁর নাম শ্রীমতী মায়া গুপ্তা এবং স্বামীর নাম সার্জেন্ট কে সি গুপ্ত। তারপর শ্রীনগরের শহরতলীর ঠিকানাটা দিয়ে বললেন, কোনো অসুবিধে আপনার হবে না, সে-ব্যবস্থা আমি করবো' এবার আমি উঠি। বেলা দশটার বাস-এ যাবো, গোছগাছ আছে! অনেক বিরক্ত করলুম, কিছু যেন মনে করবেন না। আজ ফিরেই আমার স্বামী, আত্মীয়-বন্ধু সবাইকে চিঠি দেবো যে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আর আপনি আমার ওখানে গিয়ে উঠবেন।

এই বলে নত নমস্কার জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

এই আলাপের দিন দশেক পরে শ্রীমতী গুপ্তার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম বটে, কিন্তু শ্রীনগরে সেই সময় আকস্মিক ভাবে বন্যার তাড়না দেখা দেওয়ায় মহিলাটিকে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে আমার সঙ্গে শ্রীনগর ত্যাগ করতে হয়। সেই নাটকীয় কাহিনী কাশ্মীরের আলোচনায় বলবো।

আজ ২১শে আগস্ট, ১৯৫৩। আমাদের তাড়া ছিল। চারটি ঘোড়া ঠিকাদারের জিম্মায় রাখা আছে। দুটি মালবাহী ঘোড়া আটত্রিশ টাকায় ভাড়া পাওয়া গেছে, আর বাকি দুটি চড়বার ঘোড়া চল্লিশ টাকায়। প্রত্যেকটি একজনকে-তাঁবু ছ' টাকায়। খাটিয়া দু টাকা, তোশক এক টাকা। অশ্বরক্ষীর সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ধরে হেঁটে যাবে। সকলেই তারা কাশ্মীরের গ্রাম্য মুসলমান। এদিকে আমাদের তোড়জোড় করতেই এগারোটা বেজে গেল। আজ যাত্রীদের প্রথম গন্তব্যস্থল হলো চন্দনবাড়ি। চন্দনবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে আজকের মতো যাত্রা শেষ হবে।

ঘোড়া নিয়ে যে কাড়াকাড়ি আছে আগে জানতুম না। মধ্যাহ্নের ঠিক পরেই যাত্রাকালে খবর পাওয়া গেল, দুটি ঘোড়া আমাদের নিরুদ্দেশ। তখনই ছুটোছুটি পড়ে গেল। একই দিনে একই সময়ে শত শত যাত্রী মিলে একত্র যাত্রা না করলে নির্দিষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমায় কোনোমতেই অমরনাথে পৌঁছানো যাবে না। অজানা পথের যাত্রী আমরা সবাই। কোনো ব্যক্তি পিছিয়ে পড়লে অথবা এক বেলার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলে তাকে গিয়ে একা একা জনশূন্য তুষার প্রান্তরে দিগন্তজোড়া আতঙ্কের মধ্যে নির্বাসিত হতে হবে। সে চেহারা দেখেছি, পরে বলবো। সুতরাং আমরা ওই পহলগাঁও উপত্যকার মাঠে-মাঠে বিপন্নভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম। ঠিকাদার, তশীলদার, পুলিশ, কোতোয়ালী ইত্যাদি নানাস্থলে উমেদারী ও সুপারিশ করতে করতে ঘণ্টা দুই পরে অবশেষে আমাদের সুরাহা হলো। ঘোড়া চারটিকে এবার আঁকড়ে ধরে রইলুম। দুর্গম তীর্থপথের এই অকৃত্রিম বন্ধু কয়টিকে সকাল থেকে চোখের সামনে বেঁধে রাখলেই ভালো হতো। আমরা প্রত্যেকেই যেন স্বার্থসচেতন হয়ে উঠেছি।

'কুণ্ডু স্পেশালের' প্রায় শ' দেড়েক যাত্রী আগে ভাগে বেরিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত মহিলা ও পুরুষ আছেন। অনেকেই গেছেন পায়ে হেঁটে, অধিকাংশ ঘোড়ায়, কয়েকজন উচ্চমূল্য ডাণ্ডিতে। এছাড়া পাঞ্জাবী স্ত্রীপুরুষের সংখ্যাও কম নয়। এবারে রাজনীতিক কারণে যাত্রীসংখ্যা কম। তবুও সব মিলিয়ে আন্দাজ সাত-আট শো। এদের মধ্যেই আছে সাধুসন্ন্যাসী, আছে যোগীফকির। কেদারবদরি অথবা কৈলাসের দিকে যাত্রাকালটা যেমন দীর্ঘকাল অবধি প্রসারিত, এখানে তেমন নয়—ওই একটিমাত্র দিন শ্রাবণী পূর্ণিমা! পৌঁছতে যদি পারো তবে যাও, নইলে আবার আসছে বছর। এযাত্রায় সকলের আগে গেছে প্রথম অমরনাথের পূজারির দল, তারা প্রথম অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হেঁটে। তাদের সঙ্গে আছে শ্রীঅমরনাথের আসাসোঁটা আর রাজছত্র, আছে পূজার উপকরণাদি, আছে শঙ্খ-ঘণ্টা। এরা প্রতি বছরই সকল যাত্রীর আগে গিয়ে গুহায় পৌঁছয়। মার্তণ্ড শহর থেকে ওরা প্রথম রওনা হয়। রাজ সরকার থেকে ওরা সাহায্য পায়।

আমরা প্রায় সকলের পিছনে পড়েছি। তবু এখনো অপরাহ্ণ আড়াইটে বোধ হয় বাজেনি। রৌদ্র বেশ প্রখর। মেঘ যদি না করে আমাদের অসুবিধা কিছু নেই। প্রথমটা পথ যথেষ্ট প্রশস্ত নয়, পাশাপাশি দুটি ঘোড়া যাওয়া অসুবিধা। শান্ত পাহাড়ী ঘোড়া অনেকটা তার নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তরপথে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাঁকে দেখতে পাচ্ছি সুদীর্ঘ পথে শ্রেণীবদ্ধ ঘোড়ার ক্যারাভান। পহলগাঁও ছাড়লেই লিডার নদীর নড়বড়ে সাঁকো পাওয়া যায়, তারপরেই সরকারি টোল আপিস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়। তীর্থপথে কোনো ট্যাক্স নির্ধারিত থাকলে মন ছোট হয়ে আসে। দরিদ্র বলে রেহাই পায় না কেউ। দোহন থেকেই দাহনের উৎপত্তি—সবাই জানে।

পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে, আমাদের ঘোড়া চলেছে সার বেঁধে। একের পিছনে আর একজন সারবন্দী। কেউ কেউ পাশ কাটিয়ে ঘোড়া নিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটাপন্ন হয়ে এলো। ক্রমশ নগাধিরাজের রহস্যদ্বার আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আকাশ ছোট হয়ে আসছে। নদীর ঝরো ঝরো আওয়াজ বেড়ে উঠছে। আমরা নরলোক থেকে যাচ্ছি দেবলোকে। এখানে পথ চার ফুট থেকে ছয় ফুট আন্দাজ প্রশস্ত, কিন্তু অতিশয় বন্ধুর। যে-ব্যক্তি আমার অশ্বরক্ষী, তার নাম গণিশের।

জাত কাশ্মীরী, কিন্তু চেহারায় আর্য। ঘন সবুজের সঙ্গে নীলাভ দুটি চোখ টানা টানা। দীর্ঘকায় সুশ্রী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মানুষটি যেমন নিরীহ, তেমনি ভদ্র। কাশ্মীরের মুসলমানরা সাধারণত দাড়ি গোঁফ রাখে না। আচরণে দেখেছি এদের ত্রিসীমানার মধ্যে অসাধুতা, অশিষ্ট আচরণ, যাত্রীর প্রতি অবহেলা কি ঔদাসীন্য, এসব কিছু নেই। এদের কোনো ব্যক্তিকে নমাজ পড়তে দেখিনি কোনো পথে। মুখেচোখে সর্বদা সহাস্য বন্ধুত্ব, নিরন্তর স্নেহ ও সহযোগিতা। অনেক সময়ে ওদেরকে পরমাত্মীয় বলে মনে করেছি। এরা পাহাড়ের সন্তান, পাহাড়ের কাঠিন্য এবং সৌন্দর্য দিয়ে এদের দেহমন তৈরী, উদার পর্বতমালার থেকে এরা আপন স্বভাবকে আহরণ করেছে। গাড়োয়ালে ঠিক এই দেখেছি—এই স্নেহ, এই সাধুতা, এই সহযোগিতা। দেখেছি সীমান্তের পাঠান মহলে, দেখেছি নেপালে, ভীমতালে, দেখেছি কামরূপে, দেখেছি কৌশল্যা নদীর পারে সোমেশ্বরে। সমগ্র হিমালয়ের থেকে এরা পেয়ে এসেছে বন্য সাধুতা আর সরলতা।

চড়াইপথে চলেছি, কখনও নামছি, কখনও বা উঠছি। মাঝে মাঝে কাশ্মীরী মেয়েরা সামনে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চাইছে। সেই ঘনকৃষ্ণ চোখ বনহরিণীর, পরনে ঘাঘরা, মাথায় কাপড়ের টুকরো বাঁধা, দুধে আর রক্তে মেলানো বর্ণ। এরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু দরিদ্র। মুসলমান, কিন্তু পর্দা নেই। বাঙলার গ্রামের যে দারিদ্র্য, তার সঙ্গে এখানে বর্ণে বর্ণে মেলে। তবে তফাৎ এই, বাঙ্গলায় অর্ধনগ্ন অথবা উলঙ্গ থাকলে সহজে মরে না, আর এখানে উলঙ্গ থাকা যায় না। এদের চেহারা দেখলে আমি বিস্মিত হই, কারণ অবিভক্ত ভারতের কোনো মুসলমানের সঙ্গে এদের চেহারার মিল নেই। তুর্ক ইরাণী রক্ত নয়, এরা আগাগোড়া আর্য। রক্তের মধ্যে হিংসা ও বর্বরতা আনেনি। সেই কারণে সীমান্তের থেকে যখন পাঠান দস্যুরা এই সেদিন কাশ্মীরকে আক্রমণ করে, কাশ্মীরের আর্য মুসলমান তাদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। রক্তের মূল পার্থক্য আছে বলেই পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের মিল কোনোমতেই ঘটতে পারছে না। অমন সুন্দর মেয়েদের চোখ, অমন ব্যাকুলতা—কিন্তু কারুণ্য এবং মিনতি সুস্পষ্ট। শত শত বছরে ওদের এ দারিদ্র্য ঘোচেনি। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার বাইরে যে ভারতবর্ষ নামক একটি দেশ আছে, কিংবা পৃথিবী অনেক বড়—এ ওরা জানে না। ওরা জানে, যারাই আসে কাশ্মীরে, তারাই ধনী, তারাই দাতা। ওরা কেঁদেছে অনেক কাল, মার খেয়েছে শত শত বছর ধরে। আফগানীরা মেরেছে, আফ্রিদী পাঠানরা মেরেছে, তুর্কীরা মেরেছে, হূনদের হাতে মার খেয়েছে, তাতাররা মেরেছে বারম্বার—এমনকি এই সেদিনের শিখ রাজত্ব—তাদেরও হাতে ওদের হাড়পাঁজরা গুঁড়িয়ে গেছে। মোগল অথবা ইংরেজ ওদের মারেনি। মহারাজা গুলাব সিংহের আমল থেকে ওরা আর মার খায়নি। এই শত সহস্র বছরের অপমানজনক ইতিহাসকে সরিয়ে ওরা আজও ঘর গুছিয়ে তুলতে পারেনি, আজও কর্মী পুরুষকে মানুষ করে তুলতে পারেনি। তাই ওরা পথের মাঝখানে এসে শত শত হাত পেতে দাঁড়ায়, সভ্য জাতিদের কাছে প্রাণের আবেদন জানায়। আমাদের কাছে কাশ্মীর ভূস্বর্গ, ওদের কাছে কাশ্মীর চির দারিদ্র্যের নরককুণ্ড।

পথ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে চলছি। পাশেই নীলগঙ্গার গভীর নীচু খাদ। দুইধারে পর্বতমালার বন্য শোভা। মাঝে মাঝে জলপ্রপাত এপাশে ওপাশে সগর্বে নামছে। এখনও লোকালয় পাওয়া যাচ্ছে, এখনও সুশ্রী বলিষ্ঠ আর্যনাসা-ও-চক্ষুযুক্ত পার্বত্য স্ত্রীপুরুষকে মাঝে মাঝে দেখছি। এপারে ওপারে একটু আধটু গ্রামের

চিহ্ন—কোথাও কাঠের কাজ, কোথাও বা দর্জির ঘর। তাদের মাঝখান দিয়ে আমাদের সুদীর্ঘ ক্যারাভান চলেছে দীর্ঘবিলম্বিত বিরাটকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো। নীলগঙ্গার অবিশ্রান্ত ঝরো ঝরো আওয়াজ শুনতে শুনতে অশ্বারোহী যাত্রীর দল শান্ত মনে পাহাড়ীপথ অতিক্রম করে চলেছে। ডাণ্ডি চলেছে বাঙালী মহিলাকে নিয়ে। ভাটপাড়া চলেছে হেঁটে তরুণ দলের সঙ্গে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর শিশু চলেছে ঘোড়ায়। এদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মালবাহী ঘোড়ার দল, গাছের ডাল হাতে নিয়ে আমরা চলেছি ঘোড়সওয়ার—আশঙ্কায় কণ্টকিত, কোমরের ব্যথায় আড়ষ্ট। কখনও অজস্র বহুবর্ণ বন্য ফুলের গন্ধ, কখনও পতঙ্গদলের রঙ্গীন পাখার গুঞ্জন, কখনও বা অনামা পাখি দলের এপার থেকে ওপারে যাবার ডানা চালনার আওয়াজ। স্তব্ধ পার্বত্যপথ, শব্দহীন অরণ্যালোক। চোখে মুখে সকলের নির্বাক বিস্ময়, এক পথ থেকে অন্য পথে যেন একটির পর একটি অজানালোক আমাদের চোখের সামনে তাদের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন করছিল। আমরা চলেছি ভূস্বর্গে।

সহসা সামনের দিক থেকে একটা কলরব ভেসে এলো পিছন দিকে। আমরা একটি নির্ঝরিণীকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলুম। কাছে গিয়ে দেখি একটি অপঘাত ঘটেছে। ছোট একটি পাঞ্জাবী মেয়ে-পুরুষের দল যাচ্ছিল। তাদের ভিতর থেকে একটি মহিলা ঘোড়া থেকে নদীর খদের দিকে পড়ে যান। মাথাটা পড়েছিল নীচের দিকে, তাই কান ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্নগুলি রক্তাক্ত। কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ছিল না, এখন পড়ে রয়েছেন পথের ওপর। আত্মীয়রা অপেক্ষা করছে আশেপাশে। 'ফার্স্ট এইড' দেওয়া হচ্ছে। কারণটা হলো, সঙ্কীর্ণ পথে ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার ধাক্কা লেগে খদের দিকে তিনি ছিটকে পড়েন। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, নদীর নীচে গড়িয়ে যাননি। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার থেকে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করলো।

মাঝে মাঝে পথ নেই, আছে পায়ে চলার দাগ, আছে বড় বড় গাছপাথরের ফাঁক। সেটাকে পথ বলো, স্বীকার করবো। কখনও মাথা হেঁট হয়ে ঘোড়ার পিঠে উপুড় হতে হচ্ছে, মাথায় লাগতে পারে গাছের ডাল, কিংবা পাথরের খোঁচা। কখনও ঘোড়ার পিঠে বসে হাঁটুতে লাগছে পাথরের ধাক্কা, কিন্তু পা সরাবার উপায় নেই, ভারসাম্য রক্ষা হয় না। চোখ দুটো থাকে পথের রেখায়, পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ কম। নীচে থেকে উঠছি উপরে, উপর থেকে নীচে। যাঁরা ডাণ্ডিতে চড়েছেন চারটে মানুষের কাঁধে, তাঁদের পাদুটো কখনও উপরদিকে এবং মাথাটা নীচের দিকে। কখনও পাদুটো এত নীচে ঝোলে যে, ডাণ্ডি থেকে পিছলে না পড়ে যান। মাঝে মাঝে নদীর নীচের দিকে শষ্পাচ্ছন্ন লতাগুল্মসমাকীর্ণ গুহাগহ্বরে অন্ধকারের দল পাকানো। পাথরের উপরে দুগ্ধফেননিভ গর্জমান জলপ্রবাহ আছাড় খেয়ে ধূমেল শিকরকণা উৎক্ষিপ্ত করছে। ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যবিটপীর নীচে উন্মত্ত তরঙ্গের সেই উদ্দাম মাতামাতি চোখ ভরে দেখলে মন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যেমন দেখেছি কত শতবার অলকানন্দায় আর কোশীতে, বাগমতীতে আর তিস্তায়, বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়, নীলধারায় আর মন্দাকিনীতে। ওদের তীর থেকে কতদিন কত পাখি উড়ে গেছে আমার মনের খবর নিয়ে, কত তৃষ্ণার্ত তীর্থপথিক জলপান করে উঠে গেছে নিরুদ্দেশে, কত জন্তু আর সরীসৃপ ওদের ধার থেকে আমায় দেখে সরে গেছে গুহাগহ্বরে আমারই উদ্‌গ্রীব রহস্যবোধের ক্ষুধা নিয়ে। টের পাই আমার মধ্যে আছে একটি কীট, সেই কীট কেবলই খোঁজে এই হিমালয়ের পথ আর পাথর। তার বন্যপ্রকৃতি

কামড়ে থাকে এই নাগাধিরাজের প্রতি পাথরের টুকরো, প্রতি নির্ঝরিণীর তটপ্রান্তের শৈবালের মূল, প্রতি বৃক্ষের কোটর, প্রতি লতার পাতায় শস্পে গুল্মে তুষারে বরফে নদীপথে, প্রতি তীর্থে, প্রতি পথিকের পায়ের তলায়,—সে বাসা বেঁধে থাকে বড় আনন্দে। সে থাকে হিমালয়ের প্রতি ধূলিকণায়, প্রতি রন্ধ্রে আর গহ্বরে, প্রতি মন্দিরের প্রাচীন পাথরে, প্রতি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায়। অমৃত যুগে, সমুদ্র মন্থনে, দেবাসুরের সংগ্রামে, ত্রেতাযুগে, বাল্মীকি-বেদব্যাসে, ভারতের আদিম সভ্যতায়, আর্য-অনার্যের সঙ্ঘর্ষণে, বেদে উপনিষদে, পুরাণে ইতিহাসে,—সেই কীট চলে এসেছে কল্পে-কল্পান্তে, যুগ থেকে যুগান্তরে, মানুষের বংশপরম্পরায়, অস্তিত্বের পর্বে পর্বে। আমি সেই কীট হিমালয়ের,—সেই কীটানুকীট সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনক্রমে।

থাক্, আমাদের পথ আজকের মতো ফুরিয়ে এসেছে। উত্তুঙ্গ পর্বতমালার শীর্ষে দিনান্তের রক্তিম রোদ দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে চন্দনবাড়ির অধিত্যকাটি চোখে পড়ছে। প্রায় আট থেকে ন' মাইল পথ পেরিয়ে এলুম। সাড়ে নয় হাজার ফুটে এসে এবার যেন বেশ শীত ধরেছে।

প্রায় ঘণ্টা চারেক লাগলো চন্দনবাড়ি পৌঁছতে। পথের শেষ অংশটা বড়ই বন্ধুর ছিল। যারা বরাবর হেঁটে এসেছে তাদের পায়ের ইতিহাসটা আমার জানা। মনে মনে তাই সমবেদনা বোধ আসে। আমরা ঘোড়ায় আসছি, কিন্তু তাতে পায়ের কিছু স্বস্তি থাকলেও মেরুদণ্ডের নেই। কাঠ হয়ে বসে থাকতে থাকতে পিঠের দিকে টনটন করে। তা ছাড়া ঘোড়ার পায়ের ওপর বিশ্বাস আসে না। খদের ধার ঘেঁষে চললে আতঙ্কিত শরীর ঢৌল হয়ে আসে পলকে পলকে। সবচেয়ে নিরাপদ হলো পায়ে হাঁটা, কেননা সেটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে।

চন্দনবাড়ি অধিত্যকা হলো একটুখানি অবকাশ মাত্র। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, মাঝখানে এইটুকু ফাঁক। সামনে কয়েকখানি লাল রংয়ের করোগেটের চালা, লোহার ফ্রেমে আঁটা। বছরে দু' একটি দিন এসে গরীব তীর্থযাত্রীরা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি বাঁচিয়ে এখানে আশ্রয় পায়, তারপর সমস্ত বছর শূন্য চালা হা হা করে। অত্যধিক তুষারপাতের সময় পাহাড়ী ভালুকরা এখানে এসে জায়গা নেয়, কিংবা উপত্যকার অন্যান্য জন্তু। পাশ দিয়ে অনেক নীচে খরতর প্রবাহে চলেছে নীলগঙ্গা বা লিডার নদী। আমরা এসে যখন ঘোড়া থেকে নামলুম, তখন সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের একটু কাঁপিয়ে দিল। অশ্বরক্ষী গণিশের এবং তার সহকারী মিলে খোঁটা পুঁতে আমার ও হিমাংশুবাবুর তাঁবু দুটি খাটিয়ে দিল। তাঁর একটু জ্বরভাব থাকলেও উৎসাহটা ঢিলা নয়। সন্ধ্যার ছমছমে ছায়ায় এদিক ওদিক ঘুরে দেখি আমাদের আগে এসেছে প্রায় সবাই এবং সমস্ত অধিত্যকাটি জুড়ে তাঁবু পড়েছে এবং নানা জিনিসের দোকান বসে গেছে। তাঁবুর পর তাঁবু—পা বাড়াবার উপায় নেই। কোথাও কেউ জ্বেলেছে কাঠের আগুন, কেউ ময়লা হারিকেন, কেউ বা মোমবাতি। শীত ধরেছে সকলের, অনেকে জবুথবু হয়ে কম্বলের রাশির তলায় ঢুকেছে। সাধু, মহন্ত, বাবাজী, সন্ন্যাসী, নাগা ফকির, গৃহস্থ স্বামী-স্ত্রী, এমন কি কয়েকটি কচি শিশু ও বালক-বালিকাও সঙ্গে এসে উপস্থিত। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এলো এবং ওপারের পাহাড়ের পাশের চাঁদ এপারের পাহাড়ের চূড়াটিকে ঈষৎ উজ্জ্বল করে তুললো। আমাদের ছোট অসমতল প্রান্তরটুকু নীচের দিকে পড়ে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। শত শত লোক

তাদের একটি রাত্রির জীবন নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুব দিল। পথঘাট বলতে কিছু নেই। বর্ষার জলস্রোতের আঘাতে যেটুকু ভেঙে এসেছে, সেইটুকুই হলো আনাগোনার পথ। আশে পাশে ঘন জঙ্গল, এখানে ওখানে একটু আধটু লোকালয়। আগেকার কালের তীর্থযাত্রায় যে শ্রেণীর লোক আসতো তারা সংসার থেকে প্রায় বরখাস্ত ছিল। অল্পবয়সী স্ত্রী-পুরুষ বড় একটা চোখে পড়তো না। ইদানীং চাকা ঘুরছে। কাঁচা বয়সের যাত্রীরা যায় সর্বত্র। সবটা অধ্যাত্ম পিপাসা নয়, কিছু দুর্গম ও দুঃসাধ্য পথের টান, কিছু অভিনব জীবনযাত্রার আকর্ষণ, কিছু বা আবিষ্কারের আনন্দ। সামাজিক জীবন থেকে সাময়িক একটা স্বচ্ছন্দ মুক্তি, সেটাও কম লোভনীয় নয়। আমরা আসবার সময় দেখেছি, অল্প বয়সের অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ,—তাদের মধ্যে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী অনেকেই আছে। একটি বাঙালী দম্পতি এসেছে ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে, তাদেরও দেখেছি। অসমসাহস সন্দেহ নেই।

শীতে ঠকঠক করছে বহুলোক। ফুটন্ত চা গিলছে অনেকে। মিলিটারী এসেছে একদল, পুলিশের লোক এসেছে কয়েকজন। অদূরে শিখ দোকানদার রুটি সেঁকছে, পরটা ভাজছে, চা বানাচ্ছে,—ভিড় জমেছে সেখানে। গণিশেরের দল ভাত আর ভাজি এনেছে তাদের পিঠে ঝুলিয়ে,—কাঠের আগুন সামনে রেখে তারা বসে গেছে। হিমাংশু গিয়ে জুটেছেন ওই শিখের দোকানে। তিনি আলাপী লোক, অতএব আসর জমিয়ে বসেছেন দোকানের বেঞ্চিতে। সামনে হারিকেন জ্বলছে।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে বসলুম বেঞ্চির এক কোণে। হিমাংশুবাবুর পাশেই জন দুই মিলিটারী যুবক খাবার খাচ্ছে। কথা কইতে কইতে জানা গেল ওদের মধ্যে একজন বাঙালী। এ অঞ্চলে মিলিটারী বাঙালী? হিমাংশুবাবু মহা খুশী হয়ে নতুন রসে আলাপ করতে শুরু করলেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সাময়িক বিভাগে যে মেডিক্যাল ইউনিট আছে, তার মধ্যে শতকরা ষাটজনই বাঙালী অফিসার। এই যুবকটি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে যাচ্ছেন অমরনাথ দর্শনে। তীর্থের মোহ ঠিক নয়, দুর্গমের আকর্ষণ। আমার সঙ্গে হিমাংশুবাবু তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে, সহসা যুবকটির চোখে মুখে সেই হারিকেনের আলোয় কেমন একটা নাটকীয় চমক লাগলো। আমার অলক্ষ্যে বার বার তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শুনলুম তাঁর নাম মিঃ মজুমদার। চেহারাটা পল্টন দলেরই উপযুক্ত। যাই হোক, কোনো মতে আহারাদি সেরে বেশী কথাবার্তা আর না বলে সেদিনকার মতো তিনি বিদায় নিলেন। আলাপটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না।

আমাদের পাণ্ডা বদরিনাথ বুদ্ধিমান লোক। সে তার ভাই শিউজীকে রেখেছে আমাদের তত্ত্বাবধানে। সে এসে আমাদের তাঁবুর কাছ দিয়ে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে, খবরদারি করছে। এইভাবে অনেক যজমানকেই সে নজরবন্দী করে রেখেছে। আমাদের তাঁবু দুটো পড়েছিল নদীর ধার ঘেঁষে। তাতে কিছু দুর্ভাবনাও ছিল, —অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার অথবা সাপের ভয়; স্বস্তি কিছু ছিল—নিরিবিলি থাকা। গণিশের ও তার দলবলের লোকরা ঘোড়াগুলির পা বেঁধে এখানে ওখানে ছেড়ে দিল,—সেগুলো সমস্ত রাত ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘাস খেয়ে বেড়াবে। নিজেরা শুলো লুই-কম্বল মুড়ি দিয়ে আশে-পাশে। আমরা গিয়ে ঢুকলুম নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে।

এর আগে বনভোজন উপলক্ষে দিনমানে তাঁবুর অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু একাকী এভাবে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস কখনও করিনি। আমার তাঁবুটি ছয় ফুট লম্বা-চওড়া,—টেনে

বাঁধলে চারদিকে ফুটখানেক করে বাড়ে। এইটুকুর মধ্যে আমার এই বিচিত্র রাত্রির সংসারযাত্রার সীমা। পাটকরা খাটিয়ার ওপর একখানা ভাড়াটে তোশক, বালিশটা আমার নিজের। সাজসজ্জাটা এবার কম নয়, উপকরণের কিছু বাহুল্যই আছে। একখানা ফোল্ডিং চেয়ার ভাড়া করে এনেছি, তার হাতলের ওপর মোমবাতিটি জ্বালিয়ে রেখে নোট বইটির কাজ শেষ করলুম। রাত্রি ঘনিয়ে উঠলো।

মানুষের একটু-আধটু কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ অবধি শোনা যাচ্ছিল। তারপর সব চুপ। সেই নীরবতার পরিমাপ করা কঠিন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে পেচক শৃগাল-কুকুর—এদের ডাক শোনা আমাদের অভ্যাস। ঝিঁঝিঁ পোকা কিংবা ব্যাঙ ডাকে। জঙ্গলের ধারে থাকলে অনেক সময় ফেউ ডাকে। গাছপালা ঘন হয়ে থাকলে এক এক সময় সরীসৃপের ডাকও শোনা যায়। কিন্তু এখানে প্রাণীশূন্য জগতে চেতনার চিহ্ন কোথাও নেই—একেবারে মৃত্যুর মতো অসাড় এবং অবলুপ্তি। শুধু পার্শ্ববর্তী নীলগঙ্গায় তরঙ্গভঙ্গের আছাড়ি-পিছাড়ি আর্তনাদ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রান্তরচাবী শীতার্ত, ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলিব কণ্ঠের বিচিত্র আওয়াজ। দেখতে দেখতে সেই অববোধ-ঘেরা অধিত্যকায় নেমে এলো জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার আশ্চর্য চেহারা আমাদের কাছে পরিচিত নয়; গাঙ্গেয় সমতল ভূভাগের জ্যোৎস্না সে নয়,—সেই জ্যোৎস্না হিমালয়ের গহন রহস্যালোকের। হঠাৎ যদি দেহের বিলোপ ঘটে এবং তারপরেও যদি থেকে যায় জীবন-কল্পনা—আমরা ভেবে নিই একটা কিছু অবাস্তব মায়ালোক। সেটা স্বপ্নে, রঙে, কল্পনায়, তন্দ্রায় আলোছায়ায় যেমনই অবাস্তব, তেমনই অপ্রাকৃত। চেয়ে দেখি রাত্রির কোন অদৃশ্য প্রহরী এসে যেন সৌরলোক এবং মর্ত্যলোকের মাঝামাঝি দ্বার খুলে দিয়ে গেছে। নীচে প্রাণীচ্ছায়াশূন্য প্রান্তরের উপরে মৃত্যুর অসাড়তা এবং উপরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অপ্সবালোক। কোনদিন কোন মানুষের দুটো চোখ যা দেখতে পায় না, যা জানতে পারে না, উপলব্ধির মধ্যে আসে না—তাই যেন দেখছি স্পষ্ট, জানছি অতি অনায়াসে, বোধ করছি নিবিড়ভাবে। জনতার ভিড়ের মধ্যে যারা চিরজীবন কাটিয়ে যায়, তারা বলবে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—" কিন্তু সত্যি কি মানুষের উপরে কিছু নেই? যা আমাদের সংস্কারের, বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের অতীত? যেটা ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ভোলায়, বুদ্ধিজীবীকে দিশাহারা করে, হিসাবীকে ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে, জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বানায়,—সে বস্তু কী? সে কেমন?

থাক্, আজ এই আরামেব শয্যায় আর কাজ নেই। খোলা থাক্ বাকি রাতটুকু ওই তাঁবুর পর্দা। এর জবাব চাই,—এব ব্যাখ্যা, এর ভাষ্য, এর চরম অর্থটা জেনে যাওয়া চাই। দেবতাত্মা হিমালয় তার শেষ কথাটা সহজে এবার বলুক আমার কানে কানে।

ভোরবেলায় সাড়া পেলুম হিমাংশুবাবুর। তাঁর শরীর যথেষ্ট সুস্থ নয়, তবু এরই মধ্যে তাঁর প্রভাতের পদচারণা হয়ে গেছে। এখানকার আয়ু অল্প, তল্পিতল্পা যথাসম্ভব শীঘ্র গুছিয়ে নিতে হবে। ভোরের আকাশ প্রসন্ন ছিল বলে বহু সাধু ও সন্ন্যাসী এবং মার্কামারা তীর্থযাত্রীর দল আগেভাগে হাঁটা পথে বেরিয়ে পড়েছে। পণ্ডিত শিউজী এসে জানিয়ে দিল, এখান থেকে কিছুদূর গেলেই মস্ত চড়াই—সেই চড়াই দেখে অনেক যাত্রী ভয় পেয়ে পালায়। শীঘ্র শীঘ্র তৈরী হয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার।

চা-পানের জন্য বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় কয়েকজন বাঙালী যুবক—সাহেবী পোশাকপরা—এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার জানালো। তারাও যাচ্ছে। সঙ্গে আছেন

একজন সুইডেনবাসী ছাত্র---তিনিও চলেছেন ওদের সঙ্গে। সুইডিস যুবকটি নাকি বেরিয়েছে পৃথিবী ভ্রমণে। ভারতে এসে তুষারলিঙ্গ অমরনাথের নাম শুনেছে দিল্লীতে। তার অসীম কৌতূহল—কেমন করে প্রকৃতির খেয়ালে এমন অদ্ভুত ধরনের তুষার-শিবলিঙ্গের আয়তন তৈরী হয়ে ওঠে! তিনি আলাপ করলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ভাষা। যুবকটির সঙ্গে আছে জনচারেক স্থানীয় শ্রমিক এবং পাচক। চার-পাঁচটি ঘোড়া। দুটি তাঁবু। বিছানাপত্রে আর আসবাবে প্রচুর উপকরণ-বাহুল্য। সঙ্গে ভালো দুটি ক্যামেরা। আলাপের মাঝখানে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তোলা হলো। বাঙালী যুবকরা সকলেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। অসামান্য তাদের উদ্দীপনা। স্বাস্থ্য, শ্রী ও শক্তিতে সকলের চেহারাই প্রদীপ্ত।

সকলের আগে বেরিয়ে গেল 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' যাত্রীরা। মেয়ে, ছেলে, বৃদ্ধ, প্রবীণ, প্রৌঢ় মিলিয়ে প্রায় দেড়শো। মস্ত তাদের আহারাদির আয়োজন, বিস্তৃত তাদের যানবাহনের ব্যবস্থাদি। তাদের দখলে আছে প্রায় চারশো ঘোড়া, পনেরো কুড়িটি ডাণ্ডি, গোটা পঞ্চাশেক তাঁবু এবং প্রচুর পরিমাণে ভোজ্যবস্তু। পরিচালনা ও বিধিব্যবস্থা দেখলে আমাদের মতো লোকের মাথা ঘুরে যায়।

ক্রমে ক্রমে দোকানপত্র অদৃশ্য হলো, যাত্রীদল নিয়ে সারবন্দী ঘোড়াগুলি শান্তগতিতে দূর পাহাড়ের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। একটি একটি তাঁবু উঠে গেল, পুলিশ ও মিলিটারীর দল অগ্রসর হলো। দেখতে দেখতে সেই পর্বতমালার প্রাচীরঘেরা ক্রোড়ভূমি আবার হয়ে এলো জনশূন্য। আমরা পড়েছি প্রায় শেষের দিকে, কারণ আমাদের সব দেখে যাওয়া চাই। শোনা গেল, পহলগাঁও থেকে আজও মধ্যাহ্নের দিকে কিছু যাত্রী আসবে, তারা আজ সন্ধ্যায় পৌঁছবে বায়ুযানে। সুতরাং চন্দনবাড়িতে দু-একটি খাবারের দোকান থেকে যাবে বৈকি। আজ আমাদের গন্তব্য স্থল হলো বায়ুযান,---শেষনাগের হিমবাহ আজ আমরা অতিক্রম করবো। যখন আমরা চন্দনবাড়ি থেকে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লুম, বেলা তখন নটা। রৌদ্র আজ আর প্রখর হতে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে একটু-আধটু মেঘের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগছে বেশ,—যারা পায়ে হেঁটে যাবে, ঠাণ্ডায় তাদের সুবিধা। যেদিকটায় পর্বতের ছায়া, ঠাণ্ডা সেদিকে বেশী। আজকের পথ বনময়। কোথাও কিছু পথ ভালো, কিছু পথ পাহাড়ের ভাঙনে বিঘ্নসঙ্কুল। নীচের দিকে দেওদারের ঘন বন, মাঝে মাঝে চিড় আর শিশম্, ভুর্জপত্র আর আখরোটের জঙ্গল, এপাশে ওপাশে গিরিগাত্রের নির্ঝরিণীর ঝরঝরানির শব্দ। এই পর্যন্ত নাকি জন্তু-জানোয়ারের শেষ আশ্রয়, এর পর থেকে তাদের সংখ্যা বড়ই কম। গতকালকার রৌদ্রে আর রাত্রির তুহিন ঠাণ্ডায় যে কারণেই হোক আমাদের পথে প্রচুর হিমকণাপাত ঘটেছে। সমস্ত পথটা সেজন্য পিছল ও সপসপে। আমরা ধীরে ধীরে উঠছি উপরে। যারা পায়েহাঁটা, তাদের গতি মন্থর হয়েছে, তারা লাঠি ঠুকে চলছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, তাদের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পেরিয়ে যেতে আমাদের কিছু কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে—সন্দেহ নেই। অর্থাৎ মনের মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন অক্ষমতা ও পরাজয়বোধ অনুভব করছি। উপায় নেই, এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

প্রায় মাইল দেড়েক এসে আমরা সেই সুপ্রসিদ্ধ চড়াই-পথ পেলুম। এর নাম 'পিসুর' চড়াই—এটি চন্দনবাড়ি অঞ্চলে অতি কুখ্যাত। অনেকে বলে, এটি হলো প্রথম এবং সর্বপ্রধান অগ্নিপরীক্ষা। নীচের দিকে নিবিড় অরণ্য, আস্তে আস্তে উঠতে থাকলে অরণ্যলোক হাল্কা হয়ে আসে। পথের প্রথম দিকে এত পাথরের জটলা এবং সে-পাথর

এত আল্‌গা যে, যদি দৈবাৎ একটি কি দুটি স্থানচ্যুত হয়, তবে সর্বনাশ! নীচের দিকে অসংখ্য যাত্রী হয়ত প্রাণ হারাবে। নাগা-সাধু, সন্ন্যাসী ও মহন্ত মহারাজরা চলেছে মন্ত্র জপতে জপতে। প্রতিটি পদক্ষেপ ক্লান্তিকর। লাঠির ভর দিয়ে দু-পা ওঠো, আবার দাঁড়াও, নিশ্বাস নাও, আবার ওঠো। পথ বিপজ্জনকভাবে পিছল। নীচের থেকে মাথা উঁচুতে তুললেও পর্বতের চূড়া দেখা যায় না। ঘোড়া উঠছে,—সামনের দুটো পা উঁচুতে, পিছনের পা দুটো নীচে। মানুষের মতো ঘোড়াও সন্তর্পণে পা তুলছে, পাছে পিছলে যায়, পাছে হোঁচট খায়। এ তাদের অভ্যাস, এ তারা জানে। কিছুদিন আগে গিয়েছিলুম ভুটানের দিকে বকসা দুর্গে। মাঝখানে আন্দাজ আধ মাইল এই প্রকার পথ ছিল। কিন্তু তার বিস্তৃত আঁকবাঁক ছিল বলে এতটা বুঝতে পারা যায়নি। এখানকার পাকদণ্ডিতে ঘোড়ার দেহের সামনের অংশটা যখন বাঁক নিয়ে উঠছে, পিছনের শরীরটা তখন আগেকার বাঁকপথে থেকে যাচ্ছে,—অর্থাৎ পরিসর এত সামান্য। দিল্লীর কুতবমিনার উঁচু আড়াইশো ফুট, কিংবা কলকাতার মনুমেন্ট উঁচু দেড়শো ফুট। কিন্তু ওরা যদি প্রায় চার মাইল উঁচু হোত—তাহলে? কুতবমিনারের ভিতরে সিঁড়ি আছে, সোজা হয়ে এক একবার দাঁড়ানো যায়। এখানে সিঁড়ি নেই, পাহাড়ের খাঁজ নেই, জিরোবার স্থান নেই, দাঁড়াবার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বিপদ তাদের, যারা নীচের দিক থেকে এখনও উপরে উঠছে। ঘোড়ার পায়ের ঠোকরে যদি একটি পাথর গড়ায়, তবে সেটি ঠেলবে আরেকটি পাথরকে—দুটিতে গিয়ে তৃতীয়টিতে দেবে ধাক্কা,—তারপর? তারপর নীচেরতলাকার যাত্রীদের সেই শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যু আর ভাবতে পারিনে। পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ডাণ্ডিতে চড়ে বাঙালী মহিলা। আতঙ্কে তাঁর চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়েছে। বিজ বিজ করে বলছেন, জয় অমরনাথ! জয় বিপদতারণ মধুসূদন! চোখে আঁচল চাপা দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা!

উপুড় হয়ে আমরা ঘোড়ার গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আছি। খাদের দিকে তাকাচ্ছিনে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হতে পারে। উপর দিকে তাকাতে পাচ্ছিনে, মাথা ঘুরে যায়। শুনেছি যারা আত্মহত্যা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তারাও অপঘাত মৃত্যুকে ভয় করে! নীচের দিকে কোথায় চন্দনবাড়ির শূন্য অধিত্যকা হারিয়ে গেছে, অরণ্যের শীর্ষস্থান আর খুঁজে পাচ্ছিনে, পৃথিবী আমাদের অনেক নীচে, অনেক পিছে পড়ে রইলো! তেরো চৌদ্দ বছর আগে পণ্ডিত নেহরু এসেছিলেন এখানে, শেষনাগের তুষার-নদী দেখবার ইচ্ছা ছিল তাঁর,—কিন্তু এই পিসুর চড়াই তাঁর পথে বাধা ঘটিয়েছিল? তাঁর সঙ্গে ছিলেন খান আবদুল গফ্‌ফর খান এবং শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। পণ্ডিতজীকে তাঁরা এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন এক একটা বাঁক আসতে লাগলো যে, আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলুম। সবচেয়ে বিপদ ছিল, এই অদ্ভুত পাহাড়ের এক একটি স্থলের মৃন্ময় পিচ্ছিলতা, এক একটি স্থলে ধারালো পাথরের ফাঁকে এক ফুট কিংবা ছয় ইঞ্চি পরিমাণ পা রাখার জায়গা। একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহূর্তের অন্যমনস্কতা, সামান্য একটি হিসাবের ভুল,—তারপর মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে যাত্রীর মালপত্র পড়ে গিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে; ক্লান্ত ঘোড়া তার পিঠের সওয়ার এবং মালপত্র ফেলে দেবার চেষ্টা করছে,—সেখানে তার আত্মরক্ষণীবৃত্তির আদিম চেতনা। মাঝে মাঝে তাদের অবাধ্যতা, মাঝে মাঝে তাদের অবস্থান-ধর্মঘট। গণি ধরেছে শক্ত হাতে আমার ঘোড়ার লাগাম। সতর্ক তার চক্ষু, সতর্ক প্রহরা। অভয় দিচ্ছে আমাকে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে। গণি নিজে হাঁপাচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে মুখের থেকে এক একটা

আওয়াজ বার করছে। কখনও ঘোড়াদের দিকে শিস দিচ্ছে, কখনও বা নিঃঝুম পাহাড়ের মধ্যে চেঁচাচ্ছে—'হোউস,—সাব্বাস! হোউস্,—সাব্বাস!' ওটা তাদের বুলি, ও বুলিটা ঘোড়ারা বোঝে। যে দুটি ঘোড়া আগে-পিছে চলে, তারা নিজেদের মধ্যে মন জানাজানি করে, একজনকে ফেলে আরেকজন এগোয় না, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পথের মাঝখানে দাঁড়ায়, চেঁচায়, অবাধ্য হয়। ওদের এই প্রকৃতি রক্ষকরা জানে এবং সেইমতো ব্যবস্থা করে। এই পথের সম্বন্ধে বায়ুযানের তাঁবুর মধ্যে বসে আমার নোটবইতে যেটুকু লিখে রেখেছিলুম, এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি :

''সর্বাপেক্ষা উঁচু চড়াইপথ পার হচ্ছি। সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী সমস্তটা ভয়াবহ। আমার জীবনে এমন সঙ্কটসঙ্কুল চড়াই খুব কমই অতিক্রম করেছি। পথ অতিশয় পিছল, দুঃসাধ্য এবং দুরতিক্রম্য। অবকাশ নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপত্র ফেলে দিচ্ছে ঘোড়ারা। মহিলারা পড়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটি ভুল মানেই মৃত্যু! আশেপাশে বিভীষিকাময় গহ্বর, তুষার-গলা প্রপাত, শক্ত বরফে আচ্ছন্ন নদী, তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্বত এবং সমস্ত পথের দুই পাশে মধ্য শরৎকালের বিবিধ রঙ্গীন বর্ণের অজস্র ফুলের সমারোহ শোভা। প্রত্যেক পদে পদে সাধু-সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বালকবালিকা, অশ্বরক্ষক ও কুলীর দল,—প্রত্যেকে এক একবার হাঁ করে নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করছে। এই প্রকার মর্মস্পর্শী দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট আরো উপরে উঠে এলুম—।''

নীচেরতলা থেকে উঠে ছাদের খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালুম। এটা উপত্যকা। চন্দনবাড়ি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ, তবে লম্বা অনেকখানি। সামনে সুদীর্ঘ সমতল দেখে আমাদের মুখে-চোখে অসীম স্বস্তিবোধ। যারা এখনও পিছনে আসছে, তাদের কথা ভাবতে ভয় করে। কামনা করি, তারা নিরাপদে আসুক। আমরা প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুটের উপরে উঠেছি কাগজপত্রের হিসাবে। পর্বতমালার তৃতীয় স্তরে আমরা এসেছি। চতুর্থ স্তর হলো 'গ্লেসিয়ার'—অর্থাৎ বরফ-জমা নদী নীচে উপরে এবং চারিধারে। সেই নদীরা ঝুলে থাকবে আমাদের চোখের সামনে। আশে-পাশে দেখি, কারো চোখ থেকে বেরিয়ে এসেছে আনন্দের কান্না, কেউ ধুঁকছে, কেউ বা বাক্‌রুদ্ধ। অনেকেই বিশ্বাস করেনি নিরাপদে উঠ্‌বে। শোনা গেল, জন আষ্টেক বাঙালী পুরুষ এবং চার-পাঁচজন মাদ্রাজী মেয়ে-পুরুষ ভয় পেয়ে ফিরে গেছে। 'কুণ্ডু স্পেশালের' পরিচালক শ্রীমান শঙ্কর কুণ্ডু এই নিয়ে পরে আমার কাছে বড় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাঙালীর উৎসাহ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি তারা পিছিয়ে যায়। কিন্তু জাতি-চরিত্র বিচারের সময় তখন নয়। কণ্ঠ, তালু, টাগরা সব শুষ্ক—আগে একটু চা খেয়ে বাঁচি। ছোট্ট একটি চা-কচুরীর দোকান আমাদের আগে-ভাগে এসে গেছে। এই উপত্যকাটির নাম হলো যশপাল। কেউ বলে, যোজপাল। হিমাংশুবাবুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটেছে। ঘোড়া থেকে নামলেন কয়েকজন বাঙালী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। দুঃসাধ্য তীর্থযাত্রায় এরই মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয় ও বন্ধু হয়ে উঠেছি। আশেপাশে গাছপালা কমে এসেছে,—তবু দেবদারু আর রুদ্রাক্ষের কয়েকটি গাছ চোখে পড়ছে। ঘাস-লতা আছে এখানকার উঁচু-নীচু প্রান্তরে। বৃষ্টির কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর কষ্টস্বীকারের বাইরে পার্বত্য প্রকৃতি তার সমস্ত শোভা নিয়ে বিরাজমান। ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটেছে অজস্র। যতদূর দৃষ্টি চলে, ফুলের বিছানা পাতা। একই বৃন্তে পাঁচ-সাত রংয়ের ছোট ছোট আশ্চর্য ফুল। প্রত্যেক পাপড়ির রং পৃথক, একটি

বোঁটার সঙ্গে অন্য বোঁটার বর্ণের মিল নেই। কোন ফুলের নাম জানিনে, কোন ফুল চিনিনে,—তাই এত আনন্দ হচ্ছে। আগে বলেছি, সমগ্র কাশ্মীর হলো মৃন্ময়। তার পাহাড়, তার প্রান্তর, তার অরণ্যলোক, তার নদীপথ, তার উপত্যকা-অধিত্যকা,—সমস্ত মৃত্তিকাময়। এই মাটির ক্ষয় হয়ে চলেছে যুগে যুগে। আশেপাশে পর্বতমালায় অসংখ্য অগণ্য ক্লীফ্—কলমের ডগার মতো একটার পাশে আরেকটা দাঁড়িয়ে। সেই চূড়াগুলি মৃন্ময়—তাতে ক্ষয় ধরেছে বহুকাল থেকে। কেউ যদি বলে, হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যে কাশ্মীরের পর্বতমালার এ উচ্চতা থাকবে না—আমি অসঙ্কোচে বিশ্বাস করবো। কাশ্মীরের এত ফলন কেবল তার মৃন্ময়তার জন্য। যশপাল থেকে বেরিয়ে যত দূরে যাচ্ছি, এই ক্ষয়িষ্ণু পর্বতের একই চেহারা। অন্য কোন পার্বত্য দেশে—বিশেষ করে এই উচ্চতায় এ প্রকার ফলন হয় না। সমগ্র গাড়োয়ালে নেই, কুমায়ুনে নেই, হিমাচল প্রদেশে নেই, নেপালে কিংবা সীমান্তে নেই। সেখানে সর্বত্র গ্র্যানাইট্ পাথরের ভিড়,—দশ হাজার ফুট পর্যন্ত সেখানে ফলন। সেসব অঞ্চলে গেলে কাশ্মীরের চেহারাকে বিশ্বাস করা যায় না। কাশ্মীরকে লোকে ভূস্বর্গ বলে এসেছে বহুকাল থেকে, কিন্তু কাশ্মীরের মতো ভূস্বর্গ সমগ্র হিমালয়ে শত-সহস্র আছে। আদি-অন্ত হিমালয়ে যেখানে-সেখানে ভূস্বর্গ। ব্রহ্মপুত্রে, সুরমায়, তিস্তায়, বাগমতীতে, কৌশল্যায়, শারদায়, গোমতী ও রাপ্তিতে, ব্রহ্মপুরা ও সমগ্র কুমায়ুনে, বিপাশা আর চন্দ্রভাগায়,—যেখানে অরণ্য-সমাকীর্ণ দুর্গম পর্বতমালার আশেপাশে গিরিনদীরা চলে গেছে, সেখানেই ভূস্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের কথা পৃথক। এখানে সমস্ত প্রকার খাদ্য, সবজি ও ফলপাকর অজস্র। এখানকার গ্রামে ঢুকলেই মনে হবে বাঙলা দেশ। সেই থোড়, মোচা, কাঁচকলা, সেই শশা, ঢেঁড়শ, ঝিঙে, সেই বেগুন, পটল, আর লাউ। আদা, লঙ্কা, তেঁতুল, সজনে আর নটে। নদীতে অজস্র মাছ, উঠোনের মাচানে লাউ আর কুমড়োর লতা। সেই অঙ্গন আর মাটির ঘর, সেই ধান-ঝাড়া আর চালকোটা। সেই মৌরীফুল, আর কাঁচা ডালিমের গন্ধ। সেই দারিদ্র্যের রুগ্ণতা আর নগ্নতা, সেই রোগ আর জরা। ওর পাশে তাকাও,—আঙুর আর আপেলের বন, বাগুগোসা, খোবানি, বাদাম,—আরো কত রকমের ফল, কত মেওয়া। অজস্র খাঁটি ঘি, অজস্র সুন্দর সুগন্ধি চাউল। মাছ, মাংস, মাখন, ডিম,—চারিদিকে প্রাচুর্য। কিন্তু সমগ্র দেশে নেই পয়সা, রোগে ভুগে আর দারিদ্র্যে মরে কাশ্মীর। আর যারা বাইরের থেকে মোটা টাকা নিয়ে বেড়াতে যায়, তারা ফিরে এসে বলে—ভূস্বর্গ!

আরো চার মাইল এগিয়ে যাচ্ছি। আকাশে একটু-আধটু কালো মেঘের ইশারা দেখছি। ডানদিকে বিরাট পর্বতের সারি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। চেহারা প্রায় ওই একই, ক্ষয়িষ্ণু মৃন্ময়। মাঝখানে আবার গেছে কিছুক্ষণ প্রাণান্তকর চড়াই—প্রায় সাত আটশো ফুট। আমাদের আগে এগিয়ে গেছে বহু লোক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া,—দক্ষিণে অনেক নীচে দিয়ে গেছে সেই নীলগঙ্গা। সেটি মিলেছে শেষনাগ নদীতে। চড়াই আর উৎরাই চলেছে—তবে চড়াই বেশী বরাবর। এদিকের পথ কিছু ভালো, কিছু সহ্য করা যায়, কিছু বা চওড়া। কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে ভয় করে। মাঝে এক-আধবার যাযাবর গুজরদের এক-আধটি বস্তি চোখে পড়েছিল। তারপরে আর কিছু নেই। যতদূর দেখছি, মহাশূন্য। পাখি, জন্তু, মানুষ, গাছপালা—কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না। আকাশে এক-আধ টুকরো মেঘের চলাফেরা দেখে সকলেই উদ্বেগ বোধ করছে। আমাদের ক্যারাভান চলেছে সঙ্কটসঙ্কুল পর্বতমালার

সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরে বিরাট সরীসৃপের মতো।

শেষনাগ এলো। হঠাৎ যেন খুলে গেল দিগন্তের পূর্বদ্বার। পশুরাজ সিংহ যেন বসে রয়েছে পূর্বদিগন্ত জুড়ে। সমগ্র দেহে ধবল তুষার শোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিস্তৃত এবং এত ব্যাপক তার পটভূমি যে, সেই হ্রদের আয়তন সহসা ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল। একটি তুষার নদী এসে নেমেছে হ্রদে এবং একটি নদী বেরিয়ে গেছে সেই হ্রদ থেকে। যেমন কৈলাসের চূড়ার অদূরে মানস সরোবর এবং রাবণ হ্রদ। শেষনাগ হ্রদের ওপারে সোজা উঠেছে পর্বতমালা, এপারে কিন্তু বালুবেলা। বহু যাত্রী পাহাড়ের তলায় নেমে গেল স্নান করতে। আমাদের পথের থেকে আন্দাজ একশো ফুট নীচে সেই হ্রদ। সুতরাং সেই জল স্পর্শ করে আসা কঠিন নয়। অনেক পাঞ্জাবী মেয়ে নেমে গেল, অনেক উৎসাহী যুবকও। আশ্চর্য শোভা বলেই তার দুর্বার আকর্ষণ। ওপারের নানা পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে তুষার নদী। এই হ্রদের জলে আছে নাকি নানা ধাতব পদার্থ মিশ্রিত,—যারা স্নান করে, তাদের আর এ জীবনে নাকি চর্মরোগ হয় না। তুষারগলা জল, ডুব দিলে অসাড় হয়ে আসে সর্বশরীর। কিন্তু অনেককে বলতে শুনেছি, স্নানের পরে সকলে আশ্চর্যরকম সুস্থ বোধ করে। তারা আর ঠাণ্ডায় কাতর হয় না। যদি কল্পনা করি, জ্যোৎস্না রাত্রে এই স্বচ্ছ নীল জলে অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আসে কিন্নরী আর অপ্সরীর দল,—তাহলে সেটা সত্য মনে হবে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কোন নির্দিষ্ট নিরীখ সত্য সত্যই এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন একটা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, যেখানে আমরা ভিন্ন আর কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই। হয়ত যারা এখানে আছে, তারা অশরীরী, আমাদের চর্মচক্ষু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। আমরা তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই,—কিন্তু ধারণে পাইনে। হয়ত আমাদেব দেখছে তারা সকৌতুকে। কিন্তু আমরা যাদের দেখতে পাচ্ছিনে, তারা যে নেই,—একথা কে বললে? থার্ড ডাইমেন্‌শ্যানে কেমন করে দেখতে পাচ্ছি? কেমন করে দেখছি টেলিভিশ্যানে? হয়ত একদিন আমরা নতুন ধরনের লেন্স আবিষ্কার করবো,—তার সাহায্যে দেখতে পাবো, যা দেখবাব জন্যে মানুষের এত আকুলি-বিকুলি, দার্শনিকদের এত খোঁজাখুঁজি। মানুষ অনেকদিন ধরে চোখ বুজে রইলো, অনেক সাধু ঘর ছেড়ে যোগের আসনে বসে জীবনপাত করলো, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সবাইকে লুকিয়ে অনেকেই গা ঢাকা দিয়ে রইলো,—যদি ঈশ্বরকে দেখা যায়। চোখে দেখতে না পেয়ে বললে, বেশ ত মন দিয়েই দেখবো! খ্রীস্টান, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ—ওই একই চেষ্টা সকলের। তবে কি বিজ্ঞান দেখিয়ে দেবে ঈশ্বরকে? এমন লেন্স আবিষ্কার করবে একদিন—যা চোখে দেবামাত্রই দেখতে পাবো—যা এতদিন চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাইনি! যন্ত্রের সাহায্যে যদি আসল মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধরে রাখা যায়,—যেটা অশরীরী, তবে অশরীরীকে যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাবে না কেন?

উপর থেকে ক্রমশ দেখা যাচ্ছে বায়ুযানের শূন্য হিমকান্ত প্রান্তর। মধ্যাহ্ন পেরিয়েছি, কিন্তু শীত ধরেছে খুব। তুহিন বাতাস উঠেছে। হাত অবশ হয়েছে ঠাণ্ডায়। আমরা বায়ুযানে এসে পৌঁছলুম।

শেষনাগ থেকে বায়ুযান আন্দাজ মাইল দেড়েক। এটাকে পথ বলবো না,—পথের নিশানা মাত্র। পথ বলতে কোথাও কিছু নেই। পাহাড় ছেড়ে পাহাড়ে ওঠা কিংবা নামা, পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া, নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলা। শেষনাগ অবধি আমরা

পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছিলুম, এবার নেমে এসেছি পাঁচ সাতশো ফুট। আকাশে মেঘ করেছে, সেজন্য আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন। মেঘ মানে ভয়, মেঘ মানে প্রায় হাজারখানেক লোকের মুখ শুকিয়ে যাওয়া। আমার মনে আছে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের কথা। সেবারও এমনি করে মেঘ জমেছিল বায়ুযানে। দেখতে দেখতে বৃষ্টি, দেখতে দেখতে তুষারনদী মূল পাহাড় থেকে খসে নেমে এলো পঞ্চতরণীতে, তুষারের চূড়া ভেঙে ছুটলো উপর থেকে নীচে। চারিদিকে বরফ জমে গেল দশ ফুট উঁচু। তার পরের ঘটনাবলী জানে সংবাদপত্রের তৎকালীন পাঠকরা। ছয়শো লোক তুষার-গর্ভে সমাধিস্থ হলো, পালাতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরেছে শত শত, গাছে উঠে বাঁচতে গিয়ে গাছের ডালে মরে আটকে আছে, না খেয়ে মরেছে অজস্র,—কিন্তু তালিকা বাড়ানো উচিত নয়। ১৯২৮-এর কথা এখন আমি কোন ব্যক্তিকে শোনাচ্ছিনে, হিমাংশুবাবুকেও না। শুনলে সবাই ভয় পাবে। বেশ মনে পড়ে সেবার ছয়শো ঘোড়াকে এক হাজার মণ রসদসহ পহলগাঁও থেকে পাঠানো হয়েছিল এখানে। মিলিটারী স্যাপার্স ও মাইনার্স ইত্যাদি মিলিয়ে শত শত লোক ও স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল এদিকে। কিন্তু সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই প্রথম চোটের ঢালাও মৃত্যু ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে পুলিস আর মিলিটারীর কিছু লোক যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আসে প্রতি বছর। সেই সময়টায় আমি কাশ্মীর-সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যান-বাহন বিভাগে চাকুরে ছিলুম বলেই এসব খবর আমার জানবার সুযোগ ঘটেছিল। এই নিয়ে একটা গল্পও লিখেছিলুম ভারতবর্ষে।

সেই বায়ুযানকে ঘিরে সমস্ত আকাশ আজকেও ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এলো। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ কিন্তু এত ঠাণ্ডা যে, দু'হাতের দশটা আঙুলে ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে ওই লোহার পাতটাকে ধরে রাখতে পাচ্ছিনে। আঙুলগুলো অসাড় নীলবর্ণ হয়ে আসছে। সবাই ক্ষুধার্ত, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে আহারে রুচি কমে গেছে অনেকখানি। বায়ুযানে পৌঁছে আমরা যে যার তাঁবু বানিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। শেষনাগ থেকে এ অঞ্চল পাঁচ-সাতশো ফুট নীচু এবং এখানকার উপত্যকাটা বোধ হয় চন্দনবাড়ি অপেক্ষা কিছু প্রশস্ত। উপত্যকা কিংবা হিমলোক, কিংবা তুহিন প্রান্তর—ঠিক কোন্‌টা বলবো বুঝতে পাচ্ছিনে। মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছে ঠাণ্ডায়। বিছানাপত্র এলিয়েছি, কিন্তু সে-বিছানা এত ঠাণ্ডা যে, ছোঁয় কার সাধ্য! মেঘের সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছে বরফানি বাতাস—সেই বাতাস মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওই তুহিন উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের তাঁবুর খুঁটি ধরে মাঝে মাঝে শাসিয়ে যাচ্ছে। শিশু ও বালক এসেছে কয়েকটি। ঘোড়ার পিঠে তাদের করুণ ভয়ার্ত শীতার্ত কান্না দেখতে দেখতে এসেছি। কেউ কেউ এনেছে নতুন ধরনের নিশ্ছিদ্র রবারের তাঁবু,—ওরকম তাঁবু মাঠের ওপর খাটালে বাতাস ও বৃষ্টি নাকি কোনমতে ভিতরে ঢোকে না। অমনি একটা তাঁবুর মধ্যে মা-বাপের সঙ্গে শুয়ে আছে সেই ছয় মাসের শিশুটি। আজ ভোর থেকে তার কান্না থামছে না কিছুতেই।

বৃষ্টি এলো ফোঁটা ফোঁটা। আমাদের তাঁবু পড়েছিল একটি শীর্ণ ঝরনার পাশে, ওপাশে পুলিশ আর মিলিটারীর তাঁবু। তাদের সঙ্গে কিছু রসদ, কয়েকটি গাঁইতি আর বন্দুক, কিছু আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা, কিছু বা মদ আর দুধের গুঁড়ো, অথবা অতিরিক্ত কিছু গরম আচ্ছাদন। বৃষ্টি আরম্ভ হতেই তাদের দুজন লোক 'পরচা' নিয়ে এখানে ওখানে ছুটে গেল। এই বলে যাত্রীদলকে সাবধান করে এলো যে, এখান থেকে কেউ আর এক পা না নড়ে। যদি কোন জরুরী অবস্থা দেখা যায়, তবে পহলগাঁওকে সঙ্গে সঙ্গেই 'এলার্ট' করা হবে।

হিমাংশুবাবুর গা বেশ গরম, বোধ হয় জ্বর একটু বেড়েছে। তিনি তাঁবুর মধ্যে ঢোকার পর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আহারাদির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গে কিছু রুটি ছিল, কিন্তু হাত-পা অসাড় হবার পর থেকে সেগুলো আর বার করা হচ্ছে না। বৃষ্টি বেশ পড়ছে। এক একটি ফোঁটা, একেকটি চাবুক। আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে অনেকে। কিন্তু যে পরিমাণ উত্তাপ ওই কাঠের আগুনে সৃষ্টি হলে চারিদিকের তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে জল গরম হয় কিংবা রুটি সেঁকে নেওয়া যায়,—সেই উত্তাপ ওই আগুনে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠ জ্বলে শেষ হচ্ছে, কিন্তু আধ সের আন্দাজ জল কোনমতেই গরম হলো না। আট আনারও বেশী কাঠ পুড়ে গেল। পণ্ডিত শিউজী হয়রান হয়ে শেষকালে গা ঢাকা দিল। সাড়া নিলুম হিমাংশুবাবুর, তিনি পাশের তাঁবুতে ছিলেন লেপের মধ্যে,—কাঁপতে কাঁপতে সাড়া দিলেন।

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু আমিও কাঁপছিলুম। মাথাটা ব্যালাক্লাভায় ঢাকা, গায়ে সবচেয়ে মোটা পট্টুর কোট. তার নীচে সোয়েটার, তার নীচে তিনটে সূতী জামা, পরনে খুব মোটা ব্রেজারের প্যান্ট, তার নীচে পশমের ড্রয়ার, হাতে দস্তানা,—কোমর থেকে পা পর্যন্ত মোটা ওভারকোট ঢাকা,—তার ওপরে দুখানা কম্বল,—শীতে আমি কাঁপছিলুম। কাঁপছে হাজারখানেক লোক, কাঁপছে গণিশেরের দল, কাঁপছে ঘোড়াগুলো।

অপরাহ্ণের দিকে বৃষ্টি এলো জোরে। আমার তাঁবুটি বড় দরিদ্র। উপরের কাপড়টা পাতলা, মাঝে মাঝে টস টস করে জল গড়াচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় পর্দাটা স্থির থাকছে না। খোঁটা পুঁতে দড়িগুলি টেনে বাঁধা সত্ত্বেও তলা দিয়ে রাশি রাশি হওয়া ঢুকছে। কিন্তু নিরুপায় আর নিষ্ক্রিয় হয়ে সেই ঝুপসির মধ্যে চুপ করে বসে রইলুম। সেইখানে বসে নোটবই নিয়ে যেটুকু লিখে রেখেছিলুম, তার একটু অংশ এখানে তুলে দিই :

"পেন্সিল সরছে না ঠাণ্ডায়, হাত অবশ। তাঁবুর বাইরে কোনমতেই আসতে পাচ্ছিনে। সমস্ত গরম বস্ত্র আর শয্যাদ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে হচ্ছে। পহলগাঁওর পর থেকে উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ময়লা রুটির টুকরো চিবোতে হচ্ছে। এ অঞ্চল জনশূন্য, তৃণশূন্য, জল নেই, চা নেই। দুটো চল্‌তি দোকানে খাদ্যের নামে অখাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাঁবুর মধ্যে দিনমানটা কাটছে অত্যন্ত কষ্টে আর ঠাণ্ডায়। আকাশ পাণ্ডুর। দুরন্ত তুহিন ঝাপটের সঙ্গে মেঘের দৃশ্য ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছে। মাঝখানে নামলো বৃষ্টির সাপট, রাত্রির কথা মনে করে আমরা উদ্বিগ্ন হলুম। কয়েক ব্যক্তির আমাশয় হয়েছে এবং প্রায় পঁচিশজন লোক—মেয়ে আর পুরুষ, অধিকাংশ বাঙালী—তারা মেঘ এবং বৃষ্টির ফোঁটা দেখে পহলগাঁওর দিকে ফিরে চলেছে। আমার কিছুই করবার নেই। কেবল নিরুপায় হয়ে মাঝে মাঝে হাতঘড়িতে সময় দেখছি। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরাহ্ণ গড়িয়ে যাচ্ছে—"

তাঁবুর বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমাকে ডাকছে। বৃষ্টি পড়ছে বৈকি তখনও। কোন দুঃসংবাদ আছে কি পাহাড়ের দিক থেকে? কম্বল আর ওভারকোট সরিয়ে ঠাণ্ডা জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে বেরিয়ে এলুম তাঁবু থেকে।

দেখি সেই সপসপে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার সেই নবপরিচিত মিলিটারী বন্ধু—সেই চন্দনবাড়িতে গত রাত্রির পরিচয়সূত্রে—মিঃ মজুমদার এবং তাঁর পাশে একটি মোটা চশমাপরা তরুণী—ঈষৎ খর্বকায়া, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। মজুমদার বললেন, কাল রাত্তিরে আপনার সঙ্গে কথা না বলেই চলে গিয়েছিলুম, এত চমক লেগেছিল আপনাকে দেখে। ইনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছেন—মিস মুখার্জী। ইনিও 'আর্মি-মেডিক্যাল ইউনিটে'

আছেন। উনি এম. বি. বি. এস.। উনি কাল রাত্রে বিশ্বাস করেন নি, আপনি এসেছেন।

নমস্কার বিনিময়ের পর প্রশ্ন করলুম, আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই বাঙলা দেশে নয়?

হাসিমুখে শ্রীমতী মুখার্জী বললেন, কেমন করে বুঝলেন? আসুন আমাদের ওই তাঁবুতে, আপনাকে চা দিতে পারবো।

চললুম তাঁদের সঙ্গে। আন্দাজে বুঝতে পারি মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশের মধ্যে। চেহারাটা একেবারে রাঙা। দার্জিলিংয়ের ভূটিয়া ছেলেমেয়েদের মতো গাল দুটো ছোপ ছোপ লাল। তাঁবুতে এসে ঢুকে মেয়েটি বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাড়ি সিমলায়—বাবা থাকেন সেখানে। 'আর্মি মেডিক্যালে' কাজ করি, বাবার ইচ্ছে নয়।

হাসিমুখে বললুম, বাবার ইচ্ছেটা কি সহজেই বুঝতে পারি।

তিনজনেই হাসলুম। ফ্লাস্ক থেকে ওরা গরম চা ঢাললো। মজুমদার বললেন, আমরা 'অফ ডিউটি'তে আছি, তাই শ্রীনগর থেকে এবার বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলে অনেকেই আছেন, তবে বাঙালী আমরা শুধু দুজন।

মেয়েটি বললে, আমরা পাহাড়ে মানুষ, কিন্তু এই তিরিশ মাইল যে এত দুর্গম, আগে একবারও মনে হয়নি। আপনার কেদার-বদরির পথও কি এই রকম?

বললুম, মাত্র তিরিশ মাইলের মধ্যে এত দুঃসাধ্য পাহাড় কেদার-বদরির কোথাও নেই। সেখানেও দুর্গম এবং দুরারোহ আছে বহু ক্ষেত্রে—কিন্তু তারা ছড়িয়ে আছে দুশো মাইলে। এ ঠাণ্ডা কেদারে আছে, কিন্তু বদরিতে নেই।

মজুমদার শুধু বললেন, চড়াই এখনও অনেক বাকি।

মেয়েটি বললে, আরো?

হ্যাঁ, মোটামুটি সাড়ে সতেরো ফুট পর্যন্ত উঠবো, অনেক সময় আঠারো, তারপর নামবো পনেরোয়, তারপর আবার উঠবো ষোলয়।

মেয়েটি বললে, আমাদের কাছে সব রকমের জিনিস আছে, আপনার কিছু দরকার হলে আমরা দিতে পারবো।

ওদের তাঁবুর মেঝেতে মোটা চাটাই পাতা। বিছানাপত্রের ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো। আহারাদির আয়োজন সন্তোষজনক। ওদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্কটা নিয়ে আমার চোখে মুখে কিছু জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটছিল, কিন্তু কোনো অশোভন কৌতূহল পাছে প্রকাশ পায় এজন্য সতর্ক ছিলুম। ওদের মিলিত তীর্থযাত্রাটাকে মনে মনে সেদিন তারিফ করেছিলুম সন্দেহ নেই। মজুমদার এক সময়ে বললেন, একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, পুলিশ রিপোর্টে জানলুম। আজ সকালে একটি লোক হার্টফেল করে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। বোধ হয় নীচের দিকে তাকিয়ে আসছিল। জোয়ান লোক! ঘোড়ার পিঠের ওপরে থাকতেই মারা যায়!

বাইরে রীতিমতো বর্ষাকাল নেমে এলো। ঘন ঘোরালো সন্ধ্যা ছমছমিয়ে নামছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আবার বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু তাঁবুতে না ফিরে সোজা গেলুম এগিয়ে। তাপমাত্রা নেমে গেছে ৩০ ডিগ্রির নীচে শুনলুম। ওই তাঁবুতে সেই শিশুর কান্না এখনও থামেনি। আর কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, সবাই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে চারিদিক বন্ধ করে নিঃসাড়ে রয়েছে। গায়ে বৃষ্টি পড়ছে, পায়ের মোজা জুতো ভিজে। ঝাপসা মেঘ নেমেছে উপত্যকায়। প্রচণ্ড বাতাস ঘুরছে চারিদিকে। এতক্ষণে চোখ পড়লো চারিদিকের পাহাড়ে। প্রচুর বরফ পড়েছে অপরাহ্নের দিকে আমাদের আশে পাশে, এতক্ষণের মধ্যে

লক্ষ্য করিনি। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে বরফজলের ধারা। বেশী পরিমাণ বৃষ্টিতে কোনো তাঁবু নিরাপদ থাকবে না। আকাশের ভ্রূকুটি-করাল চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকলুম। সেখানে শোনা গেল, খানিকক্ষণ আগে মিলিটারীর লোক পুনরায় 'পরচা' জারি করে যাত্রীদের সতর্ক করে দিয়েছে।

দোকানের মধ্যে চাটাইয়ের উপর বসে কিছু আগুনের উত্তাপ পাওয়া গেল। আমার জলের পিপাসা শুনে দোকানদার শিখ সর্দার অবাক। আজ সকাল থেকে কেউই নাকি জলস্পর্শ করেনি। খাবার খেয়ে কেউ ঠাণ্ডা জল পান করে, এখানে এ খবর তাদের জানা নেই। চা ও রুটি এখানে মেলে, গরম পরটার অনেক দাম। তার সঙ্গে একটুখানি আলুর ঘাঁট। সব শেষে ফুটন্ত চা। গলার মধ্যে যখন যাচ্ছে, সে চা তখনও টগবগ করছে!

দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম তাঁবুর দিকে। সেই মেডিক্যাল ছাত্রবন্ধুরা ধরলো তাঁবুর পথে। তারা নাকি আমার কুশলবার্তা জানতে বেরিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে কোনো পক্ষেরই এখানে দাঁড়িয়ে দুটো প্রাণের কথা বলাবলির অবকাশ ছিল না। কোনোমতে বন্ধুত্বটা বজায় রেখে যে যার তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলুম। গলা বাড়িয়ে একবার হিমাংশুবাবুর সাড়া নিলুম. মনে হলো তিনি কতকটা যেন সুস্থ হয়েছেন। আমি তাঁকে খাবারের দোকানের খবর দিলুম।

তাঁবুর মধ্যে ঠাণ্ডাটা যেন জমাট বেঁধে রয়েছে, যেন তুষারাচ্ছন্ন গুহাগর্ভ। বাইরে গেলে শরীরটা নাড়া পায়, মাংসপেশী সচল থাকে। এখানে স্থাণু সুতরাং রক্ত চলাচল নেই। মাথা ঠেকে যাচ্ছে তাঁবুর আচ্ছাদনে! শুনতে পাচ্ছি, সপ সপ করে বৃষ্টি পড়ছে তার ওপর। জল চুঁইয়ে নামছে ভিতরে। দেশালাই জ্বেলে মোমবাতি ধরালুম। ঠাণ্ডা মোমবাতি, হাতে লাগে। সিগারেটের প্যাকেট, ঘটি, চায়ের পেয়ালা, চেয়ারের হাতল, বালিশ এবং আমার নিজের নাকের ডগা এতই ঠাণ্ডা যে, ছোঁওয়া যায় না। দেশালাই জ্বেলে মোমবাতির পলতে ধরাতে সময় লাগলো। জুতো জোড়া খুলে বিছানার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হলো। হিমগর্ভ জুতো!

দড়ি দিয়ে তাঁবুর পর্দাটা বেঁধে দিতে গিয়ে বুঝতে পারা গেল, আঙুলগুলো কোনোমতেই আজ আমার বাধ্য হবে না। বাইরে থেকে তুহিন বাতাসের ঝাপটায় মাঝে মাঝে সমস্ত তাঁবুটা নড়ে উঠছে। রাত্রে কোনো সময় গোটা তাঁবু যদি আমার উপর উল্টে পড়ে তাহলে যথেষ্ট রকম আহত হবো কিনা সেটা একবাব আন্দাজ করে নিলুম। এদিকে পিছনের পাহাড় থেকে নেমেছে বৃষ্টির ধারা। তাঁবুর তিন দিকে ইঞ্চি তিনেক সরু করে পরিখা কেটে দেওয়া হয়েছিল, জল নেমে এসে সেই পরিখা দিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে; ভিতরে আর জল আসছে না। পণ্ডিত শিউজি নিরুদ্দেশ, গণিশের এবং তার দলের লোকদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এইভাবে সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো এবং এইভাবেই সেদিন রাত্রি ঘনিয়ে এলো। বৃষ্টি পড়ছিল সপসপিয়ে।

তাঁবুর বাইরে ঘোলাটে অন্ধকার। পাঁজি অনুসারে আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। একপ্রকার আলো দেখা যাচ্ছে বাইরের এই মৃত্যু-উপত্যকায়,—যে-আলোটা ঠিক নৈসর্গিক নয়। এমনি আলো দেখা দিল কেদারনাথের তুষার প্রান্তরে। কিছু আলো আসছে মেঘাবৃত আকাশ থেকে, কিছু আলো তুষারচূড়া থেকে প্রতিফলিত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয় গহন অরণ্যলোক, কিংবা বনময় গ্রাম। কিন্তু ঘোর অমাবস্যার দিনেও উন্মুক্ত প্রান্তর সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না! এখানে সমস্ত বর্ষণ এবং দুর্যোগের মধ্যেও আলোর আভা দেখছি, কিন্তু দশ হাত দূরেও কিছু চিনতে পাচ্ছিনে। একবার ঝাঁসীতে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গের মধ্যে

ঢুকে হামামের ভিতরে গিয়েছিলুম। চতুর্দিক অন্ধকারে ঝুপসি, কিন্তু স্ফটিকের থেকে ছিল একটা বিচ্ছুরিত আভা,—সেই আভায় হামামটাকে চিনতে পারা যায়! এখানকার আকাশ-বিচ্ছুরিত সেই আলোর আভায় এবং তুষার-প্রতিবিম্বিত আলোয় দেখতে পাচ্ছি ওই অসাড় প্রান্তরের মৃত্যুপাণ্ডুরতা। দেখলে ভয় করে। পৃথিবী এখান থেকে অনেক দূরে ফেলে এসেছি সেই পৃথিবীকে কবে কোথায়—সেই স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। হয়ত সেখানে এখন আকাশভরা জ্যোৎস্নার রোমাঞ্চ হরষ, হয়ত সেখানে এখন শরতের মধুর মদিরতা!

কম্বলের মধ্যে ডুব দিয়ে বহুক্ষণ নিজের হাত দু'খানা মুচড়ে-মুচড়ে আঙুলগুলোকে একটু সচল করা গেল। তারপর ঠাণ্ডা নোটবইখানা খুলে তার পৃষ্ঠায় কোনোমতে পেন্সিল চালাতে লাগলুম :

"আর কিছু করবার নেই। নিরুপায়ের মতো প্রহর গুনছি। দুরন্ত বাতাস বইছে। বর্ষা নেমেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে কোনোমতেই নিজেকে গরম করে তোলা যাচ্ছে না। কতক্ষণ নোটবইখানা আলোর সামনে ধরে রাখতে পারবো জানিনে, কারণ মুহূর্তে মুহূর্তে হাত অবশ হয়ে আসছে। সিগারেট ধরানো যাবে না, কারণ ওর জন্য হাত এবং মুখ বার করে রাখতে হয়। বিছানার মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চল না থেকে উপায় নেই, কেননা যেটুকু জায়গা নিয়ে দেহটা স্থির হয়ে রয়েছে, তার এক ইঞ্চি এপাশ ওপাশ হলে বরফের ছেঁকা লাগছে বিছানার মধ্যেই। উপর থেকে মাঝে মাঝে টসটসিয়ে বিছানার ওপর বরফ-জলের ফোঁটা পড়ছে। রাত্রে নিদ্রা যাবার মতো উত্তাপ সৃষ্টি বিছানার মধ্যে হবে কিনা বলা কঠিন। সমস্ত শরীর কনকন করছে শীতের যন্ত্রণায়। রাত এখন প্রায় বারোটা। মোমবাতি নিভে আসছে—"

সহসা বাইরে কিসের আওয়াজ। অত্যন্ত ক্ষীণ কান্নার শব্দ! কান পেতে শুনে বুঝতে পারা গেল, সেই শিশুটির কান্না এখনও থামেনি। প্রকৃতি ওকে অমনি করে কাঁদাচ্ছে সারাদিনরাত। শীতের যন্ত্রণায় যত কাঁদবে ততই ওর দেহটুকুর মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হবে। এছাড়া ওর বাঁচবার উপায় নেই!

না, ভুল করছি। শিশুর কান্না নয়,—অন্য কিছু। ক্ষুধাতুর, সর্বহারা যন্ত্রণাজর্জর মানুষের মৃত্যুর ঠিক আগেকার কান্না। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম। দেখতে দেখতে সেই কান্না যখন আমার তাঁবুর ঠিক পাশের থেকে হঠাৎ শোনা গেল,—তখন বুঝতে পারলুম, এ কান্না মানুষের নয়, আমাদেরই ঘোড়াগুলির। একটা দীর্ঘ শীর্ণ সকরুণ আওয়াজ অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে, যে কণ্ঠস্বর আগে আমার এমন করে জানা ছিল না। উপযুক্ত খাদ্য ওদের সারাদিনে জোটে না, ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা বয়ে আনে, চন্দনবাড়ির পর আর বিশেষ কোথাও ঘাস খুঁজে পায় না, ঠাণ্ডায় আশ্রয় নেই কোথাও, তুষারের হাওয়ায় আর বৃষ্টিতে পাগুলো ধীরে ধীরে জমে আসছে,—এবং একজোড়া পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। ওরা তাই অমন স্খলিত ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওদের ভাগ্যনিয়ন্তার কাছে! সমস্ত সৌরবিশ্বের দিকে এক একবার উঁচু গলায় তাকিয়ে যন্ত্রণাজর্জর কণ্ঠে অন্তিম ঘৃণা প্রকাশ করে চলেছে! আমার আরামের বিছানাটা দেখতে দেখতে যেন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠলো!

বাবু!

তাঁবুর বাইরে গণিশের ও তার সঙ্গীর সাড়া পেলুম। মোমবাতির ক্ষীণ আলোটা তখনও নেভেনি। সাড়া দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম, কি চাই?

পর্দাটার গেরো খুলে ওবা ভিতরে এলো। সর্বাঙ্গে বৃষ্টির জল। ওরা নিজেদের ভাষায় বললে, বহুৎ মুশ্‌কিল্ হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের একটা ঘোড়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পাহাড়ের গায়ে উঠেছিল ঘাস খেতে। আহমদ মিঞা ওকে খুঁজতে খুঁজতে এই তাঁবুর পাশের পাহাড় বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায়,—'বহুৎ বারিস হোতা হ্যায় পাহাড়মে—'

বললুম, তারপর? ঘোড়া পেলে?

নহি।—গণি বলতে লাগলো, পাহাড়ের ওপরে অনেক গুম্ফা, সেখানে ঘোড়া ঢুকেছে কিনা এই তদারক করতে গিয়ে হঠাৎ বিপদ! ঘোড়ে ত নহি মিলা, পরন্তু একঠো কালা জান্‌বর গুম্ফাসে নিকাল্‌কে আহমদকো উপর তাং কিয়া,—আহমদ ডরসে ভাগা।

কেমন জানোয়ার? বাঘ?

মালুম নেহি পড়া! শের ইধর নহি মিলি, ভ্যাল হো শক্‌তা! ব্যস, হিঁয়াসে দো রসি উপর! উ ত হ্যায় হুঁয়া!

ঈষৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, ভালুকটা আমাদের তাঁবুর দিকে নেমে আসতে পারে মনে করো?

গণিশের বললে, মালুম হোতা কি এত্‌না বারিষমে কোই জান্‌বর উৎরেগা নহি!

কিন্তু ঘোড়াটাকে যদি ওটা মারে, তবে কাল আমাদের গতি কি হবে? কেমন করে পৌঁছবো?

গণিশের ও আহমদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর যাবার সময় বলে গেল, কাল ভোর হলেই আবার ঘোড়াটাকে খুঁজতে বেরোবো, হাতিয়ার লেকে যায়েঙ্গে!

ওরা চলে যাবার পর মোমবাতিটা এক সময় শেষ শিখা উঁচিয়ে নিভে গেল। তারপর ভিতরটা নিঃঝুম নীরেট ঠাণ্ডা অন্ধকার। সমস্ত তাঁবুর বোঝাটা যেন বুকের ওপর চেপে ধরেছে। কম্বল আর ওভারকোটের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, কতক্ষণে সেই কালো মস্ত জানোয়ারটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে প্রথমেই আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকবে, এবং বড় বড় নখবযুক্ত দুখানা হাত দিয়ে আমার পা ধরে টানবে!

পা দুখানা হিম হয়ে আসছে। ঘোড়ার কান্না।—সেই বুকফাটা কান্না চলতে লাগলো অবিশ্রান্ত। প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করে রইলুম।

নিদ্রার মতো উত্তাপ কোনোমতেই পাওয়া গেল না। অতএব চার পাঁচ ঘণ্টা পরে মুখের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে দেখলুম, প্রভাতের স্বচ্ছতা চিকচিক করছে তাঁবুর পর্দার ফাঁকটুকু দিয়ে। ব্যস, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। নিদ্রার অভাবে কোনো ক্লান্তি কিংবা অবসাদ বোধ করছিনে। আমি কেবল চাচ্ছিলুম উত্তাপ। একটুখানি আগুন,—একপেয়ালা চা, এক ঘটি গরম জল। উঠে বাইরে এসে দেখি, এক আধজন যাত্রী এবং বৈরাগী এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে হি হি করতে করতে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। পাহাড়-পর্বতের দিকে প্রভাতকালে সব চেয়ে কম দুর্যোগ, যত বেলা বাড়ে, ততই অবস্থা বদলায়। বরফ পড়তে থাকে সাধারণত বেলা নটা দশটার পর থেকে। যাই হোক, গতকাল সন্ধ্যা অপেক্ষা এখন আকাশের অবস্থা উন্নত। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের কথা স্মরণ করে কখন যেন মৃত্যুভয় ঢুকেছিল মনে,—কালো সরীসৃপ যেমন ঢোকে গর্তে। এবার থেকে আর ভয় পাবো না,—কোনোমতেই ভয়কে প্রশ্রয় দেবো না। ভয় মানেই মৃত্যু। ভালুক থাক্

পাহাড়ের চূড়ায়, আকাশে থাক্ দুর্যোগ, থাক্ তুহিন ঢাকা আমাদের সমস্ত পথ,—ভয় আর পাবো না। অতএব পর পর গোটা দুই সিগারেট টেনে রুমাল দিয়ে এলুমিনিয়মের ভয়ানক ঠাণ্ডা ঘটির কানাটা ধরে সোজা গেলুম সেই শিখসর্দারের চা-খাবারের দোকানে। সবেমাত্র সে কাঠ দিয়েছে উনুনে—আমি তার প্রথম খদ্দের। গত পরশুদিন চন্দনবাড়ি থেকে সর্দার এনেছে দুধ, সেই দুধেই চা তৈরী হয়ে আছে দুদিন থেকে। সেটা কেবল আমাকে গরম করে দেবে মাত্র। সেই ঘোলাটে ফুটন্ত জলটুকুর দাম চার আনা। হোক চার আনা, দুঃখ করবো না। কিন্তু ওই সঙ্গে একঘটি ফুটন্ত জল না পেলে আমার কিছুতেই চলবে না। গতকাল এক টাকার কাঠ খরচ হয়েছে, কিন্তু জল গরম হয়নি। শিউজি বলেছে, পাঁচ টাকা খরচ করলেও একটি গাছের ডালও আর পাওয়া যাবে না। কাঠ নেই এ অঞ্চলে।

হিমাংশুবাবুকে সকালের দিকে একটু সুস্থ দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে মোটা লেপ ছিল, সুতরাং ঘুমোতে পেরেছিলেন। পরম্পরায় জানা গেল, মিলিটারীর লোকেরা পুনরায় 'পরচা' বার করেছে,—তাদের বিনা হুকুমে কেউ আজ অগ্রসর হতে পারবে না। যদি কেউ যায়, তবে তার নিজের দায়িত্বে। রাজসরকার নিজের ওপর কোনো ঝুঁকি নেবে না। আজকের আবহাওয়া সংবাদ নাকি ভালো নয়! আমাদের সামনে এখনও মহাগুনাস্ গিরিসঙ্কট বাকি, তারপর বাকি পঞ্চতরণী, সেখানকার পথে একাধিক স্রোতস্বতী অতিক্রম করে যেতে হবে। পঞ্চতর্ণী অথবা পঞ্চতরণী যাই বলো—সেখান থেকে অমরনাথ আর মাত্র চার-পাঁচ মাইল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছে। আমাদের নির্বোধ বানিয়ে প্রকৃতি দেখাচ্ছে তার নানা চটুল রঙ্গ। ভয় দেখাচ্ছে, ভাবনায় ফেলছে, দেখাচ্ছে কখনও ঊষর অনুর্বর দিকদিগন্ত, নিয়ে যাচ্ছে কখনও সহস্র বরনের কুসুমাস্তীর্ণ উপত্যকা-পথে, কখনও গিরিগাত্রের নির্ঝরিণীর পাশ কাটিয়ে, কখনও বা বিজনতায় ভীষণতায় মহাশূন্যচারিণী রাক্ষসীরূপিণীর আলুথালু তুষার ঝটিকায় উন্মত্ত রণরঙ্গের মাঝখানে। সেইজন্য দুরবস্থার মধ্যে মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও রস পাচ্ছি মনে মনে। রসো বৈ স—তিনি রসের মধ্যে আছেন! ঈশ্বর যদি রসের মধ্যে থাকেন, তবে রাজি আছি। রস পাচ্ছি বলেই অমরনাথ—নইলে গুহা ছাড়া কিছু নয়, এমন কোনো যাত্রী দেখিনি—বুড়ো-বুড়ি ধরেই বলছি—যারা তীর্থপথ থেকে ফিরে গিয়ে অনুশোচনা করেছে! রস পায় বলেই তীর্থ। তিনি রসময়! ওই রসে মৌমাছির মতো ডুবে মরে তীর্থযাত্রীরা। আমরা দুর্গমে রস পাই, রস পাই দুঃসাধ্য পথে, রস পাই মৃত্যুকে কলা দেখিয়ে পালানোয়, বস পাই অবশ্যম্ভাবী আত্মনিগ্রহে! নইলে কালীঘাট ছেড়ে ছুটি কেন কামাখ্যায়? কাশীর কেদার ছেড়ে কেন ছুটি কেদারনাথে আর পশুপতিনাথে? যদি কেউ এখন প্রশ্ন করে, ঈশ্বরকে চাও, না অমবনাথ যেতে চাও? তৎক্ষণাৎ জবাব দেবো, ঈশ্বর আপাতত থাক্, অমরনাথ যেতে চাই! অমরনাথ যাত্রায় রস! বিনিদ্র রাত্রি যাপনে রস, ভল্লুকাতঙ্কে রস, উপবাসে আর বিপদাশঙ্কায় রস, চাবিদিকের গগনস্পর্শী পর্বতমালা এক রাত্রের মধ্যে তুষারধবল হয়ে গেছে—ওর আশ্চর্য সৌন্দর্যতেই রস!

ওই সময় ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলুম এই কটি কথা :

"সকালে চা নেই, খাদ্য নেই, শৌচাদি সম্ভব নয়,—জলের ব্যবহার অভাবনীয়। যে যার তাঁবুর মধ্যে রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। বাইরের চড়া হাওয়ায়, ঠাণ্ডায়, বৃষ্টিতে বেরোবার সাহস কারো হচ্ছে না। পাহাড়ের উপরে তুষারপাত হচ্ছে, দল বেঁধে মেঘেরা নামছে নীচে আমাদের তাঁবুর ওপর। মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছি মেঘের মধ্যে। আশা ভরসা

আর খুঁজে পাচ্ছিনে। আমাদের তাঁবুগুলি ভিজে সপসপ করছে। ঘোড়াগুলির করুণ চীৎকার এখনও থামেনি। এমন সময় আকাশ কিছুক্ষণের জন্য একটু স্বচ্ছ হয়ে এলো। বৃষ্টি আপাতত থামলো। পুলিশের তাঁবু থেকে খবব এলো, আমরা পঞ্চতরণীর দিকে এবার যাত্রা করতে পারি। বেলা তখন ন'টা বেজে গেছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁবুগুলি উপ্‌ড়ে তুলে নিয়ে আমরা যখন যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন গণিশেরের লোক এসে জানালো, হারানো ঘোড়াটা প্রায় দুমাইল দূরে পাহাড়ের পথ থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে। আমরা এই সুসংবাদে নতুন করে সাহস পেয়ে যাত্রা করলুম।''

আজকের পথ অত্যন্ত পিছল এবং সঙ্কটসঙ্কুল। সারবন্দী ঘোড়ারা যখন মালপত্র এবং সওয়ার নিয়ে রওনা হলো তখন আবার খবর পেলুম, প্রায় তিরিশজন যাত্রী বৃষ্টি-বাদলের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে পহলগাঁওর দিকে রওনা হয়েছে। তাদের মধ্যে 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' কয়েকজন যাত্রীও ছিল। পথে দেখছি, পাঞ্জাবী মেয়েরা সবচেয়ে শক্ত। তাদের অধ্যবসায় অক্লান্ত। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এক সময় ঠিকই তারা গিয়ে পৌঁছয়। শক্তিতে পুরুষ হলো প্রধান,—কারণ সে জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা। পরিশ্রমে মেয়ে হলো প্রধান,---কারণ সে ধৈর্যশীল। অপবিসীম পরিশ্রম করে মেযে ওই কোমলাঙ্গে৷ কী নধর, কী পেলব,—কিন্তু ভিতরে কী কঠিন! পৃথিবীর বলিষ্ঠতম পুরুষ জন্মায় ওই নবনীতকোমলার জঠরে; দিগ্বিজয়যাত্রায় ঐশ্বরিক শক্তি খুঁজে প্রায় পুরুষ ওই লাবণ্যলতার প্রাণদায়িনী স্তনো! সেইজন্য পুরুষ ওদের প্রিয়,—চিরশিশু বলেই প্রিয়! প্রতিভাধর পুরুষকে দেখে ওরা আনন্দ পায়,—জানে, সে ওদেরই দেহনিঃসৃত; বর্বর পুরুষকে দেখে ওরা কৌতুক বোধ করে,---জানে, ওদেরই স্তন্যপায়ীর এই রণরসরঙ্গ! ওরা কোনো চেহারায় পুরুষকে দেখে ভয় পায় না,—কেননা ওরা শক্তিরূপিণী! সেই কাবণে মহাশক্তির ভিন্ন নাম হলো অভয়া! অভয়া একই জঠরে ধারণ করেন দেবতা ও অসুরকে। এই দেবাসুরের নিত্য দ্বন্দ্বে তিনি প্রমত্তা। কখনও তিনি জগদ্ধাত্রী, কখনও বা মহাকালী। একই শক্তি, কিন্তু বিভিন্ন তার অভিব্যক্তি।

ধীরে ধীরে আমাদের ক্যারাভান পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করছে। এবার চলেছি পূর্বলোকে। পথ বড় কষ্টসাধ্য, বড় প্রস্তরসঙ্কুল, বড়ই বিপজ্জনক। গণিশের লাগাম ধরে চলেছে। মাঝে মাঝে কণ্টকিত সওয়ারকে পরম বন্ধুর মতো অভয় দান করছে, 'ডরো মৎ।' ডরিয়ে উঠছে অনেকে সামনে আর পিছনে। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছি সবাই, কিন্তু আমরা যেন বেপরোয়া। যত উপরে উঠছি,—একটির পর একটি ধবলচূড়া। বরফ পড়ছে তখনও পর্বতমালায়—দেখতে পাচ্ছি তাদের অস্পষ্ট ধূম্রজাল। বৃদ্ধ, যুবা, স্থবির, ধনী, দরিদ্র, সাধু, শিশু, নারী, পণ্ডিত, পাণ্ডা, মুসলমান, মিলিটারী---সবাই চলেছে ওই একই লক্ষ্যে। চলেছে ঘোড়া, ডাণ্ডি, মিউল্‌,—চলেছে ভাটপাড়ার দল, চলেছে কুণ্ডু স্পেশ্যাল, চলেছে পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র তামিল বিহার আর বোম্বাই। বায়ুযানে যতটুকু নামতে হয়েছিল, আবার চড়াই পথে উঠে আসতে হলো আন্দাজ হাজার ফুট। নিঃশ্বাসের জন্য অনেকেই কষ্ট পাচ্ছে, অনেকেরই বমির ভাব। দেখতে দেখতে ষোল হাজার ফুটের উপত্যকায় এসে পৌঁছলুম। আকাশ বড় হয়ে উঠলো, সামনে পাওয়া গেল উঁচুনীচু ময়দান। আশেপাশে জমাট বরফের ভিতর থেকে জলের প্রবাহ আসছে, দেখতে পাচ্ছি তুষারাচ্ছন্ন নদী আর হিমবাহ, দেখতে পাচ্ছি সহস্র বৈচিত্র্যভরা বহুবর্ণ কুসুমলতাবল্লরী আস্তীর্ণ পথে পথে। গাছপালা কোথাও নেই, চিহ্ন নেই কোনো ফলনের, মানুষের ছায়ামাত্র নেই

দূরদূরান্তরে। কোথাও কোথাও শুক্‌নো সাদা কঙ্কাল, কোথাও বা গত বছরের যাত্রী সমাগমের চিহ্ন ছড়ানো। আমরা সারবন্দী চলেছি। মাঝে মাঝে অশ্বরক্ষীর গলার আওয়াজ—'হৌস, সাব্বাস, হৌস সাব্বাস'—প্রান্তরে আর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কখনও চলতে চলতে দেখছি একই পাথরে বহুবর্ণসমন্বয়, কখনও নীল ফুলের আস্তরণ, কখনও নাকে আসছে জলপ্রপাতের সঙ্গে তীব্র গন্ধকের গন্ধ,—অনুর্বর পর্বতরাজির শিরে শত শত ক্ষয়িষ্ণু মৃন্ময় ক্লিফ্। সামনে দিয়ে অগম্য পায়ে চলা পথ গেছে জোজিলা গিরিসঙ্কটে, লাডাকের পথ ঘুরে ঘুরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, পূর্ব প্রান্তে তিব্বতের দুরতিক্রম্য পর্বতমালা দেশান্তের বিরাট প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে—অজর অমর অনাদি-অনন্ত! আমরা কখনও নামছি নীচে—নদী-ঝরনা পার হচ্ছি, কখনও উঠছি উপরে। চারিদিকের পার্বত্য প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে এইভাবে মহাগুনাস গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে চলেছি। নদীর গতি ছিল এতকাল আমাদের পিছনদিকে, এবার তাদের বিপরীত গতি। আমরা চলেছি নদীপ্রবাহপথ ধরে।

সহসা আমাদের গতি রুদ্ধ হলো। ছয় হাজার বছর আগে এখানে নাকি এক ঋষি এসেছিলেন হিমালয়ের কোন্ প্রান্ত থেকে। তিনি মহাগুনাসের নৈসর্গিক শোভা দেখে পথের ধারে থমকে দাঁড়ান্, এবং কালক্রমে প্রস্তরীভূত (fossilised?) হয়ে যান্। পথের বাঁদিকে একটু পাশে সেই ঋষির আয়তন পাহাড়ের সঙ্গে মিশে একাকী দাঁড়িয়ে। আমরা স্তব্ধ, বিমূঢ়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এমন একটা মানুষের আকার-আয়তন কল্পনা করা আছে। আমরা যেন অনেকটা মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেই আয়তনকে (outline) এককালের ঋষি বলে ভাবতে লাগলুম। ঝাঁঝরা পাথরে আকৃত একটা অদ্ভুত মানুষের কল্পনা সহসা মনে আসে বৈকি। বিচিত্রবর্ণ পাথরে, নানা রংয়ের ফুলে ও লতায়, বিভিন্ন গুল্মে ও শিকড়ে এবং পরিশেষে মানব-অবযবের কল্পনায় দৃশ্যটা অভিনব সন্দেহ নেই। শোনা গেল, বহু শত বছর ধরে বহু সহস্র যাত্রী এর কাছে পূজা নিবেদন করে চলে যায়।

সুদূর আকাশে হঠাৎ এক সময়ে গুরু গুরু ঘোষণা শোনা গেল। চেয়ে দেখি, দুগ্ধ-শুভ্র পর্বতমালার উপর দিয়ে আবার মলিন মেঘদলের ষড়যন্ত্র চলছে। আবার দেখতে দেখতে যাত্রীদের মুখে চোখে আতঙ্ক দেখা দিল। মাঝপথে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। এখনও অনেক পথ বাকি। পাহাড়ে দ্রুতগতিতে চলা যায় না। অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল পথ। বছরে মাত্র দুটি দিন মানুষে এই পথ মাড়ায়। একবার যায়, একবার ফেরে। পায়ে হাঁটা সবচেয়ে নিরাপদ। যদি মৃত্যু হয়, তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযোগে, আর নম্লত পাহাড়ি আমাশয়ে,—অন্য অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। সবচেয়ে সুবিধা ঘোড়া কিংবা ডাণ্ডি, কিন্তু দুটোতেই ভয়। হিমাংশুবাবু বললেন, জনৈক যাত্রী ডাণ্ডিতে যাচ্ছিল পাহাড়ে। ঘণ্টা চারেক পরে ডাণ্ডিওয়ালারা আবিষ্কার করলো যাত্রীটি মৃত,—ভয়ে ও ঠাণ্ডায় কখন মরেছে জানা যায়নি।

লাগাম কষে ধরেছে গণিশের। পথ নেই, আছে পেরিয়ে যাবার একটা রেখা। কাঠ হয়ে আছি ঘোড়ার পিঠে। দুখানা হাতই অচেতন। বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছি ঘোড়ার পিঠ, সেই মুষ্টি মৃত্যুর পরেও হয়ত আলগা হবে না। জমাট কঠিন মুষ্টি পাথরের মতো হয়ে থাকবে। ডান হাঁটু প্রায় ঠেকছে পাহাড়ে, বাঁ-হাঁটুর পাশে গভীর খাদ—হাজার ফুট নীচু। একটু ভারসাম্যের এদিক ওদিক, ব্যস,—অবধারিত মৃত্যু! গণিশের মাঝে মাঝে সেই অভয়বাণী উচ্চারণ করছে,—'ডরো মৎ।' বৃষ্টি এলো ফোঁটায় ফোঁটায়, এলো আবার তুহিনের

ঝাপটা, এলো সেই ১৯২৮-এর সম্ভাবনা। আসুক, তবু বলে যাবো—যা দেখে গেলুম এর তুলনা কোথাও নেই। নীলগঙ্গা আর অমরাবতীর তীরে তীরে কাশ্মীরের অমৃত আত্মাকে দর্শন করে গেলুম। জেনে গেলুম এই পথে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল কাটানো চলে। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য কল্পনা, শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের পরম মধুর ভাবনা, শ্রেষ্ঠ যোগ ও সাধনা—মানবাত্মার নিগূঢ় রহস্যালোক থেকে যা কিছু উদ্ভূত হয়—এই পথে যেন তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

বৃষ্টির ধারা নামছে। সমস্ত শরীর আবৃত মোটা গরম পোশাকে। শুধু নিজের নাক এবং তার চারদিকে ঘা ফুটছে কাল থেকে। হাতের দস্তানা খুলেছি। বৃষ্টিতে ভিজছে মুখ আর হাত। দেখতে দেখতে ঘন বৃষ্টিধারা। কিন্তু আমরা শান্ত,—এ আমাদের ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার পরীক্ষা। এবার চূড়া থেকে এঁকে বেঁকে পাকদণ্ডী দিয়ে নামতে থাকি। এতটুকু ভুল, ঈষৎ পদস্খলন, সামান্য বিভ্রান্তি, একটুখানি দ্রুতগতির চেষ্টা,—নিশ্চিত অপঘাত। একটি স্বাস্থ্যবতী পাঞ্জাবী তরুণী তার কমরেডকে নিয়ে ছোটবার চেষ্টা করেছিল দেখেছিলুম। পরে হিমাংশুবাবুর কাছে শুনতে পাই, নিজের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মেয়েটি ছিটকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। হিমালয় কখনও বদ্‌সাহসীকে ক্ষমা করে না।

অমরাবতী নদীর দিকে নামছি। কেউ কেউ বলে অমরগঙ্গা। এই অমরগঙ্গার পাঁচটি ধারা এখানকার আশেপাশে রয়েছে এবং ওই পাঁচটি ধারা পেরিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছবো পঞ্চতরণীর প্রশস্ত ময়দানে। এই গঙ্গার চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতমালা অতি অপরূপ। পর্বতের পাদমূল বলেই এখানে নানাদিকে নেমেছে গিরিনদীর দল। কতকগুলি অদূরে তিব্বতে এবং কয়েকটি মিলেছে নিকটবর্তী সিন্ধুনদে। আমাদের সামনে বিরাট ভৈরবঘাটের পর্বতচূড়া এবং তারই পাশে অমরনাথ পর্বতের তুষারশৃঙ্গ। গুহা কোথায় জানিনে। শুধু জানি ভৈরবঘাট পর্বত অতিক্রম করে আমাদের আরোহণ করতে হবে অমরনাথ পর্বতে।

আবছায়া অন্ধকারে দিকদিগন্ত ঘিরে মুষলধারায় বৃষ্টি নামলো। ঠিক পঁচিশ বছর আগে এইখানে এইপ্রকার বৃষ্টিতে নেমে এসেছিল বিরাটকায়া তুষারনদী মূল পাহাড়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। পরের বছরে শত শত লোকের কঙ্কাল এই মৃত্যু উপত্যকায় খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রবল বৃষ্টি ও তুহিন ঝড়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করা চলছে না। আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায় এবং শান্তভাবে এক এক পা করে নদীর দিকে চললুম। বৃষ্টির প্রবল ধারায় আমরা দিশাহারা হয়ে গেলুম।

এই আমাদের কপালে ছিল। ভাগ্যদেবতা কানে-কানে বললেন, ভয় নেই, তোদের মারবো না, কেবল শীতের চাবুকে ঠাণ্ডা করবো। এই দ্যাখ্, মুষলধারায় বৃষ্টি। এবার বল্ ঈশ্বরকে মানিস কিনা?

শোনো কথা। পৃথিবীর বহু ঈশ্বর-ভক্তের চোখে দিনরাত অশ্রু গড়ায় কেন? মার খেয়ে তাদের হাড়পাঁজরা ভাঙে কেন? পুণ্যের সংসারে কেন আগুন লাগে? ভক্তিমতী বিধবার একমাত্র সন্তান কেন মরে অপঘাতে?

আবার তর্ক? তর্কে পাবি কিছু? তবে নে,—মর!

মনে মনে বললুম, যাবার সময় মেরো না, দোহাই। ফিরতি পথে 'এভালান্স্' পাঠিয়ো—একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবো। সেই ভালো। ছা-পোষা লোক, দেশে গিয়ে আর

দুঃখ পেতে হবে না! মরে বাঁচবো!

পিছন থেকে হিমাংশুবাবু চেঁচালেন,—ও মশাই, এ কি হলো?

প্রবল বৃষ্টির ঝাপটায় আমাদের ঘোড়া স্থির থাকছে না। গণিশেরের কাছে ছিল আমার ছাতা। ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই সেই ছাতা নিলুম বাঁহাতে। কিন্তু এক হাতে ঘোড়ার পিঠে ভারসাম্য রক্ষা করা যে ভয়ানক সমস্যা। উত্তরদিক থেকে নদী বয়ে এসে ছুটছে পূর্বদিকে। এই মস্ত নদী আমাদের পেরোতে হবে। ঠাণ্ডায় অসাড় হচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু ওর মধ্যেই অতি সন্তর্পণে ছাতা নিয়ে বাঁ হাতে ধরে থাকতে হলো। নদীর খানিকটা অংশ পায়ে হাঁটা, খানিকটা সাঁকো। সামনে পিছনে মেঘের মধ্যে আমরা ডুবেছি। তার উপরে আবার প্রবল বারিধারার জন্য একটা আবছায়া যাদুজাল সৃষ্টি হয়েছে। যতদূর দক্ষিণে দৃষ্টি চলছে, পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু তুষারের মুকুট। একদিকে লাডাক, একদিকে তিব্বত, উত্তর-পশ্চিমে জোজিলা গিরিপথ এবং উত্তর-পূর্বে ভৈরবঘাট পেরিয়ে অমরনাথ পর্বতচূড়া। নীচে এই খরস্রোতা অমরাবতী নদী—যাকে বলা হচ্ছে অমরগঙ্গা। আমরা পুনরায় ষোল থেকে পনেরো হাজার ফুটে নেমেছি।

বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় আমাদের ধাক্কা দিচ্ছে। হিমাংশুর সর্বাঙ্গ—মাথা সমেত—ঢাকা আছে পাতলা প্লাস্টিকের ওয়াটারপ্রুফে। আমি ভিজছি মোটা জামা ও প্যান্ট সমেত। জল লাগছে হাতে পায়ে পিঠে—কেবল ছাতার জন্য বাঁচছে মাত্র মাথাটা। বরং মাথাটা গিয়ে বাকিগুলো বাঁচলে কাজ দিত। আমরা সাঁকো পার হচ্ছিলুম। ভাগ্যবিধাতার চেষ্টা ছিল, ঘোড়াসুদ্ধ ধাক্কা দিয়ে নদীগর্ভে তিনি আমাদের ফেলে দেন্ এবং ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু গণিশেরের কাছে তিনি পরাজিত, তাঁর কৌতুকরঙ্গ গণিশের বোঝে—সেইকারণে সে সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকে। ধীরে ধীরে আমরা সেই প্রবল বারিবর্ষণের ভিতর দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠলুম। ওপারে বালু ও পাথরের চড়া,—তারই পিছনে বিস্তৃত পঞ্চতরণীর তুহিন উপত্যকা। উপত্যকার পিছনে ভৈরবঘাটের বিশাল পর্বতচূড়া তুষারমণ্ডিত। চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি সব, চোখ থেকে আমাদের কিছু না হারায়। এখানে আমার ডায়েরী থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করি :

"ধীরে ধীরে তিন মাইল বরফানি বাতাসের ভিতর দিয়ে নদীগর্ভে এসে নামলুম। ঝড়বৃষ্টিব ঝাপটায় কোনো কিছু দেখতে পারলুম না। কে কোথায় রইলো, কার কি গতি হলো কে জানে। ঘোড়ার উপরে বসে সর্বশরীর ঠাণ্ডায় সিটিয়ে উঠছে। এখানে তাপমাত্রা বলতে আব কিছু নেই। ভয়ের কথা এই, সমস্ত জামা কাপড় এবং বিছানাপত্র ভিজে থক থক করছে। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি যেন। নদী পেরিয়ে এপারে এলুম। মাথার উপরে বরফের চূড়া। তুহিন বাতাস মুহুর্মুহু ঝাপটা দিয়ে চলেছে তুষার ঝড়ের মতো। কিন্তু সমস্তটা কী অপরূপ, কী অভিনব আমাদের চোখে। সর্বপ্রকার বিপদ আপদের বাইরে এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির যে স্বাভাবিক শোভা দেখে গেলুম, সেই ত আমাদের পরম পুরস্কার। তাকেই ত লালন করবো মনে মনে চিরদিন! যাই হোক, খানিকটা চড়াই উঠে গিয়ে বিস্তৃত পঞ্চতরণীর উপত্যকা পাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছে সেই বৃষ্টির মধ্যে ধৈর্য সহকারে গণিশের আমাদের তাঁবু খাটিয়ে দিল। বেলা তখন দুটো বেজে গেছে। হিমাংশুবাবু তাঁবুর মধ্যে ঢুকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন, আর তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। আমরা হাড়ের মধ্যে ঠক ঠক করে কাঁপছি, কষ্ট পাচ্ছি এবং আর্তনাদ করছি। পকেটে খান দুই বিস্কুট ছাড়া এই দুর্যোগে আর কোনো আহারাদির কথা ওঠে না। গরম

চা স্বপ্ন! তাঁবু থেকে কারো বেরোবার সাহস হচ্ছে না। কেমন করে আহার অন্বেষণ করা হবে কেউ জানে না। নীচে দিয়ে নদী বইছে, তার ধাবে এই তুহিন প্রান্তর। কোথাও কোথাও একটু আধটু ঘাস দেখতে পাচ্ছি। বাদ বাকি সমস্তটাই শূন্য ধূসর আবছায়াময় জনচিহ্নহীন পার্বত্য প্রকৃতি। তাঁবুর মধ্যে বসে যখন এই কথাগুলি এলোমেলোভাবে লিখে যাচ্ছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা। শরীরের নীচের দিকটা বলতে গেলে অসাড় হয়ে গেছে এই বৃষ্টিবাদলের ঠাণ্ডায়।"

বৃষ্টি কমে গেছে সন্ধ্যার পর। কিন্তু তাঁবুর বাইরে আর কোথাও কিছু দেখা যায় না। ধূসর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অদূরে খরতর নদী বয়ে চলেছে ইস্পাতের ফলকের মতো। চারিদিকে তার এমন ভীষণ বৃক্ষলতাহীন অনুর্বর পাহাড়তলী, সহসা আর কোথাও দেখা যায় না। আন্দাজে বুঝতে পারি মেঘেরা নেমেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। মেঘ আর গ্লেসিয়ার ঝুলছে প্রত্যেক পাহাড়ের কোলে কোলে। গতকাল থেকে সেই দুর্যোগ এবং বাতাস এখনও কমেনি। ইতিমধ্যে পেয়েছিলুম গরম চা এবং কিছু খাদ্য, তাতে উপোসরক্ষা হয়েছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনোমতে পছন্দসই আহার জোটাতে পারি! আজ নিয়ে তৃতীয় দিন হলো পহলগাঁও থেকে বেরিয়েছি। তিনদিন কিংবা তিন বছর সহসা ঠাহর করা যায় না। ভুলে গেছি সব, স্মৃতিশক্তি অনেকটা যেন লোপ পেয়ে গেছে। প্রতি ঘণ্টায় আবিষ্কার করেছি নতুন দেশ, নতুন জগৎ, নতুন প্রকৃতি। প্রতি মাইল পথ হলো আমাদের জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ, এক একটি ইতিহাস। এত অল্প পথে এমন দুস্তর গিরিলোক আগে আমার দেখা ছিল না। গতকাল প্রভাতে বায়ুযানের পথে একটি পাহাড়ি মেষপালককে দেখেছিলুম তেলনাড় নামক অঞ্চলের কাছাকাছি, তারপরে যাত্রিদল ছাড়া পাহাড়ে পাহাড়ে মানুষের চিহ্ন আর কোথাও দেখিনি। এটা নতুন বটে। মানস সরোবর, কেদার-বদরি, পশুপতিনাথ—কোথাও এমন নয়। অথচ বুঝতে পারা যায়, এটা মধ্য এশিয়ার দিকে যাবাব ভিন্ন একটি পথ। আমি যদি এখান থেকে নিকটবর্তী পাহাড় পেরিয়ে পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করি, নিষেধ করবার কেউ নেই। আমাদের এই পাহাড়েব পিছনেই ভারতের সীমানা, মাত্র নয় মাইলের মধ্যে। একটি ঘোড়া এবং রসদ নিয়ে যদি যাই বল্‌তালের দিকে, কে দেখছে? কে জানছে, যদি সিন্ধু উপত্যকার ধার ঘেঁষে জোজিলা পেরিয়ে চলে যাই? লাডাক ত অতি নিকটে, অমরগঙ্গা ধরে গেলেই ত তিব্বত! আমার কাছে হয়ত সহজসাধ্য নয়, কিন্তু তেনজিংয়ের পক্ষে কতটুকু? সোয়েন হেডিনের পক্ষে কতক্ষণ? সঙ্গে জন দুই লোক থাকলে চব্বিশ ঘণ্টাব বেশী লাগে কি?

ঠিক বায়ুযানের মতো! সমস্ত রাত্রি ওই নদীতীরের তুষার-বাতাসের ঝাপটায় তাঁবু নড়তে লাগলো। কম্বলের তলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে তেমনি বিনিদ্র রাত্রিযাপন। চোখ বুজে রইলুম বটে, কিন্তু হাড়পাঁজরার মধ্যে এমন মোচড়াতে লাগলো যে, কোনো মতেই ঘুম এলো না। সন্ধ্যা রাত্রের দিকে হিমাংশুবাবু একখানা উপরি কম্বল আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও সুবিধা হয়নি। তাঁবুর চালে বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ কোনো সময়েই থামেনি। কে জানে আগামী কালের জন্য আমাদের ভাগ্যে আর কি জমা আছে! এখান থেকে অমরনাথ আর মাত্র চারপাঁচ মাইল পথ। এত অনিশ্চয়তা, এত দুর্ভাবনা, এত আশঙ্কা—তবু মন আছে প্রফুল্ল, আমাদের বহুকালের বহু প্রত্যাশার স্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারবো। শিশুকাল থেকে শুধু ছবি দেখে এসেছি, গল্প শুনেছি, দুঃসাধ্য পথের ইতিহাস জেনেছি, মানচিত্রে এর অবস্থানচিহ্ন দেখে কতদিন কত কল্পনা করেছি,—আগামী কাল সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি।

মর্ত্য সীমার প্রান্তে দাঁড়িয়ে অমর্ত্যলোকের দ্বার উন্মোচন করবো? কাল আমাদের পূর্ণ যাত্রা! কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রির অনাগত ইতিহাস এখনও বুঝতে পারছিনে। বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামে নি। জানি তুষারসমাকীর্ণ হবে আমাদের সমস্ত পথ। কিন্তু নেমে আসবে কি 'গ্লেসিয়ার' এই উপত্যকায়? ছুটে আসবে কি 'এভালান্স' ওই অমরগঙ্গায়? শত শত প্রাণীর পক্ষে এমন ভয়ার্ত রাত্রি কবে কে কোথায় দেখেছে? মৃত্যু-সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এদের মতো কে কোথায় এমন করে প্রহর গুনেছে?

ঠিক মনে নেই। বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইনি। হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ শুনে কম্বলের রাশির ভিতর থেকে মুখ বার করলুম। বিশ্বাস করিনি, প্রভাত হবে এত শীঘ্র! জানতুম দুঃখ আর যন্ত্রণার রাত্রি বড় দীর্ঘ হয়।

বিশ্বাস করিনি এই আশ্চর্য প্রভাত! কবে বৃষ্টি হয়েছিল, কোনো চিহ্ন তার নেই! কবে মৃত্যুভয় পেয়েছিল সবাই, কোনো স্মৃতি তার মনে পড়ে না। সমগ্র আকাশ যেন নীলোজ্জ্বল এক মহাকাব্য। মধুর সূর্যকিরণ পড়েছে অমরাবতীর নীলাভ জলরাশিতে। প্রভাতের মৃদু স্নিগ্ধ সমীরণ-শিহরণ দূর দূরান্তরে জানিয়ে দিচ্ছে অভয়বাণী। দুগ্ধশুভ্র তুষারের আবরণে সমস্ত পর্বতগুলি সূর্যরশ্মিজালে ঝলমল করছে। তবে কি এই তুমি! তবে গতদিন কেন অমন রুদ্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলে? কেন অমন মত্ত মহাকালের জটাজালে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে শিশু মানবকদের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করেছিলে? এত সুন্দর তুমি, কেন তবে এত ভীষণ! কান্না এলো দুই চোখে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যোর্মামৃতং গময়ঃ,—অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যুর থেকে নিয়ে যাও অমৃতলোকে! হয়ত এই সেই অমৃতলোক। পিছনে ছিল মৃত্যু—সামনে অমরাবতী। অসত্যের থেকে সত্য, ভয় থেকে জয়। জয়বার্তা বিঘোষিত হচ্ছে আমাদের সম্মুখপথে। প্রসন্ন প্রভাতের সূর্য এনে দিচ্ছে যেন মধুরের ধ্যানাবেশ, আনন্দে আবার হেসে উঠেছে সেই প্রাচীন পৃথিবী! দেবতাত্মা হিমালয় তাঁর রত্নগিরির দ্বার খুলেছেন। গত দুদিনের ইতিহাস দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মুছে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের পিছন দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল কুণ্ডু স্পেশালের তাঁবু, সেখানে সরকারি চালা আছে। সেখান থেকে আমাদের যাত্রাকালে আবার এলো দুঃসংবাদ। এক বাবাজী শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে কাল মারা গিয়েছে এবং পেটের পীড়ায় একজন মৃত্যুশয্যায়। শঙ্কর কুণ্ডু বললে, আবার কয়েকজন পালিয়েছে ভয়ের হিড়িকে। মেয়েরা কাঁদতে বসেছিল আকাশের চেহারা দেখে, আশা ত্যাগ করে চলে গেছে অনেকে। কতগুলি মেয়েপুরুষ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত, কেউ কেউ শ্রান্তিতে ধরাশায়ী।

আন্দাজ সাড়ে সাতটায় আমরা যাত্রা করলুম। আমাদের মালপত্র সমেত তাঁবু এখানে পড়ে রইলো অশ্বরক্ষীদের জিম্মায়, আহম্মদ রইলো তত্ত্বাবধানে। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। আজ পূর্ণিমা তিথি, হিন্দুমতে উপবাস। দর্শনান্তে শত শত লোক জলগ্রহণ করবে, তার আগে নয়। শীতের হাওয়ায় আর রৌদ্রে আজকের যাত্রা বড় আনন্দদায়ক। আকাশের উজ্জ্বল নীলাভা বলছে, এ বছরে আর বৃষ্টি হবে না, নিশ্চিত থাকো। সুতরাং পুনর্জীবন লাভ করেছি আমরা।

কিন্তু আজকের পথ বড় পিছল। সকলেই অতি সতর্ক। উঠছি উপরে, উপর থেকে উপরে। ঠিক যেন বিরাট কোনো প্রাসাদের কার্নিশের উপর দিয়ে চলা। মাথা টললেই মৃত্যু। ঘোড়ার পা পিছলোলে ঘোড়াসুদ্ধ তলিয়ে যাওয়া। পথ মানে, পথ নয়। অত্যন্ত

আতঙ্ক ফুটছে মুখে চোখে, শরীরের রক্ত চলাচল মাঝে মাঝে যেন স্থির হয়ে আসছে। আজ আর কেউ নিরাপদ মনে করছে না। পাকদণ্ডী একটির পর একটি। ঘোড়াকে এক একবার টেনে তুলতে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত সচেতন ত্রস্ত এবং আড়ষ্ট। কিন্তু গণিশের আমার রক্ষক, জানি তার হাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার নীলাভ দৃষ্টিতে কী স্নেহ, মৃন্ময় কাশ্মীরের সমস্ত মধুর পেলবতা ওর ব্যবহারে। কিন্তু কী দরিদ্র সে। ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, ছিন্ন কম্বল, একেবারে নিঃস্ব। পায়ে ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া শেরওয়ানী। ওর খাওয়া দেখলে কান্না পায়। চার দিন আগেকার রান্না পোড়া ভাত, আর সেই পহলগাঁও থেকে আনা লাউয়ের শুকা,—ব্যস। আমি জোর করে ওর হাতে দিয়েছিলুম কিছু রুটি। প্রথমটা নিতে চায়নি, পাছে ওর জাত যায়। এদিকে গ্রাম্য মুসলমানদের ধারণা, হিন্দুর হাতের তৈরী কিছু মুখে দিলে তাদের সমাজচ্যুতি ঘটবে। এটা জাতিগত অভিমান বুঝতে পারি। সেই একই ইতিহাস আসমুদ্রহিমাচল। এক রক্ত, এক প্রকৃতি, একই সংস্কৃতি। আফগানী তুর্কিরা একদা এদেরকে ধরে গায়ের জোরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর এরা ফিরে আসে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের কাছে। পণ্ডিতরা এদের গ্রহণ করেনি। এরা পাহাড়ে পর্বতে দেহাতে উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

পাহাড়ে পাহাড়ে নদী ঝুলছে তুষারমণ্ডিত। জলপ্রপাত নামতে গিয়ে বরফে জমাট বেঁধে স্থির হয়ে গেছে—তাদের ভিতর থেকে চুঁইয়ে নামছে জলের ধারা। তুহিন নদী ও নির্ঝরিণী পথে পথে। কোথাও শ্যাওলা নেই, কোথাও নেই তৃণচিহ্ন। পথের ধারে মাঝে মাঝে আবার সেই কুসুমশয্যা—সেই নানাবর্ণ—সেই মৃৎপাথরের ভিতর থেকে প্রাণবন্যা। তৃণপুষ্পে কাশ্মীরের হৃদয়ের অর্ঘ্যসম্ভার। ধীরে ধীরে আমরা উঠছি—দৃঢ় পদ, দৃঢ় ইচ্ছা, দৃঢ় মনোযোগ আমাদের। উদার ভাবনা, মধুর স্বপ্ন, মহৎ চিন্তা—তার সঙ্গে ভয় আর অনিশ্চয়তা, তার সঙ্গে পায়ে আর শিরদাঁড়ায় অসহনীয় কনকনানি। আমরা শুধু এগিয়ে যাচ্ছি। এই পথে আসতো শক আর হূন—মিহিরগুল আর চেঙ্গিস খাঁর দল, আসতো তুর্কি-তাতার, আসতো মধ্য এশিয়ার অনামা-অজানা যাযাবর দস্যুর দল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে তারা প্রথম খাদ্য আর আশ্রয় পেত, প্রথম পেত মানুষের সমাগম—সেই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল প্রথম গ্রাম, অর্থাৎ পহলগাঁও।

মাইলের পর মাইল চড়াই আর উৎরাই। বায়ুশীর্ণতার জন্য আমরা কষ্ট পাচ্ছি। প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার ফুটের উচ্চতায় উঠেছি। এবার নামবার পালা। ধীরে ধীরে পথ ঘুরছে পূর্বদিকে। ভৈরবঘাটের সীমানা শেষ হচ্ছে। ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছি। আশে পাশে চলেছে সাধুসন্ন্যাসী, চলেছে বাবাজী-বৈরাগী। ধীরে ধীরে নামছি। পোড়ামাটির মতো পথ, কিন্তু বৃষ্টিভেজা,—পিছল। ফিরছি ডান দিকে, ভৈরবঘাটের পিছনে,—আবার নামছি। নামতে নামতে এসে পৌঁছলুম তুষার নদীর প্রান্তে। তুষারমণ্ডিত পথ আর উপত্যকা পেরিয়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার নতুন অভিজ্ঞতা। তুষার নদীর ওপর ঘোড়া নিয়ে নেমে এলুম। পায়ের তলায় বরফের নীচে দিয়ে প্রবল নদীর স্রোত, আর আমরা উপরতলার কঠিন বরফের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি। যদি চিড় খায় কোথাও, যদি কোথাও নরম থাকে—তবে রক্ষা নেই। বাঁকের মুখে সোজা উত্তরে চলে গেছে একটি নদীর ধারা তিব্বতের মধ্যে, কিন্তু এইটি হলো অমরগঙ্গার মূল প্রবাহ। এপারে ভৈরবঘাট, ওপারে অমরনাথের চূড়া। কিছুদূর গিয়ে গণিশের বললে, উৎরাইয়ে!—হয়ত তার মনে দুর্ভাবনা ছিল, যদি দৈবাৎ আমাদের পায়ের তলায় ধস নেমে যায়! সুতরাং আমরা এবার

নামলুম সেই তুষার নদীর ওপর। পায়ের তলায় বরফ কচমচ করে উঠলো। এমন বরফ কিনতে পাওয়া যায় কলকাতার বাজারে সর্বত্র। বড় বড় ডেলা, মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা যায় না। রংটা স্বচ্ছ শাদা নয়, ঈষৎ ঘোলাটে। পায়ের তলায় তুষার নদীর তল-প্রবাহ। মাঝে মাঝে পায়ের পাশে ছোট বড় গহ্বর, তার ভিতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছি কালো জল নীচের দিকে আবর্তিত হচ্ছে। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলছি, প্রতি পদে যেন শিহরণ হচ্ছে। নদী ধরেই চললুম কিছুক্ষণ। এক সময়ে গণিশের আবার তুললো ঘোড়ার পিঠে। কিছুদূর গিয়ে এই নদীই আবার উত্তাল উদ্দাম জলধারাসহ প্রকাশ পেলো। আমরা এলুম সাঁকোর কাছে। সেটা অমরগঙ্গারই সাঁকো। সেই ছোট্ট সাঁকো পার হয়ে ওপারে অমরনাথ পর্বতের পাদমূলে গিয়ে আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে এবার নেমে পড়লুম। এর পর আর ঘোড়া যাবে না। সামনের চড়াই ধরে প্রায় সাড়ে তিন শো ফুট উঠে গিয়ে পাবো অমরনাথের গুহামুখ।

প্রসন্ন নীলাভ দুই চক্ষু প্রসারিত করে স্মিত হাস্যে সামনে দাঁড়ালো আমার ভয়ত্রাতা সৌম্যদর্শন মুসলমান গণিশের। দুর্দিনের দুর্যোগের আতঙ্কের অভয়দাতা সে আমার নিত্যসঙ্গী—আমিও তাকালুম তার প্রতি। অন্তর্যামী আমার কানে কানে বললে, থাক্ অমরনাথ, সকলের আগে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করো ওই মুসলমানের পদতলে! তোমার পঞ্চপিতার এক পিতা হলো ওই দরিদ্র হতভাগ্য চিরবুভুক্ষু গণিশের, কারণ ও তোমার ভয়ত্রাতা—রক্ষক! অভিমান ত্যাগ করো, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত হও, মানুষের অন্তর্নিহিত নারায়ণকে স্বীকার করে নাও! পদধূলি গ্রহণ করো ওই পরমাত্মীয় মুসলমানের!

পারলুম না! হাজার হাজার বছরের রক্তের ধারাবাহিকতার সংস্কার দিল বাধা। বংশপরম্পরাগত জাত্যভিমান পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ালো মাঝখানে। কী ছোট আমি! কী ক্ষুদ্রচেতা, কী দরিদ্র! নিজেকে চাবকালুম শতবার। চোখে জল এসে দাঁড়ালো। অবশেষে দু'খানা প্রাণহীন বাহু বাড়িয়ে গণিশেরকে সহসা ঘন আলিঙ্গনে বেঁধে দিলুম। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী অপমান করে ফেললুম নিজেকে, যখন মনিব্যাগ খুলে কয়েকটা টাকা দিলুম তার হাতে। প্রাপ্য তার কানাকড়িও নেই, সুতরাং গণিশেরের চোখেমুখে ছিল কিছু বিস্ময়। কিন্তু আমি আর পিছন ফিরে কোনোমতেই তাকাতে পারলুম না।

প্রখর রৌদ্র। অমরগঙ্গার আঘাটা থেকে উঠে গেছে এই পথ সোজা গুহা পর্যন্ত। নদীতে বহু লোক সাহস করে স্নান করতে নেমেছে। এই নদী তিব্বতের দিকে চলে গেছে। আশেপাশে সামনে পিছনে পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার নদীগুলি ঝুলছে। এরা চিরস্থায়ী, সহজে গলে না। মে-জুন মাসে কি হয় বলতে পারিনে। রৌদ্র এত প্রখর যে, তুষার আবহাওয়া সত্ত্বেও কোনো কষ্ট আমাদের হচ্ছে না। বরং রাশীকৃত গরম আচ্ছাদনে এবার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এখন বুঝতে পারা যায় মোটমাট কত যাত্রীসংখ্যা এ বছরের। পুরো এক হাজার কি হবে? মনে হয় না। সেই সুইডিস ছাত্রটি এসেছে, একজন বৃদ্ধ ফরাসী ভদ্রলোক এসেছেন। অদূরে দেখছি সেই মিলিটারী যুবক মিঃ মজুমদার এবং তাঁর সঙ্গিনী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। এদিকে ভাটপাড়ার এন পি ভট্টাচার্য মহাশয়ের দল আর কুণ্ডু স্পেশালের একজন। উপরে উঠছেন ঘোষ মশাই তাঁর মাকে নিয়ে। চন্দনবাড়ির পথে সেই যে পাঞ্জাবী মহিলাটি ঘোড়া থেকে পাহাড়ের ধারে পড়ে গিয়ে আহত হন—তিনিও এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আরো বহু এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে মুখচেনা হয়েছে

গত পাঁচ ছয় দিনে। এসেছেন সেই মিসেস রায়—শ্রীনগর ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্টের স্ত্রী,—হিমাংশুবাবুর পাতানো দিদি। পুলিশ মিলিটারী সবাই আজ এসেছে।

এই শেষ চড়াইটুকু বড় গায়ে লাগছে। বায়ুশীর্ণতার জন্য পরিশ্রম খুব বেশী মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রায় উপরে উঠে এলুম। আর পঁচিশ ফুট উঠতে পারলেই গুহামুখ পাই।

ঘোষ মশাইয়ের বৃদ্ধা জননী শুয়ে পড়লেন। আর তাঁর ওঠবার শক্তি নেই। বোধকরি জ্ঞানহারা হবার সম্ভাবনা ছিল। মাথা ঘুরছে, বমি ভাব। ঘোষ মশাই দিশাহারা হয়ে ছুটে নেমে যাচ্ছিলেন। মায়ের যদি অন্তিম ঘনিয়ে থাকে? এখনও যে দর্শন হয়নি! ডাক্তার কি এখানে মেলে না?

দাঁড়ান—বাধা দিলুম ঘোষ মশাইকে।—মা ঠিক বাঁচবেন, কিন্তু আপনি মুখ থুবড়ে যদি গড়িয়ে পড়েন নীচে, আপনি বাঁচবেন না! আপনাকে যেতে দেবো না!

মা বাঁচবেন? কেমন করে? কিন্তু—

কিচ্ছু ভয় নেই। কোলের কাছে এসেছেন, অমরনাথ,—তাই বৃদ্ধার উত্তেজনা! বিশ্রাম দিন, নিশ্বাস নিতে দিন—উনি নিজেই উঠে যাবেন উপরে।

আপনি কেমন করে জানলেন? মা যে তিনদিন কিছু খাননি। আজ আবার পূর্ণিমা!

আমারও উত্তেজনা এলো। বললুম, এরকম কেস্ অনেক দেখেছি তাই বলছি। আপনার মা যদি উঠে ধুলো পায়ে নিজের শক্তিতে দর্শন না করতে পারেন, তবে আমিও বলে রাখছি, অমরনাথকে না দেখে আমিও এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে যাবো।

ঘোষ মশাই থমকে দাঁড়ালেন। মিনিট পনেরো পরে তাঁর মা নিজে গা-ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে আবার গুহামুখে উঠতে লাগলেন। ঘোষমশাই চললেন মায়ের পিছু পিছু। ক্যামেরা হাতে নিয়ে হিমাংশুবাবু হাসিমুখে চললেন। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বহু যাত্রী উঠছে, কেউ কেউ নেমেও আসছে। সকলের মুখচোখ আনন্দে আর উৎসাহে উজ্জ্বল। আজ সকলের যাত্রা সার্থক হয়েছে। সূর্যেব প্রখর আলো যেন সকলের জন্য অভাবনীয় আশীর্বাদ বহন করে এনেছে।

ক্লান্ত পা তুলছি টেনে টেনে উপব দিকে। ঘোড়ার পিঠে বসে শিরদাঁড়া আড়ষ্ট, পা দু'খানা ভারী,—বিনিদ্রা আর উপবাস। আব কয়েক পা বাকি। তার পরেই গুহার ওই বারান্দা! কিন্তু হঠাৎ থামলুম।

না, আগে দর্শন নয়, এখানে একবার দাঁড়াও,—নিশ্বাস নাও আগে। এখানে দাঁড়িয়ে আগে একবার মাতৃমন্ত্র জপ করে নাও!—ওই উনি মা, যিনি একটু আগে ধরাশায়িনী হয়েছিলেন। ওই মাকে নিয়ে স্মরণ করো সেই স্বর্গতা জননীকে, যিনি তোমার মাতা দেবী বিশ্বেশ্বরী, দেবতাত্মা হিমালয়ে আজ যিনি পরিব্যাপ্ত! থাকুন অমরনাথ,—আগে স্মরণ করো তাদের কথা, যাদের এই পথে মৃত্যু ঘটেছে, যাবা পৌঁছতে পারলো না কিছুতেই, যারা দেবতাত্মার পদতলে শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলে যেতে পারেনি! তাদের কথা এখানে দাঁড়িয়ে আজ স্মরণ করো, যাদের পিতা মাতা সন্তান বন্ধু পরিজন—কেউ কোথাও নেই, যাদের পিপাসার্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় নিত্য প্রেতলোকে! যাদের কেউ কোনদিন স্মরণ করেনি।

ধীরে ধীরে উঠে এলুম গুহার সম্মুখভাগের অলিন্দে। সামনে লাল রেলিংঘেরা গুহার অভ্যন্তরভাগ। পনেরো হাজার ফুটের উপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। গুহামুখ উত্তর-পশ্চিমে ফেরানো। গুহার মাথার উপর আরো প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু গিরিচূড়া। সেখান থেকে ঝুলছে তুষার নদী। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে ভয়াবহ অনুর্বরতা,—বৃক্ষ,

শষ্প, লতা, গুল্ম—কোথাও কিছু নেই। তুষারগলা জলধারা নেমে আসছে প্রতি পাহাড়ের গা বেয়ে। ক্ষার, গন্ধক ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ এবং বহু বর্ণময় মৃৎপ্রস্তর চারিদিকের পাহাড়ে আকীর্ণ।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, পাথুরে কালো মাটি মসমস করছে। গুহার ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। সামনে তিন চারটি ধাপ উঠে রেলিংয়ের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। গুহার পরিধি আন্দাজ শ' দেড়েক ফুট। ভিতরের অবকাশটুকু কমবেশী চল্লিশ ফুট বিস্তৃত। ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল উপরের বহু ফাটল থেকে অবিশ্রান্ত জলের ফোঁটাগুলি চুঁইয়ে পড়ছে টপটপ করে। গহ্বরের চারিদিকটা খড়ি পাথরের। ছুরি দিয়ে খোঁচাতে থাকলে মুঠো মুঠো চুনপাথরের গুঁড়ো পাওয়া যায়। ঢোকবার সময় ধাপগুলি ডানদিকে রেখে সোজা বাঁদিকের কোণের কাছে এলেই অমরনাথ। পাড়বাঁধানো একটি চৌবাচ্চার মতো আয়তন—মাঝখানে বরফের একটি স্তূপ—নীরেট, কঠিন। উপর থেকে ফাটল চুঁইয়ে তুষারগলা জল পড়ছে টসটস করে। বরফের স্তূপটির উপরটি কচ্ছপের পিঠের মতো। মধ্যাংশ ঈষৎ উঁচু—চতুর্দিকে ঈষৎ ঢালু। এতকাল শুনে এসেছি চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই তুষারস্তূপ কমে এবং বাড়ে। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমায় শিবলিঙ্গের আকার অন্তত তিন চার ফুট উঁচু হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তা হয়নি। গতমাসের পূর্ণিমায় যখন যুবরাজ করণ সিং সস্ত্রীক এখানে আসেন, তখন লিঙ্গটি পূর্ণ আকার প্রাপ্ত ছিল। এই প্রকার স্বচ্ছ ধূমেল বরফের চাংড়া কলকাতায় চলন্ত লরীর ওপর মাঝে মাঝে দেখি, কিন্তু হ্রাসবৃদ্ধিই হলো এর বৈচিত্র্য। অনেকে বললে, উপরের ফাটল থেকে যে জলবিন্দু পড়ে, সেই জল অনেক সময় ঝুলনের রজ্জুর আকারে জমে যায়, এবং চৌবাচ্চার ভিতরকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যহেতু অমরনাথ লিঙ্গটি ক্রমশ স্ফীত ও উচ্চাকাব ধারণ করতে থাকে। ক্রমে উভয়ে সংযুক্ত এবং একাকার হয়ে যায়। ভূ-তত্ত্বে এর কৈফিয়ৎ এবং অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় বলেই এর পরমার্থের দিকটা তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করে। প্রকাশ, প্রায় দেড়শো বছর আগে এক গুজর মুসলমান মেষপালক ওপারের পাহাড়ের উপর থেকে এই গুহাটি আবিষ্কার করে, এবং লোকজনসহ এখানে এসে অমরনাথের পূর্ণলিঙ্গ দেখতে পায়। বোধহয় সমগ্র ভারতে এই একমাত্র তীর্থ, যেখানে খ্রীস্টান মুসলমান হরিজনাদি জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের প্রত্যেকের পায়ে ছিল ঘাসের তৈরী জুতো—দাম এক আনা—নইলে এই ভয়ানক ঠাণ্ডায় আমাদের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। অমরনাথ লিঙ্গের উপরে একটি ঘণ্টা ঝুলছে। যাত্রীরা স্পর্শ করছে লিঙ্গ। আমাদের হিমাংশুবাবু সেই লিঙ্গের থেকে এক টুক্‌রো বরফ ভেঙে তাঁর শিশিতে সংগ্রহ করলেন। অনেকে নিলেন গুহামধ্যকার খড়িপাথরের গুঁড়ো। চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ছে দূর দেশ থেকে আনা অজস্র ফুল আর বেলপাতা। প্রদীপ জ্বলছে আশে পাশে। প্রসাদ সংগ্রহ করছে অনেকে। কেউ মন্ত্র ও স্তবপাঠ করছে, কেউ কাঁদছে হাউ হাউ করে, কেউ মাথা ঠুকছে, কেউ বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিকৃতকণ্ঠে অধীর, অস্থিরভাবে প্রলাপোক্তি করছে। অত্যন্ত দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল তীর্থস্থানে না এলে এইপ্রকার আত্মহারা ভাবাবেগ কল্পনা করা যায় না। মূল অমরনাথের লিঙ্গের কয়েক ফুট দূরে-দূরে গণেশ ও পার্বতীর ওই একই প্রকার তুষারলিঙ্গ। তবে তাদের ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধির চেহারা কি প্রকার, ঠিক একথা নিয়ে তখন আর কেউ আলোচনা করে না। যাঁরা অমরনাথের পাণ্ডা ও পূজারী, তাঁরা সকলেই থাকেন মার্তণ্ড শহরে,—পহলগাঁও থেকে খানাবলের পথে।

এতক্ষণ পরে চোখে পড়লো গুহার ভিতরে 'সিলিং'-এর একটি কোটরে দুটি পায়রা দিব্যি বাসস্থান করে নিয়েছে। এরা নাকি আছে আদিকাল থেকে, এরা নাকি দৈবপারাবত। প্রাণীচিহ্নহীন পর্বতমালার মধ্যে এরা নাকি দৈববার্তা বহন করে বেড়ায়। এদের দর্শন করা পুণ্য। এই তুষার-পারাবত দুটিকে সকলেই ভক্তিভরে দেখতে লাগলো।

ভিতরটায় ঘুরে ফিরে আবার এলুম বারান্দায়। সামনে গণিশের দাঁড়িয়ে। তার জিম্মায় আমাদের লাঠি, জুতো ও ছাতা, এবং গরম কোট। তাকালুম নীচের দিকে অনেক দূরে অমরগঙ্গার পারে। লোকে ওপারে গিয়ে এপারের এই গুহার ছবি তোলে, সেইজন্য চড়াই পথটা ছবিতে দেখা যায় না। চড়াইয়ের নীচে নদীতে স্নান করছে সাধু ও সন্ন্যাসী, মেয়ে আর পুরুষ। তুষারগলা জলে নীল হয়ে যায় দেহ, কিন্তু উলঙ্গ স্নান এখানে বিধি। অনেক নারী স্নানে নেমেছে একেবারে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে। যদি এই দুর্গমে এসে পৌঁছে থাকো তবে এই ব্রহ্মলোকের তীরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হও। কোনো লজ্জা রেখো না, সমস্ত আবরণ মোচন করো, সমস্ত আভরণ জলাঞ্জলি দাও—এখানে পৃথিবী নেই, সমাজ নেই, লৌকিক সংস্কার নেই। চেয়ে দেখছি, কোনো বয়স বাদ যায়নি। পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, দক্ষিণী, বাঙালী, বিহারী, উত্তর প্রদেশী,—উলঙ্গ নরনারী দলে-দলে নেমেছে ঘাটে। হঠাৎ মনে হয় স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের নৃত্যসভায় অপ্সরা উর্বশী মেনকা রম্ভার নাচের ডাক পড়েছে। সেখানে যাবার আগে লজ্জা মান ভয় বিসর্জন দিয়ে ওরা এসে নেমেছে এই অমরাবতীর শিলাতলে অবগাহন-স্নানে। আকুলিত কেশে ওদের উল্লাসের অজস্রতা। তুষারনদীর ওপর বইছে হু হু বাতাস,—প্রখর রৌদ্রে চারিদিক আনন্দময়। কিন্তু কিচ্ছু নেই এখানে। খাদ্য এবং আশ্রয়ের চিহ্নও নেই—উপর থেকে তিন শো ফুট নীচে নেমে না গেলে তৃষ্ণার জলও নেই। সকল তীর্থেই কোথাও না কোথাও দাঁড়াবার মতো জায়গা পাওয়া যায়। তুঙ্গশীর্ষ কেদারনাথে যাও, কিংবা ভারতমহাসাগরের তীরে কন্যাকুমারিকার বালুবেলাতটে যাও, আহার ও আশ্রয় দুই মেলে। এখানে সব শূন্য। মাইলের পর মাইল,—অন্তহীন রুক্ষ অনুর্বর তরুতৃণশূন্য ভীষণকায় পর্বতমালা ও তুষারনদী ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

বন্ধুরা ছবি তুললেন কতকগুলি। তারপর মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে আবার আমরা গুহামুখ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলুম। গণিশের ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত ছিল। আমরা আবার সারবন্দী হয়ে তুষারনদীতে অবতরণ করলুম। সেই একই পথ, বৈচিত্র্য কিছু নেই। সেই ভীষণাকৃতি পিশাচ প্রকৃতির পর্বতমালার চড়াই, সেই ঘোড়ার পিঠে কার্নিশ বেয়ে চলা,—জন্তু আর মানুষ একই প্রকার ক্ষুধার্ত। সূর্যকরোজ্জ্বল তুষারকিরীটের তলা দিয়ে পথ, নদী এবার ডানদিকে, সেই আমাদের অতি সতর্ক আড়ষ্ট দেহ, চোখে সেই পতনাশঙ্কা—কিন্তু উদ্দীপনা আর কঠোর অধ্যবসায়ের পর,—এবার তন্দ্রাতুর অবসাদ। আমাদের সকল উত্তেজনার অবসান।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এলুম পঞ্চতরণীতে। প্রথমেই চোখে পড়লো নদীর ধারে বসেছে একটি পুরির দোকান। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে কে আগে ছুটতে পারে ওই দোকানে! হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ঘোড়ায় আর মানুষে। বাবা অমরনাথ রইলেন আমাদের মাথায়, কিন্তু ওই 'গুহামুখ' আমরা সকলে। অতএব মুখ ব্যাদান করে সকলে দাঁড়ালো দোকানে। পুণ্যসঞ্চয় করেছি সকলে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষুধা সঞ্চয় করেছি তার চেয়ে অনেক বেশী। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ভাটপাড়া, মানিকতলা, হাওড়া, অমৃতসর, জম্মু, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা—সবাই লালায়িত।

পঞ্চতরণী পেরিয়ে মহাগুনাস গিরিসঙ্কটের পথ পার হয়ে চলেছি বায়ুযানের দিকে। কুণ্ডু স্পেশালের শঙ্কর কুণ্ডু বলে রেখেছিল, পঞ্চতরণীতে আমাদের তাঁবুতে আপনাদের নিমন্ত্রণ! কিন্তু পুরির দোকান দেখে আর অতদূরে যাবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। হিমাংশুবাবুর জ্বর আর নেই, কিন্তু আমার এসেছে জরা। অতএব আর কোথাও দাঁড়ানো নয়। এবারের পথ অধিকাংশ উৎরাই। ঘোড়ার ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পাহাড়তলীতে না ছিট্‌কে পড়ি, এই ছিল ভয়। দেখতে দেখতে এসে পড়লুম বায়ুযানে। বিশ্বাস করলুম না, কেননা চিনতে পারা গেল না। শূন্য তুহিন প্রান্তর ধূ ধূ করছে। আমরা এখানে রাত্রিবাস করেছি, তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। আবার পড়ে রইল ওই প্রান্তর আগামী তিনশো চৌষট্টি দিনের জন্য। দিনে রাত্রে এবার চরে বেড়াবে ওখানে সেই তিব্বতী ভালুকের দল, নেমে আসবে হয়ত ঈগলপাখি ছোট জন্তুর খোঁজে; কিংবা নাম-না-জানা কোনো বিচিত্র অতিকায় জানোয়ার—যারা হয়ত আজও অনাবিষ্কৃত।

শেষনাগ থেকে এগিয়ে অপরাহ্নে পথের ধারে পাওয়া গেল গরম চা। বৃষ্টিবাদল নেই, সুতরাং সবটা সহজ। জনহীন পার্বত্য জগৎ, কিন্তু তীর্থযাত্রীদের পথে বসে কিছু সংস্থান করে নিলে মন্দ কি? সুতরাং শিখ সর্দারের কাছে চা খেয়ে আবার আমরা অগ্রসর হলুম। পথ উৎরাই। অতএব ঈষৎ দ্রুতগতি। কথা ছিল যশপালে রাত্রিবাস করে যাবো। যশপালে যখন এলুম, তখন অপরাহ্নের শেষ,—ছয়টা বাজে। আশ্চর্য, এও সেই মরুভূমি,—মাথা গোঁজবার মতো কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। আরেকটু এগিয়ে গেলেই সেই বিভীষিকাময় পিসুর-চড়াই। প্রায় আমরা পনেরো মাইল চলে এসেছি অমরনাথ থেকে।

হিমাংশুবাবু বললেন, আশা করি, দু'-ঘণ্টার মধ্যে চন্দনবাড়ি পৌঁছতে পারবো। আকাশ পরিষ্কার, আজ পূর্ণিমা।

নীচে বিস্তৃত অরণ্যলোক। সঙ্কটসঙ্কুল উৎরাই পথ সেইপ্রকার পিছল। অন্ধকারে সেই ভয়াবহ আঁকাবাঁকা ঢালুপথে ঘোড়ায় চড়ে নামা চলবে না। পিছনে আসছে অনেকে,—সকলেরই চেষ্টা চন্দনবাড়ি পৌঁছানো, নচেৎ রাত্রির আশ্রয় আর কোথাও নেই। অতএব দুর্গা বলে গভীর 'কূয়ার' পথে নেমে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ঘোড়া ছেড়ে রবারের জুতো পায়ে এগিয়ে চললুম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আশেপাশে ঝরনার শব্দ শুনছি। বাঁদিকে তিন হাজার ফুট নীচু খদ। নীচের দিকে অরণ্যানী। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বাতাস তুহিন ঠাণ্ডা। প্রাণহীন শব্দহীন পার্বত্যলোক। আমরা সেই আবছায়া অন্ধকারে পাকদণ্ডীর রেখা ধরে নীচের দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

থামবো না। বিশ্রাম নেবো না কোথাও। আন্দাজে সতর্ক পায়ে কেবল নীচের দিকে তলিয়ে চলেছি। কেবলই ঘুরে ঘুরে নীচের দিকে, আরও নীচে। একজন আরেকজনকে আর দেখতে পাচ্ছে না। গণিশের ঘোড়া নিয়ে নামছে। একটির পর একটি ঘোড়া, একের পর এক যাত্রী। অরণ্যে নামছি। জ্যোৎস্নার টুকরো নামছে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে। কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছিনে, কিন্তু পাও থামছে না। চার মাইল নামতে হবে এমনি করে। দিক্‌চিহ্ন নেই, পথের সঙ্কেত নেই, দাঁড়াবার মতো পাশ নেই। পিছন দিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, তাদের পায়ের হোঁচটে আল্‌গা পাথর গড়িয়ে নামলেই সর্বনাশ। কিন্তু কোনো অপঘাত ঘটছে না,—আশ্চর্য। কে বাঁচাচ্ছে, কেমন করে নিরাপদ হচ্ছি, বিপদে কেন পড়ছিনে,—সমস্তটা আশ্চর্য। হিমাংশুবাবু দ্রুতপদে অনেক এগিয়ে গেছেন, আমি অনেককে পিছনে ফেলে এসেছি,—কিন্তু নীচেকার ঘনঘোর অন্ধকারে মাঝে মাঝে প্রেতহাস্যের ঝলকের

মতো জ্যোৎস্না আমাকে সাহায্য করছে। কোন্‌টা ঠিক নির্দিষ্ট পথ, জানছিনে—অথচ পা দুটো থামছে না! চার মাইল, কিন্তু এতই কি দীর্ঘ সেই চার মাইল? চার, না চারশো? নীচের দিক থেকে প্রবল জলরাশির শব্দ শুনছি অনেকক্ষণ থেকে। সেই শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হয়ে এলো। অন্ধকার অরণ্যালোক ক্রমশ সঙ্কীর্ণ থেকে বিস্তৃত হতে লাগলো। ক্রমশ নদীর আছাড়ি-পিছাড়ি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এবার এই খোলা জগৎটায় গিয়ে একবার ভালো করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো। চার মাইল শেষ হয়েছে।

জ্যোৎস্না এবার অবারিত। অপ্সরালোকের অমরাবতীর দ্বার আবার খুলে গেছে। আরো এক মাইল চলে এসে সেই শিখ সর্দারের দোকানের সামনে দেখলুম হাসিমুখে হিমাংশুবাবু দাঁড়িয়ে। রাত তখন প্রায় সওয়া আটটা। দুজনেই ফিরেছি নিরাপদে, দুজনেই বিস্মিত।

অবিস্মরণীয় সেই অমর্ত্যলোকের জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো চন্দনবাড়ির সেই প্রখর নীলগঙ্গার তীরে, তাঁবুর মধ্যে। একে আর শীত বলে না, বাঙলাদেশের ডিসেম্বরের শেষ। এখন আমাদের তুঙ্গে বৃহস্পতি, সমস্তগুলো সহজলভ্য হচ্ছে। উৎকৃষ্ট চা, ঘৃতপক্ক পরটা, ঘন গরম দুধ, মসালেদার তরকারি, সুশীতল জল, মূল্যবান সিগারেট। তুঙ্গে বৃহস্পতি! তারপর তুষারলিঙ্গের কৃপায় নাসিকাধ্বনিসহ ঘনঘোর নিদ্রা!

পরদিন প্রভাতে অধিত্যকার অরণ্যপক্ষীকুলের কূজনগুঞ্জনের ভিতর দিয়ে অশ্বারোহণে আমাদের যাত্রা। সকাল সাতটা। নীচে উষাকাল, উপরে নবসূর্যবন্দনা সভা বসেছে। পাশে পাশে নীলগঙ্গার নীলাভ তরঙ্গদলের রণরঙ্গ চলেছে। বাতাস স্নিগ্ধ। পর্বতগাত্রে প্রভাতসূর্যের রশ্মিচ্ছটা শিশিরবিন্দুগুলিকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছে। আমাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ। ভয় ক্ষোভ বেদনা দুশ্চিন্তা উদ্বেগ,—দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ সবগুলিকে মুছে দিয়েছে। বসন্তের কুসুমকাননের পথ দিয়ে স্বর্গলোক থেকে নেমে চলেছি মর্ত্যের মানবসংসারের দিকে। অমরাবতীর পরম আশীর্বাদের বার্তা বহন করে চলেছি।

আমরা অনেকটা প্রথম দলের লোক। সঙ্গে সঙ্গে আসছে ভাটপাড়া, আর কুণ্ডুর দল। পিছনে আসছেন কোটপ্যান্টপরা মিসেস রায়, সঙ্গে সঙ্গে মজুমদারসহ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। প্রশস্ত পথে ঘোড়ারা এবার একটু আধটু ছুটছে। পিছনে পিছনে আসছে বোম্বাই আর পাঞ্জাব। গ্রাম ছেড়ে আসছি, ঝরনা পেরিয়ে যাচ্ছি—কাশ্মীরী মেয়েদের ভিক্ষা চলছে এখানে ওখানে। পথের ধারে ব'সেছে বৃদ্ধ কাশ্মীরী ঝুলি নিয়ে। প্রখর রোদ উঠেছে, বেলা সাড়ে ন'টা।

দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম টোল আপিসের ধারে। সেখানে ঘোড়াওয়ালাদের কাছে ট্যাক্স আদায় চলছে। সামনে লিডার নদীর সাঁকো। আশে পাশে উপত্যকায় পড়েছে বায়ুবিলাসিনীদের তাঁবু। পিছন দিকে কোলাহাই হিমবাহের পার্বত্য পথ। এপারে ওপারে ঘন পাইনের বন দূর দূরান্তরে চলে গেছে। পাহাড়ীরা চলেছে হাটের দিকে। গ্রামের মেয়েরা শিশুদের সঙ্গে ময়লা জীর্ণ শয্যাগুলি রৌদ্রে নামিয়ে দিচ্ছে।

পড়ে রইলো পিছনে একটা জীবন—সেটা তীর্থযাত্রীর। এবার যেন উত্তীর্ণ হলুম জন্মান্তরে। পৃথিবী সেই প্রাচীন, সুন্দরের সেই শোভা দিকে দিকে। ধীরে ধীরে এসে পৌঁছলুম আমাদের পরিচিত নদীর ধারে—সনাতন মন্দিরের পাশ কাটিয়ে, সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম ছাড়িয়ে। আমাদের পুরাতন বন্ধু পহলগাঁও।

ঘোড়া থেকে নেমে বুঝলুম আমি অকর্মণ্য। গত রাত্রের সেই পিসুর উৎরাই একটানা নেমে সর্বশরীরে এবার প্রবল আড়ষ্টতা এসেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হোটেলের দিকে চললুম। এখানে বাস করবো কয়েকদিন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাঞ্জাবের হিমালয়

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ সপ্তাহটায় লাহোরের পথ খুব আরামদায়ক নয়, একথা আগে জানতুম বৈকি। কিন্তু শীতের দিনেও ত দেখেছি লাহোরকে—যে ঠাণ্ডাটি বাঙালীর চামড়ায় সহ্য হতে কিছু দেরি লাগে। তার হিম, তার বৃষ্টি, তার সূক্ষ্ম তুষারকণা, এবং ডিসেম্বরের শেষ দিকে তার আকাশের ভ্রূকুটি-করাল চেহারাটা। ঘরের মধ্যে আগুনজ্বালা, আর দিনরাত বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য শার্সি বন্ধ করে রাখা। সেই লাহোর জ্বলে পুড়ে যায় জুনের প্রথম সপ্তাহে। জানুয়ারিতে লাহোরের গরীব লোক শীতে কুঁক্‌ড়ে পথের ধারে কাঠ হয়ে মরে থাকে, আবার তারাই মরে জুনমাসের সর্দিগর্মিতে।

আমাকে যেতে হবে লাহোর ছাড়িয়ে। দু'ধারের পথ আর প্রান্তর দাউ দাউ করে জ্বলছে। শুনছি বৃষ্টি নামতে পারে নাকি প্রায় আরও একমাস দেরিতে। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ যা সহ্য করবার অভ্যাস করে, তাই সে সয়। যে মাঠ জ্বলছে, সে মাঠে মানুষ এই রোদ্দুরে কাজও করছে। শিখ চাষী, মাথায় পাগড়ী বেঁধে গায়ে জামা এঁটে পায়ে জুতো দিয়ে লাঙল ঠেলছে। গ্রামের পা-জামা-পরা বউ ইঁদারা থেকে জল তুলছে। বুড়ি জাব দিচ্ছে বলদকে। ছোট শিখ ছেলে ছড়ি হাতে নিয়ে ছুটছে ভেড়ার পিছনে। উঁচু নীচু ডাঙা,—কোথাও পাহাড়ি টিলা, কোথাও বা কাঁকর পাথর। হঠাৎ এসে পড়ে নধর সবুজ গাছপালার পাড়া,—অমনি তার সঙ্গে ছায়া ঝিলিমিলি চাষীদের ঘর। তারই কোনও নিভৃত অঙ্গনে একটুখানি কবিতা, একটু বা ব্যঞ্জনা। মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে কোমল সবুজ উপত্যকা, কখনও নদীর সেতু, কখনও সুড়ঙ্গপথ, কখনও বা ঘননীল পার্বত্য শোভার সঙ্গে বৈরাগিনী নদীর শান্ত সৌন্দর্য। ঝিলমের তীরে শুনে এসেছি দেবমন্দিরের শাঁখঘণ্টার আওয়াজ। মনে পড়ে গিয়েছে কাশীর মনিকর্ণিকা। তারপর সেটুকু আবার হারিয়ে যায় চোখ ঝলসানো প্রান্তরে। রুক্ষ প্রস্তরময় অসমতল। হিমালয় থেকে অসংখ্য ছোট বড় নদী নেমে এসেছে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে, কিন্তু তাদের জল বড় শীঘ্র পালায়। তারা বিশেষ কোথাও ধরাবাঁধা থাকে না। 'সুক্কুর বারেজ' না থাকলে পাঞ্জাব এতদিনে মরে যেত।

কয়েকজন বালুচ সৈন্য ছিল আমার কামরায়। তাদের নাকি শীতাতপ কোনওটাই গায়ে লাগে না। সুর্মা লাগানো চোখ, গায়ের রং তামাটে, মুখখানায় কোনও স্বাস্থ্যশ্রী নেই, সরু সরু হাত-পা—কিন্তু মাথায় সকলেই প্রায় ছয় ফুটের বেশী। তুলনা করার জন্য ক্ষমা চাইছি, গ্রে-হাউন্ড কুকুরের সঙ্গে ওদের কোথায় যেন মিল আছে। ওরা জলের দেশে বাস করে না বলেই মানুষের জলপান করাটা তেমন বোঝে না। বড় জোর বরফ দেওয়া সোডা-লিমনেড, আর নয়ত সেই লম্বা কাঁকড়ি চিবোতে থাকে।

পশ্চিম পাঞ্জাব হলো দুর্গপ্রাকারের দেশ। টিলা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম, কিংবা জমিদারের পাঁচিলঘেরা বাড়ি—আর তার নীচে পরিখা এবং আশে পাশে কাঁটালতা ঝোপঝাড়ের প্রান্তর। প্রাচীন অতীতকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অবধি পশ্চিম

পাঞ্জাব মার খেয়ে এসেছে যুগে যুগে। চিরস্থায়ী বাসস্থান কেউ কখনও পায়নি, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে শুধু পালিয়ে বেড়িয়েছে। তাই উঁচু নীচু উপত্যকার মতো প্রান্তরে যতগুলি গ্রাম এবং আবাসভূমি চোখে পড়ে, তাদের অধিকাংশ হলো প্রাকারবেষ্টিত এবং মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, ও চারিদিকে তার পরিখা খনন করা। কাঁকর পাথরযুক্ত মাটি দিয়ে দোতলা তিনতলা ইট গাঁথা, বাইরে পলস্তারা প্রায়ই চোখে পড়ে না। মেয়েরা আশৈশব পায়জামা পরা, কেননা তারা বংশ-পরম্পরায় জেনে এসেছে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পালাতে হবে,—বিশেষ করে শিখ নারীরা। পূর্ব-পাঞ্জাবের মেয়েরা—যারা অধিকাংশ হিন্দু—তারা শাড়ি পরে। কিন্তু শিখপ্রধান পশ্চিম পাঞ্জাব মেয়েদের জন্য শাড়ি বরাদ্দ করেনি। এবং যে কারণেই হোক পশ্চিম পাঞ্জাবে শিখ এবং মুসলমানের চরিত্রগত পার্থক্য খুবই কম। এমন কি শারীরিক লক্ষণও প্রায় এক। আহারাদির তালিকায় প্রভেদ নেই বললেই চলে। উভয়ের পূজ্য বস্তুও প্রায় এক—অর্থাৎ দুখানা পবিত্র গ্রন্থ। ভোজের আসরে উভয়েই একাসনে বসে এবং স্বভাবপ্রকৃতির প্রখরতায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, আচার আচরণ সমস্তই এক, উভয়ের ধমনীতেও আর্যরক্ত প্রবাহিত,—কিন্তু ধর্মটা ভিন্ন।

সন্ধ্যার আগেই এলুম রাওয়ালপিণ্ডি ছাউনী স্টেশনে। এটা শিখপ্রধান শহর—যেমন লাহোর আর অমৃতসর, যেমন জলন্ধর আর লুধিয়ানা, যেমন লায়ালপুর, শিয়ালকোট আর লালামুসা। এ-অঞ্চল অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সেদিনকার এই পশ্চিম পাঞ্জাবে সংখ্যায় মুসলমান অনেক বেশী হলেও সম্পদের প্রাচুর্য ছিল শিখ আর হিন্দুদের হাতে। সিন্ধুতেও ঠিক একই কথা। তবে সেখানেও ছিল হিন্দু প্রাধান্য। এমন কি সীমান্তে ও বেলুচিস্তানের লক্ষপতি যারা, তাদের অধিকাংশ হিন্দু ও শিখ। কোয়েটার ভূমিকম্পে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা আশী ভাগ ছিল হিন্দু। বেলুচিস্তানের খালাৎ, শিবি, হিন্দুবাগ ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে কেবল যে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষায় ঐশ্বর্যে সম্পদে বিলাস-বৈভবে তারা সমগ্র সীমান্তলোকে বিস্ময়ের আধার ছিল। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেকের নাম জানবার আগে—কি মেয়ে কি পুরুষ—কোনওমতেই জানা যেত না তারা হিন্দু অথবা মুসলমান। সিন্ধুতেও অনেকটা তাই, হিন্দু মুসলমানের প্রায় একই চেহারা। আচার্য কৃপালনীকে দেখে সিন্ধুকে চেনা যাবে না,—কারণ ওঁদের ঘরে ঢুকেছে বাঙালী মেয়ে, ওঁদেরকে বাঙালী করে ছেড়েছে।

আমার পরনে এবার ধুতি পাঞ্জাবী দেখে পথের লোকেরা অবাক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল বাঙালী ডাক্তারখানা। নামে বাঙালী, চেহারায় ভাষায় পাঞ্জাবী। তাঁরা আমাকে আশ্রয় দিতে প্রথমটা একটু 'কিন্তু' হলেন। বাঙালীর ছেলের পরিচয় এদিকে একটু অন্য রকম। তারা সন্ত্রাসবাদী, তারা পুলিশ ও গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তারা রিভলবার নিয়ে ঘোরে। তাদের আশ্রয় দিয়ে অবশেষে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।' সুতরাং গৃহস্থঘরের পরিবর্তে ওঁদেরই দোতলায় ঔষধপত্রের গুদামে কোনওমতে স্থান পাওয়া গেল। রাস্তার কলে সেদিন সন্ধ্যায় স্নান করলুম মহানন্দে। কিন্তু সমস্ত রাত ধরে সেই ঘরের বিচিত্র ঔষধের সংমিশ্রিত গন্ধে আমাকে অত্যন্ত অস্থিরভাবে কাটাতে হয়েছিল। এ কাহিনীটুকু আগেও বলেছি,—আবার বলছি। এইদিনেই এই কাহিনীটুকু আমার মন থেকে কিছুতেই মুছতে চায় না।

পরদিন পিণ্ডি থেকে যাত্রা হিমালয়ের দিকে। রৌদ্র ঘন হয়ে ওঠার আগে আমাদের মোটর বাস ছাড়লো। আনন্দের সেই হৃৎকম্প ভুলিনি, ভুলিনি সেদিনকার উদ্বেগের অস্বস্তি। যখনই এগোই হিমালয়ের দিকে, তখনই পিছনের পথ মুছে দিয়ে চলে যাই। আমাকে সমতলে মানায় না, হিমালয় হলো আমার সত্য পরিচয়। ঘরের মধ্যে আমি পরদেশী, কিন্তু হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের পথে নামলে আমি মনের মতন ঘর খুঁজে পাই। কলকাতার এল্‌বার্ট হল-এ ঢুকলে কিছু চিনতে পারিনে, কিন্তু নেপালের ভীমপেড়ীর ধর্মশালাটা আমার অচেনা নয়। শিলংয়ের হিন্দু বোর্ডিং কিংবা দার্জিলিংয়ের পাষাং বিল্ডিং আমার যেন চিরদিনের চেনা। সেই কারণে যতই এগোচ্ছিলুম পিণ্ডি থেকে পাহাড়তলীর দিকে, ততই আমার সমগ্র চেতন-লোক যেন উগ্র পুলকে থর থর করছিল।

যত পাহাড়ের দিকে গাড়ি অগ্রসর হচ্ছে, ততই নিরিবিলি হয়ে আসছে। বাতাস মধুর স্নিগ্ধ। দীর্ঘ ঋজু পথ কতদূর গেছে কিছু জানা যায় না। আশে পাশে শুষ্ক নদী-পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ। দু'ধারে চলেছে সুউন্নত শালপ্রাংশু। চারিদিকে তার পাতা ঝরেছে অজস্র। পথের বর্ণ রক্তিম। যেখানে শাল বন, সেখানেই রাঙ্গামাটি। মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, বর্ধমানের কোনও কোনও অঞ্চলে, সাঁওতাল পরগণায়, দুমকায়, মুঙ্গেরে—যেখানে যাও দেখবে রাঙ্গমাটির পথ বেয়ে চলেছে শ্রমিক, আর তাদের পথের দু'ধারে শালবন। কোথাও মাটি গোলাপী, কোথাও বা ঘন-রক্তিম। এখানেও তাই। পাহাড়তলী ঘন অরণ্যে ভরা; মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বড় বড় গাছের গুঁড়ি-চেরাইয়ের গোলা,—কাশ্মীরী কুলীরা সেখানে কাজ করছে। সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে রয়েছে কাঁচা কাঠের গন্ধ—যেটার বন্য বিভ্রান্তকর আমেজ সমগ্র হিমালয়ের ঘন গূঢ় রহস্যকে মনের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে। ভূটানের দিকে যাও, ওই যেদিকে দলশিংপাড়ার পথ আলীপুরদুয়ারের ওপর দিয়ে চলে গেছে,—ওখানকাঁর কাঠের কারখানাতেও পেয়েছিলুম এই গন্ধ, এবং এই গন্ধ পেয়ে একদা বিহ্বল হয়েছিলুম কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে রামবান অঞ্চলের পাহাড়ের পথে। সেদিন জ্যোৎস্না নেমেছিল চন্দ্রভাগায়।

রৌদ্রের চেহারা দেখে এই জ্যৈষ্ঠমাসের দিনে আর ভয় করছে না। নগরের উত্তেজনা, কলকোলাহল, আর রৌদ্রপথের ধূলিধূসরতা সমস্তই পিছনে ফেলে এসেছি। রাওয়ালপিণ্ডি জেলার বহু অঞ্চলে যেমন দেখে এলুম কালীমন্দির, শিবস্থান, গুরুদ্বার—যেমন সমগ্র পাঞ্জাবে কালীস্থাপনা এবং শক্তিপূজা,—তেমনি রাওয়ালপিণ্ডির এ অঞ্চলেও। এই পার্বত্যলোকেও তেমনি শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি অরণ্যভূমিকে কোথাও কোথাও মুখর করে তুলছে। পাঞ্জাবী শিখরা শক্তিপূজারী,—সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে একথা সত্য। কাল্‌কায়, কাংড়ায়, চাম্বায় একথা সত্য। একথা সত্য ধরমপুরে, জলন্ধরে, জ্বালামুখীতে এবং সিন্ধু-পঞ্চনদের এপারে ওপারে। ওরা শক্তিলাভ করতে চেয়েছে এতকাল, আরাধনা করে এসেছে শক্তির,—শক্তির দ্বারা ওরা আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছে, শক্তির দ্বারা জয়ী হয়েছে। পেপসুতে একথা বিদিত, হিমাচল প্রদেশে একথা স্বীকৃত, পাতিয়ালায় একথা প্রচারিত। কিন্তু লজ্জা করে যখন একশ্রেণীর শিখকে বলতে শুনি, তারা হিন্দু নয়। নবদ্বীপের বোষ্টমরা যদি বলে বেড়ায় আমরা হিন্দু নই—কেমন লাগে? আহমেদীরা যদি বলে বেড়ায়, আমরা মুসলমান নই,—কেমন শোনায়? ওরা শান্ত মনে একথা ভাবতে চায় না যে, হিন্দু হলো বনস্পতি, তার নানা শাখাপ্রশাখায় নানা সম্প্রদায়। বিশেষ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ এক শ্রেণীর আর্যহিন্দু গুরু নানকের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর শিষ্য হন। সেই শিষ্য

মানে শিখ, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। কিন্তু পাঞ্জাবে সর্বত্রই হিন্দু-শিখ বিবাহ প্রচলিত। হিন্দু পাঞ্জাব মনে করে না শিখ-পাঞ্জাব তার কাছে অপরিচিত। খুড়তুতো-জাঠতুতো, মামাতো-পিসতুতো, শ্বশুর-জামাই, শ্যালী-ভগ্নীপতি—কেউ পাঞ্জাবী শিখ, কেউ বা পাঞ্জাবী হিন্দু। ভিন্ন ধর্মী নয়, ভিন্ন মতবাদী। কারো নাম তারা সিং, কেউ বা নানকচান্দ।

গাড়ি চলেছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সশব্দে—কখনও সেকেন্ড গীয়রে, কখনও বা থার্ড গীয়রে। সমতল হিন্দুস্থান রয়ে গেল অনেক নীচে। চুপ করে আছে সবাই, নৈঃশব্দ্যের ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না। কলরব করি আমরা বাইরে, কিন্তু ভিতরে এসে স্তব্ধ। হিমালয়ের আত্মাকে দেখি যখন মুখোমুখি, তখন আর কথা সরে না। পরমের আস্বাদ যখন পাই, তখনই বাক্যহারা হই। তাজমহলের গম্বুজের মধ্যে ঢুকেও আমরা কথা কই, কিন্তু মূল সমাধির গহ্বরের মধ্যে যখন নেমে যাই, তখন সবাই নির্বাক। এখানে কথা সরছে না কারো মুখে, কেননা এটা হিমালয়ের গহনলোকের কাছাকাছি। অবরোধ সরে গেছে সামনের থেকে, দেখছি মহামহীধরের বিশাল বিস্তার। উপরে গগনলোক এখনও কতকটা সঙ্কীর্ণ কিন্তু তার জলদলেশহীন নীলকান্ত চেহারাটায় যেন অমৃত আস্বাদ লেগে রয়েছে। হঠাৎ পাখি ডেকে গেল। চমকে উঠে দেখি, আমরাই চুপ করে আছি, কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি নিত্যকলমুখর। অবিশ্রান্ত শুনে যাচ্ছি ঝিল্লীর একটানা ডাক, লতায় পাতায় শাখায় প্রশাখায় সরীসৃপের অক্লান্ত আনাগোনা, কুজনে গুঞ্জনে বসন্তের পাখিরা মুখর করে রেখেছে বনভূমি, আশে পাশে বনকুক্কুট আর খরগোশের ছুটোছুটি। ওদের রাজ্যে আমরা বে-আইনী প্রবেশ করেছি।

ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছি। ঘন দেওদার বনের তলা দিয়ে ঝরাপাতা উড়িয়ে স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে চলেছে। চারিদিকের অরণ্যে বসন্তের সমারোহ। এখানে এখন বনকুসুমের মাস। অজস্র বিবিধ বর্ণের ফুল দেখে চলেছি ঘাসে, লতায়, ডগায়, শাখায় চূড়ায়। নাম জানিনে কোনও ফুলের, যেমন জানিনে পাখির, যেমন জানিনে নানা ফলের, নানাবিধ বৃক্ষলতার। কতকাল ধরে ভেবেছি সত্য লাহাকে ধরে পাখি চিনবো, বিভূতি বাঁড়ুজ্যেকে ধরে গাছপালা চিনবো, রাখাল বাঁড়ুজ্যেকে ধরে স্থাপত্য চিনবো, এন্টিকোয়েরিয়ন্ বীরেন রায়কে ধবে পাথর চিনবো। কিন্তু কোনওটাই হয়নি। এই হিমালযের গহনলোকে প্রাচীনতম মন্দিরের মধ্যে ওই যে অলকানন্দার তীরে গোপেশ্বর কিংবা গরুড়-গোমতীর তটে বৈজনাথ আজও মহাকালের সমস্ত শাসন উপেক্ষা করে দণ্ডায়মান, ওদের ওই ভগ্ন জরাজীর্ণ পাথরের অন্দরে কন্দরে আজও প্রাচীন দুর্জ্ঞেয় ভারতের যে উদাসী বাতাস বয়ে যায়—ওদের কি জেনেছি, ওদের কি চিনেছি? চিনেছি কি সামান্য একখানি পাথরের আদি কাহিনী? ওই যে উপেক্ষিত দেবমূর্তি খোদিত পাথরের টুকরোগুলো গয়া-কাশী-প্রয়াগ-মথুরা-বৃন্দাবনের পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকে, ওদের সত্য পরিচয় কি পেয়েছি কখনও? ওই যে দাক্ষিণাত্যে অজন্তার গুহায় গিয়ে যেদিন সজল নয়নে দাঁড়ালুম মহাভিক্ষুর শয়ান মূর্তির সামনে, তখন কী দেখেছি? কাকে দেখেছি? কোন্ বস্তু খুঁজেছি? ওই যে কনারকে গিয়ে সপ্তাশ্ববাহী রথচক্রের উপর সূর্যমন্দিরের সামনে নিমীলিত নেত্রে দাঁড়ালুম, সেখানে কি শুধু দেখেছি প্রস্তরখোদিত নরনারীর নগ্ন মৈথুনের বিবিধ বৈচিত্র্য? ওর মধ্যে খুঁজেছি কি কোনও পরমাশ্চর্যকে? ওর কিছু কি জেনেছি, যা জানা যায় না? সামান্য দুটি আঁখিপল্লবের উপরে কি ধারণ করতে পেরেছি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ও সর্বকালজয়ী সভ্যতাকে? না, কোনও রহস্যই জানতে পারিনি। শুধু

মূঢ়ের মতো চেয়ে থেকেছি। যেমন চেয়ে থেকেছি বিস্ময়াহত হয়ে পাতাল গঙ্গায় মহিষমর্দিনীর ছায়ান্ধকার ভগ্ন মন্দিরে। সেখানে মন-কেমনের হাওয়ায়-হাওয়ায় হাহাকার করেছে আমার সমগ্র সত্তা। বাস্তবের বাঁধন ডিঙিয়ে আপন অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছি। মানুষের বিবর্ত ছাড়িয়ে দৈবসত্তার উপলব্ধিটিকে সহজ মনে করেছি। চেয়ে থেকেছি বিরহী নদীর তীরে ব্যাসগুহাগর্ভে। নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে থেকেছি বিপাশার তীরে প্রাচীন ত্রিলোকনাথের মন্দিরের দিকে। আমি শুধু নিঃসঙ্গ বিমূঢ় দর্শক—আবিষ্কার করতে চেয়েছি ভারত-আত্মাকে হিমালয়ের স্তরে স্তরে, মন্দিরের মণিগহ্বরে, ছায়াচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে, নীলনয়না নদীমেখলী গিরিশৃঙ্গমালার তুষার স্তবকে। কিন্তু আমি মূঢ়, আমি জানি আমার উদাসীন ব্যর্থ পরিব্রজ্যা নিষ্ফল আত্মানুসন্ধানে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কোনও কোনও কাফিখানার সামনে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। কোথাও রুটির দোকান, কোথাও বা ভিন্ন জলযোগের ব্যবস্থা। এ গাড়ি যাবে কাশ্মীরে ঝিলম্ নদী পেরিয়ে। কিন্তু 'সানি ব্যাঙ্ক' পর্যন্ত গিয়ে এ গাড়ি বাঁক নেবে মারী পাহাড়ের দিকে, তারপর যাত্রী কুড়িয়ে নিয়ে যাবে কোহালায়। কোহালা থেকে নদী পেরিয়ে উরির পথ। সন্ধ্যার পরে কোনও এক সময় গিয়ে পৌঁছবে শ্রীনগরে।

দেওদারের ছায়ার নীচে কোথাও কোথাও সেনানিবাস। সমস্ত পথ সামরিক সজ্জার দ্বারা শৃঙ্খলিত। সীমান্ত অঞ্চল বেশী দূরে নয়। হাজারা জেলায় প্রবেশ করার নানা পার্বত্যপথ আশে পাশে চলে গেছে। দুর্ধর্ষ এবং বন্যপ্রকৃতি পাঠানদের ওপর আধিপত্য রাখার জন্য হাভেলিয়ানে আছে মস্ত সামরিক ঘাঁটি। এই অঞ্চল থেকেই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এই পথে দাঁড়িয়েই কয়েক বছর আগে মিঃ জিন্না, স্যর ওলাফ্ কারো, সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী আবদুল কৈয়ুম ও ইংরেজ সেনাপতি কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাকসৈন্যসামন্ত ও পাঠান দস্যুগণকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন।

আমার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবী-চটিজুতো। সুতরাং প্রত্যেক যাত্রীর কাছে আমি দ্রষ্টব্যবস্তু ছিলুম। তারা বাঙালীর নাম জানে, পোশাক জানে না। বাঙালী হলো মুন্সী বা কেরানীর জাতি ওদের কাছে। যেমন এখন মাদ্রাজীরা, যেমন হাল-আমলের পাঞ্জাবীরা, যেমন নতুন রসের বিহারী আর উত্তর প্রদেশীরা,—তাই বাঙালী ওদের চোখে বাবু। বাবু মানে মিস্টার নয়, এখানে বাবু মানে কেরানী, ইংরেজ বলে গেছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু, রবীন্দ্রবাবু, জগদীশবাবু? ইংরেজ একথার জবাব দিয়ে যায়নি। এখানে ওখানে সেখানে—প্রায় সর্বত্রই বাবুমহল্লা, অর্থাৎ কেরানী-পল্লী। পেশাওয়ার, পিণ্ডি, লাহোর, চাকলালা, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ,—যেখানেই মিলিটারী একাউন্টস্, সেখানেই বাবুমহল্লা। জন আষ্টেক বাঙালী যদি গায়ে গায়ে থাকে—তবে সেইটিই বাবুমহল্লা। যেখানে কালীবাড়ি সেখানে বাবুমহল্লা। বাঙালীর মাথা ঠাণ্ডা, হিসেব নিকেশ ভালো জানে, ভালো ইংরেজি বলতে পারে এবং লিখতে পারে,—বুদ্ধি পরামর্শ দেয় ভালো, আইনকানুন মেনে চলে,—সুতরাং তারা বাবু। কিন্তু সেই বাবুরা পথে ঘাটে ধুতি পাঞ্জাবী পরে বেরোয় না—তাদের হলো চাকুরে পোশাক। সুতরাং আমি এখানে অদ্ভুত বৈকি। আমি বাঙালী, কিন্তু কে আমি? বাড়ি কোথা? বাপের নাম কি? বিষয়কর্মাদি কি করা হয়? মশায়ের নাম? এদিকে আসার উদ্দেশ্য?

চারদিকের রাশি রাশি নোংরা কৌতূহল আমাকে যেন নিরন্তর বিদ্ধ করতে লাগলো। এমন আড়ষ্ট কখনও হইনি; নিজেকে এমন নির্বোধ আর কখনও মনে হয়নি।

অনেক উপরে উঠেছি, বায়ুস্তর লঘু হয়েছে বলেই কানে তালা লাগছে। যেমন এইরোপ্লেনে ওঠা। কিছুদূর উঠলেই কান কট্‌কট্‌ করে, তারপর শ্রুতিগহ্বরটি একেবারে অবরুদ্ধ। তখন তুলো চাই, তুলো গোঁজো কানে। ভদ্র কোম্পানীর বিমানে চড়লে 'হোস্টেস্‌' এসে তুলোটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়। তুলো গুঁজলে কিছু স্বস্তি। ধীরে ধীরে তখন বিমানের ভয়ানক কানফাটা আওয়াজটাও সয়ে যেতে থাকে। সে যাক্‌।

নীচেকার বনরাজিনীলা প্রকৃতি উপরদিকে উঠে হালকা হয়ে এসেছে। এখানে অরণ্যের শোভা কম, পাহাড়ে পাহাড়ে রুক্ষতা দেখা দিয়েছে। নীচের দিকে আর নজর চলছে না। খাদের দিকে তাকালে হৃৎকম্প হয়। চারিদিকের বিশালতা বেড়ে গেছে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পেরিয়েছি বস্তি। বড়কাগাঁও, বর্ত্‌, দুত্তর, নালিপন্থ—এরা চলে গেছে। দূরের পাহাড়গুলির গায়ে চাষীদের ঘর, কিন্তু ঘরগুলি দূরের থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরা ছোট ছোট পোকার মতো পাহাড়কে কামড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা চিরকাল আছে, বংশপরম্পরায় আছে। যুগে যুগে রাষ্ট্রশাসনভার এক হাত থেকে অন্য হাতে গেছে, এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির হাতে, এক সভ্যতার পরে এসেছে অন্য সভ্যতা—কিন্তু ওরা কামড়ে আছে হিমালয়ের গা। ওরা চলে না, ওরা টলে না। ওরা হিমালয়ের আদি সন্তান, —বক্ষলগ্ন হয়ে রয়েছে যুগযুগান্তর, ঘন আলিঙ্গনের নিরাপদ শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছে। কোনও হুজুগ, কোনও আন্দোলন, কোনও বিপ্লব বা অরাজকতা ওদেরকে চঞ্চল করে না।

'সানি ব্যাঙ্কে' যখন গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তখন তাঁর ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে। প্রায় ছয় হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হয়েছে। মাঝে মাঝে আরও বেশী। যাত্রীদের মতো ইঞ্জিনও এখন তৃষ্ণার্ত। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে অপরাহ্নের দিকে যাচ্ছি। বাতাস ঈষৎ স্নিগ্ধ বটে, কিন্তু তবুও ধূ ধূ করছে রোদ। ছোট শহর 'সানি ব্যাঙ্ক।' মোটর বাসের স্ট্যান্ডটা মস্ত বড়। সেনানিবাস ও স্টোর আপিসকে ঘিরে একটি বাজার গড়ে উঠেছে। কাছেই একটি যাত্রীনিবাস। কসাইদের দোকানে ঝুলছে গরু বাছুরের হাড়পাঁজরা,—রং কিছু রক্তিম হরিদ্রাভ। স্থানীয় জনতা অনেকটা যেন ভেসে বেড়ায়। ফলওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, মোটর ড্রাইভার, রুটিমাংস-বিক্রেতা, কাশ্মীরী মেওয়া-ব্যবসায়ী, পল্টনের সেপাই, মিলিটারী অফিসার সহ ইঙ্গভারতীয় স্ত্রীলোক, তুর্কী পাঠান কিংবা কাশ্মীরী কুলি, হাজারা জেলার বন্য দেহাতী—ইত্যাদি নানাশ্রেণীর মিশ্রিত জনতায় সানি ব্যাঙ্ক পরিপূর্ণ। দরিদ্র কাশ্মীরী কুলীরা মোটা মোটা দড়ি গলায় অথবা হাতে ঝুলিয়ে পথের পাশে বসে রয়েছে। বলিষ্ঠ, হ্রস্বকায়, রক্তিম গৌর, ছাঁটা দাড়ি গোঁফ, পায়ে চপ্পল এবং ছিন্নজীর্ণ ময়লা পোশাক,—ওরা কেউ পাঠান, কেউ বা কাশ্মীরী। ওরা মানুষ হয়ে জন্মায়,—কুলী হয়ে মরে। বছরের প্রায় আট নয় মাসকাল পাহাড়ি শহরগুলির আশে পাশে রুটি খেয়ে আর মোট বয়ে বেড়ায়, পথে পথে রাত্রি কাটায় কাঁধের ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে। রুটি আর সবজির পুঁটলী রাখে সঙ্গে, পথে যদি কোথাও জোটে একটু আধটু ফল আর বাদাম, কিংবা বরাতক্রমে টুকরো দুই মাংস,—সেই ওদের জীবনযাত্রা। মুখে চোখে বন্য সরলতা, ভাষাটা পুস্তু আর কাশ্মীরী 'বোলি'—জাতি গোত্র একই, কিন্তু রক্তের প্রকৃতি ভিন্ন। এমন আছে শত শত পাঠান আর কাশ্মীরী কুলী,—যারা দেহাত ছেড়ে এসেছে সেই বাল্যকালে, আজও ঘরে ফেরেনি। নিজের নামটা জানে,—ব্যস। না জানে বাপের নাম, না নিজের বয়স, না নিজের গাঁও। এমন ঘটনা দেখেছি, সহোদর দুই ভাই দলবদ্ধভাবে কুলীগিরি করছে বছরের পর বছর, ছেলের

সঙ্গে বাপ একই মেয়ে নিয়ে টানাটানি করছে,—কিন্তু কেউ কারো পরিচয় জানে না। তবু ওরা শান্ত মনে মোট বয়, দুদিকে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল পাহাড় ভাঙে, কুঁজো হয়ে বোঝা তোলে পিঠের ওপর দুই বগলে দড়ি বেঁধে, খানিকটা জিরোয় পাহাড়ের গায়ে বোঝা ঠেসে ধরে, কপালের ঘাম হাত দিয়ে ঝরায়, তারপর আবার মোটা মোটা কঠিন দৃঢ় পায়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে থাকে।

এখান থেকে মোটর পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। একটি গেছে কোহালার দিকে, অপরটি গেছে কো-মারীতে। মারী এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। উত্তর ভারতের সামরিক ঘাঁটির প্রধান দপ্তর। 'সানি ব্যাঙ্ক' থেকে আবার চড়াই শুরু মারী পাহাড়ের দিকে। এবারের পথ অপরূপ,—দেওদারের ছায়ায় আর স্নিগ্ধতায়, বায়ুর মধুর ব্যজনে এবং বিশাল বৃক্ষশ্রেণীর মর্মরিত পাতায় পাতায় যেন গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা ঘুরে ফিরে চলেছে। ঝরাপাতার রাশির ঝরমরানি শুনতে পাচ্ছি আমাদেরই মোটরের চাকার তাড়নায়। একদিকে দেখতে পাচ্ছি দূর দূরান্তের দিগ্বলয়ের সীমানায় উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। দেখতে পাচ্ছি কারাকোরাম, দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার চূড়া, দেখতে পাচ্ছি হরমুখের অস্পষ্ট শিখর। ওরা চিরতুষারে আবৃত, চিরদিনের ধবলাধার। ওদের ছাড়িয়ে আরও দূরে দিগন্তচিহ্নহীন কোনও একটা পৃথিবীর কোণে দেখতে পাচ্ছি আমার সেই ছোট্ট ঘর, খোলা বাতায়নের নীচে দিয়ে উঠছে লতানে জুঁইয়ের ডগা, তার পাশে ছোট চারা উঠেছে সন্ধ্যামণির,—ঠাকুরঘরের দিকে আর কিছুক্ষণ পরে মা যাবেন সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে; সেই মলিন আলোর মৃদু আভায় যেন বহুদূর থেকে দেখছি বিষণ্ণ জননীর মুখ।

অপরাহ্ণের রোদ পাহাড়ে পাহাড়ে এখনও ধূ ধূ করছে। বেলা এখন চারটে। সাড়ে আটটার কাছাকাছি এদিকে সন্ধ্যার আলো জ্বলে। রাত চারটের সময় ভোর হয়। আমরা কাশ্মীরের পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই পাহাড় নেমে গেছে ঝিলম নদীতে। ঝিলম পেরোলেই কাশ্মীর। আমাদের নিরিবিলি পথ নানা 'বেন্ড' ও পথের নিশানা পেরিয়ে মারী পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এলো। ছোট শহরের ঠিক নীচেই মোটর স্ট্যান্ড, সেখান থেকে খানিকটা চড়াই উঠে গেলে মারীর 'ম্যাল্' পাওয়া যায়। এ অঞ্চলটার নাম মারী-বাজার। এ শহরটি দার্জিলিংয়ের মতো নয়। কোনওদিকে পাহাড়ের দেওয়াল নেই। এখানে এলেই মনে পড়ে লান্সডাউন, মনে পড়ে শিমলা। মারী শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায়। কালিম্পংয়ের মতো এখানে রয়েছে মস্ত গির্জা,—সেখান থেকে ঘণ্টা বাজলে বহুদূর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। হিন্দুর আছে দেবালয়, শিখদের গুরুদ্বার। কিন্তু আশ্চর্য, মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে মসজিদ সহসা চোখে পড়ে না। যেমন কাশ্মীর,—সমস্ত দেশ জুড়ে রয়েছে রাজা ললিতাদিত্যের কীর্তি, অগণ্য মন্দির এবং হিন্দু স্থাপত্য, আর্য গ্রীক আমলের বিবিধ কীর্তি,—কিন্তু মসজিদের সংখ্যা নগণ্য। যেমন জম্মু, তেমনি কাশ্মীর,—ব্যতিক্রম কিছু নেই। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে কবে নাকি গিয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব, তাঁদের সেই পথের নিশানায় আজও রয়েছে ইংরেজি নেম্-প্লেট্।

থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন ওই পথের নিশানাটার কাছে। পথটা সরু হয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে অনেক দূর, সেখান থেকে নীচের দিকে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। লতাবিতানে ছাওয়া নিরিবিলি পথ। বড় বড় গিরগিটি আশে পাশে চরে বেড়ায়, ওদের ভয়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকতে পারতুম না। এই পথ দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে যায় কাঠুরে,—ওদের

সঙ্গে আসে সেই কাঁচা দেওদার কিংবা পাইনের গন্ধ,—যে গূঢ় নিবিড় গন্ধটা হলো হিমালয়ের অনন্ত রহস্যালোকের। ওই পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি মহাভারতের আদি সূত্রপাত। ভারতের প্রথম সভ্যতার জন্ম এই অঞ্চলে, এই উত্তর-পশ্চিমে। কুষণ নয়, কনিষ্ক নয়,—তারও অনেক আগে, চার হাজার বছরেরও আগে। মহাজনপদের প্রারম্ভে নয়, গৌতম বুদ্ধ কিংবা অজাতশত্রুর আমল নয়। সেই যখন প্রথম এসেছিল আর্যরা,—কে জানে তারা পামীরের, কি মধ্য এশিয়ার, কিংবা কারাকোরামের ওপারের। কিন্তু এই অঞ্চল দিয়ে ছিল তাদের ভারত প্রবেশের পথ। তারা যে কুরু-পাণ্ডবের পিতৃপুরুষ নয়, কে জানে? হিমালয় থেকে যেমন নেমে গেছে সিন্ধুর ধারা, যেমন নেমে গেছে এই বিতস্তা বিপাশা শতদ্রু ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার ধারা, যেমন নেমে গেছে গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের ধারা, ভারতসভ্যতার ধারাও তেমনি নেমে গেছে ওই জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। দেবাদিদেবের জটা থেকে যেমন নেমেছে গঙ্গা, হিমালয় থেকে তেমনিই ত নেমেছে ভারতসভ্যতা! সমগ্র ভারতের ঐক্যবন্ধনের আদিমন্ত্র দিয়ে গেছে ওই আর্যরা, প্রতি মানুষের জপমালার সঙ্গে সেই আচমনী মন্ত্রই ত ধ্বনিত হয়, গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী! সাতটি নদী নিয়ে এই অখণ্ড ভারত, সাত নদীর সভ্যতা নিয়েই ত এই ভারতের সংস্কৃতি।

ম্যালের উত্তরাংশ হলো 'কাশ্মীর পয়েন্ট।' কাশ্মীরের পার্বত্যশোভা কতদিন দেখেছি ওই পয়েন্টে বসে। ওখান থেকে হারাতো আমার মন পাহাড়ে পাহাড়ে, পাইনবনের তলা দিয়ে, উপত্যকার ধার দিয়ে, পায়ে চলা পথের নিশানা দিয়ে। মন মিলিয়েছি কতদিন গুহাগহ্বরের আনাচে কানাচে, অরণ্যপুষ্পের গন্ধে, আকাশের টুকরো মেঘের সোনার বর্ণে, হরমুখের তুষারকিরীটে। বোঝাপড়া করেছি কত বন্ধুর সঙ্গে,—লেখরাজ, রূপলাল, আজিজ আহমদ, মতি সিং, পণ্ডিত সদানন্দ, জগদীশ চন্দর! জানিনে তারা আজ কে কোথায়? বৃদ্ধ চাকুরে বাঙালী ছিলেন একজন, তিনি গুপ্ত সাহেব। তিনি আজ নিশ্চয়ই নেই। ওদের নিয়ে যেতুম ছিকা গল্লি আর সেই স্ট্রবেরীতে, যেতুম পিনাকল আর কনভেন্টে। ঘোড়ায় চড়ে যেতুম 'পিণ্ডি পয়েন্ট' পেরিয়ে লরেন্স কলেজের দিকে, সেখানে ছিলেন দ্বিতীয় বাঙালী মিঃ চ্যাটার্জি। কো মানে যেমন পাহাড়, গল্লি মানেও তেমনি পার্বত্য অঞ্চল। বাঁশরা-গল্লি হলো হাজারা জেলার পাঠানদের পথ। তারপর আছে ছাংলা গল্লি, ঘোড়া গল্লি ইত্যাদি।

মারীর দক্ষিণে হলো 'পিণ্ডি পয়েন্ট'। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় বহু দূরে ধূসর বিরাট হিন্দুস্তানের সমতল। সীমাহীন দিগন্তে গিয়ে সেই সমতল অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চেরাপুঞ্জীতে গিয়ে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় সুরমা উপত্যকা, কার্শিয়াং থেকে যেমন দেখা যায় তিস্তা উপত্যকা, মুসৌরী থেকে যেমন দেখা যায় দেরাদুন উপত্যকা আর উত্তর প্রদেশের সমতল, এখানেও তেমনি। দেখতে দেখতে আসে গোধূলির ছায়া, আসে সন্ধ্যা ঘনিয়ে, আসে দিগন্তের নীচের থেকে সন্ধ্যাতারা। একান্ত একাগ্র বৃহদাকার সেই তারা,—নিমেষনিহত চক্ষে আমাকে সে দেখেছে কতদিন।

এই হিমালয়ের উপরে এসেছে নববর্ষা। মেঘেরা এসেছে নীচের থেকে, মেঘের মধ্যে ডুবে গেছি কতদিন। দৈত্য দানবের মতো পাহাড়ে পাহাড়ে ওরা দস্যুগিরি করে গেছে, ত্রাসগ্রস্ত জীবজন্তু ও মানুষ বর্ষার চেহারা দেখে পালিয়েছে, করকাপাতে আহত হয়েছে কত পাহাড়ি পথিক। গাছ ভেঙেছে, পাথর গড়িয়ে পড়েছে, বজ্রাঘাতের আচমকা

আওয়াজে মানুষের চেতনা লোপ পেয়েছে। দেখতে দেখতে মহারুদ্রের কালকটাক্ষ আবার শান্ত নিমীলিত হয়ে এসেছে। দেবতাত্মা হিমালয় আবার বসেছেন যোগাসনে মহাভারতের অনাদন্ত কালের মহামৌন প্রহরীর মতো। তারপর আবার ওই মেঘেরা আমার সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেছে পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে, সীমান্তে উত্তরপ্রদেশে। যক্ষ বিরহীর মতো ওদেরকে পাঠিয়েছি বিশাল হিন্দুস্তানের সমতল ভূভাগে।

পূর্ব হিমালয়ে বর্ষা হলো দীর্ঘস্থায়ী, মধ্য হিমালয়ে কতকটা—যে-ভূভাগ নেপালের প্রান্তবর্তী, কিন্তু উত্তর পশ্চিমে বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়। বর্ষার ঝাপটা আসে, কিন্তু দাঁড়ায় না। পাঠানকোট, শিয়ালকোট, লালমুসা ও পিণ্ডিজেলা অবধি বর্ষার বেগটা বেশ প্রবল, কিন্তু সে অনেকটা বন্যার মতো। ঢল যখন নামে, তখন বনজঙ্গল পাহাড় জনপদ গ্রাম—সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু উত্তরপশ্চিমে বর্ষা আসে খেয়াল খুশীতে। প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামে, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই সব ফর্সা, কোথাও আকাশে বর্ষার চিহ্নও পাওয়া যায় না। সেই কারণে অনেক স্থলে জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও আছে এবং পনেরো-কুড়ি মাইলের মধ্যে নদী থাকলে সেখান থেকেও পাম্প করে জল আনা হয়। মারী পাহাড়ের উপর যেমন বৃহৎ দুটি 'রিজার্ভয়ের' আছে।

'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে মোটর পথ চলে গেছে কোহালায় ঝিলমের তীরে। সেপ্টেম্বরের এক প্রত্যুষে আমরা কোহালার পথে অগ্রসর হলুম। কিন্তু 'সানি ব্যাঙ্কে'র পথ দিয়ে নয়, মারীপাহাড় থেকে সোজা একটি কাঁচা লাল কাঁকর-পাথরের পথ কোহালার দিকে গেছে, সেই পথে আমরা অগ্রসর হলুম। কোথাও কোথাও সামান্য চড়াই, কিন্তু উৎরাই অনেকটা। এ পথটা নিরিবিলি। শোনা গেল, তিন হাজার ফুটের নীচে গেলে জন্তু জানোয়ার আছে। মাঝে মাঝে উপত্যকা পাবো, সেখানে কাশ্মীরের নানা অচেনা রঙীন পাখি চোখে পড়বে। দুম্বা ভেড়া ও পাহাড়ি ছাগলের পাল নিয়ে চলেছে পাহাড়িরা। এত বড় লোমযুক্ত মস্ত-মস্ত ছাগল কম দেখা যায়। গলায় তাদের ঘণ্টা বাঁধা। কুলীরা হাঁটা পথে মোট নিয়ে চলেছে কাশ্মীর থেকে পিণ্ডি শহরে। পুঞ্চের পাহাড়তলী নাকি বিপজ্জনক, সেই কারণে এই দিক দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। পৃথিবী পর্যটন যাঁরা করেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। পীঠস্থান তাঁরা দেখেছেন শত সহস্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পথ দিয়ে যখন গিয়েছি, যখন গিয়েছি কুমায়ুনে, আসামে, গাড়োয়ালে, দুন উপত্যকায়, কুলু-কাংড়ায় কিংবা জম্মু থেকে কাশ্মীরে, বার বার তখন মনে হয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ আর না দেখলেও চলবে। এত রং, এত রস, এমন বর্ণাঢ্যতা, এমন সৌন্দর্যের সুষমা, অরণ্য ও পর্বতের আলো আর ছায়ান্ধকার মিলে এমন আশ্চর্য সুনিবিড় আনন্দোপলব্ধি সম্ভবত সমগ্র ভারতের কোথাও নেই। থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন ওই শিবালিকা পর্বতমালার প্রান্তে, দাঁড়িয়ে থেকেছি কালদণ্ড পর্বতের চূড়ায়, ঘুরে বেড়িয়েছি কমল-নয়ন আর পুণ্যগিরির আশে পাশে, সমস্তটা মনে হয়েছে আশ্চর্য! ভিতর থেকে যেন ফুঁপিয়ে উঠেছে মন অজানা বেদনায়, নিজের অস্তিত্বকে অবাস্তব মনে হয়েছে।

এও সেই পথ, শাল সেগুন পাইন চিড় ঝাউ আর দেওদারে আচ্ছন্ন! পৃথিবী স্তব্ধ গম্ভীর; আমরা যেন আদিকালের প্রথম ক্ষুদ্র মানবক—খান্না, রূপলাল আর আমি। এখানে যেন প্রথম পদচিহ্ন পড়ছে মানুষের, যেন আমরা জীবসৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি। নিজেদের পদশব্দে আমরা নিজেরাই এক-একবার চমকে উঠেছিলুম। অরণ্যের স্বপ্নাবেশ না ভাঙে, মহামৌনী হিমালয়ের যোগতন্দ্রা না টুটে, অরণ্যচারী প্রাণীদের অবাধ চলাফেরা যেন

সচকিত না হয়। সেই জন্য হাতের লাঠি না ঠুকে, কেডস্ জুতোয় শব্দ না তুলে আমরা অত্যন্ত লঘু পদক্ষেপে শান্ত মনে পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কথা আছে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আজ রাত্রিবাস করবো এবং পূর্ণিমা তিথি কাটবে ঝিলম-এর তীরে। আগামী কাল যদি শরীর ভালো থাকে, তবে পায়ে হেঁটেই আবার ফিরবো। আমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি হেঁটে ফিরতে চাইবে না, সে কাশ্মীরের মোটর-বাস ধরে 'সানি ব্যাঙ্ক' ফিরবে। আমরা স্থির করলুম, কোহালার মধুর পরিবেশের মাঝখানে ডাক বাংলায় আমরা রাত্রিযাপন করবো।

পথে অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি নদী পেরিয়েছি। এগুলি পার্বত্য স্রোতস্বিনী, বর্ষায় ঢল নামে, পাহাড় ভেঙে পাথরের টুকরো গড়িয়ে আসে, খরতর বেগে স্রোত প্রবাহিত হয়, পাহাড়ের বনের গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, গ্রাম প্লাবিত করে, কিন্তু শীতের প্রাক্কালে যায় শুকিয়ে। কেবল পড়ে থাকে নীরস পাথরের জটলা। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে এই একই নিয়ম। বর্ষায় হাতী ভেসে যায়, শীতে পাখির স্নান হয় না।

কোহালায় এলে মনে পড়ে যায় লছমনঝুলা, মনে পড়ে যায় হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি শহরের প্রান্তে বিপাশার পুল, মনে পড়ে যায় তিস্তার উপরে সেবকপুল। দুদিকে পর্বতমালা, মধ্যে স্বচ্ছতোয়া নীল নদী। কিন্তু এখানে তার কিছু ব্যতিক্রম। নদী খরস্রোতা, কিন্তু চন্দ্রভাগার জলের মতো রক্তিম গৈরিক। এই ঝিলমকে দেখেছি শ্রীনগরে, সোপোরে, বরমুলায়, ভেরিনাগে, জল কোথাও স্বচ্ছ নয়। শীত বর্ষা গ্রীষ্ম কোনও সময়েই নয়। এর কারণ হলো সমগ্র কাশ্মীরের উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চল মৃৎপ্রধান, শিলাপ্রধান নয়। কাশ্মীরের প্রত্যেকটি নদী পলিমাটি নিয়ে যায় পশ্চিম পাঞ্জাবে; সেই জন্য পশ্চিম পাঞ্জাব তার খাদ্য লাভ করে কাশ্মীরের বদান্যতায়। নদীর জলই পাঞ্জাবের সম্পদ্।

কোহালা সমুদ্রসমতা থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচু হলেও গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত। বাতাস এখানে কম, কেননা পর্বতের দেওয়াল ঘেরা। নদীতে স্নান এখানে আরামদায়ক, কারণ জল হলো নিত্য স্নিগ্ধ। নদী ও পার্বত্যলোকে যত দূর দৃষ্টি চলে ঘন নীল অরণ্যের নীচে রক্তিম মৃন্ময়তা। শুধু চেয়ে থাকো সৃষ্টিরহস্যের দিকে, যেমন চেয়ে থেকেছো ভুটান ভারতের তল সীমানায়, সিকিমের পথে রংপোর নীচে, রুদ্রপ্রয়াগের মন্দাকিনীর তটে, যেমন ধবলী গঙ্গার এপারে আর ওপারে, বাগমতী আর ত্রিস্রোতার তীরে তীরে।

কোহালার পুল হলো কাশ্মীর আর ভারতের সংযোগস্থল। যেমন পাঠানকোট থেকে জম্মুর পথে পড়ে মাধোপুরায় ইরাবতীর পুল। সেখানেও কাশ্মীর ও ভারতের সংযোগ ঘটেছে। এই দুই কাশ্মীর-ভারত সংযোগস্থলে আধুনিক ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় দুইজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একজন কংগ্রেস-ভারতের নেতা বলে মুক্তিলাভ করেছিলেন, অন্যজন হিন্দু-ভারতের নেতা বলে মৃত্যুলাভ করেছিলেন। একজন পণ্ডিত নেহরু, অন্যজন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। এই পুল পেরিয়ে গেলে 'দুলাই' ও 'দোমেলের পথ'। দোমেলে মিলেছে কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা। অনেকে বলে এটি বিতস্তারই একটি শাখা—মূল ধারা থেকে ছেড়ে আবার এসে মিলেছে। কেউ বলে টিটওয়ালের কাছে কৃষ্ণগঙ্গার মূলধারাই দেখা যায়। কেউ বা বলে, মূল টিটওয়ালের ধারা মিলেছে উলার হ্রদে। এই পুল পেরিয়ে পাঠান আর পাকিস্তানীরা এই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল এবং এরই পুরাতন পুল পেরিয়ে একদা শিখরাও একবার কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল এই শতাব্দীর প্রারম্ভে। আর কিছু এগোলেই পাওয়া যায় সেদিনকার শিখ দুর্গ এবং দেবমন্দির। শিখরা সেদিন সোপোর নামক অঞ্চল জয় করে রাজ্যপাট বসিয়েছিল, আর এই সেদিন পাকিস্তানী

পাঠানরা গিয়ে সোপোরে বিতস্তার তীরে শিখ অধিবাসীকে সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে চেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসের আগেই ভারতীয় কাশ্মীর সৈন্যদল বাধাদান করে। এখান থেকে আরম্ভ হলো কাশ্মীরের দেবমন্দির, বিগ্রহস্থান এবং প্রাচীন আর্য, গ্রীক ও হিন্দু স্থাপত্যের নানাবিধ পুরাকীর্তি।

এখন বর্ষার শেষান্ত। কিন্তু রৌদ্র বড় প্রখর, তার সঙ্গে নদীর প্রবাহ প্রখরতর! চারিদিক বায়ুহীন, আমাদের পরিশ্রান্ত দেহ ঘর্মাক্ত। ডাক বাংলা খুঁজে পাবার আগে আমরা নদীর কাছাকাছি গাছের ছায়াতে এসে বিশ্রাম নিতে বসলুম। মাঝে মাঝে ধূলা উড়িয়ে প্রাইভেট মোটর চলেছে শ্রীনগরের দিকে। সন্ধ্যার সময় তারা পৌঁছবে শ্রীনগরে। এখন কাশ্মীরে শরতের মধুর স্নিগ্ধতা, তার সঙ্গে অজস্র ফলফুলের সমারোহ। কাশ্মীরে শরৎ ও হেমন্ত শ্রেষ্ঠ ঋতু।

দেখতে দেখতে অপরাহ্ন পেরিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে ডাকবাংলা সম্বন্ধে খান্না অথবা রূপলাল কারোরই উৎসাহ বিশেষ নেই। আমি ওদের অতিথি, সুতরাং আমার সিদ্ধান্তের মূল্য সামান্য। পথের ধারে চা ও জলযোগ সারা হলো। তারপর খান্না গেল বিশেষ এক কাজে এবং আধ ঘণ্টা বাদে হাসি মুখে ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। ঘাট থেকে কিছুদূর উঁচুতে উঠে সামনেই পথে একটি মস্ত কাঠের গোলা। চারিদিকেই শাল-দেওদারের জঙ্গল। ফলে, এ অঞ্চল ছায়াচ্ছন্ন। কারখানাটার সর্বত্র শিখ ও মুসলমান এবং কাশ্মীরী কুলীর আড্ডা। সম্পূর্ণ অজানা এবং অপরিচিত সমাজ আমার কাছে বটে, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে ওদের ভাষাগত ঐক্যের জন্য সহজেই অন্তরঙ্গতা ঘটছে। আমরা স্তূপাকার গাছের গুঁড়ির জটলা পেরিয়ে ছোট একখানা কাঠের বাড়ির অন্ধকার ছমছমে আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করলুম। আমাদের সম্মিলিত পায়ের শব্দ পেয়ে প্রথমেই যে বেরিয়ে এল, সে প্রৌঢ়বয়স্কা এক শ্রমিক নারী, জাতে কাশ্মীরী মুসলমান, পরনে কাশ্মীরী আলখাল্লা, গলা থেকে পা পর্যন্ত, মাথায় টুকরো কাপড় বাঁধা এবং কানে মোটা মোটা অলঙ্কার, রং খুব ফর্সা। সে হাসিমুখে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে যে ব্যক্তি হাসিমুখে বেরিয়ে এলো সে খান্না ও রূপলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সম্ভবত একটু আগে আমার আসার খবর জানবার জন্যই সেই বন্ধুটি সোজা ভাঙা বাঙলায় আমাকে সম্ভাষণ করলো। ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম মিঃ চৌধুরী। আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই, এখানে বাঙালী হিন্দু শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অসম্ভবও বটে।

হাসি তামাসা চললো বহুক্ষণ। এই প্রথম জানতে পারলুম, এর নাম 'কটেজ'। এমন 'কটেজ' এ অঞ্চলে বহু আছে। অর্থের বিনিময়ে আহার ও বাসস্থান পাওয়া যায় এবং প্রধানত স্ত্রীলোকরাই এই প্রকার 'কটেজ' পরিচালনা করে। চৌধুরী এসেছেন এখানে গতকাল দপ্তর থেকে ছুটি নিয়ে,—এরা সকলেই একই দপ্তরের লোক। চৌধুরী চিরদিনই উত্তর-পশ্চিমে মানুষ। বাঙলার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, বাঙলা ভাষাও তার কাছে অপরিচিত।

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির উৎসাহ কম নয়। কলাইয়ের মগে চা ও দুখানা রেড়ো বিস্কুট এনে আমাদের খেতে দিল। আন্দাজে বোঝা গেল, আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত আয়োজন আগে থেকেই চলছে। এমন কি মুখ ধোবার জল এবং এক কুচি সাবান গুছিয়ে রাখা পর্যন্ত। ঘরদোর অত্যন্ত ছোট ছোট, ভিতরটা একটু দম আটকানো, ওর মধ্যে আছে একখানা রঙীন ছবি পেরেক ঝোলানো মক্কাতীর্থের। তামাকের ব্যবস্থা, এলুমিনিয়মের

বাসন, রুটির টুকরোর সঙ্গে মুরগীর পালক ছড়ানো, কাঁচা কাঠের টুল আর তক্তা, ময়লা বালিশ আর ছেঁড়া নোংরা কম্বল। আমার একটু দিশাহারা ভাব লক্ষ্য করে চৌধুরী বললেন, একটা রাত আপনার কেটেই যাবে, ভাববার কিছু নেই, আসুন।

খান্না আর রূপলাল আমাকে রেখে বাজারের দিকে গেছে। খানিক পরেই ফিরবে। চৌধুরী আমাকে নিয়ে গেল ভিতরে আর একটা ঘরে। একই চালার নীচে ছোট ছোট খুপরি, তাকেই ঘর বলতে হচ্ছে। কিন্তু সেই ভগ্ন জীর্ণ আসবাবের পাশে নিয়ে গিয়ে চৌধুরী দাঁড় করালো আরেকটি স্ত্রীলোকের সামনে। এর বয়স কম। মাথায় রুমাল বাঁধা নেই, অত্যন্ত ময়লা আলখাল্লা, এবং মাথায় তেল চকচকে পাটি করা চুল—যেমন কাশ্মীরী মুসলমানীরা বাঁধে, কানে রুপো বাঁধানো লাল পলা, পিছন দিকে দু তিনটে বেণী ঝুলছে। চোখে সুর্মা। নাক এবং চোখ দুই-ই ধারালো। চৌধুরী সামনে দাঁড়িয়ে বাকি সমস্ত কথাটা কেবলমাত্র হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, অর্থাৎ বুঝতে যেন বাকি না থাকে! মেয়েটা তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে সিগারেট দিল, এবং নিজেও ধরালো।

চায়ের পেয়ালাটা আমার এক হাতে ছিল, অন্য হাতে সিগারেট ধরিয়ে সটান বাইরে এসে বসলুম। শাল আর দেওদারের নীচে ছমছমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কারখানার মজুররা অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়েছে। সুতরাং একটু নিরিবিলি একটা গাছের কাটাগুঁড়ির ওপরে বসে চা গিলতে লাগলুম বিস্কুটের সঙ্গে। নতুন হাওয়া বটে।

এত দূর এবং দুরূহ স্থানে বাঙালীকে পাওয়া সত্ত্বেও চৌধুরীর সঙ্গে আমার দূরত্ব ঘুচলো না। কেবল তাই নয়, এই 'কটেজ' এবং 'কটেজ গার্ল' সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করে তার কিছু বিমর্ষতাও দেখলুম। ফলে আরও দূরত্ব বেড়ে গেল। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বন্ধুরা আঘাত পায়; পাছে আমার কোনও আচরণ অথবা ভ্রূভঙ্গীর বৈলক্ষণ্যে ওরা আমার মধ্যে নৈতিক গোঁড়ামির গন্ধ পায়। সুতরাং একদিকে যেমন আড়ষ্ট হয়ে রইলুম, অন্যদিকে তেমনি স্থির করলুম, হাসি-পরিহাসে সর্বক্ষণ সকলকে উল্লসিত করে রাখতে চেষ্টা পাবো।

যতদূর মনে পড়ছে মেয়েটার নাম মুসম্মত মশনি। বোধ হয় মুশানি থেকে মশনি। বাড়ি তার বরামূলা পেরিয়ে কোন্ পাহাড়ের দিকে। বর্ষার শেষে মায়ের সঙ্গে আসে এদিকে, শরৎ ও শীতকালটা এদিকে থাকে, তারপর গ্রীষ্ম ও বর্ষার আগে চলে যায় দেশে। মা কাজ করে কাঠগোলায়, নিজে এই 'কটেজ' চালায়। কটেজের আয় নিয়ে দেশে চলে যায়।

হট্টগোল থেকে যখন ছুটি পাওয়া গেল, তখন রাত বারোটার কম নয়। বন্ধুরা তখন কিছু স্তিমিত। মশনিও খুব সুস্থ নয়। আমি বাইরে এলুম। পূর্ণিমার চন্দ্র দেখা যাচ্ছে বিশাল দেওদারের ভিতর দিয়ে—একেবারে মাথার ওপর। পাহাড়তলীর ওদিক থেকে মাঝে মাঝে জন্তুর ডাক শোনা যাচ্ছিল। আমার প্রিয় সেই গাছের গুঁড়িটির উপরে এসে কিছুক্ষণের জন্য বসলুম। এমন নিবিড় জ্যোৎস্না, সমস্তই চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তবু কিছুই স্পষ্ট নয়। ফলে একপ্রকার অবাস্তব এবং বিভ্রান্তকর স্বপ্নাবেশ সর্বত্র জড়িয়ে রয়েছে। বাতাস অতি মৃদু, কিন্তু শরতের স্নিগ্ধতা নেমেছে আকাশভরা জ্যোৎস্নার থেকে। আলোছায়াভরা পাহাড় উঠে গেছে অদূরে, তার বিশালতা দেখলে যেন গা ছমছম করে। ওর গা বেয়ে উঠে এই জ্যোৎস্নালোকে কোথাও উধাও হয়ে গেলে কোনও এক রূপকথার

রাজ্যের তোরণ খুঁজে পাবো, হয়ত পৌঁছতে পারবো পর্বতমালা পেরিয়ে কোন এক বিচিত্র লোকে—এই বিতস্তার তীরে বসে যেন তার আস্বাদ পাচ্ছি। বুঝতে পারিনি আপন অস্তিত্ববোধের চেতনার কখন বিলুপ্তি ঘটেছে! তন্ময় হয়েছিলুম।

ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো একেবারে কাছাকাছি। ঠাহর করে দেখলুম সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি। আপন ভাষায় জানালো, আমি এখনও রুটি খাইনি। আমার জন্য সে অপেক্ষা করে আছে। বেটা, ভুখে রহোগে কেঁও, কুছ খা লেও।

খুপরিগুলো প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। বন্ধুরা তাদের উদ্দীপনার মধ্যে লক্ষ্যই করেনি যে, তাদের অতিথি এবেলায় অভুক্ত। লক্ষ্য না করাই স্বাভাবিক, অপরাধ কিছু নেই।

কিন্তু সে রাত্রে এই স্ত্রীলোকটির সদ্বিবেচনার কথা আমি ভুলিনি। আহারাদি সেরে যদিও বাইরের দিকে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল, আমি কিন্তু কোন কষ্টই পাইনি। ময়লা বালিশও একটা কপালগুণে জুটেছিল।

পরদিন মধ্যাহ্নের পর অনেক হয়রানি ও ছুটোছুটির পর পিণ্ডির দিকে যাবার মোটরবাস পাওয়া গেল। আমি একাই চড়ে বসলুম গাড়িতে। কেননা আমার হাতে সময় কম। মনে হচ্ছে বন্ধুরা আজ রাত্রেও এখানে থেকে যাবে। আমি 'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে মারী যাবো। সেখান থেকে শীঘ্রই পিণ্ডি হয়ে ফিরবো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নেপাল ও পশুপতিনাথ

সমগ্র হিমালয় হলো শৈব ও শাক্তের লীলাভূমি। যত দুর্গমেই যাও, মহাদেব এবং পার্বতীর মন্দির পাওয়া যাবে সর্বত্র। যতদূরে যাও, যেখানে খুশী যাও—মহাকালীর স্থাপনা! শক্তির আরাধনা চলছে আবহমানকাল থেকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ধরো। পেশাওয়ার থেকে র:ওয়ালপিণ্ডি, ঝিলম্, শিয়ালকোট, জম্মু, পাঠানকোট,—তারপর চলে এসো পাঞ্জাব রাজ্যে, হিমাচলপ্রদেশে, কাংড়া-কুলুতে, এসো শিমলায়, গাড়োয়ালে, কুমায়ুনে,—শুধু শিব ও দুর্গা, চণ্ডী, মহাকালী, মহিষমর্দিনী। তারপর উত্তর দিকে যাও,—সমগ্র কাশ্মীরে শিব ও শক্তিপূজা। নেমে এসো নীচে কুমায়ুনে, তারপর পূর্বদিকে তিব্বতে ঢোকো, মানস সরোবরের পথে পাবে শক্তি আরাধনা। তিব্বতের খোচরনাথ গুম্ফার গর্ভলোকে মহাকালীর মূর্তি, অমাবস্যায় সেখানে পশুবলিদান হলো বিধি। হিন্দুদর্শনের বনস্পতির থেকে নানা শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে,—কোনটা শৈব, কোনটা শাক্ত, কোনটা বা বৌদ্ধ। ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে কেবল পরস্পরের ভিতরে সংহতি সাধন করে চলেছে। এই সংস্কৃতি রাষ্ট্রের কোনও সীমান্তরেখাকে মানেনি, রাজনীতিক জরীপকে স্বীকার করেনি, তুষাবমণ্ডিত শত শত গিরিশৃঙ্গমালার অবরোধকে গ্রাহ্য করেনি। কেবলমাত্র আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসেব শক্তিতে চিরকাল ধরে তারা হিমালয়ের পারাপার করে এসেছে। ঠিক এই কারণেই সিকিমে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এটা তিব্বতের অংশ; নেপালে দাঁড়িযে মনে হয়েছে এটা ভারতের অংশ। যাঁরা কুমায়ুন, কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ, লাডাক,—অথবা এই কাছাকাছি উত্তর বিহারের কোনও কোনও উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিংবা যাঁরা শিমলা থেকে তিব্বত হিন্দুস্থান রোড ধরে গেছেন কিন্নরদেশে— তাঁরা জানেন, খণ্ড খণ্ড তিব্বত এই ভারতের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। আবার যখন দেখি তিব্বতের অসংখ্য গুম্ফায় হিন্দু দেবদেবীর নিত্য আরাধনা চলে, তখন বুঝতে পারি, খণ্ড খণ্ড ভারত তিব্বতেব মর্মে মর্মে বাসা বেঁধে রয়েছে অনাদিকাল থেকে।

উত্তর বিহার পেরিয়ে যখন সগৌলি থেকে রক্সৌল স্টেশনে গাড়ি থেকে নামলুম, তখন এইপ্রকার নানা তর্ক ছিল মনে। আমি নেপাল যাচ্ছিলুম। সঙ্গে ছিলেন পালিত মশাই। তাঁর গতি ছিল কিছু মন্থর। একটি কথা বলে রাখা ভালো। এবারের যাত্রায় অনেকটা আর্থিক অনটন ছিল, সেজন্য পালিত মশাই সঙ্গে নিয়ে চলেছেন একছড়া সোনার বিছাহার। হারছড়ার মালিক কে, এটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কথাটা পরে উঠতে পারে সেজন্য আগে বলে রাখা ভালো।

রক্সৌলে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে ছমছমিয়ে। পাশাপাশি দুটো স্টেশন, তার মধ্যে একটি হলো ভারতীয় রক্সৌল, অপরটি নেপালী। ছাড়পত্র পেতে অসুবিধা ছিল না, তবে দুটি পয়সা লাগলো। দুজনের জলযোগে লেগে গেল আনা চারেক। উভয় দেশের প্রহরীরা ছিল আশে পাশে। এখন শিবরাত্রি আসন্ন, পশুপতিনাথে মস্ত মেলা, অনেক রকমের যাত্রীর আনাগোনা। বাঙালী বিপ্লবী দলের ছেলে এই সুযোগে নেপালে গিয়ে ঢুকলে

পুলিশের চোখ এড়ানো যায়, অথবা নেপাল থেকে যদি কোনও অস্ত্রশস্ত্র আনা সম্ভব হয়, সে চেষ্টাও চলে। যাই হোক, এখান থেকে অমলেকগঞ্জ আন্দাজ ত্রিশ মাইল, দুজনের ট্রেন ভাড়া তখন আনা দশেকের বেশী নয়, দু'খানা তৃতীয় শ্রেণীব টিকিট করে আমরা অমলেকগঞ্জের গাড়িতে উঠে বসলুম। পালিত মশাই ইতিমধ্যে কোথা থেকে যেন এক গাল পান কিনে খেয়েছেন, তার সঙ্গে জর্দা। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট করলেই তা হোত—বেশী ত লাগতো না। বড্ড ভিড় এ গাড়িতে!

এবারের তীর্থযাত্রার তহবিলে তিনি কিছু চাঁদা অবশ্য দিয়েছিলেন, কিন্তু সে চাঁদায় হাবড়া থেকে মোকামাঘাট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আসা যায় মাত্র। কিন্তু আমার মনে আনন্দ ছিল যে, এ যাত্রায় একজন সুরসিক সঙ্গী পাওয়া গেছে। আরেকটা অপ্রাসঙ্গিক কথাও এখানে বলা চলে। দীর্ঘদিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় জেনেছি যে, হিমালয়ের এমন বহু অঞ্চল আছে যেখানে আমাদের অভ্যস্ত খাদ্য, পানীয় এবং নানাবিধ বিলাসদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য। সেই কারণে প্রাত্যহিক জীবনের অনেক প্রকার অভ্যাস ছেড়ে অনেক উপকরণের উপর আসক্তি ত্যাগ করে বেরিয়ে না পড়লে পদে পদে মন খাবাপ হতে থাকে। অভাববোধের কাঁটা খচ খচ করে।

আমাদের ছোট্ট খেলাঘরের ট্রেনখানা চলেছে পাহাড়ি গ্রামের মাঝখান দিয়ে এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়েই দেখতে পাচ্ছি গ্রামের লোক গাড়িখানাকে বিশেষ গ্রাহ্য করছে না। বহু যাত্রী চলেছে হাঁটাপথে, তাদের তাঁবু পড়েছে পথের আশে পাশে। এই যৎসামান্য রেলপথটুকু ছাড়া সমগ্র নেপালে যানবাহনের আর কোনও ব্যবস্থা নেই। নেপালরাজ ত্রিভুবনবিক্রম তখনও নেপালের ত্রিসীমার বাইরে যাবার হুকুম পান না, এবং তাঁর ত্রিভুবনবিজয়ী বিক্রমকে খর্ব করে রাখার জন্য মহাবাজা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি তাঁকে একপ্রকার নজরবন্দী কবেই রাখেন।

এটা হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। সমস্ত নদীনালা ঝরনা ও জলপ্রপাতের গতি এইদিকে। বৃষ্টিবাদল এইদিকে বেশী,—এবং এইদিকে যেমন বেশী ফসল ফলে, তেমনি বেশী লোকে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। এই তরাই অঞ্চল এখানেই শেষ হয়নি। দক্ষিণ কুমায়ুন থেকে আরম্ভ করে সমগ্র যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙলা, সিকিম, দক্ষিণ ভূটান ও উত্তর-পূর্ব আসামে চলে গেছে। এর দীর্ঘতা হাজার মাইল না হলেও তার কাছাকাছি। সমগ্র হিমালয় থেকে তুষার-বিগলিত জলধাবা নামে, মৃত্তিকা ও পলিমাটি নামে, বর্ষা ও ঝড়েব আঘাতে নেমে আসে উন্মূলিত বনজঙ্গল এই বিশাল তরাই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের ঘন গহন অরণ্যানীর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল আগেকার সুন্দরবনের। কুমায়ুনের পূর্বপ্রান্ত শিলগড় পর্বত থেকে কালগিরি, টনকপুর, পিলিভিৎ, মাইলানি, কৌড়িবাজার হয়ে অগণ্য নদীনালা জলা পেরিয়ে এই টিরাই চলে গেছে বীরগঞ্জ ছাড়িয়ে যোগবানীর দিকে, সেখান থেকে জলপাইগুড়ি, শুক্‌না, আলিপুর দুয়ার ও দক্ষিণ সিকিম পেরিয়ে আসামে। এই হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে যেমন একদিকে পাওয়া যায় শত শত বৎসরের পুরাতন স্থাপত্য, মন্দির, দেবালয়, নানা ঐতিহাসিক কীর্তি, তেমনি এর ভয়ভীষণ অরণ্যলোকে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে ও চিতা, গণ্ডার, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ, শত শত বরনের পাখি ও বিষাক্ত সর্প—এই সুবিশাল ভূভাগের প্রতি স্তবকে-স্তবকে চিরকাল ধরে অব্যাহতভাবে বাস করে চলেছে। আজও হিমালয়ের সর্বত্র রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত ওষধি বন, অনাবিষ্কৃত ভূমিজ ও খনিজ

সম্পদ্‌—যা খুঁজে এনে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ফেললে কেবল যে কোটি কোটি টাকা আয় হতে পারে তাই নয়,—ওই বিশাল অরণ্যের বিচিত্র ওষধিলতার সাহায্যে আজকের এই আণবিক বিস্ময়ের যুগে হয়ত মানুষের চিরকালের দুরাশার বস্তু মৃতসঞ্জীবনী পদার্থও মিলে যেতে পারে। অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে কোনও কিছু একালে আর নেই!

বীরগঞ্জের বিশাল অরণ্যের একাংশে আমাদের গাড়ি অতি ধীর গতিতে চলেছে। শোনা গেল, মহারাজা হস্তীপৃষ্ঠে এই পথে আজ শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর লোকলস্করের তাঁবু পড়েছে জঙ্গলের ধারে ধারে। রাত্রে কিছু দেখা যায় না, কারণ সরকারী কোনও আলোর বালাই নেই। কেরোসিন আসে ভারতবর্ষ থেকে, তার দাম অনেক। অন্ধকারে নেপালকে রাখা দরকার, কেননা সভ্যতার আলো প্রবেশ করলে পাছে এ রাজ্যের অধিবাসী আপন দুর্গত জীবনের চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, পাছে মহারাজার হাত থেকে শাসনদণ্ড খসে পড়ে! তাছাড়া, জাতিতে বৌদ্ধ হলেও ওদেরকে শক্তিপূজার উৎসাহ দান করা হয়। কারণ ইংরেজের সাহায্যে পৃথিবীর নানা দেশে লড়াইয়ের জন্য গুর্খা সৈন্য না পাঠাতে পারলে রাজ্যের আয়-ব্যয়ের কোনও ভারসাম্য থাকে না। এমন নির্ভয়ে, এমন ঠাণ্ডা রক্তে, এমন অবলীলাক্রমে—গুর্খা সৈন্যের মতো আর কেউ বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এমন কি সীমান্তের পাঠান, বালুচ, রাজপুত, জাঠ, ডোগরা, শিখ—এরাও গুর্খা সৈন্য দেখে সরে দাঁড়ায়। সমগ্র ভাবতে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, দূর প্রাচ্যে, আরব ও উত্তর আফ্রিকায়, ইউরোপের বহু অঞ্চলে—এরা নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও দয়াহীনতার জন্য প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল। এদের প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শত্রুর প্রতি নির্মমতা। এমন বাধ্য ও নিয়মানুগত, এমন কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়স্বাস্থ্য, এমন সবল ও নির্ভরযোগ্য—সহসা দেখা যায় না। ইংরেজের মন্দভাগ্যের কালে প্রায় সকল শ্রেণীর সৈন্যদলই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল,—কিন্তু গুর্খা সৈন্যের বিদ্রোহ একবারও শোনা যায়নি।

অমলেকগঞ্জ হলো শেষ স্টেশন। আমরা যখন নামলুম তখন সন্ধ্যা রাত। স্টেশনটি পাহাড়ের কোলে। চারিদিক অন্ধকার। কেরোসিনের আলোয় এখানে ওখানে দেখি কয়েকখানি মাড়োয়ারির দোকানপাট। ওর মধ্যেই ওরা দাঁড়িপাল্লা ধরেছে, ওর মধ্যেই কাঁচি আর কাটাকাপড় নিয়ে বসেছে, এবং ওর মধ্যেই বনস্পতির তেলে ময়লা রংয়ের পুরি ভাজতে লেগেছে। ওরা যে এককালে জয়পুর-উদয়পুর-চিতোর-বিকানের-যয়শলমেরের অধিপতি ছিল একথা ওরা এবং আমরা উভয়েই ভুলেছি। ব্যবসায়ের সঙ্গে বিক্রমের কোনও যোগ ওরা রাখতে দেয়নি।

গাড়ি থেকে নেমে রাত্রির আশ্রয় খুঁজে পাবার আগে পালিত মশাই ধরে বসলেন, একটু গরম চা খাবো।

ইতিমধ্যে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যাত্রীনিবাস হয়ত পাওয়া যেত, কিন্তু আমি নিজে সে নরককুণ্ড কোনওদিনই পছন্দ করিনি। ফলে, নানাবিধ কাঁচামালসংযুক্ত একটি দোকান ঘরের মেঝেতে সেই রাত্রির মতো আশ্রয় পাওয়া গেল। চতুর্দিকে জঙ্গলের এবং পাহাড়তলীর ঝুপসি অন্ধকার ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই দোকান ঘরের মেঝেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে যখন পড়েছিলুম, তখন আমার মনে পড়ে গেল রাওয়ালপিণ্ডির সেই ঔষধের গুদাম। শত সহস্র প্রকার ঔষধের সংমিশ্রিত উৎকট গন্ধে সমস্ত রাত্রি আমি পায়চারি করে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলুম। গোয়েন্দার চোখে সন্দেহভাজন হবার ভয়ে সেই জ্যৈষ্ঠের রাত্রে ঘরের বাইরে বেরোতে পারিনি, এবং এখানে এই

কাঁচামালের আড়তে ও কাঁচাকাঠের তৈরী ঘরের বাইরে এসে একবারও নিশ্বাস নিতে পারলুম না—কারণ এই অমলেকগঞ্জের বাজারের উপর থেকে গতকাল রাত্রেও নাকি একটি নরখাদক বাঘ একটি স্ত্রীলোককে তুলে নিয়ে গেছে। ফলে, আমাদের ঘরটির চারিদিকে একদম ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ করা হলো। ভিতরে শীতে কাঁপছে সবাই।

পালিত মশাই সঙ্গে এনেছিলেন বিছানার পুঁটলি। তার ওপর বেশ আরামে শুয়ে পান জর্দা চিবিয়ে, বিড়ি ধরিয়ে এবং নস্য নিয়ে বললেন, আপনার হিমালয় আপনারই থাক্। আপনার পাল্লায় পড়ে আরও কি কপালে আছে জানিনে।

তাঁকে আনা ছিল আমার গরজ, সুতরাং ভয়ে ভয়ে ছিলুম। তাঁর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমার কড়া নজরও ছিল। তিনি ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, মুখখানা ঠাণ্ডায় ফেটেছে। বাজারে ঘুরছিলুম ভেসলীন্ কেনবার জন্য—জংলীরা ওটার নামই জানে না! যত অগামারার দেশ!

পাতলা লেপখানা বেশ করে মুড়ি দিয়ে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। তারপর নিশ্চিন্তমনে ঘুমোবার আগে একবার বললেন, বাঘ এসে যদি দরজা ঠেলাঠেলি করে আমাকে ডেকে দেবেন!

অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি মাইল চব্বিশেক পার্বত্য পথ। সকালের দিকে শীত পড়েছে, বাতাস বইছে কনকনিয়ে। সমস্ত অরণ্যলোক ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। শীতের মধুর রৌদ্র তখনও নামেনি অমলেকগঞ্জে, পূর্বদিকের পর্বতমালা রৌদ্রকে আড়াল করে রেখেছে বহুদূর পর্যন্ত। উত্তর ও পশ্চিমে ছায়াচ্ছন্ন ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের নীচে দিয়ে চলেছে বাগমতী নদী—এ নদী নেপাল থেকে বিহারে নেমে গিয়ে বোধকরি মুঙ্গেরের দিকটা হয়ে গঙ্গায় মিলেছে,—সঠিক আমি জানিনে। কিন্তু উত্তর প্রদেশ ও বিহারকে জলদান করে চলেছে নেপালের নদী। সারদা, ভেরি, রাপ্তি, কালিগণ্ডক, ত্রিশূলগঙ্গা, গণ্ডক—এরা সকলেই নেমে এসেছে নেপাল থেকে। নেপাল তথা উত্তর বিহারের জল পেয়ে গঙ্গা গৌরবগর্বিতা হয়েছেন।

মোটর চলেছে পার্বত্যপথ দিয়ে। এ পথ অপরিচিত নয়। সুক্না থেকে তিনধরিয়া, গৌহাটি থেকে শিলং, কালকা থেকে শিমলা, পিণ্ডি থেকে মারী, জম্মু থেকে বানিহাল, কোটদ্বার থেকে লান্সডাউন, তিস্তা থেকে দার্জিলিং, জ্বালামুখী থেকে কাংড়া, কিংবা রংপো থেকে গ্যাংটক,—এ আমার অতি পরিচিত পথ, কিন্তু তবু অতি পরিচয়ের পরেও মনে হচ্ছে ওরা যেন আমার চিরকালের বিস্ময়। ওদের প্রত্যেকটি পাথর আমাকে যেন যুগযুগান্তর ধরে মোহমদির করে রেখেছে। ওরা আমাকে টেনে এনেছে বার বার ওদের মাঝখানে। এই আমি মানবগোষ্ঠী পরম্পরায় বংশানুক্রমিক দেহ-দেহান্তরের ভিতর দিয়ে ওদেরকে দেখে এসেছি হাজার হাজার বছর ধরে। প্রতি পাথর কথা বলেছে আমার কানে কানে। ইতিহাস শুনিয়েছে, রহস্য-যবনিকা তুলে ধরেছে। জানিয়েছে অনেক, দেখিয়েছে অনেক বেশী। পর্বতের নিভৃত কন্দরে শৈবালাচ্ছন্ন প্রাচীন পাথরের গন্ধে আমার মন কতদিন অমর্ত্যলোকের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সৃষ্টির আদিকালে গলিত অগ্নিগোলক যেদিন থেকে জমাট বেঁধেছে,—সেদিনকার প্রথম জীব আমি যেন কীটানুকীট, তারপর সরীসৃপের মধ্যে আমি; তারপর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন—সেই আমি নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছি যুগে যুগে। এসেছি আদিবাসীর চেতনার ভিতর দিয়ে, এসেছি বন্য বর্বর মানবেতর প্রাণীর ভিতর দিয়ে,—এসে পৌঁছেছি আমার সেই প্রাথমিক

ইতিবৃত্তে। সেই আমি এসেছি রামায়ণে, এসেছি মহাভারতে—আবর্তিত হতে হতে এই আমি অবশেষে এসে পৌছলুম আর্য সভ্যতায়। দেখে এসেছি আমার নিজের লক্ষ লক্ষ বছরের কাহিনী এই হিমালয়কে সাক্ষ্য রেখে। ওদের ওই জঠরে, কোটরে, গহ্বরে, গুহায়, ছায়ায়, মায়ায়, আমার আবহমানকালের প্রাণসত্তা আছে লুকিয়ে। তাই আমার মন বার বার কেঁদে ওঠে ওই গুল্মলতাসমাকীর্ণ পাথর জটলার মধ্যে আমার অজর-অমর আত্মাকে আবিষ্কার করে। কেঁদে বেড়ায় আমার মন ঝরনার ধারায়, প্রাচীন পাইনের ছায়ায়, ভয়-ভীষণ প্রস্তর স্তূপে আর গিরিমেখলের আশে পাশে,—ঘুরে বেড়ায় আমার চির পুরাতন প্রাণ ওই ওক্ গাছের শাখায় শাখায়, পুষ্পিত অর্কিডের চারায় লতায়, রডোডেনড্রনের গোছায় গোছায়। প্রতি কীটে, পতঙ্গে, সরীসৃপে, প্রতি উপলের অনুপরমাণুতে, প্রতিটি ঝরনার শিকরকণিকায়, প্রতি বনস্পতির লতায় পাতায় শিবায় উপশিরায়---আমি উপলব্ধি করে চলেছি আপন অস্তিত্বকে।

পথের অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, পাহাড়ে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হলো পায়ে হাঁটা---যদি বন্যশ্বাপদ ও সর্পভয় না থাকে। মোটর হলো সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিপদাশঙ্কাপূণ। এক ইঞ্চি দু ইঞ্চির ব্যবধানে মৃত্যুকে প্রতি বাঁকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে অবশেষে আসে ক্লান্তি আর অবসাদ। তার ওপর ড্রাইভার যদি মাদকবস্তু সেবন করে দ্রুত গাড়ি চালাতে থাকে, তবে আগাগোড়া অস্বস্তির অন্ত থাকে না। গত পঁচিশ বছরে অন্তত পাঁচ হাজার বার আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সুযোগ ছিল, কিন্তু দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্রোড়ে দুরাত্মাদের বোধ হয় ঠাঁই নেই। ধরো, কাঠগুদাম থেকে যারা আলমোড়া যায় রাণীক্ষেত হয়ে, তাদেব মোটর পথে কমপক্ষে এমন একশত 'বেন্ড' (বাঁক) পড়ে যে, মোটরের একটি চাকা এক আধ ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে মৃত্যু অথবা দারুণ অপঘাত অবধারিত। কিংবা ধরো যারা হিমাচল প্রদেশে মণ্ডিশহর হয়ে কুলু-মানালির পথে একবার গিয়েছে বিপাশা নদীর তীরে তীরে,—তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজেদের বেঁচে থাকাটাকে বিশ্বাস করেনি। পাহাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্রপথ হলো দার্জিলিংয়ের পথ। সে যাক্। এই কিছুদিন আগেই গিয়েছিলুম আলমোড়ায়। সেখানকার প্রধান আকর্ষণ হলেন প্রখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেন মহাশয়। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্য, এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'হোস্ট'---যাকে বলে অতিথি-সেবক। তাঁর কাছে গল্প শুনলুম, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে বলে-কয়ে তিনি গ্রীষ্মকালে আলমোড়ায় নিয়ে যান। মোটরযোগে আলমোড়ায় পৌঁছে মহাকবি কিছুকাল সেন মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। ওখানকার ওই বেন্ডগুলি পেরোবার সময় কবির মনে যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল তার জন্য তাঁর অপরিসীম ক্লান্তি ও অবসাদ আসে।

পথে একটি সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে এক সময় আমরা ভীমপেডিতে এসে পৌঁছলুম। এ অঞ্চলটি সুউচ্চ পর্বতের পাদদেশস্থিত একটি ছোট উপত্যকা। এখান থেকে 'রোপওয়ে' অথবা রজ্জুপথ চলে গেছে নেপালের দুরারোহ পর্বতমালার গর্ভে। কিছুদূর পর্যন্ত নজর চলে, তারপরে রজ্জুপথটি অদৃশ্য। ভীমপেডি অথবা ভীমপেহড়ী—যাই বলো। ভীমপাহাড়ি বললেও কেউ নালিশ করবে না। দ্বাপর যুগে মহামতি দ্বিতীয় পাণ্ডব প্রচুর পরিমাণে হিমালয় ভ্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিমালয় থেকে তাঁর ভ্রমণের চিহ্ন দেখতে

দেখতে কুমায়ুন বিভাগে ভীমতালে এসে পৌঁছই,—সেখানে সামনেই দেখি হিড়িম্বা পর্বত, এবং ভীমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। তারপরে ওই আসামেও দেখা যাবে হিড়িম্বাপুর—যেটা অধুনা ডিমাপুর এবং কো-হিমা, অর্থাৎ হিড়িম্বা পাহাড়। বুঝতে পারা যায়, সহধর্মিণী ঘটোৎকচের জননীকে নিয়ে বৃকোদর হিমালয়ের নানাস্থানে ধর্মাচরণ করেছিলেন।

এটাও ভীম পাহাড়ের কোল, পাশেই বাগমতী নদী। নেপাল রাজ্যের ধর্মশালা একটি আছে বটে, কিন্তু ভিড় বাঁচিয়ে আমরা পথেই এসে বসলুম। পালিত মশাই এবার দেখি সেই হারছড়াটি গলায় ঝুলিয়েছেন। তিনি বললেন, চা না খেয়ে পাদমেকং ন গচ্ছামি! তার সঙ্গে চাই পান জর্দা।

কাটমাণ্ডু শহর এখান থেকে কাছেই। আন্দাজে বুঝলুম কুড়ি বাইশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা হলো এই পথটুকু। এখান থেকে ঘোড়া, ডাণ্ডি, ঝাঁপান, অথবা কাণ্ডি—প্রায় সবই বন্দোবস্ত করা যায়। কিন্তু আমাদের পুঁজি হলো যৎকিঞ্চিৎ। অতএব চড়াই ধরে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। চারিদিকে নেপালী অথবা গুর্খা কুলি দড়ির গোছা হাতে নিয়ে ঘুরছে। এ সময়টা ওদের মরসুম। আমরা ভীমপেডীতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করে চড়াই পথে পা বাড়িয়ে দিলুম। অমলেকগঞ্জ থেকে এখানে আসবার সময়ে দেখে এসেছি পথে-পথে বসন্তকালের নবীন সমারোহ। কোথাও সে রক্তিম পীতাভ, কোথাও বা সে নীলিমায় সবুজে আশ্চর্য। ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম পুষ্পস্তবকে আর উপত্যকার পাখির কলকুজনে পরিপূর্ণ। মনে করেছিলুম সেই বসন্তশোভা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে। কিন্তু সিসাগড়ি পাহাড়ের চড়াই কিছুদূর ভাঙতে ভাঙতে সে ভুল আমাদের ভাঙলো।

ভীমপেডীতে আমরা যদি স্নানাহার করে বিশ্রাম নিয়ে পা বাড়াতুম, তাহলে হয়ত এ ভুল এমনভাবে ধরা পড়তো না। আমরা ভেবেছিলুম সিসাগড়ি ওরফে শ্রীশগিরি অতিক্রম করে কুলেখানি ধর্মশালায় গিয়ে একেবারে বিশ্রাম নেবো। কিন্তু শ্রীশগিরিতে না ছিল শ্রী, না বসন্তকাল। রৌদ্র প্রখর হলো, প্রখর থেকে প্রখরতর,—সেই রৌদ্র জ্যৈষ্ঠ মাসের আগ্রা জেলাকেও বোধ হয় হার মানালো। পথে কোথাও ছায়া অথবা পানীয়জল দেখছিনে, চটি ধর্মশালার চিহ্নও চোখে পড়ে না, পথের আন্দাজেও পাইনে,—কেবল সেই রৌদ্রে পাকদণ্ডিপথে এক চড়াই থেকে অন্য চড়াই ভেঙে চলা। গাড়োয়ালের বিজনী চড়াই কিংবা ছান্তিখালের চড়াইয়ের সঙ্গেই কেবল এই চড়াইয়ের তুলনা চলে। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা আড়াই পরে নেপাল সরকারের গোরা ছাউনী এবং পল্টন দপ্তর পাওয়া গেল। এখানে স্নান করবার সুবিধা পেলুম বটে, কিন্তু আমাদের রসনার মতো যেমন-তেমন কোনও আহার্যবস্তু জুটলো না।

মধ্যগগনের প্রচণ্ড রৌদ্র এই রুক্ষ পাহাড়ের উপরে অগ্নিক্ষরণ করছিল। পালিত মশাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে এক একটা পাথরের ঢেলার ওপর সজোরে আঘাত করছিলেন। পথে কোনও কোনও স্থলে এক-আধটা পরিত্যক্ত ভগ্ন দেবালয় পার হয়ে যাচ্ছিলুম। পালিত মশাই খেদোক্তি করে বললেন, রাবিশ। স্নান করে যেটুকু জল টেনেছিলুম, ঘাম দিয়ে সেটুকু বেরিয়ে গেল!

মুখ ফিরিয়ে দেখি তিনি গাত্রাবরণ কতকটা সরিয়েছেন। কপাল থেকে অসংখ্য ঘামের ফোঁটা নেমেছে। হিমালয় থেকে যেমন গিরি-নদীর ধারা। নামতে নামতে গলা পেরিয়ে

সোনার হারছড়াটা ভিজিয়ে আরও নেমে গেছে। সহানুভূতির সঙ্গে বললুম, আপনার কৌটোয় পান আছে, একটা খান্ না?

নাঃ—!

তবে না হয় নস্যি নিন্ এক টিপ?

পালিত মশাই হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে লাঠি আছড়ে শুধু বললেন, থাক্!

সাধুরা চলেছে চিমটে বাজিয়ে,—জয় পশুপতিনাথ। জয় শম্ভো! ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডাণ্ডিযাত্রী। পাশ দিয়ে গাছের ডাল ছিপটিয়ে তিব্বতী টাট্টু চলেছে সওয়ার নিয়ে। মাঝে মাঝে ভালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সরকারী অফিসার। পিঠে বন্দুক ঝুলছে। মাথায় পিতলের তক্‌মা আঁটা মিলিটারী। ওদিক থেকে আসছে গোর্খা কুলী পিঠে মস্ত বোঝা নিয়ে, কিংবা আসছে পাহাড়ি লোমশ ছাগলের পাল প্রত্যেকের পিঠের দুই দিকে পুঁটলী ঝুলিয়ে।

আসবার সময় সেই উত্তর বিহারের সীমান্ত থেকে মানুষের মুখের রেখা বদলাতে আরম্ভ করেছে। উত্তর বিহারে অনেক স্থলে ঢুকেছে মঙ্গোলীয় রক্ত। উচ্চতায়, চোয়ালে, দুই চোখের ব্যবধানগত অবস্থিতিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই পরিবর্তন। দেখতে দেখতে এসেছি। যত ভিতরে যাচ্ছি ততই সেই পবিবর্তন প্রকট। শুধু মানুষ নয়, গরু ও মহিষ, ছাগল ও মেষ—এদের আকৃতি ও গঠন যাচ্ছে বদ্‌লে। এই ক্রমবিবর্তন দেখেছি আলমোড়ায়, গাড়োয়ালে, হিমাচল প্রদেশে, পহলগাঁও থেকে জোজিলা গিরিপথের দিকে। এক অঞ্চল মিলছে ভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে। এক রক্তস্বভাব মিশিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন রক্তে। সিকিমে দেখে এসেছি তাদের, যাদের নাম লেপ্‌চা। সিকিমের আদিবাসী, তার সঙ্গে বাঙালী, তার সঙ্গে গুর্খা, তার সঙ্গে নেপালী—এই মিলিয়ে ধরলেই লেপ্‌চা। এমনি করে অনাদিকাল থেকে সমস্ত মানুষের সঙ্গে সমস্ত মানুষকে মিলিয়ে দিচ্ছে এক অদৃশ্য নিয়ন্তা। ইচ্ছায় মিলছে, অনিচ্ছায় মিলছে, অজ্ঞাতে মিলছে। বাধা দেবার সাধ্য তোমার-আমার নেই। হিট্‌লার বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু নিজের শক্তিতে নিজেই ফেটে মরেছে। প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনকে বাধা দেবার সাধ্য হয়নি।

সাত আট মাইল—যতদূর আন্দাজ করতে পারি। যখন কুলেখানিতে এসে পৌঁছলাম তখন অপরাহ্ণ। এত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত যে, পালিত মশাইয়ের দিকে তাকাতে সাহস হলো না। সামনে মস্ত সরকারী যাত্রীনিবাস। দূরে দূবে দেখা যাচ্ছে নেপালী গুর্খাদের বস্তি। আমরা পরিশ্রান্ত দেহে যাত্রীনিবাসের ভিড়ের মধ্যেই আশ্রয় নিলুম। আজ থেকে চতুর্থ দিনে পড়বে শিবরাত্রি, সুতরাং হাতে আমাদের সময় ছিল।

কুলেখানির মস্ত যাত্রীশালাটা তিব্বতী স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দেয়। শুধু যাত্রীশালা নয়, মন্দিরও তাই। বড় বড় বাসস্থান, দেবালয়, গুর্খা বস্তির ঘরদোর,—এরাও তিব্বতী শিল্প প্রভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ স্থাপত্য হলো কাঠের তৈরী। তার ওপর খোদাই, তার ওপরেই নক্সা। নেপাল বৌদ্ধ প্রধান, কিন্তু শাক্তমতী। মহিষমর্দিনীর জন্য মহিষ চাই পদে পদে। অধিকাংশ আমিষাশী। খড়্গ চাই, রক্ত চাই, বলির জন্তু চাই,—মৎস্য, মাংস, মদ্য, তন্ত্রমন্ত্র ভূত প্রেত পিশাচ—সবই পাওয়া চাই। অনার্য (!) শিবকে চাই—যিনি শ্মশানচারী; অনার্য ছিন্নমস্তাকে চাই, যিনি রক্তলোভাতুরা। চণ্ডীকে চাই, যিনি শত্রু বিমর্দিনী। সিংহ-বাহিনীকে চাই, যিনি সর্বপালিকা। আমার কাছে আজও স্পষ্ট নয়, নেপাল বৌদ্ধ অথবা শাক্ত। খ্রীস্ট ও বৌদ্ধধর্মপন্থী যারা তারা এ-যুগে 'অহিংসা পরমধর্ম'—এ

আদর্শ মেনে চললো কিনা, এতে আমার সন্দেহ আছে। কেননা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষে এই সেদিন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, তার প্রধান নায়করা ছিল খ্রীস্টান ও বৌদ্ধধর্মের লোকেরা। হিন্দু এবং মুসলমান সরে দাঁড়িয়েছিল। অহিংসার সঙ্গে অহিংসার জগৎজোড়া রক্তপাত হয়ে গেল।

নেপালের প্রায় সমস্ত স্থাপত্যকীর্তিতে যে সমস্ত চিত্র খোদিত দেখা যায়, তার অধিকাংশই নগ্ন নরনারীর মৈথুন চিত্র। এ দৃশ্য নতুন নয়। কাশীতে, পুরীতে, কোনারকে, বাঙলার কোনও কোনও স্থাপত্যে—এর প্রাচুর্য সবাই জানে। অশ্লীলতায় এরা ভয় পায়নি, কারণ ওটাকে এরা সুন্দর করে তুলেছে। মৈথুন চিত্রের ভিতর দিয়ে এরা সবাই তুলে ধরেছে সেই বিপুল অগ্নিস্রাবের সঙ্কেত—যার থেকে মানবগোষ্ঠি, যার থেকে সভ্যতার পর সভ্যতা, এবং বিশ্বব্যাপী জীবসৃষ্টি বিবর্তিত। পৃথিবীর সমস্ত জাত এই অভিব্যক্তিকে ভয় করে এসেছে, তারা দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে জীব-জন্ম-রহস্যকে সকলের চোখের আড়ালে। কিন্তু একমাত্র হিন্দু, যারা এই রহস্যকে দেখেছে দর্শনের চোখে। যাদের কাছে জ্ঞান বড়, বিজ্ঞান বড় নয়। যারা তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করেছে, শুধু তথ্য খুঁজে বেড়ায়নি। যারা দেখে এসেছে মহাশক্তির আধারযোগে পলকে পলকে নিঃস্রাবিত হচ্ছে জীব-জন্ম সমারোহ। পুনরায় গ্রাস করেছেন মহাকালী আপন মৃত্যুগহ্বরে সকল জীবকে। জন্ম-মৃত্যুর এই খেলা চলেছে শাশ্বতকাল।

পরদিন আমরা একটি নদী পার হলাম। নদীটি ছোট, বলা বাহুল্য বাগমতীরই শাখা। চারিদিক পর্বতমালায় বেষ্টিত, সভ্যতা থেকে দূরে, ছোট ছোট গুর্খাবস্তি বাদ দিলে চারিদিক নিঃঝুম, শব্দহীন। কিছুদিন আগেই এ অঞ্চলে তুষারপাত হয়েছে, এখনও প্রবল শীতের বাতাস। সামনে চড়াই-পথ পেরিয়ে এবার পাওয়া গেল উপত্যকা। পথ পিচ্ছিল, কিছু মৃন্ময়, কিছু বা রক্তিম। এপাশে ওপাশে অরণ্যলোক। তবু ওরই মধ্যে কিছু কিছু চাষ আবাদের চিহ্ন আছে, ওরই মধ্যে ফসল। সামনে পাশে পর্বতগাত্র, ওপারে কিছু দেখা যায় না। শ্রীশগিরি পেরিয়ে এসেছি, এবার পার হতে হবে চন্দ্রগিরি। পথ বহুদূর, কিন্তু চড়াই কম। দুই সবৃহৎ পর্বতশৃঙ্গের মাঝখানে এটি উপত্যকা। একটু উৎরাই পেলেই ভাবনা হয়, কেননা অতটাই আবার চড়াই ভাঙতে হবে। আমরা সমতল পেলেই খুশী থাকি।

আরাম ও আহারাদির কথা ওঠে না, কারণ আমরা তীর্থপথিক। যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাবো, এই ছিল চেষ্টা।—সকালের দিকে নোংরা চা গিলে পালিত মশায়ের প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। তাঁর মনের কথাটা ছিল এই যে, শিবরাত্রির মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অত বেশী তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ছাড়পত্রে যখন সময় বেশী আছে, তখন ধীরেসুস্থে এক-আধদিন এখানে ওখানে কাটালে ক্ষতি কি?

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাঁর গলায় সোনার হার আছে বলেই তাঁর সাহস আছে,—এদিকে আমার তহবিল কিন্তু উৎসাহজনক নয়। ফলে, আমার তাড়া ছিল। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, আমি যত দ্রুত এগিয়ে যাই, পালিত মশাই ততই পিছিয়ে পড়েন। মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে আমি এক পাথরখণ্ড আশ্রয় করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করি, কিন্তু তিনি হয়ত তখন এক মাইল পিছনে পড়ে আরেকখানা পাথর আশ্রয় করে বসে থাকেন। এইভাবে যেতে যেতে অপরাহ্নকালে আমরা চেৎলাং ধর্মশালায় এসে পৌঁছলুম। শেষের দিককার পথটা ছিল কষ্টদায়ক, সেজন্য বিশ্রামের বিশেষ দরকার ছিল।

বাগমতীর তীরে সরকারী এক ছোট্ট চালা পাওয়া গেল। সেটা লতাপাতায় ছাওয়া

তাঁবু। ভিতরে কিছু নেই, বালুপাথরে কাঁকরে পরিপূর্ণ। শয্যাদ্রব্য হিসাবে খড় সংগ্রহ করে আনা গেল। কিন্তু নদীর স্রোত যদি হঠাৎ খরতর হয়, তবে জল আসবে ভিতরে। আমাদের মনে উদ্বেগ ছিল, কিন্তু তার চেয়েও দুর্ভাবনা ছিল এই, তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে আমাদের রাত্রি কাটবে কেমন করে?

পাথরের টুকরোর সাহায্যে উনুন বানিয়ে ভাত ফোটাবার চেষ্টা চললো। কাঠের সেই আগুনটাই হলো আলো, তার বাইরে সব অন্ধকার হয়ে আসছে। শোনা গেল, এখন এদিকে নাকি নরখাদক বাঘের উপদ্রব চলছে। মানুষের গন্ধ ও সাড়শব্দ পেলে তারা আসতে পারে বৈ কি। হিমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় আমরা নদীর তটে বসে এমনিতেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলুম, তার উপরে এলো নরখাদকের আতঙ্ক। পালিত মশাই এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঠের আগুনটা ছেড়ে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। গরম গরম চা ও জলখাবার পেয়ে তাঁর আবার পরিহাসবোধ ফিরে এসেছিল। এবারে কিন্তু অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমরা কেবল উদ্বিগ্নচক্ষে চেয়েছিলুম পশ্চিম দিকে, দুই বিশাল পর্বতের নীচেকার গহ্বর থেকে যেখান দিয়ে বাগমতীর দুরন্ত জলধারা সশব্দে ছুটে আসছে। গত কয়েকদিন রৌদ্র অতিশয় প্রখর ছিল, বরফ গলেছে নিশ্চয় অনেক বেশী। মধ্যরাত্রের দিকে স্রোত স্ফীত হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের মন দুশ্চিন্তায় ভরে রইলো।

আহারাদি সেরে তৃণশয্যার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে যখন পড়েছি তখন আমাদের তাঁবুটি যাত্রীর সংখ্যায় দেখতে দেখতে ভরে উঠছে। ভিতরে জন আষ্টেকের মতো জায়গা হতে পারতো, কিন্তু জন পনেরো এসে জায়গা নিল। ভিখারী, বৃদ্ধা, খঞ্জ, বাউণ্ডুলে, সাধু—নানা লোকে ভরে গেল। ওর মধ্যে ছিল একজন কাঁচা বয়সের কৃষ্ণাঙ্গী বিহারী স্ত্রীলোক। কপালে টিপ—মাথায় সিঁদুর, হাতে রুপোর চুড়ি, পরনে কালাপাড় শাড়ি,—আগে থেকেই আমাদের মুখচেনা হয়েছিল। সে এসে জায়গা নিল এক কেশবিরল স্থূলকায় বৃদ্ধ মহারাজের পাশে। স্ত্রীলোকটির কলকণ্ঠে, পরিহাসে, স্পষ্টবাদিতায় এবং গুনগুনানি সঙ্গীত সাধনায় মরুভূমির উপর যেন কাজল মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। হিন্দিভাষায় পালিত মশায়ের ব্যুৎপত্তি কম, তবুও কম্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরে ভিতরে হেসেই খুন। স্ত্রীলোকটির প্রাণশক্তি ছিল অসামান্য, তার কলকণ্ঠের তাড়নায় ঘুম পালাচ্ছে সকলের চোখ থেকে। কিন্তু একথাটা যখন শোনানো হলো যে, মানুষের গলার আওয়াজ পেলে নরখাদকের পক্ষে পথ চিনে তাঁবুর মধ্যে ঢোকা সম্ভব এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি নরখাদকের আকর্ষণ বেশী,—তখন সে চুপ করলো।

মধ্যরাত্রে চেঁচামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। পুঁটলী থেকে মোমবাতি নিয়ে আলো জ্বালানো হলো। আমরা লাঠি বাগিয়ে ধরলুম। কিন্তু ব্যাপারটা একটু ভিন্ন রকমের। বৃদ্ধ কেশবিরল গেরুয়াধারী মহারাজ শুয়েছিল স্ত্রীলোকটির ঠিক পাশে। সহসা মধ্যরাত্রে ঘুমের ঘোরে স্ত্রীলোকটি অনুভব করে, নরখাদক ব্যাঘ্রের থাবা তার শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারে, নরখাদক ঠিক নয়—অদ্বৈতবাদী মহারাজেরই থাবা। আলো জ্বেলে আমরা দেখি, বিরলকেশ মহারাজের মাথায় স্ত্রীলোকটি সজোরে চপেটাঘাত করছে। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং বহুকাল তপশ্চর্যার ফলে এমনি সংযম ও অহিংসায় ব্রতী ছিলেন যে, এত প্রহারের ফলেও তাঁর আক্রোশ হচ্ছে না। বৃদ্ধ এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, ঘুমের ঘোরে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে স্বপ্নে দেখে হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাঁর কথায় তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন না করে এই কথাটাই চীৎকার করে

জানাতে চায় যে, পুরুষের হাতের এবং আঙুলের ভাষা প্রত্যেক যুবতী নারী বোঝে এবং এই মধ্যরাত্রে মহারাজের শ্বাসপ্রশ্বাসের যে উত্তাপ অনুভব করা যাচ্ছিল, তার ভিতরকার রহস্যটা অভিজ্ঞ মেয়েমানুষের কাছে দুর্বোধ্য নয়।

চেঁচামেচি এবং তর্কবিতর্ক চললো অনেকক্ষণ পর্যন্ত। মোমবাতির মালিক আলোটা নিবিয়ে মোমবাতিটা কাছে নিল। স্ত্রীলোকটি এবং মহারাজ যেখানে শুয়েছিল ঠিক সেখানেই রইলো। যতদূর মনে পড়ে শেষরাত্রের দিকে আবার উভয়ের মধ্যে একটা চাপা কলহ ও লাঞ্ছনা পুনরায় আমাদের কানে আসছিল।

তারপর সকাল হলো। শীতে জমে যাচ্ছিল হাত পা। আজ ভোর-ভোর আমরা চেৎলাং ছেড়ে চন্দ্রগিরির চূড়া অতিক্রম করবো। চড়াই খুব কঠিন, তবে এইটিই শেষ চড়াই। এরপর নামতে হবে থানকোটে, সেখান থেকে সোজা কাটামাণ্ডু। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম। রোদ ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়বো।

পালিতমশাই সহজে নড়তে চান না, তিনি একটু ধীরগতি। তাঁর চা-পান চাই ঘন ঘন। একটু মশগুল হয়ে বসা, একটু গত রাত্রির আলোচনা,—তার সঙ্গে গরম গরম পুরি-কচুরি। সমস্তটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, তবে কিনা পকেটের ভাষাটা একটু অন্য রকমের। যত দেরি হবে ততই তহবিলে টান ধরবে, এই মুশকিল। যাই হোক, আমাকেও একটু ঢিলে দিতে হলো।

আজ সকালে আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলুম, মহারাজ এবং সেই হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ঘটেছে। মেয়েটি পরিহাসে বেশ সরস, এবং বৃদ্ধ মহারাজও কর্মোৎসাহে বেশ চঞ্চল। দুজনে একসঙ্গেই চলাফেরা করছে। পরম্পরায় জানা গেল, স্ত্রীলোকটির সন্তানাদি হয় না বলে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করে একা পশুপতিনাথে চলেছে। বাবা পশুপতিনাথ যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই আশা! এই কাহিনীটিকে কেন্দ্র করে আমি পরে 'দেবতার গ্রাস' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেছিলুম। বাবা পশুপতিনাথ স্ত্রীলোকটির মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন!

চেৎলাঙের সামনেই সুবিশাল পর্বতচূড়া। ওরই গা বেয়ে উঠছে শত শত যাত্রী পিপীলিকাশ্রেণীর মতো। সিসাগড়ির মতো এটারও নাম চন্দ্রাগড়ি। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য পাকদণ্ডি পথ,—সোজা খাড়াই। অমরনাথ তীর্থে যাঁরা গেছেন, যাঁরা মন্দাকিনী থেকে উখীমঠে গেছেন--তাঁরা বুঝবেন চন্দ্রগিরির চড়াই পথ। একমাত্র সান্ত্বনা এই, এই পথের দীর্ঘতা কিছু কম—মাইল চারেকের বেশী নয়। যেমন ভূটানের সীমানায় বক্সা বন্দিশালার পথ,—মাইল দেড়েক চড়াই তাই রক্ষে, নইলে কষ্টটা মনে থাকতো। যেমন মুসৌরী থেকে 'কেম্পটি' জলপ্রপাতের পথ,—ছয় মাইল মাত্র চড়াই বলেই লোকে সহজে ভুলে যায়। কিন্তু যে কারণে লোকে নৈনীতালের 'চায়না-পীকের' কথা ভোলে না,—সেই কারণেই চন্দ্রগিরির কথা আজও আমি ভুলিনি। সম্প্রতি শুনতে পাচ্ছি রক্সৌল এবং কাটমাণ্ডুকে সংযুক্ত করে সম্রাট ত্রিভুবন বিক্রমের নামে একটি রাজপথ নির্মাণের কাজ চলছে।

শ্রীশগিরি এবং চন্দ্রগিরি—দুটো চূড়াই সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু। কিন্তু ভীমপেডির পর চার থেকে আন্দাজ পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত চড়াই উঠতে হয়। বাকি চড়াই উৎরাই অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি অবধি মোটর বাসেই আনাগোনা চলে। চন্দ্রগিরির চূড়া এবং এদিক ওদিকের পর্বতমালা ঘন অরণ্যে আবৃত, হিংস্র জন্তুর অবাধ বিচরণ ভূমি। চূড়ার দিকে অগ্রসর হলেই চারদিকের দিগন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে।

নীচের দিকে যখন থাকি, নিজে তখন অনেক বড়। যত উপরে উঠি, যত বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি যায়, তখন দেখি নিজে আমি কত ক্ষুদ্র! সংসার যাত্রায় আমার আশে পাশে যত লোভ, মোহ, অভিমান, আকর্ষণ, আমার সুখ দুঃখ, আমার ভিতরকার ষড়রিপুর খেলা—তারা কী নগণ্য, কী সামান্য! আকাশ এখানে অনেক বড়। এ পৃথিবী আশ্চর্য।

চন্দ্রগিরির চূড়ায় দেখি, কাপড়ের টুকরো বাঁধা অসংখ্য পতাকা। হিমালয়ের যেখানে যাও, এ দৃশ্য চোখে পড়ে। সিকিমে এই, অমরনাথে এই, গাড়োয়াল কুমায়ুনে এই, হরিদ্বারের চণ্ডী পাহাড়ের পথে এই। এতই যখন চল্‌তি, এটি প্রচলিত কুসংস্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কুসংস্কার এক অখণ্ড ঐক্যবন্ধনে বেঁধে রেখেছে সমগ্র হিমালয়কে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। কালো কাপড় উড়িয়ে কাক তাড়ানো যায়, লাল কাপড় দেখলে নাকি মহিষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, শাদা কাপড়ের টুকরো ওড়ালে নাকি হিমালয়ের ভূত প্রেত পিশাচরা সে তল্লাট ছেড়ে দূর হয়ে যায়। এই শ্বেতপতাকা ওড়ে সমগ্র তিব্বতের গুম্ফায়-গুম্ফায়।

চূড়ায় উঠে দেখি সেই প্রাচীন পৃথিবী, কিন্তু উত্তরে তার স্বপ্নলোক। সমগ্র হিমালয়ের তুষার রাজ্য,—তার প্রত্যেকটি শৃঙ্গ দুগ্ধশুভ্র বরফে ঢাকা। প্রত্যেকটি যেন তুষার শুভ্র মন্দির, প্রত্যেকটি যেন মহাযোগে আসীন। বায়ুস্তর ভেদ করে গিয়ে ওদের উপর পড়েছে রৌদ্র—একটি অত্যুজ্জ্বল গৈরিক স্বর্ণাভার আবহ সৃষ্টি করেছে। এখানে সব চুপ। মানুষের কথা, ভাষা, মন্ত্র, স্তব, কলকণ্ঠ—সমস্ত স্তব্ধ। চেতনা, প্রাণ, চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি—সমস্তগুলো যেন থরথরিয়ে কাঁপছে আমার এই দৃষ্টিবিন্দুতে। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নড়িয়ে বুঝতে হয় যে, এবার আমাদের এগোতে হবে।

উপর থেকে চোখ নামিয়ে নীচে আনতে হয়। নীচের দিকে বিরাট নেপাল,—নীলাভ তার উপত্যকা এবং শস্যপ্রান্তর। বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদের চূড়া—কিন্তু এখান থেকে কী ক্ষুদ্র! মাঝখানে রৌপ্য বৌদ্রাভ নগর কাটমাণ্ডু,—সমস্তটা যেন পুতুলের ঘর সাজানো। যত বিরাট, যত ব্যাপক, যত বিস্তৃত, যা কিছু হোক—হিমালয়ের কাছে অতি নগণ্য। এই পশ্চাদ্‌পটের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কাটমাণ্ডু শহরটাকে ফুটখানেক লম্বা-চওড়া একটা ছেলেখেলা বলে মনে হতে লাগলো। এমনি করে দাঁড়িয়ে কতবার কত উপত্যকা দেখেছি হিমালয়ের কত বিস্ময় দুই চোখে নিয়ে। মুসৌরির উপরে দাঁড়িয়ে দেরাদুন, বানিহালের সুড়ঙ্গলোকের মুখ থেকে সমগ্র কাশ্মীর, হনুমান চটি ছেড়ে গিয়ে দূরের থেকে বদরিকাশ্রম, গোপেশ্বরের পাহাড়ের উপর থেকে বহুদূর অলকানন্দার তীরে চামোলির পার্বত্য শহর, বজ্রেশ্বরীর মন্দির অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের বিশাল কাংড়া উপত্যকা, চণ্ডীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে হরিদ্বারের মনোরম দৃশ্য।

কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা এবার অবতরণের দিকে পা বাড়ালুম। আমাদের নামতে হবে হাজার চারেক ফুট নীচে, কিন্তু কিঞ্চিদধিক দু'মাইলের পরিসরে। কাজটি শক্ত। বুঝতে পারা যায়, এই বিরাট প্রাকৃতিক প্রাচীরের অন্তরালে রাখা হয়েছে কাটমাণ্ডু শহরটিকে; এই অবরোধের বাইরে রাখা হয়েছে সভ্যতাকে। কিন্তু এই বিপজ্জনক অবতরণের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা আমরা প্রমাদ গণলাম। নামবার সময় দেহের ভারসাম্য না রাখতে পারলে অপঘাত অবধারিত। তা ছাড়া ভয় ছিল হাঁটুর ওপর অতিশয় চাপ পড়বে। পাহাড়ের চড়াইতে বিপদ নেই,—কেবল বুকের মধ্যে আঘাত লাগে এবং পরিশ্রম হয়; কিন্তু উৎরাইতে লাঠি ঠিক করে ধরে না রাখতে পারলে বিপদের সমূহ আশঙ্কা। মনে

পড়ে যাচ্ছে পরেশনাথের কথা। ওই হাজারীবাগের ওদিকে। যারা শ্বেতম্বরী দিগম্বরী ধর্মশালার ওদিক দিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে উঠেছেন, তাঁদের খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তবু পরেশনাথের সুবিধা এই, পথটা ছয় মাইলে ছড়ানো। এখানে বড় জোর আড়াই মাইল। শোনা গেল, এই উৎরাই পথে প্রতি বছরে বহুসংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটে। অসতর্ক পায়ের ধাক্কায় নীচের দিকে অনেক সময় পাথর গড়িয়ে পড়ে। অনেকে পা ফসকে নীচে গড়িয়ে যায়। কিন্তু তীর্থযাত্রাপথে কতকটা দুর্গম অঞ্চল থেকে বলেই সেটা মানুষের সাহস ও শক্তিকে আকর্ষণ করে। সমগ্র হিমালয় ভ্রমণে মানুষের শক্তি সাহস, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং আত্মনিগ্রহের অগ্নিপরীক্ষা এইভাবেই চলে। তুমি শান্ত, তুমি নম্র, তুমি ধীর, তুমি একাগ্র, তুমি কষ্টসহিষ্ণু—তবেই তুমি হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপকে দর্শন করবে!

প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো থানকোটে এসে পৌঁছতে। ছোট গ্রাম্য শহর। চারিদিকে দারিদ্র্যটা বড় প্রকট। এখান থেকে কাটমাণ্ডু আন্দাজ মাইল ছয়েক পথ। এখান থেকেই মোটরবাস ছাড়ে। এবারে আমাদের চেহারায় তীর্থযাত্রীর ছাপ ফুটেছে। ধুলোবালি-মাখা কম্বল, নোংরা পরিচ্ছদ, ময়লা মাথা, শীতের ছাপ-ছাপ চামড়া-ফাটা দাগ,—তার সঙ্গে নিগ্রহের কৃশতা। এবার সহজে মিলে গেছি যাত্রীর জনতার সঙ্গে। এর আগে দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের কেউ-কেউ আমাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, এবার আমরা যদি ভিক্ষে করতে চাই, তবে আমাদের চেহারায় বেমানান হবে না। পাহাড় থেকে নেমে বড় স্বস্তিবোধ করলুম। গত তিন-চারদিনে সমান সহজ রাস্তা যেন ভুলে গেছি। আমরা বাসে চড়ে বসলুম। গাড়ির চাকা ঘুরছে, নতুন আনন্দের স্বাদ পাচ্ছি।

পিছনে পড়ে রইলো চন্দ্রগিরির আরণ্যক বন্য শোভা গুহাগহ্বরে, কন্দরে; পাহাড়তলীর নীচে নীচে জানোয়ার ও সরীসৃপরা তাদের চিরস্থায়ী বাসা নিয়ে আছে; আর এই পর্বতমালার কোন এক রহস্যালোকের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে বাগমতী,—যার এপারে ওপারে বহু অঞ্চলে আজও মনুষ্যপদচিহ্ন স্পর্শ করেনি। মনে পড়ছে অলকানন্দার কোন এক শাখা নদীর পথ। চলতি পথের থেকে কিছুদূরে যেখানে যাবার প্রয়োজন ঘটে না কারো। ভীরু পায়ে গিয়ে নামলুম সেই নদীর কোলে প্রস্তর-শিলায়। কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে সেই নদী দুই বৃহৎ পর্বতের মাঝপথ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোন মানুষ কখনও গিয়েছে সেখানে, তার কোন চিহ্ন নেই। উপর থেকে নামছে সেই জলধারা, তার দুরন্ত বেগ ছুটে এসে পাথরের উপরে ধাক্কা খেয়ে উৎক্ষিপ্ত ফেনায়িত হচ্ছে। বড় বড় মাছ উপর থেকে জলের সঙ্গে নীচে নেমে যাচ্ছে। বসন্তকাল পরিপূর্ণ সমারোহে নেমেছে ছোট নদীর দুই ধারে, পাহাড়ের গায়ে, বনময় গুহাগহ্বরের আশেপাশে। শৈবালাচ্ছন্ন পাথর আর প্রাচীন শিকড়ের পাশ দিয়ে বনবল্লরী উঠে গেছে মস্ত গাছগুলিতে। অজানা অনামা পুষ্পসম্ভার ঝুঁকে পড়েছে গাছ থেকে নদীতে। বড় বড় রঙীন পাখিরা ডাকছে। প্রকাণ্ড দুই ডানা মেলে নেমে এলো দুই লালমোহন। পাহাড়ের কোটরে ডিম পেড়েছে অপরিচিত পাখি। মস্ত পাথরখানার পাশে প্রকাণ্ড বিচিত্রবর্ণ সাপ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে আরও গিয়েছি এগিয়ে। মধ্যাহ্নের নৈঃশব্দের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় পাখির কূজনের মধ্যে মেলানো সরীসৃপের ডাক। নানাবর্ণের বন্য মাকড়সারা জাল বেঁধে ঝুলছে কাঁধের পাশে পাশে পাহাড়ে। দূরের বস্তির থেকে কখনও কোন গৃহপালিত পশু আসে না এই নদীতে জল খেতে। সম্পূর্ণ নিঃঝুম পাহাড়তলীর এই বন্যপ্রকৃতি। বিশ্বাস করেছি সেদিন

ওইখানে দাঁড়িয়ে, আকাশপথের জ্যোৎস্নালোক থেকে নেমে আসে শুক্লপক্ষ দেববালার দল—ওরা এসে অবগাহন করে যায় ওই নীলাভ জলধারায়, উঠে বসে ওই শিলাতলে,—তাদের দেহের শোভায় পাহাড়তলীর এই মায়াকানন রোমাঞ্চ হরষে পুলকিত হয়। উপরে দূর ঈশান কোণের পর্বতগাত্র বেয়ে মানুষের চলার সঙ্কীর্ণ পথ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আর এই নীচে অদূরে পাথরের উপরে দেখেছি শুষ্ক রক্তের ধারা তখনও রক্তিমাভ এবং তারই অদূর-ঝোপের পাশে সদ্যহত শৃঙ্গজড়ানো হরিণের খণ্ডদেহ। হঠাৎ সন্দেহ হয়েছে আশপাশ থেকে আমাকে কোন একটা প্রাণী তাক করছে, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি অনুভব করতে পারছি,—অমনি একটি মুহূর্তে আমার সর্বশরীর ছমছমিয়ে এসেছে। আমি বাইরের লোক, এ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছি, ওদের কেউ একজন মুখ বুজে আমাকে লক্ষ্য করছে। সহসা সজাগ হয়েছি, আমার হাতে হাতিয়ার কিছু নেই। তখন ভারী পা দুটো টেনে উঠে আবার ফিরে গেছি।

বালু-পাথরে আকীর্ণ পথ ভেঙে আসতে মোটরবাসের লাগলো আধ ঘণ্টা। যেখানে নামালো সেখানকার কাছেই ছিল জলের কল। এখানে পৌঁছুবার আগে বাগমতীর পুল পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু প্রথমেই কাটমাণ্ডুর চেহারা দেখে মন বড় বিষণ্ন হলো। যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি ঘিঞ্জি—সমস্তটা মিলে কেমন যেন বুকচাপা সঙ্কীর্ণতা। প্রত্যেক চতুষ্কোণযুক্ত দোপাট্টা চালাঘরের ভিতরে যতই দৃষ্টি যাচ্ছে, কেমন যেন অস্বাস্থ্যের চিহ্ন, কেমন রুগ্ণতা, কেমন একপ্রকার নোংরা অসুস্থ জীবনযাত্রা। কাছেই ত্রিপুরেশ্বরের ম[illegible]। কাঠের ওপর অমন চমৎকার কারুশিল্প, এমন অপূর্ব নক্সায় প্রত্যেক বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে—তার ছন্দ, তার মাত্রা, তার সুষমা ও সুসঙ্গতি,—দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের কপালগুণে নাগরিকদের অপরিষ্কার এবং বিশৃঙ্খল গৃহস্থলীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত নিরুৎসাহ বোধ করলুম।

পথের উপরে পড়ে রয়েছে সিঁদুরমাখা শিবলিঙ্গ, তার পাশে হাঁড়িকাঠ—সেখানে টাট্‌কা রক্ত থিক্ থিক্ করছে। এটা স্বাধীন দেশের একটা রাজপথ হলেও শ্রী ও শোভনতার উপর ভ্রূক্ষেপ কারো নেই। কোথাও গম্বুজ, কোথাও প্যাগোডা, কোথাল বা শাক্ত-মন্দির।

অত্যন্ত তীব্র রোদ, সুতরাং ঠাণ্ডা কলের জলে যেমন তেমন করে পথের ওপরেই সকলের আগে স্নান করে নিলুম। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলুম। গলা ধরে গেল, মাথা ভার হলো। স্নান সেরে হাঁটতে হাঁটতে এসে আমরা অতিথিশালা খুঁজে বার করলুম।

আধুনিক কাটমাণ্ডু সৃষ্টি করেছেন পরলোকগত মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর। রাজপথের ধারে তাঁর প্রস্তরমূর্তি। অদূরে কলকাতার লালদীঘির মতো একটি সরোবর—রানীবাগ। সরোবরের ঠিক মাঝখানে একটি মন্দির,—অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরের মতন। রানীবাগের ওপারে একটা ঘণ্টা-ঘড়িঘর; যাকে বলে টাওয়ার ক্লক। চতুর্দিকে পাহাড়, মাঝখানকার এই উপত্যকায় হলো কাটমাণ্ডু। এরই আশেপাশে ছোট ছোট পার্বত্য গ্রাম্য-শহর হলো, স্বয়ম্ভু, দক্ষিণ কালী, পাটান, নারায়ণথান, দত্তাত্রেয়, চৌবাহার ইত্যাদি। কিছু গৃহশিল্প, কিছু বা চাষবাস, এই হলো সাধারণ জীবিকা। এ ছাড়া চাকরি-বাকরির সুবিধা কম। ছেলেরা বড় হতে পারলে চোখ পড়ে পল্টনের দপ্তরে, মেয়েরা বয়স্থা হলে 'কেটি' হয়ে যাবার কামনা করে রাজসংসারে। যিনি রাজা, তিনি ধীরাজ নামে পরিচিত, প্রধান মন্ত্রী হলেন মহারাজা। ধীরাজ হলেন 'পাঁচ সরকার', মহারাজা 'তিন সরকার'—যতদূর

কানে এলো। এগুলো বাইরের লোকের কাছে কোন অর্থ বহন করে না, তাই এসব নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না।

চারিদিকে পর্বতমালা,—মাঝখানে এই উপত্যকা নাকি ছিল এককালে এক বিশাল হ্রদ। এই হ্রদের জল যিনি তরবারির একটি আঘাতে বার করে দেন, তিনি হলেন নেপালবাসীর উপাস্য দেবতা মৈঞ্জু দেব। তরবারির সেই আঘাতেই বাগমতী নদীর সৃষ্টি। সেই থেকে এই উপত্যকা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। কাশ্মীরের ঠিক এই গল্প চলে। সেখানে ছিল কশ্যপমুনির কৃপা। কশ্যপ-মীর, এই নিয়ে কাশ্মীর। শ্রীনগর প্রান্তের ডাল হ্রদটিকে নালিপথে বার করে দিলে খুব খারাপ কাজ হয় কিনা আমার জানা নেই। নৈনীতালেও তাই। নৈনীহ্রদের নীচে থাকতেন নয়নীদেবী,—এদিক থেকে তাঁর অবশ্য কোন কৃপা হয়নি।

আজ নেপালে বয়ে চলেছে নতুন হাওয়া, সুতরাং আগেকার কাহিনী ওর ইতিহাসের মধ্যেই থাক্। এই সেদিনও রাজার পক্ষে নেপালের বাইরে যাওয়াটা ছিল অমঙ্গলসূচক একটা গর্হিত কাজ। আজকে সেই ধারণা এক ফুৎকারে উড়ে গেছে। রাজসংসারে 'কেটি' হয়ে থাকতে পারলে মেয়েদের বরাত ফিরে যেত। কিন্তু এই রেওয়াজও বোধ হয় এবার কমে এলো। নেপালের বুদ্ধি ছিল প্রাচীনপন্থী, জ্ঞান ছিল রক্ষণশীল সংস্কারে আচ্ছন্ন—সমাজে, ধর্মে, শিক্ষায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেই কারণে মন ছিল পিছিয়ে। ফলে, ব্যাধি, অস্বাস্থ্য, রাজনিগ্রহ এবং হতাশা কামড়ে ধরেছিল এতকাল ওদের সমাজজীবনকে। এই অবস্থায় বাঙালী গিয়ে পৌঁছেছিল নেপালে। তারা নিয়ে গিয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। স্কুল-কলেজে, ডাকঘরে, রাজকোষে, সরকারী দপ্তরে, হাসপাতাল আর পূর্তবিভাগে এবং আইন আদালতে—যেখানে সেখানে ঢুকেছিল বাঙালী। আমি যখন গেলুম, তখন দেখি প্রধানমন্ত্রী মহারাজার গৃহশিক্ষক, মুন্সী, চিকিৎসক, এমন কি তাঁর রন্ধনশালার অধিনায়ক সকলেই বাঙালী। বাঙলার অনেক বিপ্লবী দলের ছেলে এককালে নাম ভাঁড়িয়ে নেপালে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। বাঙালীরা আজও নেপালে খুব জনপ্রিয়। এই সেদিন পর্যন্ত ইংরেজরা ওদের ডাকবিভাগ দখল করে রেখেছিল, ওদের ভালোমন্দ নিয়ে গায়েপড়া অভিভাবকত্ব করতো এবং পাসপোর্টের নামে ভারতবর্ষকে নেপালের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না। ইংরেজ চলে যাবার পর শ্রীশগিরি ও চন্দ্রগিরির দেওয়াল অতিক্রম করা এখন সহজ হয়েছে। নতুন রাস্তা খুলেছে। ইংরেজের খয়ের-খাঁ যারা অর্থাৎ মহারাজার দল এতদিন পরে রাজ্যপাট তুলে সরে পড়েছে। দক্ষিণের হাওয়া লেগেছে ওদের মনে। ওদের বাঁধন সব খুলে গেছে।

আগামীকাল পশুপতিপাথে শিবরাত্রির মেলা। আমি জ্বরে পড়েছি, মাথা তুলতে পারছিনে। জ্বর বেড়েই চলেছে। পালিত মশাই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করেছেন, সোৎসাহে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সরোবরের ধারে ধারে বায়ুসেবন করে ফিরছেন গলায় সেই সোনার হারছড়াটা ঝুলিয়ে। তাঁর বাঁ-হাতের দুটি আঙুল সেই হারগাছটা প্রায়-সময়েই ছুঁয়ে থাকে। গান তিনি জানেন না এই আমি জানতুম এবং গান তিনি যখন নিতান্তই গাইতে থাকলেন, তখনও বিশ্বাস করলুম, গান তিনি জানেন না।

হাসপাতালের বাঙালী এক ডাক্তারের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। তিনি আমার চিকিৎসার ভার নিলেন। ভদ্রলোক একা থাকেন, সুতরাং পথ্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ছিল। সে যাই হোক, একটি ঘর পেয়েছিলুম ভালো। তারই জানলা দিয়ে চেয়ে

রইলুম কাটমাণ্ডুর দিকে। আমার বেশ মনে পড়ে, এই জানলার ধারে বসে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র একটি অনুচ্ছেদ লিখতে আরম্ভ করেছিলুম।

এককালে মুসলমান আক্রমণের ফলে বহু রাজপুত পরিবার পালিয়ে আসে নেপালে। সেও প্রায় ছয়শো বছর হতে চললো। তখন নেপালে ছিল মঙ্গোলীয় পার্বত্য জাতি। তারা শুধু শান্তিপ্রিয় নয়—তারা নিজের শিল্পকলা ও স্থাপত্য নিয়ে থাকতো। রাজপুতরা তাদের হাত থেকে শাসনভার তুলে নেয়। ফলে সেই মঙ্গোলীয় ও রাজপুতের সংমিশ্রণের ফলে গুর্খা জাতির উৎপত্তি। সেই গুর্খারা পশ্চিম নেপালে ক্রমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং গুর্খা রাজ্যের পত্তন করে। অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তারা এবং সমগ্র নেপালকে তারা শাসন করতে থাকে। আজও সেই তাদেরই রাজ্যপাট এবং তাদেরই প্রতিপত্তি। অবশ্য মাঝে মাঝে এখনও দুই দলের মধ্যে কলহের কথা শোনা যায়। একদল হলো গুর্খা নেপালী, অন্য দল হলো রাজপুত নেপালী। সে যাই হোক, নেপালের বহু অংশ আজও অনাবিষ্কৃত এবং উপেক্ষিত। দুর্গম বা দুরারোহ পর্বতমালার আশেপাশে উপত্যকা আছে, কিন্তু সেখানে বিরলবসতি। কোথাও চিবস্থায়ী তুষারের স্তূপ, কোথাও হিমবাহের আতঙ্ক, কোথাও বা ভীষণাকার তুষারবিগলিত জলপ্রপাত ঘেরা বৃক্ষলতা-তৃণহীন প্রস্তর প্রান্তর। এদেরই উত্তর সীমানায় রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও গৌরীশৃঙ্গ। কাটমাণ্ডু থেকে প্রায় দুশো মাইল পেরিয়ে গেলে নামচেবাজার,—সেখান থেকে গেছে গৌরীশৃঙ্গের পথ। সেখানে গৌরীশৃঙ্গের একটি প্রাদেশিক নাম প্রচলিত।

কাটমাণ্ডুর কেন্দ্র থেকে আন্দাজ আড়াই মাইল দূরে পশুপতিনাথ। মন্দিরেব নামেই গ্রাম। যেমন কেদার-বদরি, যেমন জ্বালামুখী, যেমন বৈজনাথ। শহর থেকে মোটরবাস যায়, কিন্তু ভিড়ের চাপ ছিল বেশী। সেজন্য প্রবল জ্বব নিয়েও পরদিন আমাকে হেঁটে যেতে হলো। পালিত মশায়ের পুঁজি বোধ হয় কিছু ছিল, তিনি গেলেন মোটববাসে। কথা বইলো মন্দিবে অথবা ফিরে এসে আবার দেখা হবে। পায়ে হাঁটা সুবিধা, কেননা ভ্রমণটা সত্য হয়। হিমালয়ের মধ্যে যখনই মোটরে ভ্রমণ করেছি, দেখেছি অনেক, কিন্তু উপলব্ধি সত্য হয়নি। পথে যাবার সময় রাজবাড়ি পড়ে বাঁদিকে। কিন্তু রাজবাড়ি বলতে যেমন উদ্যান সরোবর আর ফোয়ারার কল্পনা আসে, এ তেমন নয়। এ এক বিশাল ইমারত,—তার তুলনায় সামনের দিকে অবকাশ কমই। কুচবিহাবের রাজবাড়ি, নাটোরের রাজবাড়ি, কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউস, দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন,—এবা চোখে স্বস্তি আনে। কিন্তু এ বাজবাড়ি একেবারে নীরেট। শহরের উপর দিয়ে গেছে সেই ভীমপেডির রজ্জুপথ—যেমন দার্জিলিংয়ে। জনস্রোতের ভিতর দিয়ে চলেছি। জ্বরের তাড়নায় পথে বসেছি কয়েকবার। চোখ দুটো ছিল ঘোলাটে, তাতে দেখার অসুবিধা হয়েছে। ক্রমে আমবা এসে পৌঁছলুম বাগমতীর পুলের কাছে। অদূরে শ্মশানঘাটা। নদীর ওপার গুহ্যেশ্বরীর মন্দির ও পীঠস্থান। পশুপতিনাথের মন্দির বাগমতীর তীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূল মন্দির-চূড়া সোনার পাতে ঢাকা, রূপার তোরণ, এবং মন্দিরের বাইরে বিশালাকায় এক কনককান্তি বলিবর্দ। পশুপতিনাথের আশেপাশে আরও অনেকগুলি মন্দির দাঁড়িয়ে। মন্দিরের চত্বর অনেকখানি এবং চতুর্দিকে মার্বেল পাথরে মোড়া। মূল মন্দিরের ভিতরে পশুপতিনাথের কৃষ্ণকায় পঞ্চমুখী প্রস্তর-বিগ্রহ কষ্টিপাথরের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরটা, যেমন অনেক মন্দিরেই দেখি—অন্ধকার। ভিড়ের চাপকে রোধ করার জন্য মূল মন্দিরের চারদিকে

চারটি দরজায় কাঠের বেড়া দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রীদল প্রচণ্ড চাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভালো করে দেখতে দেয় না।

গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে মূর্তি নেই, আছে প্রস্তরশিলা, সোনার পাতে ঢাকা। ওটাই হলো মহাপীঠ,—এখানে সতীর গুহ্যস্থান পড়েছিল। যেমন কামাখ্যায় দেখে এলুম সতীর যোনিপীঠ—মন্দিরের ভিতরে গিয়ে কয়েকটি ধাপ নেমে অন্ধকারের মধ্যে এই শীলাখণ্ড দর্শন। পশুপতিনাথে শৈবপূজা, কিন্তু গুহ্যেশ্বরীর পূজা হলো শাক্ত,—এখানে মোরগ ও পশুবলি হয়। শাক্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ এখানে মিলেছে। এই মিলন দেখা যায় নেপালের মচ্ছেন্দ্রনাথের দেবস্থানে। উভয় জাতির লোক এখানে পূজা দেয়। সম্রাট অশোক এসেছিলেন পশুপতিনাথে, তাঁর আমলের বৌদ্ধমূর্তি চারিটি এখনও এখানে বিদ্যমান। পাশে রয়েছে মৈঞ্জুদেবের মন্দির—যাঁর তরবারির আঘাতে জলরাশি সরে গিয়ে এখানকার উপত্যকার জন্ম হয়। এখানে প্রবাদ, মঞ্জুশ্রীদেব এসেছিলেন চীন দেশ থেকে। সেই কারণে চীন, তিব্বত ও নেপালের ধর্মীয় যোগ ঘনিষ্ঠ। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে বুধনাথ স্তূপে—তারা আসে কাটমাণ্ডু পর্যন্ত। সেই স্তূপের থেকে নির্গত পবিত্র জল নিয়ে যায় তারা চীনে ও তিব্বতে। দালাই লামা সেই জল স্পর্শ করেন।

শিবরাত্রির মেলায় এলো রাজার মস্ত শোভাযাত্রা। রাজদর্শন ঘটতে বিলম্ব হলো না। শিবিকায় এলেন রাজার পুরনারীরা, যাঁরা অন্তঃপুরিকা অসূর্যস্পশ্যা। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমাত্যগণ এবং রাজপুরুষ। পালিত মশাইকে সেই জনারণ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কাটমাণ্ডুর কাছে নেপালের কুচকাওয়াজের মাঠ বড় আধুনিক,—এদিকটায় এলে নব্য সভ্যতার কিছু স্বাদ মেলে। এর সীমানায় প্রাচীন নেওয়ারদের রাজধানী ছিল,—এর নাম যণ্ডিখাল। এই নেওয়ারদের হাত থেকেই পরবর্তীকালে গুর্খাবা শাসনদণ্ড কেড়ে নিয়েছিল। এ ছাড়াও পরিভ্রমণের অঞ্চল রয়েছে পাটান ও ভাটাগাঁও। এরা ছিল প্রাচীন নেপালের রাজধানী। সেখানেও নেওয়াবদের স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যাত্রীরা নীলকণ্ঠের ধারে গিয়ে বিষ্ণুমূর্তি ও বসুধারা দর্শন করে আসে। অসুস্থ দেহ নিয়ে সেখানে আমি যেতে পারিনি।

পরবর্তী তিনদিন একটু বেশী জ্বরে অনেকটা যেন বেহুঁস থাকতে হয়েছিল। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা ভ্রমণের মধ্যে এই আমার প্রথম ও শেষবাবের অসুস্থতা। যাই হোক, ডাক্তার সে-যাত্রায় নিউমোনিয়া ও বিকারের লক্ষণ সন্দেহ করে নেপাল ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। শ্রীশগিরি ও চন্দ্রগিরির আন্দাজ কুড়ি মাইল পাহাড় আমাকে ঝাম্পানে যেতে হবে।

যেতেই হবে ঝাম্পানে। কিন্তু টাকা। ঝম্পানের ওই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা ত আমাদের কাছে নেই। পালিত মশাই আহারাদি সেরে পান চিবোতে চিবোতে এসে আমার চেহারা দেখে ত হেসেই খুন।—একি, বাবা পশুপতিনাথের পায়ে মাথা রেখে চোখ বোজবার চেষ্টা করছেন দেখছি! সে কেমন করে হয়!

উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলেন আমার দুই আঙুলের ফাঁকে। কিন্তু যে কারণেই হোক সিগারেটটা পড়ে গেল হাত থেকে। উনি সন্দেহ করে কাছে এলেন এবং একটু যেন ভয়ই পেলেন। আমি হাসছিলুম। পালিত মশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখুন, হারগাছটা

আমার গলাতেই আছে, এটা এখনই বিক্রী করা চলে,— তাছাড়া এটা আপনারই বান্ধবীর জিনিস; কিন্তু ব্যাপারটা একটু 'ডেলিকট্' ত—তাঁর জিনিস তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলেই আমার মন রক্ষা হয়।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু কিছু ভাববার আগেই ডাঃ দাশগুপ্ত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গম্ভীরভাবে পালিত মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঁর হাতে আমিই পঁচিশটি টাকা দিচ্ছি, ওতেই ওঁর হবে।

ফাইন্!— বলে পালিত মশাই লাফিয়ে উঠলেন।

ওই আমার প্রথম ঝাম্পানে চড়া। ফিরবার পথে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করে চারজন মানুষের কাঁধের উপর যেন ভাসতে ভাসতে চললুম। থানকোট থেকে ভীমপেডি। দেহের মতো চোখ দুটোও কেমন একপ্রকার আচ্ছন্ন ছিল। চোখ বুজে নেই, চেয়ে নেই, ঘুমিয়ে নেই--ওই একরকম। খররৌদ্র ছিল মাথাব ওপর। অমনি করে আমাকে যেন ভাসিযে নিয়ে চলেছে আমার নিয়তি হিমালযের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোনদিন তার বিরতি নেই। ওই একটা অস্বাভাবিক আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও যেন শুনতে পাচ্ছি আবার নতুন পাহাড়ের ডাক—ওরই ভিতব দিযে কেমন একটা রুক্ষ বন্য ক্ষুধার্ত কঠিন আত্মনিগ্রহের ডাক। ওই ডাক আমাকে কোনদিন কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি।

আমাব বহুকালের ধারণা. হিমালয় পরিভ্রমণকালে যদি কেউ অসুস্থ হয়, তবে ওখানকাব নদীতে অবগাহন-স্নান করলে তাব সব অসুখ সারে। সন্ধ্যার সময ভীমপেডিতে পৌঁছে বাগমতীতে আমি স্নান করেছিলুম। ঠাণ্ডা হাওযা আব ঠাণ্ডা জল সত্ত্বেও আমার শীত ধবেনি। বাড়ি যখন ফিবেছি, তখন আমি সুস্থ। সেই কথাটা জানিযে ডাঃ দাশগুপ্তকে তাড়াতাড়ি পঁচিশ টাকার মনিঅর্ডার পাঠিয়ে দিলুম। পালিত মশাই কলকাতায ফিবে তাঁব গলায ঝোলানো সোনার হারছড়াটা মালিকের হাতে অবশ্যই ফেবত দিয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রত্যর্পণে কিছু কৌতুকজনক আড়ম্বব ছিল। কিন্তু হারছড়া যিনি ফেরত পেলেন, তিনি আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনে পালিত মশাইকে কোনওদিন ক্ষমা কবতে পাবেননি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্রোণভূমি দেরাদুন

বিদূষী লেখিকা শ্রীমতী কৃষ্ণাদেবীর কথা এর আগে দু একবার উল্লেখ করেছি। তিনি চিঠি লিখলেন, স্বর্গে গেলেও মেয়েমানুষের সুখ নেই। সেখানে যদি বিশ্বামিত্র থাকেন তবে সেখানেও বিপ্লব। এখানে এমনি বেশ আছি নিঃসঙ্গ, কিন্তু গৃহত্যাগী হবো একথা উল্লেখ করা মাত্র চারিদিক থেকে সহস্র বাহু বাড়িয়ে ওই এক কথা, যেতে নাহি দিব! সে যাই হোক, আগামী ২৫শে অক্টোবরের পূণ্য তিথিতে রাত সাড়ে নটায় যে গাড়ি যায় দিল্লী স্টেশন থেকে হরিদ্বারের দিকে, আমি সেই গাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। শশাঙ্কবাবু সঙ্গে থাকলে খুশী হবো, তিনি বাশ টানতে জানেন। পুনশ্চ—যোগিনীর বেশ ধরে যাচ্ছি, সুতরাং 'ক' বললেই কৃষ্ণকে মনে পড়বে। ক-দেবীর বদলে 'কৃষ্ণা' হলেই সুখী হই। গৌরবর্ণা আমি নই, অতএব নামটা মানিয়ে যাবে।

সুতরাং দিল্লী স্টেশন থেকেই কৃষ্ণা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সামনে হেমন্তকাল। ভ্রমণ পিপাসায় বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরীর পাখা গজিয়েছিল। তার স্বাস্থ্যোদ্ধার, তার অবসর বিনোদন, তার অনাহত নিদ্রাসুখ, তার আহার-বিহারের নিয়মানুবর্তিতা,—সেদিকে আমাদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি। শশাঙ্কর যকৃৎ ছিল নিত্যসক্রিয়। কৃষ্ণা বললেন, উনি কৃশকায় ব্যক্তি, কিন্তু ওঁর ওজন অন্তত দশ পাউন্ড যদি না বাড়ে তবে আমাদের হিমালয় ভ্রমণ মিথ্যে।

ফলে, হরিদ্বারে যে কদিন রইলুম, তিনজনে মিলে পাঁচজনের খাদ্য অনায়াসে গলাধঃকরণ করতে লাগলুম। কোমর বেঁধে লেগে গেলুম শশাঙ্কর পরিচর্যায়। তার 'বেড-টী' তার প্রাতরাশ, তার মধ্যাহ্নভোজন, তার সন্ধ্যা চা, তার নৈশভোজ। শশাঙ্কর পরিপাকশক্তি দেখে আমরা মুগ্ধ, এবং বন্ধুবর নিজেও বিস্মিত। কৃষ্ণা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনার দেবতাত্মা হিমালয় নিয়ে আপনি যত খুশী মাথা ঘামানগে, আমার পক্ষে হলো মস্ত ছুটি। 'কেউ কোথা নেই আর, শ্বশুর ভাসুর সামনে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে—' আমার পুলকের চেহারাটা আপনি বুঝবেন না! ঘর-সংসার করেননি ত!

কিন্তু শশাঙ্ক?

ওঁর স্বাস্থ্যোন্নতি! পরিপাকশক্তি বাড়ানো! উনি আপনার মতন বাউণ্ডুলে নন, গেরস্থ। ভেসে যাননা, সাঁতার কেটে পেরিয়ে যান! হিসেবী মানুষ!

ইত্যাদি। অর্থাৎ এই প্রকার সঙ্গসাহচর্যে আমার পথ এ-যাত্রায় কণ্টকিত ছিল। বাঁধা ছকের মধ্যে পরিভ্রমণ করাটা যে আমার দু চোখের বিষ—একথাটা বোঝবার শক্তি আমার ছিল না। ইনি এসেছেন হাড় জুড়োতে, আর উনি এসেছেন স্বাস্থ্যকামনায়।

হরিদ্বার থেকে আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ মাইল হলো দেরাদুন। এখানে স্টেশনের কাছেই মনসা পাহাড়ের সুড়ঙ্গ, এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ট্রেন চলে যায় ভীমগোড়া পেরিয়ে এঁকে বেঁকে, সত্যনারায়ণের দিকে। কিছুদূর এগিয়ে রায়ওয়ালার কাছে রেলপথ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ডানদিকে গঙ্গাপথ,—হৃষিকেশে গিয়ে গাড়ি থামে। বাঁদিকে দেরাদুনের পথ।

এটি অরণ্যালোক। দেরাদুন উপত্যকার অরণ্য হলো সুপ্রসিদ্ধ। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কাকার, বিবিধ সরীসৃপ, লেপার্ড ও চিতাল, প্যান্থার ও শম্বর, -এরা আশেপাশের অরণ্যে চিরস্থায়ী। কিছুদিন আগেও এই পথের ধারে চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য ছিল অতি প্রবল। তীর্থযাত্রীরা দল বেঁধে না গেলে ভয়ের কারণ ছিল। এখন আর সেদিন নেই। অরণ্য প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার ভিতর দিকে সরে গেছে। জায়গা দখল করেছে শ্রেষ্ঠ জন্তু—অর্থাৎ মানুষ!

আমরা ট্রেনেই যাচ্ছিলুম। এটা শিবলিঙ্গ পর্বতমালার পাদমূল। সুতরাং দেরাদুনে পৌঁছবার আগেই পাহাড়ি বনজঙ্গল চারিদিক থেকে বেষ্টন করে। এই বন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে পূর্বে ও পশ্চিমে। পূর্বে গঙ্গার মূল প্রবাহ এবং পশ্চিমে যমুনার ধারা। এই উভয় নদীর মাঝখানে এবং দক্ষিণে প্রায় শাহারানপুর জেলার সীমানা অবধি এই উপত্যকা কমবেশী দুশো মাইল পরিধি নিয়ে অরণ্য বেষ্টিত। উত্তর পশ্চিম ভারতের কাংড়ার ন্যায় দেরাদুন উপত্যকাও পশুশিকারের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। অরণ্যের ভিতরে ভিতরে শিকারীদের জন্য ডাকবাংলো পাওয়া যায়।

আমার পক্ষে মুশকিল এই, চলতি অর্থে আমি 'টুরিস্ট' নই, সেজন্য আনুপূর্বিক তথ্যের দিকে আমার স্বভাবতই ঝোঁক কম। আমি এসেছি নিশ্বাস নিতে নতুন দেশে, নতুন পটভূমিতে। দেরাদুনের চাউল অতি সুন্দর ও সুস্বাদু, কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। এ অঞ্চলে ঔষধিবন হলো বিশাল, এবং লতাগুল্ম ও শিকড়ের গবেষণার জন্য মস্ত এক সরকারী কলেজ এখানে প্রসিদ্ধ। বেশ মনে পড়ে, আমরা সেখানে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা যাপন করলেও আমাদের কৌতূহল মেটেনি এখানে দেওদার শাল চাঁড় হলদ তুন শিশুম—ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা অনেকগুলি চা বাগান দেখে বেড়িয়েছিলুম।

দেরাদুন স্টেশনে নামলে রাঁচিকে মনে পড়ে। দুই থেকে আড়াই হাজার ফুট উঁচু সমুদ্রসমতা থেকে, কিন্তু বোঝবার জো নেই। আমার চোখ ছিল এখান থেকে প্রধান দুটি পথের দিকে। একটি গেছে রুড়কি, অন্যটি চক্রতা। কিন্তু কোনও পথটিই নিতান্ত সহজ নয়। চক্রতা এখান থেকে কমবেশী যাট মাইল পথ। আন্দাজ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত গেলে শাহারানপুরের পথের সঙ্গে মেলে। তারপর সেখান থেকে আরও ত্রিশ মাইল। কোটদ্বার থেকে যেমন লান্সডাউন, তেমনি শাহারানপুর রোডের ওই সংযোগ থেকে চক্রতার পথ গিরিগাত্র বেয়ে চলে গেছে চক্রতার দিকে। পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে চড়াইয়ের পর চড়াই পেরিয়ে। গিরিনদী, ঝরনা, উত্তরে তুষারশুভ্র হিমালয়ের বিস্তৃত শোভা, নীচের দিকে অরণ্যবেষ্টিত দেরাদুনের বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। পথে পড়ে চোহারপুর, তারপর যমুনার পুল। এই পুল পেরিয়ে একদিকে চলে গেছে নাহান রোড, অন্যদিকে মোটরপথ চক্রতার দিকে। ইংরেজ আমলের ভারত গভর্নমেন্ট কোনওদিন গাড়োয়ালীকে এবং গুর্খাকে বিশ্বাস করেনি। সেজন্য তারা এই চক্রতায় এবং লান্সডাউন সৈন্যদলকে স্থায়ীভাবে মোতায়েন করে রাখতো। পাঠানকে তারা বিশ্বাস করেনি, সেজন্য সমগ্র পাঞ্জাব এবং সীমান্তে অতগুলি গোরা ছাউনী। অথচ সেই গাড়োয়ালী, গুর্খা এবং পাঠানদের মতো নির্ভরযোগ্য যোদ্ধাও তারা আর ভূভারতে খুঁজে পেতো না। ইংরেজ আজ নেই, কিন্তু গুর্খা সৈন্য পাবার জন্য তাদের আকুলি-বিকুলি থেকে গেছে।

চক্রতা প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে। এখানে বেড়ানো যায়, কিন্তু বসবাস করা চলে না। সৈন্যসামন্তের পরিবারেরা মাঝে মাঝে এসে বাস করে এবং তার জন্য দেহাতীদের ছোটখাটো বাজার বসে। প্রয়োজনের সীমানাটা পেরোলে আর কোথাও কিছু নেই। সৈন্যদলের ব্যারাকের বাইরে কিংবা দপ্তরের সীমানা ছাড়িয়ে না আছে সমাজ, না বা কোনও আত্মীয় গোষ্ঠী। ফলে, একবেলা থাকলেই হাঁপিয়ে ওঠে মন। কার্তিক মাস পড়লেই দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া আসে এ চক্রতার পথে কিন্তু যমুনার বন্য ও পার্বত্য শোভা মনকে আগাগোড়া কেমন যেন অভিভূত করে রাখে। চক্রতার পরেই কইলানা অঞ্চল। একটি চক্রতারই অংশ, কিন্তু কইলানা 'নেক্ এর' দ্বারা পৃথক। দুটি মিলিয়ে এক, কিন্তু দুটি বিচ্ছিন্ন। কলকাতা এবং ভবানীপুর,—মাঝখানে চৌরঙ্গী।

দেরাদুন থেকে আন্দাজ পঁয়ত্রিশ মাইল দূর হলো হরিপুর। হরিপুরের সামনে হিমালয়ের নিসর্গ দৃশ্য পথচারীকে আনন্দে স্তম্ভিত করে। হিমালয় পেরিয়ে মর্ত্যে প্রথম নেমেছেন যমুনা। ওখানে গঙ্গার আবির্ভাব হলো হবিদ্বাবে, এখানে কালিন্দীর আবির্ভাব ঘটলো হরিপুবে। যেমন আমরা দেখে এসেছি আলমোড়ার উত্তর প্রান্তে বৈজনাথ,—যেখানে গোমতীর প্রথম অবতরণ ঘটছে মর্ত্যলোকে। হরিপুরেব প্রান্তে কালসি অঞ্চলে সম্রাট অশোকের শিলালিপি অতি প্রসিদ্ধ। সেখানে মাটি চৌদ্দটি অনুজ্ঞা প্রস্তবগাত্রে খোদিত রয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সেই আবহ এখানকাব জনশূন্য পার্বত্য প্রান্তরে নীলাভ আকাশের নীচে প্রখর রৌদ্রে আজও যেন অনির্বচনীয় গীতিকাব্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার প্রখর অতি-আধুনিক মন কোথাও কোনও প্রাচীনেব চিহ্ন লক্ষ্য কবলেই যেন সমগ্র সত্তা দিয়ে লেহন করতে থাকে।

দ্বাপরযুগে আচার্য দ্রোণ তাঁব একটি অস্ত্রশিক্ষা শিবিব স্থাপনার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এখানে ওখানে। অবশেষে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা পেবিয়ে উপগিরি ও বহির্গিরির মাঝামাঝি দেওদার পর্বতের কোলে এই সুবিশাল উপত্যকাটি তিনি বেছে নিলেন। দ্রোণাচার্যের আশ্রম এখানে ছিল বলেই এ অঞ্চলের নাম হয় ডেরাদ্রোণ, ওরফে দেরাদুন। প্রাচীন হস্তিনাপুর থেকে দেবাদুন বেশী দূরে ছিল না। এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে পরবর্তীকালে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। পৌবাণিক কাল থেকে আধুনিক ইতিহাসের কাল অবধি অনেক ঝড় বয়ে গেছে এই দেরাদুনে। এই উপত্যকা বরাবরই ছিল গাড়োয়ালের অধীনে। সপ্তদশ খ্রীস্টাব্দে এলো মোগল। শাহজাহানের সেনাপতি খালিলুল্লাব সঙ্গে গাড়োযালবাজ পৃথ্বীশার লাগলো যুদ্ধ। রাজা সন্ধি কবলেন তাদেব সঙ্গে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে শতাব্দীর শেষভাগে গুরু রাম রায় এলেন দেরাদুনে। মোহন গিরিসঙ্কটের কাছে গুরু রাম রায় তাঁর ভক্তগণকে নিয়ে আবাস রচনা করলেন। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাবার চেষ্টায় তিনি যেদিন প্রথম দেরাদুনে পা দিলেন, সেই দিনটিকে স্মরণ করে আজও প্রতি বছর এখানে 'ঝাণ্ডা' উৎসব-মেলা হয়ে থাকে। গুরু রাম রায়ের মন্দির—যেটি মোগল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত—সেটি এখানে অতি প্রসিদ্ধ। এখানে গুরুর শয্যাদ্রব্য ও চিতাভস্ম সুরক্ষিত রয়েছে। গুরু রাম রায়ের শিষ্যসেবকদের এখানে বলা হয়ে থাকে 'রামরাইয়া'।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড রাজনীতিক দুর্গতি দেখা দেয় এই দেরাদুনে। 'এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল।' আফগান সেনাপতি নাজিবুদ্দৌলা এবং তাঁর নিষ্ঠুর নাতি গোলাম কাদির দেরাদুন আক্রমণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। এই সময় দেরাদুন ঐশ্বর্যে

ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। নাজিবুদ্দৌলা ছিলেন শাহাবানপুরের শাসনকর্তা। তিনি শিবলিঙ্গ পর্বতমালা পেরিয়ে এসে দেরাদুন আক্রমণ করেন। এই সময় গাড়োয়ালের রাজা এবং দেরাদুনের অধিপতি রাজা ফতে শা আপন গুণ-গরিমার জন্য চারদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু রোহিল্লা দলের শাসন ও সেনাপতি নাজিবুদ্দৌলা প্রতিবেশীর এই সমাদর বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। রক্তপাত ঘটলো সামান্যই। দেরাদুন তিনি অধিকার করলেন। কিন্তু সে মাত্র অল্পদিন। তারপরেই নাজিবুদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর ফতে শা যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন--সেই সব রাজপুত ও গুজর সম্প্রদায়—যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য বহির্ভারত থেকে আসতো, এবং পাঞ্জাবের শিখরা অথবা নেপালের গুর্খারা—একে একে এই উপত্যকার উপর হানা দিতে আরম্ভ করলো। দেখতে দেখতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দেরাদুনের দুর্গতি উঠলো চরমে। শ্মশানে পরিণত হলো উপত্যকা। কিন্তু এর পরেও শেষ হয়নি। হিমালয়ের ওই পাথর রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে বার বার শিখ-সর্দার বুঘেল সিং এবং পাঠান সেনাপতি গোলাম কাদিরের তরবারির খোঁচায়। লুট করেছে উভয়ে। হত্যা করেছে প্রাণের পুলকে। আগুন জ্বালিয়ে উল্লাস করেছে দুজনে। অতঃপর গোলাম কাদির গরুর রক্ত নিয়ে গুরু রাম রায়ের মন্দিরকে রঙ্গীন করে তুলেছে।

গোলাম কাদিরের পরে এলো গুর্খা আক্রমণ। তারা জাতিতে হিন্দু, কিন্তু নিষ্ঠুরতায় গোলাম কাদিরকেও হার মানালো। গুর্খারা জয় করলো সমগ্র কুমায়ুন, পরে দেরাদুন। তারা বিধ্বস্ত করলো সমগ্র গাড়োয়ালকে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে দেরাদুনের পথের উপর রাজা প্রদ্যুম্ন শাকে হত্যা করলো। অবশেষে গুর্খারা কেমন করে ইংরাজের নিকট পরাজিত হয়, এবং গাড়োয়ালরাজ সুদর্শন শা কিরূপে ইংরাজের সাহায্য নেন, সেকথা আমি আগেও বলে এসেছি, পরেও সামান্য বলবো।

দেরাদুনে গুর্খাদের রাজত্বকালটুকু কেমন কলঙ্কের মসীলিপ্ত হয়ে রয়েছে, সে সম্বন্ধে দু একটি কথা এখানে বলি। ওরা যখন এই উপত্যকায় এসে কুকরি ও বন্দুক হাতে নিয়ে পথে ঘাটে প্রাণের আনন্দে হত্যা করে বেড়াতে লাগলো, তখন উপত্যকার প্রায় সব নরনারী পালাতে লাগলো এখানে ওখানে। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে না পেরে গুর্খারা হরিদ্বারের বাৎসরিক মেলায় গিয়ে গাড়োয়ালী ছেলে ও মেয়েকে বিক্রি করে আসতো। একটি ফুটফুটে ছেলে পঁচাত্তর টাকা, একটি সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ের দাম দেড়শো টাকা। কৌতুকের বিষয় ছিল এই যে, সেই মেলায় একটি ঘোড়া পাওয়া যেত আড়াই শো টাকায়।

দেরাদুন থেকে মাইল পাঁচেক এগিয়ে টনস নদীর কাছাকাছি পাওয়া যায় একটি 'ডাকাতে গুহা'। ডাকাতের দল কোথাও নেই বটে, তবে এখানকার নিরিবিলি নিভৃত চেহারাটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালে যে একটু গা ছমছমে ভাব হয় না তা নয়। এখানে নদীর জল সহসা নুড়ি-পাথরের তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আবার কিছুদূর গিয়ে প্রবাহের আকারে দৃশ্যমান হয়। আশে পাশে প্রাকৃতিক শোভা মনের মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা আনে সন্দেহ নেই।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না, দেরাদুন শহর থেকে রাজপুর বোধ হয় আন্দাজ মাইল নয়েক পথ। এই পথ বাঁধানো এবং মোটর চালনার পক্ষে অতি উত্তম। এই রাজপুরের কাছাকাছি গন্ধকজল ও গরম জলের ঝরনা দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র গাড়োয়াল কুমায়ুন এবং পাঞ্জাবের বহু পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রকার ধাতব এবং উত্তপ্ত জলের ঝরনা শত শত।

কিন্তু এখানে এর পরিবেশটি বড় মধুর এবং আনন্দদায়ক। একটি গুহাশীর্ষ থেকে অবিশ্রান্ত জলধারা নামছে, এ দৃশ্যটি দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে রাখে। এই দৃশ্যটিকে যাঁরা 'সহস্রধারা' নামে প্রথম অভিহিত করেছেন তাঁদের রসবোধকে তারিফ করি বৈকি। চারিদিকে অজস্র লতাগুল্মের ভিড়, ঋতুর মরসুমে চারিদিকে নানা ফুলের সমারোহ, শরতে-বসন্তে নেমে আসে হিমালয়ের নানা রঙ্গীন পাখি—আর তাদের মাঝখানে এই নিভৃত কাব্যকাননে শান্ত মৃদু ঝরনার ঝরঝরানি শব্দ অনেকটা যেন গীতিময়।

শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে গার্বহি গাঁও ছাড়িয়ে কয়েকটি চা বাগান ও ফরেস্ট রিসার্চ কলেজ পেরিয়ে গেলে শীর্ণ একটি স্রোতস্বিনীর নীচে তপোকেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরটি হলো একটি মস্ত গুহার মধ্যে, নদীর কোলের ভিতরে। এখানে পাথর দেখেছিলুম বহুবর্ণের। অনেকে বলে, এখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম আমরা। ভিতরে কয়েকটি মূর্তি ও দেবলিঙ্গ। ভারতের সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি প্রতি বছরে শিবরাত্রির দিন মস্ত মেলা বসে। মেলা হলো মিলনের কেন্দ্র। একটি মেলার তারিখ ধরে আসে শত সহস্র নরনারী। ভারত সংস্কৃতির প্রধানতম প্রতীক হলো দেশদেশান্তরের মেলা। মেলায় দাঁড়িয়ে আজও ডাক দেওয়া যায় বিশাল ভারতের জনসাধারণকে। তপোকেশ্বরের ওপারে আছে দেরাদুন মিলিটারী কলেজ। ভারতের যাঁরা ভবিষ্যৎ সমর-নায়ক হবেন, তাঁরা বালককাল থেকে এখানে যুদ্ধবিদ্যা ও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন। খোঁজ করে দেখেছি, এখানে নিয়মানুগত্যের শিক্ষা অতিশয় কঠোর; এবং জীবনযাত্রার প্রণালী অতিশয় রুক্ষতার সঙ্গে শেখানো হয়ে থাকে। এর জন্য মনে মনে তারিফ করেছি। মহাভারতের আচার্য দ্রোণ যে এখানে অস্ত্রশিক্ষা দান করতেন, তার সঙ্গে আজকের এই একাডেমির মিল আছে বৈকি। চারিদিকে পাহাড় আর অরণ্য; দুই পাশে দুই নদী,—আর মাঝখানে এই বিশাল উপত্যকা। অস্ত্রবিদ্যা ও রণকৌশল শিখবার উপযুক্ত স্থান, সন্দেহ নেই।

দেরাদুনের আর দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার ভালো লেগেছিল। এমনি নিরিবিলি পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে যদি কেউ বালক-বালিকাদের সৎশিক্ষা দানের কথা ভাবে তবে সেটি আনন্দের কথা বৈকি। পরলোকগত এস আর দাশ মহাশয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় বালকদেরকে কেমন করে গড়ে তোলা যায়, সেকথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি এই প্রকার ভাবনা নিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগে দেরাদুনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল বালক শুচিতাসম্পন্ন বিদ্যালাভ করতে পারে। স্বর্গত দাশ মহাশয়ের এই দুন্ স্কুল ছাড়াও মেয়েদের জন্য আরেকটি বিদ্যালয় রয়েছে, তার নাম কন্যা গুরুকুল। এই বিদ্যালয়টি পার্বত্য মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, রাজপুরের পথে। শীতের দিনে এখানে প্রবল ঠাণ্ডা, আবার গরমকালে স্নিগ্ধ। এই বিদ্যালয়টি প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে,—অবশ্য সমুদ্রসমতা থেকে। কিন্তু চারিদিকের বন্য পার্বত্য শোভার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঙ্গলার ছেলেমেয়েরা যে কত দুর্ভাগা, এবং একশ্রেণীর পিতামাতা যে কী অদূরদর্শী,—সেকথা বুঝতে পারি যখন দেখি ভারতের সকল প্রদেশই আজ শিক্ষা স্বাস্থ্য চরিত্রগঠন এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় ছেলেমেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। উত্তরপ্রদেশে শতকরা আশীটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য ভালো একথা শুনলেও আনন্দ পাওয়া যায়। কন্যা গুরুকুলের মতো বিদ্যালয় দেখে এসেছি শিমলায়, দার্জিলিঙে, কার্সিয়াঙে, কালিম্পঙে এবং শিলঙে। কিন্তু

এমন আনন্দদায়ক পরিবেশ সহসা চোখে পড়ে না। এখানে বালিকাদের বয়স দশ বছরের বেশী হলে আর ভর্তি করা যায় না—এই নিয়ম। অনেকটা আশ্রমিক বিধি অনুযায়ী বালিকারা এখানে বিদ্যালাভ করে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেরাদুনে অনেকগুলি।

দেরাদুন স্টেশন থেকে কিছু দূরে সেই জৈন ধর্মশালাটা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে। বাঙ্গালী হোটেল একটি ছিল, এখনও হয়ত আছে, কিন্তু ধর্মশালার আবহাওয়াটা আমার ভালো লাগে। কাঠকয়লা আর পেন্সিলে লেখা অসংখ্য নাম আর ঠিকানা,—একটুখানি আবেদন, একটি করুণ মিনতি,—আমাকে মনে রেখো' এ মিনতি কোথাও বাদ যায়নি। পাথর কেটে এমনি করে নাম-ধাম লেখা আছে কত দেশের কত মন্দিরে। এ মিনতি দেখে এসেছি কুতব মিনারের চূড়ায়, আবু পাহাড়ের নীচে, দ্বারকার ধর্মশালায়, বোম্বাই-সমুদ্রগর্ভের হস্তীগুহায়, অজন্তায়, রামেশ্বরমে, ভুবনেশ্বরে, কোথাও বাদ যায়নি। শুধু মনে রেখো! পৃথিবীর পট থেকে একদিন মুছে যাবো মনে-মনে জানি, কিন্তু আমি যে ছিলুম, এই সংবাদটুকু রেখে যেতে চাই। যদি ধর্মশালার এই দেওয়ালের দিকে তোমার চোখ পড়ে—জানি পড়বেই এক সময়ে,—তবে আমাকে মনের কোণে একটু ঠাঁই দিয়ো।

এই হাস্যকর প্রচেষ্টার দিকে তাকিয়ে বন্ধুবর শশাঙ্ক এমন করে হাসলো যে, নিজের অস্তিত্বটাও যেন নিজের কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলো। কৃষ্ণাদেবী বললেন, আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে কিনা সেটুকু অন্তত লিখে রেখে যান, শশাঙ্কবাবু।

মেয়েমানুষের হালকা পরিহাস,—শশাঙ্ক বিজ্ঞের মতো মুখের একটা শব্দ করে নিরুত্তর রইলো।

এখানে আমাদের আয়ু অল্প। এই ধর্মশালাটির দুখানি ঘরে আমাদের ওই স্বল্পকালীন সংসারযাত্রার সীমানা,—ওরই মধ্যে দিন তিনেকের খেলাঘর পাতা হয়েছিল। বাইরের কুকুর আসে, দোকানদার ঝাড়ুদার এসে ঘুরে যায়। আমরাও ঘুরেছি যখন তখন, যেখানে সেখানে। আমাদের সামনে দেওদার পর্বত, রাত্রে এখান থেকে দেখা যায় মুসৌরী শহরের আলোর মালা। নীচে দেরাদুন, উপরে মুসৌরী। অক্টোবর প্রায় শেষ হয়ে এলো, এখন সকলের মুসৌরী থেকে নেমে আসার পালা। কিন্তু আমাদের মন হলো বিপরীতগামী, এই আমাদের যাত্রার কাল। কৃষ্ণা দেবী হাসিমুখে বললেন, যবনের সঙ্গে বেরিয়েছি, সুতরাং এক সাথেই খানা খেতে হবে। ঘুরেছি অনেক দেশ, কেবল হিমালয় দেখা বাকি ছিল।

বললুম, শাস্ত্রকার মনু বলেছিলেন, পথে নারী বিবর্জিতা। তার অর্থটা বোধগম্য হচ্ছে এতদিনে!

কৃষ্ণাদেবীর চোখ দুটো স্বভাবতই বড় বড়। তিনি আমাদের দিকে সভয় প্রশ্নময় দৃষ্টিতে তাকালেন। বললুম, সঙ্গে মহিলা থাকলে তিনিই পথ আড়াল করে থাকেন, তাঁকে এড়িয়ে কিছু দেখা যায় না!

কৃষ্ণা বললেন, বেশ ত, কম্বল জড়িয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমাইগে, আপনি গিয়ে ঘুরুন, রাজপুরের পথে। কাব্য জমবে! দেখলেন অনেক, কিন্তু মন দিয়ে দেখবার চোখ পেলেন কি? তীর্থে-তীর্থে মাথা ঠুকলে মাথাটাই ফোলে, আর কিছু হয় না।

কথাটা দর্শনতত্ত্বের দিকে ঘেঁষে গেল, সুতরাং আর নয়। বুঝতে পারা যায়, কৃষ্ণাদেবীর মনে সমস্যার জটিলতা আছে। সেদিকে আর অগ্রসর না হওয়াই সঙ্গত। আমরা গত কয়েকদিন যাবৎ তাঁর মধুর সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি।

স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ও সংযমে গঠিত তাঁর প্রকৃতি। কোনও উল্লাসে কিংবা কোলাহলে তিনি একবারও মেতে ওঠেননি, কিন্তু শান্ত হাস্যে আমাদের এই পরিভ্রমণে তিনি সহযোগিতা করে এসেছেন। প্রতি পদেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। তিনি কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধাদি লেখেন,—এবং তাঁর অনেক রচনা আমার হাত দিয়েও ছাপা হয়েছে, হিন্দি রচনাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী,—কিন্তু নিজের লেখা নিয়ে কোনও আলোচনা করতে তিনি নারাজ। ওটা অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তিনি এড়িয়ে যান। তাঁর পারিবারিক জীবন আমাদের জানা নেই, জানবার চেষ্টাও করিনি—কিন্তু কোথাও কিছু একটা বেদনার খোঁচা আছে অনুভব করতুম। হরিদ্বারের ঘাটে তাঁকে অনেক সময়ে একা বসে থাকতে দেখতুম, হৃষিকেশের ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে তিনি গিয়ে বসতেন নীলধারার সামনে সন্ধ্যার দিকে,—আর আমি প্রশ্ন করতুম শশাঙ্ককে উদ্বিগ্ন মনে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনও অভব্য কৌতূহল প্রকাশ করাটা অশোভন বলেই বিশ্বাস করতুম।

তবু ওই জৈন ধর্মশালার বারান্দায় বসে আগের দিন রাত্রে আমি বলে ফেললুম, আপনার জ্বালা অনেক মনে হচ্ছে?

তিনি মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, বুঝতে পেরেছি। তাগাদা দিচ্ছেন ত?

তাগাদা? কিসের?

আমার জ্বালা কি, সেকথা থাক্। তবে আপনার বোধ হয় পেটের জ্বালা ধরেছে। চলুন, খেতে দিই।

আমরা দুজনে হেসে উঠলুম। শশাঙ্ক সোৎসাহে গিয়ে পানীয় জল ধরে নিয়ে এসে ঠাঁই করে বসে গেল। উনি ধরেছেন ঠিক। পরিপাকশক্তি আমাদের প্রবলভাবে বেড়েছে।

আগামীকাল আমরা মুসৌরী রওনা হবো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেওদার পর্বত মুসৌরী

হরিদ্বারের ওপারে চণ্ডী পাহাড়ের নীচে গঙ্গার মূলধাবাব তীরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে সোজা উত্তরে,—বদরিনাথের তুষারশুভ্র চূড়া এত দূরে থেকেও চিকচিক করে। মনসা পাহাড়ে কিংবা চণ্ডীর মন্দিরে দাঁড়ালে ত কথাই নেই। একটি কাক যদি উড়ে যায়, তবে আকাশপথে হয়ত পঁচিশ মাইলের বেশী হবে না, কিন্তু পথ ধবে গেলে দুশো মাইল। শোভা দেখতে চাও ত দূরের থেকে, নইলে পায়ে হাঁটা পথ প্রাণান্তকর। পাহাড় হলো শক্তির অগ্নিপরীক্ষা।

শশাঙ্ক চৌধুরীর উৎসাহ, কেবল পাহাড়েব চূড়ায় বাস করবো! সেখানে বায়ু লঘু, শ্বাস-প্রশ্বাস হয় দীর্ঘ,—এবং পরিপাকশক্তির উন্নতি। শতকরা নিরানব্বই জন তাই চায়, অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ালে জল-হাওয়া বসে না। যে-পাথর গড়িয়ে বেড়ায়, তার গায়ে শ্যাওলা ধরে কি? শশাঙ্কর অকাট্য যুক্তি। অখণ্ডনীয় হিসাববোধ।

দেরাদুন থেকে আমরা যাচ্ছিলুম মুসৌরীব দিকে। হেমন্তকাল। ঠাণ্ডা বাতাসে শুষ্কতার টান ধরেছে, 'কোল্ড-ক্রীম' মুখে মাখবার সময় এসেছে। 'চেঞ্জাররা' পাহাড়পর্বত থেকে বিদায় নিচ্ছে একে একে। তারা হয়ত বোঝে না, পর্বতবাসের পক্ষে উপযুক্ত সময় এইবার আসন্ন। যত ঠাণ্ডা, যত হাওয়া এবং যত রৌদ্র—ততই স্বাস্থ্যশ্রী। বস্তুত, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অবধি মুসৌরী, নৈনীতাল, আলমোড়া, দার্জিলিং প্রভৃতি পার্বত্য শহরে বসবাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠকাল। কিন্তু বাঙালীর সীজন্ শেষ হয় অক্টোবরের সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং আমরা যাচ্ছিলুম সীজ্‌নের পরে। আমাদের প্রাণের টান ভিন্ন রকমের।

কৃষ্ণাদেবীকে প্রশ্ন করলুম, কেমন লাগছে আপনার?

তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, নতুন!

নতুন, সন্দেহ নেই। যতবার এই প্রকার পথে এসেছি—নতুন। গৌহাটি থেকে নংপোর পথ, কাল্‌কা থেকে ধরমপুর, কাঠগোদাম থেকে ভাওয়ালী, শুক্‌না থেকে তিনধরিয়া,—চিরকাল নতুন। যারা যায়নি তারা দুর্ভাগা,—যারা গিয়েছে তাদের মনে কোনওদিন দাগ মুছবে না। আমরা এগোচ্ছি রাজপুরের কাছাকাছি! মসৃণ পথে চলেছে আমাদের মোটরবাস। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, দেরাদুন থেকে মোটরপথে মুসৌরী বোধ করি মাইল বাইশেক হবে। আট ন' মাইলের পরে গিয়ে এক সময় পড়ে রাজপুর। বছর পঁচিশেক আগে ঘোড়ায় চড়ে যাবার একটা সহজ পথ ছিল দেরাদুন থেকে মুসৌরী, কিন্তু সে-পথে এখন আর কেউ যায় না।

দ্রোণাচার্যের কাল থেকে এই পর্বতটির নাম হয়েছে দেওদার পর্বত। শিবলিঙ্গ পর্বতমালা এবং দেওদারের মাঝখানে দেরাদুনের বিশাল উপত্যকাটা চোখে পড়ে রাজপুর ছাড়িয়ে গাড়ি যখন চড়াই পথে উঠতে থাকে। বাঁধানো মোটরপথ অতি চমৎকার; নৈনীতাল দার্জিলিং মনে পড়ে। মুসৌরী পাহাড়ের পুবদিকে অনেক নীচে দিয়ে চলেছে

গঙ্গা, এবং পশ্চিমে যমুনার ধারা। হিমালয়ের শত-সহস্র পাহাড়ের নামে শত সহস্র রূপকথা লোকমুখে প্রচলিত। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এই দেওদার পর্বতের চূড়ায় থাকতো নাকি এক দানব,—নাম মানাসুর। তারই অপভ্রংশ হলো মুসৌরী। অনেকে বলে, এই যে এখানে অনেক অঞ্চলে মন্‌সুরি বৃক্ষ দেখা যায়, এর থেকেই নাকি মুসৌরী নাম প্রচলিত।

রাজপুর পর্যন্ত পথ মোটামুটি সমতল। তারপর চড়াই আরম্ভ হয়। চমৎকার পথ, কিন্তু বেন্ডগুলির সংখ্যা বেশী, সেজন্য সংঘর্ষ ও অপঘাতের আশঙ্কা থাকে। এই কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখানে 'একমুখী যানবাহান চলাচলের' ব্যবস্থা করেছেন। ওঠবার সময় চড়াই এখানে অত্যন্ত দুঃসাধ্য মনে হতে থাকে, এবং নামবার সময়ও তেমনি ভীতিজনক। আমাদের মোটরবাস তার সমস্ত শক্তি এবং হিংস্র আর্তনাদ প্রকাশ করা সত্ত্বেও ধীরগতিতে উপরে উঠছিল। পায়ে হেঁটে যারা এক-আধজন ঠুক ঠুক করে আসছে, মোটরের মধ্যে বসেও তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসে। আমার মনে হয়, এই পথটিকে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য করে তোলা দরকার।

একটির পর একটি 'বেন্ড' আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। পিছন দিকে দেরাদুনের বিস্তৃত উপত্যকা ছবির মত হয়ে আসছে। যত উঁচুতে উঠি, ততই বিস্তার, ততই ব্যাপকতা। চড়াই যত ওঠে, চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য পদ্মের মতো এক একটি যেন দল মেলতে থাকে। দূরদূরান্তরে ছুটে যাচ্ছে দৃষ্টি। আলমোড়া, নৈনীতাল, গাড়োয়াল,—প্রত্যেকটি পার্বত্য জেলা; পাহাড়ের পর পাহাড়, দিকদিগন্ত অবধি প্রসারিত। পথের পাশে কোথাও প্রপাতের শব্দ, কোথাও গিরিগাত্র বেয়ে নামছে ঝরনা, কোথাও বনময় ছায়ান্ধকারে মৃদু কলতান। উপরে রৌদ্র প্রখর, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস প্রখরতর। চুপ করে বসে আছি বলেই বোধ হয় শীত শীত করছে। অন্যান্য পাহাড়ী শহরের মতো এখানেও 'টোল্‌ট্যাক্স' দিতে হয়। আমাদেরও দিতে হলো মাথা পিছু দেড় টাকা। ঝরিপানির 'চেকপোস্টে' গিয়ে ট্যাক্সের রসিদটি আবার না দেখালে চলে না। ঝরিপানি ছাড়িয়ে খানিকটা দূর গেলে নেপাল মহারাজার প্রাসাদটি চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাসাদ বললেই তার ছবি ফোটে মনে, বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ঝরিপানি ছাড়িয়ে গেলে আর একটি ছোট জনপদ পাওয়া যায়। নাম বার্লোগঞ্জ। এখানে একটি কলেজ এবং শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের গাড়ি এলো একটি ঝোলাপুল পেরিয়ে। তলা দিয়ে তার নদী চলে গেছে দেরাদুনের দিকে।

মুসৌরী শহর বটে, কিন্তু সমগ্র পাহাড়টিকেই এখন মুসৌরী বলা হয়ে থাকে। দেওদার পর্বতের নাম মানুষ কবে ভুলে গেছে তার ঠিক নেই। বার্লোগঞ্জের পরে আসে কুলরি বাজার; এখান থেকে আরেকটি পথ চলে গেছে লাণ্ডুরের দিকে। লাণ্ডুরের দিকে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে মস্ত একটি ঘণ্টাঘর। এই ঘণ্টাঘড়ি ঘরটি ঠিক মুসৌরী এবং লাণ্ডুরের মধ্যপথে অবস্থিত।

এই পর্যন্ত কৃষ্ণাদেবী চুপচাপ ছিলেন। এবার আমিই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে বসলুম। বললুম, আজ সকাল থেকে যেন আপনার আর ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে প্রসন্ন চক্ষে তাকালেন। আমি পুনরায় বললাম, বিয়ের পরে নতুন বউ যখন প্রথম শ্বশুরঘর করতে যায়, তার চুপ করে থাকাটার মধ্যে

আসল ভাষাটা বুঝি। কিন্তু আপনার মৌনব্রত একেবারেই দুর্বোধ্য! ভয়ানক একটা পিছুটান আপনার আছে মনে হচ্ছে!

তিনি হাসিমুখে বললেন, হট্টগোল না হলে বুঝি আর আপনার চলছে না?

বুঝতে পারা গেল, তিনি মুখ খুলতে চান না। মুসৌরী প্রায় এসে গেছে। কিন্‌ক্রেগের কাছে আমাদের নামতে হবে। সেখান থেকে অনেকটা চড়াই পথ পায়ে হেঁটে গেলে তবে ম্যাল্ পাবো। মোটরবাস থেকে নামবার ঠিক আগে কৃষ্ণাদেবী শুধু বললেন, 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।'

বাস থেকে নেমে মালপত্র কুলীর মাথায় দিয়ে আমরা উপর দিকের পথ ধরে চললুম। এ সময়টা সুবিধা। হোটেলের দাম যেমন সস্তা, জায়গাও মেলে তেমনি প্রশস্ত। ধর্মশালা মুসাফিরখানা—কোনওটারই অভাব নেই। আর্যসমাজ মন্দিরেও অনেক রকম জায়গা পাওয়া যায়। এমন কি বিনামূল্যে আহার ও আশ্রয়। কিন্তু আমাদের পছন্দের জাত আলাদা। অবশেষে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পছন্দসই একটি হোটেল পাওয়া গেল। তিন চার খানা ঘর নিয়ে থাকলেও দৈনিক দু'টাকার বেশী লাগবে না এবং আহারাদি আমাদের ইচ্ছামতো। হোটেল-মালিক হলেন এক পার্শী ভদ্রলোক। আমরা ভিন্ন তাঁর আর কোনও বোর্ডার বর্তমানে নেই। এই রকমটিই আমরা চেয়েছিলুম। কৃষ্ণা হলেন আমাদের অতিথি, সুতরাং শশাঙ্ক তাঁর জন্য শ্রেষ্ঠ ঘরখানি বরাদ্দ করে দিয়ে এলো। তিনি সে ঘরে তাঁর কাব্যকুঞ্জ প্রস্তুত করে নিলেন। আমরা এখানে গোবর্ধন নামক জনৈক গাড়োয়ালী পাচককে নিযুক্ত করেছিলুম। ছত্রি ব্রাহ্মণ, কিন্তু মাংস ও মাছ বাঁধে ভাল। তার বাড়ি হলো দেবপ্রয়াগের দিকে।

বন্দরপঞ্চের পর্বতমালা সোজা উত্তরে চোখে পড়ে। আর কোনও পাহাড়ী শহরে বোধ হয় এত কাছাকাছি তুষারচূড়া চোখে পড়ে না। উত্তর অংশটা একেবারে শূন্য, সেই কারণে মুসৌরীতে তুহিন বাতাস এত প্রবল। দার্জিলিংয়ে কিংবা শিমলায় উত্তরাঞ্চলে অনেকটা বাঁধন আছে, আলমোড়াতেও খানিকটা অংশে পাহাড়ী দেওয়ালের অবরোধ দেখা যায়, নৈনীতাল পড়ে আছে অনেকটা যেন চৌবাচ্চার মধ্যে। কিন্তু মুসৌরী একেবারে খোলা। হঠাৎ চূড়াটা উঠেছে যেন যূথভ্রষ্ট হয়ে, চারিদিকে খোলা অবকাশ। 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর চূড়া আছে পাশেই, কিন্তু সেটা অবরোধ নয়। 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর আগে নাম ছিল 'গান-হিল'। ওখান থেকে আগে বেলা বারোটায় কামান দাগা হোত, শহরবাসীরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত। কিন্তু তার জন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে এমন আচমকা কাঁপন লাগত যে, শহরের লোকরা ওটাকে আর পছন্দ করল না। এখন আর কামানের আওয়াজ নেই।

লাণ্ডুরের উত্তর-পূর্বে 'টপ্ টিব্বা' হলো মুসৌরী অঞ্চলের সর্বোচ্চ চূড়া। এটির উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফুটের ওপর। এই চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে শুধু দূরের বন্দরপঞ্চ নয়, একে একে নীলাঙ্গ, শ্রীকান্ত, সতোপন্থ, কেদারনাথ, কামেত, বদরিনাথ,—প্রায় প্রত্যেকটি চূড়া দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আকাশ পরিষ্কার ও নির্মেঘ থাকলে আরও দূরে পূর্বদিগন্তে দেখা যায় পৃথিবীর উচ্চতম চূড়াগুলি। যেমন নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি ইত্যাদি। অনেক সময় কৈলাশ পর্বতের শ্রেণীও এখান থেকে স্পষ্ট আন্দাজ করা যায়।

মুসৌরী থেকে গঙ্গোত্রী যাবার পথ আছে। বহু লোক গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ-টিহরি ধরাসুর পথ যেমন ধরেন, এখান থেকে তেমনি একটি পথ কোড়ি ও লালকৌড়ি হতে ধরাসুর দিকে চলে গেছে। এ পথ নির্জন বনময়, জন্তুজানোয়ারের উপদ্রব আছে,—সেজন

দল বেঁধে যাওয়া নিরাপদ। পথে চড়াই এবং উৎরাইয়ের সংখ্যা কিছু বেশী বলেই যাত্রীরা দেবপ্রয়াগের পথটা ইদানীং পছন্দ করে। এ পথে পাওয়া যায় বহু বিচিত্র বর্ণের অরণ্যপুষ্প এবং ঔষধি-লতাপাতা। কিন্তু দেশীয় প্রকৃতির এই অফুরন্ত সম্পদের প্রতি আমাদের মোহ বরাবরই কম। চলতি পথের বাঁধা অভ্যাসটাই আমাদের প্রিয়, সেজন্য উদ্বেগ এবং আকুলতা নেই। সে যাই হোক, গঙ্গোত্রীর দূরত্ব এখান থেকে একশো ত্রিশ মাইলের বেশী নয়।

কতবার দেখেছি এই পাহাড়ের পথ, কত গিরিনদী আর নির্ঝরিণীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তার জন্য এদের সবাইকে দেখে পুরনো বন্ধুত্বের আস্বাদ যেন পাই। আমি ওদের আশে পাশে গিয়ে ঘুরলে ওরা যেন আমার কুশলবার্তা জানতে চায়। মহাকালের তুলনায় আমি ক্ষণায়ু, ক্ষণজীবী,—কিন্তু ওরা চিরকালের, আদি-অন্তের। আমি নতুন পাখি, নতুন কাকলী শুনিয়ে যাবার জন্য এসেছি ওদের ওই গহনলোকে। শুনতে চায় ওরা কান পেতে, —যেমন শুনে এসেছে হাজার হাজার বছর। ওরা জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এবং কালক্রমিক মানুষের উত্থানপতনের অতীত,—তবু ওরা শুনছে নতুন পাখির কাকলী! আমিও কতবার শুনেছি ওদের ভাষা। নির্ঝরের কলস্বনে, সরীসৃপের ও পশুপক্ষীর কণ্ঠে, ঝিল্লীর ডাকে, পতঙ্গের গুঞ্জনে। শুনে এসেছি ওদের মর্মের ভাষা অনাহত স্তব্ধতার মধ্যে।

এই অঞ্চল থেকেই চলে গেছে আরেকটি পথ যমুনোত্রীর দিকে। এখান থেকে আন্দাজ এক শো দশ মাইল। রাণুগাঁও হয়ে পথ চলে গেছে কুনলারি ও রাজটোরের দিকে। সেখান থেকে কাউনসালি হয়ে খুরসালির দিকে। খুরসালি থেকে যমুনোত্রী দেড় ক্রোশ মাত্র। এখান থেকে চক্রতা রোড ধরে কেম্পটি প্রপাত ছাড়িয়ে নাগটিব্বা পর্বতমালার ভিতর দিয়ে পথ। একেবারে যমুনার কূলে গিয়ে মিলেছে, সেখান থেকে যমুনা উপত্যকা পেরিয়ে চড়াই পথে সোজা উত্তরে চলে যাওয়া। কিন্তু এই পথে প্রায়ই গভীর অরণ্যলোক অতিক্রম করে যেতে হয়। আগে যমুনোত্রী এবং সেখান থেকে খুরসালি, চিনপুলা ও ভৈরংঘাটি হয়ে গঙ্গোত্রী আসাই সুবিধা। পথ অতি দুস্তর এবং দুরতিক্রম্য; ঠাণ্ডায় অতীব কষ্টকর,— তারপর উপযুক্ত খাদ্য এবং আশ্রয়ের অনেকটা অভাব। কিন্তু কোনওমতে যদি দেখে নেওয়া যায় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তবে তা রইল এ-জীবনের গর্বের মতন! যুক্তি ও গবেষণা সহ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে, কৈলাস শিখরশ্রেণী থেকে নেমে এসেছে মূল গঙ্গার ধারা; বিশ্বাস করতে মন যাবে যে, দেবাদিদেবের জটা-জটিলতার মধ্যে "জাহ্নবী তার মুক্তধারায় উন্মাদিনী দিশ হারায়—।" মুসৌরীও গঙ্গোত্রীর পথে হরসিলের কাছে এসে গঙ্গা মিলেছে ত্রিধারায়,—নীলগঙ্গা, হরিগঙ্গা ও গুপ্তগঙ্গা! গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার পথ কষ্টকর—আন্দাজ মাইল পনেরো। ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। এখানে যেমন তুষার নদীর দৃশ্য অতি সুন্দর, তেমনি যমুনোত্রীতেও তুষার নদীর শোভা অতি মনোহর। যমুনোত্রীর উত্তপ্ত ঝরনা যেমন আরামদায়ক, মন্দিরটিও তেমনি আনন্দ দান করে।

মুসৌরী থেকে চক্রতা প্রায় চল্লিশ মাইল এবং দেওবন আরও ধরো ছয় মাইল। চক্রতা থেকে দুটি পথ গেছে শিমলার দিকে। একটি টিউনী ও আরাকোট হয়ে চলে গেছে এঁকেবেঁকে-—প্রায় একশো পঁচিশ মাইল; অন্যটি চক্রতা থেকে সিন্‌গোটা পুল পেরিয়ে চলে গেছে। এ পথে গেলে দূরত্ব কিছু কম। চক্রতা থেকে কোয়াখেরা, তারপর চেপাল ও ফাগু হয়ে শিমলা। অর্থাৎ প্রায় একশো মাইল। মুসৌরী থেকে ঝাল্‌কি হয়ে টিহরী যেতে গেলে বিয়াল্লিশ মাইল পড়ে। টিহরী থেকে নৈনীতালের পথ হলো দ্বারহাট আলমোড়া

রানীক্ষেত ও খয়রনার ভিতর দিয়ে। কোশীর পুল পেরিয়ে যেমন আলমোড়া, খয়রনার পুল পেরোলে তেমনি নৈনীতাল। অর্থাৎ মুসৌরী পাহাড় রয়েছে এমন একটি কেন্দ্রে, যার চারিদিকে হলো একটির পর একটি পার্বত্য রাজ্য। হিমাচল প্রদেশের শিমলা, পাঞ্জাবের কুলু উপত্যকা, এদিকে কুমায়ুনের পর্বতমালা এবং নীচের দিকে দেরাদুন ও শাহারানপুর। মনে হয়, মুসৌরীর ওপারে এসে দাঁড়ালে একদিকে গাড়োয়াল এবং অনদিকে হিমাচল প্রদেশ যেমন দেখা যায়, তেমন অন্য কোথাও থেকে সম্ভব নয়।

আমার মনে ছিল অস্বস্তি। বোধ হয় কিছু যেন বাকি থেকে যাচ্ছে। দেখা মানেই ত সঞ্চয়,—সঞ্চয়ের ঝুলি শূন্য না থেকে যায়। পাহাড়ের নিজস্ব ভাষা কিছু নেই, কিন্তু তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করুক আমার মধ্যে। আমি সেখানেই সার্থক। হিমালয় তার দিকদিগন্ত জোড়া মহাকাব্য কাহিনী মেলে ধরে রয়েছে, তুমি কেবল তাকে প্রকাশ করো! তোমার মধ্যে তার অভিব্যক্তি, তার মহিমা। বিশ্বব্যাপী হয়ে রয়েছে বিপুল সৃষ্টি, তুমি দেখছ তার পিছনে স্রষ্টার সঙ্কেত। স্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তুমি উপলব্ধি করছ তাকে। এটা তোমার অন্তরের মহিমা, তোমারই নিজস্ব অভিব্যক্তি। ঈশ্বর আছে কি না, সে কথা থাক। আমি কৌতূহলী এই আমার পরিচয়, আমি সংশয়বাদী। আমি জানিনে কোন্‌টার থেকে জ্ঞানের জন্ম,—বিশ্বাস না সংশয়? বুদ্ধি, না যুক্তি? উপলব্ধির থেকে জ্ঞান,—এ বরং বিশ্বাস্য! ইনট্যুইশন থেকে দিব্যদৃষ্টি,—যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস করি! কিন্তু ভক্তি থেকে বিশ্বাস,—এ অসম্ভব! অন্ধ ভক্তি কোথায় টানে, এ আমি জানি। পাহাড়ে পাহাড়ে আমি প্রতিফলিত, তাই আমার এই আনন্দ! আমার মধ্যে প্রতিফলিত হিমালয়, ওইতেই আমার অন্তর্যামী আনন্দিত। আমি খুশী করতে চাই আমার মধ্যের আমিকে। সেই আমি কাঙাল, সে হাত পেতে বেড়ায় হিমালয়ে, সে কেঁদে বেড়ায ভূভারতে! আত্মতুষ্টি সাধনের জন্য প্রতি পাথরে সে দিয়ে যাচ্ছে আলিঙ্গন, প্রতি অবণ্যপুষ্পের পল্লবে নিবিড় চুম্বন, প্রতি নির্ঝরিণীতে তার প্রেমের অঞ্জলি, প্রতি চূড়ায় তার অনুরাগের অর্ঘ্য! আমি বোধ হয় প্রস্তরপ্রেমিক, তাই আমার হিমালয় দেখা কোনমতেই শেষ হয় না। যখনই দেখি, তুমি নতুন! তোমার অঙ্গে অঙ্গে অভিনবত্ব, তুমি মোহিনী মায়া, তাই আমার দুই চোখে ঘন অনুরাগ। আমার লুব্ধ দৃষ্টি তোমার বর্ণাঢ্যতার দিকে! আমার বন্যক্ষুধা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তোমার সামনে এলে! তোমার কঠিন প্রকৃতির স্তবকে স্তবকে আমার মৃত্যু যেন নেচে বেড়ায়,—আমার হিংস্র ভালোবাসা যেন তোমার প্রতি অঙ্গে নখরের আঘাত হানতে থাকে, ধারাল দাঁতের দংশনে তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করে। তুমি আমাকে কতবার নিয়ে গেছ তোমার ওই অন্ধ গুহাগহ্বরের প্রেতচ্ছায়াময় মৃত্যুর মধ্যে, নিয়ে গেছ তোমার সুশ্যাম বসন্তকাননে মন্ত্রবশীভূত করে, নিয়ে গেছ তোমার নিভৃত রহস্যনিকেতনে,—আমার কাছে প্রকাশ করেছ তোমার মর্মকাহিনী! আমি সেই ভিক্ষু আনন্দ,—তোমার ওই অন্তহীন মহিমার মধ্যে আমি বার বার নবজন্ম লাভ করে ফিরেছি।

রাজা প্রদ্যুম্ন শার পুত্র সুদর্শন শার কাছ থেকে জনৈক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যক্তি দেরাদুন উপত্যকাটি খরিদ করেন। তিনি আবার এই উপত্যকাটি বাৎসরিক বারো শত টাকা খাজনা পাবার সর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করেন। এর কিছুকাল পরে নেপালের গুর্খারা এই উপত্যকাটির লোভে বৃটিশ সিংহের ল্যাজ ধরে টান দেয়। পশুরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে গুর্খা দলের উপর আক্রমণ করে এবং নেপাল ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। মুসৌরী তখন দেরাদুনের অন্তর্গত, কিন্তু তদানীন্তন মুসৌরীতে দেরাদুনের হিংস্র

শ্বাপদের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করতো, মানুষের চিহ্ন কোথাও ছিল না। আজও শীতের তিন মাসের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের দল আসে মুসৌরীর পাহাড়ে পাহাড়ে,—যখন পাহাড় ছেড়ে শীতের ভয়ে সবাই চলে যায় নীচের দিকে এবং সমগ্র শীতকালটায় সমগ্র মুসৌরী ও লাণ্ডুর প্রায় তিন ফুট উঁচু বরফে সমাচ্ছন্ন থাকে। সে যাই হোক, একথা সত্য, গত একশো বছরে মুসৌরী শহরটি সাহেবসুবার হাতেই এক প্রকার গড়ে উঠেছে। এক ডালহাউসী ছাড়া সম্ভবত আর কোনও পার্বত্য শহরে এমন সর্বাঙ্গীণ সাহেবি চেহারা দেখা যায় না। এ শহরের আগাগোড়া প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় প্রকৃতির যোগাযোগ একপ্রকাব নেই বললেই হয়। এই সেদিন অবধি পাউন্ড ওজনে খাদ্য এবং ইংল্যান্ডের ওজনে আবহাওয়া চালু ছিল। স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকাংশই সাহেব-মেমদের পরিবার, শ্মশানের বদলে সাহেবদের গোরস্থান, লাইব্রেরী বলতে অ-ভারতীয় বই, কাগজ বলতে স্টেটসম্যান এবং ধর্মমন্দির বলতে গির্জা। ওরা শীতপ্রধান দেশের লোক, সুতরাং এদেশের প্রত্যেকটি পার্বত্য শহরে—যেখানে প্রচুর ঠাণ্ডা—এক একটি খণ্ড ক্ষুদ্র ইংল্যান্ড তৈরী করে তুলেছিল। এমন সুন্দর ও সুসজ্জিত ফুলের বাগান, লতাবিতানে ছাওয়া এমন চমৎকার এক একটি বাংলো, এমন সুরুচিপূর্ণ ও সুশ্রী জীবনযাত্রা—আর কোনও পার্বত্য শহরে এমন বিস্তৃতভাবে আমার চোখে পড়েনি। এটা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত হলেও এখানে উত্তর প্রদেশীর সংখ্যা ছিল অতি কম, কারণ তাদের অতিশয় হিন্দুয়ানি এখানে তাদের বসবাসের পক্ষে ছিল পর্বতপ্রমাণ বাধা। সেই কারণে পাঞ্জাবী ও মুসলমানরা এখানে জায়গা পেয়েছিল বেশী। বলা বাহুল্য, সর্বত্রগামী মারোয়াড়ীরা পশ্চাৎপদ ছিল না।

বিদ্যালয় মানেই ইংরেজি স্কুল—ইংরেজিই তার মাধ্যম। এদেশের একটি ছেলেমেয়েকেও তারা জায়গা দিতে নারাজ ছিল। তাদের বই ছেপে আসতো বিলেত থেকে। ইতিহাস পড়তো বিলেতের। ধর্মগ্রন্থ মানে বাইবেল। পরিচ্ছদ বিলেতী বস্ত্র। কোনও নেটিভের সঙ্গে কোনও সামাজিক যোগ ছিল না। এখান থেকেই তৈরী হত ভবিষ্যৎ আর্মি অফিসার, ভাইসরয়ের স্টাফ, জেলা শাসক, পুলিসের কর্তা এবং নিউ দিল্লীর সেক্রেটারীর দল। ওরাই হোত ভারত সাম্রাজ্যের রক্ষক। কোনকালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ এক পা নড়বে না, এই কথাটা মনের সামনে রেখেই তারা কায়েমী স্বার্থের কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু হায়, "তবু চলে যেতে হয়, তবু ছেড়ে চলে যায়।" আমার এক বন্ধু বলেন, মৌমাছির অসহ্য দংশনে অস্থির হয়ে পশুরাজ পালালো। ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছিল একশো বছরও নয়, দুশো বছরও নয়,—মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর! অর্থাৎ ১৯১২ থেকে ১৯৪৭। তাও স্বদেশীদের যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে। এদেশের মন পাবার জন্য ওরা 'হেঁট মাটি ওপর' করেছে। দেড়শো বছর ধরে ওদের লাঠালাঠি শেষ হয়নি। সন্ধির পর সন্ধি করে নানা জাতকে ওরা নিরস্ত করেছে। নপুংসক দেশীয় রাজাদের মাথায় মুকুট পরিয়ে তাদের দরজায় দারোয়ানি করে এসেছে এতকাল। মাথায় করে কাপড় বয়ে এনেছে, পাড়ায় পাড়ায় ইস্কুল বসিয়েছে, মেয়েদের মন পাবার জন্য টয়লেট তৈরী করে এনেছে,—ওরা করেনি এমন কাজ নেই। তারপর বসালো দিল্লীর দরবার। মনে করল কপালের ঘাম মুছে এবার থেকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজ্যপাট ভোগ করবে। কিন্তু বিধি বাম। ভবীর মন কিছুতেই ভুললো না। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পালিয়ে বাঁচল। সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি সবচেয়ে কম সময় টিকে ছিল। ভাগ্যের এমন পরিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

কয়েকটি জলপ্রপাত আছে মুসৌরীতে। যেমন ভাট্টাপ্রপাত,—ভাট্টা গ্রামের কাছাকাছি।

এখান থেকে মুসৌরীর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। শহর থেকে নীচে কার্ট রোড ধরে অনেকটা পথ গেলে তবে এটি দেখা যায়। আরেকটি আছে হার্ডি প্রপাত—ভিনসেন্ট পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে। কিন্তু অনেকটা দুস্তর পথ পেরিয়ে যেতে হয়। এ দুটি ছাড়াও বার্লোগঞ্জের ওদিকে রয়েছে মসি ও হিয়ার্সি প্রপাত,—কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছবার পথ হলো একটি বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে। অন্য আরেকটি আছে, তার নাম মারী প্রপাত,—সেটি লাণ্ডুর থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল পড়ে।

আমরা একদিন স্থির করলুম, কেম্পটি জলপ্রপাত দেখতে যাব। কৃষ্ণা দেবী সানন্দে সঙ্গে চললেন। আমাদের হোটেল থেকে আন্দাজ সাড়ে সাত মাইল পথ। সকালবেলায় আমরা যাত্রা করলুম। পাচক শ্রীমান গোবর্ধন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের উপকরণ সঙ্গে নিয়ে চলল।

এটি চক্রতা যাবার পথ। কিন্তু এপথে মোটর চলে না। পথ সঙ্কীর্ণ এবং অধিকাংশই উৎরাই। এমনই উৎরাই—যেন পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলে। শরৎকালের যাত্রীর মরসুম শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং প্রায় সমস্ত পথই জনবিরল। সাদা কেডস্ জুতো পায়ে দিয়ে কৃষ্ণা চললেন স্বচ্ছন্দ গতিতে। তিনি স্বভাবতই আত্মগত। আমরা আলাপ করি, তিনি শোনেন প্রসন্ন মনে। ওতেই ওঁর সায় আছে। বনময় পথ আমাদের অজানা, সেই বন ঘন হতে থাকে যতই আমরা এগোই। শীতের দিন, তাই আমাদের ক্লান্তি কম। সমস্ত পথটা এসে পৌঁছতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগলো। কেম্পটিতে একটি ছোটখাটো ডাকবাংলা এবং বারান্দা রয়েছে। আন্দাজে পাই, এ অঞ্চলটা মুসৌরী থেকে প্রায় হাজার দুই ফুট নীচে। সুতরাং রৌদ্রে খানিকটা তাপ আছে। সামনের পাহাড়ের মধ্যে একটি চক্রাকার ক্রোড়গর্ভ, অনেকটা অশ্বক্ষুরের আকৃতি। তারই একটি বিরাট পর্বতশীর্ষ থেকে স্ফীতকায় একটি জলপ্রপাত নীচের দিকে পড়ছে ঝরঝরিয়ে। আশেপাশে ছোটখাটো প্রপাতও আছে দু'একটি। নীচে গিয়ে তারা জলাশয় সৃষ্টি করছে। আসামের চেরাপুঞ্জীতে দেখেছিলুম এই দৃশ্য, হস্তীপ্রপাতে ও গিরিডির উশ্রী প্রপাতে, দার্জিলিংয়ের পাগলাঝোরায় এবং কাশ্মীর যাবার পথে জম্মুর বিশাল পর্বতশ্রেণীতে,— যেটাকে বলে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা। এখানে লোভনীয় পরিবেশ তেমন কিছু নয়। দু'চারজন 'ভিজিটর' মেয়ে পুরুষ দেখা গেল বটে, কয়েকজন মিলে হট্টগোলও করলো,—যদিও এখানে পরিভ্রমণের সুবিধা তেমন বিশেষ কিছু নেই। তবে কিনা ভুনি-খিচুড়ি সহযোগে ওখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আসরটা জমে উঠেছিল বটে। বলা বাহুল্য আমাদের আহার্য-তালিকায় হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটেছিল।

জলহাওয়ার গুণে আমাদের পরিপাকশক্তি যত প্রবলই হোক, ফিরবার পথে আমাদের অবস্থাটা ছিল কষ্টকর। উদরপূর্তির ফলে পা চলে না সহজে এবং চড়াই পথে ওটাই নিষিদ্ধ। পাহাড়ে চলতে গেলে কখনও যে পেট ভরে খেতে নেই, একথা মনে রাখার দরকার ছিল। সেই প্রমাদের জন্য ফিরে আসতে লেগেছিল চার ঘণ্টারও বেশী। কৃষ্ণাদেবী যেমনই ক্লান্ত তেমনি ঘর্মাক্ত, এবং আমরা,—থাক্, বর্ণনায় আর কাজ নেই। হোটেলে ফিরে ঘণ্টাখানেক অবধি কেউ কারো সঙ্গে আর কথা বলিনি। সেটা কৃষ্ণপক্ষ। সন্ধ্যার পরে তারকায় ছেয়ে গেল আকাশ এবং সে-আকাশ যেন আমরা হাত বাড়ালে পাই। কিন্তু নীচেকার দৃশ্যও আরও অপরূপ। আমরা বেছে বেছে এমন একটি হোটেলে উঠেছিলুম, যেখান থেকে সমগ্র দেরাদুন উপত্যকা ঘাড় ফেরালেই দেখে নিতে পারতুম। সন্ধ্যায়

দেরাদুন শহরে জ্বলে উঠেছে আলোর মালা। সাত হাজার ফুট উঁচুতে একটি জায়গায় বসে নীচের তলাকার সেই দীপাবলীর দৃশ্য বিস্ময়ের মতো চোখে লেগে থাকে। এমন একটা দৃশ্য দেখেছিলুম বোম্বাইয়ের মালাবার পাহাড়ের উপর সেই হোটেল থেকে নীচেকার সমুদ্রের দিকে। সেখানে সমুদ্রের কোলে সমগ্র বোম্বাই অর্ধচন্দ্রাকার, তার ভিতর দিয়ে এসেছে মেরিন্ ড্রাইভ। সন্ধ্যার পরে অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমের কোলে দীপমালা জ্বলে উঠেছে। স্থানীয় লোকেরা ওই গোলাকার বৃত্তের নাম দিয়েছে 'কুইনস্ নেক্‌লেস'। দুই চোখ-ভরা বিস্ময় ছিল আমার।

হঠাৎ পাশ থেকে কৃষ্ণাদেবী আক্রমণ করলেন। বললেন, পুরুষকে খুশী করা আমাদের প্রাণের দায়!

তাঁর বাক্যবাণে আমরা দুজনেই ধাক্কা খেলুম। শশাঙ্ক প্রশ্ন করল, কেন বলুন তো?

তিনি বললেন, চোখ দুটো শান্ত থাকলে তবেই ত দেখবেন! কেম্পটি ফলস্-এ গিয়ে কি মিথ্যে হয়রানি হলো না? সবাই মিলে নাস্তানাবুদ!

বললুম, আপনি যে কষ্ট পাচ্ছেন জানতে দেননি কেন?

কষ্ট পাচ্ছিলুম আপনাদের কষ্ট দেখে!

আমরা খুশী থাকবো, আপনি কি এইজন্যে গিয়েছিলেন?

কৃষ্ণা এবার হাসলেন। বললেন, দোহাই, চটে যাবেন না। কিন্তু এবার থেকে আমি না বললে আপনার আর কোথাও যাওয়া হবে না।

মানে? আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

তিনি বললেন, বলুন ত শশাঙ্কবাবু, যেখানে কিচ্ছু পাওয়া যায় না, সেখানেই উনি হাত বাড়াতে যান কেন? কী উনি পেলেন কেম্পটি ফলস্-এ?

শশাঙ্ক বলে বসলো, ওর ওটাই দোষ। সব সময় ধরতে যায়, যেটা ধরা যায় না! যেখানে কিচ্ছু মেলে না, সেখানকার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ!

আমরা উচ্চকণ্ঠে সবাই হাসতে আরম্ভ করে দিলুম। সমাজের মাঝখানে এসে বসলে শশাঙ্ক চিরকালই আমার বিপক্ষ দলে যোগ দেয়। আমাকে নিয়ে তামাসাই ওর কৌতুক।

বিজয়গৌরবে কৃষ্ণা বললেন, কাল থেকে প্রোগ্রাম তৈরীর ভার আমার আর শশাঙ্কবাবুর হাতে থাকবে!

হাসিমুখে বললুম, তাহলে আমার সন্দেহ এতদিনে সত্যে পরিণত হলো?

কি সন্দেহ?

থাক, শুনে কাজ নেই!—আমি ওঠবার চেষ্টা করলুম।

ওরা দুজন আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। আমি সিগারেট ধরালুম। দেখতে দেখতে কৃষ্ণাদেবীর অবস্থাটা কাহিল হয়ে উঠল। অধীরকণ্ঠে তিনি বললেন, কী বলছেন আপনি ছেলেমানুষের মতন? কিসের সন্দেহ?

নাটকটা যখন জমে উঠেছে বেশ, তখন বললুম, এ ক'দিন আপনার ছদ্ম গাম্ভীর্যের কথাটাই বলছিলুম!

ওঃ তাই ভালো। ভয় পেয়েছিলুম!—আবার আমাদের মধ্যে হাসির রোল উঠল।

নবম পরিচ্ছেদ

হিমাচল শিমলা ও কিন্নরক্ষেত্র

সিন্ধু আর শতদ্রুর মতো বন্য ও পার্বত্য নদী ভারতে তৃতীয় আর নেই। ডায়েরীতে একদা লিখেছিলুম—গঙ্গা হলেন রাজতরঙ্গিনী, কিন্তু শতদ্রু আমার বিস্ময়! আদিতে বিস্ময়, অন্তেও বিস্ময়। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে শতদ্রু। তিব্বত থেকে সে যাত্রা করেছে। কৈলাস পর্বত শ্রেণীকে কেটেছে, তারপর জাস্কার, তারপর ধবলাধার, শূলশৃঙ্গ ও শিবলিঙ্গ পর্বতমালা—অর্থাৎ সমগ্র হিমালয়কে কাটতে কাটতে এসে পাঞ্জাবের বিলাসপুরে মোড় ঘুরেছে। আশ্চর্য নদী। সবাইকে টেক্কা দিয়ে পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে সোজা নেমে গেছে দক্ষিণে, তারপর সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আরব সমুদ্রে। বন্য শতদ্রু আজ শৃঙ্খলিত হতে চলেছে বাখ্ড়া-নাঙ্গালে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অবাক হয়ে শতদ্রুর দিকে চেয়ে থাকে।

বিলাসপুরের দিকে যখন শতদ্রু এলো, তখন সে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। মুশকিল এই, পার্বত্য পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ এমন একাকার যে, কোন্ তহশীল কার মধ্যে, হঠাৎ বলা কঠিন। চাম্বা যদি হিমাচল প্রদেশে হয়, তবে কাংড়া ও কুলু এসেছে পাঞ্জাবে—এটা শুনতে অবাক লাগে। একটার সঙ্গে একটার সংযোগ নেই কোথাও। পশ্চিমবঙ্গের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে গেলে বিহার অথবা পূর্ববঙ্গ পেরিয়ে যেতে হয়, তেমনি হিমাচল প্রদেশে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে গেলে পাঞ্জাব না মাড়িয়ে উপায় নেই। পেপসুও প্রায় তাই এবং পশ্চিম ভারতে বরোদাবও ওই একই নমুনা। এর ফলে এই হয় যে, বাইরের থেকে কোনও প্রকার আঘাত এলে প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি বিস্ময় বোধ করেছিলুম যখন শিমলাকে আনা হলো হিমাচল প্রদেশের মধ্যে। কেননা, হিমাচল প্রদেশের মূল প্রকৃতি হলো রাজপুত এবং সিমলার হলো পাঞ্জাবী। বিচ্ছেদটা কামনা করিনে, কিন্তু মিলনটা বিস্ময়কর। পাঠান আর মোগলের আমলে হাজার হাজার রাজপুত পরিবার পালিয়েছিল হিমালয়ে পাঁচ ছশো বছর আগে। স্থানীয় লোককে হটিয়ে তারা আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য, শিক্ষা এবং সুশাসনের গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এইভাবে নেপালও যেমন গড়ে ওঠে রাজপুতের হাতে, তেমনি উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের মাঝামাঝি পার্বত্য অঞ্চল—যেটাকে আজ নাম দেওয়া হচ্ছে হিমাচল—সেটাও রাজপুতরা আগে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এর ফলে খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন বহু ছোট ছোট রাজ্য একে একে গড়ে ওঠে। দু-চারটি পাহাড় নিয়ে এক একটি রাজ্য—আশেপাশে কোন নদীর সীমানা এবং এইটিই প্রধান—ব্যস্, প্রত্যেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র! এই প্রকার একুশটি ছোট বড় রাজ্য নিয়ে আজ হিমাচল প্রদেশ গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে চাম্বা, মণ্ডি, বিলাসপুর, শিরমুর—এরাই হলো বড় বড়।

শিমলাতে বাস করেছিলুম কিছুদিন। ওটা নাকি এই সেদিনও পাতিয়ালার মহারাজার জমিদারীর মধ্যে ছিল, কিন্তু ইংরেজ গভর্নমেন্ট ওটা নিজের দখলে রাখেন। পাঞ্জাবে গরম

হলো অসহনীয়, সেজন্য পাহাড়ী শহর না হলে সাহেবদের চলতো না। এই সূত্রে অ্যালান্ ক্যাম্বেল জনসনের "Mission with Mountbatten"—বইখানার একটি পৃষ্ঠা মনে পড়ে। পূর্বপাকিস্তান জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ইংরেজকে গভর্নরের পদটি নেবার জন্য জিন্না সাহেবের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এলাকায় শিলং ও দার্জিলিং পড়েনি বলেই সেই ইংরেজ ভদ্রলোক চাকুরি নেননি। সে যাই হোক, পাতিয়ালার প্রাসাদ আছে বটে শিমলায়, তবে তিনি তখন বাস করেন চাইল্ শহরে। শিমলা থেকে চাইল্ দেখা যায় রাত্রের দিকে, যখন চাইল্-এ আলো জ্বলে। দিনের বেলায় অস্পষ্ট।

পার্বত্য শহরের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র শিলং, যেখানে পৌঁছলে একথা মনে হয় না যে, পাঁচ হাজার ফুট ওপরে বাস করছি। কেননা, পথঘাট আশ্চর্য রকম সমতল সেখানে। অন্য কোন হিল্'স্টেশনে সে সুবিধা নেই। অবশ্য শিলং হলো হিল্ সিটি, হিল্ স্টেশন নয়। শিমলা এর বিপরীত। যতদূর মনে পড়ছে, উচ্চতায় শিমলা সাত হাজার ফুটেরও বেশি এবং মুসৌরী ও রানীক্ষেতের মতো শীতের দিনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে এবং তুষারপাত হয়। কোন কোন বছরে শিমলায় চার-পাঁচ ফুট অবধি বরফ পড়ে। শিমলায় যাবার পথঘাটও খুব সোজা নয়। কেননা, মণ্ডি, চাম্বা অথবা বিলাসপুর থেকে শিমলায় পৌঁছতে গেলে যে পরিমাণ দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হবে, তাতে রাজধানীর সঙ্গে নিত্য সংযোগ রাখা খুবই দুরূহ। উত্তুঙ্গ পর্বত, অনধ্যুষিত উপত্যকা, ভীষণ অরণ্যানী এবং দুরতিক্রম্য নদীনির্ঝরিণীর দ্বারা একটির সঙ্গে আরেকটি চিরকাল বিচ্ছিন্ন।

কাল্কা থেকে শিমলা পর্যন্ত রেলপথ, তার সঙ্গে আছে রেল-মোটর এবং তারই পাশে পাশে প্রশস্ত কার্ট রোড। যেমন দার্জিলিংয়ে, কিংবা গৌহাটী থেকে শিলং, অথবা কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ার পথ। পথ আঁকাবাঁকা, বন্ধুর, অনেকগুলি লুপ, অনেক টানেল্—যতদূর মনে পড়ে। এই পার্বত্য পথে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল রয়েছে। একটি হলো ডগ্সাই— যেখানে ভারতীয় সৈন্যদলের অফিস। একটি হলো সোলন,—যেখানে ভারতপ্রসিদ্ধ মদ্য প্রস্তুতের কারখানা। তৃতীয়টি হলো কসৌলী—কুকুরে কামড়ালে যেখানে বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়; এবং চতুর্থটি ধরমপুর—যেখানকার হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগীরা আশ্রয় পেয়ে থাকে। সমতল পাঞ্জাবের ধূলিধূসরতা থেকে দূরে, পর্বতের নিভৃত বনমর্মরতার মধ্যস্থলে ধরমপুর অতি মনোরম স্থান। কার্শিয়াংয়ের হাওয়ায় জলীয় অংশ বেশি, এমনকি, নৈনীতালের ভাওয়ালীও হয়ত অনেকের পক্ষে স্যাঁতসেঁতে মনে হতে পারে, কিন্তু ধরমপুরের শুষ্ক এবং স্বাস্থ্যকর বায়ু ও জল বাঙালীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারী। এখানকার পারিপার্শ্বিক পার্বত্য বনভূমি, নানা বর্ণের অজস্র হিমালয়ের পাখি, নির্ঝরিণীর কলমুখরতা—যে কোন পর্যটকের কাছে অমরাবতীর সংবাদ এনে দেয়।

কাল্কা থেকে শিমলা মনে হচ্ছে আন্দাজ ষাট মাইল পাহাড়ী পথ। বিস্ময় লাগে, এই পথ এককালে যারা জরীপ করেছিল! তারা নমস্য সন্দেহ নেই। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে দেহাতিদের পায়েচলা পথ, সে ত সংখ্যাতীত, তেমনি জটিল—কিন্তু কিছুতেই এবং কোনমতেই যেখানে পথের আন্দাজ পাওয়া যায় না, সেখানে প্রত্যেকটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পারস্পরিক সংযোগ আবিষ্কার করা, এ-কাজ অতিমানবিক। এখানেও ঠিক দার্জিলিংয়ের মতো। রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে মোটর-পথ। নেউল যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, তেমনি এখানেও মোটরের সঙ্গে ট্রেনের খেলা! উভয়ে কখনও অদৃশ্য, অর্থাৎ উভয়েই হারিয়ে গেছে পার্বত্য বনপথে; কিন্তু যথাসময়ে সহসা আবার দেখা হয়ে গেল।

যাকে বলে, শেষ পর্যন্ত নেউলের হাতেই সাপের পরাজয়। মোটর আগে গিয়ে পৌঁছয় শিমলায়। শিমলার প্রবেশপথে আছে অক্‌ট্রয়, সেখানে একটা খানাতল্লাসীর ব্যাপার থাকে, তারপর পোল্‌-ট্যাক্সের কথা ওঠে। অতঃপর ছাড়পত্র সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাবের (বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের) এবং ভারতের পার্বত্য রাজধানীতে মাথা গলানো যায়। পাহাড়ের দুই প্রান্তের দুটি মালভূমির উপর প্রদেশের গভর্নর এবং ভারতের ভাইসরয়ের আবাসভূমি ছিল। অতি স্পষ্টত এটি হলো ইংরেজের গ্রীষ্মাতঙ্ক। ওয়েস্ট রীজের পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে মাসোব্রায় হলো বড়লাটের প্রাসাদ, প্রাসাদেব নাম 'রিট্রীট্‌'। এই রিট্রীটে' পাইন বনের নীচে চায়ের আসরে বসে ভারতের ভাগ্য বহুবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এখানকারই একটি নিভৃত কক্ষে বসে কোন এক শেষ রাত্রে পণ্ডিত নেহরু পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজী হয়েছিলেন!

ওই ওয়েস্ট রীজের দিকে, অর্থাৎ আপার শিমলার কেন্দ্রীয় পরিষদের কাছাকাছি ব্রাহ্ম মন্দিরের পাশ কাটিয়ে নীচেব দিকে একটি বাড়িতে বাস করেছিলুম অনেকদিন। এখান থেকে চক্রাকারে ঘুরে গেছে শিমলা শহরের পথ। ওদিকে হলো লোয়াব শিমলা। এধার দিয়ে পথ চলে গেছে যক্ষ পর্বতের দিকে। ওখানে যাব চলতি নাম হলো 'জ্যাকো হিল'। ওখানে পরিশ্রম করতে যায় অম্লরোগীর দল, আব মেহনতি মেয়েপুরুষ। সমগ্র পাহাড়টি পরিভ্রমণ করতে গেলে মাইল আষ্টেক হাঁটতে হয়। ওখানকার মায়াকাননের আশেপাশে অনেক উর্বশী বাঁকা নয়নে টেনে নিয়ে যায় অনেক আধুনিক বিশ্বামিত্রকে। এদিকে ম্যাল ধবে সোজা চলে গেলে একটি নির্বিবিলি অঞ্চলে বাঙালীসমাজ পরিচালিত কালীবাড়ি। এই কালীবাড়ি স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সবকারের চেষ্টায় এক সময়ে প্রচুর উন্নতি লাভ কবে। তিনি তৎকালীন সরকার তরফের লোক হলেও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বাঙালী সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। কীর্তির্যস্য স জীবতি।

আমি ছিলুম বন্ধুবর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসুর অতিথি। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যসমালোচক। কিন্তু তিনি অধুনা পরলোকে। তাঁর কথা অন্যত্রও বলেছি। তাঁর কাঠের বাংলোটি ছিল শিমলাব পাহাড়তলীব এক নিভৃত বনময় অঞ্চলে। তিন দিকে সুউচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর, নীচেব দিকে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা, আশেপাশে সুবিশাল পাইন, শাল ও চিড়ের ছায়ানিবিড় নিকুঞ্জলোক। কিন্তু অমন নিভৃতবাসের মধ্যেও আমাদেব কয়েকজনকে মিলে একটি দল গড়ে উঠেছিল। বরিশালের নেতা শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত, যিনি স্বর্গত অশ্বিনীকুমাব দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র—তিনি ছিলেন নাটের গুরু। সুরসিক এবং পণ্ডিত। এদিকে সাংবাদিক সত্যেনের কাছে আসতেন সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুত দুর্গাদাস, আসতেন শ্রী ভি ভি গিরি--এই সেদিনও যিনি মন্ত্রী এবং পবে সিংহলের ভারতীয় হাই-কমিশনার ছিলেন। আর আসতেন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গত সত্যমূর্তি, প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ, সুদর্শন শিল্পী শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন এবং আরও অনেকে। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী বসু,--অধুনা পরলোকগতা। কবি অজিত দত্তের শ্যালিকা শ্রীমতী মিণ্টু ও তাঁর এক বান্ধবী শ্রীমতী রমা নন্দী। এছাড়া আরেকজন ছিলেন শ্রীমান পাতঞ্জলি গুহঠাকুরতা। কিন্তু সেদিন সে আমাদের কাছে 'বলাই' নামে খ্যাত ছিল, পাতঞ্জলি হয়ে ওঠেনি। আরেকটি সুদর্শন তরুণ ছাত্র আসতো আমার কাছে মাঝে মাঝে, তার নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। অপ্রাসঙ্গিক যদি না হয় তবে বলি, সেদিনের সেই প্রভাত পববর্তীকালে বিবাহ করে বলাইয়ের সহোদর

ভগ্নী শ্রীমতী অরুন্ধতী গুহঠাকুরতাকে—যিনি 'মহাপ্রস্থানের পথে' চিত্রে 'রানীর' ভূমিকায় অভিনয় করে প্রথম অভিনেত্রী যশোলাভ করেন। অতএব আমাদের দলটি সেদিন নেহাৎ ছোট ছিল না। সত্যেনের ঘরে ছিল বিনামূল্যের টেলিফোন, সুতরাং বহু উপভোগ্য কাহিনী টেলিফোনের সাহায্যেও রচিত হতো।

শিমলা থেকে তারাদেবীর ছোট্ট গ্রামটি নিকটবর্তী। যতদূর মনে পড়ছে এখানে একটি কালীমন্দির দেখেছিলুম। যেমন আগে বলেছি, আসামের উত্তর প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে ভূটান, সিকিমের দক্ষিণ অংশ, দার্জিলিং, নেপাল, কুমায়ুন এবং তারপর কাংড়া ও হিমাচল প্রদেশ—সমগ্র হিমালয়ের প্রথম স্তরে শক্তিপূজার আয়োজন। চণ্ডীর পরে এলেন কালিকা, তারপর তারাদেবী, তারপর কিন্নরের ভীমকালী, শাকম্ভরী, মহিষমর্দিনী—এইভাবে চলেছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ধারণা থেকে সমাজ-মনের উৎপত্তি। সেই সমাজ-মন লালন করেছে ধর্মীয় সংস্কৃতি, চিৎপ্রকর্ষ, এবং সমষ্টিগত জ্ঞানলাভের বাসনা। যদি কেউ বলে, আমি বিশ্বাস করিনে, বলুক, কিন্তু বিশ্বাসটা চলে এসেছে। কাল থেকে কালে, যুগ থেকে যুগে। ভারতীয় মনের এই সর্বকালীন ধারাবাহিকতা এখনও অটুট।

শিমলার নীচেই সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট। উর্ধ্বতন কর্মচারীরা এখানে মধ্যে মাঝে শিকারে আসেন এবং অবসর বিনোদনের জন্য কিছুদূরবর্তী আনানদেল্ মাঠে যান ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলতে—শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে নীচের দিকে। যেমন দার্জিলিংয়ের প্রান্তে লেবং-এর মাঠ। বড় শিমলা পেরিয়ে ছোট শিমলার ধার দিয়ে একটা পথ চলে গেছে বয়লুগঞ্জ ছেড়ে প্রসপেক্ট পাহাড়ের দিকে। সে-অঞ্চলটি জনবিরল বলেই বনভোজনের পক্ষে ভারি সুবিধে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে হিমাচল প্রদেশের বিস্তার ও বৃহত্তর চেহারা দেখা যায়।

সরকারী কর্মচারীদেব বাসস্থান, বড় বড় হোটেল এবং বোর্ডিং হাউসে শিমলা শহর সকল সময়েই জনবাহুল্যে গমগম করে। এত অধিক সংখ্যক বাসস্থান বোধ হয় আর কোন পাহাড়ী শহবে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকরা প্রধানত ব্যবসায়ী অথবা শ্রমিক, বাদ বাকি প্রায় সকলেই চাকুবে। তৎকালে এমন অনেক বাঙালী ছিলেন,—যাঁদের মধ্যে অনেকেই উন্নাসিক সমাজের লোক—যাঁরা এই শহরে চিরস্থায়ী বসবাস করে থাকেন। অনেকে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও দিল্লী-শিমলার মোহ আজও ত্যাগ করতে পারেননি। সত্যি বলতে কি, মোহ ত্যাগ করাও কঠিন। জল, বায়ু, আহার, বিহার এবং একটা আনুপূর্বিক স্বাচ্ছন্দ্য—এইটেই শিমলার বৈশিষ্ট্য। এই শহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য পাঞ্জাব এবং ভারত—উভয় গভর্নমেন্টই সুদীর্ঘকাল ধরে মাথা ঘামিয়েছেন।

শিমলার নীচে দিয়ে চলেছে বিস্তৃত কার্ট রোড—যে-পথ দিয়ে শিমলায় প্রবেশ করতে হয়। সমগ্র শহরের পরিশ্রমসাধ্য চড়াই আব উৎরাই ছেড়ে এই পথ চলে গেছে বহুদূর। এই 'হিন্দুস্থান টিবেট রোড' ধরে শিমলা থেকে আন্দাজ একশো মাইল গেলে তিব্বত ও ভারতের সীমানা। কিন্তু এই পথটি অতিশয় দুস্তর। পূর্ব-কাশ্মীরে যেমন কারগিল হয়ে লাডাক যেতে হয় এবং বহু দুর্গম গিরিসঙ্কট এবং অজানা অনামা ও দুরারোহ অঞ্চল পেরিয়ে লাডাকের রাজধানী লে শহরে পৌঁছানো যায়, এখানেও তেমনি। ঘোড়া ঝব্বু, অশ্বতর—এরা ভিন্ন আর কোন বাহন নেই। আহারের আয়োজন নিতে হয় সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি তাঁবু, মাইনে-করা দুটি পথনির্দেশক,—এছাড়া দুঃসাধ্য। ঠিক অরণ্যের মতো,

পাহাড়ে পথ হারানো অতিশয় বিপজ্জনক। পথ যেখানে শাখা-প্রশাখায় বহু বিভক্ত, সেখানে গাইড ছাড়া চলে না—কেননা, কোন পথের কোন সঙ্কেত নেই। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বায়ুর বিশেষ একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছলে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযোগ ঘটতে বাধ্য। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি অল্প পরিশ্রমেও কেন যে ক্লান্তি বোধ করছেন, তিনি নিজেও বুঝতে পারবেন না। সে যাই হোক, এই পথে একশো মাইল পর্যন্ত গেলে তবে হিমালয় প্রদেশের সীমানা। এই সীমানার মধ্যেই বুশাহার রাজ্য পড়ে এবং এই রাজ্যেরই একটি অঞ্চলের নাম কিন্নর দেশ। একদিকে তিব্বত, দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ, পূর্বে গাড়োয়ালে প্রান্ত সীমানা—এবং এ অঞ্চলের গা বেয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আশ্চর্য শতদ্রু নদী—এদেরই মধ্যস্থলে হলো কিন্নর দেশ। বুশাহরের প্রকৃত রাজধানী হলো শরণ, এখানে ভারতপ্রসিদ্ধ ভীমকালীর অতি সুদৃশ্য মন্দির—ভারতীয় ও তিব্বতী স্থাপত্য শিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আগেও আমি বলেছি, পূর্ব-কাশ্মীরে, নেপালে, উত্তর গাড়োয়ালের এবং সিকিম-ভূটানে তিব্বতীয় স্থাপত্য-প্রভাব অতিশয় প্রকট। হিন্দু মন্দির ত দূরেব কথা, মুসলমানের কোন কোন মসজিদও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। অনেক সময়ে তিব্বতী ধরনের হিন্দু দেবদেবী—যেমন শিব, কার্তিক, কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি এদের গঠন ও সজ্জা-পারিপাট্যের মধ্যেও তিব্বতী প্রভাব অনায়াসে মিশে গেছে। অবশ্য হিন্দু দেবদেবীও বিভিন্ন নামে এবং বিচিত্র সংজ্ঞায় তিব্বতে পূজা পেয়ে থাকেন সন্দেহ নেই। শতদ্রু নদীর তীর ধরে প্রাচীন পথ চলে এসেছে তিব্বত থেকে ভারতে। এই পথ বুশাহর রাজ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন এরই ধারে পাওয়া যায় প্রাচীন শহর রামপুর। কিন্তু এই শহর অতিক্রমের পর অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কিন্নব দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ ভারতীয়, অন্যটি তিব্বতীয়। ভারতীয় অংশটা মন্দিরপ্রধান . আচার ও আচরণে যেমন দেখে এসেছি সমগ্র হিমাচল প্রদেশে, তেমনি হিঁদুয়ানী। কিন্তু তিব্বতীয় অংশটা ভিন্নরূপ। এদের ধর্মগুরু হলো লামা। তাদের ধর্মস্থান হলো গুম্ফাজাতীয়, তারা বৌদ্ধ। তাদের চোখ থাকে তিব্বতের দিকে—চেহারায় তিব্বতী, আচার ও ব্যবহার লামাজাতীয়। সেই ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং দৈত্য-দানবের বিরুদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণ। স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্নর দেশ হলো ভারত ও তিব্বতের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ। এই কিন্নরের প্রধান কেন্দ্র হলো 'চিনি'। চিনির দক্ষিণে বিশাল অধিত্যকা অঞ্চল হলো গহন অরণ্যময়। আশ্চর্য, বৃহৎ রঙীন পাখি অবণ্যে অরণ্যে ডাক দিয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত, নীচে দিয়ে অবাধে চলেছে শৃঙ্গশোভী বন্য হরিণের পাল। এছাড়া তিব্বত থেকে নেমে আসে ধূসব বর্ণের ভালুক।

নারকাণ্ডা থেকে রামপুর যাবার পথে কোটগড় পড়ে। একটু বাঁকা পথ। কিন্তু রামপুরের পর থেকেই পথ অরণ্যসমাকীর্ণ। চড়াই উঠেছে, উৎরাইতে আবার নেমেছে। এপথ দিয়ে যাবার কালে সভ্য জগতের কোনও চিহ্ন সহজে মেলে না। বছরের একটা বিশেষ সময়ে ব্যবসায়ীদের ক্যারাভান কেবল আনাগোনা করে। তিব্বত হলো একপ্রকার নিষিদ্ধ দেশ, কিন্তু ভারতেব দরজা চিরদিনই খোলা। কে না জানে, ভারতের দরজা বন্ধ হলে তিব্বতী ব্যবসায়ীদের দুর্গতির শেষ থাকবে না। সেইজন্য তিব্বতীয়দের স্বার্থের দিক থেকেই 'টিবেট্-হিন্দুস্থান রোড' কোনওদিনই বন্ধ হয়নি। রামপুর থেকে ওয়াংটু, ওয়াংটু থেকে চিনি। কিন্তু ওয়াংটু হলো অরণ্যের কেন্দ্র, কোথাও অবকাশ নেই। দেওদার এবং পাইন এবং আখরোটের বন, শাল ও সেগুনের অরণ্য। পর্বতশ্রেণীর তরাই অঞ্চলে ঘন গভীর এই অরণ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কাঠুরিয়াদের ঘর। তারা প্রায় সমস্ত

বছর ধরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কাঠ কেটে বেড়ায় এবং বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ও স্লিপার শতদ্রুর প্রখর নীলাভ জলস্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেয়। সেই কাঠ ভেসে আসে পাঞ্জাবের দিকে। এ ব্যবসা চলেছে যুগযুগান্ত থেকে। ওয়াংটু থেকে চিনি হলো চড়াইপথ। পথের মাঝখানে একটি ঝুলন-সাঁকো। সন্ধ্যার পরে এই সাঁকো দিয়ে এপার থেকে ওপারে বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা চলতে থাকে। এই সাঁকো পেরিয়ে ধীরে ধীরে যেতে হয় চড়াই পথে। রক্তিম আপেলের বন চলেছে, আঙুরের ক্ষেত তার গায়ে গায়ে। মেয়েরা সলজ্জ সুন্দর চোখে তাকায়; আঙুরের মতো টসটসে মুখ, আপেলের মতো আরক্তিম দুটি গাল। সুঠাম দেহখানি নজরে পড়ে না, এমনি করে ঢেকে রাখে সর্বাঙ্গ,—পাছে পথচারীর কোনও গুপ্ত বাসনার দাগ এঁকে যায় সেই কিন্নরীর লাবণ্যলতায়। সভ্য মানুষকে ওরা ভয় পায়।

'চিনি' অনেক উঁচু, হয়ত বা দশ এগারো হাজার ফুট। হঠাৎ সামনে পাওয়া যায় মস্ত উপত্যকা, সমতল আর অসমতল মেলানো। তিনদিক তার চক্রাকার, নীচের দিকে বৃহৎ ভারতবর্ষ। কিন্তু এই আঙুর আর আপেলের প্রান্তর পেরিয়ে সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে আকাশছোঁয়া পর্বত শিখর,—চূড়ার পর চূড়া,—চিরতুষারে সমাচ্ছন্ন। প্রত্যেক চূড়ার নাম তিব্বতী আর ভারতীতে মিলানো, নাম মনে রাখা কঠিন। এখানে, ধরো এক শো মাইলের মধ্যে মিলেছে গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, তিব্বত এবং কাশ্মীর। পাহাড়ের চূড়ার উপর দাঁড়ালে সমস্তটাই দৃশ্যমান। সিকিমে গিয়ে গ্যাংটকেব দরবার গুম্ফার অঙ্গনে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় উত্তরে তিব্বত, পূর্বে ভূটান, পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ,—ঠিক এখানেও তেমনি। এই ভূভাগেবই ভিতর দিয়ে চলে এসেছে শতদ্রুর নানা শাখাপ্রশাখা অসংখ্য বিভিন্ন নামে। ঠিক এইখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে কিন্নরদেশ। উত্তরে দুস্তর পার্বত্যপথ, শস্যতরুলতাহীন তার চেহারা; দক্ষিণে অনন্ত শ্যামশ্রী এবং মাঝে মাঝে অগণিত দেবালয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি লোকবসতির আশে পাশে দেবস্থান।

এত মন্দির ও দেবস্থান কেন হিমালয়ে? এর জবাব পেয়েছিলুম নিজেরই মনে। পার্বত্য শহরের কাছাকাছি যখন আসছি, যখনই এসে পৌঁছচ্ছি একটা কর্মজগতের কোলাহলে,—তখনই দেবালয়ের সংখ্যা কমে আসছে। যখনই দুঃসাধ্য দুস্তর পার্বত্যলোকের দিকে এগোই তখনই এর সংখ্যা যায় বেড়ে! এর কারণ স্পষ্ট। মানুষ একা থাকতে চায় না, মানুষ চায় মিলন। ভালোবাসা দিয়ে বাঁধে, বন্ধুত্ব দিয়ে সেতু নির্মাণ করে, স্নেহের দ্বারা সম্পর্ক লালন করে। দেবালয় হলো সেই মিলনের কেন্দ্রস্থল। এই দেবালয় থেকে শঙ্খের ফুৎকার আর মঙ্গলঘণ্টার আওয়াজ দূরদূরান্তরে চলে যায়; ডাক দিয়ে আসে পাহাড়ে পাহাড়ে, বার্তা পাঠিয়ে দেয় গ্রাম থেকে গ্রামে; প্রতি মানুষের মনে মিলনের চেতনা জাগায়। এই দেবালয় মানুষের মনে আনে নীতিবোধ, সমাজধর্মচেতনা, অন্যায়ের প্রতি অনাসক্তি, শুচিশুদ্ধ জীবনের প্রতি অনুরাগ। একটি বিচারালয় আছে চিনি-তে,—কিন্তু সেখানে না আছে মক্কেল, না আছে মোকদ্দমা। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি—এসব কিছু নেই,—বিচারালয় উপবাস করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিভৃত কিন্নরের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার চেহারা, সন্দেহ নেই, মনের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ আনে। দক্ষিণ কিন্নর নাচে আর গানে মুখর। চাষী মেয়ে নেচে-নেচে গান ধরে আর মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও সে নাচিয়ে বেড়ায়! অলঙ্কার আর আভরণ ফিরিয়ে দিলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটলো,—ব্যস, বাকি জীবন নেচে গেয়ে কাটানো। নেচে এলো

ঘরের বউ শ্রমিকের সঙ্গে। বনকুসুমের কোরক ধরেছে যখন, যখন ঘনশ্যাম অরণ্যতলে নেমে এসেছে নববসন্তের রক্তিম আভা,—কিন্নরীর দল তখন গিয়ে নৃত্যগীত করে এলো তরুণ সুকুমার কাঠুরিয়াদের সঙ্গে। ভিন্ দেশের পর্যটক কিংবা পরিব্রাজক গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে—কটাক্ষবতী নর্তকী এলো এগিয়ে, মধুর বিস্ময়ে ডেকে নিয়ে গেল আপন অঙ্গনে,—আঙুরে, আপেলে, মাখনে, মিষ্টান্নে করলো তার অভ্যর্থনা। তারপরে ওরা মধুর কণ্ঠে গান গাইলো,—সে-গানের ভাষা দুর্বোধ্য, সুরও অপরিচিত, কিন্তু সেই কাকলীকণ্ঠের মর্মস্থলে আছে অনাস্বাদিত উপলব্ধি, আত্মার রহস্য-উচ্ছ্বাস, আনন্দের সুদীর্ঘ জয়ঘোষণা! পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে শতদ্রুর তীরে-তীরে সেই সঙ্গীত সেখানে পরম সত্য, কেননা ওই গানের সঙ্গে সেখানে,—হ্যাঁ, কেবল সেখানেই পরমার্থের আস্বাদ মেলে। পাল পার্বণ উপলক্ষে গানের সঙ্গে নূতন ধরনের নৃত্য,—যেমন কুলু উপত্যকায়,—অসুরের মুখোশ,—পিশাচের, প্রেতের, জন্তুজানোয়ারের। নাচের সঙ্গে প্রাণের প্রবল আগ্নেয় উত্তাপ, যাবে বলে প্যাশন,—অন্যায়কে ভয় দেখানো, পাপকে বিতাড়িত করা, মহতের মৃত্যুকে অস্বীকার করা, পুণ্যের জয়যাত্রার সঙ্গে জনতার স্বীকৃতি মেলানো। আলুথালু হয়ে নাচে কিন্নরী মেয়ে, অঙ্গে অঙ্গে তার নাচের দোলা, নাচে তাব জীবন আব মরণ। সেই নাচের রঙ্গে মেলানো থাকে ঝড়ের তাড়না, বর্ষার বেদনা, বসন্তের যৌবনযন্ত্রণা! সেই নৃত্যরঙ্গের কাঁপন গিয়ে স্পর্শ করে প্রান্তরচারী মেষপালককে, পথচারী ব্যবসায়ীকে, কুটির শিল্পের কর্মচারী তরুণ যুবককে,—ওই সঙ্গে তারাও গান গেয়ে ওঠে দীর্ঘকণ্ঠে। সমগ্র কিন্নরের পার্বত্যালোকে সেই গান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়।

উত্তর কিন্নরে ভিন্ন চেহারা। দক্ষিণের পাপ এখানে না ঢোকে। বিশাল তোরণের তলা দিয়ে এসে প্রবেশ করো, সমস্ত অকল্যাণ রেখে এসো বাইরে। রুক্ষ, ঊষর, উপলবহুল, কঠিন পার্বত্যপথ,—ওইখান দিয়ে এসে আনত বিনয়ে লামাদের পায়ে সাষ্টাঙ্গে পূজা নিবেদন করো এবং আশীর্বাদ মাথায় তোলো। সেই যেমন আগে দেখেছি, এখানেও প্রতি পদে পদে উড়ছে শত শত ছিন্ন কাপড়ের টুকরো,—প্রেত পিশাচের বিরুদ্ধে ওই শ্বেত পতাকা,—ওই পতাকার প্রতি দোলনে প্রার্থনা ভেসে চলেছে গৌতম বুদ্ধের উদ্দেশে, যিনি লামাদের পরম গুরু। প্রতি মানুষ পড়ছে মন্ত্র, যেমন তিব্বতের স্বভাব—প্রতি মানুষের হাতে মণি-চক্র। আশেপাশের পাথরে-পাথরে লেখা—'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।' যে বস্তিটি ওরই মধ্যে একটু বড়, সেখানে একটি গুম্ফা। সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত এবং বাইরে একটি প্রকাণ্ড ঢোলডঙ্কা। মেয়েরা পূজার্থিনী, মুখে চোখে সৌম্যভাব, চেহারা কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও সুশ্রী, মাথার চুল ছাঁটা। সমগ্র জীবন ধরে দেবসেবা, লামাসেবা। লামারাই সর্বাধিনায়ক। লামাদের হাতেই সমাজ-ব্যবস্থা, জীবন-মরণের দায়িত্ব। এই উত্তর কিন্নর দিয়ে তিব্বতের পথ সোজা চলে গেছে গারটকের দিকে শতদ্রুর ধারে ধারে, ড্যাবলিং ছাড়িয়ে এবং 'শিপকি' পর্বতের বিরাট তুষারাচ্ছন্ন চূড়ার তলা দিয়ে। মাঝখানে পড়ে লুক এবং পিয়াং নামক দুটি জনপদ। দেখতে দেখতে দুর্গম পর্বতমালা পেরিয়ে গারটকে গিয়ে এই ক্যারাভান্-পথটি মূল পথের সঙ্গে মেলে। গারটক হলো ভারত আর তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটি। এই শহরের আগে পর্যন্ত দুর্গম এবং অনধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে ভারত ও পশ্চিম তিব্বতের সীমানা সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট। কাগজেপত্রে এবং মানচিত্রে এর কতখানি সমাধান করা আছে বলা কঠিন। গারটক থেকে ক্যারাভান্ পথ গেছে চারিদিকে। দক্ষিণ-পূর্বে কৈলাস ও মানস সরোবরের পথ,—এপথে যায় অনেকে। কিন্তু

ঠাণ্ডার জন্য মৃত্যুভয় এখানে প্রচুর। উত্তরে একটি পথ গেছে সিন্ধুনদের দিকে, যেখানে লাডাক ও কাশ্মীর যাবার প্রধান ক্যারাভান্ পথ। উত্তর-পূর্বে একটি পথ গেছে তিব্বতের হৃদ্‌কেন্দ্রে—যেদিকে থোক্ জালুঙের সোনার খনি। অন্য একটি উত্তরের পথ তাসিগঙ হয়ে মধ্য এশিয়ার দিকে চলে গেছে। সুতরাং গারটক হলো তিব্বত-ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। সম্প্রতি চীন-ভারত চুক্তির মধ্যে গারটকের কথাটাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কৈলাস পর্বতশ্রেণীর প্রায় মধ্য-কেন্দ্রে বিরাট পর্বতচূড়ার উপরে এই গারটক শহর অবস্থিত,—উচ্চতায় পনেরো হাজার ফিটেরও বেশী। আমাদের পরিচিত পৃথিবীর থেকে এই পার্বত্য জগৎ এতই পৃথক এবং এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব বন্য বিস্ময় আনে যে, সমতল জগৎ ও আধুনিক সভ্যতাটাকেই স্বপ্নবৎ মনে হয়। পৃথিবীর আদিম চেহারাটা চোখের সামনে আনে, আনে হাজার হাজার বছর আগেকার একটা অদ্ভুত চেতনা,—এমন একটা দিগন্তজোড়া নির্বাক বিস্ময়, যেটার কথা মনুষ্যসমাজের কাছে গিয়ে বর্ণনা করলে নিজের কানেও অলীক শোনাবে। এমনি একটা উপলব্ধি কাশ্মীরের প্রান্তে জোজিলা গিরিসঙ্কটের কাছাকাছি গিয়ে আমার মনে এসেছিল। ঘোড়া, কিংবা টাট্টু, কিংবা ঝব্বু ও চমরী—যেটা মহিষের লোমশ কুটুম্ব এবং অতি শান্ত নিরীহ জীব,—এরা ছাড়া যানবাহনাদির আর কোনও কথা ওঠে না। পৃথিবীর কোথাও চাকার গাড়ি আছে, কিংবা চর্বির প্রদীপ ছাড়া পেট্রল-কেরোসিন নামক কোনও পদার্থের গন্ধ আছে, এ একেবারে অজ্ঞাত। সম্প্রতি টিবেট-হিন্দুস্থান রোডের কিছুদূর অবধি মোটর চলাচল করছে শুনতে পাই।

শিমলা থেকে নেমে এসেছিলুম বহুদিন পরে। কিন্তু সেখানকার পাহাড়তলীর সেই ফুলবাগান ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি, তার পাশে ঝরনার সরসরানি, তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবগণের মধুর সঙ্গ—অনেকদিন অবধি আমার মনকে উন্মনা করে রেখেছিল। যিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন এই ভ্রমণে, সেই বিদুষী লেখিকা ও কবি শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবীর কাছে ফিরে গিয়ে সবেমাত্র সবিস্তারে গল্প ফেঁদে বসেছি, এমন সময় শিমলার এক নিদারুণ সংবাদ 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' ছাপা হলো, আমার অতিথিসেবক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু গতকাল অপরাহ্ণে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে! তার শেষকৃত্যের সময় ভারতের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি এবং স্বয়ং স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

এই সংবাদটি প্রকাশিত হবার ঠিক পরের দিন শিমলা থেকে সত্যেনের স্বহস্তলিখিত এক পত্র আমার হাতে এলো :

"তোরা একে একে বিদায় নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেলি, আমিও এর প্রতিশোধ নেবো বলে রাখলুম।.....দিন চারেক আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখানে এসেছিলেন তাঁর কাজে। আমার সেই পুরনো হার্টের অসুখ তোর মনে আছে ত? ডাঃ রায় এবারে আরেকবার পরীক্ষা করে বললেন, "পাহাড়ে থাকা তোমার কিছুতেই সইবে না, তুমি এক্ষুনি নেমে যাও।" কিন্তু আমি গেলে এখানে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর কাজ আর কেউ চালাতে পারবে কি? সমস্যার প্রতিকার কি, তাই ভাবছি....."

'ইউনাইটেড প্রেস'-এর সমৃদ্ধির জন্য সত্যেন জীবন দিয়েছিল, একথা বিধুভূষণ সেনগুপ্তও বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার আর কোনওদিন শিমলায় যাবার ইচ্ছা হয়নি!

দশম পরিচ্ছেদ

কালিম্পঙ

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ। এ বছর শীতটা কিছু দীর্ঘ-বিলম্বিত, একটু কমে গিয়ে আবার তেড়ে আসে। আকাশের চেহারাও গত দুদিন থেকে খুব উৎসাহজনক নয়। শুনতে পাই উত্তরবঙ্গের লোকেরা চৈত্র মাসেও অনেকে গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে রাত্রে ঘুমোয়।

কোন এক রাত্রে জল্‌পাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং জেলায় ঢুকেছি। দীর্ঘ প্রান্তর পেরিয়ে এসেছি অন্ধকারে। বাতাসে ঠাণ্ডা ছিল প্রচুর। আমার দুর্নাম আছে, ঠাণ্ডা আমার লাগে না। যাঁর মোটরে আসছিলুম তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বক্‌সী,—মোহরগং-গুল্‌মার চা-বাগানের ম্যানেজার। আমার ভ্রমণ ব্যাপারে তিনি অতিশয় উৎসাহী,—যে কোন প্রকারের সহায়তা তাঁর কাছে মিলবে। শিলিগুড়িতে এসে তিনি কিছু কেনাকাটা করে নিলেন, তারপব আবার গাড়ি ছেড়ে চললো দার্জিলিংয়ের রাজপথ ধরে। দীর্ঘপথ চলে গেছে উত্তরের পাহাড়তলীর দিকে।

শুক্‌নার জঙ্গলে থাকিনি কোনদিন। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের যে অরণ্যের কথা বলে এসেছি, শুক্‌না হলো তারই ধারাবাহিক অরণ্য। রাত্রে হাঁটাপথে এ অঞ্চলে যাওয়া বিপজ্জনক। এই পথ পেরিয়েছি বহুবার,—দার্জিলিঙে যাওয়াটা যখন নিতান্ত সহজ ছিল। মন খারাপ হলে দার্জিলিং, পুজোর সময় দার্জিলিং, বৈশাখের শেষে কলকাতায় গুমোট দেখা দিলে দার্জিলিং,—কিছু না হোক, আত্মগোপনের বড় আশ্রয় হলো, দার্জিলিং! কিন্তু আজ এই প্রথম রাত্রের দিকে যাচ্ছি শুক্‌নার জঙ্গলে, কেননা জঙ্গলের মধ্যেই হলো ভূপেন্দ্রবাবুদের চা-বাগান এবং তাঁর বাগানের ভিতর দিয়েই চলে গেছে আসামের রেলপথ কোচবিহারের দিক দিয়ে। পথ সামান্য, কিন্তু ওর মধ্যেই আনে ঘন অরণ্যের উপলব্ধি। শিলিগুড়ির শাল আর সেগুন বঙ্গ-বিখ্যাত, বর্মাটীকের পরেই নাকি এর ঠাঁই। কিন্তু বাণিজ্য এক বস্তু, আর অন্ধকার রাত্রির শাল-সেগুনে আচ্ছন্ন শত শত মাইল অরণ্য অন্য বস্তু। মাত্র আট মাইল পথ, তবু ওর মধ্যেই উত্তর পর্বতের দিকে দেখা গেল, তিনধরিয়ার ঝিকিমিকি আলোর মালা; অন্ধকারে যেন মণিমাণিক্য জ্বলছে। ঠিক এই দৃশ্য,—এই প্রকার প্রদীপের মালাখচিত পর্বতের দৃশ্য দেখা যায় দেরাদুন থেকে মুসৌরী। অন্ধকার থেকে বড় সুন্দর লাগে। দেখতে দেখতেই আমরা গুল্‌মার চা-বাগানে এসে প্রবেশ করলুম। এ নিয়ে অনেকগুলি চা-বাগানে আমি অনেকবার কাটিয়েছি, কিন্তু সেসব আলোচনা এখানে থাক্।

নিত্যই বাঘ আসে এ অঞ্চলের চা-বাগানে। গতকাল সন্ধ্যায় ঠিক এইখানে লাইনের ধারে মোটরের আলো দেখে একটি লেপার্ড থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওরা আসে গরু-ছাগলের আশায়। তবে মানুষের আওয়াজ পেলে পালায়। মাঝে মাঝে ম্যান্-ঈটার বেরিয়ে পড়ে, তবে চা-বাগান মাত্রই ভালো শিকারী রাখে। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই চা-বাগানের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বাগানের ভিতর দিয়েও প্রায় দু'মাইল পথ। কিন্তু অন্ধকারে দুই পাশে কিচ্ছু দেখা যায় না। তরাই অঞ্চলের নীরেট অরণ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো চারিদিকে দাঁড়িয়ে।

আমাদের মোটর এঁকে বেঁকে এসে বিস্তৃত বাগানবাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

ম্যানেজারের প্রাসাদের নীচে চন্দ্রমল্লিকার মস্ত বাগান। বড় জমিদারের বাগানবাড়ির সঙ্গেই কেবল এর তুলনা চলে। ভূপেন্দ্রবাবু সপরিবারে এখানে বাস করেন। তাঁর অপরিসীম যত্ন, আতিথেয়তা ও পরিহাস-সরস আলাপে সেই রাত্রি বড় আনন্দে অতিবাহিত করেছিলুম। পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর তিনি সঙ্গে দিলেন একখানি নতুন মোটর এবং একজন নেপালী ড্রাইভার। বলে দিলেন, এ গাড়িটি আমি যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারি এবং চার-পাঁচশো মাইল যাবার মতো পেট্রলের ব্যবস্থা ড্রাইভারের সঙ্গে রইলো। অতঃপর জোর করে তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন আজানুলম্বিত এক ওভারকোট এবং একটি ব্যালাক্লাভা টুপি। পশমের তৈরী। তিনি নাকি আমার স্বেচ্ছাচারের চেহারা দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত। কথা রইলো ফিরবার পথে তাঁর এখানে হয়ে যাবো।

অনন্যসাধারণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদের কথা ওঠে না, কিন্তু নিজেকে হঠাৎ এমন বেপরোয়া অনেকদিন মনে হয়নি। পাহাড়ের পথে মোটরগাড়ির মধ্যে একা বসে এমন আরাম এবং সুখের চেহাবা পাইনি কোনদিন। এমন নধর গদি এবং কাচের আবরণ, এমন একান্ত নিরাপদ একা। আসুক বৃষ্টি, আসুক তুষার ঝটিকা,—একেবারে আমি নিশ্চিন্ত। দায় নেই, ব্যয় নেই, তাগিদ নেই,—যখন খুশী, যেদিকে খুশী! ভূপেনবাবু লেখকের মনকে চেনেন।

শিলিগুড়িতে এসে গাড়ি ঘুরলো সেবকপুলের দিকে,—গেলিখোলার পুরনো রেল-লাইনের গা বেয়ে সেই পথ চলে গেছে পাহাড়-পর্বতের অন্তঃপুরে। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছুটলো। মাঝপথের নদীর নাম মহানন্দা, বোধ করি তিস্তার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমানাটা এখানে ঠিক বুঝতে পারিনে। জলপাইগুড়ির সীমানা সম্ভবত শিলিগুড়ির নীচে দিয়ে এগিয়ে গেছে আলীপুর দুয়ারের দিকে অরণ্যের প্রান্তরেখা দিয়ে। সমতল পথ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে, দেখতে দেখতেই পথ সঙ্কীর্ণ। পিছনে ফেলে এসেছি প্রান্তরের পর প্রান্তর,—মাঝে মাঝে সেখানে ইদানীং বসে গেছে রেফুজীদের উপনিবেশ। কোথাও কাঠের ব্যবসা, কোথাও বা কুটির-শিল্প। অনেক কাঠের বাড়ি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে, যাকে বলে পোঁতা,—মাঠ থেকেই কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরতলায়। এরকম বাড়ি তরাই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। গৌহাটি থেকে নাংপোর পথে দেখে এসেছি এই প্রকার, আলীপুর দুয়ারে এই, কোচবিহারের অনেক অঞ্চলে এই। যেখানে বন্যার ভয়, যেখানে পার্বত্য-নদীর ঢল নেমে আসে অকস্মাৎ, কিংবা জন্তু-জানোয়ার সাপখোপ,—সেখানে মানুষ এইভাবে নিজেকে নিরাপদে রাখার প্রয়াস পায়।

গেলিখোলার পুরনো শীর্ণ রেলপথটি দেখতে পাচ্ছি পাশে পাশে। তিস্তার দুরন্তপনার জন্য এপথে ট্রেন চলাচল আর সম্ভব হলো না। জলের ধাক্কায় লোহার লাইন মুচড়ে যায়, স্লিপারগুলি উৎখাত হয়ে অদৃশ্য হয় এবং গাড়ি ও এঞ্জিন ডুবজলে তলিয়ে থাকে। ফলে আজকাল মোটরবাস ও লরীওয়ালাদের রামরাজত্ব। তিস্তার এই পথটিতে আমার প্রথম অভিযানটির কথা মনে পড়ছে। সেবার শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে আসছিলুম। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরী। আগের দিন থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পাহাড়ে যেমন ভাঙন ধরেছিল, তিস্তারও তেমনি দুরন্তপনা বেড়ে উঠেছিল। ফলে কালিঝোরা পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন আর যেতে পারলো না। কিন্তু দুর্যোগ যতই ঘন হোক, আমাদের কোথাও থামলে চলবে না। সেটা ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ এবং বাঙলা তারিখ ছিল ২৫শে বৈশাখ। মহাকবির জন্মদিন

উপলক্ষে আমরা যাচ্ছিলুম কালিম্পঙে। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে। তাঁর পাদপদ্মে দেবার জন্য কিছু নৈবেদ্যও ছিল সঙ্গে। তার মধ্যে শ্রীঅমল হোম আমার হাত দিয়ে প্রণামী পাঠিয়েছিলেন একঝাড় রজনীগন্ধা এবং একটি কলম। ফুল যদি বা শুকোয়, কবির কলম যেন শুকোয় না কোনদিন!

তিস্তা বিস্তৃতিলাভ করেছে মাঝপথে। সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ এসে প্রথম সে গা এলিয়ে দেয় উপত্যকায়। পাহাড় ভেঙে আনে সঙ্গে, আনে কাঁকর আর বালু। আমার মোটর চলেছে তারই প্রান্ত-সীমানা বেয়ে। দেখতে দেখতে এলো করনেশন। ব্রীজ। এরই চলতি নাম হলো সেবক পুল। এপারে দার্জিলিং জেলা, ওপারে জলপাইগুড়ি। যতদূর মনে পড়ছে মোটরপথ চলে গিয়েছে আলীপুর এবং কোচবিহারের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হয়। পথটি ডান দিকে রেখে মোটর চললো এবার পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। পাশে রইলো তিস্তা। কোথাও রৌদ্রের প্রখরতা, কোথাও বা মেঘচ্ছায়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক,—আজ ফাল্গুনের এই প্রথম সপ্তাহে খেলাটা জমেছে ভালো। চড়াই পথ উঠছে, ভূপেনবাবুর ড্রাইভার এবার সতর্ক। বনময় পাহাড় দেখছি দুই পারে, প্রথম স্তরের পর দ্বিতীয় স্তর, তারপর ধীরে ধীরে মহাহৈমবন্তের বিশাল ব্যাপকতা। উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে তার শিখরদেশ। কতকাল ধরে দেখছি, কতবার করে। শ্রদ্ধা নিয়ে দেখা বলেই আনন্দদর্শন, নইলে হিমালয় কেবল পাথরের পুঁজি। মাটি আর পাথরের পুতুলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয় বলেই ত আনন্দ। তার নিজস্ব আকারের মধ্যে মহিমা কিছু নেই, কিন্তু মহিমা আছে আমার মনে। ইউরোপের আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালা নিয়ে এক শ্রেণীর লোক অতিশয়োক্তি করে, আমাদের কাছে ওটা অর্থহীন। আমরা হিমালয়কে মিলিয়েছি দেবতার সঙ্গে; দেবাদিদেবের প্রতীক হলো হিমালয়,—তিনি শিব, তিনি কল্যাণের আধার। কিন্তু ইউরোপের চোখে আল্‌প্‌স্‌-এর সে মহিমা একেবারেই নেই।

আন্দাজ বত্রিশ মাইল পথ শিলিগুড়ি থেকে। তারপর এলো তিস্তার দ্বিতীয় পুল। বাঁদিকে সোজাপথ চলে গেল চড়াই ধরে দার্জিলিং শহরের দিকে। ওর নাম পেশক রোড। এখান থেকে দার্জিলিং বাইশ মাইল,—পথে পড়বে ঘুম্‌। ডানদিকে তিস্তা পুল পেরিয়ে উপর দিকে চমৎকার পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে কালিম্পঙে। মাইল দশেক পথ। পুল পার হবার আগে পড়ে জেটমল ভোজরাজের মস্ত গদি। এরা একশো বছরেরও বেশী হলো দার্জিলিং জেলা ও সিকিমে আমদানি-রপ্তানির কাজ করে আসছে—ব্যবসাটা প্রায় একচেটিয়া। এরা হলো পাঞ্জাবী রাজপুত। যখন কোন যোগাযোগ ছিল না, রেলপথ এবং মোটরগাড়ি যখন ছিল স্বপ্নবৎ—তখন এরা আসে হিমালয়ে। এদের প্রতাপ ও প্রভাব এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আমার মোটর চললো কালিম্পঙে। সুখ আছে সঙ্গে, তাই অস্বস্তিও আছে। এত সুখ সইছে না। দ্রুতগতি মোটরে ভ্রমণ সিদ্ধ নয়। গ্রহণ করবার সময় পাচ্ছিনে কোথাও, মন কোথাও দাঁড়াতে পাচ্ছে না, সেজন্য দেখাটাও সত্য হচ্ছে না। শরীরে ক্লেশ নেই, পথশ্রম অনুভব করছিনে, প্রতি পদক্ষেপে পথের স্পর্শ পাচ্ছিনে,—সুতরাং এ ভ্রমণ সার্থক নয়। নিঃঝুম নির্জনে কবে কোথায় হিমালয়ের কোন্‌ শিলাতলে বসেছিলুম, গোমতীর ধারা পেরিয়ে কবে কোন্‌ মধ্যাহ্নে গরুড় নামক শহরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলুম, মুসৌরীর থেকে হাঁটতে হাঁটতে কবে নেমেছিলুম কেম্পটি জলপ্রপাতের দিকে, ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পরিশ্রান্ত দেহ টানতে টানতে কবে গিয়ে পৌঁছেছিলুম মন্দাকিনীর তীরে

গৌরীকুণ্ডে—সেইসব পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি মুহূর্তের উপলব্ধি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। এ ভ্রমণে ফাঁকি আছে, তঞ্চকতা আছে, স্পর্শের অভাব আছে, তাই এ ভ্রমণ সিদ্ধ নয়। পোস্ট-অফিসের পার্সেল এখান থেকে যায় বিলেত, কিন্তু সে ইউরোপ ভ্রমণ করলো, একথা বলা চলবে না।

দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে এলুম। এবার ধীরে ধীরে বুঝতে পারা যাচ্ছে ভূপেন বক্‌সী মহাশয়ের হাত থেকে ওভারকোটটি নেবার মূল্য কতখানি। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে, কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় এ প্রকার ঠাণ্ডা একটু অস্বাভাবিক। বেলা অপরাহ্ণ, মেঘে-রৌদ্রে কালিম্পঙের আকাশ নানা বর্ণে শোভাময়। আমার মোটর এসে দাঁড়ালো এক বাঙালী মিঃ মুখার্জীর হোটেলের সামনে। একটুখানি ঢালু পথ দিয়ে ঘুরেই সামনে মস্ত লন্‌। এখন ঠিক মরসুমের কাল নয়, সুতরাং বোর্ডিং প্রায় শূন্য। ড্রাইভারের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করে আমি গেলুম ভিতরে। শ্রেষ্ঠ ঘর চাই, শ্রেষ্ঠ বিলাসব্যসন এবং তিন-চারজন হোটেল-বয়কে আমার এখুনি দরকার। অনেককাল পরে একটু নবাবী করে নেওয়া যাক্‌। বন্ধুরা বলেন, আমি যখন একা, তখন আমি নাকি বিপজ্জনক। বয়, সোডা লাও!

মোটরের চেহারাটায় যতখানি আভিজাত্য ছিল, আমার পরিচ্ছদে তার আভাস বিশেষ মেলে না। পরিচ্ছন্ন পারিপাট্য ফেলে আসি নিজের দেশে। কৈফিয়তের কোন দায় নেই, ফিটফাট থাকার দরকার আছে মনে করিনে। পোশাকেই হলো পরিচয়, সে পরিচয় না পেলেই খুশী থাকি। কেউ না জানুক, মুখ ফিরিয়ে চলে যাক্‌, কৌতূহল প্রকাশ না করুক---সেইটি আমার প্রয়োজন। বোর্ডিংয়ের ভিতরে গিয়ে দোতালায় উঠে দেখি, এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর—সমস্ত শূন্য। শূন্য বারান্দা, শূন্য করিডর—সুতরাং স্বাধীনতাটা অবারিত। জানালা দিয়ে হিমালয়কে দেখা দরকার, যেদিকে ওই তিস্তা উপত্যকা,—যেখানে অপরাহ্ণের রক্তিম আলোয় দলছাড়া ছোট ছোট মেঘ নেমেছে উত্তরীয় উড়িয়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা দরকার দূর উত্তরে যেখানে চূড়ায় চূড়ায় অকাল বর্ষার সজলতা। ওখানে ওই গ্রেহাম্‌স্‌ হোমের উত্তরে একটির পর একটি চূড়া আবহমানকালের বিস্ময়স্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। ওখানে রয়েছে মহাকবরু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, শ্রীশম্ভু, নরসিংহ চূড়া, শিনিওলচু ও লম্‌গেবোর শিখর। কে নাম দিয়েছিল জানিনে, ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। নাম যদি ওদের খুঁজে না পেতুম, ক্ষতি ছিল না কিছু। ওরা হিমালয়ের দল, এতেই আমি খুশী। ওরা আশ্রয় দিয়েছে আমার অস্থির প্রকৃতিকে চিরদিন, তাই ওদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওরা জবাব দিয়েছে আমার অনেকদিনের অনেক প্রশ্নের, অনেক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার,—ওরা আমার অনেক দিনের অনেক গোপন অশ্রুর সাক্ষ্য-আর সান্ত্বনা,--ওতেই আমি তৃপ্ত। ওদের পাথরে পাথরে দেখেছি আমাব প্রাণের ভাষা, ওদের ওই পাখিডাকা উপত্যকায় আমার জীবন-জিজ্ঞাসার সুবৃহৎ দরখাস্তখানা কতবার মেলে ধরেছি, আমার হৃৎপিণ্ডের রক্তধারা কতবার বয়ে গেছে ওদের উপলাহতার নির্ঝরিণীর উন্মত্ত নর্তনে। ধ্যান-মৌন চিরনির্বাক হিমালয়, কিন্তু কেবলমাত্র আমার কানে কানে ওরা কথা কয়, আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় ওদের অন্তঃপুরে বার বার, আমাকে চেনে ওরা মর্মে মর্মে। ওদের মাঝখানে গিয়ে কখনও বিক্রম প্রকাশ করিনি, অসমসাহসিক অভিযানে গিয়ে ওদের মাথায় দাঁড়িয়ে কখনও নিজের মাথা তোলবার চেষ্টা পাইনি,—কিন্তু ওরা দেখিয়েছে আমাকে শ্রদ্ধা আর আনন্দের পথ, দেখিয়েছে নৈবেদ্য

উৎসর্গের পথ। ওদের একখানি পাথরের কাছে আমি কীটানুকীট—সেই আমার একান্ত একাগ্র আনন্দ।

রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে কালিম্পঙের দক্ষিণ শিখরে। একটি উদ্দেশ্য ছিল ওখানে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। কিন্তু ওখানকার বেণী ব্রহ্মচারী মহারাজ সহসা আমাকে দেখে উল্লসিত হলেন এবং আমি ধরা পড়ে গেলুম। তাঁকে কখনও দেখেছি মনে পড়ে না, কিন্তু তিনি নাকি আমাকে দেখেছেন কোন এক উপলক্ষে। দেখামাত্রই পরমাত্মীয়ের মতো তিনি কাছে টেনে নিলেন। ফলে, আমার স্বাধীনতাটুকু সম্পূর্ণ মুছে গেল। ফিরে আসতে হলো সামাজিক জগতে। মহারাজ তাঁর দল ভারী করে তুললেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে ডেকে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন ছোট হাকিমের বাঙলোয়। হাকিম বয়সে তরুণ, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মিষ্ট আলাপ এবং অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলুম। হাকিমের নাম ডক্টর বি ভট্টাচার্য। আমি সিকিম যাচ্ছি শুনে তিনি সোৎসাহে ফোন্ করে দিলেন গ্যাংটকে, এবং জেঠমল ভোজরাজের নামে চিঠি লিখলেন। এমন জনপ্রিয়, ভদ্র এবং সুশিক্ষিত হাকিম সহসা চোখে পড়ে না। বর্তমানে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ওখানেই পরিচয় হয়েছিল মিঃ ডি পি প্রধানের সঙ্গে, তিনি এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়। অতঃপর গেলুম ডাঃ গোপাল দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে। বাড়ির নীচে মস্ত ডাক্তারখানা। জলপাইগুড়ির প্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, এম. এল. সি. আমার মারফৎ একখানা চিঠি দিয়েছিলেন ডাঃ দাসগুপ্তর নামে। ভেবেছিলুম সে-চিঠি চেপে যাবো। কিন্তু সঙ্গীরা ডাঃ দাসগুপ্তর কাছে গিয়ে আমার কথা বলতেই বুঝতে পারা গেল, তিনি আমার আসার খবর আগে থেকে জানতেন। অতএব এই সমস্ত আলাপ পরিচয়ের শেষ ফলাফল হলো, স্থানীয় 'বাঙালী সমিতিতে' আমার এলোমেলো বক্তৃতা! কী বললুম তা মনে নেই, কিন্তু কি বলতে চেয়েছিলুম সেটা মধ্যরাত্রে তোলপাড়া করে বুঝলুম। পরবর্তীকালে চন্দননগর কলেজের জনৈক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত আমাকে পত্রযোগে জানান, আমার সেই বক্তৃতার ফলে 'বাঙালী সমিতি' নাম বদলিয়ে 'মৈত্রী সংঘ' রাখা হয়। বলা বাহুল্য, আমার কিছু জানবার এবং অনুধাবন করবার আগেই দেখলুম, আমার মালপত্র সমেত আমাকে হোটেল থেকে তুলে এনে ডাঃ দাসগুপ্তর দোতলার একটি ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং তাঁর বিদুষী দ্বিতীয়া স্ত্রী অপরিসীম যত্নে নৈশভোজনের সমস্ত রাজসিক উপকরণ টেবলের উপর সাজিয়ে আমাকে ডেকে বসালেন। এতটুকু অবাধ্য হবার উপায় ছিল না, এবং আমি যে অন্তত দিন পনেরো এখানে থাকতে বাধ্য,—তার সর্বপ্রকার আয়োজন নাকি ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে। সহসা নিজেকে কলের পুতুল মনে হতে লাগলো।

এ অভিজ্ঞতা অভিনব সন্দেহ নেই। কপালের ঘাম মুছে এসেছি হিমালয়ে এতকাল, অন্ন আর আশ্রয় জোটেনি কতবার। নিজের পায়ে নিজে মালিশ করেছি, কাঁধ কনকন করেছে বোঝা সঙ্গে নিয়ে. পায়ে ফোস্কার ঘা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছি,—এদের সাক্ষী ছিলনা কেউ। আজ শুতে পেলুম পালঙ্কের গদিতে, মেঝের উপরে কার্পেট পাতা, আরাম কেদারায় মখমল বসানো, মাথার কাছে বেতাব যন্ত্রে বেহাগের আলাপ। বাইরে থেকে হিমালয় ডাকছে ওই বেহাগের আলাপে, ওর ক্রন্দনকম্পিত মূর্ছনায়, ওর অব্যক্ত বেদনায়। কত সঙ্গী আর সঙ্গিনীরা মিলেছিল আমার সঙ্গে এই হিমালয়ে। মারী পাহাড়ের সেই আজিজ আহমদ আর মোতি সিং, কোহালার পথে খান্না, কাশ্মীরে এম কে ধর, জম্মুর

সেই বক্সীজি ড্রাইভার, রুদ্রপ্রয়াগের সেই মারাঠা গৃহিণী, নেপালের মান বাহাদুর, কুলু উপত্যকার সুখলাল। এরা ছাড়া ছিল বাঙালী ছেলে আর মেয়ে; বন্ধু আর বান্ধবী। অনেকে নেই, অনেকে রয়েছে আজও সগৌরবে। হারিয়ে গেছে কেউ মিলিয়ে গেছে কেউ অন্ধকার স্মৃতির তলে; কেউ মরে গেছে, কেউ বা গৃহস্থালী নিয়ে বসে গেছে। বিপদ হয়েছে এই, আমার হিমালয়ের পথ এখনও ফুরোয়নি। নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা পেয়েছি, কাঁদুনে মনকে নানা খেল্‌না যুগিয়ে অন্যমনস্ক করতে চেয়েছি,—কিন্তু হাওয়ায়-হাওয়ায় হঠাৎ ডেকে যায় হিমালয়। ওর মাঝখানে এসে বুঝতে পারি, সব খেলা আর সব খেল্‌না মিথ্যে, ছদ্মবেশটা মিথ্যে—এইখানেই আমার নিজের সঙ্গে নিজের নির্ভুল চেনাচেনি।

ভোরে এলো আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। ডাক্তার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কালিম্পঙের উপর দিয়ে চলেছে রেনক্ রোড তিব্বতের দিকে, কিন্তু এ পথে দুর্যোগ বেশী, এবং দুঃসাধ্যও বটে। সুতরাং এই প্রাচীন পথ ছেড়ে এখন প্রায় সবাই যায় গ্যাংটকের পথ দিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে কালিম্পঙ থেকে তিব্বত সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। রেনক্ রোড গিয়েছে 'জেলাপ-লা' গিরিসঙ্কটে, তারপরেই তিব্বত সীমানা। গ্যাংটক থেকে নাথুলা গিরিসঙ্কট হলো মাত্র ছাব্বিশ মাইল; এখান থেকে জেলাপ-লা ঠিক ক'মাইল আমার জানা নেই। এই পথ দিয়ে কিন্তু তিনজন জগৎপ্রসিদ্ধ বাঙালী গিয়েছিলেন তিব্বতে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বাঙলার চিরদিনের গর্ব ঢাকা-বিক্রমপুরের সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আজ থেকে নয়শো বছরের বেশী আগে ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানঋষি দীপঙ্কর তিব্বত গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নির্মল স্বরূপকে প্রচার করেছিলেন। তিনি তেরো বছর সেখানে বাস করেছিলেন, এবং লাসার নিকটেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। গৌতম বুদ্ধের পরেই তিব্বতবাসীরা তাঁর মূর্তিকে আজও বোধিসত্ত্ব নামে পূজা করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধুনিক ভারতের কুলগুরু রাজা রামমোহন রায়। তিনি তিব্বত যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তার আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমার জানা নেই। তৃতীয় যে-ব্যক্তির প্রতি আমি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র দাস। তিনি গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। তাঁর কাছে আধুনিক ভারতবর্ষ ঋণী, কেননা তাঁরই ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনে একালে প্রথম আমরা তিব্বতের বিষয় জানতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্যর ফ্রান্সিস ইয়াংহাসব্যান্ড যখন তিব্বত জয় করতে যান, তখন শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন—এটি স্যর ফ্রান্সিসেরই স্বীকারোক্তি। অতীশ দীপঙ্করের আগে আরেকজন ভারতবরেণ্য বাঙালীও তিব্বতে গিয়ে আচার্য বোধিসত্ত্ব উপাধিলাভ করেন, তিনি হলেন যশোরের রাজপুত্র শান্ত রক্ষিত। অষ্ট শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে যান। লামারা তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু দীপঙ্করের যে বিপুল কীর্তির কথা আমরা জানি, শান্ত রক্ষিত সম্বন্ধে অতটা জানা যায় না।

কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হলো গারটক, কিন্তু সে বহুদূর এবং বহু অগম্য অঞ্চল পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। কুমায়ুনের প্রান্তে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে লিপু লেক গিরিসঙ্কট অতটা না হলেও অনেকটা তাই; ওখানে তাকলাকোটে হলো তিব্বতীদের ঘাঁটি। নেপালেও আছে নাম্‌চেবাজার দিয়ে তিব্বত। অন্যান্য পথও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিব্বত যে এত কাছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লী পৌঁছতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা,—সেই গতিতে

গেলে লাসা পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লাগে কি?

কালিম্পঙের যে পথ চলে গিয়েছে উত্তরে সেখানে পশমের ঘাঁটি একটির পর একটি, অসংখ্য তিব্বতী আর মারোয়াড়ী তার আশেপাশে। এইটি হলো তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু এখানে কারবারিদের উন্নতি ঘটেছে একালে প্রচুর, তার প্রকাশ্য নিদর্শন হলো বড় বড় অট্টালিকা, আর অগণ্য কুঠিবাড়ি।

ভোর থেকে আকাশ আজ মেঘময়, শীতের হাওয়া ছিল কনকনে। বড় গির্জাটা হলো কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক। তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে চড়াইপথ এদিক ওদিক ঘুরে অনেক উঁচুতে গ্রেহাম্‌স্‌ হোমের দিকে। এখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং সাহেব সুবার অভিভাবকহীন ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে মানুষ হয়। সমগ্র পাহাড় নিয়ে এ এক বিরাট কীর্তি। পরিচালনা ব্যবস্থা সমস্তই খাঁটি সাহেব-মেমদের হাতে। একটু আধটু দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে আবার ফিরে এলুম ডাঃ দাশগুপ্তের পাড়ায়। এটা অভিজাত পল্লী। কিন্তু এরই একপাশে একটি সঙ্কীর্ণ গলির নীচে নেমে যে মন্দিরটির চত্বরে এসে দাঁড়ালুম, এটির কথা আজও ভুলিনি। দেখে নিলুম সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঝুপসি ঘরখানা, যেখানায় বছর চৌদ্দ আগে একটি রাত্রি বাস করে গিয়েছিলুম আমি আর শশাঙ্ক চৌধুরী। এটির নাম ছিল ঠাকুরবাড়ি, আজও সেই নামটি তেমনি প্রচলিত। সেদিনও কালিম্পঙে এসেছিলুম বটে, কিন্তু কালিম্পঙ চোখে পড়েনি,—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সমগ্র হিমালয়কে সেদিন আমাদের চোখের আড়ালে রেখেছিল। মনে পড়ে সেই ২৫শে বৈশাখের অপরাহ্ণ। কবি রয়েছেন গৌরীপুর প্রাসাদে। বৈদান্তিক এটর্নী হীরেন দত্ত আছেন, আছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী। অনিল চন্দ, মৈত্রেয়ী আর চিত্রিতা। অমল হোমের কলম ও রজনীগন্ধার গুচ্ছ কবির হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করলুম। আমার হাতে ছিল কয়েকখানি 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'। মহাকবি জানতেন, আমি তখন 'যুগান্তরের' অন্যতম সম্পাদক। আমার অনুরোধে উনি অনেকবার 'যুগান্তরে'র জন্য লেখা দিয়েছিলেন। আজকের 'যুগান্তরের' প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল শিল্পীর হাতে-আঁকা কবির একখানি রেখাচিত্র। গ্রাম-নগর-দেশ-মহাদেশ এবং দিগ্বলয় ছাড়িয়ে কবির মাথা উঠেছে ধবলাগার গৌরীশৃঙ্গের মতো,—হিমালয়ের চেয়ে তিনি বড়,—পৃথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি! ছবিখানার মধ্যে এই চেহারাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম।

কবি বললেন, সমগ্র মহাভারতখানা তিনি নিজের হাতে একবার লিখতে চান, অত বড় এপিক্‌ পৃথিবীর কোনও কালের কোনও সাহিত্যেই নেই। কিন্তু কাজটি দরূহ, অনেকদিন সময় লাগবে। হীরেনবাবুকে আনিয়েছি, ওঁর সাহায্য নেবো।—

তাঁকে যখন জানালুম, এখানকার এক ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছি, তিনি বললেন, এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?

সৌম্য সুহাস কবির মুখখানিতে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা প্রকাশ পাচ্ছে। বাইরের আলো এসে পড়েছে সেই সুন্দর শ্বেতশ্মশ্রুময় মুখে। নরম একখানা শাল এলায়িত দেহের উপর ছড়ানো। একখানা আরাম কেদারায় তিনি অর্ধশয়ান। দু'চারটি কথার পরে তাঁর পরিহাস-সরস বাক্যবাণ ছুটতে লাগলো। বলা বাহুল্য, সেই বাণে আমিই বিদ্ধ হচ্ছি বারম্বার এবং হাসির রোল উঠছে এপাশে ওপাশে। কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।

সেইদিনকার সেই ২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর জন্মদিন

উপলক্ষে একটি নবরচিত কবিতা বেতারযোগে পাঠ করবেন, সেজন্য কলকাতার বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কলকাতা-কালিম্পঙের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না, এই উপলক্ষে তার প্রথম উদ্বোধন। সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খুঁটি বসানো এবং তার খাটানো হয়েছে গত কয়েকদিন থেকে। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। কবি তাঁর ঘরের আসনে বসে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বরটি ধরে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ব্রডকাস্ট করবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। কয়েকজন বেতার-বিশেষজ্ঞ এসেছেন এখানে এই উপলক্ষে। তাঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত ঁনৃপেন্দ্র মজুমদার ছিলেন অন্যতম। মহাকবি মাঝে মাঝে একবার ভীষণ শব্দে গলা ঝাড়া দেন, একথা সকলেরই মনে আছে। কিন্তু আজ কাব্যপাঠকালে সেই আওয়াজটির দাপটে সূক্ষ্ম যন্ত্রটা বিদীর্ণ হয়ে যাবে কিনা, এই আশঙ্কাটা ছিল রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের মনে। সেজন্য উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে নৃপেনবাবু একবার আমাকে বললেন, ঠিক ওই চেয়ারে বসে যন্ত্রে মুখ রেখে কলকাতাকে একবার ডাকুন তো? আপনার গলায় যদি না ফাটে তবে আর ভয় নেই!

কেঁপে উঠলুম। ওটা যে কবির আসন! কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুর ফরমাশ শুনতেই হলো। নধর মখমল-বসানো চেয়ারে বসে কয়েকবার ডাকলুম, হ্যালো, ক্যালকাটা......হ্যালো.....?

কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো—'ও-কে।' (o.k.)

বোধহয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কিংবা আটটা। একটা বুঝি বেল্ বাজলো! কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্ত্রের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্র—কলকাতা ঘুরে কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্ত্রে,—সেই আমাদের রোমাঞ্চ পুলক। কবি মাত্র পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ করে দিলুম। শব্দ না ঢোকে।

একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ দীপ্ত কণ্ঠের মূর্চ্ছনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো নবরচিত কবিতায়—

"আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হ'তে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।"

আমাদের পায়ের নীচে কালিম্পঙ থর থর করতে লাগলো কিনা সেকথা তখন আর কারো মনে রইলো না। জ্যোৎস্না ছিল সেদিন বাইরে। একটা মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে যাচ্ছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম পরস্পরের অস্তিত্ব।

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম—
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

* * * *

'ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান

বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা,
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তা'রা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।"

*　　　*　　　*　　　*

"বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।"

*　　　*　　　*　　　*

"......দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।—
আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালোবাসা—বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।"

মাত্র পনেরো মিনিট, কিন্তু আমরা বাইরে ওই জ্যোৎস্নানিমীলিত হিমালয়ের দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে কেমন যেন আদিঅন্তহীনকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলুম। সহসা পাশ থেকে যেন কতকটা রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করে রথীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "যাক্, উনি গলা ঝাড়া দেননি।"

এরপর কবি মাত্র তিন বছর তিন মাসকাল জীবিত ছিলেন।

চৌদ্দ বছর পরে ফিরে আসি এবার নিজের কথায়। ডাঃ দাসগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন করেই হোক আমাকে এযাত্রা বিদায় নিতে হলো। আকাশে মেঘ রয়েছে এখনও, হয়ত বা কোথাও বৃষ্টিও নামতে পারে। কিন্তু আজ আমি স্থির করলুম, ভূপেনবাবুর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এবার অন্যপ্রকারে সিকিম রওনা হবো। পথের চেহারাটা আমার জানা নেই, সুতরাং যদি কোনওপ্রকারে তাঁর গাড়ির কোনও ক্ষতি হয়, সে বড় লজ্জার কথা। অনেক ভেবেচিন্তে ড্রাইভারকে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললুম। প্রথমটা সে একটু বিস্মিত হলো, তারপর রাজী হলো। ফিরবার পথে—যদি নিরাপদে ফিরি—তবে ভূপেনবাবুর ওখানে হয়ে যাবো বলে দিলুম। সে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

ভারতবর্ষের বাইরে হলো সিকিম, তাই একটা মিশ্র মনোভাব রয়েছে আমার। অজানা অপরিচিত সেই পথ। কিন্তু সেইটিই ত বড় আকর্ষণ! আমি মোটর বাসে গিয়ে উঠে বসলুম।—

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

একাদশ পরিচ্ছেদ

কাশ্মীর ও পীরপাঞ্জাল

পুরাণে দেবী ধরিত্রী প্রশ্ন তুলেছেন : প্রভু, তোমার আপন স্বরূপ লুকালে কোথায়? মানবাকারে তুমি প্রকাশ নও কেন? ওই উদার গিরিশৃঙ্গমালার বিশাল মৌনে কেন তুমি আপনাকে অভিব্যক্ত করেছ?

পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণু জবাব দিচ্ছেন : প্রিয়ে, মহাহৈমবতের ওই প্রসন্ন আনন্দস্বরূপ ক্ষুদ্র মানবাকারের মধ্যে কোথা? ওখানে প্রস্তর-কাঠিন্যে দেবতাত্মার প্রকাশ। ওই বিরাট তুষারশৈলাধার সকল দুর্যোগ, শীতাতপ, ভয়, মৃত্যু, বেদনা, জরা ও জয়োল্লাসের অতীত। মহৎ স্থাণুর মধ্যে দেবতাত্মা যোগাসীন। তিনি অজর, অব্যয়, অমেয়।

ধরিত্রী তাঁর শিয়রে ধারণ করে রয়েছেন মহাজট তুষারকিরীট দেবাদিদেবকে, যিনি চিরতন্দ্রায় নিমীলিতনেত্র,—যিনি আত্মস্থিত যোগাসীন। সুদূর দক্ষিণে ধরিত্রীর চরণচুম্বন করছেন মহাজলধি আপন তরঙ্গরঙ্গে।

এই ভুবনমনোমোহিনী তুষারকিরীটিনীর দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রয়েছেন সম্রাট অশোক। তিনি ধ্যানস্থ, আত্মসমাহিত। ভারতবর্ষের সুদূর ভবিষ্যতের দিকে এই জগদ্‌বরেণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠের দৃষ্টি নিবদ্ধ—সাম্প্রতের আবরণ সরিয়ে। দুই হাজার দু'শো বছর আগেকার কথা।

পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন হয়ে গেল। রাজধর্মকে কল্যাণধর্মে রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সম্রাট। পৃথিবীর প্রথম মানবসভ্যতা প্রবর্তনের প্রাথমিক নীতিকে উৎকীর্ণ করেছেন তিনি পঞ্চশিলায় ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শে। কিন্তু তবু তাঁর আনন্দ নেই মনে, ললাট চিন্তান্বিত, দৃষ্টি বিষণ্ণ। দেশদেশান্তরাগত সন্ন্যাসীগণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে অমিততেজঃ, তুমি কি তুষ্ট নও? আসমুদ্রহিমাচল কি তোমাকে বরণ করেনি?

সম্রাট ধর্মাশোক জবাব দিলেন, মহাত্মন্, আমি ভিক্ষু,—আমি বুভুক্ষু কল্যাণের। বিশ্বমানবের দুঃখ, মৃত্যুভয়, নিরানন্দ—এরা বিদূরিত না হলে কোথা আমার শান্তি, কোথা বা এই দেবভূমি ভারতের আনন্দ? সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কোথা?

কর্তব্য আদেশ করুন, হে ভিক্ষুপতি!

গৈরিকবসনাবৃত নগ্নপদ দারিদ্র্যভূষণ সম্রাট-ভিক্ষু নতজানু হলেন সন্ন্যাসীগণের পদপ্রান্তে। বিগলিত অশ্রুনয়নে নিবেদন করলেন, মহাত্মন্, ভগবান বুদ্ধের যোগধর্ম প্রচারিত হোক বিশ্বময়, সপ্তদ্বীপায় তাঁর বাণী নবকল্যাণচেতনা আনয়ন করুক, বুদ্ধের দৈবসত্তা প্রতি মানবের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হোক,—এই আমার জীবনের ব্রত। অহিংসার মন্ত্রে পৃথিবী দীক্ষালাভ করুক, প্রেমের মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হোক, ত্যাগের মন্ত্রে তাদের সিদ্ধিলাভ ঘটুক, শান্তিময় সহস্থিতির মন্ত্রে তা'রা নবজীবনবেদের ব্যাখ্যা লাভ করুক। আমার নির্বাণলাভের পূর্বে বিশ্বজীবনের এই সার্থকতা দেখে যেতে চাই, মহাত্মন্!

রাজভিক্ষুর সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছিল,—ইতিহাসে এই সংবাদটি পাওয়া যায়।

সম্রাট অশোক প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার-কামনায় কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে গান্ধারের দিকে এবং পূর্বে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার দিকে সন্ন্যাসী ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর কেউ তখনও জাগেনি। মঙ্গোলিয়া ও মিশর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন; ব্যাক্‌ট্রিয়া, আসিরিয়া, ইয়ারখন্দ, চীন—সবাই ঘুমিয়ে। ইউরোপ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায় বনে অরণ্যে আর সমুদ্রতীরে; আমেরিকার জন্ম হয়নি। সম্রাট অশোকের আবেদনের ফলে তিব্বতে, মধ্যএশিয়ায় ও গান্ধারে বৌদ্ধভিক্ষুগণ বৌদ্ধসভ্যতার কীর্তি স্থাপন করেন। সেই কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে কুন্‌লুন গিরিমালার উত্তর পারে বিশাল তাক্‌লা মাকানের মরুলোকে—ইয়ারখন্দ, খোটান ও কেরেয়া নদের এপারে ওপারে,—যাদের নাম মাসারতাগ, কারাডঙ, দানদান উইলিক, আইপা ইত্যাদি। শত সহস্র বৎসরের বালুর ঝাপটা এই ধ্বংসাবশেষগুলিকে আজও বিলুপ্ত করতে পারেনি। আজও এদের বালুপাথরের প্রাকার গৌতম বুদ্ধের বাণীকে বহন করছে।

সম্রাট অশোকের এই বিশ্ববৌদ্ধবাণী-সাধনার প্রথম কেন্দ্রে পরিণত হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিল কাশ্মীর। প্রথম কাশ্মীর থেকে ভিক্ষুর দল প্রবেশ করেছিল সম্রাট অশোকশাসিত গান্ধারে,—যে-গান্ধারে একদিন মহাভারতীয় চন্দ্রবংশের প্রভুত্ব ছিল। আজকের মতো সেদিনও গান্ধারের প্রধান প্রবেশপথ ছিল পুরুষপুর, একালে যে শহরটিকে বলা হচ্ছে পেশাওয়ার। রাজধানী পুরুষপুরকে কেন্দ্র করে সমগ্র গান্ধারে বৌদ্ধ সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্রাট-ভিক্ষু অশোক।

ভারতের উত্তরে কাশ্মীর থেকেই বৌদ্ধসভ্যতা প্রথম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেছিল। সেদিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য সীমানা আজকের মতো চিহ্নিত ছিল না। ওদিকে পারস্যের পথ এবং এদিকে তিব্বত-মঙ্গোলিয়ার পথ সম্পূর্ণ অবারিত ছিল। মানবধর্মনীতি ও সুশাসনের প্রভাবে সকল জাতির মানুষ সেদিন সহজে বশ্যতাস্বীকার করতো। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, এবং দক্ষিণে সিংহল, ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্রাট অশোকের ধর্ম ও মানবতার নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করে আনন্দ পেয়েছিল।

এই কীর্তি ভারতের সংস্কৃতির—কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর ছিল সংহতিমন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। শত শত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে এর ঐতিহ্য আর সভ্যতা। মহাপ্রলয় ও ঝঞ্ঝা, সংহার ও সৃষ্টি অগণিত দানবীয়তার দংষ্ট্রাঘাত, অসুরের করালচক্ষু, এবং সংখ্যাতীত সন্ন্যাসী ও দৈবমানবের ভয়হীন প্রতিভার স্বাক্ষর—কাল-কালান্তের সকল ইতিহাস চিহ্নিত রয়ে গেছে এই সংস্কৃতির পর্বে পর্বে। কিন্তু একথা সত্য, আড়াই হাজার বছর আগে গৌতমবুদ্ধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ভারতেরও নবজন্মলাভ ঘটে।

কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম।—

ধবলাধার গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সোজা উত্তরে, উত্তর থেকে পূর্বদিকে তার শাখা-প্রশাখা। উলঙ্গ ফকিরের মতো সে ঊর্ধ্ববাহু, বুভুক্ষায় বঞ্চনায় সে যেন চিরদরিদ্র। আমাদের পথ ধবলাধারের দিকে নয়, আমরা যাবো উত্তর-পশ্চিমে,—ইরাবতী নদী পেরিয়ে জম্মুর দিকে। পুরাকালে চাক নামক এক বর্বর পার্বত্য জাতি কাশ্মীরের উপর প্রবল অনাচার করেছিল, সম্ভবত তাদেরই নামানুসারে চাক্কি নামক একটি চেক্‌-পোস্ট পাশে রেখে আমরা পাঠানকোট থেকে বেরিয়ে মাধোপুর ও লক্ষ্মণপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। গত রাত্রে আমরা জলন্ধর থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত শতদ্রু এবং বিপাশা

অতিক্রম করে এসেছি। বস্তুত কাশ্মীর পরিভ্রমণকালে কোনও না কোনও সময়ে পঞ্চনদ এবং সিন্ধুনদ না পেরিয়ে উপায় নেই। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ না করলে পার্বত্যভূমিতে আনাগোনা করা যায় না। আসামে ব্রহ্মপুত্র, ভূটানে রায়ডাক আর কালচিনি, সিকিমে তিস্তা আর রংগীত, দার্জিলিংয়ে মহানন্দা, নেপালে বাগমতী, কুমায়ুনে কোশী আর গঙ্গা-যমুনা,—যেখানে যাও, যে কোনও পাহাড়ে, যে কোনও হিমালয়ে। প্রভাতের প্রথম রক্তরশ্মির নীচে দিয়ে দেখে এসেছি শীতলসাগর হ্রদ, অতিক্রম করে এসেছি বিপাশার গৈরিক স্রোত। দেখে এসেছি এই সুদূর উত্তরেও ছড়িয়ে রয়েছে বাঙলা দেশ এখানকার পথে প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে আর গুল্মলতায়—সমস্ত নীলাভ ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে। দূরে দূরে ধূম্রাভ গিরিশ্রেণীর স্তবকে স্তবকে শ্রাবণশেষের বর্ষণক্লান্ত মেঘের দল বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রজাপতি পতঙ্গরা পথে বেরিয়ে পড়েছে সূর্যকিরণে।

পাঠানকোট থেকে জম্মুর পথ আগে ছিল অব্যবহার্য, এখন সে-পথ চিক্কন ও মসৃণ। শিয়ালকোট থেকে জম্মু ছিল রেলপথ, কিন্তু শিয়ালকোট এখন পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঠানকোট থেকে জম্মু মোটর বাসে গেলে সাতষট্টি মাইল।

সমগ্র কাশ্মীর দুই ভাগে বিভক্ত। পীরপাঞ্জালের এপার হলো জম্মু উপত্যকা, ওপার হলো কাশ্মীর উপত্যকা। জম্মু পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল বহুকাল। জম্মু হিন্দুপ্রধান, এবং কাশ্মীর বর্তমানে মুসলিম-প্রধান।

মাধোপুর ছাড়িয়ে ইরাবতীর পুল পেরিয়ে লক্ষ্মণপুর পিছনে রেখে আমরা চললুম পশ্চিম দিকে। শাল-সেগুন আর শিসমের বনচ্ছায়াময় পাখিডাকা উপত্যকাপথ মধুর লেগেছে মনে মনে। দক্ষিণের হায়দারাবাদের মতো এদিকে পাঞ্জাবের সুদীর্ঘ কোন কোন অঞ্চল মালভূমির মতো; রুক্ষ রক্তিম পর্বতের সানুদেশ লতাগুল্মবিজড়িত। তারই ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও পীরপাঞ্জালের বন্য নদীর রক্তবরণ প্রবাহ ছুটে চলেছে। এই পথ থেকে শিয়ালকোটের সীমানা বড় নিকট। এই রক্তবরণ প্রবাহ ইরাবতীরই শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত। এরা আসছে ধবলাধার গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এদের মূল উৎস সম্ভবত পীরপাঞ্জালে, যার ক্রোড়পর্বত হলো ধবলাধার। কিন্তু এমনটি দেখিনি কোথাও,—এত লাল, এত রক্তের স্রোত। হয়ত একেই বলে, রক্তগঙ্গা।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকালে একটি গ্রাম পেরিয়ে গেল। নাম শম্বা। শম্বা অর্থে বিদ্যুল্লতা; যদি শম্ব হয় তবে বজ্রদণ্ড। ছোট পাহাড়ী গ্রাম পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত; ডানদিকে পার্বত্য ক্রোড়ভূমি। বনময় উপত্যকা আর আঁকাবাঁকা গিরিনদীর উপলাহত স্রোত নিঃঝুম মধ্যাহ্নকে নিবিড় করে তুলেছে। দূর দিগন্তে ঠাহর করা যায় পাঞ্জাবের বিশাল সমতল, আর সেই সমতল থেকে শিরদাঁড়া ও মেরুদণ্ডের মতো হিমালয়ের পার্বত্য শিরা উপশিরাগুলি উত্তরখণ্ডের দিকে প্রসারলাভ করেছে। এরাই হলো হিমালয়ের ভিত্তি, এরাই হলো তা'র ভূতাত্ত্বিক পঞ্জর-বন্ধন।

কিছু অস্বস্তি ছিল মনে, কিছু বা শঙ্কা। দিল্লী থেকে বাহির হবার কালে কোনও কোনও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভয় দেখিয়েছিলেন, কাশ্মীরে রক্তারক্তি চলছে, ওদিকে নাই গেলেন! সেটা ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্টের মাঝামাঝি। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে শেখ আবদুল্লা গদিচ্যুত হয়েছেন, এবং কয়েক সপ্তাহ আগে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীনগর প্রান্তে আটক অবস্থায় হঠাৎ মারা গেছেন। অজানা ভবিষ্যতের ভাবনায় সমগ্র কাশ্মীর উদ্বিগ্ন।

দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করি, রক্ত দেখতে দেখতেই আমরা মানুষ, কারণ আমরা বাঙালী। জীবরক্ত আমাদের খাদ্য, টাট্‌কা মাছ-মাংসের হৃৎপিণ্ডঝরানো রক্ত দেখলে আমাদের মুখ লালাসিক্ত হয়। রক্তাম্বর আমাদের চোখে পবিত্র পরিধেয়। রক্তলোভাতুরা মহাকালী আমাদের ইষ্টদেবী। বলিদানের পুণ্যরক্ত দেখলে আমরা ভাবাপ্লুত হই। সন্ধিপূজায় অসুরনাশিনী চণ্ডীর স্তোত্র শুনতে শুনতে আমাদের আবেশ আসে। রক্তজবা আর রক্তপদ্ম আমাদের পূজার উপচার। আমাদের মেয়ে পায়ে পরে আল্‌তা, মাথায় ধরে সিন্দূর। রাঙাপাড় শাড়ি তাদের সকল উৎসবে পরিধেয়। বাঙালী কবি উদয়াস্ত গগনের রক্তচ্ছটায় কাব্যের প্রেরণা পায়। রাজনীতিতেও তাই। ১৯০৫ থেকে ১৯৫০ অবধি বাঙালীর রক্তক্ষরণের কাহিনী। শৈবভারতের রাজনীতি বাঙালীকে অভিভূত করেনি; রক্তবিপ্লবে তারা পেয়েছে আনন্দ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেদিন সংহারমূর্তি নিয়ে দাঁড়ালেন, বাঙালী সেদিন প্রাণের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য সাজালো তাঁর উদ্দেশে। বাঙলার সরকারী প্রতীক্ হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রক্তে বাঙালীর ভয় নেই। এই সেদিনও এক পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাতে গিয়ে কলকাতার পথে-পথে বাঙালী রক্তারক্তি করেছে! কিন্তু তবু সাম্প্রতিক রাজনীতিক বিপর্যয়ের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে-সময়টায় বিস্ময়-বিমূঢ় ও হতচকিত, ঠিক সেই সময়টিতে অজানা দেশে প্রবেশ করা দুর্ভাবনার কারণ বৈ কি। চারিদিকে চাপা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে, কাশ্মীর মিলিসিয়ার কর্মতৎপরতা নানা দিকে প্রকট, কখন আগুন জ্বলে ওঠে কে জানে।

দেখতে দেখতে এসে পড়েছি অনেকদূর। অনেক বাঁক ঘুরেছি, উপত্যকা আর অধিত্যকার সর্পিল গতি আমাদের মোটর বাসকে অনেক চড়াই উৎরাইতে ঘুরিয়ে আনলো। তপ্তরৌদ্রের চেহারায় মধ্যাহ্ন বিগতপ্রায়। সমতলের কোলাহল-কলরব আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রাঙামাটির অধিত্যকায় শালসেগুন-শিসমের ছায়ানিবিড় বনে পাখিসমাজের বিশ্রম্ভালাপ চলছে।

পার্বত্য পাঞ্জাব হিন্দুপ্রধান—শিব এবং শক্তির পূজারী। সেইকারণে জম্মু উপত্যকায় প্রায় সর্বত্রই হিন্দুমন্দির। কোথাও রঘুনাথ, কোথাও রুদ্রেশ্বর, কোথাও বা ভৈরব। রাজপথের বাইরে নিরিবিলি বৃক্ষজটলার মধ্যে চকিতে শোনা যায় পূজাপ্রহরের ঘণ্টারব। কোথাও দেবদেউলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পট্টবস্ত্র-পরিহিত পূজারী ব্রাহ্মণ; ছোট পাহাড়ের ওই অনেক উঁচুতে হয়ত চোখে পড়ছে ত্রিশূলীর মন্দিরে শ্বেত ও রক্তপতাকা উড্ডীন। কোথাও দেখছিনে একটিও মসজিদ, অথবা একটিও শিখ গুরুদ্বার। কাশ্মীরের ধমনীতে হিন্দু আর বৌদ্ধভারতের রক্ত বইছে চিরদিন।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। আমাদের মোটর বাস এসে দাঁড়ালো জম্মু শহরে। ঘণ্টাখানেকের মতো ছুটি পাওয়া গেল। জম্মু হলো পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের মিলনক্ষেত্র।

বড় শহর, মস্ত বাজার হাট। পাহাড়ের নাতিউচ্চ প্রশস্ত উপত্যকায় এই শহর খুবই প্রাচীন। একদিকে পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে শ্রীনগর, সুতরাং এ শহরে আমদানি রপ্তানির কাজ প্রচুর। বাহির থেকে নানা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা এসে এখানে রাজ্যপাট বসিয়েছে বহুকাল আগে থেকে। পথঘাট অপ্রশস্ত,—পার্বত্য শহরে যেমন হয়। কোনদিক ঢালু, কোনদিক বা উঁচু। এটি হলো কাশ্মীর মহারাজার শীতকালীন রাজধানী। এখন মহারাজা

হরি সিং তাঁর কৃতকর্মের জন্য অন্যত্র নির্বাসিত; তাঁর স্থলে আছেন তাঁরই তরুণ পুত্র করণ সিং,—তিনিই এখন কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ, অর্থাৎ অনেকটা রাজ্যপালের মতো।

সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মুতে চাউল হলো প্রধান খাদ্য, গম নয়। কিছু বিস্ময় লাগে যখন দেখি বাঙালীর অতি পরিচিত ভোজ্য উপকরণ কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্র। লাউ বেগুন থোড় কচু কাঁচকলা ঝিঙে উচ্ছে ডুমুর কুমড়ো নটে আর লাউডগা। যদি কেউ মনে করে কাশ্মীরের হিন্দুমুসলমান জনসাধারণ উগ্র এবং বলিষ্ঠ স্বভাব, সে ভুল করবে। ওদের প্রাণশক্তিব প্রবল কোনও পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এমন নিরীহ জাতি ভূভারতে নেই। ওরা তাই মার খেয়ে এসেছে চিরকাল, কিন্তু মাথা তোলেনি একবারও। একবারও শোনা যায়নি, উৎপীড়িত কাশ্মীরীরা বিপ্লব ঘোষণা করেছে, অথবা দস্যুকে বিতাড়িত করেছে। এ দুর্নাম ওদের নেই। শক্তিতে ওরা বাঙালী অপেক্ষা অনেক দুর্বল। ওরা হলো প্রাচীন আর্যজাতির মহৎ বিনষ্টির সাক্ষ্য। ওরা শুধু মধুরস্বভাব, ওরা অতিথিপরায়ণ, ওরা পরম শান্ত,—কিন্তু না আছে ওদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, না বা আত্মপ্রতিষ্ঠা। যে-কোনও শ্রেণীর শাসক বাইরে থেকে এসে ওদের ওপর প্রভুত্ব করুক, ওরা আত্মসমর্পণ করতে উৎসুক। এই অতি কোমল প্রকৃতির ভিতর থেকে বজ্রের কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে আজ একটি মানুষ, তিনি হলেন বক্সী গোলাম মহম্মদ।

জম্মুর চাউল হলো ভারতপ্রসিদ্ধ। এমন নধর সুস্বাদু ও শুভ্র তার শ্রী। একটি গুজরাটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে পথের ধারে এক মনোহাবী দোকানে উঠে বসলুম। আমি বাঙালী শুনে দোকানদার সসম্ভ্রমে আসন দিল। কাশ্মীরের জন্য সর্বশেষ আত্মবলি দিয়েছে বাঙালী, অর্থাৎ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। সমগ্র কাশ্মীর এখন বাঙালীর জয়গানে মুখর। বলতে বলতে মুসলমান ছোকরা অতিশয় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার ধারণা, শ্যামাপ্রসাদের অপমৃত্যুর জন্য 'শেখ সাব' সম্পূর্ণ দায়ী। হম কাশ্মীরী হুঁ, কবভি ঝুট নহি বোল্‌তা, সাব! দুনিয়াভর ইন্‌সানকো মালুম হো গৈ!

আমাদের মোটর বাস আবার জম্মু ছেড়ে চললো। বেলা অপরাহ্ন। আমরা এন. ডি. রাধাকিষেণ কোম্পানীর গাড়িতে যাচ্ছি। এটি লালমোটর, অর্থাৎ ডাকগাড়ি। আমাদের ড্রাইভার অতি ভদ্র এক কাশ্মীরী সৌম্যদর্শন ব্যক্তি, নাম বক্সীজী। পার্বত্যপথের বিপদসঙ্কুল বাঁকে-বাঁকে গাড়ি চালাবার জন্য যে ধীর বিচারবুদ্ধি ও সচেতন দৃষ্টির প্রয়োজন,—বক্সীজীর অনন্যসাধারণ যোগ্যতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল পদে পদে।

জম্মু থেকে উধমপুর বেশী দূরে নয়। এবার আশে পাশে অল্পস্বল্প পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য প্রাচীর। ধীরে ধীরে উঠছি চড়াই পথে। নিস্তব্ধ উধমপুর। অদূরে বট-অশ্বত্থের ছায়াচ্ছন্নলোকে একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় আজ সেখানে কোনও বিশেষ পর্ব ছিল। পথের বাঁকে রাজার এক উদ্যানবাটির মস্ত তোরণ। তারই প্রত্যেক ঘাঁটিতে দেখা যাচ্ছে মিলিটারী পোশাকপরা সশস্ত্র প্রহরীর দল। উদ্যানটির আয়তন অতি বিস্তৃত, এবং দূর থেকে চোখে পড়ে একটি টিলাপাহাড়ের উপরে একতলা রাজবাড়ি। ওখানে শেখ আবদুল্লা সাহেব বর্তমানে অন্তরীণাবদ্ধ। তিনি নিজে বন্দী, কিন্তু থাকেন সপরিবারে। দেশের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য বক্সী গোলামের হাতেই বন্দী, কিন্তু শিষ্যের হাত থেকে গুরু তাঁর দক্ষিণা পাচ্ছেন নিয়মিত। অর্থাৎ, চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তাঁকে আটক রাখা হয়েছে,—সংবাদপত্রাদি এবং বেতার যন্ত্রসহ। তাঁর গতিবিধি প্রাসাদ উদ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রাসাদের বারান্দা থেকে সমগ্র জম্মু উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়।

উধমপুর ছেড়ে গাড়ি ছুটে চললো এবার চড়াই পথ ধরে। এবার যেন শতদলের এক একটি দল মেলছে। পূর্বদিকে এবার ধবলাধারের বিস্তার,—আমরা প্রবেশ করছি উত্তরে পীরপাঞ্জালের আঁকাবাঁকা চড়াই পথে। গোধূলির আর বিলম্ব নেই। এপাশে ওপাশে নামছে গিরিনির্ঝরিণীরা, ওদের নূপুর-নিক্কণ কানে আসছে, শুনতে পাচ্ছি কলকণ্ঠীর গুনগুনানী। সমতল জগতে ওদেরকে কোথাও পাইনে; ওরা থাকে হিমালয়ের পারিজাত কাননের আড়ালে-আবডালে। আজ শুক্লা সপ্তমী। হিমালয়ের রাজসভা বসবে আজ চন্দ্রভাগার তীরে-তীরে, তার জন্য তৈরী হচ্ছে ওরা, ওই 'সুন্দরী ঝর্ণা, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা!'

খদ নামক একটি পাহাড়ী বস্তির কাছে এসে চা পান করা গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে 'কুদ'। কিচ্ছু নেই কোথাও, অনেক উঁচু থেকে অনেক নীচু অবধি চলে গেছে এই বস্তি। তীর্থপথে একে সাধারণ 'চটি' বলা যেত। এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য জলধারাপাত চোখে পড়ে। সমগ্র খদটি অর্ধচন্দ্রাকার, অশ্বক্ষুরাকৃতি। যেমন দেখেছি মুসৌরী ছাড়িয়ে কেম্পটি প্রপাত, যেমন দেখে এসেছি চেরাপুঞ্জির জলধারা। এতক্ষণে আমরা সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠেছি। বাতাস লঘু, মুখচোরা স্নিগ্ধ হাওয়ায় আমরা সজীব হয়েছি। সন্ধ্যার ছায়ায় আমরা ছোট্ট শৈলস্বাস্থ্যনিবাস বাটোটে এসে পৌঁছলুম।

আমরা মোট জন পঁচিশেক যাত্রী। সবাই বলছে, এবার ট্যুরিস্টের ভিড় কম। রাজনীতিক কারণে সকলেই ত্রস্ত। কারো কারো ধারণা, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আক্রমণ ঘটতে পারে। আমাদের গাড়িতে স্ত্রীলোক ও শিশুও আছে দুচার জন। কেউ কেউ বমি করতেও আরম্ভ করেছে, অর্থাৎ 'চক্কর' লেগেছে। একজন আছেন মাদ্রাজী সরকারী কর্মচারী, নাম আয়ার। তাঁর আর্থিক অবস্থার চাকচিক্য ঠিকরে পড়ছে আমাদের এপাশে আর ওপাশে। তিনি যাচ্ছেন কাশ্মীরে স্বাস্থ্যোদ্ধার কামনায়। যুবক বলা চলবে না, প্রৌঢ় বলতে বাধে। সম্ভবত কেউ তাঁকে বলে থাকবে, দুধ খেয়ো খুব, ফল খেয়ো তার চেয়েও বেশি। ফলে, তাঁর এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝুড়িতে ফল, দুই পকেটে ফল। গাড়ি কোথাও থামলেই তিনি ছোটেন কোনও দোকানে, যদি দুধ পাওয়া যায়। সকাল থেকে তিনি বার আষ্টেক দুধ খেয়েছেন, ফলের রস ঝরেছে তাঁর কোটপ্যান্টে। বাটোটের ছায়ান্ধকারে তিনি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়েছিলেন। বক্সীজী বারম্বার হর্ন দিচ্ছিলেন গাড়িতে তাঁর জন্য। একসময় তিনি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। মুখে হাতে জলের দাগ। বেশ হাসিখুশী। তাঁকে নিয়ে সারাদিন ধরে গাড়ির মধ্যে চাপা হাসি আব টুকরো কথার চোখ ঠারাঠারি ছিল। আয়ার ভ্রূক্ষেপ করেননি। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আর্যাবর্তের আজও রুচির মিল হয়নি।

গাড়ি ছাড়লো। কিন্তু এবারে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল মনে মনে। পাহাড়ের পথ অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। রাত্রি তার দিগন্তজোড়া ডানা মেলে নেমে এসেছে পীরপাঞ্জালের চূড়ায়-চূড়ায়। দিনমানে যে-হিমালয় শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক, রাত্রির অন্ধকারে তার দানবাকার মূর্তি হৃৎকম্প আনে। অনেক উঁচুতে উঠতে হচ্ছে, অথচ প্রশস্ত পথ নয়। একটু ভুল, একটু অমনোযোগ, একটু বা দৃষ্টিবিভ্রম,—অমনি আমাদের অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তি। সাধারণত রাত্রের দিকে পার্বত্য পথে মোটর চালনা নিষিদ্ধ। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানতে গেলে চলে না। বলা বাহুল্য, বাইরের দিকে নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা রুদ্ধশ্বাস ভয়ে গাড়ির মধ্যে বসে ছিলুম।

যেদিকে গহ্বর সেইদিকে আমি। গাড়ির চাকা আর মৃত্যুর মাঝামাঝি কয়েক ইঞ্চি মাত্র ব্যবধান, হেডলাইটের আলোয় তার পরিমাপ করেছিলুম প্রতি ক্ষণে। কিন্তু আতঙ্কময় বিমূঢ়তারও শেষ আছে একসময়ে। যদি হঠাৎ আসে একঝলক অরণ্যপুষ্পের গন্ধ, মৃত্যুভয় মধুর হয়ে ওঠে। যদি হঠাৎ চোখে পড়ে, শুক্লা সপ্তমীর মলিন জ্যোৎস্না বিশাল তির্যক ছায়া ফেলেছে হিমালয়ের ওই কৃষ্ণাঙ্গ দৈত্যদলের বক্ষপটে, তবে হতচেতন বিস্ময়ের উপর দিয়ে অনন্তের তোরণদ্বার খুলে যায়। একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমান কাঁপতে থাকে থরথরিয়ে।

আমরা যাচ্ছিলুম চন্দ্রভাগার ধারাপথ বেয়ে। ঘূর্ণি লেগেছে তার রক্তবরণ খরস্রোতে, সেই ঘূর্ণিজল মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় শত শত চন্দ্রঝলকে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। আমরা উৎরাই পথে রামবান সাঁকোর দিকে নেমে যাচ্ছি। বনতল অন্ধকার,—চন্দ্রহাস রাত্রি নেমে এসেছে চন্দ্রভাগায়। লক্ষ লক্ষ বৈদূর্যমণির মতো জ্যোৎস্না জ্বলছে খরতর তার প্রবাহে।

সম্মুখের রত্নগিরিদলের চূড়ার উপর আকাশলোকে এসে দাঁড়ালেন সপ্তঋষির দল। পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে এলো অপ্সরা,—জ্যোৎস্নারাত্রে লজ্জাবাস বিসর্জন দিয়ে যারা অবগাহন স্নানে নামে। বন্য কেশরীর রক্তমাখা পদচিহ্ন অনুসরণ করে সিংহশিকারী বল্কলবাসা কিরাত এসে দাঁড়ালো নদীর বালুবেলায়। নগ্নকান্তি বিদ্যাধরা ভূর্জপত্রে রক্তিম স্বর্ণাক্ষরে লিখে চলেছে প্রণয়সঙ্গীত। হিমালয়ের গুহাছিদ্র-নিঃসৃত শীতলশ্বাস নিকটবর্তী বেণুবনের মধ্যে প্রবেশ করে আপন মর্মরধ্বনিতে মধুর সুরযোজনা করে। ময়ূরপক্ষী কিন্নরদল নৃত্য করে যায় তার তালে তালে। আরণ্যক ঐরাবতরা এসে তাদের গাত্র ঘর্ষণ করে যায় বিশাল দেবদারুকাণ্ডে, সেই ক্ষতগাত্রের সুগন্ধে পর্বতশীর্ষ হয় সুবাসিত। হিমালয়ের বন্য জ্যোতির্লতার আভায় আলোকিত গুহাভ্যন্তরে অরণ্যচারী কিরাত ও যক্ষিণীগণের লজ্জাহরণের বিলোল বিহ্বল রসবঙ্গলীলা; অবশেষে মেঘের দল নেমে এসে গুহামুখে যবনিকার আবরণ টেনে দেয়। প্রভাতে আসেন সপ্তঋষিগণ স্বর্ণপুষ্পচয়নে। তাঁরা পদচারণা করে যান তুষার প্রান্তরের ধারে শতদল সায়রে।

সেই জ্যোতির্লতা আর স্বর্ণপুষ্পের সন্ধানে আমার উৎসুক দৃষ্টি ওই তারকাস্পর্শী বিরাট হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সেই জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

রামবান পেরিয়ে আমাদের গাড়ি আবার সেই ছায়ান্ধকার গিরিগাত্রের বিপজ্জনক পথ দিয়ে চড়াই ভেঙে চললো।

আতঙ্কে আনন্দে সে পথ বিচিত্র। ঠিক ভয় নয়, কিন্তু বিমূঢ় বিস্ময়। দুর্ভাবনায় কথা বলছে না কেউ। থার্ড গীয়রে গাড়ি চলছে, তার অবিশ্রান্ত গোঁ গোঁ আওয়াজে কানে তালা লাগছে। জ্যোৎস্নারাত্রে বিমানে চড়ে যারা আকাশলোকে বিচরণ করেছে তারা জানে এ আওয়াজ। বিমান ভেসে চলেছে স্বপ্নসায়রে। ভয়ের চেতনা লোপ পেয়েছে। বিমানখানি বিকল হয়ে যদি পড়ে যায় নীচে, তার পরিণাম সম্বন্ধে মন অসাড়। কারণ নীচেকার পৃথিবী দেখা যাচ্ছে না। কুতব মিনারের শীর্ষে উঠলে ভয় করে, কারণ পতনের ফলে যে শারীরিক সংঘাত ঘটবে—সেই কঠিন ভূমি আমরা দেখতে পাই। জ্যোৎস্নালোকে দশহাজার ফুট উঁচু শূন্যে বিমানে বসে আমরা শুধু দেখতে পাই একটা অবাস্তব মায়াচ্ছন্ন ব্যোমলোক,—সেটি শব্দজগতের ঊর্ধ্বে, সেখানে পাখি পৌঁছয় না,—প্রাণের কোনও চেতনা নেই। অনন্ত গগনে সেই আশ্চর্য শূন্য! ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে ভেসে চলেছে বিমান,—কিন্তু

অনুভব করছে না কেউ। প্রচণ্ড গতি, প্রচণ্ডতর বেগ,—অথচ বিমানটি স্থির, একটু নড়ছে না, একটু দুলছে না,—সে অচঞ্চল, গতিচেতনাহীন। চাঁদ নড়ে না, তারা নড়ে না, মহাশূন্য নড়ে না। আরামগদিতে শুয়ে আরোহীরা নিদ্রিত। কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে স্থির জ্যোৎস্না এসে পড়েছে হয়ত কোনও এক বিবশা তনুলতার উপরের মুখচন্দ্রমায়।

এখানে অন্য কথা। পর্বতপক্ষে জ্যোৎস্না, নীচের খদ ভয়ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এপারে বিশাল দেওয়ালগাত্রে যে-সূত্রপথ, তার উপর দিয়ে মোটর বাস চলেছে। চাকার পাশে দেখতে পাচ্ছি নীচের দিকে দুহাজার ফুট কালো গহ্বর,—দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর মুখব্যাদান, এবং তাকে পদে পদে এড়িয়ে পালাতে চাইছি!

রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় বানিহাল বস্তির উৎরাই পথে গাড়ি এসে পৌঁছলো। শরীরের অন্ত্রেতন্ত্রে তখন অবসাদ জড়িয়ে ধরেছে।

কয়েকখানি দোকানে অল্পস্বল্প আলো জ্বলছে। আবছা জ্যোৎস্নায় আশপাশে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমাদের গাড়ি এসে থামলো একটি যাত্রীশালার ধারে। এখানে আজকের মতো রাত্রিবাস। রক্ষক হলো এক মাড়োয়াড়ী। দুটাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিলুম।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই বানিহালের অধিত্যকা। চাঁদের আলোয় আন্দাজে বোঝা গেল, কাছাকাছি রয়েছে একটি গিরিনদী। এখানে ওখানে কয়েকখানি দোকানদানি, সামনেই কোথাও আছে একটি ব্যাটারিচার্জকরা বেতারযন্ত্র। আমার ঝুপসি ঘরখানার কোলে বারান্দা, সেখানে নানালোকের নানা জটলা। ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে। আগামী প্রভাতে সাতটায় আবার আমাদের গাড়ি ছাড়বে।

বনময় গিরিনদীঘেরা পাহাড়তলীর অধিত্যকায় ওই পরম সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রিটি ওই বেতারযন্ত্রের চিৎকারের দ্বারা যেন ক্ষণে ক্ষণে সূচিকাবিদ্ধ হচ্ছিল। এমন বিরক্ত হইনি আর কোনদিন ওই যন্ত্রটার প্রতি। কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করিনি। ঠাহর করে দেখি, এই পার্বত্য গ্রামটি কতকগুলি সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় পরিবেষ্টিত রয়েছে, এবং অদূরে একটি দোকানে ওই বেতারযন্ত্রের চারিদিকে অনেকগুলি লোক ভিড় করেছে। পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ও রাজপুরুষ করাচী থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাশ্মীরবাসীর উদ্দেশে বেতারে বক্তৃতা করছেন।

বক্তৃতার ভাষাটি উর্দু। অল্পস্বল্প বুঝতে পারা যাচ্ছিল। 'শেষ আবদুল্লার গদিচ্যুতি এবং অবরোধের সংবাদে সমগ্র পাকিস্তান আজ মর্মাহত এবং অশ্রুভারাক্রান্ত। কাশ্মীরবাসীগণের প্রতি ভারতের অমানুষিক অত্যাচার যে কতখানি বর্বরোচিত তা পৃথিবীবাসীগণ জানে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শেখ আবদুল্লার প্রতি ভারত যে-প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং ভারতীয় সৈন্যরা সমগ্র কাশ্মীরে নরনারী ও শিশু নির্বিশেষে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত। অতএব আমরা পবিত্র কোরাণের নামে শপথ করছি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ তোমাদের এই সর্বনাশা বিপদ থেকে উদ্ধাবের জন্য শ্রীনগরের দিকে অভিযান করবে। ইসলাম আজ বিপন্ন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। শেখ আবদুল্লা সাহেবের অপমানের প্রতিশোধ নাও।'

শেখ আবদুল্লার প্রতি এই প্রীতির সংবাদ শুনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খাঁনের কথা,—যাঁকে রাওয়ালপিণ্ডিতে হত্যা

করা হয়। তিনি একদা এক বক্তৃতাকালে ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে শেখ আবদুল্লার উদ্দেশে বলেন, 'কাশ্মীর আপকো বাপকা মিলিকিয়াৎ নেহি হ্যায়।'—কাশ্মীর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নয়!

শেখ আবদুল্লা শ্রীনগরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, কথাটা ঠিক। তবে কাশ্মীরে আমার পুরুষানুক্রমিক বসবাস। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ থেকে গিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি পশ্চিম পাঞ্জাবের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব করে, তবে তাকেই অনুরূপ সম্ভাষণ করা উচিত,—আমাকে নয়।

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁন এই মন্তব্যটি শুনে চুপ করে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাড়ি ছিল উত্তর প্রদেশে। আজ সহসা বেতার যন্ত্রে উচ্চারিত আবদুল্লার প্রতি এই প্রীতি—এর পিছনে কোনও রহস্যজনক কারণ আছে কিনা এখনও জানতে পারিনি।

আমার পক্ষে মুশকিল হলো এই, এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবকরা যদি সশস্ত্র এসে কাশ্মীরের উদ্ধারকার্যে লাগে, তবে আমি পালাবো কোথা? তাছাড়া কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও প্রবেশ করিনি,—এখনও আছি জম্মুপ্রদেশে,—সুতরাং ধরেই নেবো করাচীর শ্রদ্ধেয় নেতারা সত্যভাষণ করছেন। নেতামাত্রই সত্যভাষী—এই আমার ধারণা। তবে কি সত্যই সামগ্রিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে গিয়ে পড়তে হলো? প্রাদেশিক অভব্য ভাষায় বলতে হয়, একটু ভড়কে গেলুম!

ঘরে এসে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। ভিতরে দেখি সেই স্বাস্থ্যান্বেষী ফলভুক মাদ্রাজী ভদ্রলোক কৌপীন মাত্র সম্বল করে প্রাণপণে ডন্-বৈঠক দিতে ব্যস্ত। চেহারাটি তাঁর শীর্ণ,—এ বয়সে এক্সারসাইজের দ্বারা তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি কতখানি সম্ভব বলা কঠিন। আমাকে দেখে তিনি একটু থতিয়ে ইংরেজিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আজ থেকে আমি একাজ ধরলুম। এটা দরকার।

আমার মুখে চোখে প্রশ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। পুনরায় তিনি বললেন, ধরুন কাশ্মীর যদি আক্রান্ত হয়, আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার! দেশের জন্য, জাতির জন্য...

কিন্তু সাতদিনে কি লড়াইয়ের উপযুক্ত শরীর হবে আপনার?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক তা নয়, তবে মেহন্নত করলে মানুষ সাহসী হয়, জানেন ত?

জানলুম।

পুনরায় তিনি বললেন, অন্তত ছুটে পালাবার মতো শক্তিও থাকা চাই।— আজ একটি গুমোট! আপনি যদি অনুগ্রহ করে বাবান্দায় গিয়ে শোন, আমি এ ঘরটায় যা হোক করে থেকে যাই। একখানা খাটিয়াও রয়েছে দেখছি।

এবারে বলতে বাধ্য হলুম,—তার চেয়ে ভালো হয় যদি আপনি গিয়ে বারান্দায় শোন,—আপনার এক্সারসাইজ করা ঘর্মাক্ত দেহ একটু স্নিগ্ধও হবে! আমি ঘণ্টাখানেক আগে ওই মাড়োয়াড়ীর হাতে দুটি টাকাও দিয়েছি।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর কি মনে হলো, এ সময় জোব্বাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। সে-রাত্রে তিনি একটি স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিলেন, সকলের আগে আর দরজা খোলেননি।

তাঁর এই দরজা বন্ধের ইতিহাস হয়ত আরও একটু ছিল। আহারাদি সেরে ঘরে ঢুকে সুস্থির হয়ে বসেছি, এমন সময় জনতিনেক স্থানীয় অধিবাসী মহা হল্লা বাধিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। বাইরে একটা গোলমাল বেধেছে। ওদের মধ্যে দুজন মুসলমান এবং একজন

এই যাত্রীশালার খিৎমদগার। মুসলমান দুজনেই বয়সে যুবক, কিন্তু ওর মধ্যে একজন একটু বেশীমাত্রায় দেশী 'সরাব' পান করেছিল। একটু বেহুঁশ, একটুখানি টলটলে।

চেঁচামেচি শুনে বারান্দার ওদিকের ঘরগুলি সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে টলটলে যুবকটিকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অন্য যুবকটি ওকে যখন শান্ত করার চেষ্টা পাচ্ছে, ও তখন একখানা ছোরা বার করেছে। ওর ইচ্ছা, ওই শান্তিবাদী যুবকটিকে হত্যা করবে। আশে পাশে লোক হাসাহাসি করছিল। খুনে ব্যক্তিটিকে আমার বিছানায় বসানো হলো বটে, কিন্তু ছোরাখানা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। খুন সে করবেই।

হারিকেন লণ্ঠনে কেরোসিন তেল কম, সুতরাং আলোটা নিভে আসছিল। মদ-খাওয়া যুবকটি নাকি বেতার যন্ত্রে করাচীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক বাধায়, এবং সুস্থ শরীরে বন্ধুর পিঠে ছুরিকাঘাত করা একটু চক্ষুলজ্জার ব্যাপার বলে সে দেশীমদ খেয়ে ছুরি নিয়ে ছুটে আসে। হত্যা সে এখনই করবে, তবে তার আগে আমার ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অনুমতি পাওয়া দরকার।

যুবকটিকে একটি সিগারেট দিয়ে নিজেই দেশলাই জ্বেলে দিলুম। দেখি ওর চোখদুটো লাল টসটস করছে। হেসে বললুম, যে-ব্যক্তি ছুরি মারে, সে কি অনুমতির অপেক্ষা রাখে?

খুব জোরে সিগারেটে টান দিয়ে রাঙা চোখ তুলে যুবকটি বললে, আপনি কি মানা করছেন?

বললুম, না, মানা করবো কেন? তবে কাল সকালে মেরো। নইলে তোমার মতন ভদ্র ছেলের নামে এই দুর্নাম রটবে যে, তুমি মাতলামি করতে গিয়ে খুনখারাপি করেছ। বরং বেশ ভেবে চিন্তে মাথা ঠাণ্ডা করে ছুরি মারলে তবেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে!

ছেলেটি হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলো,—ঠিক বলেছেন। একে মেরে যদি ওই পাহাড় ডিঙিয়ে পুঞ্চ-এর দিকে পালাই, কে ধরছে! সালাম লিজিয়ে, সাব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাকে ওই 'দুষমন' বন্ধুটিরই সহায়তা পুনরায় নিতে হলো। অবাধ্য পা দুখানা তার বড়ই টলছিল।

সকালে উঠে দেখি নিস্তব্ধ পাহাড়পল্লী। তখনও ঠিকমতো বানিহালের ঘুম ভাঙেনি। রঙ্গীন পাখিরা পীরপাঞ্জাল থেকে নেমে এসেছে অধিত্যকায়। বস্তির উত্তরপ্রান্তে উপলাহত গিরিনদীর কুলুকুলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। চতুর্দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের অবরোধ। ওরই মধ্যে একটু আধটু চাষবাস ও ফলনের কাজ চলছে। দোকান-পাট এখনও খোলেনি। রাত্রে যে-উত্তেজনাটুকু দেখা গিয়েছিল, সকালে তার চিহ্নমাত্রও নেই। রাজনীতিক ভূমিকম্পের সঙ্গে কাশ্মীর চিরদিন পরিচিত, এই সামান্য বিপর্যয়ে তার বিশেষ কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমাদের গাড়ি প্রস্তুত হলো সকাল সাতটায়। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার প্রাক্কালে সেই যুবকটি এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে—যাকে আজ এখনই হয়ত হত্যা করা হবে। অতি ভদ্র মুসলমান যুবক। মদ্যপায়ী যুবকটি ওরই 'চাচার' ছেলে, নাম শের গুল। শের গুলের উত্তেজনা অতি ক্ষণস্থায়ী,—যুবকটি জানালো। ছোরাখানা নাকি এই যুবকটির কাছেই জিম্মা রেখে শের গুল ঘুমোতে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।

গাড়ি ছেড়ে চললো উত্তর পর্বতের চড়াই পথে। দেখতে দেখতে মধুর রৌদ্রের দিকে উঠে এলুম। আমরা চলেছি বানিহাল গিরিসঙ্কটের দিকে। বাতাস ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হচ্ছে। বর্ষায় ফল হয়েছে প্রচুর। ফুলশয্যা পাতা হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ধবলাধার গিরিশ্রেণীতে

যেমন কথায়-কথায় পাথরের হাড়পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে, এখানে তা নয়। শ্রাবণের নূপুর-ঝুমুর শোনা গেলেই মৃৎপিণ্ডের থেকে বেরিয়ে আসে মৌসুমীফুল বর্ষার অভ্যর্থনায়। সমগ্র পীরপাঞ্জালেরই এই প্রকৃতি, এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য। হাভেলীয়ন, আবটাবাদ, মুজাফরাবাদ, মীরপুর,—যেখানে যাও, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। কোথাও ছায়া পড়েছে প্রাচীন বনস্পতির, কোথাও বা সকরুণ মায়া কাব্যব্যঞ্জনার। প্রতি গুহাগহ্বরে রেখে যাচ্ছি আমার প্রাণের সুর, প্রতি গুল্মলতায় জড়িয়ে যাচ্ছি আমার মর্মের বাঁধন, আমার মায়ার কাঁদন।

দেখতে দেখতে প্রসারিত হচ্ছে জ্যোতির্ময় দিগন্ত। অন্ধকারে নীচের দিকে পড়েছিলুম গত রাত্রে,—যেখানে মানুষের ক্ষুদ্রতার ইতিহাস নিত্য রচিত হচ্ছে। যেখানে চিত্তের বিদ্বেষ পারিপার্শ্বিককে বিষাক্ত করছে ক্ষণে ক্ষণে; স্বভাবের বিকারে, চরিত্রের গ্লানিতে, সংশয় ও ধিক্কারে যেখানে নরক সৃষ্টি হচ্ছে কথায় কথায়। কিন্তু এখানে পূর্ব দিগন্তের রত্নগিরিদ্বারে উঠে এলে সব তুচ্ছ। এখানে হিমালয়ের হাওয়া ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করছে মুহুর্মুহু। যত উঁচু তত বিস্তার, ততই প্রসার। ক্ষতি নেই, যদি এখান থেকে ডাক দাও আরও বৃহত্তর দৈবজীবনকে, হাত বাড়িয়ে যদি সমস্ত আকাশকে আলিঙ্গন করো,—সমগ্র ক্ষুধার্ত প্রাণ যদি ডানা মেলে উড়ে যায় পীরপাঞ্জালের উপর দিয়ে হিমালয় ছাড়িয়ে কোথাও উধাও হয়ে। থামা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। যেমন আকাশপথে রাজহংসরা পাখা মেলে চলে যায় নিরুদ্দেশ লোকে; যেমন পরস্পর তারা কথা কয়, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!'

চড়াই উঠছে মোটর বাস,—প্রচণ্ড হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে। আপার মুণ্ডার দেওয়াল বেয়ে উঠছে,—সুদীর্ঘ জিগজ্যাগ্ পথ একবার পূর্বে এবং একবার পশ্চিমে প্রসারিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজ ভয় নেই গতরাত্রির মতো; যা কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল রাত্রের অন্ধকারে,—এখন সমস্তটা আলোকিত। কাল দেখেছিলুম মৃত্যুকে, আজ মৃত্যুর অতীতকে। মুখ ফিরিয়ে দেখছি অনেক দূরে রয়ে গেল বানিহাল গ্রাম, তারও চেয়ে অনেক দূরে সমতল ভারত প্রায় দশ হাজার ফুট নীচে। ক্রমে আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছলো পর্বতচূড়ার কাছাকাছি স্বল্পপ্রসার একটি মালভূমিতে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল সশস্ত্র সামরিক প্রহরী বানিহাল গিরিগহ্বরের প্রবেশপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে।

কাশ্মীর ও ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে এই একমাত্র সুড়ঙ্গপথ,—অন্য পথ নেই। এটি আগে কাশ্মীর মহারাজার নিজস্ব পথ ছিল। শীতের কয়েকমাস এই গহ্বরপথের এপার ওপার কঠিন বরফে আচ্ছন্ন থাকে, সেজন্য সম্প্রতি নীচের দিকে আরেকটি পথ নির্মাণের চেষ্টা চলছে। কাজ সমাপ্ত হলে কাশ্মীর অনেকটা সুগম হবে। আমাদের গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। অতঃপর একটি মিলিটারী গাড়িব কন্‌ভয় পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বাস ঢুকলো সেই অন্ধকার গহ্বর লোকে। দীর্ঘপথ সত্যই অন্ধকার ঘুটঘুট্টি। পিছনে জম্মু, সামনে কাশ্মীর।

ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মিনিট তিনেক। সত্যি বলবো, ঠিক এ প্রকার ধারণা আমার আগে ছিল না। অন্ধকার থেকে আলোয় আসামাত্র কাশ্মীরের দৃশ্য যে অবাক বিস্ময়ের ধাক্কা দেয়, সেটি বিচিত্র। কিছুক্ষণের জন্য চেতনা লোপ পায়। সৌরবিশ্বলোকের কোনও বাতায়ন থেকে যদি সৃষ্টিকর্তা আপন আশ্চর্য সৃষ্টির দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে অভিভূত হন্, তবে এটি সেই একমাত্র বাতায়ন। বায়ুস্তরের মধ্যে সূর্যরশ্মির যে কাঁপন উত্তরমেরুতে অরোরার আলিম্পনার সৃষ্টি করে, দুই চোখ মেলে তা বিশ্বাস করে যাচ্ছি।

চতুর্দিকে শত শত মাইল্স পরিব্যাপ্ত চিরতুষারময় হিমালয়, তাদেরই কোলে-কোলে ভাসছে মেঘের দল চিত্ররথের মতো। উপর থেকে দেখছি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারা,—এবং তাদের ভিতরে-ভিতরে পলকে-পলকে রামধনু তরঙ্গায়িত হচ্ছে নানা বর্ণে। বায়ুলোকে পরিব্যাপ্ত সূর্যরশ্মি এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে মুহুর্মুহু; ফলে, দৃষ্টি আমাদের বিভ্রান্ত হচ্ছে পলকে-পলকে। প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে আছি বলেই এই দৃষ্টিবিভ্রম এবং এই অনির্বচনীয় বিস্ময়। সমতলে নেমে গেলেই দৃষ্টি স্বচ্ছ। পৃথিবীকে আমরা দেখছি একই চেহারায় লক্ষ লক্ষ বছর থেকে, বিপরীত দিক থেকে একে কখনও দেখিনি। কিন্তু ভিন্ন গ্রহের উপরে দাঁড়িয়ে যদি দেখতুম পরিচিত পৃথিবীকে, তবে দৃশ্য-বৈচিত্র্য আবিষ্কার করতুম। পাশের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়িটি দেখলে বৈচিত্র্যবোধের আস্বাদ লাগে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বানিহালের এই সুড়ঙ্গলোক দিয়ে যদি কাশ্মীরে প্রবেশ করতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা লাভ করতুম!

মিনিট দুই হতচেতন হয়ে ছিলুম। ওইখানে নেমে একবার দেখে নিলুম দেবতাত্মার শীর্ষলোক। শ্বেতচূড়া একটির পর একটি পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বে প্রসারিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্ট হিন্দুকুশ আর কারাকোরামের প্রত্যন্ত শীর্ষ. গিলগিটের পারে দুমানি, দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার তুষারশীর্ষ, কোলের কাছে দেখছি হরমুখ, সোনামার্গ আর জোজিলা, বাল্‌তিস্তানের পূর্বলোকে গাসেরব্রুম আর মাসেরব্রুম, তার দক্ষিণে দেবসাহি, লাডাখ আর জাসকার গিরিশৃঙ্গমালার অন্তহীন তরঙ্গলোক।

গাড়ি এবার নামতে লাগলো আপার মুণ্ডার পথ বেয়ে। কিন্তু ওই যে দু মিনিটের একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল মূর্ছাহত হয়েছিল, ওটা যেন ভূতের মতো পেয়ে রইলো। শুধু আমার কাছে নয়, প্রত্যেক পর্যটকের কাছেই চিরকালের কাশ্মীর ওই দু মিনিটের মধ্যে নির্ভুল সত্য হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে গাড়ি নেমে যেতে লাগলো নীচের দিকে। অনেক দূর নীচে সেই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ 'পপলার এভেনু' পথটি ছবির মতো চোখে পড়ে। সমগ্র বিরাট উপত্যকা নীলাভ সবুজ, এবং বর্ষার শেষ প্রান্তে এসে সজল শ্যামল শোভায় ঝলমল করছে। বুঝতে পারা যায় কাশ্মীর কেন এত লোভের বস্তু, কেন এই মানহারা সর্বহারা অনাথিনীর সর্বাঙ্গে হাজার দু হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বর্বরের দল তাদের হিংস্র দাঁতের দাগ ও নখের আঁচড় রেখে গেছে।

উপর থেকে নেমে সমতল পথে গাড়ি চললো। চব্বিশ ঘণ্টার পর সমতল দেখলুম। আরও কুড়ি মাইল ওই পপলার শ্রেণীর মধ্যপথ ধরে এসে কাজিকুণ্ডে পৌঁছে বাস থামলো। এখানে প্রাতরাশ সেরে নিতে হবে। কাজিকুণ্ড থেকে শ্রীনগর যতদূর মনে পড়ছে আন্দাজ চল্লিশ মাইল পথ।

এই পথ খানাবলে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একটি যায় উত্তরপূর্বে পহলগাঁওর দিকে,—অন্যটি উত্তরে অবন্তীপুরা হয়ে সোজা চলে যায় শ্রীনগরের দিকে। ছোট ছোট পাহাড় এক পাশে, কিন্তু একদিকে অনন্ত ধানক্ষেত এবং আখের চাষ। সবজি ও শস্যের বাগান এখানে ওখানে। গ্রামের বাড়িগুলি ছবির মতো, প্রত্যেকটিতে শিল্পীমন কাজ করেছে। এ ধরনের ঘরদোর ভারতবর্ষে দেখিনি। সস্তায় বিভিন্ন নামের ফল পথেঘাটে দোকানে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। এটা ভাদ্রের প্রথম, বাজারে আপেল আসছে অল্পস্বল্প। টসটসে আঙুরের গোছা নিংড়ে খাচ্ছে কাশ্মীরী মেয়ে। কালো চোখের প্রসন্ন চাহনির দ্বারা বিদেশীকে ওরা অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ওরা কি জানে, অজানা বিদেশীর পৈশাচিক

বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে ওদের মাটির ঘরের গৃহস্থালী যুগে যুগে মাটি হয়েছে? এতকাল ধরে মার খেয়েও কাশ্মীরীদের স্বভাব-কোমলতা নষ্ট হয়নি, এটা ওদের পক্ষে গৌরবের কথা—এ আমি মনে করিনে।

বিতস্তার গৈরিক-রক্তিম আঁকা-বাঁকা স্রোত চলেছে পাশে পাশে। আশ্চর্য, এত বড় পার্বত্য উপত্যকায় পাথরের জটলা কোথাও দেখছিনে। চারিদিক মৃন্ময় আর কোমল। প্রথম দেখলুম 'চেনার' আর 'উইলো' গাছ। চেনারের বৃহৎ বৃক্ষ ছায়া ফেলেছে মসৃণ সুন্দর পথে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ-ছাগল ও গরুর পাল চরছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরী পণ্ডিত আর পণ্ডিতানিকে।

গাড়ি ছুটেছে। ছুটেছে দূর থেকে দূরান্তরে। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। একসময় প্রখর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর বাস এসে পৌঁছলো আধুনিক শ্রীনগর শহরের এক মোটর স্ট্যান্ডে। সেখানে টাঙ্গাওয়ালাদের ভিড় জমেছে।

প্রায় আধমাইল দূরে কাশ্মীর খালসা হোটেলে গিয়ে উঠলুম।

* * *

হরমুখ পর্বতের পাদভূভাগে প্রাচীনকালে ছিল দিক্‌চিহ্নহীন সুবিশাল জলাশয়। তার পৌরাণিক নাম হলো সতীসায়র। দেবী পার্বতী নেমে আসতেন তুষারচূড়া থেকে, এবং এই জলাশয়ে তরণীবিহার করতেন। তারপরে গিয়েছিল কতকাল। হরপার্বতী গেলেন অধিকতরো লোভনীয় মানস সরোবরে। ইত্যবসরে জলোদ্ভব নামক জনৈক অসুর এসে অধিকার করলো ওই সতীসায়র। মানুষের উপরে দানবের অনাচার চললো বহুকাল। ওদিকে ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপমুনি এই অনাচারের প্রতিকারের জন্য হাজার বছর ধরে তপশ্চর্যা করছিলেন। সেই তপস্যায় খুশী হয়ে দেবী তাঁর নিকট এক পাখিকে পাঠিয়ে দেন। পাখির ঠোঁটে ছিল একটি পাথরের টুক্‌রো। ওই পাথরের টুক্‌রোটি জলোদ্ভব অসুরের শিরে ফেলা হয়, এবং ক্রমে সেই পাথর বৃহদাকার ধারণ করে। এর ফলে জলোদ্ভব সতীসায়রের নীচে সমাধিস্থ হয়, এবং বর্তমান হরিপর্বত দাঁড়িয়ে ওঠে। সতীসায়রের জল চলে যায় বরাহমূলের দিকে, মৃন্ময়ভূমি দেখা দেয় চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত অধিত্যকায়, এবং পরবর্তীকালে এই ভূভাগের নাম হয় 'কশ্যপ-মীর।'

ঠিক এমনি উপকথা শুনে এসেছি নেপালের কাটমাণ্ডুতে। মঞ্জুশ্রীদেবের খড়্গাঘাতে বাগমতীর সৃষ্টি হয়। নেপাল উপত্যকার জন্ম তখন থেকে। ওদের পূজ্য মঞ্জুশ্রীদেব।

এই সমস্ত উপকথার পিছনে একটি সত্য আজও বিজ্ঞানীদের চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে, কাশ্মীরের 'সুখী উপত্যকা' এককালে 'অনবতপ্তা' মানসের পদ্ম-সরোবরের মতো বিশাল জলাশয় ছিল। আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে পাহাড়ের উপরে বহু অঞ্চলে সেকালের সেই সাগর-উদ্ভূত জীবাণুর নানাবিধ প্রাণময় কোষ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ভূতাত্ত্বিকরা চমৎকৃত।

খ্রীস্টপূর্ব দুহাজার বছর আগে কোনও নির্দিষ্ট রাজশক্তির খবর পাওয়া না গেলেও রাজা দয়াকরণ ও রাজা রামদেবের কথা শোনা যায়। অতঃপর ঐতিহাসিক কালে আসেন রাজা প্রবর সেন এবং রাজধানীর নাম হয় প্রবরপুর। এইটিই বর্তমান শ্রীনগর। খ্রীস্টপূর্ব আড়াই শো বছর আগে সম্রাট অশোক এসে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে রূপান্তরিত করেন। এই রাজভিক্ষুর মহৎ আদর্শকে বরণ করে সনাতনীরাও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এর পরে আসেন রাজা জলক এবং তিনি পর্বতশীর্ষে একটি প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করেন, সেটি আজও

দাঁড়িয়ে,—কিন্তু তার নাম শঙ্করাচার্য। এই সময় তাতার দস্যুর দল কাশ্মীর আক্রমণ করে। ক্রমে সম্রাট কনিষ্ক এসে দাঁড়ান, এবং তাঁর রাজত্বকালে দস্যুদল বিতাড়িত হয়। কনিষ্কের কালেই কাশ্মীরের বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধধর্মের কোনও একটি মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান ঘটে। পরবর্তী শত শত বৎসর অবধি কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। খ্রীস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে শ্বেত হুনরা আক্রমণ করে এই ভূস্বর্গ, বীভৎস অনাচারের দ্বারা কাশ্মীরকে তারা শ্মশানে পরিণত করে। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রধান হলেন বৌদ্ধ-বিরোধী মিহিরগুল। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং কাশ্মীরের এই সর্বনাশ দেখে যান—মিহিরগুলের হাতে তখন বৌদ্ধবিহারগুলি প্রায় সবই একে একে ধ্বংস হয়েছে। বৌদ্ধভিক্ষুরা পলায়ন করেন তিব্বতের দিকে, সেখানে নির্মাণ করেন বহু বৌদ্ধমঠ। শ্রীনগর থেকে কয়েক মাইল দূরে হরবনের প্রান্তে আজও সেকালের ভূপ্রোথিত বৌদ্ধবিহারগুলির উদ্ধার কার্য চলছে।

এর পর কাশ্মীরে হিন্দুরাজত্ব আরম্ভ। কবি কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী' বলছে, নৃপতিশ্রেষ্ঠ ললিতাদিত্য এলেন, এলেন অবন্তীবর্মণ্, এলেন একে একে হিন্দু নরপতি। সমগ্র কাশ্মীরে অদ্যাবধি বৌদ্ধ ও হিন্দু ভিন্ন অপর কোনও জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্থাপত্য-কীর্তি নেই। রাজা ললিতাদিত্য আজও কাশ্মীরে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সম্রাট অশোক, এবং কনিষ্কের পরেই তাঁর আসন নির্দিষ্ট। এই উপত্যকায় তাঁর বিপুল কীর্তি সর্বজনস্বীকৃত। মার্তণ্ড জনপদে তাঁর মন্দির এবং কাশ্মীরভূভাগব্যাপী তাঁর স্থাপত্যকীর্তি আজও তাঁর চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর জন্য অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবের যুগ।

রাজা ললিতাদিত্য সমগ্র উত্তর ভারতখণ্ডে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হননি। বিস্ময়ের কথা এই, তুরস্কের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ললিতাদিত্য তুরস্ক এবং মধ্যএশিয়ার একটি প্রধান অংশ আপন শৌর্যবলে জয় করেছিলেন। সমগ্র মধ্যএশিয়ার অ-সভ্য জাতিগণের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির কালজয়ী মহিমা। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বেরুনী বলেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের আমলে তাঁর দিগ্বিজয়-মহিমা এতদূর গৌরবময় হতে পেরেছিল যে, প্রতি বৎসর কাশ্মীর জুড়ে মস্ত এক উৎসবের সাড়া পড়ে যেত।

হিন্দুরাজত্বের চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে পার্বত্য উপজাতি দাম্‌ড়া ও তান্ত্রিয়রা কাশ্মীরের কল্যাণ-যজ্ঞ নষ্ট করতে চেয়েছে বারম্বার। অগ্নিসংযোগ, লুট, নরহত্যা, নারীহরণ—এই ছিল তাদের পেশা। কবি কল্‌হন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসব বর্ণনা করেছেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণীতে' তিনি বলছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী হিন্দু রাজত্বের কালে কাশ্মীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূভাগে পরিণত হয়। সাহিত্যে, কাব্যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, ভগবৎদর্শনে এবং শৈব বেদান্ত সংস্কৃতিতে কাশ্মীর ছিল অদ্বিতীয়। জনসাধারণ সমগ্রভাবে ধর্ম ও মনুষ্যত্ববাদে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে।

চতুর্দশ শতাব্দীর তাতার যোদ্ধা জুল্‌ফি কাদির খাঁন আসেন কাশ্মীরে। ভয়ানাম্ ভয়ম্ ভীষণম্ ভীষণানাম্! তাঁর এক হাতে শানিত তরবারি, অন্য হাতে অগ্নিসংযোগের উপকরণ। তাঁর দানবিক লীলায় কাশ্মীর অগ্নিসিদ্ধ হয়। যাবার সময় তিনি পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ নরনারীকে ক্রীতদাস স্বরূপ নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর সেই রক্তরাঙা পথে আসে প্রচণ্ড তুষার-ঝটিকা, তিনি নিজে তাঁর উপজাতীয় দস্যুদলসহ এবং ওই নিরীহ পঞ্চাশ হাজার

নরনারী সমেত তুষার সমাধি লাভ করেন। আজও তাদের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায় হুন্‌জা পর্বতের প্রান্তে আর কোহিস্তানে, হিন্দুরাজ পর্বতমালার আশে পাশে আর পামীরের মালভূমির তলায়-তলায়। সেকালে কাশ্মীরে ছিল জ্ঞান আর বিদ্যা, কাব্য আর সংস্কৃতি,—কিন্তু না ছিল ক্ষাত্রশক্তি, না ছিল রাজশৌর্য। তবে কাশ্মীরের ইতিহাসে অনাচার ওখানেই শেষ হয়নি। দেখতে দেখতেই আবার এলেন গজনীর মহম্মদ, এলো আবার তাতার যোদ্ধার দল। এই প্রকার পাঠান আক্রমণের যুগে সেইকালে কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন একাধিক হিন্দুসম্রাজ্ঞী,—তাতার ও পাঠানদের সঙ্গে বহুবার তাঁরা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। ওদের মধ্যে একজন রানী অনেককাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন,—যখন তাঁর স্বামী প্রাণভয়ে পলায়ন করেন রাজ্য ছেড়ে। তিনি জনৈক পাঠানকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁর অন্যতম মন্ত্রীপদে। কিন্তু সেই মন্ত্রী শা মির্জা কৌশল-চক্রান্তের দ্বারা সিংহাসন দখল করে এবং রাজরানীকে পত্নীরূপে লাভ করার জন্য হাত বাড়ায়। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা রানী আত্মনাশের দ্বারা মুক্তি লাভ করেন।

আবার একশো বছর ধরে পাঠান সুলতানদের হাতে কাশ্মীর উৎপীড়িত হতে থাকে। দেব-দেবীর মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মন্দিরগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়। মার্তণ্ড, পাণ্ড্রেথান, গণেশবল, ব্রজবিহার প্রভৃতি জনপদ একে একে ধ্বংসস্তূপে ভরে যায়। সুলতান শিকান্দারের বীভৎসতা কাশ্মীরের পথে পথে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাতার আর পাঠানের কলঙ্ককাহিনীতে কাশ্মীর ভরা।

কিন্তু এক সময় ওই দৈত্যকুলের ভিতর থেকে প্রহ্লাদ এসে দাঁড়ালেন। তিনি বাদশাহ জয়নুল আবেদিন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরীদের অকৃত্রিম সুহৃদ্। তিনি মন্দির মেরামত করলেন, খাল কেটে বন্যার তাড়না থেকে কাশ্মীরকে বাঁচালেন। কাগজ, রেশম, শাল---এদের কারখানা বসালেন। ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। কাশ্মীরীদেরকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। আজও অনেক অঞ্চলে জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে লোকসঙ্গীত প্রচলিত, আজও শ্রীনগরে 'জয়না-কদলে' তাঁর ওই সমাধিস্তম্ভটি রাষ্ট্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত আছে।

কিন্তু পাঠান ও তাতারের বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্ষণকালের তুলনায় জয়নুল আবেদিনের রাজত্বকাল আর কতটুকু? দার্দ দেশ থেকে এলো গাজি খাঁন, এবং তার পরে-পরে পাঁচসাতজন দস্যু নরপতি। আঘাতে আর অপমানে কাশ্মীরীদের পিঠ আবার দুমড়িয়ে গেল। মনুষ্যত্বের শেষ দশায় এসে তারা দাঁড়ালো। কেঁদে কেঁদে অসাড় হয়ে এলো কাশ্মীর।

অবশেষে সম্রাট আকবরের হিন্দু সেনাপতিরা কাশ্মীরে তাঁদের জয়পতাকা তুললেন। 'সুখী উপত্যকায়' বহুকাল পরে শুভসুযোগ এলো। জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠে দাঁড়ালো। আকবর পুনরায় হরিপর্বতের প্রাচীন দুর্গটির সংস্কার সাধন করলেন। প্রাকার তুলে দিলেন চারদিকে। তাঁর পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর পুষ্পোদ্যান বানাতে বসলেন ভেরিনাগে, নাসিমে, শালিমারে, নিশাতে। চেনারের চারা এনে পুঁতলেন সর্বত্র। নূরজাহান বানালেন 'পাথর মসজিদ'। জাহাঙ্গীর-পুত্র শাহাজাহানও পিতার অনুসরণ করেছিলেন। অতঃপর আওরঙ্গজেবের আমলে আবার কাশ্মীরে উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। পণ্ডিতদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলে, অন্যায় রকম কর দিতে তারা বাধ্য হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল দরবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেইকালে

মোগলরাজের প্রতিনিধিগণের স্বেচ্ছাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন কাশ্মীরে দানবীয় আকার ধারণ করে। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন আফগানীরা? অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এলো তাদের পাশবিক আক্রমণ। আহমদ শা দুরানি জয় করলেন কাশ্মীর। পরবর্তী ষাট বৎসরকাল অবধি সর্বব্যাপী ধ্বংস ও নারীর সতীত্বনাশ করে চললো তারা। ওটা ওদের গৌরব, ওটাই ওদের ইতিহাস। ওদের পাশবিক অত্যাচার কোনও জাতিভেদ মানেনি, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মনাশ করাই হলো ওদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে কাশ্মীরী নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা হলো; যারা রাজি হতে চাইল না তাদেরকে আগুনে পোড়ানো, জীবন্ত সমাধি দেওয়া, শূলে চড়ানো, বন্যজন্তুর খাঁচায় ফেলা, অথবা জীবন্ত দেহকে চটের থলেতে মুড়ে দাল-হ্রদে ডুবিয়ে হত্যা,—এই সব চললো।

দাল-হ্রদের এক কোণের একটি নামকরণ করা আছে, 'বাট-মাজার',—অর্থাৎ হিন্দুসমাধি। এমনি করেই কাশ্মীরে অ-হিন্দুর সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে এই হাজার হাজার 'হিন্দু' যখন লক্ষে লক্ষে পরিণত হলো, সেই সময় তারা সদলবলে ফিরে আসতে চাইল তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মে,—কিন্তু অনেক দেরি করেছিল তারা,—বারাণসীর সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাদের আবেদন মঞ্জুর করলো না। আজ সেই আচরণের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বৈকি।

ইতিহাস নয়, কাশ্মীরের বুকের যে যন্ত্রণা এ তারই কাহিনী। কিন্তু এইখানেই শেষ হয়নি। আফগানী জব্বর খাঁনের অত্যাচারে অস্থির হয়ে পণ্ডিত বীরবল ধর লাহোর থেকে ডেকে আনলেন রণজিৎ সিংহের সেনাপতি রাজা গুলাব সিংকে। তিনি পীরপাঞ্জাল পেরিয়ে এসে জব্বর খাঁনকে বিতাড়িত করলেন। ঊনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। জনৈক ইংরেজ ভ্রমণ করেছিলেন কাশ্মীরে। তিনি বললেন, শিখরা আফগানীদের চেয়ে কম স্বেচ্ছাচারী নয়। হতভাগ্য দরিদ্র কাশ্মীরীরা জোগাতে পারলো না রাজস্ব, সুতরাং তারা নিশ্চিহ্ন হতে লাগলো। দেশে ভূমিকম্প, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন—কথায় কথায়। বিচার নেই, অন্যায়ের প্রতিকার নেই, হত্যার শাস্তি নেই, অন্ন-বস্ত্র কোথাও কিছু নেই,—চারিদিকে হাহাকার।

এমন সময় রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যু হলো। শিখরা পরাজিত হলো ইংরেজের হাতে। রাজা গুলাব সিংয়ের হাতে এলো কাশ্মীরের শাসনভার। হৃদয় তাঁর কঠিন বটে, কিন্তু শানিত যুক্তি এবং প্রখর ন্যায়বুদ্ধির গুণে কাশ্মীরে তিনি সুশাসনে প্রতিষ্ঠা করলেন। গুলাব সিংয়ের পৌত্র প্রতাপ সিং অপুত্রক ছিলেন, সেই কারণে তাঁর ভাগিনেয় হরিসিং মহারাজা হন। হরি সিংয়ের পুত্র হলেন যুবরাজ করণ সিং।

দেখতে দেখতে দাল-হ্রদের তীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। আলো জ্বলেছে হাউস বোটে আর নেহরু-পার্কের তাঁবুর মধ্যে। ফিরে চললুম শহরের দিকে।

শ্রীনগর দুই পারে বিভক্ত,—মাঝখান দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। সাতটি সাঁকোর দ্বারা নগরের দুই পার সংযুক্ত। বিতস্তাকে দেখলে কালীঘাটের আদিগঙ্গাকে হঠাৎ মনে পড়ে। নৌকা, শিকারা ও হাউস-বোটের ভিড় পদে পদে। আমি ছিলুম শহরের প্রায় নাভিকেন্দ্রে, জনতার কোলাহলে,—ওটায় আমার প্রয়োজন ছিল। হাট-বাজারের ভিড়ের মধ্যে, নোংরা বস্তির আনাচে-কানাচে, টাঙ্গা ও মোটরওলাদের আড্ডায়, ফলওয়ালা ফেরিওয়ালাদের পাড়ায়-পাড়ায়,—আমার কৌতূহলের সীমা নেই। হরি সিং হাই স্ট্রীটের পাশে রাধাকিষণের

মন্দির, পঞ্চমুখী হনুমানজী আর মহারানীর রামজী মন্দির,—এরা রয়েছে নগরের কোলাহলমুখর পল্লীতে। বিতস্তার তীরে রাজা গুলাবসিংয়ের প্রাসাদের মধ্যে পাওয়া গেল গদাধরের মন্দির। এই প্রাসাদের একটি অংশে বসেছে আজ সরকারী দপ্তরখানা। প্রাসাদের পশ্চিমে হলো গান্ধীময়দান। একদা মহাত্মাজী এখানে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরবাসীকে সম্ভাষণ করেছিলেন। সেটি ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রাক্কাল। এই প্রাসাদের তল বেয়ে চলেছে আপন মনে বিতস্তা। ওপারে দূরে হরিপর্বতের দুর্গ চোখে পড়ে।

শঙ্খঘণ্টারবে নদীতীর মুখর, সূর্যপ্রণাম করছে কাশ্মীরী পণ্ডিতের মেয়েরা। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছে। নামহারা অজানা মন্দির অসংখ্য। কপালে চন্দন-তিলক, মাথায় লাল অথবা শাদা পাগড়ী, বর্ণ গৌর—এরা হিন্দু। সরকারি দপ্তরে, ডাকঘরে, টেলিফোনে, ব্যাঙ্কে, কাজকারবারে,—যেখানে যাও, সেখানেই পণ্ডিত। মুসলমান মানেই শ্রমিক জগৎ। কোনও মুসলমানের দাড়ি নেই, নমাজ পড়ে না অধিকাংশ। গরু কাটে না কেউ কাশ্মীরে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের গন্ধও নেই কোথাও। হিন্দুপরিবারে অবাধে চাকুরি করে মুসলমান; শিখহোটেলে নির্বিবাধে রাঁধে মুসলমান,—জাতিভেদ একটু নেই। মুসলমানের হাতে খাচ্ছে যে-কেউ, ঢালাও বাস করছে উভয়ে একত্র। চট্ করে মনে হতে পারে এটি আজব দেশ,—ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে। হিন্দু-পণ্ডিত আর আর্যমুসলমান বাস করছে কাশ্মীরের ঘরে-ঘরে।

ফিরছিলুম পথে-পথে। শের-ই কাশ্মীর পার্কের আনাচে-কানাচে, কিংবা বিতস্তার ধারে-ধারে, ময়দানের আশে-পাশে, ছায়ানিবিড় বাগানবাড়ির পাড়ায়-পাড়ায়। মনে অস্বস্তি ছিল দু'কারণে। পাকিস্তানের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কখন এসে পৌঁছয়, কখন বা শ্রীনগরে রক্তারক্তি আরম্ভ হয়। ধারণাটা আমার ভুল। আমার আসবার কয়েকদিন আগে খালসা হোটেলের কাছে দু'চারটি দোকানের সামনে একদিন একটু হল্লা হয়, দু'একটি লোক বুঝি পুলিসের গুলিতে মারা যায়,—তার পরে সব শান্ত। যেমন চলছে তেমনি। পীরপাঞ্জালের চূড়া চেয়ে রয়েছে কাশ্মীরের দিকে, চেয়ে রয়েছে হরমুখের চূড়া শাশ্বতকাল থেকে,—নীচের দিকে ইতিহাস পাল্‌টে যাচ্ছে কথায়-কথায়। দরিদ্র কাশ্মীর, ভাগ্যহত কাশ্মীর,—আছে তার ঘরে বিদুরের খুদ, আছে সুশীতল জল। কিন্তু না আছে সোনা, না কয়লা, না তেল, না লৌহধাতু। সমগ্র জগৎ এসে কাশ্মীরে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে যায়, রূপে আর গুণে সে লোভের বস্তু। পাঠান, তাতার, হুন, মোগল,—এরা এসে পাত পেতে খেয়ে গেছে, যাবার সময় হতভাগ্যদের ঘরকন্না ভেঙে দিয়ে মেয়ে লুট করে নিয়ে গেছে। সতীত্বনাশ আর ধর্মনাশ,—এই হলো কাশ্মীরের মধ্যযুগের ইতিহাস। মেরুদণ্ডভাঙা নিরুপায় দুর্বলের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বর্বর যুগে-যুগে। স্বভাবের কোমলতা তারা বোঝেনি, বোঝেনি ন্যায় ও নীতির মর্ম, বোঝেনি জ্ঞান-বিদ্যা-সংস্কৃতির মহিমা,—কিচ্ছু বোঝেনি। চেয়ে-চেয়ে দেখছি, সমস্ত মাঠের তৃণশয্যায় ফুল ফুটে রয়েছে বর্ণবাহার কার্পেটের মতো। নদীর তীরভূমি, পাহাড়ের গা, সরোবরের কোল,—সর্বত্র ফুল। পরিত্যক্ত জঞ্জালের স্তূপ, নালা নর্দমার ধার, বাসস্ট্যান্ডগুলির ময়লা উঠোন, মাছি-ভন্‌ভনে দোকানের নোংরা জলের পাশ, ওদের মধ্যেই অজস্র অনামা ফুল। ফুটবলের মাঠে ফুল মাড়িয়ে ছেলেরা খেলা করে, মেষ-ছাগল-গরুরা ফুল মাড়িয়ে ওঠে পাহাড়ের গায়ে, ফুল মাড়িয়ে তীর্থযাত্রীরা অতিক্রম করে অমরনাথের দিকে দুর্গম পাহাড়, কাটাধানের মাঠ ফুলে ভরে যায় কথায়-কথায়। তুলতুলে কাশ্মীরের মাটির তলা থেকে

হাওয়ায়-হাওয়ায় ফুলের রাশি ওঠে দাঁড়িয়ে। এত ফুল ফুটলো বলেই নরম হয়ে রইলো কাশ্মীরী মেয়ে,—আঙুরের গোছায় আর আপেলের শাঁসে রস এত নিবিড় হলো বলেই তারা মদালসা হয়ে রয়ে গেল। এ ভালো নয়। খুশী হতুম, যদি দেখতে পেতুম কাশ্মীরে কাঁটালতার ভিড়, যদি দেখতুম প্রাচ্যের এই নন্দনকাননে পাওয়া যায় বিষাক্ত সর্প, যদি জানতুম অরণ্যে-অরণ্যে দেখা যায় হিংস্র শ্বাপদ। আমরা বাঙালী, কবিতার দেশে আমাদের জন্ম। গান গেয়ে-গেয়ে আমরা ভাষ্য সৃষ্টি করেছি। কালো মেয়েকে আমরা বলি কৃষ্ণা, কালো পাথরকে বলি শালগ্রাম। আঙুল টিপলে জল ওঠে বাঙালীর চোখে, জ্যোৎস্না দেখলে আমরা যাই ফুলবাগানে, নদীর কল্লোলের সঙ্গে আমরা ধরি মাঝির গান। বাঙালী ভালোবাসা জানে, কিন্তু অপমানের বিরুদ্ধে খড়্গাঘাত করতেও সে জানে। অকল্যাণ ঘনিয়ে এলে সংহারমূর্তি ধরে বাঙালী। রাষ্ট্রে অধর্ম দেখা দিলে বাঙালী হিংস্র হয়ে ওঠে; উৎপীড়নে জর্জরিত হতে থাকলে বাঙালী অপেক্ষা প্রতিশোধপরায়ণ জাতি আর কেউ নেই। ডান হাতে তরবারি ধরে বাঙালী গীতাপাঠ করে।

সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বভাবের দৃঢ়তা থাকলে কাশ্মীরকে মানিয়ে যেত। কাশ্মীরে পাথর নেই তাই কাঠিন্যও নেই। ওদের ওই লাবণ্যলতাকে নিষ্পেষণ করলে রক্ত ঝরে না, আঙুরের রস গড়িয়ে পড়ে। চাহনিতে ভদ্রতা, আচরণে নম্রতা, চলনে ভব্যতা। জাতিভেদ আছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতা নেই; রুচিভেদ আছে, কিন্তু তার প্রকাশে রুক্ষতা নেই। ওদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক খাদ্য। ওদের রাজনীতির মধ্যে বিরোধীদলের ধ্বংসাত্মিক চক্রান্ত নেই,—ওরা সবাই একাকার। যাদের সঙ্গে মতে মিলছে না, তাদেরকে ডেকে আনে ঘরের মধ্যে বিরোধ মিটাবার জন্য। ওদের কোনও উগ্র রাজনীতিক অথবা অর্থনীতিক মতবাদ নেই। ওদের একমাত্র কাম্য হলো যুগযুগান্তরের দস্যুতার হাত থেকে কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ করেছে।

দেখছি খানাবল, দেখছি অনন্তনাগ আর মার্তণ্ড, দেখছি আইশমোকাম আর গণ্ডাবরল,—ভাবের বিরোধ নেই কোথাও। নিরীহ সংসারযাত্রা অনাহত শান্ত। মাঠে-মাঠে চাষ চলছে ধানের, মন্দিরে শোনা যাচ্ছে ঘণ্টারব, বিতস্তায় স্নান করে যাচ্ছে মেয়েপুরুষ, কলাবাগানের ধারে লাউমাচার পাশে খেলা করছে শিশুরা, বিছানা রোদে দিচ্ছে মেয়েরা। উপর দিকের দিগন্তে দেবতাত্মা হিমালয়ের আদিঅন্তহীন অবরোধ। অনন্ত পর্বতমালা গগনের এ প্রান্ত থেকে চলে গেছে কোন্ প্রান্তে,—সে যেন দিশাহারা নিরুদ্দেশ। ওই পর্বতশ্রেণীর অজানা অনামা গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে চিরকাল ধরে দানব ও দেবতার আনাগোনা চলেছে। সব চেয়ে প্রাচীন, সব চেয়ে দুঃসাহসিক বিজয়াভিযান চলে এসেছে ওই হিন্দুকুশের তলায়-তলায়। প্রাচীন সভ্যতার বার্তা চলে গিয়েছে এপার থেকে ওপারে। ওরা পেরিয়েছে কৃষ্ণগঙ্গা আর সিন্ধু, পেরিয়ে গেছে টাঙ্গির, কোহিস্তান, হিন্দুরাজ, চিত্রল, পেরিয়ে গেছে অগণ্য পার্বত্য পথ; অতিক্রম করে গিয়েছে দুঃসাধ্য গিরিসঙ্কট একটির পর একটি, সেই সব প্রাণীহীন, তরুলতাহীন, জলচিহ্নহীন দুর্গম তুষারকান্তারের ভিতর দিয়ে। অগণিত নামহারা গিরিসঙ্কট আজও রয়ে গেছে মানচিত্রে। চিত্রলের ভিতর দিয়ে দোরান, পঞ্চশির পর্বতমালার ভিতর দিয়ে বলিয়ানপথ,—একটির পর একটি চলে গিয়েছে সেই কোথায় আমুদরিয়ার প্রবাহপথ ধরে টারমেজ-এর দিকে।

টারমেজ! চমকে উঠেছিলুম। মনে পড়ে গেল প্রাচ্যের মানবসভ্যতার তখন প্রথম জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে! সেদিন স্মরণীয় কালেরও অতীত। আর্যরা জপে বসেছে হিমালয়ে,

তাদের সেই বীজমন্ত্রে ভারতসভ্যতার প্রথম উদ্বোধন ঘটছে। কেউ ছিল না তখন পূর্বে আর পশ্চিমে। জন্তুর ছাল জড়িয়ে বেড়াতো মানুষ,—কি মেয়ে, কি পুরুষ, লজ্জা এসে তখনও পৌঁছয়নি তাদের অঙ্গে-অঙ্গে। তার পরে ক্রমে খবর রটে গেল মধ্যপ্রাচ্যের পাড়ায়-পাড়ায়, হিমালয়ের উপবনে আর তপোবনে সামগান মুখরিত হচ্ছে। বেদ রচনার পর বেদব্যাস বসে গেছেন বেদবিভক্তিতে। তারপরে দেখতে-দেখতে গেল অনেক কাল। জানিনে কত যুগ-যুগান্ত। এমন এক কালে এই হিমালয়ের গহন রহস্যালোক থেকে উঠে এলো এক তরুণ সুকুমার রাজকুমার,—নাম তার শাক্যসিংহ। জীবন কি, মৃত্যু কি, পথ কি, ঈশ্বর কি,—এই প্রশ্ন তাকে সেদিন অস্থির করেছিল বলেই ভারতের ইতিহাস আবার ঘুরে দাঁড়ালো। সেই আড়াই হাজার বছর আগে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার; হেলাস, স্লাভ, মোঙ্গল, আরব,—এদের নাম শোনেনি কেউ; গান্ধার তখন ছিল, কিন্তু কনিষ্ক এসে পৌঁছয়নি; তখন অসভ্য জাতিতে ইউরোপ অধ্যুষিত; ইংলন্ড তখন আদিম সামুদ্রিক জাতির এলাকা,—বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায় জলা-জঙ্গলে। তখনকার দিনে এই হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর আর হিন্দুকুশের শাখাপ্রশাখায়, সমগ্র গান্ধার ছাড়িয়ে কশ্যপহ্রদ পেরিয়ে ওই শাক্যসিংহের পৃথিবী-বিজয়ী সভ্যতা আপন অপরাজেয় বীর্যবত্তাকে প্রকাশ করেছে সম্রাট অশোকের উদ্যমে।

এই আমুদরিয়ার সীমান্তেই ছিল ভারতসভ্যতার সীমানা। প্রায় আটশো বছর পরে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ এখানে প্রথম পদার্পণ করে দেখেছিলেন পৃথিবীর বিরাটতম বুদ্ধমূর্তি। এই সকল মহাকীর্তির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট কনিষ্ক—ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের তিনি গৌরব। কনিষ্ক তাঁর রাজত্বকালে সম্রাট অশোকের আদর্শ পালন করেন এবং তিনি সমগ্র গান্ধারে অগণ্য বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। গান্ধার থেকে উত্তর ভারত এবং আর্যাবর্ত অবধি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ওই গান্ধারেরই এক বৌদ্ধমঠে হুয়েন সাঙ বাস করেছিলেন বহুদিন। এই হিন্দুকুশ আর আমুদরিয়ার মধ্যবর্তী প্রাচীন ব্যাক্‌ট্রিয়ার সভ্যতা এই সেদিনও জাজ্বল্যমান ছিল, কিন্তু মোঙ্গলদের হাতে সেই সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটেছে মাত্র ছয়শো বছর আগে। হুয়েন সাঙ বলছেন, হুনদের প্রবল ধ্বংসাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও সপ্তম শতাব্দী অবধি ব্যাক্‌ট্রিয়ার রাজধানীর প্রান্তে শতাধিক বৌদ্ধগুম্ফায় প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধভিক্ষু তখনও ছিলেন।

এই টারমেজ আর আমুদরিয়ার তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার। তাদের পরনে ছিল জন্তুর ছাল আর লতাপাতার আবরণ। এই টারমেজ আর আমুদরিয়ার প্রান্ত অবধি ছিল ভারতের রাজনীতিক সীমানা—যার উপরে প্রভুত্ব ছিল সম্রাট অশোকের। উত্তরে তেমনি ছিল বৃহৎ পামীর,—আলাই পর্বতমালার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। ইতিহাসের কাল এসেছে অনেক পরে, কিন্তু কাশ্মীরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে হিমালয়ের অন্তর্গত কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরির স্তবকে-স্তবকে,—এবং আলাই, হিন্দুকুশ, কো-হি-বাবা, কালা পাঞ্জা, হরিরুদ্র, হেলমন্দ, পঞ্চশির, কপিশ, ত্রিচিমির, সেবক, শিবরাগ,—ইত্যাদি অঞ্চল ভারতীয় ভূগোলের অন্তর্গত ছিল চিরকাল। অনেকে নাম বদলেছে, ভাষা ও আচার বদলেছে, জীবনের চল্‌তি নিয়মের ধারাও বদলেছে,—কিন্তু আজও রয়ে গেছে ওদের গুহায়-গুহায় বৌদ্ধসংস্কৃতি, পথে-প্রান্তরে-উপত্যকায় মঠ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাথরে-পাথরে খোদিত অশোক আর কনিষ্কের অনুশাসন লিপি। আজকের আফগানিস্তান সেদিন আগাগোড়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিল, ছিল গান্ধারের

অন্তর্গত—যেখানে গ্রীক ও ভারত-সংস্কৃতির সংযোগের ফলে অভিনব শিল্পকলার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে যার নাম শুনি, গান্ধারশিল্প। কিন্তু এই স্থাপত্য ও ললিতকলা বৌদ্ধসংস্কৃতি থেকে জন্মলাভ করে। সম্রাট অশোকের সুশাসনকালে বৃহত্তর কাশ্মীর ও গান্ধারে স্বর্ণযুগের ঐশ্বর্য দেখা দিয়েছিল। শ্রীনগর শহরটি প্রথম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ফিরে আসি ঐতিহাসিক যুগের কাশ্মীর প্রান্তে। ওই হিন্দুকুশের উপত্যকাপথে দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদেছে গান্ধার নরনারী। ঝড় উঠেছে ওখানকার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রান্তরে, বালুর আঁধি উঠেছে আমুদরিয়া থেকে হিন্দুরাজপর্বতমালা পেরিয়ে মধ্যএশিয়ায়। রক্তমাখা তরবারী হাতে নিয়ে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস খাঁ ছুটে এসেছে ভারতের বহির্প্রান্তে। ক্ষণে-ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে চেঙ্গিস। শত-শত কোটি স্বর্ণমুদ্রামূল্যের জড়োয়া জহরৎ, পরমাসুন্দরী অনন্তযৌবনা কাশ্মীরী উর্বশীর দল, জলা-বিল-উপত্যকাবেষ্টিত শস্যশোভাময় কাশ্মীর ও ভারত,—চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাতারসম্রাট চেঙ্গিস! পরনে বৃষচর্ম, কণ্ঠে শোণিত পিপাসা,—মৃত্যুর ঝড় তুলে সে আসছে এগিয়ে।

চেঙ্গিস খাঁ বলেছিল, শুধু চাই জয়ের উল্লাস। পদদলিত শত্রুর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে রক্তপতাকা তুলবো—এই আমার একমাত্র আনন্দ। ধ্বংস করবো, লুট করবো,—আর সেই ভগ্নস্তূপের জটলায় দাঁড়িয়ে কাঁদবে সবাই,—এই মনোহর দৃশ্য দেখতে চাই। নারী ও তাদের কন্যাদলের প্রতি পাশবিক অনাচার চালাবো,—এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। আগুনে রক্তে, লুণ্ঠনে, ধ্বংসে, হত্যায়—আমাব শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সংখ্যাতীত নরবলি দিল চেঙ্গিস। জনশূন্য হয়ে চললো নানা ভূভাগ মধ্য-এশিয়ায়। লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করলো নগরের পর নগব, ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাজপ্রাসাদ আর ধর্মমন্দির। এর পরে আবার গেল অনেক কাল। অতঃপর আবার এসেছিল ওই চেঙ্গিসের বংশধর তৈমুরলঙ্গ। সেও পেরিয়ে এসেছিল ওই আমুদরিয়াব তীরবর্তী টারমেজ। সে পৌঁছেছিল দিল্লী পর্যন্ত। সহস্র-সহস্র নরমুণ্ড নিয়ে লোফালুফির পর সেও এক লক্ষ বন্দী ভারতীয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। প্রকাশ, তৈমুরের এক-একজন সেনাপতি নিজের সঙ্গে দেড়শত শিশু, নারী ও পুরুষকে ক্রীতদাস করে নিয়ে যায। তারা সবাই সমরখন্দে ফিরে গিয়ে কোটি-কোটি স্বর্ণমুদ্রা, হীরা জহরৎ ও সুন্দরী নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হিমালয়ের গিরিগুহাবর্ত্মে তাদের কান্না অনেককাল প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আমুদরিয়ার অশ্রুনদী আজও বয়ে যায় টারমেজের তীরে-তীরে।

হিমালয়ের গর্ভে সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার ঘটে গেল কাশ্মীরে এই সেদিন—১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। সেই কথাই বলি।

কাশ্মীরে আমার নবলব্ধ সংবাদিক বন্ধু এম. কে. ধার.-এর উৎসাহে এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন পাব্‌লে এলেন গাড়ি নিয়ে সকালবেলায়। জীপগাড়িতে আরেক তরুণ বন্ধু আছেন মিঃ আচারি। আমাকে নিয়ে যাবেন ওঁরা যুদ্ধবিরতি সীমানার ধারে, যেটা এখন কাশ্মীরের 'সীজ্ ফায়ার লাইন।'

পীরপাঞ্জালের উত্তুঙ্গ গিরিলোক চিরদিন বিশ্বাসঘাতক। ওই গিরিশিখরলোকের দিকে তাকিয়ে আজও প্রতি কাশ্মীরীর হৃৎকম্প হয়। মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো পীরপাঞ্জালের এক একটি চূড়া করাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কাশ্মীরের দিকে। অথচ সমগ্র কাশ্মীর বংশপরম্পরায় অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত। এরা শেখেনি যুদ্ধ করতে, শেখেনি আত্মরক্ষার জন্য

আত্মোৎসর্গের অভিযান। সেই কারণে কোনদিন কোনও শত্রুকে বাধাও দিতে পারেনি প্রাণপণে।

শ্রীনগর ছাড়িয়ে মাইল চারেক দূরে এসে পাওয়া যায় সালাটেং,—এই পর্যন্ত এসে পৌঁছে সেদিন পাকিস্তানী উপজাতীয় পাঠানদেরকে থামতে হয়েছিল। এখানে পথ দুইভাগে বিভক্ত। সামনে বিশাল ধানক্ষেত, আশে-পাশে গ্রামবাসীদের নিরুদ্বিগ্ন জীবন। কিন্তু এই ধানক্ষেতের উপর থেকেই কাশ্মীরের মিলিসিয়া পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকেব দল ওদেব পথরোধ করেছিল। নগরে যেন ওরা প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু সেই প্রতিরোধ শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে তখন বিমানযোগে ভাবতীয় সৈন্য ও সাহায্য শ্রীনগরে এসে পৌঁছয়।

উপজাতীয় পাঠানদের সঙ্গে পাকিস্তানের সদ্ভাব কিন্তু নেই। এবা আফগানিস্তানেব সীমান্ত-সন্তান, কিন্তু পাকিস্তানের শিষ্য নয়। এরা ইংরেজ এবং পাকিস্তান—এই দুয়েরই প্রতি বিরূপ। কিন্তু এদের মধ্যে যারা একান্তই হিংস্র প্রকৃতি, যেমন হাজারা জেলার অধিবাসী তুর্কী-রুশীয় 'কারগিজ কাজাকি'রা, তাদেরকে উৎকোচে বশীভূত করা হয়েছিল। তারা ধনদৌলত পাবে, শস্যক্ষেত্র পাবে, পছন্দসই স্ত্রীলোক পাবে—এই আশ্বাস পেয়ে তবে তারা হামলা করে। পিছনে রইলো পাকিস্তান,—অস্ত্র ও রসদ পিছন থেকে অজস্র যুগিয়ে যাবে। সুতরাং দানবকায় মত্ত হস্তীর দল বিবাট এক দস্যুবাহিনীর আকার ধরে রাওয়ালপিণ্ডি, মারী, হাভেলীয়ান, নাথিয়াগলি, কোহালা ও দুমেলের পথে বিতস্তা নদীর তীর ধরে কাশ্মীরে ঢুকে অতর্কিত আক্রমণ চালালো। রক্ত, আগুন আর নারীধর্মনাশ চললো বন্যাবেগে।

ক্যাপ্টেন পাব্‌লে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। জাতিতে তিনি শিখ। যেমনই শিক্ষিত ভদ্র, তেমনি শান্ত। আমরা সোজা বরমূলার পথ ধরেছিলুম। পথে-পথে পাওয়া যাচ্ছে রাজা ললিতাদিত্যের কীর্তির অবশেষ, রাজা অবন্তীবর্মার নানা স্মৃতিচিহ্ন, সম্রাট অশোকের আমলের কিছু-কিছু স্থাপত্য। অতি সুন্দর বাঁধানো পথে পড়েছে মধুর রৌদ্র, আশে-পাশে টিলাপাহাড়ের গায়ে রঙীন পাখিরা ডাক দিয়ে যাচ্ছে আসন্ন শরৎকালকে। এখানে-ওখানে আপেলের বনে একটু-একটু রং ধরেছে।

পাব্‌লে হাসিমুখে বলছিলেন, এ পথে যাচ্ছি, এখানে কিন্তু এই সেদিন অনেক রক্ত গড়িয়েছে। তবে কি জানেন, পৃথিবীতে শান্তি ও অহিংসাবাদ প্রচার করা এক কথা, আর সামরিক রীতি-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিব্যবস্থার ওপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করা অন্য বস্তু।

গাড়ি চলছে। কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় শোনেননি, কাশ্মীরের এ যুদ্ধ আমরা সম্পূর্ণ জয় করে এনেছিলুম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের মন্দ। চরম আঘাত হানবো, এমন মুহূর্তে হঠাৎ আমাদের থমকে যেতে হলো।

কেন?

ক্যাপ্টেন হাসলেন। কিন্তু তখনই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, রাষ্ট্রের নীতি অহিংসবাদ এবং সাধুতার ওপর দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যুদ্ধকালের একমাত্র নীতি হলো বর্বরতার অবসান ঘটানো। আমাদের সেই নাটকীয় জয়লাভের কালে হঠাৎ রাজনীতিক নির্দেশ সামরিক অভিযানকে নিয়ন্ত্রণ করে বসলো। কাশ্মীরের জনসাধারণ হায়-হায় করে উঠলো আমাদের দুর্বলতা দেখে।

তার পর?

তারপর 'সীজ ফায়ার!' বুক ফুলিয়ে লাইনের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো রক্তমাখা দস্যুর দল, আর বুক ফুলিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীরা পাঠিয়ে দিল জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিদলকে। চেয়ে দেখুন, তাঁবু ফেলে বসেছে তারা দুই পারে—চক্রান্ত চলছে এপারে-ওপারে। ক্যাম্পে-ক্যাম্পে মদ আর মেয়ে। সমস্ত রাত ধরে হুল্লোড়। শাদা গাড়ি ছুটিয়ে ওরা আসে শ্রীনগরে—অসচ্চরিত্রা ইঙ্গ-মার্কিন মেয়েরা হলো ওদের গোয়েন্দা। ওদের নোংরা কীর্তি সবাই জানে। আপনারা ত জানেন, একটি ইংরেজ মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা। বক্সী গোলাম সাহেব তাকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত শক্তি থাকতেও আমরা নির্বোধ বনে রইলুম।

শ্রীনগর থেকে বরমূলা মাত্র চৌত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের পথ। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় শঙ্করাচার্যের মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে পথের দুই ধারে চেনার আর পপলারের সারি। যেদিকে চাই, যে পাশে ফিরি,—মৃন্ময় কাশ্মীর,—সুন্দর, নধর, পেলব। ছোট ছোট টিলা পাহাড় এখানে-ওখানে, এ মাঠে আর ও মাঠে,—মনে হচ্ছে আগামী বর্ষায় গলে যাবে সব।

পাটান পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। এই একই পথ। এই পথে যেমন এসেছি পাঠানকোট থেকে জম্মু আর শ্রীনগর, তেমনি এই পথ সোজা গিয়েছে বরমূলা, উরি, দুমেল আর কোহালার ঝিলম নদীর পুল পেরিয়ে সানিব্যাঙ্ক হয়ে রাওয়ালপিণ্ডির দিকে। এ আমার সম্পূর্ণ জানা পথ। এই পথ আমাকে অস্থির করেছিল তরুণ বয়সে,—যখন আমার বসবাস ছিল রাওয়ালপিণ্ডির ওদিকে।

দুই পাশের শান্ত পল্লীপ্রকৃতি পেরিয়ে জীপ চলেছে। অজস্র ফসল দুই ধারের ক্ষেতে। ফলের গাছগুলি এখন পরিপূর্ণ। তন্দ্রাজড়ানো বাতাস বয়ে চলেছে। কোথাও কোনও অশান্তি অথবা কোলাহল নেই।

এক সময় একটি মৃন্ময় টিলাপাহাড়ের নীচে এসে ক্যাপ্টেন জীপগাড়ি থামালেন। আন্দাজ পঞ্চাশ ফুট উঁচু। আমরা উপরে উঠে গেলুম। সামনেই একটি কালো পাথরের স্মৃতিফলক। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে লেফটেনান্ট কর্নেল ডি. আর. রে এই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সদলবলে পাঠানদের প্রতিরোধ করেন। এইখানে বয়ে গেছে সেদিন রক্তের প্রবাহ, সে-রক্ত গড়িয়ে গেছে ক্ষেতখামারে, গেছে অদূরবর্তী বিতস্তার গৈরিক স্রোতে। কিন্তু হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে দস্যুদলের সামনে কর্নেল যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, তেমনি এক ইঞ্জি হটে যেতেও চাননি। ফলে, এইখানেই গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। সেই অসমসাহসিক প্রকৃত যোদ্ধার হৃৎপিণ্ড থেকে ঠিক এই স্থলে প্রথম রক্তবিন্দু ঝরে পড়ে, এই কারণেই এখানে তাঁর স্মৃতিফলকটি নির্মিত। তারিখটি লেখা রয়েছে পাথরে, অক্টোবর ২৭, ১৯৪৭।

মাইল দেড়েক দূরে বরমূলায় এসে পৌঁছলুম। ছোট শহর, প্রবেশপথটি পাহাড়ে বেষ্টিত। এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল বরাহমূল। সংবাদপত্রে পড়া সেদিনের বীভৎস কাহিনীর কথা স্মরণ করে পা দুখানা যেন ভারী হয়ে উঠলো। সামনেই সেই মিশনারীদের সুপ্রসিদ্ধ সেন্ট জোসেফস কন্‌ভেন্ট। ক্যাপ্টেন বললেন, আসুন, ভেতরে ঢুকি।

ভিতরে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, আশেপাশে সুন্দর বাগান এবং বসবাসের ঘর। এরই মধ্যে ঢুকে দস্যুরা যে কয়জন শ্বেতাঙ্গ রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, তাদেরই

একজনকে ডেকে ক্যাপ্টেন আলাপ করিয়ে দিলেন। শান্ত নম্রমুখী মহিলা। তাঁর চোখে চশমা, মুখের ভাবটিতে বুদ্ধি ও মাধুর্য একসঙ্গে মিলেছে। মহিলা সেই ভয়াবহ দিনগুলির নানা বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা করে একসময় বললেন, আমাদের এক বন্ধু জনৈক ইংরেজ কর্নেলের স্ত্রী এখানে তখন সদ্য একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং সেদিন পাঠান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং কর্নেল এসে তাঁর স্ত্রী ও সদ্যপ্রসূত সন্তানকে বিলাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। দস্যুরা স্বামী-স্ত্রীকে এই কন্‌ভেন্টের মধ্যে হত্যা করে এবং শিশুটিকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আনন্দে নাচতে থাকে। তাদের সাংঘাতিক আক্রমণে সমস্ত কন্‌ভেন্ট ছারখার হয়। এ যা দেখছেন, এসব আবার নতুন করে সাজানো হয়েছে। আমি একমাত্র সেদিনকার 'প্রেতিনী' হয়ে বাস করছি!

মাথা নীচু করেছিলেন ক্যাপ্টেন। মহিলা এবার চুপ করলেন। আমি ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখতে লাগলুম। পীরপাঞ্জালের দূর সীমানায় এসে এই সব আমাকে দেখে যেতে হলো।

কন্‌ভেন্টের একটি অংশে প্রসূতি আগার। সেখানে কাশ্মীরী রোগিণী রয়েছে কয়েকজন। অধিকাংশই মুসলমানী। একটি কারিগরী বিদ্যালয়ে কয়েকটি মেয়ে হাতের কাজ শিখছে। শিশুরা একস্থলে ঔষধপত্রাদি নিচ্ছে। একধারে কয়েকটি পরিত্যক্ত নবজাত শিশুকে রাখা হয়েছে। সমগ্র ভারতের ও কলকাতার অন্যান্য কন্‌ভেন্টের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

ভারাক্রান্ত মনে আমরা কন্‌ভেন্ট থেকে বেরিয়ে শহর পরিদর্শনে বেরোলাম। না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। মনে হচ্ছিল, মাত্র গতকাল সমস্ত শহর জ্বলে পুড়ে কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছে। পথে পথে সর্বত্র স্তূপাকার ধ্বংস। ক্যাপ্টেন দেখাচ্ছিলেন, অবাবিত লুণ্ঠন ও হত্যার কেন্দ্র; শত শত নরনারী পুড়েছে একই অগ্নিকুণ্ডে; পথের এক একটি কেন্দ্রে সংখ্যাতীত রমণীকে উলঙ্গ করে দস্যুদল উল্লাসরঙ্গে নৃত্য করেছিল। স্বামীর দুই হাত আর দুই পা কেটে নিয়ে সেই কাটা হাত-পা দ্বারা নগ্না স্ত্রীকে প্রহার করা হয়েছিল। অগণ্য উৎপীড়িতা আতঙ্কিতা নগ্না রমণী ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে বিতস্তায়; সংখ্যাতীত রক্তমাখা নারীর অচেতন দেহ নালার ধারে পড়েছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। পাথর দিয়ে ছেঁচে এবং পথের উপর আছাড় মেরে শিশু বালক বালিকাকে হত্যা করা হয়েছে,—তাও অসংখ্য। জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে বরমূলা। যেদিন মৃত্যুর মতো অসাড় শান্তি ফিরে এলো, দেখা গেল বরমূলার অন্ধকার শ্মশানে কাঁদবার কেউ নেই। যাবার সময় দস্যুরা নিয়ে গেছে শত শত নারী ও বালিকা। বরমূলার আগাগোড়া এই ইতিহাস।

মুসলমানি শহর, কিন্তু একটি মসজিদও চোখে পড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সঙ্কীর্ণ বিতস্তার ওপারে প্রাচীন রঘুনাথজীর মন্দিরে তখনও বাজছে শঙ্খ ও ঘণ্টা। একটি বৃহৎ চেনারবৃক্ষের ছায়া পড়েছে মন্দিরের সুবর্ণ কলসে। কলসের গায়ে কালো দাগ। শুনলুম ওপারেও আগুন জ্বলেছিল। মন্দিরঅঙ্গনে পণ্ডিতদের আনাগোনা দেখাত পাওয়া যাচ্ছিল। বিতস্তার তীরে অবগাহন স্নান ও পূজাপাঠ চলছে।

বাজারের জনবহুল পথের এক স্থলে এসে ক্যাপ্টেন দাঁড়ালেন। সামনেই কাশ্মীর-কেশরী মকবুল শেরওয়ালনির বালিধ্বসা দোতলা বাড়ি, এবং তার ইঁটের দেওয়ালে আজও রয়েছে গুলির দাগ। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁর সামনে তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি নারী ও শিশুকে এনে একে একে হত্যা করা হয়। অতঃপর দস্যুরা শেরওয়ানিকে প্রশ্ন করে, এখনও তিনি পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ

করতে রাজি আছেন কি না। শেরওয়ানি ঘৃণার সঙ্গে এই নরহত্যাকারী দস্যুদলের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর অপমানজনক তিরস্কারে ক্রুদ্ধ দস্যুরা তাঁরই বাড়ির দেওয়ালে তাঁকে পেরেক পুঁতে ঝুলিয়ে তাঁর দেহকে গুলিবিদ্ধ করে শতছিদ্র করে!

শেরওয়ানির উদ্দেশে আজ নিত্যপ্রণাম জানায় কাশ্মীর।

ফিরবার পথে 'সংগ্রামা' হয়ে 'সোপোর'। এর প্রাচীন নাম ছিল, সুইয়াপুর। অনেকে বলে, রাজা অবন্তীবর্মার কালে 'সুইয়া' নামক এক ইঞ্জিনীয়ার ঝিলমের বন্যার গ্রাস থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাবার জন্য এখানে এক নদীপথ কেটে দেন। যাই হোক, সোপোরেরও ওই এক ইতিহাস। নদীর ওপার থেকে আসে উপজাতীয় পাঠানরা, এবং পিছন থেকে এগিয়ে আগে বরমূলা থেকে দস্যুদল। উভয়েরই উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ও নারীহরণ। সেই চূড়ান্ত সঙ্কটকালে কয়েকটি পরিবারের পুরুষ আপন আপন হাতে নিজ পরিবারের নারীগণকে হত্যা করে অবশেষে নিজেরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নাটকীয় সঙ্কটকালে চারিদিক থেকে ভারতীয় সেনাদল দস্যুদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন শান্তকণ্ঠে বললেন, মুসলমানের উপরে মুসলমানের এই অমানুষিক বর্বরতা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই!

সোপোরের বাজার বেশ বড়, পথঘাট জনবহুল। বুঝতে পারা যায়, মহাজনতা চিরকাল বিস্মৃতিপরায়ণ। ক্ষয় ক্ষতি ও ক্ষত মানুষ আবার ভুলতে বসেছে। নতুন কালে আবার নতুন ফসল ফলেছে, নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে, গাছে গাছে নতুন কিশলয় দেখা দিয়েছে!

যদি কেউ এই মৃত্তিকার লাবণ্যের উপর কান পেতে থাকে, কাশ্মীরের কান্না শুনবে। রক্তপিছল ভূস্বর্গ এবার হয়ত মৃত্যু আর অপমান থেকে ভীষণামূর্তিতে উঠে আসতে চায়। বিবশ বিস্রস্তা মৃন্ময়ী এবার তার ধূলিধূসর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধুক। অগ্নিক্ষরা করাল দৃষ্টি তুলে এবার ডাক দিয়ে বলুক, "হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা, রক্তে মোর বাজে রুদ্রবীণা!" ওর প্রাণের ইতিহাসের পর্বে পর্বে হুন তাতার মোঙ্গল পাঠান সবাই এসে ওর সর্বাঙ্গে নখরাঘাত হেনেছে বর্বরের মতো, হিংস্র দস্যুর দল যুগে যুগে ওর তনুলাবণ্যের 'পরে পাশব প্রবৃত্তির খেলা খেলেছে! এবার উঠে দাঁড়িয়ে মুছুক চোখের জল, ক্ষতবিক্ষত 'রক্তাক্ত' দেহে ডাক দিক্ ওই হরমুখ হিমালয়ের বজ্রপাণিকে,—পশুহননের জন্য পাশুপত অস্ত্র হাতে তুলে নিক্—!

*　　　*　　　*

গুহাতীর্থ অমরনাথ থেকে ফিরে দিন তিনেক পুনরায় বাস করেছিলুম পহলগাঁওয়ে। শহর ফুরিয়ে যায় বড় জোর মাইল খানেকের মধ্যে। ওইটুকুর মধ্যেই চলাফেরা, ওইটুকুর মধ্যেই কাজকারবার ব্যবসা বাণিজ্য। এপাশের উপত্যকা পথে উঠে গেছে পাইনের সুদীর্ঘ বনরেখা, আর দক্ষিণ নীলগঙ্গার তীর ধরে চলে গেছে চিড়গাছের অরণ্য। নদীর ওপারে সমগ্র পশ্চিম উত্তুঙ্গ পর্বতমালায় অবরুদ্ধ। ওদের ভিতর দিয়ে মাইল পনেরো অভিযান করলে কোলাহাই হিমবাহ এবং লিডারবৎ,—গুজরজাতির যাযাবরের দল ওই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। মহাকাব্য যেন আসন পেতে বসেছে এখানে।

আবহমান কাল এখানে মন্থরগতি। প্রাণীজগতে কোথাও চাঞ্চল্য নেই। আপন মনে কাজ করে চলেছে হিমালয়ের প্রকৃতি। সূর্যাস্তকালে পশ্চিম পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রাখলে

সন্ধ্যা কেটে যায়, ধীরে ধীরে মেঘের টুকরো নেমে আসে নীলগঙ্গার নীলাভ জলের ধারে,—তার পর যেন ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যোৎস্নারাত্রে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ডুক্‌রে-ডুক্‌রে ওঠে নীলগঙ্গা।

পহলগাঁও থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লুম।—

ছায়ানিবিড় রোমাঞ্চ ছিল কোনও এক পাহাড়তলীর বস্তিতে, তারই চূড়ার দিকে পশ্চিমমুখী এক মসজিদ এতদিন পরে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল। প্রকৃত নাম হলো জনকমহল, কিন্তু নাম বদলেছে ইদানীং কালে—যেমন আয়েশমোকাম! প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্যকীর্তিই প্রধান,—এদের সঙ্গে মিশেছে কোথাও কোথাও আরও দুটি শিল্পকলার প্রভাব। একটি হলো গ্রীক, এবং অন্যটি তিব্বতী, যার মূল ছাঁচ হলো মঙ্গোলীয়। সাম্প্রতিক তিন চার শো বছরের মধ্যে অবশ্য একটু আধটু মোগল স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীনগরের সন্নিকটে যেটি বড় মসজিদ—অর্থাৎ শাহ হামদান,—এটিকে বৌদ্ধ 'মসজিদ' বলা চলে। এই মসজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে উঠেছে, সেই স্থলটি হলো দেবী কালীশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণ। কাশ্মীরের সর্ববৃহৎ জুমা মসজিদও তাই, প্রাচীন দেবদেউলের কোলেই তার ভিত্তি। কিন্তু এ ছাড়া কি আর কোনও জায়গা ছিল না? ছিল বৈকি। কিন্তু হিন্দুস্থাপত্য স্থান-নির্বাচনে চিবকাল পারদর্শী। পুরীর জগন্নাথ, সমুদ্রবেলায় কোনারক, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত ঝিলম শহরের নদীতীরবর্তী বিশাল শিবশক্তির মন্দির, পূর্ব পাকিস্তানে সমুদ্রশোভা-সমন্বিত চন্দ্রনাথ, করাচীর মহাকালীর মন্দির, বেলুচিস্তানের অঘোর নদীর তীরে জ্যোতির্লিঙ্গ হিঙ্গুলা দেবী, অগ্নিতীর্থের সোমনাথ, ব্রহ্মপুত্রের পারে কামাখ্যা, বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মী, কাশীর বেণীমাধব আর আদিকেশব,—বলে যেতে পারি একটির পর একটি। বলতে পারি রাজগৃহ, যয়শলমের, যোধপুর, পুণা আর রামেশ্বরম্—বলতে পারি আরও অনেক। পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে, নদীতীরে—প্রত্যেক হিন্দুস্থাপত্যের স্থান-নির্বাচনটি হলো সৌন্দর্যবোধের প্রতীক্। এই প্রথম কাশ্মীরে দেখলুম, পাহাড়ের চূড়ায় মসজিদ। কিন্তু এর কারণ অনুমান করতে বিলম্ব হয় না। কাশ্মীর হলো অতর্কিত বন্যাপ্লাবনের দেশ, হঠাৎ আসে বন্যা,—ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ।

মার্তণ্ড শহরে এলুম। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের দেখেছি, এবার দেখছি পাণ্ডাদের। এদেরই পূর্বপুরুষ একদা ধর্মান্তরিত কাশ্মীরী হিন্দুকে নিজেদের কোলে ঠাঁই দেয়নি। যেমন গয়ায়, যেমন কাশী আর বৃন্দাবনে, যেমন মথুরা-হরিদ্বার আর কলকাতার কালীঘাটে,—এরা ঠিক তেমনি ছিনেজোঁক। সেই একই ব্যবসা পুণ্যবিতরণের। এখানে সরোবরের তীরে সূর্যনারায়ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ,—নাম হলো মার্তণ্ড মন্দির। এর স্থাপত্য, কারুকলা এবং অবস্থিতি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। মার্তণ্ড শহরের বর্তমান নাম ইসলামাবাদ কেন হলো খোঁজ নিইনি, কিন্তু মার্তণ্ডকে অনেকে আবার বলে মাটান্। এখান থেকে অল্প দূরে রাজা ললিতাদিত্যের সর্বপ্রধান স্থাপত্যকীর্তি দেখে আসা যায়। কাশ্মীরকে তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন।

অনন্তনাগের শান্ত পল্লীতে এসে পৌঁছলুম। উঁচু নীচু গলিঘুঁজি বন-বাগান-ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা গ্রাম। কাছেই একটি গন্ধক-ঝরনার পাশে একটি দেবস্থান। সত্যি, যেখানে যাও যেদিকে চাও—দেবস্থান ছাড়া কিছু নেই। আসতে আসতেই দেখে নিচ্ছি বিষ্ণু আর রাধাকিষেণ, রামলছমন আর সীতা, সত্যনারায়ণ আর সূর্য। গিরিশ্রেণীর দিকে

তাকাও—অধিকাংশ নাম হলো, হরমুখ, হরমহেশ, কৃষ্ণগিরি, শঙ্করাচার্য, হরিপর্বত, শ্রীশনাগ, ভৈরবঘাটি, অমরনাথ ইত্যাদি।। নদীর দিকে তাকাও,—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, কৃষ্ণগঙ্গা, নীলগঙ্গা, দুধগঙ্গা, রোমহর্ষী, ভৃঙ্গা, সহস্রা, রামবিহারা, মদমতী ইত্যাদি। নগরগুলির দিকে তাকাও—সুখনাগ, নরনাগ, নাগমার্গ, অবন্তীপুর, ব্রজবিহার, আশুনাগ, রামপুর, রামঘাট চণ্ডীগাঁও ইত্যাদি। হ্রদের কথা যদি বলো, তবে কৃষ্ণসায়র, বিষ্ণুসায়র, গঙ্গা ও মনসাবল, উল্লহর—যাকে বলে উলার, বুদ্ধবল, গান্ধারবল, নরবল, অমরসায়র, তরসায়র ইত্যাদি দেখিয়ে দেবো। সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্থাপত্যে কাশ্মীর হলো আগাগোড়া আর্যহিন্দু এবং আর্যবৌদ্ধ। মুসলমান জনসাধারণ যাদেরকে দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস, জীবনযাত্রা, খাদ্য, শরীরের গঠন, আকার, মুখের ভাব, চক্ষু ও নাসা, সামাজিক মেলামেশা,—সমস্তটাই মুসলমান-বিরোধী। উত্তর ভারতের অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা অবাক হয়; তাতার মোঙ্গল কিংবা পাঠান মুসলমান এলে ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে। মোগল আমলের মুসলমানদের সঙ্গে ওদের আজও মিল হয়নি। ওদের সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় হলো কাশ্মীরী হিন্দু। যেমন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের পরমাত্মীয় হলো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু। উভয়ের মধ্যে আত্মিক পরিচয় অতি নিবিড়। একই রক্তের যমজ সন্তান। রাজনীতি হলো বহিরঙ্গ, শোণিতনীতি হলো অন্তর-অঙ্গ।

সাতটি সাঁকোর দ্বারা শ্রীনগরের এপার ওপার সংযুক্ত। প্রথম সাঁকোর নাম, 'আমিরা কদল'। কদল মানে সাঁকো। আমিরা কদল-এর উভয় পার হলো নগরের প্রায় নাভিকেন্দ্র। ওরই কাছাকাছি খালসা হোটেলে এর আগে বাসা নিয়েছিলুম। এবার এসে উঠলুম, ইম্পিরীয়ল্ ব্যাঙ্কের বাগানে তাঁবুর মধ্যে। কাশ্মীরে এসে তাঁবুতে বাস করা আনন্দদায়ক। নিরাপদ স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়।

সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা নিমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছলো সদর-ই-রিয়াসতের ওখান থেকে—সোনালি লাল কালিতে ছাপা। বুঝতে পারা গেল, সাংবাদিক বন্ধু মিঃ ধারের উৎসাহ আছে এর পিছনে। অপরাহ্ণ সাড়ে চারটের সময় যুবরাজ করণ সিং জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করতে চান।

শ্রীনগরের দক্ষিণ অংশটি হলো ঘিঞ্জি শহর। বাজার অংশ পেরিয়ে গেলে আধুনিক আবহাওয়া। শেখ আবদুল্লার গদিচ্যুতির পর এখন তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, থমথমে ভাবটি আর এখন নেই, অবস্থা স্বাভাবিক। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকারি শাসনভার হাতে নিয়েছেন কাশ্মীরের 'লৌহমানব' বক্সী গোলাম মহম্মদ। সমগ্র কাশ্মীরে দেশনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী ও ভয়হীন নেতারূপে তিনি পরিচিত। অথচ এই সেদিন অবধি তিনি শেখ আবদুল্লার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির পাশা খেলা বিচিত্র। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেখ আবদুল্লাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে একরাত্রের মধ্যে সরানো হয়, এবং পরদিন তিনি যখন গুলমার্গ থেকে তাঁর সহকর্মী মীর্জা আফজল বেগকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার ওদিকে পালাচ্ছিলেন, তখন পথের মাঝখান থেকে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়। 'প্রজা পরিষদের' সন্দেহ বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

কথাটা এখানেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। রাজনীতি অথবা ইতিহাস গবেষণা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কাশ্মীরের একটি বিশেষ সঙ্কট-সন্ধিকালে ওখানে গিয়ে পড়ি বলেই

ওটাকে এড়ানো কঠিন ছিল। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তাঁকে বলা হয়, কাশ্মীরের 'ব্যাঘ্র'—শের-ই-কাশ্মীর! কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের পর থেকে সহসা তাঁর রাজনীতিক অভিমত ঘুরে দাঁড়ায় এবং কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' বলে ঘোষণা করার একটা অদ্ভুত চেষ্টা তিনি করতে থাকেন। বহুলোকের ধারণা, তিনি জনৈক আমেরিকান নেতা ও দুই একজন পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চাপা চক্রান্তে পড়ে যান। প্রকাশ, এমনি সময় কাশ্মীরের প্রজা-পবিষদের নেতারা এই দুষ্ট চক্রান্তের খবর পান এবং তাঁদের হাতে তৎকালীন কাশ্মীর-মন্ত্রী মীর্জা আফজল বেগ লিখিত কয়েকখানি চিঠিপত্রের নকল ধরা পড়ে। প্রজা পরিষদ আক্রমণ করেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে। প্রকাশ, শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন এবং অন্তরঙ্গ মহলের ধারণা এই, তিনি কয়েকখানি চিঠি নেহরুকে দেখান। নেহরু এতে আস্থা স্থাপন করেননি। শেখ আবদুল্লা তাঁর বিশ বছরের বন্ধু এবং নেহরু বন্ধুবৎসল। বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা না করে তিনি মতামত স্থির করবেন না। ইতিমধ্যে শেষ আবদুল্লার বিরুদ্ধে প্রজাপরিষদেব প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের সম্মানজনক নিষ্পত্তির জন্য শ্যামাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত নেহরু ও আবদুল্লার সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তিনি স্বচক্ষে পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য কাশ্মীর প্রবেশের সিদ্ধান্ত করেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয কিনা, এজন্য শেষ আবদুল্লাকে জানান। আবদুল্লা এতেও আপত্তি করেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ স্থিব করেন যে, তিনি ভারতের এলাকাভুক্ত কাশ্মীরে বিনা ছাড়পত্রেই প্রবেশ করবেন। কাশ্মীব গভর্নমেন্টের নিজস্ব কোনও ছাডপত্র নেই, এটি ভাবত গভর্নমেন্টেবই প্রবর্তিত। বস্তুত, শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর প্রবেশে কোনও প্রকার বাধা দেওয়া হয়নি, এমন কি মাধোপুব চেক্ পোস্ট থেকে ইরাবতী নদীর পুলের ওপাব পর্যন্ত অনেকটা যেন অভ্যর্থনা করেই তাঁকে নিয়ে যাওযা হয়। "To see that his entry into the state without permit was facilitated."—এটি ছিল ভারত সরকারের অধীনস্থ গুরুদাসপুরের কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশ। স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামাপ্রসাদের শুভযাত্রা কামনা করেছিলেন। সেটি ১১ই মে, ১৯৫৩। পুলের ওপারে পৌঁছবামাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার কবা হলো। বিচিত্র সেই গ্রেপ্তার! কাশ্মীর অথবা ভারত—কোন্ পক্ষ কোন্ আইনে এই ভারতপ্রসিদ্ধ আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করলো, ঠিক বোঝা গেল না। তবে শ্যামাপ্রসাদকে মাত্র 'দুমাসের জন্য' আটক করে রাখার সিদ্ধান্তটা একটু নতুন ধরনের, কারণ পববর্তী ওই দুমাস কাল পণ্ডিত নেহরু ছিলেন বিশেষ ব্যস্ত। তাঁকে যেতে হচ্ছিল ইংল্যান্ডে রানী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণে এবং ইউরোপ ভ্রমণে।

কিন্তু পণ্ডিতজীর মনে বোধ করে স্বস্তি ছিল না। তিনি গেলেন কাশ্মীরে আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শেখ সাহেব এবার যেন একটু ভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বললেন। পণ্ডিতজীর অভ্যর্থনা হলো না এবার শ্রীনগরে। এর পর বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং শ্যামলাল শরফ—এই দুই মন্ত্রীর সঙ্গে শেখ সাহেবের মনোমালিন্য ধূমায়িত হতে থাকে, এবং তিনি কাশ্মীরের নানা স্থানে নানাবিধ অসংলগ্ন এবং হিন্দুভারত-বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।

গ্রেপ্তারের একমাস এগারোদিন পরে ২৩শে জুন তারিখে হঠাৎ শেষ রাত্রে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে কিনা, এই নিয়ে প্রশ্ন তুললো

সমগ্র ভারত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ একেবারেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন নেতা ছিলেন না! পূর্ববঙ্গ থেকে জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, এমন মহৎ এবং উদারপ্রাণ দেশনিষ্ঠ কর্মী তিনি দেখেননি। তিনি সহোদর বিয়োগের বেদনা অনুভব করছেন। এমন সময় খবর এলো, শ্যামাপ্রসাদের স্বহস্ত লিখিত ডায়েরীখানি কাশ্মীরের পুলিশ হস্তগত করেছে, সেটি আর পাওয়া যাবে না।

ফিরে এলেন নেহরু। তিনি সান্ত্বনা দিলেন শ্যামাপ্রসাদের জননী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবীকে। কিন্তু বাঙলার শার্দুল স্বর্গত স্যর আশুতোষের সহধর্মিণী সেই সান্ত্বনা গ্রহণ করেননি,—সন্তানবিচ্ছেদাতুরা মহীয়সী মহিলা, অভিযোগ আনলেন ভারত গভর্নমেন্ট ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই অভিযোগের যথাযথ জবাব দেওয়া অথবা শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরকারী ও বেসরকারী লোক নিযুক্ত করা,—এই দুই কাজই পণ্ডিতজীর পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। সম্ভবত তাঁর মনে এই ভয় ছিল যে, এই তদন্তের ব্যাপার নিয়ে পাছে ভারতে পুনরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু ততদিনে শেখ আবদুল্লার গভর্নমেন্টের প্রতি ভারতের প্রায় সকল রাজনীতিক দলেরই একটি গভীর সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একথা সেদিন জানা গেল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষেও একজন সত্যব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক দেশহিতসাধকের মূল্যবান জীবনও সকল সময় নিরাপদ নয়,—যদি তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতদ্বৈধ ঘটে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুপুরী সেদিন দেখে এলুম নিশাতবাগের পিছনে।

বেলা চারটেব সময় গাড়ি এসে দাঁড়ালো তাঁবুর সামনে। এবারে নতুন পথ। শ্রীনগর সুন্দর হতে থাকে যদি শহর-বাজার ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। চেনার-উইলোর সারির মধ্যে প্রত্যেকটি পথ কোথা থেকে যেন কোন্‌দিকের ছায়ানিবিড় বনে-বনে হারিয়ে গেছে আমার স্বপ্নজগতের মতো! দেখছি পাইন-পপলার-চেনার-উইলো-ওয়াল্‌নাটের নিকুঞ্জলোক আশে-পাশে,—দেখছি, কিন্তু দেখছিনে! দেখে যাচ্ছে মন, চোখ বোধ হয় নয়। মহাকাব্যের পাতায়-পাতায় মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে এই হিমালয়ের আন্তঃইতিহাস,—যখন ফিরে যাবো, বোবা দেওয়াল থাকবে চোখের সামনে, পাঠ করবো এই মহাকাব্য প্রতিটি পাতা উল্‌টিয়ে। দৃষ্টির সঙ্গে মন যদি সংযুক্ত না থাকে, কিচ্ছু দেখা যায় না। 'অন্যমনস্ক চেয়ে ছিলুম'—মানে, দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মন ছিল অন্যত্র, তাই কিছু দেখতে পাইনি,—অনেক লোক এই কথা বলে। শকুন্তলা তাকিয়েছিল ক্ষুৎপিপাসাকাতর দুর্বাসার প্রতি, কিন্তু মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ ছিল দুষ্মন্তের দিকে; তাই দুর্বাসাকে সে দেখতে পায়নি। ভূস্বর্গ হিমালয়ের দিকে আমার মন ছিল, তথ্য সংগ্রহের দিকে চোখ ছিল না।

শ্রীনগরের সমতা থেকে একটি উপত্যকার মতো উঠে গেছে যুবরাজ করণ সিংয়ের প্রাসাদের পথ। এখানে-ওখানে পরিচ্ছন্ন উদ্যান। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো প্রহরীবেষ্টিত প্রাসাদপ্রাঙ্গণে। পশ্চিমে বিশাল দাল-হ্রদ—তার জলরাশি সূর্যকিরণে ও রঙিন মেঘের প্রতিফলনে ঝলমল করছিল। তার একাংশে হরিপর্বতের দুর্গ, অন্য অংশে পাহাড়ের চূড়ায় শঙ্করাচার্যের প্রাচীন মন্দির। উত্তর অঞ্চলে মহারাজা গুলাব সিংয়ের পুরাতন প্রাসাদ। কিন্তু যুবরাজের এই বাংলো প্যাটার্নের প্রাসাদটি নবনির্মিত। যেমন চারিদিকে আধুনিক

সুরুচির শোভা, তেমনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয়। নগরের কোলাহল থেকে দূরে একটি নিভৃত জীবনযাত্রা। আমরা যুবরাজের বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলুম।

সমস্ত ঘরে কাশ্মীরী কার্পেট আর মখমলের কাজ। এখানে ওখানে পড়াশুনার উপকরণ। কোনও কোনও ফুলদানিতে মৌসুমী ফুলের নানাবর্ণের গুচ্ছ রাখা। একটি টেবিলে কয়েকখানি ছবি,—রাজেন্দ্রপ্রসাদ-নেহরু-গান্ধী, এই তিনজন। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুশ্রী ছবি টাঙানো। রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাচ্ছিনে।

যুবরাজ এক সময় সস্ত্রীক এসে প্রবেশ করলেন। অতি সুশ্রী তরুণ যুবক। বড় বড় কালো কাশ্মীরী দুই চোখ। একটি পায়ে কিছু খুঁৎ আছে, সামান্য খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁর পরনে সম্পূর্ণ শাদা প্যান্ট আর গলাবন্ধ কোট। হাসিমুখে আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। নমস্কার জানালেন।

তাঁর স্ত্রীর বয়স অতি অল্প, আন্দাজ বছর কুড়ি। যেমন সুশ্রী, তেমনি পরমাসুন্দরী তিব্বতী মেয়ে,—তাঁর সঙ্গে এসেছেন জনৈকা ইংরেজ গভর্নেস। তাঁরা বসলেন একান্তে।

মোট দশ বারোজন আমরা ছিলুম। অন্য সকলেই তাঁর অল্পবিস্তর পরিচিত, আমি নতুন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আজ আপনি আমাদের নতুন অতিথি। অনেক দূরের মানুষ আপনি। আপনার এই ধুতি পোশাক দেখলে আমরা অবাক হই।

বললুম, এই পোশাকই ছিল ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথের। কই, আপনার ঘরে তাঁর ছবি দেখছিনে ত?

হাসিমুখে যুবরাজ বললেন, আর বলবেন না, রবীন্দ্রনাথের ছবির এতই চাহিদা এখানে যে, বার-বার জোগাড় করেও তাঁর ছবি আমার ঘরে রাখতে পারিনি। কেউ না কেউ এসে তাঁর ছবি নিয়ে চলে যায়। আবার শিগগিরই তাঁর ছবি আনাবো।

আমরা চামচ দিয়ে খাচ্ছিলুম, যুবরাজ প্লেট্ থেকে হাতে তুলে নিয়ে শিঙ্গারা খাচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, আপনার 'যাত্রিক' ছবিটি দেখে ভারি আনন্দ পেয়েছি, জীবিত লেখকের জীবন-কাহিনী এর আগে কখনও ছবিতে দেখিনি। ছবি দেখে চিনেছি আপনাকে! সিনেমায় ভারতীয় ছবি আমার খুব ভালো লাগে।

গুহাতীর্থ অমরনাথের আলোচনা উঠলো। মাত্র গত মাসে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্ণ তুষারলিঙ্গের ছবি তিনি তুলে এনেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, তাঁর স্ত্রী ওই দুঃসাধ্য পার্বত্যপথে সম্পূর্ণ হেঁটে গিয়ে যাত্রা পূর্ণ করেন। যুবরাজ নিজে গিয়েছিলেন ডাণ্ডিতে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলো। তিনি প্রত্যাদেশ পেয়ে এসেছিলেন ক্ষীরভবানীতে। তারপর তিনি যান অমরনাথে। সেখানে এমনভাবে তিনি আত্মসমাহিত হন যে, তীর্থযাত্রীরা তাঁকেই শ্রীঅমরনাথ বলে পূজা দেন। আশ্চর্য সেই মহাপুরুষ, তাঁর পদস্পর্শে কাশ্মীর ধন্য হয়েছিল!

উচ্ছ্বসিত যুবরাজ এক সময় বললেন, দুঃখ এই, সেই বিবেকানন্দের বাঙলা আমি আজও দেখিনি। মানচিত্রে দেখি বাঙলা অনেক দূর! বাঙলা দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের। যদি কখনও যাই, আগে যাবো বেলুড় মঠে, আগে দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির! বাঙলা দেশ হলো ভারতবর্ষের গৌরব।

বললুম, বাঙলাদেশে গেলে আপনার মনে হবে না যে, আপনি কাশ্মীরের বাইরে এসেছেন। এর বন-বাগান ক্ষেত-খামারের এতই মিল দেখছি বাঙলার সঙ্গে।

যুবরাজ তাঁর মনের একাগ্র বাসনা প্রকাশ করে বললেন, জানিনে, কোনওদিন

বাঙলাদেশ দেখতে পাবো কিনা!

গল্পগুজব চললো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। কিন্তু তার মধ্যে একটিও রাজনীতির কথা ছিল না—যেটি নিয়ে তখন সারা কাশ্মীরে তুমুল ঝড় বইছে।

জলযোগের পর আমরা বাইরে এলুম। যুবরানী সহাস্য নমস্কার জানিয়ে ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ অবধি ফটো তোলাতুলি হলো। অতঃপর বন্ধুবান্ধব একে একে বিদায় নিলেন। বাগানের একান্তে গেলুম যুবরাজের সঙ্গে,—প্রায় অন্দরমহলের দরজার কাছাকাছি। সেখানে বারান্দার রোয়াকে তিনি একস্থলে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর এই সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে বসাটা দেখে খুব আমোদ পেলুম। এটি যুবরাজজনোচিত নয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা আমিই তুললুম। তাঁর এই অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাঙালী জাতি, অত্যন্ত শোকার্ত অবস্থায় রয়েছে—একথা তাঁকে জানালুম।

যুবরাজ বললেন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন—এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। তাঁর মতো ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ নেতা অতি বিরল। আমি নিজে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ আজও জানতে পারিনি, কিন্তু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়েছিলুম। কখনও ভাবিনি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটতে পারে। সেই মর্মবেদনা আজও আমাদের বাড়ির কেউ ভুলতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুতে যেন আমাদের পরমাত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটে গেছে!

আমার নোটবইটি তাঁর হাতে দিলুম। তারই একটি পৃষ্ঠায় তিনি এই বাণীটি লিখে দিলেন :

"I have been asked by Shri P. K. Sanyal to send a message to the people of Bengal. All I can do is to send the people of that great land my best wishes. I hope to some day visit your State which was played such a noble and dynamic role in the history of our nation.

Karan Mahal, Srinagar.
29th August, 1953 Karan Singh."

যুবরাজের এই বাণীটি যথাসময়ে দিল্লী ও কলিকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ প্রকাশিত হয়।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সারা পৃথিবী উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল কাশ্মীরের একটি নাটকীয় সংবাদে। এই তরুণ রাজকুমার মাত্র এক রাত্রির মধ্যে একটি চল্‌তি গভর্নমেন্টকে বিশেষ ক্ষমতাবলে নিজের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে আরেকটি নূতন গভর্নমেণ্টকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পিছনে দিল্লীর সহায়তা কতখানি ছিল, অথবা ছিল কিনা, সে-আলোচনা এখানে ওঠে না।

সে যাই হোক, এই সময়টায় আমার লেখা কয়েকখানি 'কাশ্মীরের চিঠি' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ বেনামীতে নিয়মিত ছাপা হতে থাকে। তাদের মধ্যে শেষ পত্রে যুবরাজ করণ সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র ছিল : [অনুবাদ]

"His eagerness for visiting Bengal has led me to think that we outght

to bring him down to Bengal and give him a befitting reception. I hope such a visit would help to clear up the misunderstanding between Bengal and Kashmir that has cropped up as a sequel to Dr. Mookherjee's sudden death in Kashmir. Perhaps the Yuvaraj also Knows this. If the West Bengal Governor Dr. H. C. Mookherjee and Dr. B. C. Roy can consider this suggestion it will be better still."

অতঃপর চার মাসের মধ্যে যুবরাজ করণ সিংকে সাদরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তিনি বেলুড় মঠ এবং এখানে-ওখানে কিছুদিন পরিভ্রমণ করে বিশেষ আনন্দলাভ করেন।

'দেবতাত্মা হিমালয়ের' প্রথম খণ্ডে জনৈক বাঙালী মহিলার উল্লেখ আছে। পহলগাঁওর হোটেলে তিনি এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। হিমাংশু বসু ছিলেন আমার সঙ্গে। মহিলাটি আধুনিক কালের মেয়ে। নাম শ্রীমতী মায়া। তিনি বিশেষভাবে তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। অতএব অমরনাথ থেকে ফিরে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো তাঁর ঠিকানা নিয়ে শ্রীনগরের শহরতলীর এক বাড়িতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে-বাড়িতে চার পাঁচটি পরিবারের মধ্যে দুটি বাঙালী। তিনি আমাদের নাটকীয় আবির্ভাব দেখে সেই সন্ধ্যায় সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর স্বামী বিমান-বিভাগে চাকরি করেন, এবং বর্তমানে আছেন দক্ষিণ ভারতে।

একটি বাগানবাড়ির দোতলায় মহিলাটি থাকেন। শহর থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বড়জেলা নামক পল্লীতে। রামবাগের পুল পেরিয়ে মহারাজা গুলাব সিংয়ের সমাধি-উদ্যান ছাড়িয়ে যে পথটি গিয়েছে বিমানঘাঁটির দিকে, সেই পথের ধারে পপলারের বনময় পাহাড়তলীর দিকে এঁদের বাগানবাড়ি। পল্লীটি অতি নিভৃত,—বাড়ির গা দিয়ে গ্রামের দিকে একটি পথ চলে গেছে, অরণ্যজটলা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের দিকে।

শ্রীমতী মায়া পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না যে, তাঁর এখানে আমি কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য নিতে বাধ্য। সঙ্গে যদি হিমাংশুও থাকেন তবে তিনি পরম কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু হিমাংশু তখনই জানিয়ে দিলেন যে হাউস-বোটে কিছুদিন বাস করার বাসনা নিয়ে তিনি এসেছেন কাশ্মীরে, তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হওয়া একান্তই দরকার। হাউসবোট আমার নিজের ভালো লাগেনি। দাল-হ্রদের আনাচে কানাচে এবং বদ্ধজলার দলজড়ানো নোংরা জলে হাউসবোটের বাহ্যিক চেহারা দেখে মানিকতলার খালের মহাজনী নৌকার কথা আমার মনে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, মাঝিমল্লার হাতে স্বাধীনতা তুলে দিয়ে জলের মাঝখানে গিয়ে হাত পা গুটিয়ে থাকা পছন্দসই হয়নি। অবশ্য প্রত্যেক বোটের অধীনে 'শিকারা' নামক ছোট ছোট ঘেরাটোপের ডিঙি মোতায়েন আছে বটে, যখন খুশী পারাপারও হওয়া চলে। কিন্তু যতই হোক, যত কাব্যই ওর সঙ্গে যুক্ত থাকুক, স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা পদে পদে কুণ্ঠিত হয়—এই আমার বিশ্বাস। তাঁবুতে থাকতে গেলে পাহারা লাগে। সুতরাং হোটেল সর্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যকর।

আমরা সেদিন চা পান করে পুনরায় আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলুম। কথা রইলো পরদিন সকালে মায়া আসবেন আমাদের তাঁবুতে। সুন্দর বাগানবাড়ির গাছপালা এবং ফুলবাগানের মধ্যে আমাদের তাঁবু, কিন্তু বোধ করি, উপকরণের কিছু অভাব থাকার জন্য

আবহাওয়াটা খুব উৎসাহজনক ছিল না। হিমাংশুর স্বাস্থ্য ফেরাবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা ছিল,—তাঁর মাথার কাছে কিছু ফলপাকড় থাকলেই তিনি পরিতুষ্ট হন্। আমি থাকি নিত্য অসন্তোষ নিয়ে। নধর শয্যার আরামদায়ক উত্তাপের মধ্যে শুলে আমার পিঠে চিরদিন কাঁটা ফোটে। পদে পদে নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটলে সুস্থ থাকিনে। প্রচুর আহারাদির আয়োজন দেখলে মুখে অরুচি আসে। ফল-পাকড় খেলে শরীর ভালো হয়, একথা শুনতে পেলে ফল আমার দুচোখের বিষ হয়ে ওঠে। আমি আরাম চাইনে, আনন্দ চাই।

বাগানবাড়ির ভিতর ও বাহিরের আবহাওয়াটা পরদিন সকাল থেকে আমাদের ভালো লাগেনি। ভিতরে থাকেন ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ রায় ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। মিসেস রায়ের আগ্রহাতিশয্যেই হিমাংশু এখানে তাঁবুর ব্যবস্থাদি করেছেন। সকাল বেলায় বৃদ্ধ মিঃ রায় বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কতক্ষণ আলাপ করেও গেলেন, কিন্তু কোথায় যেন বাতাসটা একটু থমথমে।

সকাল প্রায় নটায় এলেন মায়া এবং কুণ্ডু স্পেশালের শ্রীমান শঙ্কর। তাঁবুর সামনে আমাদের বসিয়ে শ্রীমান ছবি তুলতে লাগলো একটির পর একটি। শ্রীমতী মায়ার শাদা রেশমের শাড়ির উপযুক্ত ছবি কিছুতেই রৌদ্রের আভায় ওঠে না, এই ছিল মস্ত সমস্যা। তাঁবুর সামনে বাগানে সকালের চায়ের আসর বসে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে স্থির করা গেল, আজ আমরা মোগল গার্ডেনস্ দেখতে যাবো। শঙ্কর জিদ ধরে এই প্রস্তাব করলো, আজ আমরা তিনজনে তার সারাদিনের অতিথি। তার আতিথেয়তা স্মরণ করে রাখার মতো।

শহরের যে অংশটা জনবহুল সেটি নোংরায় আর সঙ্কীর্ণতায় অপরিচ্ছন্ন; ছোট ছোট অন্ধকারের খোপের মধ্যে অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা,—ওর মধ্যেই বহু ধিক্কৃত জীবন কিলবিল করে। গলি-ঘুঁজি নোংরা জলে বস্তির যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরের আশে-পাশে, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেজন্য ক্ষয়রোগ নানা স্থানে প্রবল। এর বাইরে গেলে তবে ভূস্বর্গ। যারা কাশ্মীর দেখতে যায়, তারা কিন্তু কাশ্মীরীদের প্রকৃত জীবনযাত্রার চেহারা দেখতে চায় না। তারা গিয়ে টাকা ছড়িয়ে আমোদ কিনে নিয়ে আসে। ময়লা ঘরে, নোংরা সজ্জায়, ছেঁড়া বিছানায়, উচ্ছিষ্টের আনাচে কানাচে, শিকারা আর হাউসবোটের পাটাতনের আড়ালে, দোকানের তলায়, হাটবাজারের অলিগলিতে, গাড়ির আড্ডায়, বিতস্তার ঘাটে ঘাটে, সাঁকোগুলির আশে-পাশে, কুটিরশিল্প কেন্দ্রগুলির আড়ালে আবডালে,—যে ক্ষুধার্ত দরিদ্র ও হতাশ নরনারী এবং শিশুরা চলাফেরা করে, তারা হলো প্রকৃত কাশ্মীরী,—তারা ভিক্ষে করে টুরিস্টদের কাছে হাত পেতে। যেখানে যাও ভিক্ষে, যেখানে যাও বকশিস। ছুটে গিয়ে গাড়ি ডেকে দিল, দাও বকশিস। রাস্তাটা দেখিয়ে দিল, দাও ভিক্ষে। চললো সঙ্গে সঙ্গে—যদি পায় ছিটে-ফোঁটা, যদি পায় এঁটো-কাঁটা। গৃহস্থঘরের বউ, বাড়ির গৃহিণী, ক্ষেতখামারের চাষী,—এরা ছুটে এলো পথের ধারে—কেননা টুরিস্ট যাচ্ছে, যদি দু'চার পয়সা 'বকশিস' পাওয়া যায়। রান্না করতে করতে ছুটে এলো, বিছানা ছেড়ে রোগী ছুটে এলো, খেলা ছেড়ে বালকবালিকা ছুটে এলো, খামারে জলসেচনের কাজ ফেলে শ্রমিক ছুটে এলো। এলো বাঁকা-নয়না, এলো মধুরভাষিণী, এলো লজ্জাবতী, এলো হাস্যমুখ বালক, এলো অশীতিপর বৃদ্ধ,—এলো চারিদিক থেকে হিমালয়ের সন্তান। ওরা শুনতে পেয়েছে এই পথ দিয়ে যাবে ইউরোপীয় টুরিস্ট, ভারতীয় শেঠ আর মহাজন,—ওরা আশায় আশায় পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওরা ভূস্বর্গবাসী, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধার ধারে না। বোঝে না রাজনীতি, জানে না সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। ওরা জেনে এসেছে চিরকালের মারখাওয়া দৈন্য-দারিদ্র্যের নরককুণ্ড কাশ্মীরকে। ক্ষুধার অন্নে ওরা খুশী, নিরুপায় জীবনযাত্রায় একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য পেলেই ওদের আনন্দ। ওদের এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখলে যেন কান্না পায়।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে মাইল তিনেক এগিয়ে গেলেই একে একে মোগল-গার্ডেনগুলি পাওয়া যায়। পাশেই বিস্তৃত দাল-হ্রদ। জলজ লতাদলে আচ্ছন্ন থাকে, তাই এই বিশাল জলাশয়ের নাম দাল, কিংবা দল, কিংবা ডাল। কমবেশী পনেরো বর্গ মাইল এর পরিধি। কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট লতাদলের উপর রাশি রাশি মাটি ফেলে এক একটি ভাসমান বাগান প্রস্তুত করা হয়েছে। ফুলে-ফুলে সেগুলি আচ্ছন্ন। কোথাও কোথাও ভেসে চলে শ্বেত ও রক্তপদ্মের দল,—তাদেরই উপর দিয়ে চারিদিক থেকে হ্রদের উপর ছায়া পড়ে এক একটি পর্বতচূড়ার। সূর্যাস্তের নানাবর্ণ জলের উপরে নিবিড় হতে থাকে।

আমরা একটির পর একটি উদ্যান দেখে বেড়ালুম। পাহাড়ের কোলে এই উদ্যানে নানা কৌশলে আনা হয়েছে এক একটি ঝরণা। এ বাগানগুলি মোগল আমলের। চশমাসাহি, শালিমার, নিশাতবাগ, নাসিমবাগ ইত্যাদি। এগুলি মোগল আমলের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। শ্রীনগর থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে একটি নিরিবিলি বনময় অঞ্চলে এসে আমরা পেলুম হরবন। এটি সংরক্ষিত এক বিশাল জলাশয়। এখান থেকে রাজধানীতে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। এর চেহারা দেখেই মনে পড়ে যায় জামশেদপুর থেকে আট মাইল দূরের 'ডেম্‌না' হ্রদটি,—কেউ বলে, ডেম্‌লা! দুটি হ্রদের একই উদ্দেশ্য। এখানেও পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র : সেখানেও তাই—দল্‌মা পাহাড়ের কোল। আমরা হরবনের বাঁধের উপর থেকে নেমে এসে অদূরে একটি সরকারী 'ট্রাউট্‌' মৎস্য চাষের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলুম। অরণ্যজটলার ছায়াকুঞ্জলোকে পাহাড়ী পাখিদলের কূজন-গুঞ্জন চলছে। শঙ্কর ছবি তুললো আবার আমাদের দাঁড় করিয়ে।

শ্রীমতী মায়ার এসব অভিজ্ঞতা নতুন। বন্ধুমহলের সঙ্গে একবার মাত্র বেরিয়ে তিনি গিয়েছিলেন পহলগাঁওয়ে—মাত্র দিন পনেরো আগে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিল একটি দম্পতি তাদের শিশুকন্যাসহ। তারা হলো মদনলাল আর সৎবতী। এ ছাড়া আরেকটি যুবক, নাম বাহাদুর সিং। ওদের সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আজ বাইরে এসে তিনি মুক্ত বিহঙ্গী। পাহাড়ের ঝরণা ছিল অবরুদ্ধ, এবার যেন সেটি ঝরঝরিয়ে নেমে এসেছে। স্বামী সঙ্গে নেই, সেজন্য তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ, কিছু বা আনমনা, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ উল্লাসপ্রিয়তা ওতে বাধা পায়নি। আমাদের সঙ্গে তাঁর নতুন আলাপের সংবাদটি তিনি ইতিমধ্যে ভারতের দূরদূরান্তরে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুমহলে প্রচার করে দিয়েছেন। স্বামীকে জানিয়েছেন সর্বাগ্রে।

সকাল থেকে সারাদিন মোটরবিহার চলেছে আমাদের। মোটর প্রায় সর্বত্রগামী, পথ অতি মনোরম। হাজার হাজার বর্গমাইল হিমালয়ে ঘুরেছি, কিন্তু এখানে যেন পথ ভুলে এসে পড়েছি নাচের আসরে, গানের মজলিশে। এখানে শুনি নূপুরের ঝনক হিমালয়ের নীচে নীচে, পদে পদে শুনি ঠুংরীর বোল। হিমালয়ের সেই মহাগম্ভীর অরণ্যলোকের প্রশান্ত উদার গাম্ভীর্য চোখে পড়ছে না, সেই কলমন্দ্রমুখরা জননী জাহ্নবীর পুণ্য পার্বত্যলোক ব্রহ্মপুরা নয়, জটাভস্মমাখা নগ্নদেহ সন্ন্যাসীদলের সেই বেদমন্ত্রধ্বনিমুখরিত পার্বত্য গুহাগহ্বর দেখছিনে কোথাও,—এ যেন সহস্র ভোগবিলাসে, উল্লাসে, আলসে,

লালসে বিবশা মদিরেক্ষণা রসরঙ্গীন উপত্যকা। এখানে টাকা ছড়াছড়ি যায়, আমোদ গড়াগড়ি যায়। প্রতিটি পাহাড়ের আনাচ কানাচ হলো প্রমোদ কানন, প্রতিটি তাঁবুর রহস্য অন্তরালে প্রাণ নিয়ে খেলা, চেনার-উইলো-পাইনের বনান্তরালে মধ্যরাত্রির ছায়ানিবিড় জ্যোৎস্নায় কোথাও কোথাও উচ্ছ্বসিত অনুরাগ আপন বাসনার অসহনীয় যন্ত্রণায় মাতাল হতে থাকে। সুখের আর লোভের এমন দেশজোড়া আয়োজন হিমালয়ের আর কোথাও নেই। সেই কারণে কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে যে সব রঙ্গীন প্রজাপতি এখানে বেড়িয়ে যায়, তারা কাশ্মীরকে বলে, প্রাচ্যের নন্দন কানন!

ক্লান্ত সন্ধ্যা নেমে আসছে দাল-হ্রদে। হরিপর্বতে আর শঙ্করাচার্যের চূড়ায় আরক্তিম আভা লেগেছে। হরমুখের দিকে বাদলের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বইছে ওদিক থেকে।

শঙ্কর হাসিমুখে এবার বিদায় নিল। এই মহিলাকেও যেতে হবে অনেক দূর। কিন্তু টাঙ্গায় উঠে তিনি বললেন, শ্রীনগরের ইলেকট্রিক আলো কত কম, দেখছেন ত? তারপর ময়দান ছাড়ালে আব আলো নেই। একলা যেতে আমি পারবো না, আমাকে পৌঁছে দেবেন চলুন। পথ অনেকটা।

অনেক পথ সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানকার পথঘাটে ভয়ও নেই। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের মধ্যে চোর-ডাকাতের উৎপাত সব চেয়ে কম কাশ্মীরে—এমন নিরাপদ অঞ্চল খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। পয়সা কড়ি এরা চেয়ে নেয়, বকশিস নেয়, এমন কি কৌশলে ফেলে হয়ত দোহনও করে, কিন্তু ছিনিয়ে নেয় না। এমন স্বভাব-ধার্মিক সম্প্রদায় সহসা চোখে পড়ে না, এবং এমন ভীরুপ্রকৃতি জনসাধারণ সচরাচর দেখা যায় না।

আমিরা-কদল পেরিয়ে বাঁ দিকের বস্তিবাজার ছাড়িয়ে ময়দানের ধার দিয়ে আমাদের টাঙ্গা চলেছে রামবাগের দিকে। শ্রীমতী মায়া বললেন, আজ রাত্রে আবার চিঠি লিখবো ওঁর কাছে, আমাদের বেড়াবার কথা জানিয়ে। আপনি কাল সকালে ওখানে আসছেন ত?

সকালে নয়, দুপুরে।

বেশ, তাই আসুন। আমার বড় দুর্ভাগ্য, আপনি আর মাস দেড়েক আগে এলেন না। উনি ছিলেন,—আমরা সকলেই খুব আমোদে থাকতুম। উনি সকালে যান আপিসে, খাবার সময় আবার আসেন। ব্যস, সমস্ত দিন ছুটি।

বললুম, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আসতে হুকুম করুন।

তবেই হয়েছে!—মায়া বললেন, এ যে মিলিটারির চাকরি, নিয়ম-নীতি অন্যরকম। উনি গিয়েছেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে। এই পরীক্ষায় উৎরে গেলে একটু উন্নতির আশা আছে।

কাশ্মীরের তথা ভারতের বিমান বিভাগে বাঙালী আছেন, এ সংবাদটি উৎসাহজনক। সত্যি বলতে কি, ভারত সরকারের দুটি বিশেষ বিভাগ প্রধানত বাঙালীর হাতের তৈরী। একটি বিমান বিভাগ,—এটি প্রথম একদল সম্ভ্রান্ত বাঙালীর চেষ্টায় গোড়ার দিকে বেসরকারীভাবে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে প্রায় ত্রিশ বছর হতে চললো। দ্বিতীয়টি হলো, বেতার বিভাগ। এ বিভাগটি অনেকাংশে বাঙালীর সৃষ্টি, এবং এটির জন্ম হয় কয়েকজন বেসরকারী বাঙালীর চেষ্টায়,—তাঁরা সরকারী লাইসেন্স নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলেন। কিন্তু এর প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে তৎকালে ইংরেজ

শাসকের টনক নড়ে, এবং তাঁরা একটি বিশেষ আইনবলে এই বেতার প্রতিষ্ঠানকে হস্তগত করেন।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, যদি অভয় দেন তবে একটি প্রশ্ন করি।

বলুন?

এমন সুন্দর দেশে সপরিবারে এলেন না কেন?

হাসলুম। বললুম, চারদিকে যেরকম কাঁচা পয়সা ছড়িয়ে চলতে হয়, তাতে ঘটি বাটি পর্যন্ত না বেচলে এখানে সপরিবারে আসা চলে না। তাছাড়া কাশ্মীর বেড়ানো ঠিক আমার এ যাত্রায় উদ্দেশ্যও ছিল না। আমি এসেছিলুম অমরনাথে।

তিনি এবার বললেন, দেখুন, এদিকটা কি রকম অন্ধকার হয়ে এলো! দেখছেন ত, লোকজনই নেই। আমাকে অবিশ্যি নিয়মিত আনাগোনা করতে হয় না, তাই রক্ষে। উনি যাবার আগে মোটামুটি সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

হাসিমুখে বললুম, আপনি যে অতিথিশালা খুলবেন, এ ব্যবস্থাও কি তিনি করে গেছেন?

সে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। একজন বুড়ো পণ্ডিত আছে, সে ডাকঘরে চাকরি করে। সে দু'একদিন অন্তর আমার সমস্ত জিনিসপত্র এনে দেয়। আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আরেকটা কথা হয়ত আপনি ভাবছেন, সে আমি জানি। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, সেবার পহলগাঁও থেকে ফিরেই ওঁকে জানাই যে, আপনি আমার এখানে আতিথ্য নিতে রাজি হয়েছেন। উনি তার উত্তরে কি চমৎকার চিঠি লিখেছেন, কাল আপনাকে দেখাবো।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গাড়ি ঘুরলো ডান দিকে। এ পথটা সোজা গেছে শ্রীনগরের বিমানঘাঁটির দিকে। নীচে দিয়ে নদীর ধারা পাহাড়তলীর পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে কোথায় চলে গেছে ঠাহর হচ্ছে না। যেখানেই যাক এ ধারা মিলেছে মূল বিতস্তায়।

মহারাজা গুলাব সিংয়ের সমাধি এবং শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালী স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ মঠ'-এর পাশ কাটিয়ে টাঙ্গা এক সময় এসে পৌছলো সেই বসতি-বিরল বাগানবাড়ির গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে শ্রীমতী গুপ্তা কথাটা পাকা করে নিলেন,—কাল জিনিসপত্র নিয়ে দুপুরের দিকে সোজা চলে আসবেন। কোনও সঙ্কোচ করবেন না।

আমাকেও একথা পাকা করে নিতে হলো, তিন চারদিনের বেশী আমার পক্ষে কাশ্মীরে থাকা আর সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি আমাকে হিমাচল প্রদেশ ঘুরে দিল্লী ফিরতে হবে।

তিনিও জবাব দিলেন, বেশ, তিন রাত্রের বেশি অতিথিদের থাকতে নেই, এই কথা আমি মনে রাখবো। মোটকথা আপনার আসা চাই, নইলে গুপ্তসাহেব আমার ওপর ভীষণ রাগ করবেন।

টাঙ্গা-গাড়ির আলোটুকুতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা চলছিল। শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, সব কথার ওপরেও আরেক কথা আছে। সত্যি বলছি আপনাকে, লেখক-মানুষকে কখনও দেখিনি। তারা কেমন, কিছু জানিনে। কেমন করে তারা বই লেখে, কেমন করে কল্পনায় সব আনে,—ভাবলে অবাক লাগে। আপনাকে কাছে থেকে না দেখলে আমার কিছুতেই চলবে না!

হাসিমুখে এবার গাড়িতে উঠলুম।—বেশ, কাল আসবো।

দাঁড়ান একটু, আগে আমি ভেতরে যাই।—এই বলে তিনি ভীরু পদক্ষেপে ছুট্‌ দিলেন অন্ধকার বাগান পেরিয়ে ভিতর মহলে। সেখানে দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা—এবার যান—কাল কিন্তু আপনার জন্যে রান্না করে রাখবো!

টাঙ্গা ছেড়ে দিল। আশ্চর্য, তখন আমার একটিবারও মনে হয়নি, হিমালয়ের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার এই ভ্রমণে একটি নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করবে।

*　　　*　　　*

কাশ্মীরের আকাশে বাদলের ছায়া দেখা দিয়েছে। মেঘেরা ভেসে চলেছে পীর-পাঞ্জালের কোলে-কোলে, হরমুখ আর হরমহেশের চূড়ায়-চূড়ায়, জাস্কার আর দেবশাহীর স্তবকে স্তবকে । ছায়া পড়েছে বিতস্তায় আর সতীসায়রে—যার আধুনিক নাম হলো দাল-হ্রদ।

হরমহেশের কৃষ্ণজটার অন্ধকারে গুরু গুরু ডম্বরুধ্বনি শোনা যাচ্ছে; দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চিরকালের সর্বহারা সন্ন্যাসী 'নাঙ্গার' রুদ্র নয়নের ক্বচিৎ কালকটাক্ষ। অসুরনাশিনী চণ্ডী আর মহিষাসুরের রণডঙ্কা বেজে চলেছে হরমুখের কোলে-কোলে। পাইন আর পপলারের অরণ্য মেঘের মধ্যে দিশাহারা হয়ে গেছে।

আজ জন্মাষ্টমী। আগস্ট ৩১, ১৯৫৩।

বাগানবাড়ির তাঁবু তুলে দিলেন হিমাংশু। ওর মধ্যে আমাদের দুদিনের অনির্দিষ্ট এলোমেলো সংসারযাত্রা ছিল একটু হাস্যকর। হিমাংশু চাকরি করেন কলকাতার ইম্পিরিয়ল্‌ ব্যাঙ্কে, সুতরাং তার এই শাখা আপিসের বাগানে তাঁর যেন কতকটা নৈতিক অধিকার ছিল। কিন্তু এবাড়িতে তিনি ভাত খেয়েছেন যত, বাজারের ফল চিবিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। এবার তাঁবুর কারবার বন্ধ করতে হলো। আমরা পুনরায় খালসা হোটেলে গিয়ে বাসা বাঁধলুম। কথা চলছে, সুবিধামতো হাউসবোটের ঘর পেলেই হিমাংশু দাল-হ্রদের অগাধ জলে গিয়ে পড়বেন। কিন্তু আজ এবেলা আমি হিমাংশুর অতিথি, অপরাহ্নে চলে যাবো শ্রীমতী মায়ার ওখানে। ঠাণ্ডায় কনকনিয়ে উঠেছে শ্রীনগর।

ভ্রাম্যমাণ জীবনে হিমাংশুর মতো সুহৃদ্‌ সচরাচর মেলে না। সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি রেলগাড়ির কামরায় উঠে একটুখানি আরামের লোভে সহসা স্বার্থপর হতে থাকে—এ দেখা আছে। সর্বত্যাগী নাঙ্গা সন্ন্যাসী আগে ভাগে এগিয়ে একটি ঘাঁটি-আগলানো বটবৃক্ষের নীচে আসন নেয়,—এও দেখা। এসব ছোট ছোট লোভ, ছোট ছোট স্বার্থ,—এসব ক্ষুদ্র দৈন্য অনেক বরেণ্য মানুষের প্রকৃতির মধ্যেও জড়ানো থাকে; যথাসময়ে এসব ত্রুটি ধরা পড়ে দৃষ্টির অনুবীক্ষণে। এই প্রকার ক্ষুদ্রতা থেকে হিমাংশু অনেকটা মুক্ত। দুঃসাধ্য এবং দুস্তর পাহাড়ে তীর্থযাত্রাপথে মানুষের স্বার্থপরতা যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেখানেও এই ব্যক্তিকে দেখেছি। হয়ত তিনি সংসারধর্মী হলে এইসব গুণপনা কমে যেত।

অল্প অল্প বৃষ্টি নামলো মধ্যাহ্নের আগেই। কাশ্মীরে বৃষ্টির পরিমাণ বাঙলাদেশের মতো নয়। মৌসুমী বায়ু আসে বটে পশ্চিম পাকিস্তান আর রাজস্থানের উপর দিয়ে। কিন্তু মরুভূমি ও শুষ্ক ভূভাগের উপর দিয়ে আসবার কালে সেই বায়ু যায় শুকিয়ে। সুতরাং অবশিষ্ট বায়ু পীরপাঞ্জালের দক্ষিণ কোল পেরিয়ে উত্তরপথে পৌছয় সামান্য। সেই কারণে পঁচিশ থেকে ত্রিশ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি কাশ্মীরে নেই। আজ দেখতে দেখতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝাপসা আকাশ থেকে নেমে এলো ঠাণ্ডা হাওয়া। সে-ঠাণ্ডা আকস্মিক,—যেমন পাহাড়ে

সচরাচর ঘটে,—কিন্তু তার ঝলক বড়ই উপভোগ্য। উপভোগ্য হলেও ভাবনার কারণ আছে বৈকি।

আমাদের হোটেলের ঠিক পশ্চিমে কয়েকটি দরিদ্র ঘরকন্নাযুক্ত একটি বস্তিপল্লী চোখে পড়ে প্রায় সারাদিন। সেখানে প্রতিবেশীমহলে বিবাদ বেধেছিল সকাল থেকে। ঘরোয়া বিবাদে মেয়েদের ভূমিকা যেমন সর্বত্রই প্রধান, এখানেও তাই। কিন্তু সর্বপ্রকার উত্তেজনার মধ্যে কোনও কোনও মেয়েকে হাসতে দেখছি, এইটি হলো কৌতুকের বিষয়। কাশ্মীরী 'বোলি' কাশ্মীরের বাইরে বিশেষ কেউ বোঝে না। কিন্তু এই 'বোলি'র উৎপত্তি হলো সংস্কৃত থেকে। এর সঙ্গে হিন্দি আর উর্দু দুই মিলেছে, যেমন মিলেছে ফার্সী। বাঙলা দেশেও এই। 'মগ' বাঙলাভাষা মিলেছে চট্টগ্রামে এসে। চাটগাঁর বাঙালী পাশে দাঁড়িয়ে যদি পরস্পর আলাপ করে, আমার পক্ষে বোধগম্য হয় না। ব্রহ্মদেশে বসবাসকালে আমার এই অভিজ্ঞতা ঘটে। ময়মনসিংহ থেকে মেদিনীপুর অবধি বাঙলা ভাষা বহুবার বদলায়। দার্জিলিংয়ে এবং দক্ষিণ নেপালে কান পেতে থাকলে শোনা যাবে বাঙলা ভাষা বলছে হিন্দির মিশ্রণে। পশ্চিম-দক্ষিণ আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর আর মিথিলা, উৎকল আর মগের মুলুক, কোচবিহার আর দক্ষিণবিহার, তেজপুর আর ভোজপুর,—বাঙলা ভাষাই হেঁটে বেড়িয়েছে এর-ওর সঙ্গে গলা ধরাধরি করে। ভাষার স্বাস্থ্যসবলতা থাকলেই সে হাঁটে, পাঁচজনের হাত থেকে সে পাঁচরকম শব্দ নিয়ে নিজেকে অলঙ্কৃত করে। সেইখানেই তার প্রাণশক্তি। যে-ভাষা তার জাতিচ্যুতির ভয়ে আলোবাতাসের পথরুদ্ধ করে নিজের গণ্ডীর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, এককালে গিয়ে সে ভাষা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ইংরেজ শুধু যে ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে-ঘুরে নিজের ভাষার শব্দসম্পদ বাড়িয়েছে তাই নয়, ভারতবর্ষীয় শব্দও সে আহরণ করেছে। ইংরেজি অভিধানে এব নমুনা আছে ভুবি ভুরি। বাঙলা ভাষায় যে শতকরা প্রায় তেত্রিশ ভাগ আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দি এসে জায়গা পেয়েছে, এবং সাহিত্যে তাদের স্থান নির্দিষ্ট,—অন্ধ প্রাদেশিকতার আত্মাভিমানে সেকথা আমরা ভুলে যাই।

কাশ্মীরি 'বোলি' থেকে কাশ্মীরের কাব্যসাহিত্য এবং লোকসঙ্গীতের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল এককালে। এর থেকে মেয়েরা সৃষ্টি করেছে নাচের গান আর প্রণয়গীতি,—সেই গান অনেক সময় অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে। ধানের মাঠে, দর্জির পাড়ায়, গয়লাদের ঘরে, মাঝিমাল্লার দলে, পসারিনীদের মসলিশে, ছুতোরের আড্ডায়, মজুরদের বস্তিতে,—দলবদ্ধ হয়ে লোকসঙ্গীত গায় মেয়ে আর পুরুষ। গান গাওয়া হয় আঁতুড় ঘরে আর অন্নপ্রাশনের উৎসবে। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু দোলনায়।

বিরহিনী মেয়ে তার আকণ্ঠ অনুরাগে ডাক দেয় বিতস্তার এ প্রান্ত থেকে : "অরণ্যে অরণ্যে ধরেছে প্রস্ফুটিত মুকুল, হে প্রিয়, তুমি কি শোনোনি শুধু আমার সংবাদ? গিরি-উপত্যকায় তরসায়রে অগণ্য রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো,—তুমি কি আমার সংবাদ শোনোনি কিছু?"

ও প্রান্তের অরণ্য থেকে দয়িতের ডাক শোনা যায়: "মুক্তা এনেছি সাগর মথিয়া তোমার দন্ত সাজাতে, তোমার অধরে রক্তিম আভা আমার প্রাণের শোণিতে।"

বৃষ্টি নেমে এলো মধ্যাহ্নের পর থেকে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে,—যেমন শিলংয়ে, যেমন দার্জিলিংয়ে। তফাৎ এই, এখানে তুষার চূড়ারা

খুব সন্নিকট, সেজন্য হু হু করে বরফানি বাতাস নেমে আসে। নগরের উপরে তুহিনের একটি ছায়া পড়ে। অপরাহ্ণের দিকে ফিরে এসে হিমাংশু প্রস্তাব করলেন, আকাশের চেহারা ভালো নয়, আপনার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিৎ। দেরি করলে ভদ্রমহিলা বিব্রত বোধ করবেন।

বন্ধুবর মিঃ ধারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হলো এই যে, আগামীকাল সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বক্সী গোলাম মহম্মদের ওখানে। তাঁর বাড়িতেই আলাপচারী হবে। দু একজন মন্ত্রী ও কয়েকজন সরকারী কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অতএব আজ আমার ছুটি। সুতরাং অধিককাল বিলম্ব না করে আমি বেরিয়ে পড়লুম রামবাগের পথে। সন্ধ্যার তখন বিলম্ব নেই । সাপটে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজে ভিজেই যেতে হবে।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গুলাব সিংয়ের সমাধি ছাড়িয়ে যখন বড়জেলায় এসে পৌঁছলুম, তখন মেঘেরা নেমে এসেছে বিস্তৃত বন বাগানের পপলারের জটলায়। পথে জনমানব কোথাও নেই, বাগানবাড়ির দবজা জানালা সব বন্ধ। দোতলার সামনের ঘরখানায় সমস্তগুলি জানলাই কাচের শার্সির। তারই একটির সামনে শ্রীমতা মায়া দাঁড়িয়েছিলেন। টাঙ্গায় আমাকে আসতে দেখে নেমে এলেন। টাঙ্গার গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্র গিয়ে উপরের ঘরে উঠলো। ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ।

অভ্যর্থনাটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সে কথা থাক। দুটি শিশুকে দেখছি, আর কেউ কাছাকাছি নেই। বাড়ির নীচের পিছনদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন আরেকটি বাঙালী পরিবার, এ শিশু দুটি তাঁদেরই। উপরতলার একটি অংশে থাকেন এক মারাঠী পরিবার, তাঁদের সাড়াশব্দ কম। এ ফ্ল্যাটে শ্রীমতী মায়া একা। তাঁর হেপাজতে এই দুটি ঘর। এ ঘরটি প্রায় একেবারেই শূন্য থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ ঘরে এসেছে একটি চারপাই, তার উপরে একটি তোষক এবং একখানা লেপ ও বালিশ।

শিশু মেয়ে দুটিকে খুব ভালো লাগছিল। তারা যেন এ তল্লাটের মরুভূমির মধ্যে এনেছে স্নেহছায়া। শিশুর মতো এমন নিঃসঙ্গতার অবলম্বন আর কিছু নেই। ওদের সঙ্গে বসে গল্প জুড়ে দিতে হলো। শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, এখানে আপনার আড়ষ্ট হয়ে থাকার কিছু নেই। দাঁড়ান, বড্ড ভিজে এসেছেন আপনি, আমি চা করে নিয়ে আসি।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝমিয়ে। মেঘের দল নেমে এসেছে নীচের বাগানে,—ঝাপসা হয়ে গেছে সব গাছপালা। তখনও অতি সামান্য পরিমাণ দিনের আলো অবশিষ্ট রয়েছে, কিন্তু তার চেহারাটা ধূমেল,—কেমন একটা অনৈসর্গিক আভা। যেন আদি সৃষ্টির ঊষাকাল। ঠাণ্ডা প্রচুর পড়েছে বাইরে। জানালার শার্সিগুলি ঝড়ের ঝাপটায় মাঝে মাঝে ঝন ঝন করে উঠছে,—কিন্তু এত ঝাপসা যে, বাইরে কিছু দেখা যায় না। এ বাড়ির উত্তর দিকে মাত্র একঘর বস্তি, —তার বাইরে চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলের মধ্যে ঘনমেঘলুপ্ত পপলারের বিস্তৃত অরণ্য-জটলা। সামনেই পাহাড়তলীর গা বেয়ে গেছে জলানদী বাবলাবনের নীচে দিয়ে। কোথাও জনমানব নেই।

দুরন্ত বায়ুর বেগ এবং মুষলধারাবৃষ্টি বেড়েচললো। অন্ধ মূঢ় দিগদিগন্ত সব একাকার। আকাশ ডাক দিচ্ছে মুহুর্মুহু তার বিদ্যুৎলতার ঝলকে। শিশু দুটির সঙ্গে গল্প জমে উঠলো।

এক পেয়ালা গরম চা এবং টোস্ট-অমলেট্‌সহ শ্রীমতী গুপ্তা এসে ঢুকলেন। পরে ওঘর থেকে একখানা হালকা চেয়ার এনে নিজে বসলেন। বললেন, গুপ্ত সাহেব আমারই মতন আপনার খুব ভক্ত, শুনে রাখুন। তিনি থাকলে আজ ধেই-ধেই করে নাচতেন। আপনার

কথা জানতে চেয়ে আজও তিনি চিঠি লিখেছেন। সত্যিই বলছি, লেখক আমরা কখনও দেখিনি। এখন দেখছি আপনি ত আমাদেরই মতন মানুষ!

উচ্চ হাস্যে তাঁর ঘর এবার মুখরিত হলো।

বললুম, আচ্ছা, ওসব কথা এখন থাক। আপনি একা এইভাবে থাকেন, অসুবিধে হয় না?

শুনুন তবে। এই বাচ্ছা দুটি আমার প্রায় সারাদিনের বন্ধু। আর ওই যে বলেছিলুম বুড়ো পণ্ডিতের কথা, ও হলো আমার আশা-ভরসা,—অবিশ্যি কিছু কিছু দিতে হয়। তবে এখানকার পোস্টমাস্টারও মধ্যে মাঝে খবর নেন। আজকাল কোনও কোনও দিন আসে সৎবতী আর মদনলাল,—ওদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসি। তবে ওরা ত নতুন, ওরাও আজকালের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমার কাছে বিদায় নিয়ে গেছে।

ঠাণ্ডায় চা বেশ ভালো লাগছিল। বললুম, এ বাচ্চাদুটির মা-বাবা কোথায়?

এরা থাকে নীচে। এদেরও এই। মিঃ মুখার্জি এখানে নেই। মিলিটারির মুশকিল হলো, তারা এক জায়গায় স্থির নয়। এখানে ত ভালো, বাড়িঘর, সুযোগ-সুবিধে রয়েছে। অন্য জায়গায় ক্যাম্প ছাড়া কিছু নেই। আমাদের জীবন শুধু ভেসে বেড়ানো। স্থায়ী ঘরকন্না কাকে বলে আমরা জানিনে।

ঘরের সামনে সিঁড়িতে কার যেন সাড়া পাওয়া গেল। মায়া উঠে গেলেন, তারপর ফিরে এসে মেয়েদুটিকে পাঠিয়ে দিলেন নীচে। ওদের খাবার সময় হয়েছে। কে যেন ডেকে নিয়ে গেল।

ওঁর স্বামী ফিরছেন কবে এ প্রশ্নের উত্তরে মায়া বললেন, উনি আছেন মাইসোরে, ফিরতে এখনও দুমাস। সত্যি, উনি ভারি খুশী হতেন আজ এখানে থাকলে, নাচতেন মনের আনন্দে। আজ তাঁর চিঠি আবার পেয়েছি। আমাকে এভাবে থাকতে হচ্ছে, ওঁর যে কী দুঃখ কি বলবো। উনি থাকলে আপনাকে নতুন জিনিস দেখাতে পারতুম।

মুখ তুললুম।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, উনি নিজেই সেই নতুন জিনিস। এমন উদার ধার্মিক ছেলে আপনারা সচরাচর দেখতে পান না। আমার স্বামীর মতো লোক মিলিটারিতে বেমানান।

হাসিমুখে বললুম, বুঝতে পারা যাচ্ছে আজকাল মিলিটারিতে ভদ্রলোকরা ঢুকছে।

নিশ্চয়। কাশ্মীরের মিলিটারি সবচেয়ে ভদ্র। এরা এদেশে এত প্রিয় কি বলবো। বসুন, আমি আসছি।—উনি বেরিয়ে গেলেন।

কুণ্ঠা আমার যাচ্ছে না। ফাই-ফরমাশের লোক নেই। মহিলাকে একাই সব করতে হচ্ছে। উৎসাহ করে অতিথিকে ডেকে আনা এক জিনিস, কিন্তু তার জন্য সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করা অন্য বস্তু। আমি একটু বিব্রতই বোধ করছিলুম। আজকের রাতটা অবশ্য কাটুক, কিন্তু ঠিক এইভাবে হাতপা গুটিয়ে দু'চারদিন বন্দী দশার মধ্যে আটকে থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা তাই ভাবছিলুম।

ঝড়ের ঝাপটা লাগছে শার্সিতে। ঘড়িতে দেখছি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সমগ্র কাশ্মীর বাইরে যেন লণ্ডভণ্ড হচ্ছে; পপলারের ঘন অরণ্য মহারাক্ষসীর মতো অন্ধ আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়ছে, তারই সেই হিংস্র নিশ্বাস ঝাপট দিয়ে যাচ্ছে শার্সির বন্ধ জানালায়।

এই হলো হিমালয়ের দানবীয় বিপ্লব। ভয়াল করাল তুহিন ঝটিকা সর্বব্যাপী মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে ছুটে আসে চারিদিক থেকে,—গর্জনে, স্বননে, রণনে, তার প্রলয় নাচন

চরাচরের কোনও বস্তুকে ক্ষমা করে না। উড়িয়ে ভাসিয়ে তাড়িয়ে মাড়িয়ে যেন লক্ষ লক্ষ মত্ত হস্তীর মতো পর্বতে-পর্বতে অরণ্যে-অরণ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। ভয়ার্ত মানুষ আতঙ্কিত চোখে ওর দিকে তাকায়।

খরপদে মায়া আবার এলেন।—আপনাকে একা বসিয়ে রেখেছি। বৃষ্টিতে সব মাটি হলো। গতকাল আপনাদের ওখানে সারাদিন কাটলো,—ঘবকন্নার খোঁজ রাখিনি। আজ এই বৃষ্টি, পণ্ডিতের পাত্তা নেই। কী যে অসুবিধে, বলতে পারিনে। কত যে কষ্ট হবে আপনার!

আপনার সমস্যাটা কি, বলুন দেখি?

না, সে আপনাকে বলতে পারবো না। শুধু বলে রাখি, আপনার যদি অসুবিধে হয়, সহ্য করে যাবেন।

বললুম, বটে, অতিথিকে ডেকে অসুবিধেয় ফেলছেন, একথা জানলে আপনার স্বামীও বরদাস্ত করবেন না!

স্বামীর উল্লেখমাত্রই তিনি আনন্দ পান, তার মুখে চোখে দীপ্তি ফুটে ওঠে। বললেন, সে সত্যি, আমারও কোনও অসুবিধে তিনি কখনও বরদাস্ত করেননি। আজ তিনি উপস্থিত থাকলে ঝড়-জল কিছুই মানতেন না,—আমার মানরক্ষার জন্যই ছুটতেন।

একটি অতি-আধুনিক সাজসজ্জাকর মেয়ের মুখ থেকে তাঁর অনুপস্থিত স্বামীর সম্বন্ধে এই প্রকার শ্রদ্ধানুরাগ আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলুম। অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, এবং উল্লাসের অতি-চাঞ্চল্যও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু স্বামীর আলোচনা ওঠামাত্রই তাঁর কণ্ঠ শান্ত ও নম্র হয়ে এসেছে, প্রসন্ন আভা ফুটছে মুখে চোখে। মনে হয়েছে একটি নির্মল আনন্দ যেন তাঁর মনে স্থিতিলাভ করেছে। এর পর বসে-বসে শুনলুম গুপ্তসাহেবের গল্প। তিনি সদালাপী ও কষ্টসহিষ্ণু। বিবাহ অল্পদিনের, কিন্তু এ বিবাহ সার্থক। এমন উদারচরিত্র স্বামী অনেক মেয়ের ভাগ্যেই মেলে না। ক্ষমা ও ধৈর্যের তিনি প্রতিমূর্তি।

দাঁড়ান, একটা জিনিস আপনাকে না দেখিয়ে থাকতে পারছিনে। আগে থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।—এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন, এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মস্ত এক তাড়া চিঠি এনে হাজির করলেন। সোৎসাহে বললেন, না না, পড়ুন আপনি যেখানা খুশী। আমি একটুও লজ্জা পাবো না। এসব চিঠি সাধারণ স্বামীর লেখা নয়।

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু আপনার স্বামীর অনুমতি নাও থাকতে পারে!

কেমন করে জানলেন তাঁর অনুমতি নেই? এমন চিঠি কোনদিন তিনি লেখেননি যা আপনাকে পড়ানো চলে না।

এবার আর তামাশা না করে পারলুম না। বললুম, তাহলে এক কাজ করুন। প্রথম সম্ভাষণের গোটা দুই শব্দ ও শেষের গোটা দুই ছত্র চেপে রাখুন,—মাঝখানটা পড়ে নিই।

শ্রীমতী গুপ্তা এবার হেসে ফেটে পড়লেন। অবশেষে একটির পর একটি চিঠি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, সেগুলো ছড়িয়ে পড়লো ঘরময়। ওদের ভিতর থেকে হঠাৎ একখানা চিঠি খুলে তিনি বললেন, এই দেখুন, আপনার সম্বন্ধে উনি কি সুন্দর লিখেছেন!

যে-শার্সিটা এতক্ষণ বাতাসের ঝাপটে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছিল, এবার সহসা সেটি সশব্দে খুলে গেল। ঝড়বৃষ্টির যে উদ্দাম রণরঙ্গ বাইরেটা তোলপাড় করছিল, এবার হঠাৎ তারই একটা প্রবল ঝলক উন্মত্ত চেহারায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে আছাড় খেয়ে।

উভয়েই আমরা হতবুদ্ধি,—পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে শ্রীমতী গুপ্তা দুই পাল্লা এক করে চেপে ধরলেন। বললেন, আপনার খাট-বিছানা একদম ভিজে গেল। কাঠের ছিট্‌কিনিটা ভেঙে গেছে ঝড়ের ধাক্কায়,—এটা যা হোক করে আট্‌কে দিন্ ত? ওকি করছেন, খাটখানা দাঁড় করাচ্ছেন কেন? ওতে কি হবে?—তিনি প্রায় বিদীর্ণ হাস্যে ভেঙে পড়ছিলেন। বললেন, আপনি চেপে ধরুন, আমি দেখছি।

আমি গিয়ে জানলা চেপে ধরলুম। তিনি ছুটলেন ওঘরে। কিন্তু সহসা কোনও উপায় হলো না। হাতুড়ি-পেরেক—কোথাও কিছু নেই। ইতিমধ্যে বায়ুর ঝাপটায় চিঠিগুলি ছড়িয়েছে এখানে ওখানে, তাড়াতাড়িতে পা লেগে চায়ের পেয়ালা ভেঙেছে ঝনঝনিয়ে—ঘর একেবারে ছত্রখান। অবশেষে আমার নিরুপায় অবস্থা দেখে তিনি হেসে গড়াতে গড়াতে গিয়ে এনেছেন উনুন জ্বালাবার কাঠের টুকরো, আলুকাটা ছুরি, রান্নার খুন্তি এবং কাগজের কুচি। শার্সি বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ। এবার রাগ করে বললুম, এর পর আর কোনও অতিথিকে ডেকে আনবার আগে ছুতোর মিস্তিরিকে ডাকবেন!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি গা ঢাকা দিলেন।

কিন্তু খোলা জানলার ওই অবসরটুকুর মধ্যে বাইরের উদ্দাম অন্ধ চেহারাটা একবার দেখে নিলুম। ঝড়ের সমুদ্রে একদা ভ্রমণ করেছি বঙ্গোপসাগরের জাহাজে। নৈশসমুদ্র ছিল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। কালিঝুলিমাখা সেই দিগন্ত দোলার বিভীষিকা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল অনেকে; অনেকে সেই রোলিং-এর মধ্যে শুয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী জাহাজডুবীর প্রহর গুনেছে। আজ রাত্রে দেবতাত্মার চেহারায় দেখছি নটরাজের সেই রুদ্রতাণ্ডব,—তিনি তাঁর এক অভিনব স্বরূপকে প্রকাশ করছেন। সমস্ত আকাশজোড়া অসুরশক্তির দাপাদাপি,—যক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব ডাকিনী শঙ্খিনী—সবাই নাচছে উন্মত্ত বিভীষিকায়। রাক্ষসীরূপিণী রাত্রি এসেছে রুদ্রাক্ষ মহেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে। এপারে ওপারে পীরপাঞ্জাল আর হরমুখের কোলে-কোলে সর্বনাশিনী সেই মহাকালী আপন কালো এলোচুলের রাশি ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে পিশাচীনৃত্যের উন্মাদনায় দিগবিদিকজ্ঞানশূন্যা। ছিন্নমস্তা আপন মুণ্ড নিয়ে অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলছে!

•

সমস্ত রাত্রি সমানে চললো সেই ঝড় আর বৃষ্টি। নিদ্রার কথা ওঠে না, ওই প্রবল মাতামাতির দোলা যেন চারিদিক থেকে মাথা কুটোকুটি করতে লাগলো। ঘড়িতে এক সময়ে দেখলুম, ভোর হতে আর বাকি নেই। সকাল হলো, তখনও জলের ঝাপটা লাগছে শার্সিতে। অস্পষ্ট পপলারের সারি তখনও ঝটাপটি করছে তুমুল দ্বন্দ্বে। বনে ও বাগানে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নেমে আসছে। সেই একই দুর্যোগ।

এক সময়ে স্নান করে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমতী গুপ্তা। তাঁর মলিন বিমর্ষ মুখ। পণ্ডিত আসেনি, আসার সম্ভাবনাও কম। খানিকটা বাসি দুধ আছে চায়ের জন্যে, সামান্য আনাজপত্র আছে ঘরে, ডিম বুঝি আছে দুতিনটে। এ ছাড়া ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। বললেন, আপনার কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই।

কিন্তু একবার যখন মুখ দেখালেন তখন চা আনুন।

মিনিট পনেরো পরে অবশ্য তিনি চা এনে হাজির করলেন। প্রশ্ন করলুম, চাল আর নুন আপনার ঘরে আছে কিনা।

আছে।

ব্যস, নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত তিনি রইলেন না। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে বিপ্লব বাধিয়ে তুললেন। জলযোগের ব্যবস্থা কই? দুধ, মাখন, মাংস, মাছ, কই? শুধু ভাত আর সবজিসিদ্ধ হলেই কি সব হলো? আমাকে জব্দ করার জন্যই যেন বৃষ্টি নেমেছে! শ্রীমতী গুপ্তার চোখে কান্না এলো। হতভাগা সেই বুড়ো পণ্ডিত নিশ্চয় মরেছে। সে মরুক, তার মরাই ভালো। এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে নীচের তলায়,—মায়া ছুটোছুটি করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠলো।

স্নান সেরে একসময় তাঁর রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম।—কই, দেখি আপনার কি আছে এঘরে? আমিই রেঁধে দিচ্ছি।

তিনি ত শশব্যস্ত। ভয়ানক প্রতিবাদ করে উঠলেন। অবশেষে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হলো। চেয়ে দেখি, কোনও অসুবিধা নেই। ডিমের অমলেট্, আলুকপির ঝোল, টমেটোর চাট্‌নি, মূলাসিদ্ধ, শেষ পাতে বাসি দুধ। আর চাই কি? আপনি জোগাড় দিন্, আপনাকেই আমি রেঁধে খাওয়াবো।

মিথ্যে বলবো না, ঘরকন্নায় তিনি বেশ পারদর্শিনী। নুন আর মসলা থাকে কাগজে, গামলায় খাবার জল, চায়ের প্লেটে ভাত খাওয়া, দুধের কড়াইয়ে দুধভাত, মাটির ভাঁড়ে তরকারি,—সুতরাং আমোদ পাওয়া গেল প্রচুর। তাঁর স্বামীও এসব তুচ্ছ ঘরকন্নার অনুরাগী নন। তিনিই তাঁর স্ত্রীকে নাচগান সাহিত্য শিল্প ও বাদ্যযন্ত্রচর্চায় সর্বপ্রকারে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, এবং শ্রীমতীর চেহারায় যে শ্রী ও লাবণ্য, তাতে ঠিক রান্নাবান্না অথবা বাসনমাজা-কাপড়কাচা মানানসই হয় না।

আমি ঈষৎ বস্তুতান্ত্রিক তথা বাস্তববাদী। সুতরাং তাঁকে কথা দিলুম, পণ্ডিত যদি না আসে তবে রাত্রের মধ্যে যেমন করেই হোক, আমি তাঁর জন্য কিছু-কিছু বাজার-হাট করে দেবো।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেলা তিনটার সময় একখানা জীপগাড়ি এসে বাগানের দরজায় থামলো, এবং বর্ষাতি চড়িয়ে মিঃ ধার ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এলেন। গাড়িখানা সরকারি, এবং আসছে 'নারপিরস্থান' নামক এক পল্লী থেকে। আমাকে এখনই যেতে হবে তাঁর সঙ্গে।

খবর পেলুম বৃষ্টির অবস্থা ভালো নয়, বিতস্তা আজ মধ্যাহ্ন থেকে ফুলতে আরম্ভ করেছে এবং পীরপাঞ্জালের সংবাদ উদ্বেগজনক। বাজার হাট আজকে সবই বন্ধ। গতকাল কোনও প্লেন আসেনি দিল্লী থেকে, এবং আজও এখান থেকে কোনও প্লেন ছাড়েনি। ডাক বন্ধ।

আন্দাজ তিন মাইল পথ। প্রতাপ সিং কলেজ ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়ালো সরকারি বার্তাবিভাগের আপিসে আমাদের পূর্ব পরিচিত বন্ধু মিঃ শর্মার ঘরের সামনে। তিনিই এই বিভাগের সর্বময় কর্তা। এখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে এঁরা বাধ্য করলেন। ঘণ্টা দুই পরে সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আন্দাজ দেড় মাইলের মধ্যে একটি নিরিবিলি পথে ঢুকে বক্সী গোলাম মহম্মদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলুম। প্রহরা মোতায়েন রয়েছে আশে পাশে, কিন্তু সমস্তটাই বিস্ময়জনকভাবে

অবারিত। সাধারণ ভদ্রলোকের একটি উদ্যানবাটি। যে কোনও শ্রেণীর লোক ঘুরছে যে কোন ঘরে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপিসের এক বড়বাবুর কোনও পার্থক্য নেই। গাড়িওলা, মজুর, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, মন্ত্রী—সব একাকার। আমরা বাঙালী, ইংরেজ আমল থেকে লাট-বেলাট আর মন্ত্রীর সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী দেখে অভ্যস্ত। এখানে তার চিহ্নও নেই। শেখ আবদুল্লা মাত্র তিন সপ্তাহ আগে গদিচ্যুত হয়েছেন,—তিনি ছিলেন শের-ই-কাশ্মীর। বক্সী গোলামকে বলা হয়, কাশ্মীরের 'লৌহমানব'। ইতিমধ্যে খবর শুনেছি, বক্সীজী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিজের কাঁধে নিয়ে গেছেন বিমানঘাঁটি পর্যন্ত এবং তাঁর নিজের একটি কন্যার নাম রেখেছেন, শ্যামা। এমন অকুণ্ঠ এবং ভয়হীন সত্যভাষী সংখ্যায় বড় কম। তিনি বলেন, কাশ্মীর মানেই ভারতের একটি অংশ—যেমন হায়দারাবাদ, যেমন মণিপুর, যেমন ভূপাল। জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই, আছে শুধু কাশ্মীরী। প্রজাপরিষদে অনেক মুসলমান আছেন,—যেমন ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সে ডোগরা আর পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। সমগ্র কাশ্মীর তাঁর নখদর্পণে। মাঠে ঘাটে বাজারে—তিনি সর্বত্রগামী। কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হলে তিনি আগেই গিয়ে হাজির, আপিসের কেরানি অসুস্থ হলে তিনি ওষুধ কিনে নিয়ে যান,—দোকানদারদের আড্ডায় গিয়ে তিনি একবেলা হয়ত গল্পই করে এলেন। ফষ্টিনষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই, তিনি মাঠে গিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলে সুরসিক শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি। তিনি চিরদিন কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবক বলেই সকলের কাছে পরিচিত। আজ হঠাৎ অতি পরিচিত ঘরের লোক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, সেজন্য সবাই ছুটে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাত আটটার সময় বক্সীজীর ওখান থেকে হাতচিঠা বেরুলো, সমগ্র শ্রীনগর বন্যায় বিপন্ন। সাতটি অঞ্চলে বাঁধ ভেঙেছে, জল ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। কাশ্মীর সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কাশ্মীরের বেতারকেন্দ্র থেকে এই অশুভ সংবাদ ঘোষণা করা হলো। শ্রীনগরের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চল সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাঞ্চল জলে পরিপূর্ণ।

সেদিন সবান্ধবে পাশে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কাশ্মীরের লৌহমানবকে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি, অন্ধকার শ্রীনগর, তিনদিকের পাহাড় থেকে নেমেছে বন্যা, নদীনালা ও জলাশয় স্ফীতি-বিস্তার লাভ করেছে, নগরের চারিদিকে বাঁধ ভেঙেছে। সেই শক্তিপরীক্ষার কালে অসীম আশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পথে নেমে এলেন বক্সী গোলাম আর শ্যামলাল শরফ। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে। না, মোটর নয়, জীপ নয়,—দলবল নিয়ে সেই তুহিন শীতার্ত রাত্রের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে চললেন বক্সীজী,—পরনে তাঁর সামরিক পোশাক। আমরাই বা আশ্রয়ের মধ্যে থাকবো কেমন করে? আমরাও বেরিয়ে এলুম তাঁর সঙ্গে। এর নাম উদ্দীপনা, এরই নাম নেতৃত্বের প্রেরণা। পথে বেরিয়ে দেখি, চারিদিক জনহীন, যানবাহনবিহীন,—দুর্যোগের রাত্রে ঘরবাড়ির জানালা-দরজা সব বন্ধ। কিন্তু নগরবাসী কেউ জানলো না, তাদেরই প্রধানমন্ত্রী ছুটলো তাদেরই নিরাপত্তার জন্য। বৃষ্টিতে ভিজছেন বক্সী গোলাম, কিন্তু ওরই মধ্যে কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম, লৌহমানবের মুখে প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য, দেখে নিলুম কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ। সুখ্যাতি করতে ভয় পাই, কারণ শেখ আবদুল্লা আমাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সে-রাত্রের সেই বন্যাসঙ্কটের নাটকীয়

মুহূর্তকালে মনে হয়েছিল, এমন বলিষ্ঠচেতা, স্বাস্থ্যবান, ভয়হীন ও অক্লান্তকর্মী মুসলমান জননেতা সমগ্র ভারত ও পাকিস্তানে বোধ করি আর দ্বিতীয়টি নেই। লৌহমানবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য আমার পক্ষে এই প্রকার দুর্যোগেরই দরকার ছিল।

ছুটতে ছুটতে চললুম গাড়ির আড্ডায়। বৃষ্টি পড়ছে। গায়ে পট্টুর কোট এবং গরম প্যান্ট ভিজে থকথক করছিল। শেষ টাঙ্গাখানা অনেক তোষামোদের পর পাওয়া গেল। ওর ভয়, আমাকে পৌঁছে দিয়ে ওকে একা ফিরতে হবে এই অন্ধকার দুর্যোগে। সুতরাং তিনগুণ ভাড়া কবুল করলুম। গাড়ি ছোটে না, পাছে ঘোড়ার পা পিছলায়। আমিরা-কদলের উপর উঠে দেখি, পুলের পাশের দোকানগুলি জলে ডুবে গেছে, ঝিলমের জল উঠেছে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। নদীর ধারের পাড় ভেঙে পড়ছে। আমার গাড়ি চললো পাশের বস্তির পথ ধরে ময়দানের দিকে। মনে আছে শ্রীমতী মায়ার ভাঁড়ারের জন্য খাদ্যসামগ্রী কিনতে হবে। মাইল খানেক এসে গাড়ি থামলো। গাড়োয়ান নেমে গিয়ে এক হাঁটু কাদা ভেঙে একটি দোকানের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো। দোকানদার দরজা খুললো, কিন্তু বিশ্বাস করলো না যে, এমন 'অপার্থিব' সময়ে কারো চাল-ডাল-ঘি-মসলার দরকার হতে পারে। যাই হোক, এক রাশি খাদ্যসামগ্রী কিনে আবার গাড়িতে এসে উঠলুম। সর্বাঙ্গ কাদায় আর জলে জবজব করছে। দুহাত জোড়া, সিগারেট খাবার উপায় নেই। গাড়ি আবার চললো।

সহসা অন্ধকারে দেখি, গাড়ির দুই ধারে আতঙ্কিত জনতা ছুটছে বিপরীত দিকে। সঙ্গে গরু বাছুর ছাগল ভেড়া পুঁটলী বিছানা বাক্স। শিশুব দল নিয়ে ছুটছে মেয়ে, বালক বালিকা ছুটছে, বোঝা নিয়ে ছুটছে পুরুষ। শত শত, সহস্র সহস্র। কারো মাথায় কাঠের বোঝা, কারো কাঁধে ঘবর্বাধার সবঞ্জাম। প্রাণভয়ে ছুটছে, ছুটছে বন্যার তাড়নায়। ছুটছে পাগলের মতো।

হাত অবশ হয়ে আসছে ঠাণ্ডায়। আরও এক মাইল এসে টাঙ্গাওয়ালা রামবাগ পুলের এপারে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি আর যাবে না। পিছন ফিরে দেখি অনেকগুলো পেট্রোমাক্স জ্বলছে দূরে দূবে। বিপুল জলস্রোতের আওযাজ শোনা যাচ্ছে। একটি সম্পূর্ণ নূতন নদীর জন্ম হয়েছে। একশত বর্গমাইলব্যাপী গ্রামাঞ্চল ভেসে এসেছে। বক্সী গোলাম আর মন্ত্রী শ্যামলাল সর্বাগ্রে এসে পৌঁছেছেন। খবর পাওয়া গেল, পূর্তবিভাগের দুইশত লোক এবং আটশত কুলী এখানে কাজে নেমেছে।

ওপারে যাবার আর কোনও উপায় নেই। জনৈক অফিসার বললেন, আপনাকে মাথায় তুলেও পার করা যেত, কিন্তু মাথা ছাড়িয়েও দশ ফুট জল। আপনি চলে যান্, জল ছুটে আসছে এদিকে।

কিন্তু আমাকে বড়জেলায় যে যেতেই হবে!

অসম্ভব। বড়জেলার উপর দিয়েই বন্যা এসেছে। ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে নদী বইছে। আপনি আর দাঁড়াবেন না।

পা উঠছে না। উত্তেজনা চেপে অস্থিরভাবে প্রশ্ন করলুম, সেখানকার খবর? আমার লোক আছে যে ওদিকে?

ভদ্রলোক দৌড়ে চলে যাবার আগে বলে গেলেন, কিছুই বলা যাবে না। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিন্। ডুবে গেছে সব।

ঠকঠক করে কাঁপছিলুম। হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে, এমন সময় হঠাৎ আবার জনতার ধাক্কা এলো। জল ছুটে আসছে সামনে। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গাড়িতে তুললো, এবং আর এক সেকেন্ড বিলম্ব না করে এবং আমার আপত্তি না শুনে গাড়ি ছোটালো বিপরীত দিকে। তার জানা আছে এরকম ঘটনা। নিরুপায় হয়ে খাদ্যসামগ্রীগুলি তাকেই এক সময় উপহার দিলুম। সে যেন আমার আড়ষ্ট দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো।

ফিরে এসে খালসা হোটেলে উঠে হিমাংশুর ঘরের দরজা যখন ঠেললুম, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

ঘুম চোখে দরজা খুলে তিনি অবাক।—এ কি, আপনি? ফিরে এলেন যে? মালপত্র কই? ইস—এত ভিজেছেন বৃষ্টিতে?

বন্যার খবর তাঁকে দিলুম। তিনি বললেন, বন্যা? সে কি? কোথায়? কই, কিছু খবর পাইনি ত?

হাসিমুখে বললুম, রাত্রির অন্ধকারে কত কি ঘটে, নিশ্চিন্ত লোকেরা কতটুকু জানে তার?

আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। ভিজে একেবারে গোবর। যত দুর্যোগ কি শুধু আপনার কপালেই ঘটে? সে-মহিলার বিপদ ঘটলো কিনা কে জানে! হয়ত ছুটোছুটি করছেন, হয়ত বা কান্নাকাটি লাগিয়েছেন! কিন্তু...তাই ত. আজ আর কোনও উপায় নেই। নিন আপনি সুস্থ হোন। চা আর জলখাবার আপনাকে ঠিকই খাওযাতে পারবো।

হিমাংশু আমাব স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, দুর্যোগ শান্ত হয়ে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আছে, কিন্তু মেঘের জোট ভেঙে গেছে। সূর্যের আভা পাওয়া যাচ্ছে। হিমাংশুর প্রস্তাবক্রমে বেলা দশটার সময় দুজনে অগ্রসর হওয়া গেল! তিনি নিলেন কিছু খাদ্য এবং এক বালতি পানীয় জল। বন্যা-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। আজ অপরাহ্নে তিনি যাবেন হাউসবোটে,—তিন সপ্তাহ বসবাসের মতো ঘর পাওয়া গেছে। আজ রাত্রেব পর হোটেলে তাঁব মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে।

রামবাগ পুলের কাছে এসে দেখি বিচিত্র জগৎ। তিনদিন ধরে যে পথ দিয়ে গাড়িতে আনাগোনা করেছি, সেই পথে নদী আর নৌকো। পুল আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু অগাধ নদী বইছে সেইখানে, যেখানে কাল রাত্রে আমার টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। জলের বালতি নিয়ে আমরা নৌকাযোগে ওপারে গিয়ে এক বনময় পথ ধরে বড়জেলার সেই বাগানবাড়ির ধারে এলুম। পাশের বস্তি ও গৃহস্থের চিহ্ন মাত্র নেই। ঘর ভেঙেছে, লোক পালিয়েছে। আমাদের দেখেই শ্রীমতী মায়া চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর বাড়ির দোতলার সিঁড়ি অবধি বন্যা উঁচু হয়ে উঠেছিল। নীচের ঘর-দোরে সেই বাঙালী পরিবারটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁরা ঘরদোর ছেড়ে কোথায় গেছেন জানিনে। পানীয় জলের সংযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

আমরা উপরে এলুম। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্রায়, উপবাসে, আতঙ্কে শ্রীহীন। বোধ করি সারারাত কান্নাকাটি করে চোখ ফুলেছে। প্রথম রাত্রে তিনি নদীর ওদিকে গিয়ে চীৎকার করেছেন আমার নাম ধরে, তারপর জলের তাড়নায় একপ্রকার সাঁতরে তিনি ফিরে আসেন। বন্যা এসে অতঃপর এ বাড়িকে ঘিরে ফেলে চারিদিক থেকে।

কিন্তু তাঁর অতিথি কোনও এক সময় অবশ্যই ফিরবেন, এজন্য সবাই চলে গেলেও তিনি এ বাড়ি ছেড়ে যাননি। প্রায় আটফুট জল যখন নীচের থেকে উঁচু হয়ে ওঠে, তখন তিনি কেবল অন্ধকারে সারা দোতলা ছুটে বেড়িয়েছেন। ইলেকট্রিকের আলো আর জলের পাইপ সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। অতিথির জন্য অধীর প্রতীক্ষায় তাঁর রাত কেটেছে।

কেঁদে ফেললেন শ্রীমতী মায়া। তারপর বললেন, না, আমি আর এখানে কিছুতেই থাকবো না, এ বাড়ি আমি ছেড়ে দেবো। হয়ত আবার বৃষ্টি আসবে পাহাড়ে। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন,আমি শহরে গিয়ে থাকবো।

আমার কাহিনী তাঁকে বললুম, কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পেলেন না। এক রাত্রির আতঙ্কময় জীবন তাঁকে যেন ভীষণ করে তুলেছে।

আমরা অপেক্ষা করে রইলুম, তিনি নিজের হাতে নিজের ঘরকন্না ভেঙে বাঁধাছাঁদা করতে লাগলেন। হিমাংশু বোধ করি আড়ালে গিয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে থাকবেন, সুতরাং এক সময় তিনি কাছে এসে বললেন, নিজের উত্তেজনার মধ্যে আপনার কথাটা শুনিনি, কাল যে আপনি আমার জন্যে জীবন বিপন্ন করেছিলেন, এ কখনও ভাবিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।

বললুম, বিলক্ষণ। আমার কষ্ট আর কতটুকু? কিন্তু আপনি যে এ বাড়ি থেকে নড়েননি, এ যে অসমসাহসিক কাণ্ড! আপনার সাহসের তুলনা নেই!

কতকগুলো মালপত্র নিয়ে হিমাংশু আগেই অগ্রসর হলেন। তিনি গিয়ে হোটেলে ঘব ঠিক করবেন, এবং জিনিসপত্র গোছাবেন। শ্রীমতী মায়াকে অনেক ছুটোছুটি করতে হলো। মারাঠী পরিবারের হাতে এ বাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিলেন, ধোপার খোঁজ নিলেন, পণ্ডিতকে গালি দিয়ে তার প্রাপ্য রেখে গেলেন, জমাদার বিদায় করলেন। অবশেষে আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় মাইল খানেক দূরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পোস্টমাস্টারের কাছে বিদায় নিয়ে এলেন। গ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যার তাড়না আঘাত করেনি।

নদীর ঘাটের ওদিক থেকে জনদুই কুলি ডেকে আনলুম, এবং তাঁর বাড়ি থেকে মালপত্র সমেত বেরিয়ে আসতে বেলা প্রায় তিনটে বাজলো। ভাগ্যের পরিহাস হলো এই যে, সেদিন সন্ধ্যায় হিমাংশুকে নিয়ে যখন আমাদের ঘরের সামনের বারান্দায় চায়ের আসর বসলো, তখন দেখা গেল, কোমল মখমলের মতো নীল আকাশে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্যোতিষ্ক-নক্ষত্ররা ঝলমল করছে। কোনওকালে দুর্যোগ ছিল আকাশে, কোনওকালে বৃষ্টি ও বন্যার আতঙ্কে জনতা পালিয়ে যচ্ছিল,—তার আভাসমাত্র নেই। মায়া উঠেছেন আমাদের পাশের ঘরে। প্রচুর লটবহরে তাঁর ঘর ভরে গেছে।

শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ পশ্চিমের পথে আটাশ মাইল। পথ অতি মসৃণ এবং প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। কিন্তু মোটরপথ পাহাড়ে ওঠে না, টানমার্গ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে চড়াইপথে ঘোড়া কিংবা পায়ে হাঁটা। চারিদিকে পীরপাঞ্জালের পাইন বন,—মাঝখানে নিরিবিলি গুলমার্গ। এই ক্ষুদ্র জনপদটি 'গল্ফ'খেলার জন্য পৃথিবীখ্যাত। এর সমস্ত চেহারাটা সাহেবী ধরনের, এবং এই নয় হাজার ফুট উঁচুতে যারা আসে, তারা ইউরোপীয় রুচি ও প্রকৃতি নিয়েই থাকে। বস্তুত কাশ্মীরের প্রকৃত সৌন্দর্যের পরিচয় আরম্ভ হয় শ্রীনগরের সমতা থেকে যত উঁচুতে ওঠো। সোনামার্গ, গঙ্গাবল, গান্ধারবল, মহাদেবচূড়া, বিষ্ণুসায়র, গড়সায়র, বলতাল, জোজিলা অথবা কোলাহাইয়ের পথ, পহলগাঁও,—এরা

হলো নির্ভুল স্বর্গলোক। গঙ্গাবলহ্রদ কাশ্মীরী হিন্দুর গঙ্গাতীর্থ,—এটি ঠিক শেষনাগের মতো। তুষারনদী নেমে আসে উপর থেকে, সরোবরের বর্ণ নীলাভ থেকে সবুজে পরিণত হয়, সূর্যের আলোয় রঙ্গীন মেঘের টুকরো নেমে এসে ওর জলচুম্বন করে। জ্যোৎস্নায় অপার্থিব মায়ালোকে পরিণত হয়। কাশ্মীর এখানে ভূস্বর্গ।

হরিপর্বতের দুর্গপ্রাকারের নীচে দিয়ে মোটরে যাচ্ছিলুম ক্ষীরভবানীর দিকে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী মায়া। অদূরে গান্ধারবল পর্বতের চূড়া, তার নীচে একদিকে ফতেপুর বস্তির দক্ষিণে আন্‌ছার হ্রদ—ওখান থেকে একটি প্রণালী চলে গেছে ডাল-হ্রদের দিকে। আমাদের পথের দুধারে সবুজ শস্যক্ষেত্রগুলি ফসলে এখন পরিপূর্ণ। মায়া আছেন অনেকদিন কাশ্মীরে, কিন্তু পহলগাঁও ছাড়া আর কোথাও তাঁর যাওয়া হয়নি। রৌদ্র ঝলমল করছে পথে ও প্রান্তরে। সেদিনের দুর্যোগে পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারপাত ঘটেছে। মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেলেও বাতাস অতি স্নিগ্ধ।

বনময় একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে গাড়ি এসে পৌঁছালো ক্ষীরভবানীর মন্দিরের কাছাকাছি। ভিতরে চেনার বৃক্ষগুলির ছায়া ঝিলমিল করছে। আশেপাশে সিন্ধুনদীর শাখা-প্রশাখা নানা প্রণালীপথে বয়ে চলেছে। ভিতরে ঢুকে সহসা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর দৃশ্য চক্ষে ভেসে ওঠে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের তিনদিকে ক্ষীরসাযবের জলের প্রবাহ চলেছে। কোনও কোনও স্ফীতকায় চেনারবৃক্ষের কোলে বেদী বাঁধানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিমালয় পরিভ্রমণকালে প্রত্যাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং তাঁরই পরিচালনায় ও মহারাজা প্রতাপ সিংহের চেষ্টায় এই তীর্থস্থানটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি স্থাপিত; তার সঙ্গে আছেন পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি। অনেকেব ধাবণা যুগলমূর্তিটি পাওয়া যায় মন্দিরসংলগ্ন কুণ্ডটির তল থেকে। কুণ্ডটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। শোনা গেল, তিথি-মাহাত্ম্য অনুযায়ী এই কুণ্ডের জল আপন বর্ণ পরিবর্তন করে। কখনও শাদা, কখনও বা লাল। মন্দিরের উত্তরপূর্বে একটি যাত্রীশালা। ক্ষীরভবানীর উত্তরে বিরাট পর্বতপ্রাকার।

আমাদের অপরাহ্নকাল কেটে গেল সেদিন এখানে ওখানে। অনেক দেখা বাকি রয়ে গেল, অনেক দৃশ্য পিছনে পড়ে রইলো। এবার স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার কাল উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীমতী গুপ্তা জানতেন, আমার এ যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। মুখ্য ছিল গুহাতীর্থ অমরনাথ, গৌণ ছিল এই যা কিছু দেখে বেড়াচ্ছি। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্বল্পকালের, এবং আমাদের গতি বিপরীতমুখী। হঠাৎ তিনি তাঁর সংসাব তুলে দিলেন বন্যাপীড়িত হয়ে,—সে-বন্যা এখন নেই। কিন্তু সেই পরিত্যক্ত বাসভূমে তিনি আর ফিরতে চান না, এই আমার ধারণা। তাঁর স্বামী আছেন অন্তত দুহাজার মাইল দূরে দক্ষিণ দেশে,—তাঁর সঙ্গে দেখা হতেও এখনও দুই তিন মাস বাকি। সুতরাং তাঁর সঠিক কর্মসূচী আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

হোটেল থেকে হিমাংশু চলে গেছেন হাউসবোটে, সুতরাং তাঁর ঘরটি আমার দখলে ছিল। রাত্রে খাবার টেবিলে বসে মায়া বললেন, হোটেলের একটি ঘরে এভাবে আমাকে রেখে আপনার পক্ষে কি চলে যাওয়া সম্ভব? আমি যে সম্পূর্ণ একা পড়ে যাবো! বড়জেলার ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়াও আর চলে না।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বললুম, আপনার স্বামীর চিঠি পাবার আগে শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়া কি আপনার পক্ষে উচিত হবে?

কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন। পরে বললেন, ভয় পেয়ে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলুম। দুর্ঘটনা না ঘটলে ওখানে একাই থাকতে পারতুম। কিন্তু আর ওখানে যাওয়া চলে না লজ্জার মাথা খেয়ে। আমার ভাসুর আছেন দিল্লীর লোদি কলোনিতে। ধরুন যদি দিল্লীতে আপনি আমাকে নামিয়ে দেন্?

চুপ করে রইলুম। আমি যে কিছুদিন অবধি হিমাচল প্রদেশে ঘুরবো, একথা তাঁকে আগে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁর ঘরকন্নার এমন বৈপ্লবিক বিপর্যয় ঘটবে, তিনি ভাবেননি। সন্দেহ নেই, উনি বিপন্না। পুনরায় তিনি বললেন, আজ সকালে গুপ্তসাহেবকে চিঠি দিয়েছি সব কথা জানিয়ে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হবেন জানি, তবে আপনি আছেন শুনে তিনি আশ্বস্ত থাকবেন।

এক সময় তিনি হেসে উঠলেন, ধন্য অতিথি আপনি। বানের জলে ঘরকন্না ভেসে গেল! লেখককে দেখবার চেষ্টা এবার সার্থক হলো।

কথাটা সত্য। আমিও হেসে ফেললুম। বললুম দিল্লীতে কি আপনার খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার?

শ্রীমতী বললেন, ভাসুরঠাকুরকেও চিঠি দিয়েছি। তিনিও ভাববেন বৈ কি। আপনি কি সত্যিই হিমাচল প্রদেশে যেতে চান?

আমার প্রোগ্রাম তাই। ওদিকটা ঘুরে যাবো মনে করেছিলুম।

চলুন তবে, আমিও যাই। পথ থেকে চিঠি দেবো গুপ্তসাহেবকে।

কিন্তু আপনার মালপত্র?

যতটা পারি বিক্রি করে যাবো। কিন্তু ভাবছি, আপনার কপালে কি ছিল। হিমাংশুবাবু ঠিক বলেছেন, যত গণ্ডগোল আপনার জীবনে ঘটে। এমন আতিথ্য নিলেন যে, খাওয়া জুটলো না। তার ওপর আবার পরের ঘরকন্না কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ফিরে গিয়ে এ গল্প সব'ইকে না বলতে পারলে আমার চলবে না। সেদিন আপনি কোন্ মুখে ভাঁড়ারের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন? আপনি না অতিথি? কি করলেন সেগুলো?

হেসে বললুম, তারাও বানের জলে ভেসে গেছে!

তিনিও হেসে উঠলেন।

পরদিন হাউসবোটে গিয়ে হিমাংশুবাবুর নৌকাবাস দেখা গেল। একটি দিন কাটাবার পক্ষে বেশ ভালো। দূরে ও নিকটে পাহাড়, প্রাকৃতিক শোভা, ভাসমান দ্বীপ, শঙ্করাচার্যের মন্দির, হরিপর্বতের দুর্গ,—সব মিলিয়ে চমৎকার। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বসবাস ক্লান্তি আনে—এই আমার ধারণা। সেদিন হিমাংশুবাবু প্রচুর পরিমাণে অতিথিসৎকার করলেন, এবং আমরা 'শিকারায়' ঘুরে নিলুম। হাউসবোটের বন্দীদশার চেহারাটা আমার ভালো লাগেনি।

একদিন সন্ধ্যায় ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কে চায়ের আমন্ত্রণ ছিল। কয়েকজন স্থানীয় বন্ধু সেখানে জড়ো হয়েছেন। মিঃ শরফ, শর্মা, ধার ইত্যাদি। সেখানে পাওয়া গেল দুজন বিশিষ্ট বাঙালীকে। একজন হলেন কাশ্মীর গভর্নমেন্টেরই শিল্পবিভাগের পরিচালক, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলি। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু। তাঁকে পেয়ে কাশী ও কলকাতার পুরনো আড্ডার কথা উঠলো। তিনি যে এখানে আছেন জানা ছিল না, জানলে তাঁরই ওখানে হয়ত উঠতুম। অপরজন হলেন দামোদর-ভ্যালী-কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, শ্রী এস. মজুমদার, আই.সি.এস। এঁর অমায়িক মিষ্ট আলাপে সেদিন সকলেই আনন্দ

পেয়েছিলুম। এঁর ভগ্নী হলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। শ্রীমতী মায়ার গল্প শুনে সেদিন দুঃখের মধ্যেও সবাই হাসছিলেন। পরে কানাইবাবু সেদিন সস্ত্রীক আমাদের হোটেলে এসে সুমধুর গল্পের আসর জমিয়ে তুললেন। ইম্পিরিয়ল্ ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ রায়সহ চার পাঁচটির বেশি বাঙালী পরিবার সেদিন কাশ্মীরে ছিলেন না। কোনও এক নিয়োগী পরিবার ওখানে আছেন, তাঁরা মোটর কলকব্জা ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

কানাইবাবু সস্ত্রীক বিদায় নেবার পর জিনিসপত্র গোছগাছ আরম্ভ হলো। চললো অনেক রাত পর্যন্ত। পরদিন আমরা বিদায় নেবো।

প্রভাতকালে এসে পৌঁছলেন হিমাংশু পূর্বব্যবস্থামতো। আমাদের দুর্যোগের বন্ধু। বন্যাত্রাণকালে জনৈক শ্রমিক হিমাংশুকে 'মহাত্মা' বলে সম্ভাষণ করেছিল। অসীম অধ্যবসায় সহকারে 'মহাত্মা' আমাদের উভয়ের বিপুল পরিমাণ লটবহর একটি ঠেলাগাড়ির সাহায্যে নিয়ে চললেন বাস-স্ট্যান্ডের আপিসে। 'দিদি' বলে তিনি সম্ভাষণ করেছেন শ্রীমতী গুপ্তাকে, সুতরাং ভাইবোনে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। উভয়ে নমস্কার বিনিময় করলেন।

বিষণ্ণ হাস্যে শ্রীমতী গুপ্তা বিদায় নিলেন কাশ্মীরের কাছ থেকে। এক সপ্তাহ আগেও তিনি কল্পনা করেননি, বন্যার তাড়নায় তাঁকে সংসার তুলে দিতে হবে। আমরা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলুম, তিনি আবার ফ্ল্যাটে ফিরে যান। কিন্তু একটি রাত্রির আতঙ্ক তিনি ভুলতে পারেননি। একথা জানতুম কাশ্মীর ছাড়তে তাঁর আঘাত লেগেছিল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। আজ রাত্রে পৌঁছবো জম্মুতে। শ্রীমতী গুপ্তা এবার গুছিয়ে তাঁর সীটে বসলেন।—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জম্মু ও জ্বালামুখী কালীধর

পীরপাঞ্জালের নীচে নীচে পথ। পথের নানা শিরা-উপশিরা, নানান্ শাখা-প্রশাখা। এ গিরিশ্রেণীর মৃৎপ্রকৃতি বড় কোমল,—মাটির মোহমদির গন্ধে বিবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার। ওরা তৃণশয্যার নধর কোল পেয়ে আর জেগে থাকতে পারেনি। রঙ্গীন প্রজাপতি আর পতঙ্গরা প্রলাপগুঞ্জন করে চলেছে ওদের কানে কানে।

পীরপাঞ্জাল এত নরম বলেই পা পুঁতে গিয়েছিল অনেকের। তারা কেউ ইন্দো-ব্যাক্‌টিরিয়, কেউ বা ইন্দো-পার্থিয়। তারপর মার-মার শব্দে এসেছে শক-হুন-তাতার, এসেছে খোটানি-ইয়ারকন্দি, উজবেকি আর কাজাক, এসেছে তুর্কি-আফগান রক্তমাখা অস্ত্র হাতে নিয়ে,—কিন্তু এই পীরপাঞ্জালে তাদের বিজয়রথের চাকা গিয়েছে বসে। তারা কেউ নেই আজ। সর্বগ্রাসী রাহু তাদের গিলেছে। সেই রাহু হলো ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতি। সেই রাহু আজও গিলছে একে একে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশীবাদ, ফাসিস্তবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ,—এদের ধাক্কায় ভারত সভ্যতার একখানি ইঁটও খসেনি! মোগলরা গেছে একশো বছর এখনও হয়নি, ইংরেজ গেল এই সেদিন,—মাথা ঠুকে গেল সবাই একে একে। কেউ সমাধিলাভ করলো মাটির তলায়, কেউ বা পালিয়ে বাঁচলো। শক্ত ধাতু আসে বাইরের থেকে, কিন্তু এখানে এসে তারা গলে যায়। এবার সাম্যবাদের পালা। অধিকাংশ পৃথিবী যার ভয়ে কম্পমান,—ভারতের মাটিতে হয়ত তার এবার সমাধিলাভ ঘটবে। এরই মধ্যে 'পঞ্চশিলায়' মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হচ্ছে সাম্যবাদ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' পথ ভুলে যদি কেউ এসে পৌঁছয়, তার আর রক্ষা নেই। পীরপাঞ্জাল তার সকলের বড় সাক্ষ্য।

উপরে হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম, নীচের দিকে পীরপাঞ্জাল আর জাস্কার,—এই দুইয়ের মাঝখানে ভূস্বর্গ যেন মদালসা বিবশা দেহের বিহ্বলতা নিয়ে শয়ান—সাংঘাতিক প্রলোভনের মতো। ডাক দিচ্ছে সবাইকে ডাকিনীর মন্ত্রে। তার ফলে পতঙ্গের দল এসেছে যুগে যুগে, কিন্তু পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এই মহাশ্মশান পীরপাঞ্জাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে সেই অপমৃত্যু একটির পর একটি। অভিশপ্তা কাশ্মীর,—এর ওপর লোভের হাত যারা বাড়িয়েছে, তারা কেউ বাঁচেনি। চতুর ইংরেজও একদা ভয় পেয়ে একটু সরে দাঁড়িয়েছিল, এবং রণজিৎ সিংয়ের হাত থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিয়ে সে মহারাজা গুলাবসিংকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

যেদিকেই তাকাই, শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বভাব আবহমান কাল থেকে। লোভ নয়, আসক্তি নয়, ধ্বংস ও দস্যুতা নয়,—সবাই এখানে এসে আসন নিয়ে বসে যাও তপোবনের নিভৃত শান্তিতে,—যেখানে হোমকুণ্ড জ্বালিয়ে ওঁঙ্কারধ্বনি উঠছে অবিরাম। এখানকার গবেষণাগারে চলছে সকল দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষা। বৈদিক, বেদান্তীয়, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, জৈন, খ্রীস্টিয়, জরোস্থ্রিয়, কন্‌ফুসীয়, ইসলামীয়,—কেউ বাদ যায়নি। দিব্যজ্ঞানের মহাপরীক্ষায় ভারত হলো পথ-নির্দেশক। এখানে এসে শুধু জেনে যাও জীবনের ব্যাখ্যা,

সত্যের ভাষ্য, ধর্মের নিহিতার্থ।

ভাবতে ভাবতে পথ পেরিয়ে এসেছি অনেক দূর। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আর অপরাহ্ন ছাড়িয়ে সন্ধ্যার পরে গাড়ি এসে পৌঁছলো জম্মুতে। গাড়ি থেকে নেমে এসে জম্মুর যাত্রীশালায় আমাদের পুরনো বন্ধু মদনলালের সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল।

শ্রীমতী মায়া কোন্ সময়ে যেন ওদেরকে আবিষ্কার করলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সহাস্য তর্ক চলতে লাগলো অনেকক্ষণ।

মদনলালের সঙ্গে রয়েছে তার তরুণী স্ত্রী সংবতী, এবং সেই কচি শিশুকন্যাটি। ছেলেটার অধ্যবসায় অদম্য, কিন্তু তার অসমসাহসিকতা দেখে আমি রাগ করেছিলুম। ওই ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে মদনলাল গিয়েছিল অমরনাথে। তিন সপ্তাহ আগে ওদের সঙ্গে আমার আলাপ, কিন্তু শ্রীমতী গুপ্তার সঙ্গে ওদের পরিচয় কয়েক মাস আগে,—ওরা পহলগাঁওয়ে ছিল সবাই একত্রে। আমি বাইরের লোক।

যাত্রীশালা অন্ধকার, সুতরাং মোমবাতিতেই কাজ চালাতে হচ্ছে। নীচে হোটেল আছে, সুতরাং আমরা কেউ অগাধ জলে পড়িনি। বিস্ময়ের কথা এই, হোটেলের প্রায় প্রত্যেকটি লোক শ্রীমতী গুপ্তার সঙ্গে পরিচিত। স্বামীর সঙ্গে বারম্বার দিল্লী-শ্রীনগর আনাগোনার কালে জম্মুতে একদিন কাটাতেই হয়,—সেই সূত্রেই এই ঘনিষ্ঠতা। মদনলাল এবং সংবতীকে দেখে তিনি একেবারে নেচে উঠলেন। শ্রীনগর অঞ্চলে বন্যার ধাক্কায় তাঁর সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, এবং আসবার পথে সারাদিন তাঁর মুখে চোখে বিষণ্ণতা ছিল—যেটি তিনি আমার কাছে ধরা দেননি। এবার সংবতী আর মদনলালকে দেখে তাঁর সেই মেঘ কাটলো। ওদের দুজনকে সঙ্গে করে তিনি আমার কাছে এনে হাজির করলেন।

মদনলালের পরনে সেই ময়লা পায়জামা, কিন্তু সংবতী পরেছে নতুন রেশমী শালোয়ার। মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে। মদনলাল এসে একেবারে পা মুড়ে কাছে বসলো। বললে, আভি তক্ কসর মাপ কিয়া কি নহি কহিয়ে, দাদাজি।

ওর সঙ্গে আবার সংবতী যুগিয়ে দিল, বহেনকে উপর বহৎ সা তাং কিয়া আপনে, দাদাজি!

হাসিমুখে বলতে হলো, তোমাদের পাগলামির জন্যে রাগ করেছিলুম। ওই কচি মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলে অমরনাথে! ভয় ছিল না? তুমি না ওর মা?

মায়া বললেন, সত্যি, তোরা ভারি অন্যায় করেছিলি!

ওদের গল্পগুজব আরম্ভ হয়ে গেল বারান্দায়। রাত ন'টা বেজে গেছে। কিন্তু ওরই মধ্যে মদনলাল ছুটে গিয়ে এক পুরুয়া চা এনে হাজির করলো। ওর মধ্যেই সে পাত্র যোগাড় করে খাবার জল এনে রাখলো। জম্মুতে বড় গুমোট,—রাত্রে স্নান না করে উপায় নেই।

সংবতী বললে, বাচ্চাটাকে পাহারা দিয়ে এতদূর এনেছিলুম, কিন্তু জম্মুতে এসে ওর বমি আরম্ভ হলো। এখন একটু ঘুমিয়েছে।

বাচ্চাটাকে দেখতে গেলুম ও-মহলের একটি ঘরে। ভিতরে একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে রয়েছে যেমন তেমন বিছানায়।

সংবতী বললে, আমরা দুদিন আছি এখানে। কাল চলে যাবো।

বললুম, ভালোই হলো। তোমরা শ্রীমতী গুপ্তাকে নামিয়ে দিয়ে যেয়ো দিল্লীতে। কাল

পাঠানকোট থেকে টিকিট কিনে দেবো। আমি যাবো কাংড়ার ওদিকে। তারপর হিমাচল প্রদেশ।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হেসে উঠলো। বললে, তাজ্জব! আমরাও যে যাবো কাংড়া আর কুলুতে! আমরা ওই দেশের লোক, ওখানে আমাদের আদি বাড়ি।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, আপনারা দেখছি দলে ভারী হলেন। আমারই বা সখ নেই কেন? আমিই কোন কম?

সৎবতী বললে, তোমার স্বামী যদি এখবর শুনে রাগ করেন? আগে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নাও?

অন্ধকারে শ্রীমতীর মুখখানা ঠিক দেখা গেল না। একটু ক্ষুণ্ণকণ্ঠেই তিনি বললেন, স্বামীকে যারা চেনে না, তারাই স্বামীকে ভয় পায়। আমার স্বামী হলেন সদাশিব।

মদনলাল বলে বসলো, বহুৎ দিককৎ! স্বামীর কথা উঠলে আর রক্ষা নেই। এখন কি করতে চাও তাই বলো।

মায়া এবার হাসলেন। বললেন, সঙ্গে সঙ্গে যাবো, নইলে এত লটবহর একা সামলাবো কেমন করে? একা যাইনি কখনও। ঘরদোর ভাসিয়ে লেখকের সঙ্গ ধরেছি, দেখি না ওঁর দৌড় কতদূর! ভাসুরের ওখানে তুলে দিয়ে তবে ওঁর ছুটি।

স্বামী-স্ত্রী একেবারে হেসে লুটোপুটি। মাঝরাত্রি পর্যন্ত সৎবতী আর শ্রীমতী গুপ্তার কলকণ্ঠ থামতে চাইলো না। তার পরে তরুণ মদনলাল গান ধরে দিল খাটিয়ায় পড়ে পড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাচ্চা মেয়েটাকে এনে শোওয়ালো কাছাকাছি। ছেলেটা যেন জন্তুর মতো পরিশ্রম করে।

কাল আবার সকলের নতুন পথে যাত্রা।

পাঠানকোট থেকে রেলপথ চলে গেছে যোগিন্দরনগরের দিকে অনেক দূর। এটি হিমালয়ের প্রশাখাপথ,—ছোট ছোট পাহাড়ের অধিত্যকার ভিতর দিয়ে রেলপথ গেছে। প্রথম অংশটা সমতল, তারপর লুপ-এর জটিলতা আরম্ভ হয়েছে।

রৌদ্রদীপ্ত প্রখর মধ্যাহ্ন। আমাদের বসনে-ভূষণে লেগেছে পথের ধূলিধূসরতা এবং ক্লান্তি। ওরই মধ্যে এক সময় প্রচুর পরিমাণ লটবহর গচ্ছিত রাখতে হলো পাঠানকোট স্টেশনের ক্লোকরুমে। আহারাদি যেমন তেমন। অতঃপর মধ্যাহ্নে গাড়ি ছাড়লো। অজস্র ভোজ্যবস্তু ও মেওয়াফল যোগাড় করেছে নিত্য উৎফুল্ল মদনলাল। আমার জন্য এনেছে ধূমপানের ব্যবস্থা। এদিকে সৎবতী ও মায়া বসেছেন একরাশি আখরোট আর 'বাগুগোসা' নিয়ে,—ওদিকে মদনলাল সকলের স্বাচ্ছন্দ্যসৃষ্টির জন্য ব্যস্ত। শিশুটি আছে দুই নারীর মাঝখানে,—আজ সে সুস্থ। ওরা ঠাণ্ডা সইতে পারে অনেক, কিন্তু গরমে কষ্ট পায়। মদনলালের পিতা হলো বুঝি লুধিয়ানার এক রেশম ব্যবসায়ী,—মস্ত শেঠ। ছেলেটি অবাধ্য। বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশের সর্বত্র। বাপের কাজকারবারে ওর মন নেই। ছোট লাইনের গাড়ি চলেছে ধীর গতিতে। পাহাড়তলীর গরমে গুমোট দেখা দিয়েছে প্রখর রৌদ্রে।

ছোট ছোট বনময় পাহাড়ের চূড়ার বাইরে আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। অনেকটা যেন নীচের দিকে পড়ে গেছি। মাইল পঁচিশেক পেরিয়ে পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। তবু পাহাড়তলীর খেতখামার নীলাভ আস্তরণ পেতেছে এখানে ওখানে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে যাবার

পর গাড়ি এসে পৌঁছলো জ্বালামুখী রোড স্টেশনে। এইখানে আমরা এ যাত্রায় রেলপথকে ছেড়ে দিলুম।

এ অঞ্চল পাঞ্জাবের মধ্যে। কিন্তু এর ভৌগোলিক সীমা বড় জটিল। কাংড়ার উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, কুলুর উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ। শিমলা অঞ্চল পাঞ্জাবে অথবা হিমাচলে,—আজও স্থির হয়নি। যেমন ধরো ডালহাউসী। সবাই জানে, চাম্বার মধ্যে ডালহাউসী,—কিন্তু এই শৈলশহরটি পাঞ্জাবের শাসনাধীন। পেপসু, হিমাচল, কাংড়া, কুলু, চাম্বা,—এদের পরস্পর-পৃথক মানচিত্র ছাড়া এদের সীমানা বোঝবাব উপায় নেই।

স্টেশন থেকে জ্বালামুখী গ্রাম তেরো মাইল পথ। পথ নিরিবিলি। উঁচু-নীচু খোয়ার রাস্তা সঙ্কীর্ণ। এটা পাঞ্জাব, কিন্তু জনসাধারণ 'পাঞ্জাবী' নয়। মেয়েদের কপালে সিঁদুর, পুরুষের মাথায় লাল পাগড়ি। এরা জাতিতে শাক্ত। কুলুতেও এই, মণ্ডিতেও এই। পাঁচ ছয় শো বছর আগে পূর্বরাজপুতনা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে রাজনীতিক ভাঙন ধরেছিল। তাতার, পাঠান আর মোগল,—এরা রাজপুতগণকে মাতৃভূমিতে স্থির থাকতে দেয়নি। তাই ওরা আপন সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসে হিমালয়ের আনাচে কানাচে। হিমালয়ের আদিবাসী মহলের তখন ঠিক কি প্রকার চেহারা ছিল জানা যায় না। কিন্তু এই শত সহস্র রাজপুত পরিবাব হিমালয়ের বহু অঞ্চলে গিয়ে আপন আপন সমাজ সৃষ্টি করে, এবং রাজ্যপাট বসায়। পেপসু হলো প্রকৃত পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ হলো প্রকৃত রাজপুত। এদেরই অংশ আবার ছড়িয়ে পড়েছে কুমায়ুনে আর নেপালে। কাংড়ায় এসে দাঁড়ালে মনে পড়বে পার্বত্য উত্তরবঙ্গ কিংবা আসামের উপত্যকা। সেই মন্দির, সেই শক্তিপূজা, সেই শিবের আর ভৈরবেব আবাধনা, সেই মেয়েদের কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা-নোয়া!

মাত্র তেরো মাইল পথ। কিন্তু বট আর অশ্বত্থের এমন সশ্রদ্ধ পূজা আগে দেখিনি। প্রতি বটের নীচে দেবস্থান, প্রতি অশ্বত্থের নীচে শিব। অতি যত্ন, অতিশয় পরিপাটি। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু কী শান্ত। রানিতালের ছোট্ট একটি হাট, তাইতেই স্থানীয় লোকরা খুশী। বেশী চায় না, উচ্চাভিলাষী নয়, বিরোধ কোথাও নেই,—প্রাচীনেব হাওয়া বইছে পাহাড়ী প্রান্তরের নীচে, আর শস্যক্ষেত্রের উপান্তবর্তী সরোবরে। পশ্চিম আকাশে রৌদ্র ম্লান হয়ে এসেছে।

আমাদের মোটর বাস মাড়োয়ারি ধর্মশালার প্রাঙ্গণে এসে থামলো। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্বালামুখীর 'কালীধর' পাহাড়,—ভারতের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। আশে-পাশে সামান্য কয়েকটি দোকান, দুচার ঘর বস্তি। এদিকটা নিরিবিলি। গাড়ি থামতেই পাণ্ডা এসে দাঁড়ালো। এদিকটা নাকি শহরের বাইরে, মন্দিরের ওদিকে না গেলে জনসমারোহ পাওয়া যাবে না। মায়া ধরে বসলেন, তিনি থাকবেন শহরের মধ্যে; সকলের আগে তিনি ধুলো পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করবেন। এদিকে কিচ্ছু পাওয়া যায় না।

পাণ্ডা এইটিই চেয়েছিল। সে সোৎসাহে নিজেরই উদ্যোগে কুলির সাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে অগ্রসর হলো। মদনলাল আর সংবতী সামনের ধর্মশালার নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে ধাবমান হলো না। কথা রইলো, ওরাও আধ ঘণ্টার মধ্যে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হবে। বাচ্চাটা এখানে এসে গরমে-গুমোটে আবার কান্নাকাটি লাগিয়েছে।

ঠিক সুনির্দিষ্ট একটা আশ্রয়ের দিকে দুজনে অগ্রসর হচ্ছিলুম এমন কথা বলতে পারবো না। আমার আশঙ্কা ছিল, অপরিচিত পাণ্ডার কুক্ষিগত না হই। কারণ এসব

স্বার্থের ক্ষেত্রে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে। কিন্তু মুশকিল এই, আমি ঠিক পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী নই। আবার এও অসুবিধা, সঙ্গী হিসাবে আমি একটু বেমানান। শ্রীমতী মায়ার চেহারায় ও পরিচ্ছদে কিছু অতি আধুনিকতা বর্তমান,—চট করে যেখানে সেখানে তাঁর পক্ষে গিয়ে ওঠা অসুবিধাজনক। পাণ্ডা চললো পথ দেখিয়ে। আন্দাজ আধ মাইল দূরে পাহাড়ের নীচে একটি ক্ষুদ্র জনপদ,—বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা এক সময় এসে পৌঁছলুম এক গোলকধাঁধার মধ্যে। এইটি পাণ্ডার বসতবাটী। যা ভেবেছিলুম তাই। অন্যের মুখ চেয়ে এখানে থাকা ভিন্ন গতি নেই। চারিদিক শুকনো, কোথাও জল নেই। অতি পুরনো ঘর-দোর,—আগল নেই, আব্রু নেই, আয়ত্তের মধ্যে কিছু নেই। সামনের উঠোনে বসে একজন স্ত্রীলোক—সম্ভবত বাড়ির গৃহিণী,—কি যেন শেলাই করছিলেন। বাড়ির উত্তর ও পূর্বাংশটা যেন সুড়ঙ্গের মতো। পিছনে সরু ছায়াচ্ছন্ন পথ।

জিনিসপত্র একটি ঘরে রেখে আমরা মন্দিরের দিকে চড়াইপথে অভিযান করলুম। 'কালীধর' পাহাড়ের উপরে মন্দির। ওখানে আছেন দেবী অম্বিকা এবং উন্মত্ত ভৈরব।

দক্ষযজ্ঞের বিপর্যয়ের পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এ পথেও এসেছেন দেবাদিদেব শিব। বিষ্ণুচক্রের আঘাতে সতীর জিহ্বা এখানে খসে পড়ে। সেই জিহ্বা আজও জ্বলছে জ্বালামুখীর পাহাড়ের কয়েকটি ছিদ্রে এবং কুণ্ডের মধ্যে। ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলুম গল্প। কিন্তু স্ত্রীলোকের জিহ্বায় যে এত আগুন জমা থাকে তা জানতুম না!

সরু একটি চড়াইপথ ধরে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের অঙ্গনে উঠে এলুম। সূর্যাস্ত হয়নি, রাঙ্গা রৌদ্র এসে পড়েছে মন্দিরে। মন্দিরের পারিপার্শ্বিক প্রাচীন নয়, সর্বত্রই নবনির্মাণের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু যেটি মূল মন্দির, সেটি অনেককালের,—তার অনেক ইতিহাস। কাছেই একটি গুহার মধ্যে ঝরনার স্বচ্ছ জল একটি কুণ্ড রচনা করেছে। রাজগৃহ কুণ্ডের কথাটা মনে পড়ে যায়। কুণ্ড পেরিয়ে অগ্রসর হলেই মূল মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। এটিও গুহালোক এবং তারই মধ্যে পীঠস্থান। দেওয়ালে ছোট ছোট গর্ত,—এক একটিতে অগ্নিশিখা জ্বলছে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। এখানে ওখানে এবং আরেকটি সুড়ঙ্গে কয়েকটি শিখা জ্বলছে। ভিতরের আবহাওয়াটি পবিত্র, এবং সন্দেহ নেই—একটি রহস্য অনুভূতি আনে। দেখতে পাচ্ছি সমগ্র পাহাড়টি অন্তরে-অন্তরে ধাতবপদার্থে পরিপূর্ণ। গন্ধক, খড়িপাথর, ফসফোরাস,—এবং বিশ্বাস করি, আরও নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে এর পাথর আর মাটির ভিতরে-ভিতরে। আমাদের দেশে আগ্নেয়গিরি নেই। কিন্তু অনেক পাহাড়ে তার উপাদানের অভাবও নেই। বদরিকাশ্রমে, গৌরীকুণ্ডে, রাজগৃহে, এবং আরও বহু জায়গায় অতি উত্তপ্ত ঝরনা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের সুড়ঙ্গলোক থেকে। কোথাও না কোথাও ধকধক করে আগুন জ্বলছে পাথরের গভীর অভ্যন্তরে,—কেউ তার খোঁজ রাখে না।

একটি শিখা হাত দিয়ে নিভিয়ে দিলুম। কিন্তু ভিতরে যখন দাহ্যবস্তু সঞ্চিত রয়েছে, তখন সেই শিখা আবার জ্বলবে। বাইরের দিকে এক পাশে আবেকটি জলকুণ্ডের মধ্যে পাণ্ডা কি যেন নিক্ষেপ করতেই দপ করে জলের মধ্যে একটি শিখা জ্বলে উঠলো। এটি কৌতুকজনক। ঠিক পেট্রলে যেমন আগুন লাগে, এও তেমনি। ওটার মধ্যে শ্রীমতী গুপ্তা ছেলেমানুষের মতন একটা নতুন কৌতুক পেয়ে গেলেন। তিনি বারম্বার শিখাটা জ্বালিয়ে দেখতে লাগলেন।

বাইরে পাহাড়ের রেখা চলে গেছে দূরদূরান্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে অস্পষ্ট সমতল, তার

পরে বিপাশা নদী চলে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ভালো লাগছে এই অপরিচিত পৃথিবী,—এরা হিমালয়ের সর্বশেষ নিম্নস্তর। এরা হলো তোরণ দ্বার, এখান থেকে যাত্রা শুরু। উত্তরে রয়েছে বিশাল ধওলাধাব পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বিপাশার পরপার থেকে সোলাসিঙ্গি অর্থাৎ শূলশৃঙ্গ গিরিমালা। এই দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়ে চলেছে বন্য বিপাশা। তার উত্তর ভূভাগ হলো কাংড়া উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভূভাগটি সুবিশাল পার্বত্য মণ্ডিরাজ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণপূর্বে শূলশৃঙ্গ গিরিশ্রেণী এক সময় বিলাসপুর রাজ্যকে নানাদিকে বেষ্টন করেছে।

মন্দিরের অঙ্গনটি অতি পরিচ্ছন্ন আধুনিক। এক পাশে পাণ্ডাদের গদি, সেখানে পুণ্যকামীরা শ্রাদ্ধতর্পণের ব্যবস্থাদি করে। ওটা ব্যবসায়, ওটায় রস পাইনে। সমগ্র মন্দির অঞ্চল তন্ন তন্ন করে দেখতে সময় গেল। সন্ধ্যা আসন্ন।

কিছু দুশ্চিন্তা ফুটেছিল শ্রীমতী গুপ্তার চোখে মুখে। এতক্ষণ তিনিই সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করছিলেন, তাঁর হাতেই হাল ধরা ছিল। এবার বললেন, চলুন, ধর্মশালাতেই ফিরে যাই, পাণ্ডার এখান থেকে কাজ নেই। ওর হাতের মধ্যে থাকতে চাইনে। তাছাড়া নানা অসুবিধেও রয়েছে দেখছি।

কিছু পূজা দিতে হলো বৈকি। তবে প্রণামীটা এখন বাকি রইলো। পাণ্ডার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না বটে, তবে অল্পে মুক্তি পাওয়া যেত না এখানে থাকলে। জিনিসপত্র পুনরায় নিয়ে পথে নেমে এসে কতকটা যেন স্বস্তি পাওয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমরা আবার এসে উঠলুম ধর্মশালায়। অধ্যবসায়ী মদনলাল সেখানে সংবতীকে নিয়ে দিব্য অস্থায়ী ঘরকন্না পেতে বসেছে। বাচ্চাটাকে সুস্থ করে শুইয়েছে দোতলার বারান্দায়। ওরা আগামীকাল প্রাতে যাবে মন্দিরে। আমাদের দেখে সংবতী একেবারে নেচে উঠলো।

মস্ত বাড়ি। নীচে ওপরে দরদালান। ঘরের পর ঘর। অনেক যাত্রী এসেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের। নীচের তলায় তাদের কলরব চলছে। স্নানের জল পেয়ে আমরা বাঁচলুম। পথের পাশেই দু'একটি ভোজনাগার, সেখানে যেমন-তেমন আহারাদির ব্যবস্থা। ক্ষুধার উগ্রতা থাকলে যে কোন খাদ্যই উপাদেয় লাগে। ভোজ্য ব্যবস্থার দারিদ্র্য দেখে শ্রীমতী গুপ্তা হেসেই খুন। এক সময় তিনি বললেন, ভয়ে-ভয়ে বলি, শ্রীনগরে আপনি যে আলুকপির তরকারি রান্না করেছিলেন, সেটি খুব ভালো হয়নি!

মেজাজটা বোধ করি ভালো ছিল না। ফস করে বলে ফেললুম, এখানকার আধসিদ্ধ আলুর ঘাঁটের তুলনায় সেটা কি এতই মন্দ ছিল?

তিনি হেসে উঠলেন। সংবতী এসে যোগ দিল, এলো মদনলাল। ওরা গোগ্রাসে খেলো সবাই। মদনলাল ওর মধ্যে যোগাড় করে এনেছে দুধ আর আপেল! কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বাচ্চাকে একা শুইয়ে এসেছে দোতলার একটি ঘরে। হারিকেন জ্বেলে রেখে এসেছে। এবার ফিরতে হবে।

স্নানাহার সেরে উপরে যেতে রাত দশটা বেজে গেল।

মদনলালের উৎসাহ অপরিসীম। কথায় কথায় ধমক খাচ্ছে স্ত্রীর কাছে, ওকে নিয়ে কৌতুক করছি আমরা সবাই, কিন্তু মদনলাল অদম্য। কাজ কেড়ে নিচ্ছে সকলের হাত থেকে,—নিজে করবে সব। আরও বিপদ, ওর মধ্যেই গান গাইবে। কবে শ্রীরাধা যমুনায় কলস নিয়ে জল ভরতে গিয়েছিলেন, তার জন্য মদনলালের মাথায় কী যন্ত্রণা। সংবতী

রাগে একেবারে আগুন, মায়াদেবী হেসে লুটোপুটি। এক সময় যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন সৎবতীর ধৈর্য ধারালো। চেঁচিয়ে বললে, ডাণ্ডাসে তেরি রাধেকো গাগরা ম্যায়নে তোড় দুঙ্গা!

মদন ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, দেখিয়ে দাদাজি, মেরা বিবিভি নাস্তিক বন্ গই!—আমাদের উচ্চকণ্ঠ হাসি আর বাধা মানলো না।

মদনলাল বিছানা পেতে দিচ্ছে সকলের। জল এনে দিচ্ছে সকলের হাতে। এমন কি সিগারেটের ছাই ফেলাব জন্য সে আমার বিছানার পাশে একটি 'কটোরা'ও এনে রেখেছে। বাচ্চা কেঁদে উঠলো ওরই মধ্যে বার দুই, মদনলাল তাকে শান্ত করে আবার শোওয়ালো।

বারান্দা আর ঘর মিলিয়ে বিছানা পড়েছে সকলের। এটা যাত্রীশালা, পদে পদে সমাজ-ব্যবস্থার শৈথিল্য ঘটে। তবু এর আভিজাত্য কম নয়। দোতলা পাকাবাড়ি পাহাড়ি দেশে, সুযোগ সুবিধা প্রচুর। অনেককালে অনেকবার কেটেছে পার্বত্য চটির ধারে, অনেক অযত্নে, অনেক ধূলিধূসর আনাচে কানাচে। এখানে চমৎকার। সামনে বারান্দার বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে বিশালকায়া দানবীর মতো জ্বালামুখীর অচল আয়তন, তার উপরে জ্বলছে একটি জ্যোতিষ্ক। চুপ করে আছি আকাশের দিকে চেয়ে। সহযাত্রীদের আর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ করি ঘুমিয়েছে সবাই।

অরণ্যসমাকীর্ণ কাংড়া উপত্যকার একটি অংশ হলো জ্বালামুখী অঞ্চল। অতি ক্ষুদ্র এই জনপদটি গড়ে উঠেছে তীর্থমন্দিরটিকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে বনময় চাষী-বসতি। এই অরণ্যলোকের কোনও নির্দিষ্ট সীমানা এদিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভীষণতায় জনশূন্যতায় এই অরণ্য প্রসিদ্ধ। হিংস্র শ্বাপদের অবাধ চলাফেরার পথ চলে গিয়েছে পাহাড়ের নীচে-নীচে বিপাশার তীরে-তীরে,—মণ্ডি আর বিলাসপুর রাজ্যে। পশ্চিমে শূলশৃঙ্গ গিরিশ্রেণীর ভয়াল অরণ্যালোক, দক্ষিণে চলে গেছে হামিরপুরের পথ, সেখান থেকে 'আঘার' এবং অতঃপর সুন্দরনগর রাজ্যের শেষ সীমানা,—যেখানে বিলাসপুর ছেড়ে বন্য শতদ্রু শূলশৃঙ্গের দক্ষিণে এসে মিলেছে। এ হলো অখণ্ড অবিভক্ত ভারতের হিমালয়ের সেই দুই হাজার মাইলব্যাপী তরাই অঞ্চল,—হিন্দুকুশের দক্ষিণ থেকে যার আরম্ভ, আসামসীমান্তের পূর্বাঞ্চলে, ব্রহ্মদেশ ও চীনসীমানায় যার শেষ। এখানে কেবল এই নিঃসঙ্গ বিজন অরণ্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অম্বিকা,—যিনি দুর্গা,—মহাচণ্ডী, যিনি অস্ত্রধারণ করে রয়েছেন অসুরনাশনের,—শত্রুহননে যাঁর দয়া নেই, ক্ষমা নেই, কৃপা নেই, মোহকজ্জল নেই। ওই অন্ধকা'র 'কালীধর' পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে তিনি ডাক দিচ্ছেন মহা-ভারতকে যুগ থেকে যুগান্তরে। সভ্যতার যজ্ঞ যারা পণ্ড করতে এসেছে, যারা ভারতের জ্ঞানসংস্কারকে কলুষিত করতে চেয়েছে, তপোবনের দর্শনতত্ত্ব-সাধনাকে যারা ইতিহাসের পর্বে-পর্বে হিংস্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা পেয়েছে, ঐতিহ্যের অমৃতস্বভাবকে যারা আক্রমণ করেছে বারম্বার,—মহাচণ্ডী ডাক দিচ্ছেন যেন এখান থেকে,—তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো! দৈব-অহিংসবাদের উপরে দাঁড়াও,—হিংস্রতাকে হনন করো। সেই হবে তোমার সভ্যতার রাজসূয় যজ্ঞ, সেই হবে কল্যাণব্রতের শেষ বাণী। সংহারসাধিকা সেই দেবী অম্বিকার রণপিপাসা নিয়ে যিনি এই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের চূড়ায়-চূড়ায় ফিরছেন, তিনি এখানে শিব নন, সর্বমঙ্গলার কল্যাণের প্রতীক নন,—তিনি উন্মত্ত ভৈরব; তিনি দেবাদিদেব নন, মহারুদ্র; তিনি রুদ্রাণীর অমাকুন্তলরাশির সঙ্গে মিলিয়েছেন আপন মহাজটা ওই অরণ্যে-অরণ্যে। এখানেও শিব ও শক্তির প্রকাশ।

তন্দ্রাজড়ানো এক প্রকার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম আকাশের ওই জ্বলজ্বলে বড় তারাটার দিকে—সম্মুখের কালীধর পাহাড়ের চূড়ায় যেটা জ্বলছে। সম্ভবত আমি জীবিত নই, চোখ দুটোর মৃত্যু ঘটে গেছে। ইচ্ছার আকারে দেহ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে প্রাণ,—আত্মার অশ্রান্ত ভ্রমণ-পিপাসা নিয়ে; নীলপদ্মের বিশ্বজোড়া অন্বেষণে ভ্রমর যেমন একাকী বেরিয়ে পড়ে। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে, সাগরে, প্রান্তরে, সুমেরুলোকে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, সপ্তর্ষির সীমানায়, মহাব্যোমে, ব্রহ্মচেতনায়। ক্ষুধার্ত ভ্রমর ফিরছে একা একা আপন রহস্য-পিপাসায়। বন্ধনহীন, কিন্তু মুক্তিবিহীন,—অস্তিত্বের আর চৈতন্যের কল্পে-কল্পে তার নীলপদ্মের অন্বেষণ চলছে।

পরদিন প্রভাতে মোটর বাসে বেরিয়ে পড়েছি। মদনলালরা সঙ্গে এলো না।

বাণগঙ্গার তীরে-তীরে পার্বত্যপথ। প্রাচীন পাথরের জটলা নেমেছে নীচের নদীতে। শরৎপ্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে দেওদারের বনে-বনে। রাঙারৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়। নীচের দিকে এখনও ছমছমে ছায়াবরণ। আলো এসে পৌঁছয়নি।

আমাদের গাড়ি চলেছে পাহাড় পেরিয়ে এক-অজানা থেকে ভিন্ন অপরিচয়ের দিকে। পৃথিবীকে নতুন করে পাই নতুন পাহাড়ে এলে। বৃহতের দিকে যাবার আগে একেকটি তোরণদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়। হঠাৎ পাওয়া যাচ্ছে শালের জটলা, হঠাৎ এসে দাঁড়াচ্ছে দলছাড়া সেগুন আর চীড়। দেখতে দেখতে একটির পর একটি গিরিসঙ্কট, দেখতে দেখতেই আকাশ তার দিগন্তের দ্বার খুলে দিচ্ছে। দক্ষিণ থেকে আমরা যাচ্ছি উত্তরে—যেদিকে ধবলাধার।

পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার সীমানা থেকে দক্ষিণ ভূভাগে আরম্ভ হয়েছে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা,—এসেছে সোজা দক্ষিণে, এবং প্রসারিত হয়েছে পূর্ব হিমালয়ে। মধ্যোত্তর ভারতীয় হিমালয়ের প্রধান প্রবেশপথ হলো এই শিবলিঙ্গশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এটি হলো হিমালয়ের প্রথম স্তর। কাশ্মীর, উত্তর পাঞ্জাব, হিমাচল, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল—সমস্ত ভূভাগই এই পর্বতশ্রেণীর দ্বারা প্রাকাররুদ্ধ। এই শিবলিঙ্গ পর্বতমালারই দ্বিতীয় স্তরে হলো ধবলাধার গিরিশ্রেণী। কাংড়া, পালামপুর, ধরমশালা এবং যোগিন্দরনগরের উত্তরে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় অতি নিকটে এই ধবলাধার,—শ্মশানচারী উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন লোকসমাজে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখলে ভয় করে—ওর সর্বাঙ্গে কোনও স্নেহ নেই, ছায়া-মায়া কিছু নেই,—জন্মের থেকেই যেন সর্বহারা। সবুজের আভা নেই যেন ওর সর্বাঙ্গে, বর্ষায়-বসন্তে ওর ভাবান্তর ঘটে না, ওর গোপনতা কিছু নেই, অরণ্যের কৌপীনও ধারণ করেনি। ও যেন আপন রুক্ষজটার ভিতর থেকে করালচক্ষু মেলে দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কালের প্রহর গুনছে,—রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করছে, কবে আসবে কালান্ত, কবে প্রলয়, কবে আবির্ভূত হবে দশম অবতার, তবে ছারখার হবে সৃষ্টি। ধবলাধারের বিশাল নগ্নতা দেখলে ভয় করে।

পাহাড়ের পর পাহাড় ছেড়ে এলুম, পিছনে রেখে এলুম বাণগঙ্গার অতলস্পর্শ খদ, আর অশ্রান্ত স্রোতগর্জন, রেখে এলুম দুর্ভেদ্য বনভূমির নৈঃশব্দ্য,—রেখে এলুম ওদের স্তবকে স্তবকে আনন্দের শিহরণ, প্রাণের জয়বার্তা।

পূর্বাহ্ণে এসে পৌঁছলুম কাংড়ার মস্ত শহরে।

এটি একটু বড় শহর। সমতলের উপর অবস্থিত। কোর্ট-কাছারি, ডাক ও তারঘর,

আপিস-ইস্কুল, দোকান-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য,—নগর সভ্যতার প্রত্যেকটি উপকরণ বর্তমান। তবে সকলেরই আকার ছোট। আমরা শহর-সভ্যতায় মানুষ,—এসব আমাদের চোখে পুরনো। বরং হিমালয় ভ্রমণকালে যদি সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণের অভাবে অসুবিধায় পড়ি, সে সহ্য হয়; উপযুক্ত আহার এবং আশ্রয় না জুটলে দুঃখবোধ করিনে। কিন্তু শহরে এসে পৌঁছলে আমাদের দাবি বেড়ে ওঠে, আমরা সব চাই,—এবং না পেলে ক্ষুণ্ণ হই। শহরে কোনও উপকরণের অভাব ঘটলে আমরা রাগ করি।

একজন পাণ্ডা এলেন। বয়স্ক লোক, নাম মোতিরাম। জ্বালামুখীর পাণ্ডার নাম ছিল মোতিলাল। তাব প্রতি খুব খুশী ছিলুম না। কিন্তু এই ভদ্রলোকের প্রসন্ন ব্যবহারে ভারি আনন্দ পেলুম। শ্রীমতী মায়া বললেন, মোতিরামজীর বাড়িতেই চলুন, স্নান না করে আর থাকা যাচ্ছে না। বড্ড রোদ।

বললুম, কিন্তু মদনলালরা যদি পরের গাড়িতে এসে মোটর স্ট্যান্ডে আমাদেরকে দেখতে না পায়?

নাই বা পেলো!—তিনি বললেন, সাড়ে তিনটের আগে যখন বৈজনাথের বাস ছাড়ছে না, তখন তারা মোটর স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে বাধ্য। আমরা ঠিক সময়ে এখানে এসে দাঁড়াবো। চলুন—

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সংবতীর বাচ্চাটা যদি এই পথের কষ্টে আবার অসুস্থ হয় তবেই মুশকিল। ওরা সন্তানের জনক-জননী বটে, কিন্তু এখনও মা-বাপ হয়ে ওঠেনি। শিশুর স্বাচ্ছন্দ্য এখনও বুঝতে শেখেনি।

মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলো। তবু শ্রীমতী মায়ার নির্দেশ মানতে হলো। আমরা অলিগলি আর আনাচ কানাচ পেরিয়ে একটি বস্তির মধ্যে মোতিরামের বাড়িতে এসে উঠলুম। পাণ্ডাজী সযত্নে পানীয় জল ও মিষ্টান্ন নিয়ে এলেন।

সামনেই একতলার ঘর। প্রখর রৌদ্র থেকে এসে ভারি শান্তি পেলুম। কিন্তু এ-কদিন একটি বিশেষ বিষয়ে আমি অন্যমনস্ক ছিলুম, সেটি আমারই ত্রুটি। ঘরে ঢুকেই শ্রীমতী মায়া প্রথমেই তাঁর চামড়ার ব্যাগ খুলে কাগজ কলম নিয়ে স্বামীর নিকট দ্রুত হস্তে চিঠি লিখতে বসে গেলেন। যে-ভাবেই হোক, একটি কথা সত্য। অতখানি শঙ্কিত মনে অত দ্রুতগতিতে একটি সংসার তচনচ করে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়নি; হয়ত সেই সময়ের দুর্যোগে আরও কিছু ধৈর্যরক্ষার দরকার ছিল। তবে একথা তিনি জানতেন, মাস তিনেকের মধ্যেই তাঁর স্বামী কাশ্মীরে ফিরবেন, এবং দিল্লীতে তাঁর অবিলম্বে বদলী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাঁকে যেতেই হতো কিছুদিন পরে, কিন্তু বন্যা এসে আগেই তাঁর যাওয়াটা দ্রুত ঘটিয়ে দিল।

চিঠি শেষ করে ঠিকানা লিখে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমার স্বামীকে দেখলে আপনি কিন্তু খুব খুশী হতেন বলে রাখছি।

হাসিমুখে বললুম, কথাটা যেন তিরস্কারের মতন শোনালো। আমি কিন্তু মনে-মনে আপনার স্বামীর অনুরক্ত হয়ে উঠেছি।

কাগজপত্র গুছিয়ে ব্যাগ বন্ধ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখে তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। মনে নেই, বড়জেলায় থাকতে আপনাকে তাঁর চিঠি পড়ালুম? চিঠিখানায় সবই আপনার কথা।

আমাদের স্নানাদির পর মোতিরাম তাঁর খাতাপত্র এনে বসলেন। কোনও দাবি তাঁর

নেই, প্রণামী পাবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে প্রস্তুত নন। আমরা তাঁর এখানে আনন্দ পেলেই তিনি খুশী থাকবেন। খাতা খুলে তিনি একস্থলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর মাতাঠাকুরানীকে নিয়ে একদা এই পাণ্ডার এখানেই উঠেছিলেন। সেটি সবিস্তারে লেখা রয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলুম।

পাণ্ডাজী অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে চললেন মন্দিরদর্শনে। পথ একটুখানি চড়াই। এঁকে-বেঁকে এদিক-ওদিক ঘুরে আমরা বৃহৎ এক মন্দিরেব চত্বরে উঠে এসে দাঁড়ালুম।

বাণগঙ্গা পেরিয়ে আসার পর থেকে একটি বিশেষ চেহারা লক্ষ্য করছি। সমগ্র কাংড়া উপত্যকাকে বাঙলা দেশের আত্মিক বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। পূজার্চনার রীতি পশ্চিমী নয়; ব্যবহারে, আলাপে, সামাজিকতায়—বাঙলাকেই দেখতে পাই। সাধারণত আমরা পাঞ্জাবে দেখি প্রধান দুটি দল। একটি বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের উপাসক; অন্যটি শৈবশাক্তে মেলানো। শিখ ধর্মটা নতুন, ওটার বয়স কম। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ দীক্ষার মধ্যে ওটি সীমাবদ্ধ। মুসলমানধর্মে যেমন দেখা যায় বাইরের লোকের প্রবেশ অবাঞ্ছনীয়,—শিখধর্মেও তেমনি, প্রবেশ-পথটি সাধারণের পক্ষে প্রশস্ত নয়। হিন্দুদের ব্যাপারটা ভিন্ন রকমের। যিনিই বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-ষড়দর্শন-পুরাণ পাঠ করেন, যিনিই ডুবে যান যোগ-দর্শনে, জ্ঞানে ও সাধনায়,—তাঁকেই আমরা বলি, তুমি পরম হিন্দু। গায়ের জোরে কিংবা পুস্তিকা প্রচার করে হিন্দুরা তাদের স্বধর্মীরা সংখ্যা বাড়াতে চায় না, ওটা তাদের ধাতেও নেই, জাতেও নেই। তুমি আমেরিকান, কিংবা রুশ, কিংবা ইংরেজ,—যেই হও, হিন্দুদর্শনের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে, এই কারণেই তোমাকে হিন্দু মনে করি। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙকে পরম হিন্দু বলে অনেকেই মনে করে। গৌতমবুদ্ধ ছিলেন হিন্দুদর্শনের একটি পরমাশ্চর্য উদাহরণ—একথা কে অস্বীকার করবে? সমগ্র কাংড়ায় ঘুরে দেখছি বাঙালীর শাক্ত ও বৈষ্ণবসংস্কৃতি পথে-পথে ছড়ানো। উভয়ে আশ্চর্য মিল, একই সুরে বাঁধা। সুতরাং বাজারে, হাটে, আদালতের পাড়ায়, বস্তিপল্লীর আশে পাশে, খেলার মাঠে আর গৃহস্থ ঘরে,—কোথাও ঘুরে একথা মনে হয়নি, বিদেশে এসেছি। যেমন কাশ্মীরে। গ্রামের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াও,—ঠিক বাঙলার গ্রাম। কলাগাছে মোচা কিংবা কলার কাঁদি ঝুলছে। মাচানের ওপর লাউ,—তলায় তার কাঁচালঙ্কার চারা। রোদ্দুরে বসে কাঁথা শেলাই,—একেবারে বাঙলাদেশ। উনুন-পাড়ে মেনিবিড়াল, খামারে ছাগল, গরুর সামনে খুদসিদ্ধর পাত্র, ওপাশে গাঁদা আর সন্ধ্যামণির ঝাড়, সরোবরে শালুক, ছেঁচাবাঁশের বেড়ায় গোবরের চাপড়া,—অবিকল বাঙলা দেশ। কাংড়াতেও তাই। মেয়েরা কুয়ার পাশে মাথা ঘষতে বসেছে, পেয়ারাগাছে চড়ছে ছেলেমেয়ে, ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসেছে কেউ, ধান ভানছে চালাঘরে, মুদির দোকানে জটলা চলেছে,—মনে হবে আমি ওদেরই একজন। পথে ঘাটে মানুষের চেহারায় কোনও উগ্রতা নেই,—সমস্তটাই যেমন নিরীহ, তেমনি নির্বিরোধ। পাঞ্জাবের অন্যত্র যাও,—যাও অমৃতশহরে, গুরুদাসপুরে, জলন্ধরে কিংবা লুধিয়ানায়, ফিরোজপুর কিংবা ভাতিন্দায়,—চেহারা অন্যরকম। কাংড়ায় এসে যেন পাঞ্জাব কোমল হয়েছে, প্রকৃতিতে এসেছে পেলবতা, মানুষের স্বভাবে এসে পৌঁছেছে শালীনতা।

সন্দেহ নেই, এরা রাজপুতনার রসবোধ এনেছে, কিন্তু পাঞ্জাবের রুক্ষতা পায়নি। সভ্যতার থেকে যতদূরে সরেছে মানুষ, তত সে সরল, ততই সে স্বকীয়। যান্ত্রিক সভ্যতা যে-পোশাক পরিয়েছে মানুষকে, সেই পোশাকটি মানানসই হয়নি তার প্রকৃতির সঙ্গে।

কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে সকলের বড় ষড়যন্ত্র হলো, একই ছাঁচে পৃথিবীকে ঢালাই করা। ভদ্র জাপানী আর ভদ্র মিশরীয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাও,—একই জীবনযাত্রা, এক পোশাক, এক খাদ্য, এক শিক্ষা, এক আশা-আকাঙ্ক্ষা। দাঁড় করাও আমেরিকানের পাশে অস্ট্রেলিয়ানকে, ইংরেজের পাশে রুশীয়কে, জার্মানের পাশে ফরাসীকে,—বিজ্ঞান সভ্যতা ওদের মধ্যে পার্থক্য রাখেনি কিছু। এসো ভারতবর্ষে,—অনন্ত বৈচিত্র্য আজও দেখতে পাবে। এসো হিমালয়ের পাদপর্বতে,—এই কাংড়ায়। এখানে মানুষ আপন স্বভাবধর্মে বিদ্যমান। এই দেওদার আর ঝাউবনের তলা দিয়ে, পাইনের আশ্চর্য নন্দনকাননের ধার দিয়ে—পথ যেদিকে হারিয়ে গেছে শৈলমালার ভিতরে ভিতরে,—মানুষের স্বভাব সৌন্দর্য দেখে নাও। সভ্যতার স্পর্শ এদের মনে আজও লাগেনি বলেই প্রকৃত মানুষকে দেখতে পাওয়া যাবে। পোশাকে ব্যবহারে সামাজিক জীবনে—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র।

একটি টিলা পাহাড়ের উপরে বজ্রেশ্বরী মন্দির। কয়েক রশি চড়াইপথ। সামনের মন্দির-দ্বার একটু উঁচুতে। আমরা এসেছি গঙ্গার দেশ থেকে। ফুল আর চন্দনের সুগন্ধ যদি পাই, ত্র্যম্বকের বীজমন্ত্র যদি পূজার্থীর কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি—আমাদের মনে পড়ে যায় দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গার কূলপ্লাবিনী তটসীমান্ত,—যার তীর থেকে উঠে গেল গৈরিকবাসা ভৈরবী জপ সেরে; ব্রাহ্মণ যার তীরে বসে মন্ত্রপাঠ করছে নিত্য, যেখানে ভারতসভ্যতা যুগযুগান্ত অবগাহন করে পুণ্যময় হয়েছে।

পাণ্ডাজীর পিছনে পিছনে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলুম। শ্রীমতী মায়া এতক্ষণে যেন স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করলেন। চূড়ার উপরে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইনি হলেন দেবী বজ্রেশ্বরী। সমগ্র কাংড়ায় জ্বালামুখীর পরে বজ্রেশ্বরীই হলেন প্রধান। পাহাড়ের নীচে খরতরা বাণগঙ্গা যেমন এই বজ্রেশ্বরীর পর্বতপাদ চুম্বন করছেন, তেমনি এই মন্দিরের উত্তরলোকে তুষারমৌলী ধবলাধারের কৃষ্ণাভ শৈলমালা প্রসারিত থাকার জন্য এই মন্দিরের উদার মহিমা ব্যক্ত হচ্ছে। মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতেই চারিদিক থেকে হিমালয়ের মধুর বাতাস সর্বাঙ্গে তার স্নিগ্ধসান্ত্বনা বুলিয়ে দিয়ে গেল।

জ্বালামুখীতে দেখে এসেছি পাহাড়ের উপরে মন্দির রক্তবরণ,—অম্বিকা, তিনি শক্তির প্রতীক। তাঁর উজ্জ্বলন্ত লোলাগ্নি রসনা সমস্ত ধাতব পাহাড়ের ফাটলের ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর মন্দির আছে, কিন্তু মূর্তি নেই। অগণ্য অগ্নিজিহ্বা যাঁর,--তাঁর বিগ্রহকে কল্পনা করো, চিত্রাঙ্কন করো মনে-মনে। তাঁকে দেখে নাও সমস্ত পর্বতে, দেখে নাও তাঁকে চূড়ায়-চূড়ায়। এখানে ভিন্ন কথা। এখানে বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি শান্ত। রুদ্রাণী নয়, পার্বতী। এখানে শান্ত শিব, শক্তি তাঁর বামে। এখানে ওখানে সেখানে—সর্বত্র দেবস্থান। যেমন কাশীর অন্নপূর্ণা। একবার প্রবেশ করো, অনেককে পাবে। যেমন উজ্জয়িনীর মহাকাল। একবার একটু নীচের দিকে নেমে যাও,—দেখবে অনেককে পাশাপাশি। যাও রাজস্থানে, কিংবা হরিদ্বারে, পুরীতে কিংবা দ্বারকায়, মাদুরায় কিংবা শিবসাগরে, অযোধ্যায় কিংবা গঙ্গাসাগরে, করাচীতে কিংবা চট্টগ্রামে। সবাইকে ধরে রেখেছে ভারত, কেউ বাদ যায়নি। কাংড়াতেও তাই। ইতিহাস বলেছে যাদের কথা,—যারা ছিল সনাতন ব্রাহ্মণ সভ্যতার যুগে, যারা ছিল বৌদ্ধ আর জৈন আমলে, তারা আছে কাংড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে। কেউ আছে পাহাড়ের গায়ে খোদিত, কেউ রয়েছে গুহাগর্ভে, কেউ বা আছে মন্দিরে। মৌর্য-বৌদ্ধ আমলে, গুপ্ত যুগে, হর্ষবর্ধনে, শক-হুন-গ্রীকদের

কালে, পাঠানে-মোগলে, ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজের আমলে,—কাংড়া নিঃসঙ্গ থেকে গেছে আপন মহিমায়, আপন স্বকীয়তায়, আপন সম্মাননায়। কাংড়ার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চিত্রকলায়—যার নাম 'কাংড়া স্কুল অফ আর্ট'। স্থাপত্য আর ভাস্কর্যকে তারা সুন্দর করেছে, ললিতকলার ব্যাখ্যায় এনেছে আপন লাবণ্য, যার স্বাতন্ত্র্য সর্বদেশে স্বীকৃত। ভারতের অনন্ত বৈচিত্র্য, এখানেও তার অভিনবত্ব। কন্যাকুমারী থেকে পামীর; গান্ধার থেকে কৈলাশ; দ্বারকা থেকে ব্রহ্ম আর ইন্দোচীন; নেপাল থেকে যবদ্বীপ আর সুমাত্রা; ব্রহ্মপুত্র থেকে সিংহল,—এর নাম মহা-ভারত। এই অখণ্ড, অবিভাজ্য, অব্যয় ভূভাগকে আপন ক্রোড়ভূমিতে ধারণ করে আছেন দেবতাত্মা হিমালয়, যাঁকে কাব্যে ও পুরাণে বলা হয়েছে কূলপর্বত, বলা হয়েছে মেরু-মন্দারমাল্যশোভিত হিমবান।

একা বসেছিলুম একটি নিরিবিলি পাথরের আসনে। শ্রীমতী মায়া ঘুরছেন এখানে ওখানে। পুজো দিচ্ছেন তিনি মন্দিরে, দক্ষিণা দিচ্ছেন ব্রাহ্মণকে। মোতিরাম আছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ সামনে আবির্ভূত হলেন সৌম্যকান্ত এক ব্যক্তি,—পরনে তাঁর কোটপ্যান্ট। আমাকে দেখেই তিনি কোলাহল করে উঠলেন সবান্ধবে। ইনি আমাদের বন্ধু এবং প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, সন্দেহ নেই।

আপনি যে এখানে?

ঘোষ মশায় বললেন, বাঃ, আমি নেই কোথায়? যেখানেই যান, আমি আছি। আমার সরকারী চাকরিই হলো, আমি সর্বত্রগামী। আসুন, আসুন, এ মন্দিরের পাথরের কাজগুলি একবার দেখে যান, আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

উঠবো, এমন সময় মায়াদেবী এলেন। উভয়ের পরিচয় কবিয়ে দিলুম। হরিচরণবাবু বাকরসিক ব্যক্তি, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে সব বোঝাতে লাগলেন। এ অঞ্চলে বারম্বার তাঁকে আসতে হয়েছে। তাঁর কাজের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে তাঁকে প্রায়ই রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বেতনাদি তিনি ভালোই পান।

বললুম, আশুতোষ কলেজের প্রফেসরি ছাড়লেন কবে?

হরিচরণ বললেন, সে অনেকদিন, বছর কয়েক হলো। দিল্লী থেকে চাকরি নিয়েছিলুম। ধরুন না, সেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বের আমলে। তখন চারদিকে খুব হৈ চৈ।

জন দুই অবাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর সঙ্গে। নতুন মানুষ দেখে খুব উৎসাহ লাভ করা গেল। হরিচরণবাবু নিজে পণ্ডিত এবং সুরসিক। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করবেন। শ্রীমতী মায়ার সঙ্গে তিনি খুব গল্প আরম্ভ করে দিলেন। আবার দল বাঁধলুম আমরা।

মন্দির-চৌহদ্দির মধ্যে আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘোষ মশায় বললেন, থাক আর নয়। দেখেছেন, বেলা হয়েছে কত? চলুন, একেবারে খাবারের দোকানে গিয়ে বসা যাক।

ভোজনরসিকের কথা অমান্য করা অসম্ভব নয়। সুতরাং যেতেই হলো পথঘাট মুখর করতে করতে। হঠাৎ একসময় তিনি বললেন, একি, উল্টো জামা গায়ে চড়িয়েছেন, সেদিকে লক্ষ্য আছে কি? কই, পকেট খুঁজে বার করুন ত?

সহসা আমার প্রতি লক্ষ্য করে মায়াদেবী এবং অন্যসকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। অত্যন্ত কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলুম। হরিচরণবাবু তার উপরে আবার যোগ করে দিলেন, কাংড়ার সমস্ত ধুলোময়লা নিজের অঙ্গে ধারণ করেছেন? ক্ষৌরকার্যটি হয়নি

কতকাল? স্নান করেননি কদ্দিন?

বললুম, ঘণ্টা তিনেক আগে স্নান করেছি।

ও, স্নান করেছেন! আচ্ছা, মিসেস গুপ্তা, আপনার কাছে এক কুচি সাবানও ছিল না?

হাসিমুখে শ্রীমতী গুপ্তা একেবারে শরসন্ধান করলেন,—উনি অন্য কারো জিনিস ছোঁন না!

প্রতিবাদ জানাতে হলো,—এবার যেন বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

না, হয়নি!—ঘোষ মশায় বললেন, আমরাও একটু আধটু ভ্রমণাদি করে থাকি কিন্তু এমন সর্বহারা হইনে। এর চেয়ে আঙুলে পৈতে জড়িয়ে বসে পড়ুন পথের ধারে, বামুনের ছেলের ভিক্ষে জুটবে!

এবম্প্রকার লাঞ্ছনা কপালে জুটলো অনেকক্ষণ অবধি। তারপর আমরা বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি একটি হোটেলে এসে উঠলুম। আমাদের ক্ষুধা ছিল প্রচুর, কিন্তু হুঁস ছিল না। এখানে তার অকৃপণ পরিচয় পাওয়া গেল। আহারাদির মধ্যে একসময় হরিচরণবাবু সহসা জানতে চাইলেন, আমার আর কোনও বইয়ের সিনেমাচিত্র হচ্ছে কিনা। আলোচনাটা উঠতেই মায়াদেবী একটু আড়ষ্ট বোধ করলেন। তাঁর পরিচ্ছদ পারিপাট্যে হয়ত এমন কিছু ছিল, যা লক্ষ্য করে সম্ভবত হরিচরণবাবু একথা পেড়েছেন। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে আমাকে ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে হলো। হয়ত সুশ্রী চেহারা, নীল চশমা, রেশমী শাড়ি এবং নেইল্-পালিশ ইত্যাদি দেখলে আজকাল মানুষের একটু কৌতূহল হয়!

যাই হোক, বিদেশ বিভূঁয়ে একটি চেনা মানুষকে হঠাৎ পেয়ে আলাপে হাস্যে তামাসায় বেশ কাটলো ঘণ্টা দুই। আহারাদির পর হরিচরণ বিদায় নিলেন, এবং আমরাও পাণ্ডাজীর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। পথের পাশে এতক্ষণে একটি ডাকবাক্স পাওয়া গেল। শ্রীমতী মায়া তাড়াতাড়ি তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে স্বামীর চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। তাঁর প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তাঁর স্বামীই যেন বাক্সের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা চেয়ে নিলেন।

পাণ্ডার মিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাঁর ঘরটিকেও যেন পুরনো বন্ধুর মতো মনে হলো। ঘরে এসে শ্রীমতী গুপ্তা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলেন। তাঁর ক্লান্তি ছিল প্রচুর। কাশ্মীর থেকে আসার সময় তিনি বলেছিলেন, এর আগে লেখক কেমন, আমি দেখিনি। লেখককে কাছে থেকে দেখবার এমন সুযোগ আমি ছাড়বো না।

আমি আড়ষ্ট। কী তিনি লক্ষ্য করছেন আমার জানা নেই। যে-ভ্রমণে আমার আনন্দ, তাতে তিনি উপভোগের ক্ষেত্র পাচ্ছেন কিনা, তাও আমার অজ্ঞাত। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, স্নানাদির অসুবিধা, নিভৃত বিশ্রামের সুবিধা তাঁর জুটছে না। আহার-নিদ্রা-প্রসাধনের প্রশস্ত স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে না,—সুতরাং, আমার বিশ্বাস, তাঁর কষ্টের সীমা নেই। সমস্ত পথ আমি সঙ্গে থাকলেও তিনি একা, এবং বুঝতে পারি তিনি তলিয়ে আছেন নিজের মধ্যে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তিনি উঠে এলেন। আমি একটু অস্বস্তিবোধ করেই বললুম, একটি কথা নিবেদন করি। চলুন, আর এগিয়ে কাজ নেই, এখান থেকেই দিল্লী রওনা হই। আমি না হয় আর একবার আসবো এদিকে।

কেন?

ধরুন, সেখানে সকলেই ভাবছেন আপনার জন্য, জিনিসপত্র নিয়ে অবিলম্বে আপনার

ভাসুরের ওখানে পৌঁছনো দরকার।

একটু ক্ষুণ্ণ হলেন মিসেস গুপ্তা,—আমি তবে চিঠি দিলুম কি জন্যে? জম্মু থেকে লিখেছি ভাসুরকে। আপনি আছেন সঙ্গে,—তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস কি, জানেন? আমাকে নিয়ে আপনিই অসুবিধে বোধ করছেন!

খুব হাসলুম। বললুম, যদি বলি কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়?

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে তিনি কঠোর অভিমত ব্যক্ত করলেন, সত্যি হলেও নড়বো না, জেনে রাখুন লেখক মশাই। ভ্রমণের এমন সুবিধে আর পাবো না। যত টাকাই লাগুক, এইভাবেই খরচ করবো। কাঁঠাল যদি ভাঙতেই হয়, ব্রাহ্মণ সন্তানের মাথাটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আমাদের হাসির তরঙ্গে মোতিরামও যোগ দিলেন। কিন্তু আর দেরি নয়, সাড়ে চারটের আগেই মোটর বাস ছাড়বে,—আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মোতিরামের হাতে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। একটু আগেই যাই, হয়ত সংবতী ও মদনলাল তাদের বাচ্চাকে নিয়ে এতক্ষণে বাস স্ট্যান্ডে এসে হাজির হয়েছে। ওদের কুশলবার্তা পাবার জন্য আমরা উভয়েই অস্বস্তিবোধ করছিলুম।

পাণ্ডাজী মালপত্রের হেপাজত করে সমস্ত পথ এসে আমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন। সমুদ্রসমতা থেকে কাংড়ার উচ্চতা প্রায় দেড়হাজার ফুট মাত্র, কিন্তু শীতকালে এখানে প্রবল ঠাণ্ডা। অবরোধ কোথাও নেই, সুতরাং উত্তরের বাতাস এখানে অবারিত। শীতকালের শীত হলো বাতাসের জন্য, বাতাস বন্ধ হলে তুষাররাজ্যও সহনীয়। কাংড়ায় এখন শরৎকাল, উত্তরের বাতাস ওঠেনি,—অতএব গরম। রৌদ্রে দাঁড়ানো চলে না,—আমরা ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও মদনলাল অথবা সংবতীকে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একবার এগিয়ে গিয়ে প্রায় সেই কাছারিপাড়ার ধার পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে এলুম।

মায়াদেবী বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? ছেলেটা আপনাকে ভয় করে, তাই হয়ত দল ছেড়ে পালাচ্ছে! এমন হতভাগা আমি দেখিনি। সংবতী দুঃখ পাচ্ছে ওই লক্ষ্মীছাড়ার হাতে।

বললুম, অনেক লক্ষ্মীছাড়ার হাতে অনেকেই দুঃখ পায়।

হঠাৎ সন্দেহক্রমে বাঁকা চোখে তাকালেন মিসেস গুপ্তা। বললেন, বটে, গুপ্তসাহেব সঙ্গে থাকলে আপনাকে একথার জবাব দিতুম। আপনি দেখছি আমাকে ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচেন। ওটি কিন্তু হচ্ছে না! আপনার যত সাধ আছে, পাহাড়ে ঘুরে নিন। দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে তবে আপনার ঘাড় থেকে ভূত ছাড়বে!

ঠিক ভূত নয় অবশ্য!

ভূত না হয় পেত্নীই হলো! চলুন, গাড়ি ছাড়ছে!

হাসিমুখে আবার উঠলুম গাড়িতে। বৈজনাথের দিকে চললুম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কাংড়া বৈজনাথ ধবলাধার

বর্ষাশেষের বাদল ছুঁয়ে রয়েছে কপিশকান্ত ধবলাধারের তুষারচূড়ায়,—মেঘে আর তুষারে একাকার। এমন বিস্ময় হিমালয়ের কোথাও নেই। মোটর পথের অদূরে হঠাৎ উঠেছে ধবলাধার, যার উচ্ছতা কমবেশী ষোল হাজার ফুট। ওই শৈলমালার ঠিক নীচে অন্তহীন ফসলের ক্ষেত সমগ্র কাংড়ায় যেন সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেছে। তারই মাঝে মাঝে মিহি জরির ফিতের মতো চলেছে অসংখ্য স্রোতস্বিনী এঁকে-বেঁকে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ছোট ছোট চাষীর ঘরকন্না আর দেবস্থান। পৃথিবী আশ্চর্য মনে হচ্ছে। পাইন আর দেওদারের বনরেখা যেন হৃৎপিণ্ডকে টেনে নিয়ে যায় বহুদূরে,—যেদিকে উত্তর, পূর্ব আর পশ্চিম—তিনদিকে জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলাধারের বিশাল গিরিচূড়াদল। এখানে যেন ভারতের একটি ক্ষুদ্র মানচিত্র এঁকে রয়েছে।

পথ সমতল। একদিকে পাহাড়তলীর কোলে অফুরন্ত ফলের বাগান, অন্যদিকে প্রান্তর আর শস্যক্ষেত্র। কোথাও ছায়া নেমেছে অরণ্যের, কোথাও স্রোতস্বতীর নির্জন তীরে বটের ঝুরি নেমে এসেছে—মহাপ্রাচীন মুনি আপন মনে যেন গণ্ডূষ ভরে জলপান করছেন। কোথাও নেমে আসছে লাহুলের পাখি,—যারা হিমালয় ছেড়ে যায় না কোথাও। আমাদের দীর্ঘ ঋজু পথ বনবীথিকার মতো দূর থেকে দূরান্তরে চলে গেছে। রেলপথটি এসেছে পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী রোড এবং যোগিন্দরনগর হয়ে নাগরোটা পর্যন্ত। নাগরোটার পরে আর রেলপথ নেই। কিন্তু এ পারের বৈজনাথের পথ থেকে তার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা চলেছি ছায়াবৃত বনময় পথ দিয়ে। মিসেস গুপ্তা স্থির হয়ে বসে রয়েছেন।

অপরাহ্ণ ম্লান হয়ে আসছিল। জনসমাগম এত কম যে, বিস্ময় লাগে। মাঝে মাঝে পুরুষ দেখা যাচ্ছে,—মাথায় তাদের লাল পাগড়ি। স্কুল বালকের দল গান গেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাদের, যাদের নাম 'গদ্দি'। তারা এখানকার মাটির সন্তান নয়। আপেলের রক্তিমাভা 'গদ্দি'মেয়ের গালে আর অধরে, বাঁকা নয়নে যেন বন্য অপরাজিতার কটাক্ষ, নধর পেলব কণ্ঠে প্রবালের মালায় পথিকের মৃত্যুর ফাঁস জড়ানো। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, কিন্তু সর্বাঙ্গ আবৃত। মাথায় রাঙা ওড়না। কেউ বলে এরা মোঙ্গল রক্তের ধারা, কেউ বলে আদিম আর্যের অবশেষ। ছেলে-ছোকরা-পুরুষও তাই। রঙীন টুপি মাথায়, শাদা কম্বলের জোব্বা সর্বাঙ্গে, পশুলোমের ফেট্টি বাঁধা তাদের কোমরে। একটু সাবান মাখিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন করে দেখো, প্রত্যেকে রূপবান। অরণ্য থেকে ওরা পেয়েছে স্বভাব, ধবলাধারের কাঠিন্য থেকে পেয়েছে স্বাস্থ্য, পার্বতী নদীর ঝনক ঝঙ্কার থেকে পেয়েছে হাসির উল্লোল, এবং সভ্যতা-চিহ্নলেশহীন পার্বত্য প্রকৃতি থেকে ওরা পেয়েছে চিত্তের সরলতা। গরু ছাগল মেষ ও মহিষ—এদের চরানো হলো ওদের পেশা। ওরা ফসল কাটতে আসে কাংড়ায়, কুটিরশিল্পের কাজ নেয়, রূপার অলঙ্কার নির্মাণ করে, পশুর লোম থেকে পশমের গুটি বানায়। এসব ছাড়াও ওরা মজুরি করে যায় এদিকের নানা অঞ্চলে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে অন্যত্র। ওরা যায় জাস্কার আর ধবলাধার গিরিমালার ভিতর

দিয়ে লাহুল উপত্যকায়, কিংবা লাদাখ অথবা তিব্বত সীমানার পার্বত্য লোকে। ওরা ঠিক 'গুজর'দের মতো। বাধাবন্ধ কিছু নেই, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার ছাড়পত্রের তোয়াক্কা রাখে না। ওরা চিরকাল চেনে হিমালয়কে, রাষ্ট্রকে চেনে না। কোন্ দেশ থেকে কাদের শাসনদণ্ড খসে পড়লো, কোন্ রাষ্ট্রের কোন্ সীমানা, কোন্ রাজশক্তির কি পরিচয়,—ওরা তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাহাড়কে ওরা চেনে, চেনে শুধু দুস্তর পথের সন্ধান,—যেখানে সভ্যতার আনাগোনা কম। সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটতে থাকলে ওরা দেশ বদলায়, ঘরের খুঁটি উপড়ে নেয়, তল্পিতল্পা বেঁধে তুষারের গতি-প্রগতি লক্ষ্য করে ওরা দল বেঁধে চলতে থাকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। ওদের ওই যুগযুগান্তরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ পাহাড় অঞ্চলে জরীপ করতে লেগে যায় এবং মানচিত্র প্রস্তুত করে। ওরা ওই হিমালয়ের সংখ্যাতীত শাখাপ্রাশাখার মধ্যে শত সহস্র মাইলব্যাপী যে সকল ঊর্ণনাভের মতো জটিল পথ চিহ্নিত করে রেখেছে, তারই উপর দিয়ে চিরকাল ধরে অভিযাত্রীরা চলে। মুনিঋষি গিয়েছে, গিয়েছে দার্শনিক আর কবি, গিয়েছে তীর্থপথিক আর রাজভিখারীর দল,—গিয়েছে সবাই যুগ থেকে যুগান্তরে। ওদের পায়ের দাগ দেখে-দেখে এসেছে তাতার আর মোঙ্গল, এসেছে তুর্কী, ইরাণী আর পাঠান, এসেছে শক আর হুন,—এসেছে উত্তর তিব্বতের মরুলোক তাক্‌লা-মাকানের অগণ্য বিলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের প্রান্ত থেকে কত অনির্ণীত জাতির মানুষ। ওদেরই পায়ের দাগ পাহাড়ে-পাহাড়ে খুঁজে বের করে এসেছে ইয়ারখন্দি আর সমরখন্দির দল। ওরা শীতে কাঁপে, তুষারঝঞ্ঝার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, বরফের তলায় ওদের মুখের অন্ন আর কোলের শিশু চাপা পড়ে, পশুর লোমের অভাবে ওদের হাড়-চামড়া বেরিয়ে আসে, তুষারক্ষত দেখা দেয় সর্বাঙ্গে,—কিন্তু তবু ওরা চন্দ্রভাগা আর বিপাশার নীচে-নীচে ভারতের সুশ্যাম সমতলে নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার মধ্যে নামতে চায় না,—পাছে নিম্নলোকের বাতাবরণের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে। কিন্তু আবার ওই বরফের রাজ্যে শ্বেতচ্ছায়াময় মৃত্যুলোকে যখন নব-বসন্তের সংবাদ আসে, কোনও অচেনা রঙ্গীন পাখি যখন ঋতুরাজের বার্তা বহন করে হঠাৎ ডাক দিয়ে যায় নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে, দেবতাত্মার জটা শিথিল হয়ে নির্ঝরিণীরা দল বেঁধে নামতে থাকে,—একটি তৃণফলকের ডগায় যখন একটি কুঁড়ি বুকফাটা যন্ত্রণায় মাথা নাড়া দেয়,—তখন আসে ওদের জীবনে মিথুনলগ্ন। সুনীলনয়না ফেনবর্ণা কটাক্ষবতীরা আবার কানে তুলে নেয় ধাতব অলঙ্কার, রাশিকৃত কম্বল সরিয়ে কটিবাসখানি তুলে নেয় আপন মেখলায়, এবং পুরুষকে ডাক দিয়ে টেনে নেয় আপন স্বর্ণবক্ষের মরণশয্যায়। তারপর আবার দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ভিন্ন পথে।

শ্রীমতী গুপ্তা স্তব্ধ চক্ষে ওদের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। বাণগঙ্গা পেরিয়েছি একাধিকবার। দূরে কাংড়ার দুর্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যতদূর মনে পড়ছে, বেলা পড়ে এলো নাগরোটায় পৌঁছুতে। ছায়াবৃতা নাগরোটা,—তার ছায়ায় আর মায়ায় ছোট ছোট কবিতা যেন উচ্ছ্বসিত। এখান থেকে অরণ্যের সুরু,—এ অরণ্য চলে গেছে কাংড়ার প্রধান কেন্দ্র ধর্মশালা পেরিয়ে। চেয়ে দেখছি স্বপ্নের মতো,—এ পথ সৌন্দর্যপিপাসুর পক্ষে অমরাবতীর মতো। বহুবার মনে করেছি, যদি মৃত্যু হয় এই পথের কোথাও কোনও কোণে—সেই হবে আদর্শ মৃত্যু। কেউ জানবে না, বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ,—মৃত্যুর পক্ষে সেই হবে মহিমা। ওই অপরিচিত পৃথিবীর ওক্ আর পাইনবনের তলায়—যেখানে অন্তিম দিনমানের রক্তের আল্‌পনা আঁকা হচ্ছে বনকুসুমের রঙে রঙ মিলিয়ে,—পতঙ্গ

প্রজাপতির দৌত্যগিরির পথে-পথে। অপরিচয়ের মধ্যে মৃত্যু গৌরবের হয়ত নয়, কিন্তু আনন্দের। দেওদার বনের হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে সেই বিরহপ্রলাপ, ঝাউ-পাইনের শাখায়-শাখায় উচ্ছ্বসিত হবে তাদেরই পরমাত্মীয়ের বিচ্ছেদ-বেদনা! কেউ শুনবে না সেই মৃত্যুর ইতিহাস, কিন্তু তুষার-তিতির আর শৈলপারাবতের কণ্ঠে কণ্ঠে সেই বার্তা ধ্বনিত হবে; ধবলাধারের বিগলিত তুষারের শীর্ণ অশ্রুধারা নেমে আসবে ওই বাণগঙ্গায়! আমি ওদেরই অন্যজন। ওই যেখানে অবেলার করুণ ছায়া নেমেছে কান্নার মতো, যেখানে ঘুরে-ঘুরে গেল ঘূর্ণি হাওয়ারা, নীলপাখি উড়ে গেল অরণ্য সচকিত করে, ডাহুক যেখানে ওই শিসমের নিভৃত শাখায় বসে বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে, আর ওই যেখানে শ্লেটপাথরের ছাদের নীচে 'গদ্দি'রা তাদের অস্থায়ী গৃহস্থালী বসিয়েছে,—ওদের সকলের মধ্যে আমি! আমার মধ্যে ওরা বাসা বেঁধেছে চিরকাল। আমার শাখাপ্রশাখায়, শিরাউপশিরায়, অস্ত্রে-মন্ত্রে, শোণিতে-ধ্বনিতে, আমার অস্তিত্বে আর সত্তায়—ওদের চৈতন্য কাজ করে গেছে কাল-কালান্ত!

পালামপুরের চা-বাগান পেরিয়ে চলেছি। এবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের আনাগোনা, দোকানপাট আর কাজ কারবার। এক-একটি মানুষ,—যাদেরকে দেখছি দুজনে একান্ত অনিমেষচক্ষে, তারা যেন অনাদি-অনন্ত কৌতূহলের প্রতীক। ওরা যেন বহন করছে ধবলাধারের অনন্ত রহস্য, সমস্ত কাংড়ার বিস্ময় প্রকৃতি। বিরোধ কোথাও নেই, কিন্তু স্বচ্ছ আনন্দে মুখর। অদূরে একটি ছায়ানিভৃত জলাশয়ে একই সঙ্গে ফুটেছে শ্বেত ও রক্তপদ্ম। একটি 'গদ্দি' শ্রমিক মেয়ে ঘাটের ধারে লজ্জাবরণগুলি রেখে অবগাহন করে উঠে এলো। ভ্রূক্ষেপ করলো না কোনও দিকে, কিন্তু আপনাতে আপনি উৎফুল্ল। মাথা ডোবালো না, পাছে বেণী বিপর্যস্ত হয়। এমনি করে স্নানই ওদের সাধারণ রীতি। রাজস্থানে, কাশ্মীরে, গুজরাটে, গারোয়ালে, নেপালে,—যেখানেই শ্রমিক নারী, সেখানেই এই। একটিমাত্র মোটা পোশাক ওদের সম্বল,—সেটি জলে ভেজালে কোনোমতেই ওদের চলে না।

বহুদূর পর্যন্ত সমতল, তারপর পথ উঠেছে ধীরে ধীরে। সবুজ প্রান্তরকে বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। চোখ ছাড়া পেয়েছে। এবার দেখতে পাচ্ছি বহুদূর, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ধবলাধারের পাদভূমি। বন ও কান্তার ওরই কোলে গিয়ে মিশেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা জন্তু,—তুষারবাসী পার্বত্য চিতা, পিঙ্গল-কৃষ্ণ ভল্লুকের পাল এবং দাঁতাল হরিণ। ওখান থেকে নেমে আসে বনহংস,—পাথরের কোটরে যারা বাসা বাঁধে। আর আসে শৈলপারাবত আর পাহাড়ী মোরগ। আমাদের গাড়ি ঘুরে চলেছে অনেক দূর।

বন্যা এসেছিল কিছুদিন আগে ধবলাধারের পাঁজর থেকে। সেই বন্যায় ভাঙন ধরেছে যোগিন্দরনগরের রেলপথে, গ্রাম ভেসে গেছে, পাহাড় ধ্বসেছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ের বন্যা বিশ্বাসঘাতিনী। আগে থেকে নোটিশ নেই; হয়ত আকাশ জ্যোৎস্নাহসিত, তারকাখচিত; হয়ত বা দিনমানের নির্মেঘ আকাশে সূর্য জ্বলছে—এমন সময় হঠাৎ এলো বন্যা সর্বনাশা। এর কারণ, পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে পূর্বদিন, সে-খবর কেউ রাখেনি। সমস্ত পাহাড়ের ইতিহাস এই। বর্ষা নামেনি, কিন্তু বন্যায় বিধ্বস্ত হচ্ছে পাহাড়তলীর গ্রাম ও শহর। যেমন নেপাল থেকে নামে কোশীর বন্যা, ভূটান থেকে শঙ্খোস, সিকিম থেকে তিস্তা, পীরপাঞ্জাল থেকে বিতস্তা, কুমায়ুন তেকে সরযূ, তিব্বত থেকে ব্রহ্মপুত্র। এই সকল ভূভাগের ঠিক নীচের দিকে যারা থাকে, তারা চিরদিন তটস্থ। শুধু যে পর্বতপ্রমাণ জলের দেওয়াল নীচের দিকে ছুটে আসে তাই নয়,—ওদের সঙ্গে ভেসে আসে এক একটি গ্রাম,

বিরাটাকার পাথরের চাংড়া, হাজার-হাজার টন ওজনের পাহাড়ের ধ্বস, উন্মূলিত বড় বড় বৃক্ষ। ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই ভয়াবহ বজ্র-গর্জনের মধ্যে শোনা যায় নিরুপায় প্যান্থার আর ঐরাবতের অন্তিম ডাক, বাঘ আর ভল্লুকের কান্না, অজগর সাপের ঝাপট এবং তাদেরই সঙ্গে ভাসমান মানুষের বুকফাটা চিৎকার। কেউ বাঁচে না সেই বিভীষিকায়, কিন্তু যদি কোন কোন জন্তু সেই প্রকৃতির সাংঘাতিক তড়না থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়—তবে সে ক্ষিপ্তোন্মত্ত হয়ে নিকটবর্তী গ্রাম ও বস্তিকে আক্রমণ করে এবং নিরীহ গ্রামবাসীর উপরে প্রতিশোধ নেয়। সেই বন্যা যখন চলে যায়, এবং পার্বত্য প্রপাত যখন শান্ত হয়ে আসে, দেখা যায় শত শত বন্য জন্তুর গলিত বিকৃত মৃতদেহ স্রোতের পাথরের আশেপাশে ছড়ানো। হস্তী গণ্ডার ব্যাঘ্র ভল্লুক হরিণ,—কেউ বাদ যায়নি। তাদের সঙ্গে মেলানো আছে মানুষের আর অজগর ময়ালের শবদেহ। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভূটানের ভাঙনে প্রায় দুই হাজার বড় বড় জন্তু, মানুষ এবং সংখ্যাতীত সরীসৃপ বিনষ্ট হয়েছিল।

বৈজনাথে এসে পৌঁছলুম। তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয়নি।

বাজারের কাছে এসে বাস থামলো। পথের দুই পারে কয়েকটি সাধারণ দোকান, দুচারটি ব্যবসায়ীর গদী। শহরটি ছোট, এবং এই রাজপথটির বাইরে গেলে কয়েকঘর বসতি ছাড়া আর বিশেষ তেমন কিছু নেই।

অদূরে বৈজনাথের প্রাচীন মন্দির। কিন্তু মন্দির দর্শনের আগে আমরা মদনলাল ও সংবতীর খোঁজখবর করতে করতে মালপত্রসমেত ডাক বাংলায় এসে পৌঁছলুম। ডাক বাংলাটি হলো পাহাড়ের নিরিবিলি একটি কোণে। এটির স্থান নির্বাচনটি বড়ই মনোরম। বারান্দার ঠিক নীচে ক্ষীরগঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পার্বত্য নদী পাহাড়ে-পাহাড়ে মাথা কোটে, কিন্তু সে জানে না তার এই আঘাতে আর অপঘাতে কী অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে থাকে। এটি অনেকটা পাহাড়ের চূড়ার উপরে মালভূমির মতো। ক্ষীরগঙ্গা ঘুরেছে উত্তর থেকে পশ্চিম এবং অবশেষে দক্ষিণে। ওপারে একটি পাহাড়ের উচ্ছ শিখর এবং দূর পূর্বে গিরিশ্রেণীর গা দিয়ে চড়াই পথে উঠে গেছে মণ্ডিরাজ্যের সীমানা। কাংড়া উপত্যকা এখানেই প্রায় শেষ। এ অঞ্চল পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের সংযোগস্থল।

মালপত্র নামিয়ে কুলি যখন বিদায় নিল, লক্ষ্য করে দেখা গেল এই ডাকবাংলারই উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানা প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে। সম্ভবত কোনও রাজকর্মচারীর হবে। কিন্তু ওদিক থেকে কিছুমাত্র সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় চৌকিদার এসে দাঁড়ালো সেলাম ঠুকে। যেমন সর্বত্র, এখানেও তাই। বসবাসের বিলাস কলকাতার গ্রান্ড হোটেলের মতো। এই নিঃসঙ্গ এবং নিভৃতলোকে যারা এমন সুন্দর আবাসগৃহ বানিয়েছে, তাদের সুরুচি এবং সুবিবেচনার প্রশংসা করি। ঘরগুলির কোলে সুন্দর বারান্দা।

শ্রীমতী মায়া দেখে শুনে খুশী হলেন, এবং চৌকিদারকে যখন টিফিনের টেবল ও চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিল, তিনি বসে পড়ে বললেন, কাশ্মীরের চেয়ে কাংড়া কোনও অংশে কম নয়। সত্যি, চেয়ে দেখুন, এ জায়গাটা অবিকল পহলগাঁওর মতন। কিন্তু লোকজন একেবারে নেই। রাত্রে চৌকিদার থাকবে ত?

—তুম রহোগে রাতমে, ক্যা?

জি হাঁ!—চৌকিদার জবাব দিল।

মায়াদেবী চা ও জলযোগের অর্ডার দিলেন। লোকটা যাবার পর তিনি একবার উঠে ভিতর মহলে বসবাসের তদ্বির তদারক করতে গেলেন।

আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোনও কোনও পাহাড়ের উপরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছে। অদূরে এই মালভূমিরই প্রান্তে একদল ছেলে খেলা করছিল, আকাশের চেহারা দেখে তারা মাঠ ছেড়ে ঘরের দিকে রওনা হলো। বারান্দার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাগানের সেই ওদিকে মোটরখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। বাস্তবিক, পাহাড় ও নদীর ধারে এমন নিভৃত এবং নিঃসঙ্গ ডাকবাংলা খুব কমই দেখেছি। ওই খেলার মাঠের প্রান্তভাগে একটি সরুপথ এঁকে-বেঁকে বৈজনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছেছে। মেঘের চেহারা দেখে মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ আসছে না।

কিছুক্ষণ পরে মায়াদেবী ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন। উঠে ভিতরে গিয়ে চারিদিক দেখে শুনে আমি অবাক। মস্ত বড় হলঘর, সমস্ত মেঝে কার্পেটমোড়া। ঝকঝকে কয়েকখানা খাট এবং পরিচ্ছন্ন বিছানা। প্রত্যেকটি বড় বড় জানালায় মূল্যবান পর্দা উপর থেকে নীচের দিকে ঝুলছে। হল্-এর ভিতর দিয়ে সাহেবীসজ্জার বাথরুম, ড্রেসিং রুম, এপাশে পার্টিশানের গায়ে মস্ত ডিনার-টেবল, অনেকগুলি দামি চেয়ার, ওপাশে একটি আলমারিতে বিবিধপ্রকার কাচের বাসন ও চায়ের সরঞ্জাম, এধারে ওয়ার্ডরোব, ওখানে মস্ত আয়না, এদিকে আল্না, ম্যান্টলপিসের উপর সাজানো কয়েকটি পুতুল ও রঙীন কাঁচের ফুলদানি,—তার ঠিক নীচে ফায়ারপ্লেস। এমন পরিচ্ছন্ন নূতন ও সুসজ্জিত হলঘর দেখে মায়াদেবী একেবারে উৎফুল্ল। বললেন, এখান থেকে কিছুদিন নড়বার ইচ্ছে রইলো না। আপনি এক কাজ করুন না? গুপ্তসাহেবকে জরুরী টেলিগ্রাম করে দিন, উনি প্লেনে করে চলে আসুন।

হেসে বললুম, না, তামাসা নয়। যদি অনুমতি করেন, এখনই তার পাঠিয়ে দিই! পরশু দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবেন।

মায়াদেবী বললেন, বটে। তিনি যদি এ বছর ডিপার্ট্মেন্টাল্ পরীক্ষা না দেন তবে সে-ক্ষতি আমাকেই সইতে হবে। তার চেয়ে আশীর্বাদ করুন, তিনি যেন পরীক্ষায় পাস হন। ওইতেই তাঁর ভবিষ্যতের উন্নতি। ওই দিকেই আমি চেয়ে আছি।

প্রশ্ন করলুম, আপনাদের বিবাহ হয়েছে কতদিন?

বিয়ে! তা ধরুন, বছর পাঁচেক হতে চললো!

চৌকিদার চা ও টিফিন্ নিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। খেতে বসবার আগে তাকে আলোর ব্যবস্থা করতে বললুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে অল্প বয়সের একটি যুবক ও একটি বিবি এসেছে কিনা। চৌকিদার জানতে চাইলো, তাদের সঙ্গে একটি বাচ্চা আছে কি?

মায়াদেবী একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, হাঁ হাঁ, আছে। তারা কোথায় বলতে পারো?

চৌকিদার তার পার্বত্য হিন্দিভাষায় জানালো, তারা এই ডাকবাংলোতেই বিকেলে এসে উঠেছে আমাদের ঘণ্টা তিনেক আগে। তারা আছে ও-মহলে।

যাও, শিগগির ডেকে আনো!

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আমিই যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ চা তৈরী করুন।

ও-মহলের শেষ প্রান্তের ঘরে এসে উঠেছে মদনলাল আর সৎবতী। আমাকে দেখেই মদনলাল ছুটে এসে ওদের কায়দামতো হাঁটু ছুঁয়ে আদর জানালো। সৎবতী খাটের উপর পড়ে রয়েছে চোখ বুজে, বাচ্চা মেয়েটা নরম বিছানার আরাম পেয়ে হাত-পা নেড়ে মায়ের পাশে শুয়ে খেলা করছে। এ ঘরটি চমৎকার। বললুম, কি হয়েছে সৎবতীর?

কুচ নহি, দাদাজী। চক্কর লাগা। প্রেটলকা বু বরদাস্ত্ নহি কর শক্‌তা!

কাংড়ায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি কেন, একথার উত্তরে মদনলাল জানালো, পাঁচমিনিটের বেশী ওরা কাংড়ায় ছিল না, কারণ ওই মোটরবাস-স্টান্ডে একটু পরেই ওরা বৈজনাথের গাড়ি পেয়ে গেল। ওরা জ্বালামুখীর মন্দিরের মধ্যেও ঢোকেনি। শুনে অবাক হলুম। কিন্তু মদনলাল আমাকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিল, অত মন্দির-টন্দির দেখতে গেলে ভ্রমণ হয় না।

সংবতী শুয়ে রইলো, মদনলালকে নিয়ে এলুম শ্রীমতী গুপ্তার কাছে। ওকে দেখামাত্রই তিনি রাগে উত্তেজিত হলেন। উপযুক্ত ভাষায় সম্ভাষণ করে বললেন, তোর পেজোমি আমাদের মাথা ছাপিয়ে উঠেছে, মনে রাখিস মদনলাল!

উভয়েই সমবয়স্ক, সুতরাং মাস তিন চারের ঘনিষ্ঠতাব পর নিকট-সম্ভাষণটা সহজেই আসে। মদনলাল বহিনজীর কাছে একেবাবে কাঁচুমাচু। কিন্তু বহিনজীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল নিজের জন্যে। ছেলেটা অত লাজ-লজ্জা-মানসম্ভ্রমের ধার ধারে না। মায়াদেবী হাসলেন।

প্রশ্ন করলুম, যদি পথঘাট আর মন্দির-দেউল না দেখবে তবে ওই ছেলেমানুষ বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে এত এদেশ-ওদেশ করছ কেন?

মদনলাল বললে, দাদাজী, ঘোরাঘুরি ত হচ্ছে! 'এক আস্‌লি বাত হ্যায়, শুনিয়ে।'

কি বলো।

সে বললে, হাজার ছয়েক টাকা বাবাকে ঠকিয়ে পেয়েছিলুম,—!

বাবাকে ঠকিয়ে! মানে? বাক্স ভেঙেছিলে?

নেহি সাব,—মদনলাল বললে, বাবাকে লুকিয়ে বেশম স্টক্ করেছিলুম অনেক টাকার। 'বড়া এক শেঠসে কুচ প্রাইভেট খবর মিলা। পিতাজিকো মালুম নেহি থা।—ব্যাস, ঝট্‌সে তেরা হাজার রূপ্যা বিলাক্ মার্কেটসে নাফা মিল গিয়া।'—তখন বাবাকে জানালুম। তিনি হাজার টাকা বকশিস দিতে চাইলেন, আমি বেঁকে বসলুম,—আরো পাঁচ হাজার চাই! উন্‌কো সমঝা দিয়া কি আট হাজার রূপ্যা আপকা একদম ফোকট্‌সে আ গিয়া!

মায়াদেবী হেসেই খুন। শুধু একসময় মন্তব্য করলেন, পাজির পা ঝাড়া! শ্রীনগর আর পহলগাঁওয়ে থাকতে ও কি আমায় কম জ্বালিয়েছিল? অমন চমৎকার মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, একটু ওর দিকে নজর নেই। একেবারে হতভাগা!

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মায়াদেবী ও-মহলে গেলেন, এবং মিনিট পাঁচেক পরে সংবতীকে নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন। সংবতী লজ্জায় জড়োসড়ো। কাছে এসেই আমার হাঁটু ছুঁয়ে নমস্কার জানালো। মায়াদেবী বললেন, আমি যা সন্দেহ করেছিলুম ঠিক তাই। আপনার ধমকের ভয়ে তখন সংবতী চোখ বুজে পড়েছিল,—ঘুমোয়নি। জিজ্ঞেস করুন এই শ্রীমানকে, পেট্রলের গন্ধ-টন্ধ সব বানিয়ে বলেছে।

আমরা চারজনেই হেসে উঠলুম। একটি রুমালে বাঁধা কী যেন ছিল সংবতীর হাতে, সেটি আমার হাতে দিয়ে সংবতী বললে, আপকাবাস্তে কাংড়াসে মোল্‌কে লায়া।

খুলে দেখি কিসমিস। ব্যাপার কী?

মায়াদেবী বললেন, ব্রাহ্মণসন্তানের মুখবন্ধ করার চেষ্টা!

হেসে বললুম, আচ্ছা, ভয় পাবার দরকার নেই। ওখানে যে মেয়েকে একলা রেখে এলে?

বাচ্চা ঘুমিয়েছে।—সৎবতী হঠাৎ স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, ইন্‌কো কান পাকাড়কে কহিয়ে, দাদাজী—হিঁয়া ম্যায় দোদিন ঠহর যায়েঁ! পায়েরমে এৎনা দরদ মালুম হোতি হ্যায়।

মদনলাল ফস করে বললে, সমঝিয়ে কি মুঝেকো গালি দেতা হ্যায়! ফাল্‌তু বাত করেগা ত ফিন্ গাহানা ধর্ দেগা!

মায়াদেবী বললেন, সর্বনাশ, সৎবতীর হয়ে আমিই ক্ষমা চাইছি তোর কাছে, তুই গান ধরিসনে, মদনলাল।

হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো সন্ধ্যারাত্রির সেই নিঃসঙ্গ বারান্দা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবম্বিধ দ্বন্দ্ব-কলহ খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠছিল সন্দেহ নেই। মোট কথা, ওই ছয় হাজার টাকা খরচ না করে মদনলাল কিছুতেই জলন্ধরে ফিরবে না। প্রায় চার মাস সে ঘুরছে, এখনও নাকি তার কাছে ছয় সাতশো টাকা আছে। তার ভ্রমণকালের মধ্যে ওই কচি মেয়েটার বয়স বেড়ে উঠলো।

উৎসাহী মদনলাল তার জিনিসপত্র নিয়ে এ-মহলে উঠে এলো। শীত পড়েছে বেশ সন্ধ্যার পর থেকে। দেখতে দেখতে মিসেস গুপ্তা আর সৎবতী মিলে দিব্যি দুদিনের মতো ঘর গুছিয়ে তুললেন। মদনলাল এমন সব ভোজ্যবস্তুর ফরমাশ দিল ওই চৌকিদারকে ডেকে যে, পিত্রালয় হলে তাকে হয়ত বা জাতে ঠেলতো। সৎবতী ওসব খায় না, কিন্তু সে স্বামীকে সতর্ক করে রাখলো, ফের যদি আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করো তবে বাড়ি ফিরে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো,—বলে রাখলুম। বেতমিজ কাঁহাকা!

মদনলাল ওর মাথার লম্বা বেণীটা ধরে সকলের সামনে একবার টান দিয়ে পালিয়ে গেল। ওর কাণ্ড দেখে আমরা অবাক।

অনেক রাত্রে চৌকিদার ওরফে খানসামা ওরফে বাবুর্চি বাসনপত্রগুলি মেজেমুছে গুছিয়ে রেখে বিদায় নিয়ে গেল। ওরা সবাই যে যার নেয়ারের খাটিয়া আশ্রয় করে ঘুমিয়েছে। একটু আগে বৈজনাথের মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ থেমে গেছে। আজ আর মন্দিরে ঢোকা হলো না, কাল যথাসময়ে যাবো।

পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দজগৎ একেবারে স্তব্ধ। সামনের বড় পাহাড়টা দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে অতিকায় দানবের মতো। অমাবস্যার কাছাকাছি,—শুধু তারকারা জ্বল্‌ছে। সন্ধ্যার দিকে মেঘলা ছিল, এখন আকাশ পরিষ্কার। ক্ষীরগঙ্গা নীচে দিয়ে চলে গেছে অনেক দূর,—দুদিকের দুই অংশ তার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে,—অনেকটা যেন আমার অতীত ও ভবিষ্যতের মতো। বুঝতে পারা যাচ্ছে শক্তি এসেছে কমে, বয়স যাচ্ছে ফুরিয়ে। বাকি রয়ে গেছে এখনও অনেক পাহাড়,—অনেক স্বর্গ আজও দেখা হয়নি। ক্লান্ত পা টেনে-টেনে চলছি, কেমন যেন উপলব্ধি করছি, সময় এবার ফুরিয়ে এলো। অনেক বাকি রয়ে গেল, অনেক ক্ষুধার তৃপ্তি হলো না। পাথরের পাঁজরে-পাঁজরে আমার নিশ্বাস আর নৈরাশ্য ছুঁয়ে রইলো, চিরতুষারের প্রত্যেকটি ধবলশিখরে প্রণাম রেখে গেলুম,—ওরা মনের সামনে রয়ে গেল দেবসিংহাসনের মতো। একথা বলে যেতে পারবো, আমার পথহারা প্রাণ হারিয়ে গেছে হিমালয়ে বারম্বার। হারিয়ে গেছে কালী আর কর্ণালীর তীরে তীরে, শারদা-সরযূ আর অলকানন্দার কূলে-কূলে, বিষ্ণুগঙ্গা-মন্দাকিনী আর ভাগীরথীর তটে তটে। অমরাবতী থেকে সিন্ধু অরুণ থেকে সপ্তকোশী, নীলধারা থেকে নীলগঙ্গা, চন্দ্রভাগা থেকে রামগঙ্গা, আমার অণুপরমাণু ছড়িয়ে রইলো সকল হিমালয়ে। আগামীকালের যারা

তীর্থপথিক, যারা অভিযাত্রী, যারা মুমুক্ষু, যারা আত্মার অভিব্যক্তিলাভের ক্ষুধায় অস্থির হয়ে চলে এসেছে, যাদের দৃষ্টি চিরবিরহবেদনায় বিষণ্ণ, পরম পিপাসার জন্য সংসারের কোনও ক্ষেত্রে যারা মানানসই হয়নি,—তাদের জন্য রইলো আমার ওই চূর্ণবিচূর্ণ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ। তারা পদদলিত করে যাবে, এই আমার আনন্দ।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম ডাকবাংলার খেলাঘর ফেলে। ওরা আঘাত না পায় সেদিকে চোখ ছিল। ভয় ছিল মনে, পাছে আমার তিলমাত্র বিরক্তি প্রকাশ পায়। ঘরকন্নাটা অস্থায়ী বটে, এবং ওটায় আয়ু বড় জোর ছত্রিশ ঘণ্টামাত্র, কিন্তু ওটা বেমানান বলেই ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিলুম বুনো পাথরের গন্ধ, যে-গন্ধটা জড়িয়ে থাকে লতাগুল্মে আর চীড়-দেওদারের বনে, যেটা মিলিয়ে থাকে গিরিনদীর শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের তলায় তলায়,—সে-গন্ধ ডাকবাংলার ঘরের অজস্র তৈজসপত্রে আর বিলাসসামগ্রীর মধ্যে নেই।

ডাকবাংলাটি যারা নির্মাণ করেছে, তাদের সৌন্দর্যবোধ এবং সুরুচির তারিফ করি। এটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু একটি ত্রিকোণ পেয়েছে। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীরগঙ্গা, এবং ওপার দিয়ে এসেছে রেলপথ। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে প্রবল বন্যা নেমেছিল ক্ষীরগঙ্গা এবং বাণগঙ্গায়—তারই জলের ধাক্কায় ভেঙেছে পাহাড়ের গা এবং লোহার লাইন। ফলে, লাইন ঝুলছে উঁচুতে সঙ্কটজনকভাবে, গাড়ি চলাচল বন্ধ। এখান থেকে যোগিন্দরনগর নিকটেই। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল পনেরো হবে। যোগিন্দরনগর তার জল-বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য একপ্রকার পৃথিবীপ্রসিদ্ধ বলা চলে। ধবলাধার পর্বতের ভিতর থেকে বহুদূর বিস্তৃত সুড়ঙ্গপথ ধরে এই জল প্রায় আটহাজার ফুট পাহাড় থেকে সবেগে নীচে নেমে আসে। সেই জল থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির কাজ চলছে সর্বক্ষণ। 'উইল্' নামক একটি ভিন্নপথগামিনী নদীর থেকে এই জল নিত্য সরবরাহ হচ্ছে। এক শতদ্রু ভিন্ন হিমালয়ের বিশেষ অপর কোনও নদীকে নিয়ে এভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যোগিন্দরনগর এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

পাঠানকোট থেকে রেলপথটি পাহাড়পর্বতের উপত্যকা পেরিয়ে নদী ডিঙিয়ে এঁকেবেঁকে এসেছে যোগিন্দরনগর পর্যন্ত। কিন্তু এখানেই তার শেষ। মোটরপথ বরাবর এসেছে নাগরোটা পালামপুর বৈজনাথ হয়ে যোগিন্দরনগরে, এবং সেখান থেকে চলে গেছে দক্ষিণের মণ্ডিবাজারের দিকে। যারা দক্ষিণলোক হয়ে কুলু যাবার জন্য ঘুরে যেতে না চায়, তাদের জন্য একটি শর্টকাট এখানে আছে। কিন্তু এটি সুগম পথ নয়, এবং মোটর যায় না। পাহাড়ে যেমন সর্বত্র ঘোড়া, এখানেও তাই। তীর্থপথ হলে হেঁটে যেত অনেকে, কিন্তু এখানে সেকথা ওঠে না। পাহাড়ীলোকেরা হাঁটে, পর্যটকরা ঘোড়া নেয়। এই পথ ধরে যোগিন্দরনগর থেকে কুলু অর্থাৎ সুলতানপুর হলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল,—ঘোড়ায় গেলে দুদিনের কম হয় না। এই পথের মাঝখানে পড়ে ভাবুগিরিসঙ্কট,—সেখানে নয় হাজার ফুটেরও বেশী দুস্তর চড়াই পেরোতে হয়। চড়াই তখনই কষ্টকর, যখন সে হঠাৎ সামনে এসে হাজির হয়। যেমন খিলানমার্গ থেকে লাডাখের পথ কিংবা টানমার্গ থেকে গুলমার্গের চড়াই। ভাবুগিরিসঙ্কটের আগে আসে জাতিংরি, তারপর আরও মাইল বারো গেলে শীলভাদোয়ানী। শীলভাদোয়ানী থেকে ভাবুর চড়াই আরম্ভ। এখানে চারিদিক থেকে ধবলাধারের বিশাল চূড়ারা যেন বেষ্টন করতে থাকে। ওরই ভিতর দিয়ে পথও হারিয়ে যায়, মানুষও অদৃশ্য হয়। মাঝে মাঝে এমন নৈঃশব্দ্য যে, চমক লাগে; এমন অপার্থিব যে, হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। আমাদের অভ্যস্ত চক্ষু শহর-নগরে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, বড় জোর একটু

বন-বাগান, বা নদী-প্রান্তর। কিংবা ওরই মধ্যে একবার বিন্ধ্যাচল, অথবা একবারটি শিলং-দার্জিলিঙ। এখানে সে-রাজ্য নয়, এরা পৃথিবীকে চেনে ধবলাধারের উপত্যকায়, —তার বাইরে সভ্যতার সংবাদ কমই শুনেছে। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায় কোথাও থেমে নেই। মানুষ জানতে যায় এবং চিনতে চায় ওরই ভিতর দিয়ে,—অসাধ্য এবং দুস্তর বলে ফিরে আসে না। রেলপথ আজ পর্যন্ত হিমালয়ে পৌঁছেছে সমুদ্রসমতা থেকে আট হাজার ফুট পর্যন্ত, মোটরপথ প্রায় গেছে দশ হাজার ফুট অবধি,—কিন্তু প্রকৃত হিমালয় সেই সীমানা থেকে আরম্ভ। দার্জিলিঙের ঘুম, হিমাচলের শিমলা এবং কাশ্মীরের বানিহাল গিরিসঙ্কট,—রেলপথ এবং মোটর এদের উচ্চতা থেকে আর এগোয়নি।

শীলভাদোয়ানী থেকে কারেওন হিমালয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মানুষের চেহারা নতুন, নতুন ধরনের সাজসজ্জা, নরনারী অতিশয় সুশ্রী,—কিন্তু মুখের কাটুনিতে আসে মঙ্গোলীয় ধরনের ছাপ; এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের সংসারযাত্রার চেহারাও বদলাতে থাকে।

কারেওন থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উৎরাই পথে নেমে কুলু উপত্যকায় পৌঁছানো যায়।

বস্তি-বাসিন্দা বৈজনাথ শহরটিতে কম। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেলেই মানুষের বসতির সংখ্যা বেড়ে ওঠে। পাহাড়ীরা সমতল পেলে ভারি খুশী। সমতল পেলেই ওরা আগে বানায় মন্দির, একটি শিবস্থাপনা করে, তারপর পাথরের ডেলা সরিয়ে নরম মাটি বার করতে থাকে। এ কাজে মেয়ে-মরদ বালক-বালিকা—সকলের স্বার্থ সমান, সুতরাং কেউ বসে থাকে না। বলদ যদি না জোটে, নিজেরাই মাটি আঁচড়ায়; ঝরনা কাছাকাছি পেলে সেখান থেকে বিশেষ কৌশলে জল টেনে আনে,—তারপর শস্য ফলায়। পাহাড়ী ছাগল ওদের মাল বয়; ভেড়ার পাল পোষে,—তার লোম কেটে বানায় কম্বলের পোশাক। কিন্তু একটিমাত্র ভয় ওদের মনে জেগে থাকে, সেটি হলো বন্যার ভয়। সমতল ক্ষেত্রে বন্যা স্ফীতিলাভ করে, তখনই ওদের সর্বনাশ। বন্যা এলে ঘরকন্না ক্ষেতখামার সব ফেলে ওরা উঁচু পাহাড়ে গিয়ে ওঠে, এবং কখনও কখনও দেখা যায়, দিনে অথবা রাত্রে মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটি সম্পন্ন গৃহস্থ সর্বহারা হয়ে পথে বসেছে। তারপর চোখের জল মুছে আবার নতুন জীবনের সুরু। অদম্য উৎসাহে নরনারী আবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যায়।

আজ সন্ধ্যার পরে শীত পড়েছে বেশী। মদনলালের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন মিসেস গুপ্তা,—সারাদিন উনি নাকি হেঁটেছেন অনেক। সৎবতী বুঝি কোন্ রাস্তার ঢালু পথ বেয়ে ক্ষীরগঙ্গার ঠাণ্ডা জলে স্নান করে এসেছে তার ওই পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও। মদনলাল নাকি ওকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খানসামার হাত থেকে মুরগীর ডিমের অমলেট্ নিয়ে খেয়েছে। ব্রাহ্মণকন্যা সৎবতীর এবার জাত গেল! স্বামী একেবারে নাস্তিক। ও যেন আর কাছে না আসে।

সৎবতীর জন্য আমি সংগ্রহ করে আনলুম ফল, রুটি আর মালাই। তাই দেখে কী হাসাহাসি সকলের। ওরা কেউ বিশ্বাস করে না, আমি গার্হস্থ্যধর্মী। তাড়া করে এলেন মিসেস গুপ্তা,—এবার বুঝি কোমর বেঁধে প্রমাণ করবেন যে, আপনারও দয়াধর্ম আছে? কী সৌভাগ্য সৎবতীর!

সংবতীও তেমনি। তার হঠাৎ ধারণা হয়ে গেল, আমি একজন অতি শুদ্ধাচারী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। সুতরাং সকলের নাকের ওপর তুড়ি দিয়ে এসে আমার সামনেই খেতে বসে গেল। মেয়েটার মাথার উপর দিয়ে পরিহাসের ঝড় বইতে লাগলো। মদনলাল গিয়েছিল যোগিন্দরনগরের ওদিকে, সেখান থেকে আমার জন্য অতি মূল্যবান একটিন সিগারেট এনেছিল, এবার সেটি উপহার দিল। সিগারেট নিয়ে সহাস্যে শুধু বললুম, সাবধান করে দিচ্ছি, বৌকে আর জ্বালিয়ো না!

বৈজনাথের আশপাশ ঘুরে এসেছিলুম, কিন্তু রাত্রের দিকে শয়নাবতি দেখার আকর্ষণ ছিল। মদনলাল আর সংবতী ঘরে রইলো ওদের শিশুকন্যা রতনকে নিয়ে। মিসেস গুপ্তা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চললো।

মোটর রোড পর্যন্ত যেতে হয় না, মাঠের ও-প্রান্তে মন্দির। বাত এখনও নটা বাজেনি, কিন্তু এরই মধ্যে পাহাড়তলী নিঃঝুম। পার্বত্য জীবনযাত্রা সন্ধ্যার সঙ্গেই নিঃসাড় হয়ে আসে। মেঘ জমেছে আকাশে। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে এসে মন্দিরের চৌহদ্দিব মধ্যে ঢুকলো।

মন্দির দেখে এমন সম্ভ্রমবোধ জাগেনি অনেকদিন। আমি যা খুঁজে বেড়াই, এখানে ঠিক তাই। বজ্রেশ্বরী দেখে এসেছি, কিন্তু তাব গাঁথুনির চেহারা অনেকটা আধুনিক, তার সাজসজ্জায় হাল আমলের চিহ্ন। ছবি, ফটো, ঝাড়লণ্ঠন, মার্বেলপাথবের কাজ, এখানে ওখানে রংবাহার,—তাতে ছাপ পড়েছে মাড়োয়ারির। এখানে কিছু পৌঁছয়নি, একটি আলোও নয়। এমন দরিদ্র মন্দির সহসা চোখে পড়ে না; প্রাচীনের এমন বিশাল সৌন্দর্য বোধ করি সমগ্র পাঞ্জাবে কম। সামনেই বড় দেউড়ি,—সমস্তটাই প্রাচীন পাথরের। রংটা যেন ঘষা পয়সা। পাথবের সঙ্গে পাথরের জোড় আল্‌গা—ফাটল বেরিয়ে পড়েছে ভিতর থেকে। ধূপধূনাচন্দনের গন্ধ নয়,—গন্ধটা যেন প্রাগৈতিহাসিক,—যে-গন্ধটা পাথরে-পাথরে, বট-অশ্বত্থের শিকড়ে, আনগ্ন দারিদ্রভূষণ সন্ন্যাসীর ধুনি-জ্বালনে, মুনি-কি-রেতির তপোবনে, চীরবাসা ভৈরবের মহিষমর্দিনীব গুহাদেউলে,—যে-গন্ধ বারম্বার পেয়ে এসেছি।

ছমছমে অন্ধকার, কিছু ভালো দেখা যায় না। কিছু অস্পষ্ট, কিছু ছায়াচ্ছন্ন, কিছু বা অজ্ঞাত,—কিন্তু ওরই ভিতর দিয়ে বৈজনাথের বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। সামনেই পাথরের বিশালাকায় বলীবর্দ। কোলের কাছে নাটমন্দির, বিশাল উঁচু তার খিলান,—সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোনো সজ্জা নেই, অন্নবস্ত্র জোটে না বৈজনাথের, দান-ভিক্ষা কিছু মেলে না,—তিনি নিত্য উপবাসী।

শয়নারতির আয়োজন চলছে। দর্শনার্থীর সংখ্যা অতি কম। দুচারজন পাহাড়ী স্ত্রীলোক, এক-আধজন শ্রমিক, দু'একটি ভক্ত। পূজারী ঠাকুরকে সাজাচ্ছেন গর্ভমন্দিরে বসে।

স্থানীয় লোক বলে, দুহাজার বছর আগে মহারাজা বিক্রমাদিত্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দির হিমালয়ের প্রাচীনতম দেবস্থানের অন্যতম। কেউ বলে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মন্দির নির্মিত হয়। এর প্রকৃত নাম হলো বৈদ্যনাথ। ইনি শিবেরই প্রতীক্। পূজারী যিনি আরতির আয়োজন করছেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা নাকি তিনশো বছর আগে বাঙলাদেশ থেকে এসেছিলেন।

শ্রীমতী গুপ্তা গিয়ে বসলেন গর্ভমন্দিরের দরজার কোণে। তিনি পরেছিলেন চওড়া কালাপাড় শাড়ি, তারই আঁচল গলায় জড়িয়ে হাত জোড় করে বসলেন। তাঁকে যারা শ্রীনগরে এবং পহলগাঁওয়ে দেখেছে, তারা এই পূজারিণীর চেহারাটি দেখলে একটু অবাক

হয়ে যেত। আমার বিশ্বাস, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি শ্রদ্ধায় এবং অনুরাগে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তখন থেকে একটি কথাও তিনি বলেননি।

শঙ্খ, ধুনার পাত্র, কিছু ফুল এবং প্রদীপ—এই নিয়ে পূজারী আরতি করলেন। ধীরে ধীরে গুরুগুরু ডম্বরুধ্বনি করতে লাগলেন একজন সহকারী। দর্শনার্থী শান্ত, স্তব্ধমুখ। সেই ধ্বনিমহিমা গুরুগুরুরবে চলে যাচ্ছিল সমগ্র হিমালয় পেরিয়ে যেন মানবসংসারের দিকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। উনি বৈদ্যনাথ, নিরাময় করবেন ধন্বন্তরির আশীর্বাদে। ধিক্কৃত বিকলচিত্ত হিংসাশ্রয়ী বৃহত্তর যে-মানবসভ্যতা পাশব প্রকৃতিকে আজ খুঁচিয়ে তুলতে চাইছে,—এই আরতির বীজমন্ত্র ওই ডম্বরুধ্বনির সঙ্গে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে যাবে বৈদ্যনাথের আশীর্বাদ ও মঙ্গলবার্তা নিয়ে। মানুষের চিত্ত বিশুদ্ধ ও নির্মল হবে, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটবে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিলুম। আরতি শেষ হলো, কিংবা তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। এমন আত্মবিস্মৃতি সচরাচর ঘটে না। সবাই যেন বহুদূরে কোনও অজ্ঞতালোকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এবার যেন সবাই আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরে এলো। চেয়ে দেখি, শ্রীমতী গুপ্তা মন্দিরের পাথরের চৌকাঠে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করছেন দীর্ঘক্ষণ থেকে। সেই সহকারী ছোট পূজারীটি প্রদীপের পাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সকলের মাথায় অগ্নির তাপ বিতরণ করছেন। নতমস্তকে সবাই গ্রহণ করছে সেই তাপ। শ্রীমতী গুপ্তা তাঁর আঁচলের গেরো খুলে যা কিছু সঙ্গে এনেছিলেন, সবই প্রণামী দিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর চোখে মুখে যেন দীপ্তি ফুটেছে।

নগরের সভ্যতায় আমরা মানুষ। প্রতি পদে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর আবরণ টেনে বেড়াতে হয়। চলতি কাল নিত্যই তার পাওনা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফ্যাশনের সঙ্গে চলতে হচ্ছে, নিত্য নতুনের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রতিদিন নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে মানানসই করছি। হাসিমুখে কথা বলছি তার সঙ্গে, যাকে একেবারেই পছন্দ করিনে; দুঃখ জানাচ্ছি তার কাছে, যে-ব্যক্তি কপট। জয়গান গাচ্ছি এমন ব্যক্তির, যে অপদার্থ; তোষামোদ করছি তার, যাকে কুচক্রী বলে বিশ্বাস করি। নৈতিক আলোচনা করছি তারই সঙ্গে, যার লোভ এবং আসক্তি সুবিদিত। মেয়েদের বেলাতেও তাই। হীনতা জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে,—উপরে সরলতার আবরণ পড়েছে। কুরুচি এবং স্বভাবের বিকার পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ঢাকা। অহঙ্কার এবং আত্মাভিমানে জরোজরো,—উপরে মিষ্টমুখের পালিশ। যথার্থ পরিচয়কে লুকিয়ে রেখেছে সঙ্গোপনে, বাইরে প্রতিপদে প্রতারিত করছে পারিপার্শ্বিককে। একটু স্নেহ, একটু অনুরাগ, একটু রঙ্গীন কটাক্ষ,—এই সব ছোট ছোট উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করছে অনুগ্রহপ্রার্থীদেরকে, চাতুরীর দ্বারা কার্য হাসিল করছে; কিন্তু এদেরই নাম দেওয়া হচ্ছে সামাজিকতা। যে-যত আত্মগোপনশীল, সে নাকি ততই সামাজিক; যার প্রতারণা যত নিখুঁৎ সে নাকি ততই বুদ্ধিমতী। তথাকথিত সভ্যসমাজে সরলতা, সাধুতা, আড়ম্বরহীনতা, নিস্পৃহতা,—এরা পরিহাসের বস্তু। শ্রদ্ধা, অনুরাগ, স্নেহ, ভালোবাসা,—এদের বাজার-দর নেই। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম সেবা, অকৃপণ দাক্ষিণ্য,—এরা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। জীবনের এই সর্বনাশা বিকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যদি কেউ সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে, তাকে আমরা বলি, বাতুল। সে

আমাদের হাসি এবং উপেক্ষার পাত্র হয়ে ওঠে!

ফিরবার পথে শ্রীমতী গুপ্তা অভিভূতের মতো চলছিলেন। চৌকিদার যথারীতি আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে। তিনি একসময়ে বললেন, এমন ভাবে কোনও মন্দির কোনও দিন দেখিনি। ওঁব কাছে আজ রাত্রেই আমি চিঠি দেবো।

জবাব দিলুম না। সাড়া না পেয়ে মায়াদেবী আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার কেমন লাগলো?

এবার আর চুপ করে থাকা চলে না। বললুম, আপনি এত কষ্ট কবে এসেছেন, আপনার ভালো লেগেছে, এই আমার আনন্দ!

আমরা ডাকবাংলার বারান্দায় এসে উঠলুম। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি আমাদের মুখে চোখে লাগছিল। রাত এগারোটা।

মদনলাল এবং সৎবতী ওদের বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমিয়েছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, বিদেশ-বিভুঁয়ে দরজাটা বন্ধ করে শোয়নি। মদনলালের পাশেই আমার খাটিয়া পড়েছে। ক্লান্তি ছিল অনেক, সেজন্য আব কোনওদিকে না তাকিয়ে খাটিয়ায উঠে কম্বল মুড়ি দিলুম। লোটা হাতে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে মায়া চলে গেলেন পার্টিশনের ওদিকে, সৎবতীর খাটিয়ার পাশে। বুঝতে পাবা গেল তিনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। বৈজনাথ দর্শন করে তাঁর উদ্দীপনা বেড়ে গেছে।

কখন বৃষ্টি নেমেছিল মুষলধারায়, বুঝতে পাবিনি। প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, আকাশ মেঘমলিন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সকালে উঠেই বেবিয়ে পড়বাব কথা, কিন্তু মদনলালদের কোনও তাড়া নেই। আগের দিনের ব্যবস্থামতো ভোরে উঠে মায়া প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং আমার পক্ষেও আর অপেক্ষা করা চলবে না। বুঝতে পারা যাচ্ছে মদনলাল এবং সৎবতী এখানে দুচারদিন থেকে যেতে চায়। মুখ তুলে একসময়ে মদনলাল মায়াদেবীকে উদ্দেশ করে বললে, যায়েগা ত যায়েগা, ক্যা হায়? আরে, পহিলে চা পিয়ো ত সহি! এৎনা বারিষমে ক্যা,—মরনেকে লিযে যাতা হ্যায়?

চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া,—বকবক করিসনে!—মায়াদেবী তাকে ধমক দিলেন।

জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। চৌকিদারের কল্যাণে চা ও প্রাতরাশ ভাগ্যে জুটে গেল। এখানে মদনলাল তার বউকে নিয়ে রইলো। আগামীকাল ওরা যাবে মণ্ডি, সেখান থেকে কুলু। যদি ভাগ্যে থাকে, আবার দেখা হবে। এর পর পা ছোঁওয়া, প্রণাম ও কটূক্তি বিনিময়ের দ্বারা মায়াদেবীর সঙ্গে ওদের সহাস্য বিদায়সম্ভাষণ,—এতেও গেল মিনিট দশেক। আমরা চৌকিদারকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলুম। সৎবতী তার স্বভাবমধুর আলাপের দ্বারা বড় আনন্দ দিল।

বৃষ্টি কমেছে একটু, কিন্তু পড়ছে। ছাতা-বর্ষাতি কোনওটাই আমাদের নেই। ঠাণ্ডা পড়ে গেছে প্রচুর। এখন সকাল সাড়ে ছটা, সাতটায় মোটর বাস ছাড়বে। সুতরাং মদনলালের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হলো। চৌকিদার এবং কুলি দুজন সঙ্গে চললো।

সামনের মাঠ এবং ঝোপ-ঝাপড়ার পাশ কাটিয়ে যখন বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছলুম, তখন গাড়ি ছাড়তে আর মিনিট দশেক বাকি। ওরা মালের ওপর তেরপল চাপা দিল। আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম!—

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হিমাচলরাজ্য মণ্ডি

হিমাচল প্রদেশে আবার এসে প্রবেশ করলুম। বৈজনাথ ছেড়ে এলেই কাংড়া উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। হিমাচল প্রদেশ আরম্ভ হলো যোগিন্দরনগরের এলাকায়। একটি শিখর পেরিয়ে তার শিরদাঁড়াপথ ধরে নতুন রাজ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম। বর্ষামেঘের ফাঁকে ফাঁকে এবার আকাশের নীলাভ দেখছি।

বর্ষায় আর শরতের মেলানো পার্বত্যলোক। প্রভাতের কোমল রৌদ্রের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির ঝালর, রামধনুর রঙ্গীন ঝিলিমিলি। উত্তর থেকে দক্ষিণে আমাদের গতি। পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো ধবলধারের তুষারশুভ্র চূড়া,—মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো। কানামেঘের বৃষ্টির ঝাপট লাগছে আমাদের মুখে চোখে,—এলায়িতকুন্তলা রমণীর ঝুরুঝুরু ভিজাচুলের রাশি যেন বুলিয়ে যাচ্ছে মুখে চোখে। প্রকৃতির এই পরিহাসের সংবাদ পেয়েছে পাখিসমাজ, তারা ওই রৌদ্র-বৃষ্টির খেলার মধ্যেও ডাক দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে হিমালয়ব্যাপী বিশাল শরৎবন্দনাসভায়।

বনচ্ছায়ার পাশ দিয়ে নির্ঝরিণীরা নেমে যাচ্ছে পাহাড়তলীর দিকে,—যেদিকে এখনও ছমছমে ছায়া রয়েছে দেওদারের বনে-বনে; যেখানকার সংসারযাত্রা এখনও তন্দ্রাজড়ানো। আমাদের গাড়ি চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশ উপর দিকেই চলেছে।

গত কয়েকদিন খররৌদ্র ছিল কাংড়া উপত্যকায়। বৈজনাথ থেকে পেয়েছি স্নিগ্ধতা। কাংড়ার বনকান্তারের নিভৃত নিকুঞ্জে যেন কুসুমশয্যা রচনা করেছিলুম, কিন্তু সেখানে বাতাস ছিল অবরুদ্ধ,—সেজন্য ওখানকার বিহ্বল প্রকৃতির বাসকশয্যায় দরদর ঘাম ঝরেছিল কপাল বেয়ে, নিবিড় তৃপ্তির মাদকতা লাগেনি দুই চোখে। এখানে এলো অন্য চেহারা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রভাতকালেই আসছিল দুই চোখে সুখের তন্দ্রা,—গত রজনীর ক্লান্তিশেষের মধুর অবসাদের মতো।

হিমালয় তার অন্তঃপুরের দ্বার খুলে দিচ্ছে ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিপথে। সেখানে তার প্রাণের ভাষা আছে গোপনে,—পরমাত্মীয় এসে না দাঁড়ালে সেই ভাষা অপর কারো কানে-কানে বলা চলে না। আমরা সেই পথে চললুম, যেটি তার গহনলোক, যেখানে বিপাশা নদীর তীরে নিভৃত শিলাসনে বসে চিরবৈরাগী ভারত আপন জপের মালায় বীজমন্ত্র পাঠ করছে। জরা, জন্ম, ও জাতকের অতীত যে-ভারত—যার আবহমানকালের ইতিহাসের প্রতিটি পর্ব প্রতি রুদ্রাক্ষদানার জপের সঙ্গে ফিরে-ফিরে চলেছে। এবারে আকাশ তার নির্মল নীল শোভা বিস্তার করেছে। উপত্যকায় নেমে এসেছে রঙ্গীন পাখিরা,—যাদেরকে সচরাচর চোখে পড়ে না সমতল ভারতে।

ভারতের মানচিত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছে হিমাচল প্রদেশের এলোমেলো সীমানায়। স্বাধীন ভারতে এ প্রদেশটি নতুন, এখনও এর শৈশব কাটেনি। কিন্তু এর মর্মে মর্মে এসে প্রবেশ করেছে পাঞ্জাব; এবং এর সীমানির্দেশ করতে গেলে পাঞ্জাবের মধ্যে ভ্রমণ করে বেড়াতে হয়। একটি অঞ্চল আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন। একটির ছিট্‌মহল আরেকটির

কোলে প্রবেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে ভৌমিক সংলগ্নতা নেই। কুলু উপত্যকা পাঞ্জাবের অন্তর্গত, কিন্তু হিমাচলের এক অংশ থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে না গেলে কুলু পৌঁছনো যায় না। চাম্বা এবং ডালহাউসী হলো হিমাচলের অন্তর্গত, কিন্তু ডালহাউসী আজও কেন পাঞ্জাবের শাসনাধীন, এর জবাব কেউ দিতে চায় না। তবে এর কৈফিয়ৎ সম্প্রতি একটি পাওয়া গেছে। গল্পটা অবশ্য সেই পুরনো আমলের। পাঠান, তাতার এবং মোগলদের সঙ্গে রাজপুতনা কোনদিন পুরোপুরি হাত মেলাতে পারেনি। এর ওপর ছিল আবার রাজস্থানীদের ঘরোয়া বিবাদ। কেউ কারো প্রাধান্য সইতো না, কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করতো না। অসমসাহসিক বীর্যবত্তা এবং মহৎ আত্মত্যাগে রাজপুতনার ইতিহাস যেমন গৌরবগর্বিত,—অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ, স্বজাতিদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং আত্মঘাতী অদূরদর্শিতাতেও সেই ইতিহাস কলঙ্কমসীলিপ্ত। এদের মধ্যে যারা ছিল অনেকটা নির্বিরোধ এবং স্বকীয়তাসম্পন্ন,—তারা তাদের ধনরত্নসম্ভার, আত্মীয়পরিবারবর্গ এবং লোকলস্কর নিয়ে একে একে চলে যায় হিমালয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা পার্বত্য আদিম অধিবাসীগণের সঙ্গে হাত মিলোয় এবং এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক পাঠান এবং মোগলরাজশক্তি ওদেব নিয়ে তেমন আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, কারণ ততদিনে মুসলমানশক্তি সমতল ভূভাগে যতখানি আধিপত্য পেয়েছিল, ততখানিকেই তাদের বিনামূল্যের লাভ বলে মনে করেছিল। যাই হোক, রাজপুতরা হিমালযে গিয়ে ক্রমে ক্রমে কুড়ি পঁচিশটি বাজ্য সৃষ্টি করে এবং পাঞ্জাবী রাজ্যগুলির সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব রেখে পাশাপাশি বাস কবতে থাকে। বিশাল এক একটি পর্বত এবং তৎসংলগ্ন এলাকা উভযের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের এই সমুদয় পার্বত্য অঞ্চল এবং রাজপুতনার উত্তর, উত্তবপূর্ব, উত্তরপশ্চিম এবং পশ্চিম,—এই বিরাট ভূভাগ এই সেদিন অবধি অখণ্ড ও অবিভক্ত পাঞ্জাবেব অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতস্বাধীনতার সঙ্গে সমগ্র পাঞ্জাব প্রকাশ্যত চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিম পাঞ্জাব যায় পাকিস্তানে, এবং ভারতের অধীনে আসে বাকি তিন ভাগ। একটি পূর্বপাঞ্জাব, একটি হলো পেপসু, এবং তৃতীয়টি হলো হিমাচল প্রদেশ। পূর্বপাঞ্জাব এবং পেপসু হলো হিন্দু-শিখপ্রধান, হিমাচল প্রদেশ হলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় রাজপুত প্রধান। এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশে মিলেছে নানা পার্বত্য সম্প্রদায়। এই প্রদেশে সমতলভূভাগ একেবারে নেই বললেই চলে, এবং এটি প্রধানত উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত। এই পার্বত্য প্রদেশটির ভিতর দিয়ে পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদী প্রবাহিত,—শতদ্রু বিপাশা এবং ইবাবতী। উত্তবে ইরাবতী, দক্ষিণে শতদ্রু, মধ্যভূভাগে প্রবাহিত বিপাশা। আমরা বিপাশাব দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। বন্য শতদ্রুকে ছেড়ে এসেছি একদা কিন্নর ও বুশাহর রাজ্যে।

ছোট ছোট বস্তি পার হয়ে যাচ্ছি। কোনওটা উঁচুতে, কোনওটা বা অনেক নীচে। জানতে পাচ্ছিনে ওদেব সুখদুঃখ, ওদের ঘরকন্নার ইতিহাস। পায়ে হাঁটলে তবেই পর্যটন, নইলে ছবি দেখে যাওয়া হয় মাত্র,—জীবনদর্শন ঘটে না। যারা বিমানে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে,—তাদের প্রশ্ন করো, কিচ্ছু জানা যাবে না। পৃথিবী তাদের জন্য, যারা হাঁটতে হাঁটতে প্রতি পদক্ষেপ গুনেছে। মানুষের কাছে গিয়ে তারা বসেছে, আতিথ্য নিয়েছে, মন মিলিয়েছে, হাসিকান্নায় ব্যথা বেদনায় অংশ গ্রহণ করেছে। অতিথিকে নারায়ণ বলেছি তখন, যখন সে সেবা করেছে, আনন্দের প্রদীপ তুলে ধরেছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, চোখের জল মুছে নিয়েছে। সে নারায়ণ, কেননা সে নিঃস্বার্থ, সে নিরপেক্ষ।

পর্যটক হয় তীর্থপথিক, যখন সে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। যে-ব্যক্তি তীর্থের পর তীর্থ পায়ে হেঁটে পর্যটন করে তাকে আমরা বলি, পুণ্যাত্মা। তার পায়ে যে শুধু তীর্থধূলি লেগে থাকে তা নয়, সেই ধূলির মধ্যে মিলিয়ে থাকে মানুষের ইতিহাস,—দুঃখের, ঝড়ের, সঙ্কটের দারুণের ইতিবৃত্ত; সেই ধূলির মধ্যে পাওয়া যায় ছোট ছোট মানবতা, ছোট ছোট মহত্ত্ব আর হৃদয়ানুরাগ, আত্মোপলব্ধি এবং দিব্যজ্ঞানের ছোট ছোট বিস্ময়াবিষ্কার। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যে-পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়, সে হলো মুষ্টিভিক্ষার ঝুলি, উপুর করলেই তার শেষ হয়। কিন্তু অন্তর দিয়ে যা দেখেছি পায়ে-হাঁটা পথের দুই প্রান্তে,—সেই ত পরম দর্শন, দরিদ্র দিনশ্রমিকের ঘরে বিদুরের অন্নগ্রহণকালে চারিদিকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যা জেনেছি, সেই ত পরম জ্ঞান। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখেছি আমরা, জীবের মধ্যে দেখেছি শিব, নরের মধ্যে নারায়ণ। ধর্মার্থের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে উপলব্ধির কথা। বস্তুকে সত্য বলে জানি, তাই বস্তুর ভিতর দিয়ে বিশেষ উপলব্ধির মধ্যে পৌঁছতে চাই। মাটির পুতুল সরস্বতী, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে জ্ঞান ও বিদ্যার উপলব্ধি। ঐশ্বর্যকে লাভ করি,—লক্ষ্মী থাকেন আমাদের কল্পনায়। ঋষিকে দর্শন করি,—অনুভব করি দর্শনতত্ত্বকে। মানুষের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তার সংস্পর্শে আসি, তাই ঈশ্বরকে কল্পনায় আনি। বস্তুকে ধারণ করি, ধারণ করি আকারকে,—তার ভিতর দিয়ে পৌঁছতে চাই বিশেষ লক্ষ্যে। জানাটাকেই সঠিক জ্ঞান বলে না,—উপলব্ধ সত্য হলো জ্ঞান।

মানুষকে ফেলে যাচ্ছি পিছনে, তাই পদে পদে বঞ্চিত বোধ করছি। জানতে এসেছি হিমালয়কে, কিন্তু মানুষকে জানা হচ্ছে না। এই চীড়বনের তলায় আসন পাতো, কিংবা ওই জাম্ববনের ওপাশে যেখানে প্রস্তরজটলার ভিতর দিয়ে নেমে চলেছে গিরিপ্রপাত,—ওখানে আসন বিছিয়ে পড়ে থাকো বাকি জীবন,—দেখে নাও এই হিমালয়ের জীবনধারা। একটি শিশু-বালক দাঁড়িয়ে গেছে থমকিয়ে পথের ধারে, দেখে নাও ওর চোখে হিমালয়ের পরম বিস্ময়। কাঠুরিয়া চলেছে মাথায় তার বোঝা নিয়ে, দেখে নাও অরণ্যের আশ্চর্য রহস্য। একটি আত্ম-অচেতন পাহাড়ী মেয়ে যৌবনসম্রাজ্ঞীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে,—ওর মধ্যে হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্যসম্ভার আবিষ্কার করে নাও। ডালিম আর আপেলের বনের উচ্ছ্বসিত রক্তিম প্রগল্‌ভতা যেন এসে ওর গণ্ডে গ্রীবায় ললাটে অধরে আপন স্পর্শ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু কী জীবনযাত্রা ওদের পিছনে। কতটুকু সীমা, কতটুকু বা প্রয়োজনের জগৎ! পাথরখণ্ড একটি একটি সাজিয়ে তারই দেওয়াল, স্লেট্ পাথরের ছাদ, মাটির হাঁড়ি, লোহার বাসন, কম্বলের সজ্জা, আগাছার দড়ি-পাকানো চারপাই, দু একটি টুক্‌রির মধ্যে খাদ্যের দানা, পুঁটুলির মধ্যে ভেলিগুড়, ভাঁড়ের মধ্যে নুন, লোহার গাঘরায় পানীয় জল। ওরই মধ্যে চিরদরিদ্রা রাজকন্যার গৃহস্থালী, ওরই মধ্যে সর্বহারা রাজশিশুর জন্ম। এক টুক্‌রো ক্ষেত, দু তিনটি গরু মহিষ, পাঁচ সাতটি ভেড়া, গৃহপালিত একটি কুকুর, গোটা দুই-চার মুরগী, দু'একটি পোষা তিতির,—এরাও মিলে রয়েছে ওদের সঙ্গে। সুখী সেই পরিবার,—মালভূমির উপরে যাদের ক্ষেত-খামার,—যেখানে বন্যার ভয় নেই, সর্বনাশের আশঙ্কা নেই। যারা পাহাড়ের নীচের দিকে থাকে,—নিত্য উৎকণ্ঠায় তাদের দিন কাটে। এখানে পথের ধারে কেউ বা দিয়েছে ছোট একটি দোকান—যারা ওরই মধ্যে একটু সম্পন্ন গৃহস্থ। ছোলার বরপির একটি পাত্র,—তার উপর বসেছে অসংখ্য রঙ্গীন বোল্‌তা, কিংবা মাটির সরায় কয়েকটি শুক্‌নো প্যাঁড়া,—যার রস টেনে শুষে নিয়েছে পতঙ্গের দল। কড়াইতে মহিষের দুধ জ্বাল দিচ্ছে

ঘরের মধ্যে বসে কাজলনয়না গৃহস্থবধূ,—কাঠের তাড়ু ঘোরাচ্ছে ক্ষীরের পাকে-পাকে,—ওর থেকে প্রস্তুত হবে কালাকাঁদ। গৃহপালিত মার্জার পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আছে বধূর চরণপদ্মে আপন গা ছুঁইয়ে—সেই পা দুখানি মেহেদি পাতার রসে রঙ্গীন। সংসার এখানে মন্থরগতি, কর্মচক্রের ঘর্ঘরতা কোথাও নেই। শান্ত নিরিবিলি নিষ্কম্প পাহাড়ী জীবন,—উদ্দামতার চিহ্ন দেখিনে কোথাও। এখানে লোভের পিছনে মদমত্ত মানুষ ছোটে না, দ্রুতগতির দ্বারা কেউ উর্ধ্বশ্বাস নয়। ধান, গম ও যবের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি চা-বাগানের টুক্‌রো, কোথাও বা আলু বা আখের চাষ। একদিকে খদ, অন্যদিকে মালভূমি। দূরে উত্তুঙ্গ ধবলাধার,—তার কোলের কাছে শিশুপাহাড়-সম্প্রদায়।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের আর অরণ্যের ছায়া পড়ছে সেই গিরিসঙ্কটে। যেখানে ছায়া, সেখানেই শীতল বাতাস। সেই ছায়া-ছমছমে জঙ্গল-জটলার মধ্যে ঝিল্লীর ডাক বেড়ে ওঠে। ওরা তারস্বরে ডাকছে রাত্রিকে, ঘনতমসাচ্ছন্ন রজনী ওদের প্রিয়। কাঁচা ডালিম আর কমলার গন্ধ পেয়ে ছুটেছে পতঙ্গের পাল। প্রজাপতিরা কিছু বিমর্ষ, ফুল ঝরে গেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে,—ওদের পাখার বিচিত্র বর্ণে তারই বেদনার রং জড়ানো। ধবলাধারের তলা দিয়ে আসে নীলগাই আর তুষারচিতা, অজগর আসে কাংড়ার অরণ্য পেরিয়ে, কুলুর ওপার থেকে আসে তিব্বতী পীতাভ ভালুক, আলুর ক্ষেতে ঘুরে যায় বন্য শূকর।

আমাদের গাড়ি ছুটেছে অনেক দূর। এই গাড়ি সারাদিনে দুবার আনাগোনা করে। পাহাড়ে-পাহাড়ে এইটি হলো আধুনিক সভ্যতার সংবাদ। বিচিত্র সামগ্রী মাঝে মাঝে এসে পাহাড়ীদের কাছে পৌঁছয়, সেই সব মনোহারী সামগ্রীসম্ভার পাহাড়ী গৃহস্থের চোখে বিস্ময় আনে। এই একটিমাত্র পথ,—এর বাইরে শত শত মাইলের মধ্যে অপর কোনও প্রকার যান্ত্রিক যান-বাহন নেই। সেই কারণে সভ্যতার স্বাদ ওরা পায় না, যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন ওদের কাছে পৌঁছয় না। হাট বসে ওদের পার্বত্য কোনও কোনও গ্রামে, সেই হাটে ফল কিনতে আসে দূরের মহাজন, সেই ফল সমতলে চালান যায়। ওই হাটেই বিক্রি হয় জন্তুর আর সরীসৃপের ছাল, পিতল অথবা রূপার অলঙ্কার, বিভিন্ন ওষধি শিকড়, হাড়ের অথবা রঙ্গীন পাথরের মালা, লোহার বিবিধ অস্ত্র, ভেড়ার লোমের টুপি—কিংবা মখমলের, তুলোর জামা, টিনমোড়া আয়না, কাঠের চিরুনী, আর হয়ত নাম্‌দা। আশ্চর্য, মেটে সিঁদুর ওখানে বিক্রি হয়, কিংবা রাঙ্গা রুলি আর আল্‌তা। ওরা শিবের পাশে শক্তিকে বসায়, রামের পাশে সীতা, বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী। সর্বাপেক্ষা পূজ্য সংহাররূপিণী মহাকালী। জন্তু আর পাখির মাংসে ওদের অরুচি নেই। ওরা সর্বপ্রধান উৎসব পালন করে দুর্গাপূজায় দশমীর দিনে—যেটাকে ওরা নাম দিয়েছে 'দশহরা'। সেদিন সমগ্র হিমাচল প্রদেশের প্রধান পাঁচটি জনপদ,—মণ্ডি, চাম্বা, মাহাসু, শিরমুর ও নবসংযুক্ত বিলাসপুর,—এরা আনন্দে উদ্দীপনায় কর্মতৎপরতায় এবং প্রাচুর্যে নৃত্য করতে থাকে।

হঠাৎ চমক ভাঙলো,—মিসেস গুপ্তা মাথা তুললেন। পেট্রলের গন্ধ এবং চড়াই-উৎরাই পথের বাঁক—এতে তাঁর মাথা ঘোরে এবং অসুস্থ বোধ করেন। এতক্ষণ তিনি মাথা নীচু করে চোখ বুজে ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আর কত দেরি?

গাড়ি তখন উৎরাই পথে নামছে। বললুম, প্রায় এসে গেছি।

তাঁর চোখে ঘুমের ভাব ছিল,—গত কয়েকদিনের পথের ক্লান্তি ত ছিলই। বললুম, আকাট শুক্‌নো মানুষের পাল্লায় পড়ে আপনাকে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে। মণ্ডিতে পৌঁছে

কি খাবেন বলুন? খাওয়ার গল্প এখন ভালো লাগছে।

হাসিমুখে তিনি বললেন, অর্থাৎ ক্ষিধে পেয়েছে আপনার। চলুন, আমিই আপনাকে আজ খাওয়াবো। একটা সুবিধে এই, আপনার খাওয়ার কোনও বাছ-বিচার নেই।

তাই বলে এই ঠাণ্ডা দেশে ডাঁটাচচ্চড়ির খোঁজ করতে আমি রাজি নই।

তিনি খুব হাসলেন।

বিপাশা নদীর দিকে নেমে চলেছি। ওপারের পাহাড়ের কোলে কোলে পাকাবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট বাসা,—ছোট ছোট স্বর্গ। এখানে ওখানে পায়ে-চলা পথ চলে গেছে,—কোথায় গেছে, কোনওদিন তাদের ঠিকানা জানা যায়নি। আমরা মুখ বাড়িয়ে সবটা দেখছি উৎসুক চোখে। কোনও অভ্যাগত কিংবা পর্যটক আশা করে না, এখানে শহর পাওয়া যাবে। হিমালয়ের এমন জটিল গহনলোকে এসে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে, বোধ হয় হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। সভ্যতার মেলা বসেছে জগৎ জুড়ে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চন্দ্রলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, দশ হাজার মাইল দূরের মানুষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আণবিক এবং অস্ত্রযান বোমা পৃথিবীর বায়ু, বৃষ্টি, আবহ-স্বভাব ও শীতাতপকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে—এ সকল খবর এদিকে কেউ জানে না। কিন্তু আমাদেরই ভুল। ওই বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ গৌরীশৃঙ্গের চূড়ায় উঠে নিশ্বাস নিতে পেরেছে, নিশ্চিত মৃত্যুকে পরিহার করেছে, সুমেরু প্রদেশে সভ্যতার স্বাদ পৌঁছে দিয়েছে,—সুতরাং এখানেও সেই জগৎজোড়া আধুনিকের ছিটেফোঁটা ঠিক্‌রে আসবে বৈ কি। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছিলুম, শহর আসছে।

গাড়ি নেমে এলো উৎরাই পথে। একটি বাঁক পেরিয়ে পাওয়া গেল বিপাশা নদীর সাঁকো। অনেক নীচে বিপাশার গৈরিক স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাস তুলে আবর্ত রচনা করে চলেছে। দেখলে ভয় করে। আমাদের গাড়ি সাঁকোর উপরে উঠলো। এটি সেই একই ডিজাইনের সাঁকো,—ক্যান্‌টিলিভার ব্রীজ। দুই দিক থেকে পাহাড়ের দেওয়াল নিয়ে লোহার কাছি দিয়ে টানা। এটি নিরাপদ ওই কাছিগুলির জন্য। নীচের দিকে এর ভিত্তি থাকে না, কারণ পার্বত্য স্রোতের প্রচণ্ড ধাক্কা ভিত্তিকে চূর্ণ করে দেয়। এই সাঁকো হিমালয়ে অসংখ্য। তিস্তায়, রংগীতে, লছমনঝুলায়, বিষ্ণুগঙ্গায়, ইরাবতীতে,—আরও নানান্ অঞ্চলে।

নদী পার হয়ে আমাদের মোটরবাস মণ্ডির মস্ত শহরে এসে প্রবেশ করলো,—শহর একটু দূরে। এপারে ওপারে বিশাল পাহাড়ের প্রাকার। বৃহতের দিকে তাকালে মানুষের সমস্ত কীর্তিকে অতি ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে। চারিদিকের এই বিরাট পটভূমিতে মণ্ডি শহর দাঁড়িয়ে। অজানা থেকে অজানায় এসে পৌঁছলুম।

সামনেই চতুষ্কোণবিশিষ্ট ক্লক-টাওয়ার। সেখানে সময় নির্দেশ করছে, বেলা সাড়ে নটা বেজে গেছে। কিন্তু উপরদিকে কানমোড়া ওই চতুষ্কোণ গম্বুজটির প্রথম প্রবেশপথে মণ্ডির পরিচয় বহন করছে। আমরা এসেছি উত্তর হিমালয়ের প্রান্তে,—যেখানে তিব্বতী স্থাপত্যের প্রকৃতি স্পর্শ করেছে। পশ্চিম তিব্বতের প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছে ভারতীয় মেজাজ নিয়ে। যেমন উত্তর কুমায়ুনে, সিকিম-ভূটানে, দার্জিলিং-কালিম্পঙে, পূর্ব ও উত্তর কাশ্মীরে এবং উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে। নেপালে এই স্থাপত্যের আদর্শ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এমন কি কাশীর গঙ্গার কূলে সেই ছোট্ট পশুপতিনাথের মন্দিরটিও এই গঠনতন্ত্রকে ধারণ করে রয়েছে। সমগ্র উত্তর হিমালয়ে তিব্বতী ও মঙ্গোল স্থাপত্যের প্রভাব অতি প্রবল।

শহর-বাজার জনবহুল। সমতল পথ-ঘাট রৌদ্রঝলোমলো। নানা পথ চলে গেছে নানান্‌দিকে। ডাকবাংলা এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে, সুতরাং আমাদের পক্ষে একটি ভদ্র হোটেলে পাওয়া দরকার। কুলির মাথায় লট্‌বহর চাপিয়ে আমরা একখানা টাঙ্গা ভাড়া করলুম। সহসা শ্রীমতী গুপ্তা কলরব করে উঠলেন, কই, আপনি যে বলেছিলেন, আমাকে শশা খাওয়াবেন? এই দেখুন, একেবারে এক ঝুড়ি শশা নিয়ে বসেছে! কিনুন, কিনুন—

শশা কেনা হলো সোৎসাহে। তিনি সহাস্যে বললেন, এটির দিকে তাকাবেন না! যদি আপনার আর্থিক সঙ্গতি থাকে, আরেকটি কিনতে পারেন।

তিনি না হাসিয়ে আর ছাড়লেন না। দু'আনায় দুটি মস্ত শশা কেনা হলো। কিন্তু খোসা ছাড়াবার মতো সময় শ্রীমতী গুপ্তার হাতে ছিল না!

টাঙ্গা চললো দোকান বাজার এবং জনতার ভিতর দিয়ে হোটেলের দিকে। তিনি কথায়-কথায় মদনলাল এবং সৎবতীর মুণ্ডপাত করছিলেন। কাছেই একটি প্রান্তর ও খেলার মাঠ। পথের এদিকটায় মহাজনদের পাইকারী বাজার, এবং নগরসভ্যতার সেই বিবিধ পণ্যবিপণি। আমরা ছিটকে এসে পড়লুম বাস্তব জগতে।

এক সময় টাঙ্গা থামিয়ে শ্রীমতী গুপ্তা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খুললেন, এবং গতরাত্রে লেখা একখানি চিঠি নিজেই গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে পুনরায় গুছিয়ে বসে তিনি বললেন, রাত জেগে আপনার কথাই লিখলুম দু'পাতা। আসল প্রশ্নটা করা হলো না যে, উনি দিল্লী আসছেন ঠিক কবে! একটি বিষয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবতী,—এমন স্বামী অনেক মেয়েই পায় না।

এবারে আর চুপ করে থাকা গেল না। বললুম, অনেক মেয়ে স্বাধীনতা পেলে স্বামীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়। আপনি কি তাদেরই একজন?

একেবারেই না!—শ্রীমতী গুপ্তা বলে উঠলেন, আমাদের বাড়িতে উনি যেদিন আপনাকে নিয়ে আসবেন সেদিন দেখবেন, আমাদের ঘরকন্না! আমার সমস্ত ব্যবস্থা আর ইচ্ছা-অভিরুচির সঙ্গে উনি মিলিয়ে থাকেন। উনি আলাদা মানুষ নন্‌।

স্বামীর প্রসঙ্গে উনি এত গৌরব বোধ করলেন যে, পুরুষমাত্রই আনন্দলাভ করবে। ওঁর একাগ্র তন্ময়তা দেখে একথা সহজেই বিশ্বাস করলুম, এই হিমালয় ভ্রমণ এবং চারিদিকের শোভা সৌন্দর্য ওঁর কাছে কত সামান্য! সত্যি বলতে কি, মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এই ভ্রমণের ঠিক এক বছর পরে দিল্লীতে যেদিন তাঁর তরুণ স্বামী মিঃ গুপ্তর সঙ্গে প্রথম আলাপ হলো, সেদিন অনুভব করেছিলুম শ্রীমতী গুপ্তার বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। মিঃ গুপ্ত আমাকে তাঁর বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার আমার হিমালয়যাত্রাকালে তিনি যে-বিস্ময় সৃষ্টি করলেন, তার কথা যথাসময়ে বলবো।

হঠাৎ সন্দেহ হয় তিব্বত এসে ছুঁয়েছে মণ্ডিকে। শুধু ওই চীন-তিব্বত স্থাপত্যের প্রতীক ঘড়িঘরটি নয়,—ওরা অনেক মন্দির ও দেবদেউলকেও ছুঁয়েছে। প্রায়ই দেখছি সেই ড্রাগনের মূর্তি,—সেই তীব্র দাঁত আর মুখব্যাদান, দুদিকে দুই ডানা। সিংহের কেশর, বাঘের দংষ্ট্রা, কুমীরের লেজ, গরুড়ের ডানা এবং মানুষের ভঙ্গী। শিরা-উপশিরায় প্রচণ্ড তীব্রতা। সমগ্র গঠন, সমস্ত আয়তন,—সমস্তটা যেন বহির্ভারতীয়। কাঠের উপরে আশ্চর্য কারুকার্য,—তার আঙ্গিক ও সুষমা, তার সুসঙ্গতি ও ছন্দ,—সারাদিন ধরে দেখলেও ইচ্ছা মেটে না। এর ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি বহু হিন্দু-মন্দির। উখীমঠ, ত্রিযুগীনারায়ণ, তুঙ্গনাথ,

যোশীমঠ, বদরিনাথ,—প্রায় সমগ্র উত্তর গাড়োয়ালে এই। সমস্ত নেপালে এ ছাড়া কিছু নেই। সিকিমে ভূটানে এই। আলমোড়া নৈনীতালের অনেক অঞ্চলও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি।

বিচিত্র-পোশাক-পরিহিত এক আধজন লামা পথ পেরিয়ে যাচ্ছে। সৌম্যদর্শন লামাকে দেখলে শ্রদ্ধা জাগে। ওরা এসে অনায়াসে এই ভূখণ্ডে মিলে গেছে। অনেক লামা পুরুষানুক্রমে বাস করে ভারতে,—যেমন অনেক চীনা। নৈনীতাল অঞ্চলের কোনও কোনও পার্বত্য ভূখণ্ডে একদল চীনের প্রচুর জায়গা জমি ছিল এই সেদিন অবধি,—পাহাড়ে পাহাড়ে ছিল কারো কারো জমিদারী,—আজ তারা আছে কিনা জানিনে। এ ছাড়া হুন, আরব, তাতার, এমন কি চেঙ্গিস খাঁর প্রশাখা বংশের ছিটে ফোঁটা,—এরা আজও আছে ভারতে। সেদিনও তাদের দেখে এসেছি পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমিতে। পৃথিবীর আর কোনও ভূভাগে ভারতের মতো বোধ করি এমন জাতি-বৈচিত্র্য নেই,—আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা,—কোথাও না।

অবশেষে যেমন-তেমন একটি হোটেল পাওয়া গেল। নামটি ঠিক মনে নেই, বোধ হয় 'স্বরাজ হোটেল' কিংবা অমনি কিছু। হোটেলের নীচেই বড় রাস্তা, এইটিই প্রধান রাজপথ,—শহরকে বেষ্টন করেছে। পূর্বদিকে পথের ওপারে ময়দান, তার ওপারে একটি টিলা পাহাড়ের গায়ে সরকারি দপ্তর ইত্যাদি। এটি আগে ছিল রাজধানী, এখন এটি জেলা শহর। সামন্ত রাজার অধিকার দখল করেছেন ভারত সরকারের নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার। রাজা আছেন, প্রিভিপার্স-ও তিনি পান। কিন্তু এখন তাঁর দখলে সৈন্যসামন্ত অথবা অস্ত্রসজ্জা কিছু থাকার হুকুম নেই। বোধ হয় জন দুই চার বডিগার্ড তাঁর আছে, হয়ত বা এক আধটা পাখিমারা গাদা বন্দুক,—ওটা সঠিক জানিনে।

হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়ে আমরা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। দুধ, মিষ্টি আর শিঙ্গাড়ার দোকান পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, ক্ষুধা এবং অধ্যবসায় দুই আমাদের প্রচুর। আহার্যের পরিমাণ দেখে হয়ত স্বয়ং দোকানদারও আড়চোখে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে থাকবে। ভোজনান্তে পানের দোকান দেখে খুশী হলুম। মায়াদেবী পান খান না, কিন্তু নতুন দেশের সঙ্গে সুর না মেলালে চলবে কেন? এর পর আমাদের সময় ছিল কম। ওখানে মস্ত বড় কলেজ আর ইস্কুল—সমস্তই একে একে দেখা দরকার। তিনি ফলপাকড়ের ভক্ত, সুতরাং পাহাড়ী মেওয়া ফল কিনে বসলেন এক ঝুড়ি। ঘুরেঘুরে দেখা গেল এপাড়া আর ওপাড়া। সরু সরু ঘিঞ্জি গলিপথ, ওরই মধ্যে বসবাস করে রাজপুত বংশের মেয়ে আর পুরুষ। মেয়েরা সুশ্রী, পুরুষ শ্যামবর্ণ। মাথায় রাঙ্গা পাগড়ি, পরনে চুড়িদার। মেয়েদের পরনে সাধারণত শাড়ি নয়,—পায়জামা পাঞ্জাবী এবং উত্তরী। গতকাল অবধি নাকি মস্ত হাট বসেছিল, আজও সেই ভাঙ্গাহাটের রাশি রাশি সামগ্রীসম্ভার পথে-পথে থৈ থৈ করছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা গেলুম অনেক দূর। কিছুদূর এগিয়ে গেলে দুটি নদীর সঙ্গমস্থল দেখা যায়। যারা দেখেছে গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ আর রুদ্রপ্রয়াগ—যেখানে অলকানন্দা মিলেছে এসে নীলধারায়, অথবা মন্দাকিনী মিলেছে অলকানন্দায়,—তারা এ ছবি সহজে কল্পনা করবে। একটি নদী বিপাশা, অন্যটির নাম মনে নেই। শেষেরটি এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে,—ওরই পথ ধরে দক্ষিণে গেলে 'সুকেত' তথা সুন্দরনগরের বিশাল উপত্যকা। তারপর সেই পথটি আবার গিয়েছে দক্ষিণে—শতদ্রু নদী অতিক্রম করে বিলাসপুর

রাজ্যে। অধুনা বিলাসপুর হিমাচল প্রদেশেরই অন্তর্গত।

অনেক পথ রইলো বাকি, অনেক ছায়াবীথিকা রইলো অনাবিষ্কৃত, অনেক নিভৃত নিকুঞ্জলোক যেন পাহাড়ে পাহাড়ে হাতছানি দিল। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, কিন্তু তারা দূরবর্তী। বাইরের পৃথিবী চোখে পড়ে না, কিন্তু এই হিমালয়ের প্রাকারঘেরা অবরোধের মধ্যেও এখানকার নিজস্ব জগৎটি সুপ্রসারিত।

বনময় পাহাড়তলীর পটভূমি,—তারই মাঝখানে মহাকালীর মন্দির; ওখান থেকে ডাক দিচ্ছে শক্তিকে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-অরণ্যে, উন্মাদিনী বিপাশার তরঙ্গরণরঙ্গে। এদিকে ত্রিলোকনাথ, শহরের মধ্যে ভূতনাথ। এরা বহু প্রাচীন, সন-তারিখ হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। আরও আছে নানাবিধ দেবস্থান, আছে মূর্তি, আছে বিচিত্র স্থাপত্য—কিন্তু তাদের সেই অভিব্যক্তির সঙ্গে নিজের প্রকৃতিকে মেলাতে পাচ্ছিনে। এরা ওই তিব্বতী-চৈনিক-মঙ্গোলীয় নয়, এরা যেন আবার আগাগোড়া ভিন্নগোত্রীয়। এদের দেখিনি আগে, এরা ভারতের অন্য কোথাও নেই। সিকিমে-ভূটানে নেই, গাড়োয়ালে-নেপালে ওদের দেখিনি, উত্তর কুমায়ুনে-কিন্নরদেশে এধরন নয়,—এরা নতুন। এরা আভাস দেয় অতি প্রাচীনের—যখন নদীতীরে বসে মানুষ প্রথম জপ করতে শিখেছে, শিলাতল ছেড়ে যখন মন্দির নির্মাণ কল্পনা করেছে,—হয়ত বা এরা সেই যুগের। সেকালের ভাস্কর্যের মধ্যে যে ভাষ্য থাকতো, যে-ব্যাখ্যা তারা করে যেত, পরবর্তীকালে সেই ভাস্কর্য হারাতো আপন অর্থ। কোনও শিল্পীর নাম নেই কোথাও, কেউ কখনও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়নি। মহাকালের হাতে তুলে দিয়ে গেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, নিজেকে বিলুপ্ত করে গেছে। অজন্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পদ্মশিথানশয়ান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ মূর্তি, বোম্বাই সমুদ্রগর্ভে হস্তীগুহার ত্রিমূর্তি, নেপালের স্বয়ম্ভু, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ, পূর্বলোক কোনারক,—কোথাও কোনও শিল্পী রেখে যায়নি আপন স্বাক্ষর। অনেক স্থাপত্য আপন অর্থ হারিয়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়ের মতো। মণ্ডিতে এসে চমক লাগে, এ একেবারে নতুন, এর জাতিগোত্র সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। পৃথিবীর কোনও দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মানুষের এই আত্মনিবেদন নেই; আনন্দ এবং সৌন্দর্যবোধের দিকে বৃহত্তর মানবতাকে অনুপ্রাণিত করবার এমন দেশজোড়া স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের আয়োজন কোথাও নেই; মহাজনতার আনন্দ আর উদ্দীপনার জন্য তারা উৎসর্গিত।

পাহাড়ী দেশে সর্বত্র যেটি লক্ষ্য করেছি, এখানেও তাই।—বিরোধ কোথাও নেই। সংসারযাত্রা নিরীহ। মানুষের মুখে কোনও উত্তেজনা দেখিনে, ছুটছে না কেউ, তাল ঠুকছে না কোনও প্রতিযোগী, কর্মব্যস্ততায় সংঘর্ষ বাধছে না, সমগ্র শহর যেন আনন্দের হাটে মিলেছে। হিমালয়ের হাওয়া মালিন্যকে দাঁড়াতে দেয় না।

অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে ঘণ্টা কয়েক আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়ালুম! ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটি ধোবার দোকান, অর্থাৎ ডাইয়িং ক্লিনিং,—সেখানে মাত্র তিনঘণ্টার চুক্তিতে কতগুলি জামাকাপড় কাচতে দেওয়া হলো। দোকানদার আমাদের সেই চুক্তি যথাযথ পালন করেছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে হোটেলে এসে উঠলুম। সর্বাগ্রে স্নানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উপরতলায় এসে সচকিত হয়ে দেখি ঘরটি খোলা। আমরা ভয়ে চমকে উঠলুম। যাবার সময় তাড়াতাড়িতে কুলুপ লাগানো হয়নি। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই চোখ পড়লো টিপাইয়ের ওপর রুমালে বাঁধা শ্রীমতী গুপ্তার টাকার তোড়াটা, ওটা তিনি ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমরা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে

গিয়েছিলুম। আরও কিছু কিছু মূল্যবান সামগ্রী ছিল এখানে ওখানে ছড়ানো।

পিছনে এসে দাঁড়ালো হোটেলওয়ালা, এবং জানালো আমরা ঘর বন্ধ করে যাইনি, সেজন্য দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই,—সে এতক্ষণ এই ঘরের পাহারাতেই ছিল। তবে ব্যাপারটা এই, এ তল্লাটে কারও কিছু সহজে খোওয়া যায় না!

এমন শান্ত মিষ্ট কণ্ঠে সেই যুবকটি কথাগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিল যে, আমরা অভিভূত হয়ে গেলুম।

রৌদ্র ছিল প্রখর, তাই সাবানসহযোগে স্নিগ্ধ শীতল জলে স্নান করে সেদিন বড় আনন্দ পাওয়া গেল। কাংড়ায় হঠাৎ-আবির্ভূত অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয় আমার অপরিচ্ছন্ন চেহারা ও পোশাকপত্র দেখে অত্যন্ত লাঞ্ছনা করেছিলেন, আজ তার সম্পূর্ণ প্রতিকার করতে বসলুম। দেখে শুনে শ্রীমতী গুপ্তা অত্যন্ত আপত্তিজনক পরিহাস করে বসলেন,—করলেন কি? রাস্তাঘাটে সকাল থেকে যারা আপনাকে দেখেছে, তারা যে এবার চিনতে পারবে না? এমন দুর্মতি কেন হলো আপনার?

আমার উচ্চহাস্যে তিনি জবাব পেয়ে গেলেন।

আহারাদি অল্পবিস্তর বাঙালী ধরনের। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত করায় যুবকটি জানালো, এখানকার খাদ্যরীতি মোটামুটি এই, তবে বনস্পতির তৈরী খাদ্য এখানকার ভদ্রসমাজ ছোঁয় না। দালদা খেয়ে পাহাড়ী লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট কবতে প্রস্তুত নয়। ওটা খেলে নাকি পরিণামে অন্ত্রনালী এবং যকৃতের সর্বনাশ ঘটে!

যুবকটির মুখে চোখে উত্তেজনার আভাস দেখে আমরা হাসি চাপবার চেষ্টা করছিলুম।

বেলা পড়ে এলো। আমাদের যাবার সময় হয়ে আসছে। ধোবার বাড়ি থেকে কাপড়চোপড় যথাসময়ে আনিয়ে নেওয়া হলো। আমাদের গাড়ি ছাড়বে অপরাহ্ণে।

মণ্ডি অবধি যাত্রীর ভিড় থাকে। কারণ শহরটি বড়, এবং হয়ত বা শিমলার পরে দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে ওঠার অপেক্ষা রাখে। এই শহরটি থেকে পথ গিয়েছে নানা পাহাড়ে এবং উপত্যকায়। পূর্বদিকে বিপাশা নদীর তীর ধরে গেলে প্রসিদ্ধ লারজি উপত্যকার দিকে যাওয়া যায়। এই লারজির পথটি আগে ছিল না। এটি শুধু অগম্য নয়, অসম্ভবও ছিল। একদিকে ছয় হাজার ফুট উঁচু পাথরের পাহাড়,—এবং সেই মৃন্ময়তাহীন পাথুরে পাহাড় অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় ঝুঁকে থাকতো বিপাশার স্রোতের উপর। সে-দৃশ্য আশ্চর্য, এবং প্রকৃতির এই অদ্ভুত চেহারার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করতে সাহস পেত না।

সেদিন লারজির এই বিপাশা-পথ ধরে পায়ে হেঁটে কুলু উপত্যকায় যাওযাটাও ছিল অতীব কষ্টকর। সেই কারণে কুলু যেতে গেলে যোগিন্দরনগর থেকে বেরিয়ে গুমা ও ঘাটাসানি হয়ে যাওয়াটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। হিমালয় এখানে যেন তার আদিম অভিব্যক্তির দিকে পর্যটকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছে। আমরা অবাক হয়েছিলুম।

আমাদের গাড়ি ছাড়লো অপরাহ্ণে যথাসময়ে। কুলুর খ্যাতি ইদানিং কম নয়। অনেকে বলে, কাশ্মীরের পরেই কুলু। এর কৈফিয়ৎ আছে। ভূস্বর্গের সঙ্গে শোভা সৌন্দর্যের তুলনা নয়, এ ছাড়া অন্য কিছু—যেটি পথিকের পক্ষে পরম বিস্ময়। আসামের উত্তরপূর্ব কোণে মিসমির অজানা অনামালোক ছাড়িয়ে যেখানে বিরাট নামচা-বারোয়ার সীমানা, চমলহরির নীচের দক্ষিণপূর্বে যেখানে ভূটানের অনাবিষ্কৃত এবং মানবচিহ্নহীন রহস্যগর্ভ হিমালয়, শতদ্রু যেখানে পথ কেটেছে শিপকির গিরিসঙ্কট রংচুং এলাকায়—যে-পথ গিয়েছে কিন্নরলোক পেরিয়ে ধবললিঙ্গের শিখরে-শিখরে, অথবা উত্তর নেপালের জগৎপ্রসিদ্ধ

অরুণনদ যে-পথ দিয়ে বিশ হাজার ফুট উঁচু পাথর কাটতে-কাটতে নেমে এসেছে,—লারজি এবং কুলুর পথে সেই ধরনের অতি-প্রাকৃত বিস্ময় প্রসারিত। আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

বোধ হয় স্থান-কালের প্রভাব পড়েছিল মনে। যে-ভারতবর্ষে বাস করে এসেছি এতদিন, এখানে সেই ভারতবর্ষের ছায়া পড়েনি। অতি প্রাচীনের সঙ্কেত বয়েছে এই সর্বকাল এবং সর্বলোক-বিচ্ছিন্ন হিমালয়ের অন্তঃপুরে। আমি আধুনিক ভারতের সংবাদ এনেছি ওর সামনে, কিন্তু কে শুনছে? অগণ্য শতাব্দীর যোগতন্দ্রায় যেন ওর নিমীলিত দৃষ্টি,—চোখে মুখে অনাদি-অনন্তকালের ক্ষমাস্নিগ্ধ শান্ত প্রসন্নতা। মাথা নত হয়ে আসে ওর দিকে তাকালে। একালের রুচি এনেছি সঙ্গে, এনেছি এযুগের বিজ্ঞানের অহঙ্কার, এনেছি আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবর্জনাকুণ্ড থেকে অধঃপতিত প্রকৃতি বিকার, এনেছি জীবনের অনেক মালিন্যের ধিক্কার,—কিন্তু ওই প্রাচীন অচলায়তন ঋষিব ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না! পুরুষপরম্পরায় এসেছে অনেক মানুষ ওর স্নেহচ্ছায়ায়, একটির পর একটি শতাব্দী ধরে দলে দলে তারা চলে গেছে, কত আধুনিক মিলিয়েছে কত অতীতে, কত ভবিষ্যৎ কতবার ঘুরেছে ওর চক্রতীর্থপথে,—কিন্তু নির্বিকার সুপ্রাচীন চেয়ে রয়েছে অপলকচক্ষু মহাকালের মতো, ভ্রূক্ষেপ তার কিছুমাত্র নেই। বিপাশার শিলাতলে, প্রাচীন মন্দিরের সোপানে, দেওদারের অবণ্যে, অমিতকায় পাষাণপৃষ্ঠেব ভাস্কর্যে, প্রাক্‌বৈদিক ভারতের ছায়াসুনিবিড় অতীন্দ্রিয় চেতনায়—দেখে গেলুম ওই মহাযোগীর চকিত পদসঞ্চার; নিয়ে গেলুম আমার মর্মেব রোমাঞ্চ শিহরণে তাঁর নিত্যকালের বাণী : শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্!

ঠিক মনে নেই, আন্দাজ মাইল খানেক দক্ষিণে এসে একটি ঘাঁটি-পাহারা, অর্থাৎ চেক্-পোস্ট পড়ে। এখানে একটি পুরাতন সাঁকো পেরোবার কালে ড্রাইভারকে সতর্ক করা হয়। একটি লোক পিঠে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে গাড়ির আগে-আগে হেঁটে চলে, অর্থাৎ স্পীড একেবারেই দেওয়া চলবে না। যদি স্পীড দাও, তবে লোকটিকে চাপা দিয়ে যাও। নীচের দিকে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে প্রবল পরাক্রমে মাতামাতি করছে মদমত্ত বিপাশা,—গৈরিক তরঙ্গ তার চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে পাথরে-পাথরে। এটি হলো দুই নদীর সঙ্গম। সম্ভবত যে-বৃষ্টি হয়ে গেছে গত দুদিন পাহাড়ে-পাহাড়ে, তারই দুরন্ত স্রোত সংহারমূর্তিতে নামছে দুই ধারায়। ওদের আঘাত-প্রতিঘাতে, সংঘর্ষে, তাড়নায়, হিংস্রতায় এবং বিপ্লব-বিক্ষোভে উৎক্ষিপ্ত শিকরকণায় মুহুর্মুহু ধূম্রজাল সৃষ্টি হচ্ছে। ওদেব ওই আত্মঘাতী প্রাণযন্ত্রণার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আরোহীরা।

সাঁকো পেরিয়ে গাড়ি ঘুরলো ডানদিকে এবং ওই ডানদিকেই বিপাশার তীরে-তীরে চললো অতি সঙ্কীর্ণ পথ লারজির দিকে। কুলু উপত্যকায় যাবার এইটিই একমাত্র মোটরপথ।

পথের চেহারা ভালো নয়,—সরু এবং কর্কশ। এমন অসমান যে, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়। মোটরবাসটি আরামদায়ক নয়। যত বেগে চলে, শব্দ হয় তার চেয়ে বেশি। পথটি একতরফা, অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে কোনও গাড়ি আসবে না। বিপাশা এখানে ঘুরেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পূর্বে, তারপর পুনরায় গেছে উত্তরে। আমাদের গতি স্রোতের বিপরীত দিকে।

গাড়ির মধ্যে উঠেছেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা এবং তাঁর পাশে একটি যুবক।

নিঃসন্দেহ, মাতা ও পুত্র। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এবার ভালো করে না তাকিয়ে পারা গেল না। মহিলাটি বয়সে প্রবীণ, কিন্তু তাঁর আর্যজনোচিত দৈর্ঘ্য, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, শরীরের ধবধবে রং, মিহি বেগুনী মখমলের গাত্রাবরণ, তাঁর আগুল্‌ফলম্বিত শুভ্রবর্ণের গাউন, মাথায় রেশমী ওড়না এবং পায়ের দিকে শাদা মোজা ও ক্যাম্বিশের জুতো,—এদের সঙ্গে তাঁর স্থির শান্ত এবং নির্বিকার চাহনি, সবগুলি মিলিয়ে এমন একটি সম্ভ্রমসূচক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, যেটি এমন করে আগে দেখিনি। পাশের যুবকটির বয়স অল্প, সে গলাবন্ধ কোট এবং চুড়িদার পরেছে। সবাই মিলে গাড়ির মধ্যে বসেছি, কিন্তু মহিলার মাথাটি উঠেছে সকলের মাথা ছাড়িয়ে। সকলেই আমরা তাঁর কাছে যেন ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে গেছি। দীর্ঘ বাহু, বিস্তৃত স্কন্ধদেশ, চওড়া মুখের চোয়াল, মাথার উচ্চতা, ছাড়ালো দুই পা,—আর কেউ না হোক, আমি নিজে অবাক। আরেকটি বস্তু ছিল তারিফ করার মতো। তাঁর সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদে লাল, সবুজ, পীত, কৃষ্ণনীলাভ, গৈরিক,—ইত্যাদি বিবিধবর্ণের এমন সুন্দর সমাবেশ ছিল যে, আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাঁর এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে সমগ্র গাড়িখানা এখানে অভিনব গৌরব লাভ করছিল।

তাঁকে কেউ দেখছে না, কেবল আমি লক্ষ্য করছি,—এটি শ্রীমতী গুপ্তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এক সময় গলা নামিয়ে বললেন, দেখছেন কি? উনি পণ্ডিতানী?

কে?

পণ্ডিতানী! কাশ্মীরী পণ্ডিতবংশের মহিলা! ব্রাহ্মণের মেয়ে। দেখছেন না,—তীর্থে যাচ্ছেন।

বললুম, আপনি চিনলেন কেমন করে?

বাঃ—শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, তিন বছব হয়ে গেল আমি আছি কাশ্মীরে; ওদের নিয়ে ঘর করেছি,—আমি জানিনে? আপনি যা হুড়োহুড়ি করলেন, কাশ্মীরে আপনার কিছুই দেখা হলো না। তা ছাড়া এমন লোকের কাছে আতিথ্য নিলেন, যার ঘরকন্না বানের জলে ভেসে গেল! সব লেখকেরই কি আপনার মতন কপাল মন্দ?

হেসে উঠলুম। এবার চড়াইপথে গাড়ি উঠছে, সুতরাং শ্রীমতী গুপ্তার বাক্যালাপ থেমে গেল। তাঁব ঘূর্ণি লেগেছে। তাঁর কথাটা কিন্তু সত্য, কাশ্মীরের একটি বিশেষ শ্রেণীকে দেখা হয়নি,—যাঁরা বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে সুখ্যাত। তাঁরা বিশেষ শুদ্ধাচারী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। তাঁদের মহিলারা প্রায়শই থাকেন লোকলোচনের বাইরে, শ্রমজগতে এবং জনতার হট্টগোলে তাঁদেরকে দেখা যায় না। তাঁরা অধিকাংশই অভিজাত এবং সম্পদ্‌শালী। এই মহিলাটি সেই সমাজেরই। মাতা ও পুত্রের মুখে-চোখে এমন সুশিক্ষার দীপ্তি এবং প্রসন্ন নম্রতা অভিব্যক্ত যে, আমি অভিভূত হয়ে ছিলুম। কেউ যদি বলতো, পায়ের ধূলো নাও,—আমি রাজি হতুম।

পথ ক্রমশ সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে। একখানি মাত্র ছোট বাস যাবার মতো অতি সঙ্কীর্ণ পথ। একদিকে গভীর খদ—আমাদের পায়ের নীচে। বিপাশার প্রচণ্ড রণরঙ্গস্রোত বয়ে চলেছে সেই খদের তলায়। একটি অসতর্ক মুহূর্ত, ব্যস—আমাদের গাড়ি ছিটকে পড়বে দেশলাইর বাক্সের মতো পাঁচশো কিংবা হাজার ফুট নীচে,—অবধারিত মৃত্যু! পাহাড়ের পাথর ঠিক যেন অতিকায় সর্পের ফণার মতো মাথার উপরে ঝুলছে। সামান্য খোঁচা যদি লাগে, চলন্ত গাড়ি সেই ধাক্কা কোনমতেই সামলাতে পারবে না,—টাল খেয়ে ছিট্‌কে যাবে বিপাশায় তলিয়ে। মাইলের পর মাইল এই বিপজ্জনক পথ ধরে গাড়িখানা হোঁচট খেয়ে খেয়ে

চললো এবং আমরা আকণ্ঠ উদ্বেগ, শঙ্কা, অস্বস্তি এবং আতঙ্ক নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কাঠ হয়ে রইলুম।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য উদ্বেগ ও ভয়ের কথা ভুলে যেতে পারলে এমন একটি রূপজগৎ তার রহস্য আবরণ উন্মোচন করতে থাকে যে, আপন অস্তিত্বকে অবাস্তব মনে হয়। হঠাৎ এসে পড়েছি একটি মায়াচ্ছন্ন লোকে। প্রত্যেকটি পার্বত্য গুহা পেয়েছে মন্দিরের আয়তন, এবং অজস্র বিচিত্র পুষ্পলতা ও গুল্মে আকীর্ণ সেই সব গুহালোকের ভিতরে যে নিঃশব্দে পূজার্চনা চলছে, এটি বিশ্বাস করতে মন প্রবৃত্ত হয়। বিশাল প্রাচীন এক একটি পাথরের স্তবক অবিকল ঋষির আকারলাভ করেছে, এবং আকাশের মেঘস্তূপেব দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে আমরা যেমন নানাবিধ অতিকায় জন্তু এবং বিবাট দেব ও দানবের ছবি চিনে-চিনে বার করি,—এখানেও তাই, স্পষ্ট চক্ষে দেখতে পাচ্ছি মুনি ঋষি যোগী এবং অতি-মানবকে। ওরা সবাই যেন স্থির হয়ে আছে, চেয়ে দেখছে নতুন কালের মানুষকে। অসংখ্য প্রপাত এবং নির্ঝরিণী নামছে ওদেরই জটা থেকে, ওদেরই বুকের উপর দিয়ে। এই অতি-প্রাকৃত বিস্ময় একবার মাত্র দেখে এসেছি অমরনাথেব তীর্থপথে মহাগুনাস গিরিসঙ্কটে—যেখানে পথের পাশেই একজন 'যোগীশ্রেষ্ঠ' দাঁড়িয়ে। প্রবাদ, তিনি নাকি ছয় হাজার বছর আগে ওদিকে গিয়েছিলেন, এবং পথের শোভা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর শরীর হিমতুষারে আচ্ছন্ন হয়, এবং কালক্রমে সেটি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। অজস্র ফুলের বিবিধ বর্ণে এবং গুল্মলতায় তাঁর বিশাল দেহ ছিল আকীর্ণ। অবাক হয়ে দেখেছিলুম অনেকক্ষণ। এখানে ভিন্ন কথা। সমস্তটাই যেন জীবন্ত, প্রাণময়। বুঝতে পারছিনে ওদের ভাষা, জানতে পারছিনে ওদের ওই নিঃশব্দ সমাজকে। ঠিকমতো ধরতে পারছিনে আমার অস্তিত্বটা সত্য, কিংবা ওদের ওই নিত্য জাগ্রত অবস্থানটাই বাস্তব। আমি নিজে রূঢ় বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ, আমার এই মতিভ্রম দেখে হাসবে সবাই,—যারা বিজ্ঞানী। কিন্তু এখান দিয়ে পেরোবার সময় তারা সত্যি হাসবে কি? যেটা আমার জ্ঞান এবং বুদ্ধির অতীত, সেটাই কি অবিশ্বাস্য? যেটি আজও জানতে পারিনি, সেইটিই কি অশ্রদ্ধেয়? এ অহঙ্কার কেন?

আত্মা সর্বব্যাপী,—বিজ্ঞানের এইটি শেষ আবিষ্কার। প্রাণ আছে পাথরে, হাওয়ায়, পরমাণুতে, চৈতন্যবিন্দুতে,—এই হলো বিজ্ঞানের সর্বশেষ আলোসম্পাত। সেই বিন্দুর বিদারণ মানেই সেই প্রাণের বিস্ফোরণ। সবাই বলছে, থামাও আণবিক আর অম্লজান বোমা,—নইলে সৃষ্টি রসাতলে যায়! যে-অণুব দ্বারা মানুষের সৃষ্টি, সেই অণুতেই পাথর তৈরী। প্রথমটায় পেয়েছি সৃষ্টির পরম বিস্ময়, দ্বিতীয়টা অনাবিষ্কৃত। পাথর কথা কইবে, গাছের ভাষা শুনবো,—এরই জন্য আজ প্রস্তুত হচ্ছি। একশো বছর আগে কেউ ভেবেছিল মানুষ উড়বে, বেতারে গান গাইবে, পর্দায় মানুষের চেহারা নড়বে এবং তার প্রকৃত কণ্ঠস্বর শুনবো? যাদেরকে এতকাল ধরে বলা হয়েছে, জড়,—তারা কি জড়তা ঘোচায়নি? 'অসম্ভব' কথাটা কি আজও থাকবে অভিধানে?

বন্য গোলাপের ঝাড়, আপেল ডালিমের বন, স্লেটপাথরের পাহাড়, কর্কশ শিলাসম্ভার, রহস্যগর্ভ গুহাপথ এবং আতঙ্কসঙ্কুল বিপাশার খদ,—এদের ভিতর দিয়ে কুলুর দিকে গাড়ি চললো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুলু লাহুল বিপাসা

প্রাচীন ঋষিকুলের মধ্যে প্রধানত আমরা দুজনকে পাই যাঁরা প্রচুর পরিমাণে হিমালয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহাভারত-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস; অন্যজন সূর্যবংশের রাজগুরু মহামুনি বশিষ্ঠ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য খুঁজে ফিরতেন, এবং পছন্দসই একটি অঞ্চল পেলেই তিনি নদীতীরের শিলাসনে, কিংবা ছায়াচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে, অথবা কোনও নির্জন তুষারচূড়া নির্বাচন করে নিতেন। রাজগুরু বশিষ্ঠ ত্রেতাযুগের মানুষ ছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন তপোবন, পুষ্পাঙ্গন,—এবং একটি কুটীর। বশিষ্ঠ ছিলেন আশ্রমিক, সুতরাং তিনি যেখানেই গেছেন, একটি করে আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। আসামের হিমালয় থেকে কাশ্মীরের হিমালয় অবধি রাজগুরু বশিষ্ঠ অনেকগুলি আশ্রম পরিচালনা করেছিলেন। নবতন একটি আশ্রমসৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একদা আসেন হিমাচলের এই অন্তঃপুরে, কুলু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে। এখানকার হিমালয়ের অত্যাশ্চর্য নিসর্গ শোভা দেখে তিনি ভাবস্থিত হয়ে যান এবং হিমালয়ের কঠোর তপস্যায় যোগস্থবির হন। সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি উত্তর কুলুর একটি মনোরম নিভৃত অঞ্চলে তার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কুলুর অন্তর্গত মানালি জনপদ থেকে দুমাইল দূরে রাজগুরু বশিষ্ঠের কুণ্ড ও আশ্রম আজও বিদ্যমান।

ত্রেতা এবং দ্বাপরের মধ্যে কালের হয়ত ব্যবধান কত, আমার জানা নেই। পাঁজিতে যাই থাক, অন্তত হাজার দশেক বছর হবে সন্দেহ কি! দ্বাপর যুগে মহর্ষি বেদব্যাস একদা বেরোলেন হিমালয়ে। কিন্তু কূর্মাচল তথা কুমায়ুন গিরিশ্রেণীর এখানে-ওখানে ছাড়া মহর্ষি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আর বিশেষ কোথাও রেখে যাননি। ব্রহ্মপুরার ভূখণ্ডে ব্যাসদেব সর্বত্র নিত্যস্মরণীয় হয়ে আছেন।

দ্বাপর যুগের স্মরণাতীত কালে হয়ত মহর্ষি বেদব্যাসের মনে এ কৌতূহল এসে থাকতে পারে যে, রাজগুরু বশিষ্ঠ কোন্ স্থলে গিয়ে হিমালয়ের দেবতাত্মাকে এমন ভাবে আবিষ্কার করলেন! হয়ত পুরাকালের মনস্তত্ব ছিল ভিন্ন রকমের। সেকালে হয়ত মানুষের সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা প্রমাণিত হতো, অতিমানবতার অভিব্যক্তিতে। তপস্যার কঠোরতা এবং সিদ্ধিলাভ, এই ছিল হয়ত নেতৃত্বের প্রকৃত কষ্ঠিপাথর। মহর্ষি বেদব্যাস সম্ভবত তাঁর পূর্বাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই হিমালয়ের পরমাশ্চর্য এবং অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানালি থেকে দুমাইল দূরে যেখানে বশিষ্ঠের নামে একটি গন্ধকমিশ্রিত উত্তপ্ত জলের প্রস্রবণ বিদ্যমান, সেই পর্যন্ত গিয়ে মহর্ষি থেমে যাননি! হিমালয়ের মায়াবিনী প্রকৃতি এবং আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় আরও দূরে উত্তরের ভূস্বর্গলোকে। সেই লতাগুল্মহীন প্রাণীচিহ্নবিহীন তুষাবশৃঙ্গে আরোহণ করে তিনি দেবলোকের এবং ব্রহ্মলোকের সন্ধিদ্বার উন্মোচন করেন। পরবর্তীকালে সেই তুষারচূড়ার নাম রাখা হয় ব্যাসঋষিশৃঙ্গ!

ঠিক মনে নেই, মণ্ডি থেকে সুলতানপুর অর্থাৎ কুলুশহর বোধ করি আটত্রিশ মাইল পথ। পথ শুধু নতুন নয়, পৃথিবী নতুন, মানুষও নতুন। এদেরকে কাংড়ায় দেখিনি, হিমাচলেও দেখিনি,—এরা সাজসজ্জা সম্পূর্ণ বদলিয়ে অভিনব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্নরদেশকে মনে পড়ছে, কিন্তু এরা তারা নয়। এমন শিরোভূষণ দেখিনি আগে,—তিব্বতকে যেন কোমল করে এনেছে! রংয়েব বৈচিত্র্য মাথায় ধরে এনেছে সবাই। আকাশ থেকে রং পেয়েছে, রক্ত গোলাপের থেকে ধার করেছে, এনেছে বাসন্তীবর্ণ শৈলউপত্যকার বসন্তবাহার থেকে, মেয়েদের চোখ পেয়েছে অতল কৃষ্ণাভা, আনারকলি থেকে ধার করছে রক্তবরণ। মাথার টুপি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

তিব্বতী গুম্ফার চতুষ্কোণ গম্বুজে চারটি কোণ যেমন একটু উপর দিকে মোড়া,—এই সুন্দর টুপিগুলির দুই 'কোণ' উপরদিকে ঠিক তেমনি করে একটু মোচড় দেওয়া। তার উপর বর্ণাঢ্যতার ওই বাহার। বর্ণ-সমন্বয় ও সুষমাছন্দে অনেককে ওরা যেন হার মানিয়েছে। পথের মেয়েরা অকারণ হেসে আপন মনে চলেছে। কারও মাথায় কালো, কারা বা লাল কাপড়ের টুকরো কপাল ঘিরে ফেট্টি বাঁধা। পোশাক প্রায়ই শাদা কম্বলের, একটু শীত পড়লে সূতিবস্ত্র ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

মায়াদেবী কুলুর টুপি দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, আমিও ঘুরেছি নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু এধরনের টুপি দেখলুম এই প্রথম। গোটা দুই কিনে নিয়ে যাবো।

ডালিমের বন পাশে পাশে চলেছে। অপরাহ্ণ পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পথহারা রঙ্গীন প্রজাপতিরা এখনও বাসা খুঁজে পায়নি। ডালিম আর আনারেব বনে তারা এখনও ঘুরছে।

পথ সঙ্কটসঙ্কুল। গাড়ি চলেছে অতি সতর্ক হয়ে। পাহাড়ের অতিকায় পাথর এক এক স্থলে এমন করে ঝুলছে যে, দেখলে ভয় করে—পাছে গাড়ির চালের সঙ্গে তাদের ঘর্ষণ লাগে। পায়ের নীচে বিপাশার খরস্রোত পাথরে পাথরে প্রবল কলহ বাধিয়ে ছুটে চলেছে। কাশ্মীরের সেই পণ্ডিতানী এবং তাঁর যুবক পুত্র বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রয়েছেন। গাড়ি চলেছে এঁকে বেঁকে। আমাদের গন্তব্য এখনও অনেক দূর।

শুধু বিপাশা নয়। আরও দুটি নদী তাদের প্রথম ধারাপথ পেয়েছে এই পার্বত্য ভূখণ্ডে। একটি ইরাবতী, অন্যটি চন্দ্রভাগা। কুলু উপত্যকার দক্ষিণ পাহাড়ের পিছন দিয়ে বন্য শতদ্রু উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে। সুন্দরনগরের উপত্যকা থেকে কুমারসাঁই যাবার পথে শতদ্রু পেরিয়ে যেতে হয়। কুমারসাই থেকে কোটগড় হয়ে নারকাণ্ডা পৌঁছতে পারলে হিন্দুস্থান-টিবেট রোড পাওয়া যায়। অতঃপর রামপুর, ওয়াংটা ও চিনি-কিন্নর হয়ে বুশাহর রাজ্যের ভিতর দিয়ে শিপকির গিরিসঙ্কটে পৌঁছনো চলে। শিপকি থেকে রংচুং উপত্যকার প্রধান ক্যারাভান পথ গারটকের দিকে চলে গেছে। গারটক থেকে কৈলাস পর্বতমালার ভিতর দিয়ে ক্যারাভান পথ। সোজা দক্ষিণে পৌঁছেছে মানসসরোবরে। এই পথ পনেরো থেকে ষোলহাজার ফুট উচ্চ মালভূমি আর পাহাড়তলী অতিক্রম করে চলে গেছে। এপথ অতি প্রাচীন! একশো বছরেরও আগে কাশ্মীর মহারাজার প্রসিদ্ধ সেনাপতি জোরোয়ার সিং এই অঞ্চলে সংগ্রাম করে লাডাখ প্রভৃতি পশ্চিম তিব্বত ভারতের পক্ষে জয় করেন, এবং এই অঞ্চলেই তাঁকে হত্যা করেছিল তিব্বতীরা।

'আউট' নামক একটি পাহাড়ী গ্রামে এসে আমাদের মোটর-বাস থামলো। এ গ্রামটি মণ্ডি আর সুলতানপুরের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে। রাস্তাটা একতরফা বলে বিপরীত দিকের

একখানা গাড়ি ‘ব্যারিয়রের’ ওপাশে এতক্ষণ আমাদের গাড়ির জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার সেখানা ছেড়ে গেল মণ্ডির দিকে। এ দুখানা ছাড়া আর কোনও গাড়ি আজ চলবে না।

কয়েকটি দোকান এবং পুলিশের ফাঁড়ি নিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি,—কিন্তু তাদের উপরে খোদাইয়ের কাজগুলি অতি সুন্দর এবং মনোজ্ঞ। পাহাড়ী দেশের বাড়িমাত্রই কাষ্ঠপ্রধান। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের সিঁড়ি এবং কাঠের সিলিং। কিন্তু ছাদগুলি অধিকাংশই স্লেট্‌পাথরের। এ পাশের পথ গিয়েছে পাহাড়ী বস্তির মধ্যে। পশ্চিম পাহাড়ের অধিত্যকা অঞ্চলে অল্পস্বল্প ক্ষেত খামার এবং চাষবাস চলছে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ মনে হতে পারে, কাশ্মীরের কোনও একটি মনোরম অঞ্চলে এসে পড়েছি। ওপাশের একটি ছায়াঢাকা অরণ্যপথ যেন আমারই উদ্বিগ্ন চিত্তের ক্ষুধার বার্তা নিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। কিন্তু ওই পথটি যে কত দুর্গমে গিয়েছে তার খোঁজ আমরা রাখিনে। নদী পেরিয়ে ওইটি গিয়েছে লারজি উপত্যকায়, সেখান থেকে উঠে গিয়েছে দক্ষিণ পর্বতের গহনলোকে,—গুহায়, গহ্বরে, জলধারার শিরা-উপশিরায়, শ্বাপদভয়ভীত আদিম পার্বত্য অধিবাসীর আনাচে-কানাচে, অনাবিষ্কৃত ওষধি-পর্বতের লতাশিকড়ের বিচিত্র বন্যগন্ধ পেরিয়ে এই পথ উঠেছে এক সময় বিশাল পর্বতের চূড়ায়—যেখানে ‘বানজার’ নামক জনপদের প্রান্তে ‘বাসলেও’ এবং ‘জলোরি’ গিরিসঙ্কট পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। অবশেষে এই পথ সুদূর দক্ষিণে গিয়ে শতদ্রু অতিক্রম করে কুমারসাঁইতে গিয়ে মিলেছে। বুশাহর রাজ্য থেকে বণিকের দল এই পথ দিয়ে কুলুতে এসে প্রবেশ করে। এই পথে বন্য কুকুর, ভয়াল সর্প, হিংস্র চিতা এবং পীতাভ ভল্লুক অসতর্ক পথিককে অতর্কিত আক্রমণ করে। পাহাড়ী ছাগল এবং অশ্বতরের ক্যারাভান ছাড়া এপথে আগে চলতো অশ্বারোহী পর্যটক, এখন পথ কতকটা সুগম হওয়ায় ছোট জীপ গাড়ি অতিক্রম করে যায়। শীতের দিনে এপথ কঠিন তুষারে আবৃত থাকে।

মোটর পথে বিপদের সমূহ আশঙ্কা ছিল,—সুতরাং আমরা আড়ষ্ট হয়ে এতক্ষণ বসে ছিলুম। ‘আউট’-এ এসে গাড়ি থামতেই মায়াদেবী এবার গা ঝাড়া দিলেন। সামনের একটি দোকানে বেশ রুচিকর জলযোগের আয়োজন দেখে আমরা যেন সোৎসাহে মরজগতে ফিরে এলুম। ওপাশ থেকে সেই বর্ষীয়সী পণ্ডিতানী প্রসন্ন নয়নে আমাদেরকে এক একবার লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর চাহনির নির্বিকার স্নেহশীলতা যেন আনন্দদায়ক।

আহারের আয়োজন করা গেল। মায়াদেবী সহাস্যে বললেন, আমাদের মুখের কাজ কিন্তু কোথাও বন্ধ হয়নি, দেখেছেন?

বললুম, শুধু তাই নয়, হজমেরও ব্যতিক্রম ঘটেনি!

তিনি প্রচুর হাসলেন, এবং অতঃপর ঘৃতপক্ব পুরি ও জিলাবীর সদ্ব্যহার চলতে লাগলো বহুক্ষণ অবধি।

ঠিক এই কারণেই গাড়ি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। শরীরতত্ত্ব অনুসারে শোক তাপ দুঃখ ভয় ভালোবাসা অথবা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন নিবিড় হয়, তখন নানাবিধ ক্ষুধা বাড়তে থাকে। এখানে আতঙ্কের থেকে আমাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্ত্রতন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলী ভয়ের মধ্যে এতক্ষণ অবধি প্রবল পরাক্রমে আপন-আপন কাজ করেছে, সন্দেহ নেই।

গাড়ি ছাড়লো এক সময়ে। এখনও বেশ বেলা দেখা যাচ্ছে আকাশে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এরপর থেকে পথ কিছু প্রশস্ত হবে। কুলু-টুপি মাথায় দিয়ে চলেছে কত লোক,

হাসিমুখীরা চলেছে ওদের পাশে পাশে। পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে লাহুলের ব্যবসায়ী। বস্তুত, কুলু উপত্যকা বলতে যা বোঝায় তা হলো বিপাশা নদীর দুই পার মাত্র। সেটি কখনও সঙ্কীর্ণ, কখনও বা দীর্ঘ। শেষের দিকে কতকটা সমতল, নচেৎ—চড়াই এবং উৎরাই। কোনও কোনও স্থলে এই দুই পার প্রশস্ত হয়ে দুদিকে একমাইল থেকে দুমাইল আন্দাজ প্রায়-সমতল ভূভাগে পরিণত হয়েছে,—এই মাত্র। সেখানে চাষবাস চলছে। মাঝে মাঝে এক একটি ক্যান্টিলিভার অর্থাৎ ঝুলাপুলের দ্বারা বিপাশার এপার-ওপারের উপত্যকাকে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আমরা বলি, পৃথিবী এখানে আশ্চর্য। একথা বলে যাবো চেঁচিয়ে, এ অঞ্চলের যেখানে-সেখানে স্বর্গের পারিজাত কাননের যবনিকা যেন উত্তোলন করা হয়েছে। সংখ্যাতীত স্বর্গলোকে বিচরণ করে চলেছি,—বলে যাবো একথা গলা বাড়িয়ে। সমগ্র সত্তার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন অদৃশ্য হস্তে খুলে ধরছে অমরাবতীর দ্বার! দেখে নাও প্রাণ ভরে,—যা স্বপ্নলোকের দিশাহারা পথেও কোনোদিন দেখোনি। ওই নদীর নীচে শিলাসনে কোথাও বসে যাও, কিংবা এসো বনচ্ছায়ায়,—ওক্, জুনিপার, চীড় কিংবা স্প্রুসের তলায় গিয়ে নির্জনে বসো তপস্যায়, আর নয়ত আনন্দের বুকফাটা কান্না কেঁদে বেড়াও ওই গুল্মলতাকীর্ণ প্রাচীন পাথরের আনাচে কানাচে,—শুধু যে তোমার জীবন কেটে যাবে তা নয়,—ঈশ্বরকেও হয়ত বা পেয়ে যাবে সহজে!

ঈশ্বর! মুখ ফিরিয়ে চুপ করে গেলুম। ঈশ্বরকে ভাবলেই মনে পড়ে যায় নানা দৃশ্য। তপোবনে তপস্যায় বসেছেন ঋষি, শাক্যসিংহ অধ্যাত্মক্ষুধায় কেঁদে বেড়াচ্ছেন আর্যাবর্তের পথে-পথে, মৌর্যসম্রাট অশোক অসীম পিপাসা নিয়ে পরিভ্রমণ করছেন আসমুদ্রহিমাচলে, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিক চেয়ে রয়েছেন অনন্ত প্রশ্ন নিয়ে,—এরা ভীড় করে আসে মনে। এর পরে আবার পট-পরিবর্তন ঘটে। চেয়ে দেখি, মানুষ রুদ্ধশ্বাস হচ্ছে অপমানে, অলজ্জ মালিন্যে তার জীবন বিকৃত, নৈতিক অধঃপতনে একটি জাতির ভয়াবহ পরিণাম, হাস্যকর দম্ভে সভ্যতার কদর্য স্বরূপ! ফিরে তাকাও আবার অনেক নীচে। নোংরায় মুখ থুবড়ে রয়েছে কেউ, আর্তনাদ শুনছি নিরন্নের, নিরুপায় শরণার্থীর বীভৎস অপমৃত্যু ঘটছে চোখের সামনে,—ঈশ্বর যেন রয়েছে ওদের মাঝখানে। যন্ত্রণায় দুঃখে সঙ্কটে বেদনায় অপমানে ঈর্ষায় ঘৃণায় পাশবতায় ধিক্কারে,—পলকে পলকে দেখে নিয়েছি ঈশ্বরকে!

পৃথিবীর মধ্যে যে-মন্দিরটি সর্বশ্রেষ্ঠ,—দেবতা যেখানে নিত্য জাগ্রত,—সেটি হলো মানুষের প্রাণ। ওই প্রাণের মূল দণ্ডের থেকে কতবার আমার বাসাছাড়া পাখি রাত্রির অন্ধকারে ব্যোমলোক পেরিয়ে উড়ে গেছে দুর্লভ নীলপদ্মের সন্ধানে, ডাক দিয়েছে অনেকবার ওই মহাশূন্যপথে, তার বিদীর্ণ কণ্ঠে রক্ত ঝরেছে অনেক,—ঝড়ের হাওয়ায় অশ্রু উড়ে গেছে অনেকবার। কিন্তু আজ বিপাশার তটভূমিপথে যেতে যেতে তার হিসাব নিতে মন কেন চাইবে? তবু এখানে এই অভিনব পটভূমির মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি অমরাবতীর সেই আশ্চর্য ছায়া। যদি বলো, এই স্বর্গ—আপত্তি নেই। যদি বলো, উনি আনন্দস্বরূপ—প্রতিবাদ করবো না। উনি অনেকবার আমাকে নিয়ে আনন্দ করেছেন বৈকি। মধ্যরাত্রের ভয়াবহ অরণ্যলোকে উনি আমাকে বহুবার ডেকে নিয়ে গেছেন; ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রীর সমুদ্রে উনি দেখিয়েছেন করাল মৃত্যুস্বরূপ; সমগ্র ভারতের পথে পথে রৌদ্রে ঝড়ে বন্যায় উনি আমাকে বানিয়েছিলেন লীলাসহচর।—তারপর এই হিমালয়ের হাজার-হাজার বর্গমাইলে পোষমানা জন্তুর মতো প্রতি পাথর শুঁকেশুঁকে অর্থহীন অন্বেষণে পরিভ্রমণ করে ফিরেছি। কাঁদিয়েছেন উনি অনেক, মুখে অন্ন তুলতে দেননি,

দুর্যোগের দ্বারা আশ্রয় ভেঙে দিয়েছেন, সঙ্গীকে নিয়ে গেছেন ছিনিয়ে, মৃত্যুকে লেলিয়ে দিয়েছেন পদে পদে।

আজ আবার নতুন চেহারা এসে দাঁড়ালো বিপাশার দুই তটে। নতুন করে আমার চোখের সামনে স্বর্গ রচনা চলতে লাগলো। ওপারের মায়াকানন ডাক দিচ্ছে অমর্ত্যলোকে; এঁকে যাচ্ছে বর্ণের আলিম্পনা। বিপাশার উৎক্ষিপ্ত শিকরকণার ধূম্রজালের ভিতর দিয়ে দেখছি, অকাল বসন্তের রুদ্ধ সুরভীশ্বাস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে বনে-বনে। প্রতি বৃক্ষচ্ছায়ায় তপোবনের শান্তশ্রী, প্রতি প্রস্তরের গুল্মজড়িত গাত্রে অলক্ষ্য মুনির অবয়ব, প্রতি পার্বত্য নির্ঝরিণীর ঝুমুর-ঝনকে বেদমন্ত্রধ্বনি, প্রতি রঙ্গীন পাখির কলস্বনে ঋষিকন্যার কলকাকলী। ওরা আমাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছে না!

উপত্যকা ঈষৎ প্রসারিত হচ্ছে। দেবভূমে আমরা প্রবেশ করেছি। কুলু উপত্যকার ভিন্ন নাম হলো, 'দেবভূম,'—Valley of gods. চেতনার উপরে এসে পৌঁছয় শান্ত গভীর একটি প্রসন্ন আনন্দের অনুভূতি,—এটিকে বলা হয়েছে দৈব। এখানে এলে মন ভাবতে থাকে দেবতার কথা, সুতরাং এটি দেবভূম। দেখতে দেখতে আমাদের বাস এসে পৌঁছলো 'বাজৌরার' একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এখানে বহু শতাব্দীকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব শোভাময় বাজৌরার প্রাচীন মন্দির,—এখানে শৈব ও শাক্তের উপাসনা চলে। মন্দিরের বর্ণ হলো গৈরিক, এবং এর অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য উত্তর ভারতের যে-কোনও শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমতুল্য। এককালে চান্দেল্লা রাজপুত গোষ্ঠী যে-কালজয়ী প্রতিভা ও সৌন্দর্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিন্ধ্যপ্রদেশে 'খাজুরাহোর' মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল, এ-মন্দিরে যেন তাদেরই ছায়া পড়েছে। 'বাজৌরার' প্রাচীন মন্দির সমগ্র 'দেবভূমকে' যেন পরমার্থ দান করেছে।

এই দেবভূমের আলোচনায় আরেকটি অঞ্চলের কথা মনে পড়ে গেল। সেটি হলো 'পার্বতী উপত্যকা'। মানালি থেকে 'পার্বতী উপত্যকার' দিকে অগ্রসর হওয়াই সুবিধা, কেননা এখান থেকে বাহনের ব্যবস্থা করা যায়। 'ভুন্তারগাঁও' থেকে 'পার্বতী' পৌঁছতে দুদিনের কম লাগে। এই অঞ্চল কুলুরই অন্তর্গত, কিন্তু কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। এর বন্যতাই হলো শোভা; সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার মধ্যে যে সুপ্রাচীন স্বভাবকৌমার্য আমরা কল্পনা করি,—সম্ভবত সেই বস্তুর চিহ্ন এখানে মেলে। চারিদিকের গগনচুম্বী বিরাট গিরিচূড়াদলবেষ্টিত এই বহুবর্ণা নন্দনসুশোভিতা উপত্যকাকে যারা নাম দিয়েছে 'পার্বতী', তাদেরকে নমস্কার জানাই। এই পার্বতীর ভিতর দিয়ে প্রস্তরসঙ্কটসংঘর্ষ অতিক্রম করে যে-দুরন্ত নদী নেমে এসেছে, তার দুই পারের জনশূন্যহীন অরণ্যলোকে হিমালয়ের আদিম অতিপ্রাকৃত স্বরূপটি চোখে পড়ে। নদী এসে মিলেছে বন্য বিপাশায়।

বাজৌরা থেকে কয়েক রশি পথ দক্ষিণে এগিয়ে গেলে একটি পথ উত্তরপূর্বে 'মণিকরণের' দিকে চলে গেছে। কিছুদূর গিয়ে নদীতীরে-তীরে দুইপারে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরলোক। কোথাও কোথাও শস্যক্ষেত্র, এবং তারই পাশে পাশে চড়াই উৎরাই।—এমনি করে অগ্রসর হয়ে গেলে পর্বতপ্রাকারের কোলে 'মণিকরণে' পৌঁছনো যায়। চিত্রপটের মতো এই ছোট জনপদ। গ্রামের নরনারী অতি সদাশয় এবং অতিথিবৎসল। মানুষের তঞ্চকতা, দুষ্প্রবৃত্তি অথবা নৈতিক অধোগতির সঙ্গে এখানকার স্বল্পতুষ্ট অধিবাসীর কোনও পরিচয়ই নেই। দেবদেউল রয়েছে এখানে ওখানে। অধিবাসীরা সুশ্রী

ও ভদ্র। এখানকার প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করা বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর । বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, চর্মরোগ এবং অজীর্ণরোগের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারী। পার্বতী উপত্যকাটি 'মণিকরণে'র জন্যই সুবিখ্যাত। কুলু থেকে প্রথম যাত্রারম্ভে পথের ধারেই পড়ে একটি 'শক্তি' মন্দির। উপত্যকার মেয়েরা এখান থেকে সিন্দূর নিয়ে আপন-আপন ললাটে লেপন করে। সিন্দূরশোভিত নারী দেখে চলেছি পথে পথে। বাঙালী মেয়ের স্বভাব ছুঁয়ে রয়েছে ওদের সর্বাঙ্গে।

সায়াহ্নকালে এসে পৌঁছলাম 'সুলতানপুরে'। এইটি আমাদের গন্তব্য। এরই আধুনিক নাম কুলু শহর। বিপাশা নদীর তীরে এখানে উপত্যকা বেশ সুপ্রশস্ত,—একটি ছোটখাটো পার্বত্য শহর নির্মাণের পক্ষে স্থান সঙ্কুলান হয়ে যায়। এই শহর প্রধান সরকারী কেন্দ্র। কাংড়া, ধরমশালা, পালামপুর এবং যোগিন্দরনগরের পরেই সুলতানপুর, ওরফে কুলু। গাড়ি থামলো এসে একটি সুন্দর নাতিবৃহৎ ময়দানের সামনে, মাঠের পশ্চিম সীমানায় ডাকবাংলো। আমাদের সঙ্গেই গাড়ি থেকে নামলেন কাশ্মীরের পণ্ডিতানী এবং তাঁর যুবক পুত্রটি।

এবার একটি স্থূল বিষয়ে আলোচনা করি। বাইরে গিয়ে কুলু উপত্যকা সম্বন্ধে যে-প্রকার প্রচারকার্য চালানো হয়, এবং সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে কুলুকে যে ভাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পাশেই বসানো হয়, সেটি সত্য নয়। হোটেল নেই বললেই চলে। খাদ্যাদি একেবারেই সুলভ ও সহজপ্রাপ্য নয়। সারাদিনে দুখানা বাস ছাড়া অপর কোনও প্রকার যানবাহনাদি নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী পেতে গেলে দুদিন আগে থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে লোক পাঠাতে হয়। ফলে, কুলু উপত্যকায় সমগ্র বসবাসকালটিতে অসংখ্য কাঁটা পদে-পদে বিঁধতে থাকে।

ডাক বাংলায় জায়গা পাওয়া গেল না। যাত্রীশালাও বহু দূরবর্তী। অবশেষে একটি লোক জানালো, অনুমতিপত্র আনালে 'ফরেস্ট রেস্ট হাউসে' আশ্রয়ে মিলতে পারে। তাই করা হলো। কিন্তু 'রেস্ট হাউস' অন্ধকার। না আছে ইলেকট্রিক, না কেরোসিন, না বা কোনও আহার্যলাভের সুবিধা। 'রেস্ট হাউসটি' আবার ওরই মধ্যে একটু টিলা পাহাড়ীপথের বনময় অঞ্চলে। অনেক চেষ্টার পর হারিকেন লণ্ঠন যোগাড় করা গেল। কিন্তু কিছুকাল আগে থেকে পণ্ডিতানীর সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ করেছিলুম, দেখা গেল সেটি সত্যে পরিণত হলো। তিনি এবং তাঁর ছেলে কোথাও থাকার জায়গা পাননি। অতএব আমি সেই যুবকটিকে এবার আমন্ত্রণ করলুম। মায়াদেবী এগিয়ে গিয়ে সেই মহিলার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কাশ্মীরী 'বোলিতে' আলাপ করলেন। ওঁরা তীর্থে বেরিয়েছেন, এবং মানালির বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শন করতে যাবেন। আগামীকাল অপরাহ্নে ফিরবেন মণ্ডিতে। সেখানে তাঁদের লোক আছে। মহিলা মায়াদেবীর কাছে যখন শুনলেন, আমি ব্রাহ্মণ, তখন তিনি 'রেস্ট হাউসে' এসে রাত্রিবাস করতে সম্মত হলেন। আমরা খুশী হলুম, কেননা এই নির্জন বনচ্ছায়াময় বাংলোটিতে আরও দুজন সঙ্গী পাওয়া গেল। দুটি ঘরে আলো জ্বালা হলো।

আমার স্বর্গতা জননীর মুখের সঙ্গে পণ্ডিতানী মহাশয়ার কেমন যেন একটি সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সেকথা মায়াদেবীকে জানাবার সময় পাইনি। সন্ধ্যার পরে একটু বাহাদুরীর লোভে যখন পণ্ডিতানীর পূজার জন্য বিপাশা থেকে পিতলের পাত্র ভরে জল এনে দিলুম,—আমার সেই পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করে মায়াদেবী একটু কৌতুকও বোধ করছিলেন।

তারপর ওই যুবকটিকে এখানে পাহারা মোতায়েন রেখে আমি যখন চৌকিদারের অলক্ষ্যে অন্ধকার বন-বাগান থেকে মহিলার পূজার জন্য কতগুলি ফুল তুলে আনলুম, তখন তিনি পরিহাস করতে ছাড়লেন না। বললেন, যাক্, বুড়ো হলে মেয়েদের একটা সুবিধে,—পথে ঘাটে ছেলে কুড়িয়ে পাওয়া যায়!

কি যেন জবাব দিয়েছিলুম, আজ আর মনে নেই। ফুলগুলি হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, মহিলা তাঁর পূজার আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে প্রসন্ন হাস্যে উঠে এসে ফুল নিলেন। ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বললেন, বেটা, জিন্দা রহো!

তিনি আরও জানালেন, তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের কিছু বিলম্ব ঘটে গেছে। একটু দূরের থেকে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম। তাঁর প্রশস্ত উন্নত এবং দীর্ঘ দেহ যেন প্রণামলাভেরই যোগ্য।

চৌকিদারের সাহায্যে সেই রাত্রে যেমন-তেমন আহার্য সংগ্রহ করা গেল, এবং আমরা ওই স্বল্পভাষী লাজুক এবং নম্রস্বভাব যুবকটিকে আমাদের আহারের আসরে একপ্রকার জোর করেই এনে বসালুম। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্য বলেই অবশেষে সে রাজি হলো। রাত্রের দিকে মায়াদেবী পণ্ডিতানীর ঘরে জায়গা পেয়ে গেলেন। যুবকটি রইলো আমার কাছে।

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো। গত রজনীর অন্তিম প্রহরে অরণ্যশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার দাগ লেগেছিল,—পাখিরা ভুল করে ভেবেছিল, ওইটেই বুঝি প্রভাত। ভুল ধরা পড়েছে পরে। কিন্তু ডাক দিচ্ছে সেই থেকে। পাখির দেশে পৌঁছেছি।

বেলা বেড়ে গেছে বৈকি। 'রেস্ট হাউসটি' এত নিরিবিলিতে যে, শহরের কোনও শব্দ এসে পৌঁছয় না। ঝিল্লীরব চলছে পিছনের বনে। কিন্তু নদীর আওয়াজের সঙ্গে সেই রব মিলে এমন একাকার হয়ে গেছে যে, ওদুটোর সাড়া আর কানে পৌঁছয় না।

এক সময় বাইরে এসে দেখি, পাশের ঘরটি শূন্য। সকালের দিকে মানালির গাড়িতে পণ্ডিতানী এবং তাঁর সেই স্বল্পবাক ছেলেটি চলে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরেই মায়াদেবী এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে তিনি স্নানাদি সেরে নিয়েছেন। বিশেষ কুণ্ঠার সঙ্গেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে নিতে হলো।

চৌকিদারের পক্ষে সকালের চায়ের আয়োজন করা সম্ভব হলো না, কারণ কিছুই এদিকে পাওয়া যায় না। শহর থেকে এ অঞ্চল নাকি একটু দূরে। অতএব যেমন-তেমন ভাবে প্রস্তুত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

গতকাল সন্ধ্যায় দেখে গেছি মাঠের পূর্বপ্রান্তে বিপাশা। এদিকে অনেকটা পাহাড়ের অবরোধ। পথঘাট নিরিবিলি, লোকজন তেমন চোখে পড়ে না। আমরা রাজপথ ধরে কতকটা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে এক আধটি দোকান পেলুম। থমকে দাঁড়ালেই বুঝতে পারা যায়, স্থানীয় অধিবাসীদের দরিদ্র জীবনযাত্রা। এর পরে অরণ্যজটলার ভিতর দিয়ে বিপাশা চলে গেছে অদৃশ্য হয়ে। উপত্যকা এখানে অনেকটা সমতল প্রান্তরে প্রসারিত। এটি হিমালয়ের উত্তর ভূভাগ, সুতরাং উপত্যকার উচ্চতা অল্প হলেও শীতের দিনে এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। এই শরৎকালে এখন এখানে পাখি-শিকারের আয়োজন চলছে। অরণ্যমোরগ, প্রস্তর ও তুষারপারাবত,—এরা নেমে আসবে উত্তর হিমালয় থেকে। সময় থাকতে এবার কুলুর অধিবাসীরা শাকসব্জি শুকিয়ে নিয়ে

ঘরে উঠবে। কাঠ আনবে অরণ্য থেকে। এখন থেকে ভেড়ার লোম নিয়ে শীতবস্ত্র বোনা চলছে। ছেলে বুড়ো সকলের হাতেই তকলি ফিরছে। হাওয়া নামতে আর দেরি নেই।

শহরের মাঝখানে এলুম। কিন্তু আঙুলে গুনে বলতে পারি, শহরের অধিবাসী কয়জন। কাজকারবার কিছু নেই, শহর গড়বে কি দিয়ে? ভেড়ার লোম পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু তাই নিয়ে কল-কারখানা বসাবে—কার এমন বুকের পাটা? শুধু মাল আমদানি করবে,—টাকা পয়সা কই? শুধু রপ্তানি করবে,—ভাঁড়াব কই? সুতরাং গ্রামের দারিদ্র্য নিয়ে গ্রাম পড়ে আছে চোখের আড়ালে। পর্যটকদেবকে লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে দু'দশটাকা যদি ওদের হাতে আসে, তবে তাই ওদের লাভ। সেইজন্য পাঁচজন যাত্রী গিয়ে যদি গাড়ি থেকে নামে, তবে পঁচিশজন কুলি ছুটে আসে। কুলিগিরি কিন্তু তাদের পেশা নয়, তারা হলো স্থানীয় বেকার-সম্প্রদায়। চাষবাস করে, ঘর বানায়, জন্তুর লোম থেকে কম্বল বোনে।

চায়ের দোকান আছে দু'একটি। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী পেতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেক। এবেলায় বলে রাখলে ওবেলায় মিলতে পারে। গোটা দুই ডিম হঠাৎ পেয়ে যেতে পারো, কিন্তু গোটা দশেক একসঙ্গে চাইলে গ্রামে-গ্রামে খবর দিতে হবে। মাংস পেতে গেলে আগে জন্তুটা কেনা দরকার। সর্বাপেক্ষা লোভনীয় মাছ হচ্ছে 'ট্রাউট্'—যেমন কাশ্মীবে,—কিন্তু খাবাবেব প্লেটে সেই 'ট্রাউট্' পৌঁছবাব আগে মৎস্যশিকাবী হতে হবে। এ আর তোমার দার্জিলিং-শিলঙ নয় যে, হাটবাজাব আলো কবে মৎস্যগন্ধারা সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে।

প্রাতবাশ সারা হলো পূর্বাহ্ণে। তারপব চা-ওয়ালাব সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনেব চুক্তি করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মানালির গাড়ি যাচ্ছে। এখান থেকে মানালি দূব নয়,—মাত্র চব্বিশ মাইল। পথটি পাকা, এবং এই প্রায়-সমতল উপত্যকা ছেড়ে ধীবে ধীরে উত্তরে উঠে গিয়েছে বনময় পর্বতের অন্তর্লোকে। যেমন সর্বত্র—এখানেও পাহাড় যত দ'দিকে উঁচু হয়েছে, নদীর গহ্বর ততই নেমেছে নীচে। প্রকৃতি যতই তার রহস্যযবনিকা উত্তোলন করেছে, মানুষের সংখ্যা ততই কমে এসেছে। কুলু থেকে ধীরে ধীরে চড়াই পথে মাইল আষ্টেক গেলে 'রায়সন' নামক জনপদ। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু ছবির পব ছবি। আমাদের চোখে সমস্তটা অবাস্তব, কেননা আমরা এদেবকে অভ্যস্ত সংস্কাবের মধ্যে পাইনে। দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাই, এদের সঙ্গে আমাদের নাড়িব যোগ, চোখ আমাদের তৈরী হয়েছে ওদেবই মাঝখানে। বড় শহবেব নক্সায় ইদানীং আব কোনও বৈচিত্র্য নেই। নতুন ভুবনেশ্বর তৈরী হচ্ছে নতুন দিল্লীর ছাঁচে,—চণ্ডীগড়ও তাই। পুরনো দিল্লীর সঙ্গে আগ্রা-মথুরার তফাৎ কম। বোম্বাই-কলকাতার লোক মাদ্রাজে না গিয়েও জানে, তামিল শহরটি কেমন। এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ একই। গয়া-কাশীতে সামান্য তফাৎ। লন্ডনের লোক নিউইয়র্কে কোনও বৈচিত্র্য পায় না। প্যারিস আর বার্লিনেব নক্সায় কতটুকুই বা পার্থক্য। কিন্তু এখানে এই দূর হিমালয়ের গহনলোকে অনন্ত বৈচিত্র্য। নীলাভ জলধারার ধারে একটি রক্তকরবী সমগ্র পার্বত্য প্রকৃতির পরমার্থ বহন করে। তুষারচূড়ায় যখন পঞ্চমীর শীর্ণ শশিকলা এসে দাঁড়ায়, মহাকাব্যেও সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পায়নি কোনওদিন। একটি বাড়ির সুন্দর কাঠের কারুকার্য—সমস্ত জনপদের স্বভাবকে প্রকাশ করে। পাহাড়তলীর ছোট একটি বাঁক, একটি গাছের একান্ত ছায়া, একটুকরো বনান্তরাল, একটি নির্ঝরিণীর মৃদু ঝঙ্কার,—এরা যেন সমস্ত জীবনের নিরুদ্ধ পিপাসাকে জাগিয়ে তোলে।

পর্বতপ্রাচীর এবং অল্পস্বল্প সমতল সংযুক্ত নিঃঝুম বনভূমি। মাঝখানে বিপাশা। পশ্চিমে 'কাটরাইন', এবং পূর্বপারে 'নাগর'। কাটারাইনে নদী পার হয়ে নাগরে পৌঁছতে হয়। এ পথে আসে তিব্বতী ব্যবসায়ীরা। পূর্বদিকে বিরাট পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গেলে স্পিতি-উপত্যকা। নাগর থেকে পর্বত-আরোহণ করা যায় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুগম পথ হলো মানালির পথ। 'নাগরের' জনপদটি আপন শোভা আর সৌন্দর্য নিয়ে নদীর অপর পারে তপস্যার আসনে বসেছে যেন স্বভাবসৌন্দর্য নিয়ে। সভ্যতার থেকে অনেক দূর।

এই 'নাগরে' একটি অতি সম্ভ্রান্ত রুশ পরিবারের কাহিনী গচ্ছিত রয়েছে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রুশবিপ্লবকালে একটি ধনী পরিবার ভারতের তদানীন্তন বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এঁরা বোধকরি সাম্যবাদী বিপ্লবীদলের হাত থেকে নিজদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা পান। এই বিত্তশালী জমিদারের নাম ছিল, মিঃ নিকোলাস রোয়েরিখ্। তিনি ছিলেন জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী এবং স্বনামধন্য পর্যটক। তাঁরা এই কুলু উপত্যকায় আসেন, এবং নাগরে জায়গাজমি কিনে ঘরদোর তৈরী করেন। এঁরই পুত্র জুনিয়র মিস্টার রোয়েরিখ্ একজন প্রকৃত পণ্ডিত, গুণী এবং চিত্রশিল্পী। এঁর চরিত্রবত্তা, স্বভাবমাধুর্য এবং নম্রসৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে পরলোকগত চিত্রনির্মাতা হিমাংশু রায় মহাশয়ের পত্নী ভারতপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারাণী দ্বিতীয় পক্ষে মিঃ রোয়েরিখ্‌কে বিবাহ করেন। বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় বছর দুই হতে চললো। একদা শ্রীমতীর আমন্ত্রণক্রমে তাঁর বোম্বাইয়ের অস্থায়ী বাসস্থানে গিয়ে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের আনন্দময় চেহারাটি দেখেছি, এবং সৌম্যদর্শন রোয়েরিখের শান্ত ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। বেশ মনে পড়ে, হাসিমুখে দেবিকারাণীকে প্রশ্ন করেছিলুম, এ-জীবন কেমন মনে হচ্ছে? কেমন মানুষ রোয়েরিখ্?

দেবিকারাণী মুগ্ধকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, সত্যি বলবো, যদি কোনওদিন মাথা ধরে চুপ করে বিছানায় পড়ে থাকি, উনি সেদিন অন্নজল মুখে তোলেন না! আবার উনি সতর্কও থাকেন,—সে-খবর যেন আমার কানে না ওঠে। শান্তিই আমার কামনা ছিল! এমন স্বামী অনেক ভাগ্যে মেলে।

'দেবভূম' কুলু উপত্যকার অপার্থিব সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করে যেদিন ফিরে আসি, তার পরের দিন বোম্বাইয়ের 'তাজমহল' হোটেল থেকে দেবিকারাণীর একখানি চিঠি পাই :

"...It was an honour and a privilege—such contacts in life make one feel that there is still a purpose, that there are values of a deeper nature in this very materialistic age, which makes it so much easier to enrich one on the way..."

দেবিকারাণীর অভিনয় দুচারবার দেখেছি বৈ কি, কিন্তু মানুষটি ভিন্ন প্রকারের। স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে তাঁর একটি সহজাত অধ্যাত্মপিপাসা আমাকে বিস্মিত করেছিল। অতঃপর দিল্লীতে প্রথম ভারতীয় 'ফিল্ম সেমিনার' উপলক্ষ্যে আমার ডাক পড়ে, এবং সেখানে গিয়ে রোয়েরিখ্ দম্পতির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে।

'নাগরের' পর থেকে একটি ইউরোপীয় পরিবারের নাম সর্বত্রই শোনা যায়। বস্তুত,

সমগ্র কুলুর সঙ্গেই সেই নামটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই নামটি হলো 'বেনন্' পরিবার। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে সামরিক বিভাগের জনৈক কর্মচারী মিঃ বেনন্ প্রথম আসেন কুলুর পথে দুর্গম ও দুস্তর হিমালয় পেরিয়ে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আরেক বন্ধু ক্যাপ্টেন লী। এই ভূস্বর্গের আকর্ষণ তাঁরা সামলাতে পারেননি,—এবং অবসর গ্রহণের পর তাঁরা এসে মানালিতে বাসা বাঁধলেন এবং সমগ্র অঞ্চলে ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। সেই সব বাগান আজও সুপ্রসিদ্ধ।

পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে 'লী' এবং 'বেনন্' পরিবার এখানে সমৃদ্ধ। বড়াগাঁও এবং মানালিতে তাঁদের হোটেলগুলি বহুজনপরিচিত। প্রত্যেক পাহাড়ীর কাছে ওঁরা 'চিনি সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ, প্রত্যেক গ্রামে ওঁরা সুখ্যাত। পার্বত্য নারীকে ওঁরা বিবাহ করেছেন, এবং বহুলাংশে শিক্ষাবিস্তারেও সহায় হয়েছেন। অত্যন্ত বিস্ময় লাগে, হিমালয়ের গহনলোকে গিয়ে যখন এই সাহেব গোষ্ঠীটি পর্যটকের সম্মুখে আবিষ্কৃত হয়। এঁদের বাগানের 'সেও' এবং নাশপাতি সদৃশ 'বাগুগোসা' অতি মধুর।

মন্দির-প্রধান হলো সমগ্র কুলু উপত্যকা। বিভিন্ন পাল-পার্বণে নানা দেবদেবীকে সমারোহ সহকারে বাইরে আনা হয়। মানালি, নাগর, কাটরাইন, রায়সন, বড়াগাঁও এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিবাসীরা নেমে এসে উৎসবে মাতে। এ ছাড়া লাহুল, তিব্বত, লাডাখ, ইয়ারখন্দ, খোটান, স্পিতি, পার্বতী,—ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকরা কুলুতে এসে পৌঁছয়। সমগ্র উপত্যকায় তখন বসে নাচগানের আসর। আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি পূজা আসন্ন; বিজয়াদশমীতে ওদের সর্বপ্রধান উৎসব হলো 'দশহরা'। তখন চারিদিক থেকে দেববিগ্রহরা এসে পৌঁছবে, এবং সর্বপ্রধান পূজা পাবেন রঘুনাথজী। কুলু উপত্যকায় সেদিন বিপাশার কূলে-কূলে কুলনাশিনীদের নাচের দোলায় অনেকের জীবন-তরী কূল ছেড়ে চলে যাবে অকূলের দিকে।

উচ্চ মালভূমির উপর মানালি গ্রাম। পাইন এবং দেওদারের শোভায় চিত্রিত মানালি। উত্তুঙ্গ গিরিমালা স্তরে-স্তরে চলে গেছে একদিক থেকে অন্যদিকে। তুষারের চূড়া অতি সন্নিকট বলে মনে হয়, কিন্তু সেটি দৃষ্টিবিভ্রম।

কিছুদূর এগিয়ে পথ চলে গেছে উত্তরে বিপাশার তীরে তীরে। এর পর ক্রমেই রয়ে গেল হিমালয়ের স্বাভাবিক জনবিরলতা। পথ চলে গেছে দূর দূরান্তরের চড়াইয়ের দিকে—যেদিকে 'রেহালা' হয়ে 'রোহটাং' গিরিসঙ্কট। দশহাজার ফুট ছাড়িয়ে গেলে তৃণফলকের দেখা পাওয়া কঠিন, কিন্তু তুষারধবল গিরিশৃঙ্গদলের শান্ত গম্ভীর প্রকাশটি অনন্ত বিস্ময় বহন করে। এই 'রোহটাং' গিরিসঙ্কটের উত্তরে সমুদ্রসমতা থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চ ব্যাসঋষিশৃঙ্গ। এই শৃঙ্গেরই তল থেকে রোহটাং গিরিসঙ্কটের আশে পাশে জন্ম নিচ্ছে পাঞ্জাবের দুটি প্রধান নদী—একটি বিপাশা, অন্যটি চন্দ্রা। চন্দ্রানদী আরও দুটি নামে পরিচিত। একটি চন্দ্রভাগা, আরেকটি চেনাব। বিপাশাকে অনেকে বলে, বিয়াস; হিমাচলপ্রদেশীরা বলে, 'বিয়াসা'। ব্যাসঋষির নামটিই হয়ত তারা ধরে রাখতে চায়। রেহলার পর থেকে সমগ্র গিরিশিখর এবং অধিত্যকা অঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ কাল তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে। দশ এগারো হাজার ফুটের পরে ঋতু বলে বিশেষ কিছু নেই। বরফ জমে এবং বরফ গলে এইমাত্র। শীতের কালে অগম্য, আর কিছু নয়। তুষারঝঞ্ঝা বইতে থাকলে সব ঋতু একাকার। বাতাস যদি না থাকে এবং পরিষ্কার আকাশে থাকে

রৌদ্র,—তবে হোক না কেন পাহাড় তুষারমণ্ডিত! কর্নেল হান্ট-এর বইতে পাই, গৌরীশৃঙ্গ-বিজয়কালে মে মাসের শেষের রৌদ্রে 'এভারেস্ট' অঞ্চলে তাঁরা এক এক সময়ে রীতিমতো গরম বোধ করেছিলেন। রোহটাং গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে সোজা উত্তরপথে গেলে পাওয়া যায় উত্তুঙ্গ শিখরলোকে 'বড়ালাচা' গিরিসঙ্কট। এপথ গিয়েছে লাহুলের ভিতর দিয়ে আঠারো থেকে কুড়ি হাজার ফুট উচ্চ গিরিমালা ভেদ করে—যেদিকে 'হান্‌লে' এবং 'রূপসু' উপত্যকার কোলে পাওয়া যায় লবণাক্ত বিরাট 'মুরারি' হ্রদ। লাহুল উপত্যকার উত্তরাঞ্চল দিয়ে জাস্কার পর্বতমালা নেমে এসেছে দক্ষিণে—যেখানে ধবলাধারের পূর্বসীমায় পীরপাঞ্জাল গিরিশ্রেণীর শেষপ্রান্তভাগ সংযুক্ত। সুতরাং রোহটাং গিরিসঙ্কট এখানে ত্রিমূর্তি সঙ্গমের কাজ করেছে। ভারতীয় সীমানা এখানে অনির্ণীত।

মানালি হলো এই সকল দুর্গম ও দুরারোহ হিমালয়পথের প্রথম তোরণদ্বার। এখানকার বাতায়নে মুখ রেখে দেখে নেওয়া যায় বিচিত্র দেশের অজানা অনামা অধিবাসীকে। অনেক সময় তারা নামহারা, পরিচয়হারা—তারা শুধু পার্বত্যসন্তান। চিরকাল ধরে তারা নিশ্চিন্ত, চিরদিন নিস্পৃহ,—এবং সভ্যতার পর সভ্যতা এসেছে আর চলে গেছে,—কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করেনি। সভ্য জগতে তারা পৌঁছয়নি কোনওকালে, সভ্যতার স্বাদ কেমন জানেনি, পরখ করেনি, চোখে দেখেনি। ওদের দুর্গপ্রাকারের বাইরে নীচের তলায় ভারত-ইতিহাসে শতশত বছরের বিবর্তন ঘটে গেছে। গৌতম বুদ্ধের পরে আর কোনও মহাপুরুষের সংবাদ হয়ত বা ওদের কানে পৌঁছয়নি!

যেমন 'বাজৌরায়' তেমনি মানালিতে—মন্দির অতি প্রাচীন। কিন্তু বাজৌরার হিন্দু স্থাপত্য এইটুকু দূর মানালিতে এসে মঙ্গোলীয় বৌদ্ধস্থাপত্যের শৈলীতে মিলিয়ে গেছে। এ একেবারে নতুন,—দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের গোত্রের মিল নেই। হিন্দু বটে, কিন্তু সাজপোশাক বদল করেছে। মানালির একটি মন্দিরের সন্ধান দিয়েছিলেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেটি হলো 'হিড়িম্বা'র মন্দির। মানালির গ্রাম ছাড়িয়ে দেওদারের গহন বনবেষ্টিত পাহাড়ের প্রাচীন বনস্পতির শাখাপ্রশাখার অন্তরালে এই মন্দিরটি যেন মনোরম দারুশিল্পের প্রতীক। জনশূন্য বনভূমির মাঝখানে এ মন্দির অনেকটা প্যাগোডার মতো। ছায়াচ্ছন্ন বনে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে চায় না,—চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের ভিতর থেকে গড়িয়ে এসেছে দরদর রক্তের ধারা! চমকে উঠলে চলবে না,—ভয় পেলেই পরাজয়। অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে, একটি সুন্দরী রমণী আসছে এগিয়ে,—মাথায় তার কাঠের বোঝা। অধরে তার মধুর হাসির রঙ্গিমা,—তার চেয়েও রঙ্গীন তার বেশভূষা। বড় বড় চোখে সর্বনাশা দৃষ্টি মেলে এই সুন্দরী সহাস্যে তাকালো! এ মন্দিরের পূজারী কই—এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানাবে, সেই পূজারিণী! তারপরে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি একটি গুপ্তদ্বারের ভিতর দিয়ে মন্দিরে ঢুকবে এবং সম্মুখের দ্বার খুলে দেবে। প্রদীপ জ্বেলে নম্রহাস্যে একটি কোণের দিকে নির্দেশ করবে। প্রদীপের আলোয় আর আবছায়ায় দুরুদুরু বুকে এদিক ওদিক অন্বেষণ করে অবশেষে দেখা যাবে, একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণের শিলা। উনিই দেবী,—ওঁরই উদ্দেশে পশুবলি দেওয়া হয়! দরজার বাইরে তাজা রক্তে এখনও হয়ত তার হৃৎপিণ্ডের উত্তাপ জড়ানো।

রহস্যময়ী পরমাসুন্দরীর হাসি দেখে আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না; ওই হাসিতে হয়ত

বা রক্ত অপেক্ষাও গুরুতর বিপদের সঙ্কেত নিহিত,—সেই কারণে রহস্য আরও নিবিড় হয়েছে। নম্রনতমুখে অর্ঘ দান করে শান্তভাবে বেরিয়ে এসো ওই অন্ধকার মন্দিরের বাইরে, তারপর জটাজটিল অরণ্যভূমি পেরিয়ে আবার নেমে যাও মানালির দিকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুটবে তোমার পিছনে পিছনে,—কিন্তু তাদের কোনও মীমাংসা নেই। সেই প্রশ্ন তোমার মধ্যরাত্রির তন্দ্রার মধ্যে হয়ত দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলবে, হয়ত বা সেই প্রশ্নরা ওই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের শতসহস্রমাইলব্যাপী গুহায় গহ্বরে মঠে মন্দিরে অরণ্যে তপোবনে উপত্যকায় তুষারশৃঙ্গমালায়—সর্বত্র একটি বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকারে ক্ষুধাতুরা ডাকিনীর মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে!

এ যাত্রায় আমাদের ভ্রমণের শেষ পর্বে পৌঁছেছিলুম। মায়াদেবীর মুখে চোখে দেখছি ক্লান্তির ছায়া, অবসাদ এসে তাঁকে ঘিরেছে। আমি নিজে অস্থির ক্ষুধা নিয়ে ঘুরেছি নানাস্থানে, তিনি চুপ করে দেখেছেন হিমালয়কে। মন্দির দেখে প্রণাম করেছেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছেন নিঃশব্দে। তামাসা করেছি অনেকবার,—তিনি আধুনিক কালের প্রসাধন-পটীয়সী তরুণী। তিনি হাসিমুখে বরদাস্ত করেছেন আমার পরিহাস, এবং বার বার মুগ্ধমনে হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য অঞ্চলে গিয়ে একান্ত আনন্দলাভ করেছেন। অনেকবার মনে মনে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছি।

ইতিমধ্যে তিনি দিল্লীতে তাঁর ভাসুরের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি নিরাপদে আছেন, এবং অমুক দিন সকালে তাঁর ভাসুরমহাশয় যেন দিল্লী স্টেশনে উপস্থিত থাকেন। পাঠানকোট থেকে তিনি ট্রেনে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন। কুলু থেকে তিনি পুনরায় চিঠি পাঠিয়েছেন স্বামীর কাছে দক্ষিণ ভারতে। যাবার সময় আমরা নূরপুরের পথ দিয়ে যাবো।

স্থানীয় একটি কিশোর বালক তাঁর বড় অনুগত হয়েছিল। মায়াদেবী তাঁকে গত দুদিন ধরে নানাবিধ ফাই-ফরমাশ করছিলেন। উদ্দেশ্য এই, ওই ছেলেটি যেন কিছু উপার্জন করে! কথায়-কথায় তাকে বকশিষ দেবার জন্য মায়াদেবী বিশেষ ব্যস্ত। ছেলেটির নাম সুখনলাল। তার মা নেই, ঘরে আছে বাপ, ছোট ভাই, আর রুগ্ণ বোন। সামান্য চাষবাস, যেমন-তেমন ঘরকন্না, সারা বছরের অন্নবস্ত্র চলে না। মায়াদেবী একবার সুখনকে একটি টাকা ভাঙাতে দিলেন, এবং পালায় কিনা পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ছেলেটা ফিরে এলো।—এত দেরি কেন? ছেলেটা জবাব দিল, তিন মাইল তাকে হাঁটতে হয়েছে টাকা ভাঙানোর জন্য! এদিকে কারো এত পয়সা নেই যে, ভাঙিয়ে দেয়! মায়াদেবী বললেন, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর ভাঙানো চাইনে। টাকাটা তুই নে।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ। দু'আনা পেলেই সে মহাখুশী; একটাকা তার পক্ষে অনেক। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে টাকাটা তার পকেটে দিলুম। কিন্তু তখন থেকেই আমাদের একটা কাজ জুটলো। ছেলেটার কাপড়-চোপড় নেই, হয়ত ওর বোনের অসুখে ওষুধ জোটে না, হয়ত খাওয়াও জুটছে না, হয়ত বা রাত্রে গায়ে দেবার কম্বলও নেই! সুতরাং একটা মস্ত কাজ আমরা পেয়ে গেলুম। ছেলেটা আগাগোড়া অবাক। পেয়ে গেল সে গন্ধতেল আর সাবান, খাদ্যসামগ্রীর একটা অংশ, একখানা শীতবস্ত্র, এবং মোটামুটি কিছু অর্থ। ছেলেটা শীর্ণ, রং ফর্সা, মুখের ভাবে অকিঞ্চন এবং অল্পে তুষ্ট।

যে-ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট, তাকে কিছু বেশি দিতে পারলে আমরা সুখী হই। ভিখারীকে কিছু দেবার হাত সহজে ওঠে না, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীকে ভোজন করিয়ে আমরা আনন্দ পাই। যে চায় না কিছু, সেই সহজে পায়। যে ভোগী নয়, তার চারিদিকে আমরা সম্ভোগের উপকরণ সাজাতে বসি। অর্থের প্রতি যার কিছুমাত্র আসক্তি নেই, তার চারদিকে টাকা জড়ো হয়। চাইনে বললেই কাছে আসে, কামনা করলেই দূরে পালায়। সুখনলাল কিছু চায়নি আমাদের কাছে, তাই সে পেয়ে গেল তার আশাতীত। যতটুকু সে গ্রহণ করেছে, ততটুকুই যেন আমরা কৃতার্থ হয়েছি। দুদিন ধরে সে আমাদের কাছে-কাছে ছিল, এবং একজন অপরিচিতা ও ভিনদেশিনী নারীর করুণ স্নেহচ্ছায়ায় তার জীবনের ওই দুটি দিন নিত্যস্মরণীয় হয়ে রইলো।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। অপরাহ্ণের আলো সুদীর্ঘ ছায়া ফেলেছে পাহাড়ের নীচে। ডাহুকের ডাক শোনা যাচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। আশেপাশে ছোট ছোট বস্তির জীবনযাত্রা রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। ওদের সঙ্গে রয়ে গেল আমারও প্রাণের কিছু ভাষ্য, রয়ে গেল ওই প্রাচীন দেওদারের নীচে আমার ছোটখাটো করুণ আনন্দের সুর কবিতার ব্যঞ্জনার মতো। বনভূমির ভিতরে ভিতরে ঝিল্লির ঝনকে-ঝনকে রেখে গেলুম—যা কিছু আমার অপ্রকাশিত!

মালপত্র একে একে উঠলো গাড়ির চালে। গাড়ি ছাড়বে, এমন সময় সুখনলাল এসে দাঁড়ালো মায়াদেবীর উদ্বিগ্ন দৃষ্টির সামনে। কিশোর বালকের মনে কি সেই বেদনাটুকু জন্মেছে, যেটির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বিধুর বর্ণটুকু জড়ানো? আত্মার অনন্ত রহস্যের তলায় রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল বালকের কোথায় ঘটে গেল এই আত্মিক যোগ? এ কি মায়া মহামায়ার?

আমি ঈষৎ হাসলুম উভয়েব দিকে লক্ষ্য করে। আবও দুটি অহেতুক টাকা হাতে পেয়েছে সুখনলাল। নির্বোধ মূঢ় চাহনি অকিঞ্চনের আর অর্বাচীনের,—অন্যদিকে চিরকালের সেই অনাদি-অনন্ত আবেদনের সকরুণ চাহনি,—'মনে রাখিস, সুখনলাল'।

গাড়ি ছেড়ে দিল এক সময়ে। বাইরে আর ভিতরে চারটি অপলক চক্ষু মিলে রয়েছে পরস্পর। কিন্তু আমি জানি, গাড়ির ভিতরের দুটো চোখ তখন বাষ্প-থরোথরো। রবীন্দ্রনাথের দুটি ছত্র মনে পড়ে গেল : "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়, হে বন্ধু বিদায়।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতাল ও গাগর গিরিশ্রেণী

দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে নেমে এসেছেন অনেকবার। স্বর্গে অথবা মর্ত্যে তিনি দেবতা অপেক্ষা মানবিক চেহারায় অধিকতর প্রকট। তিনি ছিলেন কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয় এবং তিনি নৈতিক রক্ষণশীলতার ধার মাড়াতেন না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের দিকে টান ছিল তাঁর বেশী। অনেক সময় সক্রিয় কৌতুক-পরিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষের মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, সততা, আত্মবিশ্বাস এবং ভয়হীন অধ্যবসায়কে পরীক্ষা করতেন।

সৃষ্টিলোকে প্রতিপালকের আসনে বসে আছেন শ্রীবিষ্ণু। আনন্দ বেদনা জরা জয়োল্লাস ভালোবাসা ও স্নেহমমতা—এদের ভিতর দিয়ে তিনি এই অনন্ত সৌরবিশ্বলোকের মধ্যে থেকে পৃথিবী নামক একটি ছোট্ট গ্রহলোকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মানুষের স্বভাববৃত্তিকে তিনি কোনও আইনে বাঁধেননি। তিনি জানেন, মানুষ হলো স্বেচ্ছাতন্ত্রী, আপন প্রবৃত্তির দাস, আপন প্রকৃতির ক্রীড়নক এবং আপন বিকৃতিরই অন্ধ স্তাবক। দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দ পেতেন রাজ্যপাল বিষ্ণুর এই প্রশাসনপদ্ধতিতে। সেই আনন্দলাভের জন্য তিনি মর্ত্যে নেমে আসতেন প্রায়ই ছদ্মবেশে। তিনি হতেন বহুরূপী। মানুষের দরজায়-দরজায় বিভিন্ন বিচিত্র বেশে তিনি এসে দাঁড়াতেন। তাঁর হাতে মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়েছে বার বার।

তিনি স্বর্গলোকবাসী বটে, কিন্তু স্বর্গলোকে বৈচিত্র্য কোথা? নিত্য আনন্দময় স্বর্গ,—কিন্তু তার মধ্যে দুঃখ-বেদনার স্পর্শে মধুর কাব্যের আস্বাদ নেই। দেবতামাত্রই পুণ্যময়, কিন্তু পাপের মনোহর রঙ্গীন রূপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পারিজাত কাননের কোনও কুসুমে কীট নেই, সিংহ-শার্দূলরা সম্পূর্ণ অহিংস, সর্পের দল সর্বদা নৃত্যশীল, নগ্নকান্তি চিরযৌবনা অপ্সরাদের লীলায়িত তনুলতার সঙ্কেতে আসঙ্গলিপ্সা নেই। শোকে, অনুরাগে, দুঃখে, নৈরাশ্যে, মহত্ত্বে ও ভালোবাসায় ইন্দ্রের স্বর্গ উদ্বেলিত নয়। শ্রীবিষ্ণু তাই শত-সহস্র-অযুত-নিযুত ভূস্বর্গ রচনা করেছেন এই পৃথিবীতে। ঈর্ষান্বিত দেবরাজ একদা স্থির করলেন যে, স্বর্গ এবং মর্ত্যের কোনও এক সন্ধিস্থলে তিনি তাঁর নিজস্ব একটি রাজধানী নির্মাণ করবেন। অতএব ছদ্মবেশে তিনি পৃথিবীতে নেমে ভ্রমণে বাহির হলেন!

শিবলিঙ্গ গিরিমালার মধ্যকেন্দ্রে যেখানে 'মহাভারতীয়' পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমপ্রান্ত, সেই অঞ্চলে আলুলায়িতকেশা যোগভ্রষ্টা 'শারদা' নেমে এসেছেন উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাঁর উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে পাথর লুটিয়েছে পায়ে পায়ে; অরণ্য-অটবীর শ্বাপদের দল পরিত্রাহি আর্তনাদ করতে করতে আত্মদান করেছে তাঁর ঝাপটের কাছে। তাঁর রাশি রাশি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সংঘাতে বৃদ্ধ বনস্পতির অবলুপ্তি ঘটেছে। শারদার উন্মত্ত নাচনে সৃষ্টি রসাতলে গেছে অনেকবার।

কিন্তু 'মহাভারতীয়' শৈলশ্রেণীর প্রান্তে টনকপুরের কাছে এসে শান্ত হয়েছেন শারদা।

তখন শোনা যায় ঝনক-ঝনক নূপুর-নৃত্য—সেই নাচনে তরাই অঞ্চলে বসে গেছে শস্যশ্যামলতার আসর। ভৈরবীর আত্মঘাতী উন্মাদনা উত্তর প্রদেশের লক্ষ্মণাবতীর উত্তরপ্রান্তে পৌঁছে শান্ত হয়েছে।

টনকপুর হলো মধ্য হিমালয়ের একটি প্রধান তোরণদ্বার। এই অঞ্চলের পূর্বে নেপালরাজ্যের সীমানা, এবং পশ্চিমে হলো দক্ষিণ কুমায়ুন—অর্থাৎ নৈনীতাল। এই দুইয়ের মাঝখানে সীমানারেখা টেনেছে শারদারই শিরস্রোত কালীনদী। সুদূর উত্তরের হিমালয়-লোকে ধবলীগঙ্গা ও কালী,—উভয়ে আসকোট নামক পার্বত্য শহরে মিলিত হয়ে দক্ষিণে নেমে এসে শারদা নামে প্রখ্যাত হয়েছে।

ইন্দ্র এসে থমকিয়ে গেলেন এই দক্ষিণ কুমায়ুনের এক প্রান্তে। না, এ দৃশ্য তাঁর সুখের স্বর্গে নেই। সৃষ্টি এখানে পরমাশ্চর্য, এই হলো স্বর্গ-মর্ত্যের সন্ধিস্থল। এখানকার নিভৃত মায়াকাননে গোপনে নেমে আসে অলকাবাসিনী অপ্সরার দল; এই উদার অনন্ত গিরিশৃঙ্গমালার নীচে বিচিত্র আরণ্যকপুষ্পশোভিত উপত্যকায় জ্যোৎস্নালোকে বসে যায় তাদের নৃত্যসভা। না, এমন জ্যোৎস্না নেই স্বর্গে,—সেখানে কেবল আছে নিত্যজ্যোতির্ময়তা। সেখানে নদী আছে মন্দাকিনী মধুরভাষিণী, কিন্তু এ নদীর মতো আত্মঘাতিনীর বুকফাটা হাহাকার মন্দাকিনীতে নেই। এখানকার ছায়ালোকের অন্ধকারের সঙ্গে মায়ালোকের জ্যোৎস্নার যে-রঙ্গরহস্য,—এ যে নিখিল বিশ্বেরই বিস্ময়। এর তুলনা স্বর্গে কোথাও নেই। সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে এসে অবশেষে এইখানে দাঁড়িয়ে দেবরাজ স্থির করলেন, রাজধানী নির্মাণের পক্ষে এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি বন উপবন তপোবন গিরিগুহালোক শৈবালাচ্ছন্ন শিলানির্ঝর ব্যাঘ্রভল্লুকাদির অবাধ বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ে অগণ্য গিরিনদীপথ ছাড়িয়ে এসে পৌঁছলেন এক নীলনয়না সরোবরের প্রান্তে। সরোবরের সলিলগহ্বরে বহুকাল ধরে বাস করছিলেন নয়নাদেবী। তিনি সেই পাতালগহ্বর থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নাহসিত গগনের নীচে দাঁড়িয়ে দেবরাজকে অভ্যর্থনা করলেন। ইন্দ্র সহাস্যমুখে জানালেন, এই ভূস্বর্গেই তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে।

নয়নাদেবীর নামে নৈনীতাল হয়েছিল বটে, কিন্তু নৈনীতালের প্রাচীন আর একটি নাম ছিল 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। ইন্দ্রপ্রস্থের বিলুপ্তির পর নয়নাদেবী পাষাণ হয়ে যান। সেইজন্য হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ের দেওয়ালে অদ্যাবধি পাষাণদেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে। তিনি শক্তিরূপিণী, সেই কারণে তিনি সিন্দূরশোভিত থাকেন। পাহাড়ের কোলে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়।

'তাল' শব্দের অর্থ হলো সরোবর। নৈনীতাল প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত। একই হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ,—একটি হলো মল্লিতাল, যেদিকে নন্দাদেবী, শিব ও গণেশ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদির মন্দির; অন্যটি দক্ষিণাংশ,—যেটি নৈনীতালের প্রবেশপথ। সমগ্র নৈনীতালের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রধান কেন্দ্র হলো নৈনীহ্রদটি। নৈনীতাল জেলা ভিন্ন দক্ষিণ হিমালয়ের অন্য কোথাও এতগুলি জলাশয় সহসা চোখে পড়ে না। সেজন্য এগুলি হিমালয়ের উপগিরি অঞ্চলে প্রচুর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এই হ্রদগুলির মধ্যে প্রধান হলো ভীমতাল, খুরপাতাল, গরুড়তাল, নল-দময়ন্তীতাল, সুখতাল, রামতাল, লক্ষ্মণতাল, নওকুচিয়াতাল ইত্যাদি। সুন্দর শতদলের শোভা এবং শালুকের গলাগলি 'নওকুচিয়াতালের' একটি প্রধান আকর্ষণ।

একদিকে শতদ্রু এবং অন্যদিকে কালীগঙ্গা, এই দুই নদীর মধ্যভূভাগ নিয়ে সমগ্র

কুমায়ুন। কুমায়ুনকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায় তবে নৈনীতাল পড়ে দক্ষিণ অংশে। মধ্য অংশে হলো আলমোড়া, উত্তর অংশে গাড়োয়াল। তবে গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার উত্তরপূর্ব সীমানা তিব্বতের সঙ্গে মিলেছে। গাড়োয়াল আগে ছিল পৃথক, কারণ সমতল ভারতে কোথাও গিয়ে তার এলাকা পড়েনি,—সে থাকতো বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ আমলের পর টিহরী গাড়োয়াল এসে মিলেছে কুমায়ুনে। আসাম থেকে কাশ্মীরের মধ্যে হিমালয়ের অন্য কোনও বিভাগে এতগুলি তুষারাবৃত চূড়া আর কোথাও এত কাছাকাছি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতের কোটি কোটি নরনারী হিমালয়ের অপর কোনও খণ্ডকে তাদের জীবনে এবং তাদের অধ্যাত্মচিন্তায় এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গেও ঠাঁই দেয়নি। পশ্চিমে যমুনাপর্বত—যেটিকে বলা হয় 'বন্দরপঞ্চ', সেখান থেকে এই শ্বেতগিরিশিখরগুলিকে জনৈক জার্মান পণ্ডিত বলেছেন, 'দেবগণের সিংহাসন।' যমুনা পর্বতের পর শ্রীকান্ত, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরিনাথ, শতোপন্থ, কামেত, দ্রোণগিরি, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচুলী, নন্দকোট প্রভৃতি শিখরগুলি জগৎ প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে নন্দাদেবী, কামেত, ত্রিশূল, বদরিনাথ—এগুলি সর্বোচ্চ। এদের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সংখ্যাতীত গিরিসঙ্কট এবং ক্যারাভান পথ—যাদের ভিতর দিয়ে পশ্চিম তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার দিকে অভিযান করা চলে। প্রধান ও প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট ঠাগা, মানা, নিতি, কাংড়াবিংড়ি, দরমা, লিপুলেক ইত্যাদি পথে ভারতীয় ও তিব্বতী বাণিজ্যের চলাচল হয়ে আসছে বহুকাল থেকে। বদরিনাথ থেকে মানা গ্রাম হয়ে শতোপন্থ ও কামেতের তলা দিয়ে সোজা উত্তরে গেছে 'মানা' গিরিসঙ্কটের পথ, সেই পথ গেছে শতদ্রু নদের দিকে। শতদ্রুর পরপারে গারটকের পথ পাওয়া যায়।

নৈনীতালের পূর্ব সীমানা হলো কালীগঙ্গা ওরফে শারদা, এবং পশ্চিম সীমানা হলো কোশী নদী। এই কোশীনদীর মূল নাম সম্ভবত কৌশল্যা, এবং যতদূর আমার জানা আছে এটি নেপাল-বিহারের অন্তর্গত সূর্যকোশী, সপ্তকোশী অথবা অরুণকোশীর শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না।

নৈনীতাল প্রবেশের পক্ষে তিনটি প্রধান পথ পাওযা যায়। পশ্চিম অংশে হলো মোরাদাবাদ-রামনগর-রানীক্ষেতের পথ। এটি চলে গেছে নৈনীতাল শহরের নীচে দিয়ে আলমোড়ার অভিমুখে। মধ্যপথটি সর্বাপেক্ষা সহজ,—বেরিলী থেকে কাঠগোদাম হয়ে মাত্র একুশ মাইল মোটর পথ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ পথ যেটি সেটি সহজসাধ্য নয়—সেটি হলো টনকপুর থেকে নৈনীতালের পথ। এই পথে নদী নালা, উপত্যকা, জলপ্রপাত, গহন অরণ্য, অসাধ্য পার্বত্যালোক এবং প্রকৃতির পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার অভিযানকারী পর্যটককে নিত্য অভ্যর্থনা জানায়। টনকপুর থেকে মোটর বাসের পথ গেছে সোজা উত্তরে—চম্পাবত, লোহাঘাট ছাড়িয়ে পিথোরাগড় পর্যন্ত। এই অঞ্চলে জগৎপ্রসিদ্ধ শিকারী ও ভারতপ্রেমিক 'জিম করবেট্' বহুকাল ধরে তাঁর বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নামে সমগ্র কুমায়ুন এখনও কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রতি বৎসর তাঁরই নামে রুদ্রপ্রয়াগে আজও একটি মেলা বসে।

নৈনীহ্রদটিকে কেন্দ্র করে আধুনিক নৈনীতাল শহরটি গড়ে উঠেছে। উত্তপ্ত ভারতের সমতলে দাঁড়িয়ে সাহেবরা খুঁজে বেড়াতো ঠাণ্ডা অঞ্চল। বস্তুত, ইংরেজের আনুকূল্যেই ভারতে একটির পর একটি সুন্দর পার্বত্য শহর গড়ে উঠেছে। ডালহাউসী, ল্যান্সডাউন,

শিমলা, মুসৌরী, শিলং, এমন কি দার্জিলিং-এরও প্রায় ওই একই ইতিহাস। ইতিহাস বলে, ব্যারন নামক এক সাহেব সাজাহানপুর থেকে বেরিয়ে মাছ ধরবার জন্য এসে পৌঁছন নৈনীতালে—সেটি ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ। তিনি এই মনোরম পার্বত্য এলাকাটির সংবাদ দেন কর্তৃপক্ষ মহলে। অতঃপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে নৈনীতাল সাহেবদের পক্ষে একটি আঞ্চলিক শাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হ্রদের চারিপাশে নৈনীতালের যে শহরটিকে আমরা দেখি, সেটি হলো অনেকটা নীচের তলা। এখানে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বাজার, বাসস্থান ও হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত। নানাবিধ কাজ কারবার বাণিজ্য বেসাতি এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। উপরতলায় রাজধানী এবং সরকারী দপ্তর। আজকে অত্যন্ত প্রয়োজন না ঘটলে প্রাদেশিক সরকার গ্রীষ্মকালে আর লক্ষ্ণৌ থেকে স্থানান্তরিত হয় না। নীচের তলায় শীতের বাতাস কিছু কম বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা প্রচুর। উত্তরপূর্বের একটি অংশ অনেকটা অবারিত থাকার জন্য শীতের দিনে ঠাণ্ডা নেমে আসে এবং তখন নগরের কাজকারবার বন্ধ করে স্থানীয় অধিবাসীদের মোটা অংশটা নীচের দিকে চলে যায়। শীতের দিনে পশ্চিম পাহাড়ের পিছন থেকে জন্তু-জানোয়াররা হ্রদের চৌহদ্দির বনময় অঞ্চলে নেমে আসে। এই জলাশয়টি নৈনীতালের প্রধান আকর্ষণ।

শহরের নীচের তলাটা চৌবাচ্ছার মতো কিনা, ওখানে দাঁড়িয়ে একথা ভেবেছি অনেকবার। জলাশয়ের শোভা অপরূপ, কিন্তু হিমালয়ের সুদূরব্যাপকতার স্বাদ নীচের তলায় নেই। কাশ্মীরের শেষনাগ, গঙ্গাবল, উলার হ্রদ, ডাল হ্রদ,—এদের চারিদিকে অনন্তের পরিব্যাপ্তি। জগৎপ্রসিদ্ধ হিমালয়বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রণবানন্দ বলেন, মানস সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের পথহারা কল্পনা কৈলাসশৃঙ্গের চারিদিকে সমস্ত আকাশে আর তিব্বতে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার তুলনায় নৈনীতালের এই জলাশয় যেন অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানে, এই হ্রদের জল স্বাস্থ্যকর নয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে এর জল কতকটা নিকাশ করে দেবার জন্য একটি নালীপথ বানানো আছে, কিন্তু নালীর দক্ষিণে যে প্রবাহপথটি দেখি, সেটি প্রাকৃতিক। এরই আশে পাশে স্থানীয় বস্তির জটলা। পুরনো বাড়িঘর, গলিঘুঁজি, নোংরা আর নর্দমা। পাহাড়ী শহরের বস্তি অঞ্চল কোথাও সুশ্রী নয়। যেখানে যাও—দার্জিলিঙে, মুসৌরীতে, শিমলায়, আলমোড়ায়—এরা সেই একই পরিচয় বহন করে। বছরে মোটামুটি ছয়মাস হলো 'সীজন্', বাকি ছয়মাস তারা দারিদ্র্যে ভোগে।

চারিদিকের অবরোধ সম্বন্ধে যে কথা তুলছি, তাদের প্রত্যেকটি হলো এক একটি পাহাড়ের শীর্ষ। কোনওটির নাম 'আয়ারপট্ট', কোনওটি 'দেওপট্ট'। উত্তর অঞ্চলে হলো 'চায়না পীক্', এদিকে আল্‌মা, লারিয়াকান্তা, শের-কি-ডাণ্ডা,—এরা চারিদিক থেকে ওই হ্রদটিকেই যেন ঘিরে রয়েছে। কিন্তু হাজার খানেক ফুট উপরে উঠলেই পৃথিবী অনেক বড়। যতদূরে তাকাও—উত্তরে অনন্ত গিরিশিখর শ্রেণী—পূর্বেও তাই, পশ্চিমেও তাই। কেবল দক্ষিণে ঠাহর করলে দেখা যায় অন্তহীন হিন্দুস্থানের ধূসর অস্পষ্ট সমতল। পূর্ব-পর্বতের 'টিফিন্ টপের' উপর উঠে সমস্ত দিনমান ধরে কেবলমাত্র হিমালয়ের পরমাশ্চর্য মহাশ্বেত শোভা দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। যারা নৈনীতালে আসে তারা জলের ধারে তলিয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করবে, সন্দেহ কি।

ছোট্ট গল্পটি মনে পড়ছে। নৈনীহ্রদে নৌকাবিহারকালে মাঝি বলেছিল : বছর পঞ্চাশেক আগে এক সাধু এখানে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এক হৈ চৈ

বাধিয়েছিল। সে নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয় যে, এখানে হ্রদের ধারে নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণ না করলে তার নিস্তার নেই। সাধু এই দাবি কবে যে, এখানে নগরের সম্প্রসারণ কিছুতেই চলবে না। তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর বাহাদুর সাধুর কান ধবে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা পান, এবং সাধুর পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেন। সাধু ভয় পায়নি। সে বিনামেঘে এমন এক বজ্রাঘাত ঘটায় যে, সমগ্র নৈনীতাল থরথরিয়ে ওঠে। চোখ রাঙিয়ে সে বলে, এমন ভূমিকম্প সে আনবে যে, লাটপ্রাসাদ ধূলিসাৎ কবে দেবে! বোধ করি সেই সাধুর কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল, সেইজন্য ইংরেজ তার দাবি স্বীকার করে এবং নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণের জন্য কতকটা জায়গা জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু এর পরেও আবার নানা কারণে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বেধে ওঠে, এবং সাধুকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য গভর্নর স্বয়ং যখন পুলিশ ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হন তখন অকাল বর্ষণেব ফলে পাহাড়ের গা থেকে এক বিরাট ধ্বস নেমে আসে নীচের দিকে,—চারিদিক ছত্রখান হয়ে যায়। সাধু সেই সময় অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু যাবার সময় এই অভিসম্পাত দিয়ে যায়, চল্লিশ বছরের মধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্য পৃথিবী থেকে রসাতলে যাবে!

নৌকার মাঝি সগৌরব উদ্দীপনার সঙ্গে মোটামুটি গল্পটা শোনালো। ওখানে আজও একটি সাধু দেখছি বৈকি। তবে সে এক ভক্ত শিষ্যসহ হ্রদের তটের নীচে জলের কোলে একটি গুহাব মধ্যে থাকে। জলের ওপরেই তার বাসা; এবং ওরই মধ্যে লতাপাতার ছায়ায় গুহাটি ঢাকা,—গাঁদাফুলে ভরা সেই গুহামুখ। ওরা নিজেদের সংসারটি বানায ঠিক সেইখানে, যে-স্থানটি সর্বপরিত্যক্ত। গাছের তলা, নদীর তট, পাহাড়েব গুহা, মন্দিরের পাশ, পথের ধার—যেখানে কারো প্রয়োজন নেই, যেখানে কোনও নিষেধ নেই। ভিক্ষে কবে না, কিন্তু আকর্ষণ করে। কথা বলে না,—রহস্য ঘনিয়ে তোলে। চোখ তুলে তাকায়,—যেন আত্মার নিগূঢ় জিজ্ঞাসার শেষ জবাব। চুপ করে থাকে,—সৃষ্টিতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তটা বুঝে নাও। চরসের কল্‌কেটায় দম ভরে টান দিল,—ওই সঙ্গে ফুঁকে দিল জীবনটা। এক সময় হঠাৎ ধুনির থেকে ভস্মতিলক তুলে দিল তোমার ললাটে,—ব্যস, আর চাই কি, 'ভাগোয়ানকো' মিল্ গিয়া। নমস্কার জানিয়ে চলে যাও।

নৌকা আমাদের ভেসে চললো। 'সন্ধ্যা-সকাল করছি শুধু এঘাট ওঘাট'। সমস্ত দিনমান সুন্দর রৌদ্রে আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি পাহাড় ছায়া ফেলেছে হ্রদের জলে—যেমন ওর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে নীলকান্ত আকাশ। ছবি আসে না ওদের,—কেননা ছবি অপেক্ষাও মনোরম। অপরিসীম আনন্দেব সঙ্গে নিবিড় অতৃপ্তি যেন জড়িয়ে আছে পাহাড়ে আর ছায়াচ্ছন্ন জলাশয়ে। এখানে শহর বটে,—কিন্তু সমস্তটা শান্ত। জলে আকাশে পাহাড়ে বাতাসে যেন সমস্ত দিন ধরে একটা প্রশ্নোত্তর মীমাংসা চলছে,—আমরা যেন তার নিঃশব্দ শ্রোতা এবং দর্শক। জ্যোৎস্নালোকে জলাশয়ের তীরে আড়ালে-আবডালে বসে আছে সবাই। যেন এবার ইন্দ্রসভার নাচের আসর বসে যাবে। আমাদের স্তব্ধ নিমেষনিহত দৃষ্টির পিছনে নিরুদ্ধ উৎকণ্ঠা!

গির্জায়, 'গুরদোয়ারে', রাধাকৃষ্ণ ও নয়নার মন্দিরে, কিছু যেন খুঁজে ফিরছি। কিছু দেখে যেতে চাই এখানে ওখানে,—কিন্তু তার সংজ্ঞাটা সঠিক জানিনে। কৌতূহল আছে, কিন্তু সংশয় আছে অনেক বেশি। সমস্ত জীবন ঘষেছি পাহাড়ের পাথরে-পাথরে,—অরণিকাষ্ঠ যেমন ঘষে আগুন জ্বালাবার জন্য। ছমছমিয়ে এসেছে দিনান্তের অন্ধকার, এসেছে অরণ্যতলের ছায়া রাহুর মতো মুখব্যাদান করে, শুষ্ক পত্রদলের

সরসরানির মধ্যে পায়ে পায়ে লেগেছে রোমাঞ্চ কৌতুক, লেগেছে কম্প, লেগেছে হর্ষ,—বুঝিনি অনেক সময় নিজের মধ্যে এমন অধীর উত্তেজনা কেন, কেন অকারণে প্রাণ এমন করে থরথরিয়ে ওঠে! তখন দ্রুতপদে চলে এসেছি ছায়ালোকের বাইরে। যে-বস্তু খুঁজতে গিয়েছিলুম, তাই যেন পাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

চিত্তের এই বিকার এবং বৈলক্ষণ্য বুঝিনি কোনওদিন।

জলে স্থলে পাহাড়ের কোলে-কোলে আজ সকালে নৈনীতালের হাসি উচ্ছ্বসিত। নীল আকাশের মাঝখানে মেঘের আকারে এসে দাঁড়িয়েছে যেন শ্বেত ঐরাবত সামনের দুই পা তুলে। হেমন্তের নীলিমার নীচে বিরাটের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে পর্বতের শিখরে-শিখরে। চাঞ্চল্যের বেগ আসছে মনে ক্ষণে ক্ষণে।

বারান্দার নীচে দিয়ে মাঝে মাঝে পেরিয়ে যাচ্ছে বায়ুবিলাসী ঘোড়সওয়ার। মোটরও যাচ্ছে এক আধখানা। পাহাড়ী শহরে এলে পাওয়া যায় ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে। ছত্রিশটি জাত ছড়ানো থাকে সমতল ভারতে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদেরকে সহসা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এখানকার স্বল্প পরিধির মধ্যে তারা স্বপ্রকাশ। এখানে এলে ঘরের চেয়ে বাহির হয় প্রধান। বাইরে আসতে হবে সবাইকে। ধরা দিতেই হবে সকলের মাঝখানে। সেই কারণে হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়ায় আর মধুর রৌদ্রে সর্বব্যাপী আনন্দের যে আসর বসেছে, সেখানে এসে পৌঁছেছে মারাঠী আর মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী আর রাজস্থানী, গুজরাটী আর ওড়িয়া। বালক বালিকারা এসেছে লখ্‌নউ থেকে তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে,—তারা যাবে পাহাড়ে পাহাড়ে 'এক্‌স্‌কারশনে'। এদের পাশে বাঙালী ছেলেমেয়ের নির্জীব চেহারা কল্পনা করে লজ্জা পাই। স্বাস্থ্যে শিক্ষায় কর্মক্ষমতায় বাঙালী আজ ভারতের কোথাও বিশেষ নেই। আজ দেশের চারিদিকে—ভিতরে ও বাহিরে—যখন দুরন্ত জীবনের অভিযান ডাক দিচ্ছে তারস্বরে, তখন বাঙালী বাৎসল্যের আঁচলের নীচে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র বাড়াচ্ছে। বদ্ধজলায় বাঙালীর পা পুঁতে বসে গেছে, রাজনীতি এনেছে ওদের জীবনে যক্ষ্মা, দারিদ্র্য এনেছে ওদের জীবনে দৈন্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব এনেছে ওদের সমাজসংসারে পাশব প্রকৃতি। বাহিরের সরল, বৃহৎ, উদার ও সর্বপ্লাবী প্রাণশক্তির দিকে বাঙালীর চোখ নেই। ওরা আগে চায় চাকরি, পরে চায় ধর্মঘট। স্বাধীনতালাভের জন্য যে-বাঙালী চেয়েছিল মৃত্যু, স্বাধীনতা লাভের পর সেই বাঙালী যেন চাইছে অপমৃত্যু

সুশ্রী বালকবালিকাদলের আনন্দোজ্জ্বল কোলাহলের দিকে চেয়ে থাকলে ঈর্ষাকাতর চক্ষু এক সময় বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। ওই অবাঙালী ওরা আমাদেরই সন্তান এবং আমারই ভারতের ভবিষ্যৎ—এ সান্ত্বনা মন যেন মানতে চায় না!

ভদ্রসমাজের তথাকথিত আবহাওয়াটাকে ছাড়িয়ে মাটির তলায় গিয়ে নামলে দেখতে পেতুম স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা। বাইরে থেকে এসেছে অনেকে, যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী। আরও আছে যারা নেপালী কিংবা গাড়োয়ালী। তারা মোট বয়, দোকানে কাজ করে, ঘোড়া রাখে, অলিগলিতে পড়ে থাকে। নেপালী এসে হোটেলে চাকরি নেয়, ড্রাইভারী করে, কিংবা বায়ুসেবীদের কাছে দাসখৎ লেখে। কুমায়ুনীরা ঘরে কম্বল বোনে, দর্জিগিরি করে, ফল আর সব্‌জি বেচে, আর নয়ত খাবারের দোকান দেয়। ওদের পিছনে যে-গৃহস্থের জীবনযাত্রা, সেটির দিকে চোখ না পড়াই উচিত। শীতকালের তিন-চার মাস ওরা কুঁকড়ে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। শাকসব্‌জি শুকিয়ে রাখে ঘরে, ক্ষেতখামারে কাজ থাকে না,

রোগ-ভোগে ওষুধ জোটে না, বাইরের বাড়িওয়ালারা ওদের কাছে জুলুম করে ঘরভাড়া চায়। চৈত্রমাস পড়লে তবে ওদের মনে আশার সঞ্চার হয়,—'চেঞ্জার'দের প্রতীক্ষায় দিন গোনে। যারা খোঁজ রাখে তারা জানে, পাহাড়ী শহরের নীচের তলাটা রোগে আর দারিদ্র্যে পঙ্গু। দার্জিলিংয়ে, মুসৌরী-আলমোড়ায়, শ্রীনগরে—সর্বত্র প্রায় একই ইতিহাস। গভর্নমেন্ট দেশের খবর রাখেন, পাহাড়ের খবর সকল সময় তাঁদের কানে ওঠে না।

মহাদেবের চূড়ায় গঙ্গা যেমন বন্দিনী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি চেহারায় নৈনী হ্রদটি রয়েছে নৈনীতাল শহরে। ওখান থেকে মাইল সাতেক নীচে নেমে এলে 'ভাওয়ালীর' ছোট শহর। ওপাশ দিয়ে উঠেছিলুম, এপাশ দিয়ে নেমেছি। এটি সেই প্রধান রাজপথ—যেটি রামনগর থেকে এসে আলমোড়ার দিকে চলে গেছে। পথটি অতি চমৎকার এবং বনময় পার্বত্য অঞ্চলের আলোছায়ায় অপরূপ। এ আমার পরিচিত পথ। তবু আবার এসেছি অনেক দিন পরে। পুরাতন বন্ধুদের প্রাচীন স্নেহ যেন ডাক দিচ্ছে ওক্ আর দেওদারের বনে-বনে। ঝাউবনে বাতাস উঠেছে, অতীত কাহিনীরা যেন আমায় কাছে পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। একালের নতুন পাখিরা এসে বাসা বেঁধেছে নির্ঝরের আশে পাশে, গিরিনদীর প্রাণধারা শুকিয়ে এসেছে, পাথরের থেকে শৈবাল ঝরে গেছে,—নিশ্বাস ফেলছে যেন সর্বগ্রাসী মহাপ্রাচীন। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি,—আমার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছে সব। প্রতি গ্রানাইট্ পাথর, প্রতি অর্কিডের চারা, প্রতি পুষ্পের স্তবক, প্রতি নিকুঞ্জের কুসুমলতা,—ওরা থাকে এ পাড়ায় আমার অতিপরিচিত মহলে। কিন্তু সমস্ত পরিচয়ের বাইরেও ওরা আমার চোখে চিরকালের অচেনা। ভালোবাসার পাত্রকে নিবিড় করে বুকের মধ্যে টেনে নিই,—যেন সে নিজের সমস্ত অনাবিষ্কৃত পরিচয় নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয়। আলিঙ্গনের মধ্যে পাই যতটুকু, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে থাকে বাইরে। সেই কারণে বড় প্রেম হলো বড় তপস্যার মতো। হাত বাড়ালেও যা পাইনে, হৃদয়ের একূলে ওকূলে যাকে ধরে না,—সেই অনাস্বাদিত অলভ্য অমৃতলাভের আশায় প্রেমের চক্ষে অশ্রু গড়িয়ে আসে। এদেরকে বুকের মধ্যে নিয়েছি একদিন, কোলে নিয়ে কেঁদেছি কতদিন। যেন জন্ম-জন্মান্তরে দেখেছি, হাজার হাজার বছর ধরে জেনেছি। অগণ্য বংশপরম্পরায় মহাকালের কল্পে কল্পে আমি ওদের দেখে চলেছি বিবর্তনবিধির ভিতর দিয়ে। আমার শিরা-উপশিরাদলের রক্তপ্রবাহে বয়ে গেছে শত-সহস্র গিরি-নির্ঝরিণীরা, আমার অস্থিপঞ্জরের স্তরে স্তরে সংখ্যাতীত শিলাসনে প্রাচীন মুনিঋষির যোগাসন পেতে রেখেছি, আমারই হৃদয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ধারণ করে রয়েছি দেবসিংহাসন হিমালয়ের অগণিত শৃঙ্গমালা। জন্ম আর মৃত্যুর অতীত অখণ্ড চৈতন্য সেই আমি,—সেই আমার আদি চৈতন্য কল্পান্তরে, দেহান্তরে, জন্মান্তরে, যুগান্তরে বিবর্তিত। পুরাণে ইতিহাসে অতীতে আধুনিকে ভবিষ্যতে,—সেই আমি অজর অক্ষয় অব্যয় ভারতাত্মার নিত্য প্রতীক। আমার ক্ষয় নেই, লয়ও নেই। আমার অহঙ্কার,—ওরা আমাকে এনে ওদের মাঝখানে বসিয়েছে বারম্বার। ওরা ভাষা দিয়েছে আমার মুখে, প্রাণ দিয়েছে আমার দেহে, নিশীথরাত্রির তারায় পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ, হেমন্তের হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরভিশ্বাস নিয়ে গেছে আমার বাতায়নে কতবার।

ভাওয়ালীর পাহাড়ের কোলে নিভৃত বনচ্ছায়াময় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে ভারতপ্রসিদ্ধ যক্ষ্মারোগী-নিবাস। ভাওয়ালী শহরটি ছোট, কিন্তু এই রোগী-নিবাসটির জন্য শহরটি

সর্বত্র সুপরিচিত। অসুস্থ না হলে এমন একটি মধুর কাব্যপরিবেশ কপালে জোটে না,—এ যেন জীবনের একটি ট্রাজেডি। কলকণ্ঠী পাখি আর সরীসৃপের ডাক ছাড়া সমগ্র অঞ্চল যেন প্রাণীচিহ্নহীন। রোগীনিবাস থেকে সামান্য উৎরাই পথে আন্দাজ আধ মাইল নেমে এলে ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদ। এখানে পথের চৌমাথা,—সামনে পাহারাদার দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করছে। অদূরে মোটরবাসস্ট্যান্ডের অঞ্চলটি কতকটা প্রশস্ত। গিরিশ্রেণীর সারিবদ্ধ জটলার বাইরে দৃষ্টি বেশিদূর পৌঁছয় না। পাহাড়ের গা বেয়ে একটি ঝিরি ঝিরি ঝরনা নেমে এসেছে।

এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ 'ভীমতাল'। পথ পার্বত্য, কিন্তু অনেকটা উপত্যকাপথ। ডানদিকের একটি পাহাড়েব নীচে গা বেয়ে-বেয়ে পথ চলে গেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদটিতে আবার যথাসময়ে ফিরে আসতে হবে।

ভীমতালের পথটি তেমন মসৃণ নয়, কিছু কর্কশ। এখানকার উঁচু কোনও পাহাড়ের শিখরে উঠলে দক্ষিণ কুমায়ুনের তরাইয়ের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে অনেকটা ওই কার্সিয়ং অঞ্চলের ন্যায় ধূসর একটা ছায়ার মতো। এ পথটি ভীমতাল হয়ে এঁকেবেঁকে উপত্যকাপথে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের গাড়ি যখন এসে পৌঁছলো তখন মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে।

ভীমতালের হ্রদটির বর্গ পরিমাপ নৈনীতাল অপেক্ষা একটু বড়, এই আমার ধারণা। কিন্তু নৈনীতাল অপেক্ষা প্রায় দু' হাজার ফুট নীচে হওয়ার জন্য এখানে রৌদ্রের উত্তাপ বেশী। উঁচুতেই হোক আর নীচেই হোক, পাহাড় অঞ্চলে রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর। হেমন্তকালে হরিদ্বার বাতাসের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু হৃষিকেশ লছমনঝুলা অঞ্চলে গরম। মাত্র পনেরো ষোল মাইলের মধ্যে এই তারতম্য ঘটে। শুধু এখানে নয়, তুষার রাজ্যেও এই। 'পঞ্চচুলীর' শৃঙ্গবিজয় অভিযানে যিনি প্রথম সাফল্যলাভ করেন, দিল্লীর সেই ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি. এন. নিকোর বলেন, "সাড়ে বাইশ হাজার ফুটের উপরে উঠে প্রখর উত্তপ্ত সূর্যরশ্মি তাঁকে যেন ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ করছিল। কিন্তু বাতাস উঠলেই সর্বনাশ। সেই বাতাসে আসবে কুহেলী, এবং অতঃপর তুষারঝটিকা।"

ভীমতাল নাকি অতলস্পর্শ গভীরতার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে এসে দেখি হ্রদটি বড় নির্জন, বড়ই একা। ওপারে একটি বৃহৎ পর্বতচূড়া, এবং ওটির নাম 'হিড়িম্বা' পাহাড়। এ অঞ্চলে কেবল এই হ্রদটি নয়, এখান থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পর পর সাতটি 'তাল' পাওয়া যায়। তাদের কথা আগে বলেছি। কাছাকাছি এসে দেখি, ভীমতাল সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। নাম, ভীমেশ্বর মহাদেব। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম দেখা যাচ্ছে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করেছেন প্রচুর। আসামে হিড়িম্বাপুর (ডিমাপুর), কো-হিমা অর্থাৎ হিড়িম্বা পাহাড়, নেপালে ভীমপেড়ী, হরিদ্বারে ভীমগোড়া,—এর পরেও পাঞ্জাবে আর কাশ্মীরে কি-কি চিহ্ন যেন পাওয়া যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নামে উৎসর্গিত একটি দেবস্থানও কই এযাবৎ চোখে পড়েনি। শ্রীরামচন্দ্র ছড়িয়ে আছেন যেমন ভারতের সর্বত্র, তেমনি হিমালয়েরও সর্বত্র। শ্রীনগরের উত্তরপথে সিন্ধু নদী অতিক্রম করে গিলগিটে ঢোকবার তোরণদ্বারই হলো রামঘাট। পাকিস্তানঅধিকৃত কাশ্মীর এলাকার একটি জনপদের নাম রামপুর। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বড় শহরের নাম, রামনগর,—যেটি শিয়ালকোটের দক্ষিণ অঞ্চলে চন্দ্রভাগার তীরে। সুতরাং 'রামঘাট' থেকে সেতুবন্ধ 'রামেশ্বরম্' পর্যন্ত ভারতবর্ষ একসূত্রে গাঁথা।

ভীমতাল হ্রদের ঠিক মাঝখানে একটি ক্ষুদ্রদ্বীপ রয়েছে চোখের সামনে,—কলকাতার লেক্-এ যেমন দেখা যায়। গিরিলোকে নদীর সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু জলাশয়ের সংখ্যা বড় কম। সেই দীঘি, হ্রদ, সরোবর—তাদের আকর্ষণ বেশি। এই হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ে আদিবাসী পাহাড়ীর মেয়ে ছিলেন পরমাসুন্দরী শ্রীমতী হিড়িম্বা। তিনি বোধ করি ভীমের অসমশক্তি কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে দ্বিতীয় পাণ্ডবকে এখানে আমন্ত্রণ করেন। পাহাড়ী মেয়ের কঠিন যৌবন হয়ত খুঁজেছিল শক্তিমান পুরুষ। ভীম আসেন এখানে, এবং উভয়ে প্রণয়াসক্ত হয়ে বিবাহ করেন। সম্ভবত এই সরোবরের মাঝখানে ওই জনহীন দ্বীপকাননে তাঁরা মধুযামিনী যাপন করেছিলেন। ঘটনাটি মহাভারতে ঠিক এই ভাবে আছে কিনা মনে পড়ছে না।

একটি প্রাচীরের পিছন দিয়ে ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের চত্বরে উত্তীর্ণ হলুম। বৃক্ষচ্ছায়াময় মন্দিরের অঙ্গন,—অদূরে বস্তি। ঝুরু ঝুরু বাতাস বইছে ছায়ালোকে। ছোট একটি পাণ্ডা-পরিবার এখানে থাকে। শিবের কাছেই পার্বতী। গণেশ থাকবেনই, এবং সিন্দূরমাখা মহাবীর অবশ্যম্ভাবী! হনুমান হলেন শৈবভারতে শক্তির প্রতীক। বেদীবাঁধানো রয়েছে পাথরের, তারই এক পাশে বসে কতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। মন্দিরের মতো এমন মধুর অনাহত বিশ্রামের ক্ষেত্র আর কোথাও নেই। গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় হিমালয়ের হাওয়ায় নিভৃত মন্দিরের এক কোণে চোখ বুজে শুয়ে থাকা,—তার সঙ্গে যদি থাকে আকাশপথের পথিক পাখির চূর্ণ কণ্ঠস্বর, আর যদি থাকে নিকটবর্তী নালাপথে সরোবরসলিলের কুলুকুলুধ্বনি,—তাহলে সেই সৌন্দর্যচেতনার শিহরণে আকাশের অনন্ত নীলিমাও শিউরে ওঠে বৈকি। বিশ্বাস করবে না অনেকে,—স্বর্গলাভ করি আমি কথায় কথায়!

ওরই মধ্যে এক সময় দেখে নিলুম ভীমতালের সঙ্গে নালীপথ সংযুক্ত করে 'স্লুইস গেট্' বানিয়ে জলনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। এর পর জ্যামিতিক পদ্ধতি দেখতে সময় গেল। অতঃপর ভাওয়ালীতে ফিরে এসে চললুম এবার রামগড়ের দিকে। ভাওয়ালী থেকে রামগড় নয় মাইল, কিন্তু অধিত্যকা পেরিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই পথ উঠে গেছে। এ পথটি পাকা। নাম, 'নেহরু রোড'। দক্ষিণপূর্ব দিকে পেরিয়ে গাড়ি চলেছে উত্তর দিকে। এ অঞ্চলে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ দেখে মন খুশী হয়। মোটরবাসের প্রথম যুগে মালিক এবং চালকের যে-স্বেচ্ছাচার ছিল—যেমন ছিল কলকাতায়,—এখন আর সেরূপ সহসা চোখে পড়ে না।

ডালিমের বন ঘেঁষে চলেছি। ছোট ছোট কমলা ধরেছে গাছে গাছে। 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'—ফলের বাগানের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ ভীমেশ্বর মহাদেবের কথা ভুলে গেলুম। শুষ্ককণ্ঠে এখনই কিছু ফলের রস সঞ্চারিত না হতে পারলে জীবনটাই ব্যর্থ! দার্জিলিংয়ের ভূটিয়া মেয়ের দুটি গালের মতো টসটসে আপেলে রক্তের ছোপ পড়েছে,—মাথায় থাকুন ভীমেশ্বর! কিন্তু ফলের বাগান নাগালের বাইরে,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোনো লাভ নেই। ওইসব রাঙা ফলের পিছনে আছে রক্তলোভাতুর মহাজনের দল। তাদের সঙ্গে আছে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চক্রান্ত। ফল তারা পচিয়ে দেবে সে ভালো, কিন্তু অল্প দামে বেচে বাজার মাটি করবে না। প্রলোভনের ফাঁদ ওরা পেতে রেখেছে নগরে নগরে। কায়েমী স্বার্থের সাফল্যটা ফলের রসে সরস। আমাদের গাড়ি চলেছে চড়াই পথে।

পাহাড়ের নীচে-নীচে দেখে যাচ্ছি, নতুন ধরনের ফলনের কাজ চলছে। কোথাও

ফুলের বাগানে চলছে পরীক্ষা, কোথাও বা লতাপাতা নিয়ে নতুন পদ্ধতির গবেষণা। ওরই মধ্যে পেকে উঠছে ফলপাকড়, ওরই মধ্যে চলছে আলুর চাষ। রেশমের গুটিপোকা ও মৌমাছির চাষ চলছে নানাস্থানে।

একটি চাষীপ্রধান গ্রাম লেগে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। এর নাম বুঝি 'বিনায়ক'। হবেও বা। কিন্তু এখান থেকে একটি পথ গিয়েছে মুক্তেশ্বরে চৌদ্দ মাইল চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে। একথা লোকে বোধ হয় ভুলতে বসেছে যে, মুক্তেশ্বর হলো একটি তীর্থস্থান। কেননা প্রায় ষাট বছর পূর্বে ভারত গভর্নমেন্ট মুক্তেশ্বর পর্বতের শিখরে একটি পশুচিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে উঠেছে, এবং ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কর্মী ও ছাত্ররা এখানে বিভিন্ন কাজ নিয়ে আসে। মুক্তেশ্বরের চারিদিকে কুমায়ুনের মনোরম উপত্যকাগুলি বিস্তারিত ভাবে দেখে নেওয়া যায় এবং এই মুক্তেশ্বরে দাঁড়ালে হিমালয়ের চূড়াদলের শত শত মাইল শোভা সমগ্র দিগন্ত জুড়ে দৃষ্টিগোচর হয়। 'বিনায়ক' অথবা 'রামগড়' থেকে মুক্তেশ্বরের পথে এখনও গাড়ি চলে না। পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ার পিঠে বারো চৌদ্দ মাইল পথ যাওয়াই সুবিধা।

আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছলো 'রামগড়ে'। এখানে একটি ডাকবাংলো রয়েছে অদূরে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ওটার প্রয়োজন ছিল না। এই রামগড় একটি মস্ত বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিন্তু শহর নয়, সামান্য একটি জনপদ, উপরে ও নীচে কয়েকখানা কাঁচা-পাকা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। রামগড়ের শিখরলোকে একটি উপত্যকায় মোটরবাস এসে দাঁড়ালো, এর পরে আর যাবে না। পাহাড়ের অনেক নীচে দিয়ে চলেছে রামগড় নদী। বেশিদিনের কথা নয়, বোধহয় শ'দেড়েক বছর আগে এ অঞ্চলে কয়েকজন চীনার দখলে ছিল কয়েকটি সম্পত্তি। তারা এখানে চায়ের চাষ করেছিল। আজও 'চায়না-পীক' তাদের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ অঞ্চলটি যাঁর দখলে ছিল তিনি বোধ করি এখানকারই 'হরতোলা' স্টেটের রাজা কৃষ্ণপাল সিং। আজও রামগড়ের নীচে তাঁর নানাবিধ রাজকীর্তির স্থাপত্যচিহ্ন পড়ে রয়েছে। এর পর একে একে আসেন ইংরেজ মিঃ সামারফোর্ড এবং মিঃ অ্যালেন। দেখতে দেখতেই এসে পৌঁছে যান অজয়গড়ের রাজা, ধনপতি বিড়লা এবং যুগীলাল কমলাপতি। ক্ষুদ্র রামগড়ের আসর একেবারে গরম হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, এত পাহাড় থাকতে এই অপরিচিত অজানা ও অখ্যাত রামগড় অঞ্চলে এঁরা এলেন কেন? একটি উপমার লোভ সামলাতে পারছিনে, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। রুধিরের গন্ধে বাঘ আসে! রামগড়ের মাটি সরস, পাথরের ভিড় কম, এবং অতিশয় ফলনশীল। সমগ্র উত্তরভারতে 'নৈনীতালের আলু' বলে যেটি প্রসিদ্ধ, এই অঞ্চল হলো তার প্রধান জন্মভূমি। এ ছাড়া কাশ্মীরের পরে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মেওয়াফল নাকি অন্য কোথাও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং প্রতি বৎসর এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার রপ্তানীর খেলা চলছে। প্রত্যেকটি পাহাড়ের সানুদেশ বিরাট ও বৃহৎ এক একটি ফলনক্ষেত্র। আলু আর আপেল হলো প্রধান। তার সঙ্গে আছে আনার, ডালিম, নাসপাতি, কমলা, টমাটো, মটরশুঁটি ইত্যাদি। এদেরই পাশে দেখতে পাচ্ছি, গভর্নমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত ফল ও সব্জি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য একটি মস্ত কারখানা। মনে পড়ে গেল, আজকাল কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী আরম্ভ করেছে 'কোল্ড্‌স্টোরেজের' নামে একটি শোষণচক্রান্ত। কলকাতায় সম্প্রতি এর উৎপাত চলছে। সময়কালের ফল ও সব্জি অসময়ে বেচতে পারলে দু'পয়সার বদলে চার পয়সা লাভ,—সেগুলো মানুষের খাদ্যের উপযোগী থাক্ আর নাই

থাক্। শীতকালে আম, বসন্তকালে আনারস, গ্রীষ্মকালে কমলালেবু, বর্ষাকালে বাঁধাকপি, শরৎকালে লিচু ইত্যাদি কিনে হাসি-খুশী মুখে কেরানীবাবু যখন বাড়ি ফেরেন, তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে পাঁচুর মা গদগদ কণ্ঠে এগিয়ে এসে 'নতুন' জিনিস স্বামীর হাত থেকে তুলে নেন। সেদিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব। পরদিন পাঁচুর জন্য ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি!

তুষারের চূড়াগুলি অনেক দূর, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার ও সেই চূড়াগুলি মেঘময় না থাকলে এখান থেকে তাদের ছবিও নেওয়া চলে। সেইদিকে মুগ্ধচক্ষে চেয়ে যখন একান্ত দাঁড়িয়েছিলুম তখন এক অকিঞ্চন ব্যক্তি এসে জানালো, অদূরে ওই যে উঁচু পাহাড়ের গায়ে ঘরের মতো দেখতে পাচ্ছেন, ওরই একটি বাগানবাড়িতে কিছুকাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

আমার মুখের চেহারা দেখে সে-ব্যক্তি একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় বললে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনেননি?—জিন্‌কো 'ভারত-কবি' বোলা যাতা হ্যায়! দুনিয়াভর ইনসানকো প্যারে হেঁ!

সামান্য ব্যক্তির চোখে-মুখে সেদিন ভারতকবির সম্বন্ধে যে-গৌরববোধ দেখেছিলুম, সেটি অবিস্মরণীয়। রামগড় পাহাড়ের চূড়ায় সম্ভবত ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন। এখানে বসে তাঁর সুদূর দৃষ্টির সম্মুখে তুষারচূড়াগুলিকে রেখে অনেকগুলি কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। কেবল একবার নয়, কুমায়ুন পর্বতমালার মধ্যে মহাকবি বারম্বার এসেছিলেন। সেদিন একথা জেনে বিস্ময় এবং আনন্দ বোধ করেছিলুম, এখানকার অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থান-কাহিনীকে অতি যত্নে লালন করে চলেছে। কবি যে-বাড়িটিতে বসবাস করেছিলেন, সেটি তাঁর নিজের কিনা আমার জানা নেই। অনেকে এখন বলে, সেটি বিড়লার বাড়ি।

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত মোটরপথ পঁচাশী মাইলেরও বেশি পড়ে, এবং রাণীক্ষেত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এদিক দিয়ে যারা যায়,—অর্থাৎ কাঠগোদাম, ভীমতাল, রামগড় এবং 'ফিউড়া' হয়ে যে-পথটি গেছে আলমোড়ায়, সেটি মাত্র একচল্লিশ মাইল পথ। অসুবিধা এই, রামগড় থেকে 'ফিউড়ার' পথে আলমোড়া পৌঁছতে গেলে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হেঁটে, কিংবা উচ্চমূল্য 'ডাণ্ডিতে অথবা পাহাড়ী টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়। এই পথটি বাঙালী জাতির নিকট অতি পরিচিত। এই পথটি দিয়ে একদা গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধু একা যাননি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, তাঁর পুত্র চিররঞ্জন ওরফে 'ভোম্বল', কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ওরফে 'বেবি'। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশবন্ধু ভাগলপুর থেকে 'মায়াবতী আশ্রমের' উদ্দেশে রওনা হন এবং ভীমতাল ও রামগড়ের পথ ধরে আলমোড়া পৌঁছে আবার সেখান থেকে মায়াবতীর ভিন্নপথে অভিযান করেন। তাঁরা তখন গিয়েছিলেন ঘোড়া, ডাণ্ডি ইত্যাদির সাহায্যে, কেননা তখন ভারতবর্ষের কোনও অঞ্চলে মোটর বাস জন্মগ্রহণ করেনি। মোটরপথও সেদিন ছিল না। দেশবন্ধুর সেই 'মায়াবতী আশ্রম' যাত্রার কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মায়াবতী পথে' গ্রন্থে।

মোটরপথ অবশ্য আজও 'মায়াবতী' পর্যন্ত নেই। কিন্তু আজ আলমোড়া পর্যন্ত এবং এদিকে রামগড় অবধি গাড়ি রয়েছে। আলমোড়া থেকে মায়াবতী পঁয়তাল্লিশ মাইলেরও

বেশি। ইদানিং শোনা যাচ্ছে টনকপুর থেকে পিথোরাগড় পর্যন্ত মোটর বাস চলছে। তা যদি হয় তবে পথেই পড়ে 'চম্পাবত' এবং 'লোহাঘাট' নামক জনপদ। 'মায়াবতী বেদান্ত আশ্রম' লোহাঘাট থেকে আন্দাজ চার মাইল পথ। জনহীন বনভূমি, পার্বত্য ভূভাগের অত্যাশ্চর্য মহিমা, গিরিনদী এবং ঝরনার নয়নাভিরাম দৃশ্যের মাঝখানে 'মায়াবতী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত।

কাশ্মীরে পাঞ্জাবে হিমাচলে নেপালে,—যে-বিষয়টি কোথাও এমন সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না,—সেটি প্রত্যক্ষ করা যায় এই কুমায়ুনের তিনটি জেলার পর্বতশ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে; ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে, কূর্মাচল আলমোড়ায় এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতালে। বন্য পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সকল স্থানে,—কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন অধ্যাত্ম জীবনের স্বাদ, এমন ভগবৎ ভাবনা, এমন বিবাগী মনের বেদনা কুমায়ুন পর্বতমালার মতো আর কোথাও নেই। যোগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষু, তপস্বী, দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞানী, বেদাধ্যায়ী, বৈদান্তিক,—বোধ হয় হিমালয়ের অপর কোনও অঞ্চলে এমন অগণিত দেখা যায় না। বোধ হয় হিমালয়ের আর কোনও ভূভাগ থেকে এক-চাহনিতে এতগুলি তুষারশৃঙ্গও পাশাপাশি চোখে পড়ে না। এমন করে হিমালয় আর কোথাও ডাকে না, এমন করে আর কোথাও সে কাছে টানে না। সমগ্র কুমায়ুনে অসংখ্য গঙ্গার আকুলি-বিকুলি চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। গৌরীগঙ্গা, কালীগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, দুধগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, ভাগীরথীগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, কেদারগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, পিন্দারগঙ্গা, —আরও অনেক গঙ্গা। কিন্তু সব গঙ্গার জল মিলেছে গিয়ে আর্যাবর্তের মূল গঙ্গায়। ওই একেকটি গঙ্গাপথে সাধুসন্তরা বেঁধেছে আশ্রম লোকলোচনের অন্তরালে, কেঁদেছে অনেক তৃপ্তিহীন মন, ফুঁপিয়েছে অনেক জীবন অকারণ।

জনৈক আমেরিকান মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে একদা মায়াবতীর অরণ্যপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ান। তুষারপর্বতরাজির শোভা এখানে অপরূপ। কখনও লোহিতবর্ণ, কখনও স্বর্ণাঙ্গ, কখনও গৈরিক, কখনও বা তারা হীরক-জ্যোতিষ্মান। ভারতবর্ষের আকাশে মেঘের মধ্যে প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় যে-বর্ণবৈচিত্র্যের অশ্রান্ত লীলা দেখা যায়, তারই অপরূপ ইন্দ্রজাল মেরু-মন্দার হিমালয়কে বোধ করি সেদিন মায়াচ্ছন্নলোকে পরিণত করেছিল। ওই মহিলা সেই দৃশ্য দেখে মায়াবতীর এই নিভৃত অঞ্চল ছাড়তে চাননি। এখানে তাঁরা দুজনে একটি বাসস্থান এবং একটি কুসুমকানন রচনা করেন। উভয়েরই বোধ করি এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা হিমালয়ের এক প্রান্তে বসে অধ্যাত্ম জীবন যাপন করবেন। পরবর্তীকালে যখন সেই মহিলা ভারত ত্যাগ করেন, তখন তাঁর এখানকার সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে যান। মায়াবতী আশ্রমে অদ্যাবধি এই মহিলা 'মাদার' নামে বিদিত। এই দানশীলা নারীর উদারতায় স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ হন, এবং সম্ভবত ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী প্রথম মায়াবতীতে যান। অনেকেরই কাছে শুনেছি, বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও এক সময়ে মায়াবতী আশ্রমে গিয়েছিলেন।

নৈনীতাল এবং আলমোড়া উভয়ে সর্বত্রই প্রায় সংযুক্ত হয়ে রয়েছে এক একটি সেতুবন্ধে,—কোন্‌টি কোথায় পৃথক এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছি অনেক দূর। সন্ধ্যার আকাশে কখনও জ্বলে উঠেছে লক্ষ প্রদীপ, অন্তিম দিনমানকালে শ্বেতচূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে গৈরিক স্রাব, প্রভাতকালে তাদের ললাট থেকে নেমে এসেছে ভলকে ভলকে শোণিতের প্রবাহ, কিংবা হঠাৎ মধ্যাহ্নে বিগলিত স্বর্ণস্রোত।

জেনেছি চোখের ভ্রম, জেনে এসেছি বায়ুস্তরভেদের মায়া,—কিন্তু তারা মনের মধ্যে এনেছে মহিমা, এনেছে সৌরবিশ্বের আহ্বান, এনেছে সৌন্দর্যলোকের অপার আনন্দ। সমস্ত আকাশকে পেয়েছি আলিঙ্গনের মধ্যে, সমগ্র হিমালয়কে পেয়েছি আপন বক্ষে। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য রূপ দেখেছি পথে পথে,—জলে, আকাশে, রৌদ্রে, নির্ঝরে, দেওদারের বনে-বনে, বায়ুর মধুর স্বননে,—সেই অনন্ত বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে বর্ণের সুষমায়। 'রিচি' গ্রামের সেই সঙ্কটসঙ্কুল অবরোহণ, রামগঙ্গার অদূরে সেই 'ঘাটি' গ্রামের বিহঙ্গকাকলীভরা গ্রাম, তারপর সেই 'টোডমের' পাহাড়ধসা কার্নিশপথ,—সেই আনন্দ আর আতঙ্কের চেতনা আজও বুকের মধ্যে ধকধক করে। 'সোরাল্' পেরিয়ে গেছি,—যেখানে নামহারা গিরিনির্ঝরিণী বনবালিকার মতো গান গেয়ে চলেছে অতিকায় পাথরের আড়ালে-আবডালে। তারপরে গিয়ে প্রবেশ করেছি বিজন গহন 'কুমারিয়ার' অরণ্যে। ওখানে আবার পেরিয়েছি কোশী 'মোহন সেতুর' উপর দিয়ে। একটি পথ আমার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে হারিয়ে গেল 'সাকারের' পথে,—আমার নিজের পথটি নদীর তীরে তীরে চলে গেল রামনগরের দিকে।

'গরজিয়াব' গভীর অরণ্যালোকেব কথা অনেকেই জানে। শুনলুম কোন না কোনও সময় একটি-দুটি নরখাদক ব্যাঘ্রের ভয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা থাকে নিত্য তটস্থ। বাঘ হলো শাসনকর্তা, তার একনায়কত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার কবে গ্রামবাসী। বাঘের ভয়ে তারা শিবমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানায়; এবং তাদের আক্রমণ ঘটলে তাবা কপালের লিখন বলে বুক চাপড়ায়। ওদেরই গ্রামের ধার দিয়ে চলে যেতে হয়েছে অনেক দূব।

বিরাট পাহাড়ের মেরুদণ্ড নেমে এসেছে কোশীনদীব পথে। সেই পাহাড় বিরাটতর প্রাকার রচনা করেছে একদিকে, অন্যদিকে গত বর্ষায় তাব পঞ্জর থেকে নেমে এসেছে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের ধস। সেই বিপুল ক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে যে-বিশালতা দেখা যায়, তাতেও বিমূঢ় হতে হয়। আবার মনে পড়ছে, এমনি ধস নেমেছিল দার্জিলিং শহরে গত ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে বোধ করি জুলাই মাসের বর্ষায়। একটি রাত্রির সেই ইতিহাস অতি ভযাবহ। সেই ধসগুলিব সঙ্গে অনেকগুলি বাড়িঘর চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং কয়েকটিব সমাধিলাভ ঘটে। নরনারী ও শিশু কতগুলির মৃত্যু হয়েছিল তার সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃৎপ্রধান পাহাড়ের ঠিক নীচে বসবাস কবা অনেক সময় বিপজ্জনক।

অরণ্যসমাকীর্ণ রামনগরের পথে যাচ্ছি। বাঁ দিকে কোশীর জলপ্রবাহের ঠিক মাঝখানে পাওয়া গেল মাটি আর পাথর মেলানো একটি মস্ত,—না, মন্দির নয়, কিন্তু তারই মতো একটি আয়তন। ওটা নাকি ভগবতীব 'মন্দিব'। ওর মধ্যে আছেন উপাট্টাদেবী। ওই আয়তনটির ভিতরে রয়েছে একটি মস্ত গুহা—নদীর বুকের উপর। ওই গুহায় অনেককাল ধরে থাকতো এক সাধু, নাম—'বালক বাবা'। সে ছিল মস্ত তপস্বী। কিন্তু যত বড় তপস্বীই হও, রক্তমাংসের দেহধারী মানুষকে প্রকৃতির শাসন, জৈবিক তাড়না এবং পার্থিব দাবি মেনে চলতেই হবে। 'বালক বাবাও' মানুষ। একদা বর্ষারম্ভে এই কোশীতে ছুটে এলো পঁচিশ ত্রিশ ফুট উঁচু জল। পশুপক্ষী মানুষ গ্রাম ক্ষেত খামার সমস্তই সেই সর্বনাশা জলের প্রবাহে ভেসে যেতে লাগলো। মাঝনদীতে রয়ে গেল ওই 'ভগবতীর গুহা' এবং ওই 'বালক বাবা।' ওকে বাঁচাবার জন্য কারো মাথা ব্যথা ছিল না। জলরাশি এসে গ্রাস করলো ওই ভগবতীখণ্ড,—গুহা এবং বালক বাবা নিশ্চিহ্ন হলো জলের তলায়।

এখানকার লোক বলে, 'বালক-বাবা' সেই মৃত্যুকে স্বীকার করেনি। যতক্ষণ তার পক্ষে

সম্ভব ছিল, উঁচু জায়গায় গলা বাড়িয়ে সে প্রবল কণ্ঠে চীৎকার করে বলেছে, বিশ্বাস করিনে! বিশ্বাসবাদীরা চিরকাল ধরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছে, তপস্বীর কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি চিরকাল। সেসব সম্পূর্ণ মিথ্যে, এ আমি বিশ্বাস করিনে।—'বালক বাবা' চীৎকার করে এই কথা জানাচ্ছিল অবিরত,—বিশ্বাস করিনে!

প্রাণীচিহ্নহীন বিপুল বন্যারাশির মাঝখানে কেবলমাত্র বালক বাবার নিমজ্জিত দেহের উপর শুধুমাত্র তার মুণ্ডটি জলের উপরে বেরিয়েছিল। জল যত উঁচু হয়, মুণ্ডটিও তত উঁচুতে ওঠে। জল উঁচু হয় পর্বতপ্রমাণ, মুণ্ডটি ওঠে তারও উপরে। সেই অটল স্থির মুণ্ডটি শেষ পর্যন্তই টিকে রইলো।

'বালক বাবার' মৃত্যু হয়নি। বন্যা চলে গেল,—বালকবাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে! ওটা হলো ভগবতীর গুহা!

দেখতে দেখতে রামগঙ্গার তীরে এসে গাড়ি থামলো। সামনেই রামনগর।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নিষিদ্ধ তিব্বত

সন্ন্যাসী বলছেন, জ্বলন্ত ধূপ এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি সুগন্ধ রেখে যায় তার পরিবেশে। গিরিরাজের অপার বিস্ময়ের মাঝখানে তপস্বীরা যেখানে বীজমন্ত্র জপ করে গেছেন, সেই 'আসনের' আশে-পাশে এসে দাঁড়াও, তোমারও হৃদয় একটি অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হবে।

প্রশ্ন করলুম, সে-আচ্ছন্নভাবটি কেমন, মহারাজ?

সন্ন্যাসী হাসলেন।—চুম্বকের আকর্ষণে লৌহচূর্ণ যেমন থরথরিয়ে কাঁপে, তেমনি।

পুরাকালে তিব্বত ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। যেমন ছিল গান্ধার, যেমন কম্বোজ আর যবদ্বীপ, যেমন সুমাত্রা আর শ্রীলঙ্কা। ওদের কারো নাম ছিল অমরাবতী, কারো বা স্বর্ণদ্বীপ। তিব্বতকে সেই পুরাকালে বলা হতো কিম্পুরুষখণ্ড, তথা স্বর্গভূমি, তথা স্বর্ণভূমি। স্বর্ণভূমি ত বটেই,—তিব্বতে আজও অপরিমেয় সোনা প্রায় সর্বত্র নদী আর পাথরের নীচে পুঞ্জীভূত। কিম্পুরুষখণ্ড নাম হয়েছিল হিমালয়ের জন্যই, কারণ হিমালয়ের অপর একটি পৌরাণিক নাম হলো কিম্পুরুষপর্বত। প্রতি তুষারচূড়ায় পুরুষোত্তমের নিত্যকালের সিংহাসন পাতা। পুরাকাল থেকে ইতিহাসের কালে এসে দেখি, একে একে ভারতের সীমানা-ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ভারতের অবয়ব থেকে,—বনস্পতির থেকে শাখা-প্রশাখা ঝড়ের তাড়নায় যেমন ছিন্ন হয়ে ছুটে যায়। গান্ধার, পামীর, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, কম্বোজ, সিয়াম, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ,—একে একে সবাই চলে গেছে। এই সেদিন গেল শ্রীক্ষেত্র ওরফে ব্রহ্মদেশ,—এখনও পঁচিশ বছর হয়নি। আর যা গেল সম্প্রতি, তারও ক্ষতস্থান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। এমনি করে যুগযুগান্তর ধরে ভারত ছোট হচ্ছে, সীমানা তার সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। শুধু আনন্দের কথা এই,—ধর্মবোধে, অধ্যাত্মভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও তাদের সকলের সঙ্গে ভারতের সমগোত্রিয়তা বর্তমান। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মনে। তবে কি সনাতন এবং বৈদিক ভারত বৌদ্ধদর্শনকে আজও গ্রহণ করতে পারেনি? তবে কি আর্য-দ্রাবিড়ের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের মিল ঘটলো না কোনও কালে? কে কাকে ত্যাগ করলো?

হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে এর জবাব কোনওদিন মেলেনি। সন্ন্যাসী বললেন, হিমালয়ের মতো এতবড় রণক্ষেত্রও পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। কিন্তু সেই রণক্ষেত্র হলো ধর্মবাদের, দর্শনমতের। সেই রণক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটেনি কখনও, কিন্তু যোগতন্দ্রায় আত্মসমাহিত অনেক তপস্বীর জীবনপাত ঘটে গেছে। সত্যকে যারা অক্লান্তভাবে খুঁজেছে, আলোকের সন্ধানে যারা সর্বত্যাগ করে দুর্গমে আর দারুণের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে,—তাদের চেয়ে রণবীর আর কে আছে সংসারে? তারা নিঃশব্দে জয় করেছে মানুষের শ্রদ্ধা, নিভৃতে নির্ণয় করেছে মানবসভ্যতার নিয়তি। তাদের প্রশ্নোত্তর মীমাংসার পথ ধরে ভারত-সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে তার জ্ঞানের জগতে। বুদ্ধিকে নির্মল করেছে, সভ্যতাকে সুন্দর করেছে।

তিব্বতের প্রবেশপথ এক হাজার বছরের মধ্যে কোনওদিন সহজ হয়নি। পথ দুঃসাধ্য বলে নয়, কিন্তু কোনও পর্যটক অথবা তীর্থযাত্রী তিব্বতবাসীর নিকট আজও তেমন কাম্য নয়। মৌর্যসাম্রাজ্যকালে, সিথিয়ান যুগে, ব্যাক্‌ট্রিয়ের কালে, হর্ষবর্ধন-সমুদ্রগুপ্ত-স্কন্দগুপ্তের সময়ে--তিব্বত এবং চীনের দ্বার খোলা ছিল। কিন্তু মগধ সাম্রাজ্যের শেষ দশায় মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে সেই অবারিত দ্বার বন্ধ হয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই. লাসা নগরীর সীমান্তে 'জো-খাং' নামক বিরাট বৌদ্ধমঠে যে-পঞ্চধাতুনির্মিত অতিকায় বুদ্ধমূর্তিটি পবিত্রতম বলে পূজিত হয়, সেই মূর্তিটি ভারতের। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালেই মগধে এই মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং মুসলমান আক্রমণকালে চীনসম্রাট মগধের রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, এবং সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই মূর্তিটি চীনসম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর চীনসম্রাটের কন্যার সহিত যখন তিব্বতরাজের বিবাহ হয়, সেই সময় বধূবেশিনী সম্রাটদুহিতা এই মূর্তিটি তিব্বতে আনেন। তিব্বতের সেই রাজা এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এই মূর্তিটি স্থাপন করেন।

বুঝতে পারা যায়, ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মুসলমান আমলে। ভারতের বৃহত্তম সমতল ক্ষেত্রে পাঠান-মোগল- পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজ—এরা জায়গা পেয়ে প্রভুত্ব করেছিল,—কিন্তু এদের থেকে গোঁড়া বৌদ্ধ-তিব্বত একান্তে সরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারা এতকাল ধরে ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসের সঙ্গে পর্যটককেও সরিয়ে রেখেছে যুগের পর যুগ। তিব্বত হয়ে গেল নিষিদ্ধ।

ওরা নাকি পৃথিবীর একমাত্র 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়। ওদের দেশব্যাপী গ্রন্থভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ পুঁথি আর ধর্মগ্রন্থ। ওরা জানে পৃথিবীর অন্তিম পরিণাম, সভ্যতার আদিঅন্ত ইতিহাস। হিমালয়ের ওপারে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ষোল হাজার ফুট মালভূমিতে,—ওরা হলো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। একটির পর একটি সভ্যতা এসে চলে গেছে, হাজার হাজার বছরে শত শত রাজ্যের অভ্যুত্থান এবং অবসান ঘটেছে,—ওরা ভ্রূক্ষেপ করেনি। চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, কাশ্মীর, নেপাল, রুশিয়া, তুর্কিস্তান,—এদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড় আর বিপ্লব, অরাজকতা আর প্রলয়,—কিন্তু তিব্বত তাদেরকে গ্রাহ্য করেনি। ওরা চিরকাল পুঁথি পড়েছে আর মন্ত্র জপেছে; 'মণিচক্র' ঘুরিয়েছে আর প্রেত-পিশাচ তাড়িয়েছে। মানুষের চেয়ে মন্ত্র ওদের কাছে অনেক বড়। ওরা মন্ত্র পড়তে-পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারির দ্বারা টুকরো-টুকরো করে কাটে, এবং শৃগাল-শকুনি আর কুকুর যখন সেগুলি ভোজন করে—ওরা তখনও মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। চীন ওদের উপর গায়ের জোরে প্রভুত্ব করতে চেয়েছে, ওদের ঘরে ঢুকে তম্বি করেছে, তাই ওদের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রীয় মন-কষাকষি চিরদিনের। ওরা যে কেবল স্বাধীন থাকতে চায় তা নয়, ওরা পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতেও চায়। বৌদ্ধভিক্ষু ছাড়া কেউ না ঢোকে ওদের সমাজে, সাহেব না ঢোকে, মুসলমানছোঁওয়া হিন্দু না ঢোকে, বিজ্ঞান না ঢোকে, আধুনিক সভ্যতার হাওয়া না ঢোকে। দুচারজন ব্যতিক্রম ছাড়া তিব্বতের ঘৃণা বয়ে বেরালো প্রায় সবাই চিরকাল।

তিব্বতের বিরাট মালভূমির উপরে যেমন শত শত তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া, তেমনি সংখ্যাতীত লবণহ্রদ। লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে মানুষ কিছু কিছু আছে, কিন্তু গাছপালা নেই বললেই ভালো হয়। ভারতের তুলনায় তিব্বত হলো প্রায় জনশূন্য। প্রতি বর্গমাইলের হিসাবে মাত্র সাতজনের বেশি মানুষ নেই। খাদ্য খুঁজে পাওয়া যায়

না,—ক্ষুধার্ত তিব্বত। পূর্ব তিব্বতে বাঁচবার পথ আছে, যেখানে ব্রহ্মপুত্র সৃজন করেছে অরণ্য, শস্যক্ষেত্র আর নিম্নভূমি। বালুপাথরে, কাঁকরে, লবণে সোডায় এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থে তিব্বত পরিপূর্ণ,—কিন্তু স্নেহ নেই কোথাও, কুঞ্জ-কাননের মায়া নেই, তমাল-তালী-বনরাজিনীলার ছায়া নেই। আছে আত্মনিগ্রহী অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম, এবং অন্ধ আচারঅনুষ্ঠানের কঠোরতা। পূর্বতিব্বতে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের স্বভাব কতকটা কোমল হয়ে এসেছে,—তাই রাজধানীও গড়ে উঠেছে 'কাইচু' নদীর উত্তরে লাসায়। সেখানকার পোটালা প্রাসাদে থাকেন সর্বাধিনায়ক দলাই লামা।

'মণিচক্র' ঘুরেছে লামাদের হাতে-হাতে যুগের পর যুগ,—আজও ঘুরছে। কিন্তু কলের চাকা কিংবা গাড়ির চাকা কখনও ঘোরেনি তিব্বতে। আজ সভ্যতার ধাক্কা আসছে গণতন্ত্রী চীন থেকে। তারা গাড়ি চালাতে চায় তিব্বতে, তারা আলো ফেলতে চায় অন্ধকারে, ধর্মের উপরে মানবতার দাবিকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দাবি স্বীকার করাবার জন্য তারা সৈন্যসামন্ত এনে ফেলেছে এই দুস্তর ভূখণ্ডে। এবার হয়ত কলের এবং কালের চাকা ঘুরবে!

মধ্যতিব্বত সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা বৃথা। সেখানে আছে নুন, দামি পাথর, ভূগর্ভের স্বর্ণভাণ্ডার, আর জনবসতির এখানে ওখানে আদিমকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুম্ফা। প্রচণ্ড হাওয়ায়, তুহিনের ঝাপটায়, প্রখর সূর্যে, নির্মল জ্যোৎস্নায়, ক্ষণমর্জী প্রাকৃতিক চটুলতায়, আকাশের অত্যুগ্র নীলিমায়,—তিব্বত অপার্থিব রহস্যে আচ্ছন্ন। উত্তরে তার আদিঅন্তহীন 'তাকলামাকান' আর 'গোবি' মরুভূমি, দক্ষিণে হিমালয়ের সংখ্যাতীত তুষারচূড়া,—ধবলগিরি, মুক্তিনাথ, মানসলু, গোঁসাইথান, গৌরীশঙ্কর, এভারেস্ট, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনঝাউ, পাউহুনরি, চমলহরি,—এমনি আরো অনেক। এই সব চূড়া থেকে বেরিয়ে গেছে অনেক নদী,—এরা তিব্বতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রকে বলশালী করে তুলেছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে পৃথক করে রেখেছে কারাকোরাম, লাদাখ, জাস্কার এবং কৈলাস পর্বতমালা। কৈলাসপর্বতশ্রেণী নেপালসীমানা অবধি চলে এসেছে।

তেরোশো বছর আগে তিব্বতের রাজদূত আসেন ভারতে, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই কালে মগধে এবং বাঙলাদেশে যে 'নাগরী' বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সেই বর্ণমালা তিনি নিয়ে যান তিব্বতে। সংরক্ষণশীল তিব্বতে সেই বর্ণমালা আজও প্রচলিত রয়েছে, কেবল একটু আধটু চেহারার অদলবদল হয়েছে মাত্র। কিন্তু সম্পর্কটা ওখানেই থেমে যায়নি। বাঙলার সঙ্গে তিব্বতের নাড়ির যোগ সেই কাল থেকেই চলে এসেছে। এর পরে যশোরের রাজপুত্র সর্বত্যাগী 'শান্তরক্ষিত' বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করে তিব্বতে যান, এবং তৎকালীন নরপতি তাঁকে প্রথম তিব্বতীমঠের মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই গৌরব আজও আছে তিব্বতে। অদ্যাবধি তিব্বতীরা শান্তরক্ষিতকে আচার্য বোধিসত্ত্ব-মহাগুরু আখ্যা দিয়ে গৌতমবুদ্ধের মতোই পূজা করে। অতঃপর বাঙলাদেশ থেকে কয়েকজন বৌদ্ধপণ্ডিতও যান তিব্বতে। তাঁরা গিয়ে যে কেবল ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাই নয়,—বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। রাজশক্তির আনুকূল্য ছিল বলেই সেকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। হিন্দুদর্শনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাই যে বৌদ্ধদর্শন—এ কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। গৌতমবুদ্ধ তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি হিন্দু ছিলেন, এই সত্যও মনে রাখিনে।

এর পরে যে মহাপুরুষের কথা ওঠে, তিনিও বাঙালী। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে,—তিনি ঢাকার লোক। তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আচার্য শঙ্করের প্রতিভায় একদা সমগ্র ভারত যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, দীপঙ্করও তেমনি ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে তৎকালে অভিভূত ও মুগ্ধ করেছিলেন। বহু দেশ ও বিদেশে তিনি ভ্রমণ করেন, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় ভারতবর্ষে তৎকালে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাঁর বয়স যখন ষাট তখন তিব্বতের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান এবং বৌদ্ধদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা করে সমগ্র তিব্বতের হৃদয় জয় করেন। তিনি বিশুদ্ধ 'মহাযান' মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং তিব্বতকে বহু কুসংস্কার এবং তান্ত্রিক পন্থা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীপঙ্কর সেখানে 'কদম্‌পা' নামক একটি নূতন লামা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, সেই সম্প্রদায়টি অদ্যাবধি তিব্বতে সর্বপ্রধান। দীপঙ্কর তেরো বৎসরকাল তিব্বতে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এখনও তিনি সেখানে একান্তভাবে শ্রদ্ধেয় এবং পূজ্য। বুদ্ধের পরেই তিনি বোধিসত্ত্বস্বরূপ। তিব্বতীরা তাঁর মূর্তি পূজা করে। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধিমন্দির। ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দে দীপঙ্কর দেহত্যাগ করেন।

ভারতের সঙ্গে তিব্বতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোধ করি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানেই শেষ হয়। এর পরে ইতিহাস অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে। ভারতের হাত থেকে ওরা পেয়েছে ভাষা, শাস্ত্র, ধর্মদর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যকার যেটি প্রাণধারা, সেটি পাঠান আমল থেকেই শুকোতে থাকে। যারা মুসলমান ও তাতারের আমলে সমতল ভূভাগ ছেড়ে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল, তাদের সঙ্গে তিব্বতীদের কিছু কিছু যোগাযোগ থেকে গেছে অনেককাল ধরে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে ভারতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বলেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাজশক্তির সহায়তার অভাব এবং ভারতে বিধর্মীর প্রভুত্ব—তিব্বতকে হারাবার মূলে এই কারণ দুটি প্রধান। যারা দূরে সরে গেল, তারা অদৃশ্যালোকেই মিলিয়ে রইলো। তিব্বতের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘুচে গেল।

প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন মাত্র ইংরেজ তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম টমাস ম্যানিং। অতি অল্পকালের জন্য তিনি লাসায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনও বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁর যাবার তেত্রিশ বছর পরে দুজন ফরাসী মিশনারী লাসায় স্বল্পকালের জন্য প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরাও কোনও বিবরণ রেখে যাননি। আত্মাভিমানী ইংরেজের মনে এই বিক্ষোভ বহুদিন অবধি ধূমায়িত হতে থাকে। এদিকে ভারতের উপরে ইংরেজের প্রভুত্ব তিব্বতের চক্ষুশূল ছিল, এবং যাদের সাহায্যে ইংরেজ ভারতসাম্রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থা চালাচ্ছিল,—সেই সব ভারতীয়দের প্রতিও তিব্বতের প্রবল বিরাগ ছিল। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে ভারতের এমন কোনও বিষয়ে কোনও যোগাযোগ ছিল না, যার জন্য বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া চলতে পারে। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং গোর্খাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতের ইংরেজ সৈন্যরা। গোর্খারা তিব্বতীদের নিকট পরাজিত হয়। পুনরায় ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে নেপাল এবং তিব্বতের মধ্যে লড়াই বাঁধে, এবং বহুলোকের ধারণা এর মধ্যে ইংরেজের উসকানি ছিল। নেপাল পরাজিত হয়, এবং নিয়মিত 'ক্ষতিপূরণ' অর্থাৎ নমস্কারী পাঠাতে স্বীকার পায়। এর পর অপমানিত ইংরেজ দীর্ঘকাল চুপ করে থাকে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বালা করে তার মন।

শোনা যায় উনিশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন তিব্বতের দিকে অভিযান করেছিলেন, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিং স্কুলের এক অসমসাহসিক শিক্ষক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর এক 'লামা বন্ধুর' সহায়তায় তিব্বত প্রবেশের অধিকার পান। শরৎচন্দ্রের এই অভিযানের পিছনে ভারত গভর্নমেন্টের সহায়তা ছিল। তিনি তাঁর অভিযানপথের পরিমাপ করবেন, এবং খোঁজখবর আনবেন—এই ছিল সর্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন,—নয়ন সিং ও কিষণ সিং। আর্কিবাল্ড উইলিয়মস্ বলছেন,— "These men were the emissaries of the Indian Government, their duty being to survey with all possible accuracy such parts of Tibet as they should traverse. The most extensive results came from the expenditions of Kischen Singh...who in four years crossed Tibet from North to South, and from East to West...and managed to draw out a detailed plan of Lhasa. His survey is considered to be very accurate."

বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই ছদ্মবেশে এবং অতি সাবধানে তিব্বত ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এনেছিলেন তিব্বতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি ছয়মাস কাল তিব্বতের অন্তর্গত 'তাসিলানপোতে' সংস্কৃত ও তিব্বতী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চলের অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর সঙ্গে পানচেন রিনপোচের প্রধান লামা পুরোহিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে তিনি আবার তিব্বতে যান। এবার তিনি বরাবর লাসায় উপস্থিত হন। শুধু লাসা নয়,—প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন তিব্বতীয় শহরে ভ্রমণ করে প্রকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিব্বতের কর্তৃপক্ষ ঘূণাক্ষরেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য একটুও জানতে পারেননি। রাজনীতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক এবং কূটনীতিক,—সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ঝুলিতে ভরে এনেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ভারত গভর্নমেন্ট তাঁকে এক বিশেষ উচ্চ উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন, এবং 'রয়াল জিয়োগ্রাফিকাল সোসায়েটির' নিকট থেকে তিনি অর্থসাহায্যও পান। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে,—'তাসিলানপো' থেকে ভারত প্রবেশের পথে,—সহসা লাসা কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা 'পানচেন্ রিন্‌পোচের' প্রধান লামাপুরোহিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'সিন্‌চেন্‌লামাকে' গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা পাঠান। এই কাহিনীটি নিয়ে আমি অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করেছি, তবু এখানে সংক্ষেপে সেটুকু বললে বেমানান হবে না। 'সিন্‌চেন্‌লামাকে' গ্রেপ্তার করে তুষারগুহায় রাখা হয়েছিল। অতঃপর চাবুক মারতে-মারতে তাঁকে মৃত্যুমুখে আনা হয়,—এবং তাঁর অন্তিমকালে তাঁর হাত দুখানা পিঠের দিকে বেঁধে ব্রহ্মপুত্রের তুষারগলা জলে নিক্ষেপ করা হয়। সিন্‌চেনের যে কয়জন ভৃত্য ছিল, তাদের শাস্তি আরও বীভৎস। প্রত্যেকের হাত এবং পা একটি-একটি করে কেটে নিয়েও কর্তৃপক্ষ বোধ হয় খুশী হননি, অধিকন্তু তাদের প্রত্যেকের চক্ষুও উপড়ে ফেলা হয়েছিল।—এখানে বলে রাখা দরকার, শরৎচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'সিন্‌চেনও' জানতেন না! শুধু এরা নয়, আরও অনেকে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এইভাবে কঠোর 'শাস্তিলাভ' করেছিল। তারা কেউ বাঁচেনি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে দাস মহাশয় একখানি গ্রন্থ রচনা করে যান—"Narrative of a journey to Lhasa."

এই ঘটনার পনেরো বছর পরে সুইডেনের জগৎপ্রসিদ্ধ অভিযানকারী ডাঃ সোয়েন হেডিন মধ্যএশিয়ার 'তাক্‌লামাকান' মরুভূমি পেরিয়ে তিব্বতে ঢোকেন এবং লাসার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তৎকালীন দলাই লামার আদেশে তাঁকে লাসার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সদলবলে বিতাড়িত করা হয়। হেডিন সাহেব লাডাখ এবং কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসেন (১৮৯৯ খ্রীঃ) এবং লর্ড কার্জনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় অল্পকালের জন্য পদার্পণ করেন। তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর হেডিন সাহেব বছর দশেকের মধ্যে হয়ত লাসায় গিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তিব্বত বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্টের নিকট বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব হেডিনের সেই অভিযানের আলোচনা এখানে আর ওঠে না।

তিব্বত এককালে নামেমাত্র চীনের অধীন ছিল। শুধু আজ নয়, চীনের নিকট কোনওদিন তিব্বত বশ্যতাস্বীকার করেনি। চীন একথা জানতো,—কিন্তু আপন অধিকারটুকু অব্যাহত রাখার জন্য তিব্বতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাকে বহুকাল অবধি হিংসার আশ্রয়ই নিতে হয়েছে। চীনবিরোধী তিব্বত পাছে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপন করে, সেই কারণে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে চীন-সামরিক বিভাগ তিব্বতকে একপ্রকার অবরোধ করে। এর কারণ ছিল। কম্যুনিস্ট চীন নেহরু-গভর্নমেন্টকে প্রথম দিকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেনি। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল, চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদন করে নেহরু-গভর্নমেন্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গত (Tibet region of China) বলে স্বীকার করে নিলেন, সেইদিন থেকেই চীনের ভারত-প্রীতি বেড়ে উঠলো। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে চীন পুনরায় তিব্বতের উপর তার দখল ফিরে পেলো।

আগেকার আলোচনাটুকু শেষ করি। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণগুলি তৎকালীন বৃটিশ ভারতের অধিনায়ক লর্ড কার্জন কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরই হাত থেকে পরোয়ানা নিয়ে সেনাপতি মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে শরৎচন্দ্রবর্ণিত পথঘাট দিয়েই তিব্বত অভিযান করেন, এবং তিব্বত তাঁর যথাসম্ভব 'মৃদু আক্রমণের' নিকট পরাভূত হয়। সম্ভবত এই সাফল্যের জন্যই মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড পরবর্তীকালে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কাইচুর তীর ধরে উত্তরে গেলে নদীর পরপারে লাসা। লাসা নিজেই প্রধান তীর্থ। বস্তুত, তীর্থকেন্দ্রিক বলেই লাসার এত প্রাধান্য। এই রাজধানী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে, এবং এরই মাঝখানে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গপ্রাকারের মতো 'পোটালা' প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ বলে যে সকলে এটিকে সম্মান করে তাই নয়, এটি তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরুর বাসস্থান,—যাঁর নাম দলাই লামা। 'দলাই' শব্দটি মোগল শব্দ,—উৎপত্তি বোধ করি মঙ্গোলীয়। এর অর্থ হলো যিনি সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান। যেমন হলেন রোমের পোপ, যেমন জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতি, ভারতের শঙ্করাচার্য, ইত্যাদি। কিন্তু এঁদের বাইরে রাষ্ট্র আছে,—তিব্বতে দলাই লামাকে বাদ দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনওটাই লোকস্বীকৃত নয়। এককালে পাশ্চাত্য দেশ এবং প্রাচ্যের বহু অঞ্চল এই রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। বিলাতে এটি আজও চালু আছে। ধর্মমন্দিরের পুরোহিত সম্মতিদান করেননি বলে অষ্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করে তবে স্বামীপরিত্যক্তা নারীকে বিবাহ করতে হয়েছিল; গির্জার সম্মতি না থাকার জন্য এই সেদিন রাজকুমারী মার্গারেটকে প্রণয়-বিবাহ নাকচ করতে হলো। ধর্মদর্শনের আদিভূমি ভারতে কিন্তু এই মধ্যযুগীয় অন্ধতা নেই। ভারতের সনাতনী যুগেও মানুষের আত্মিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল

স্বচ্ছন্দ। আজ থেকে একুশশো বছর আগে তক্ষশীলায় গ্রীক রাজত্ব ছিল। সেই রাজ্যের কুমার হেলিয়োডোরাস মালোয়ারাজ্যে আসেন হস্তীসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল মালোয়ায় বসন্তোৎসব। রাজকন্যা মাধবিকা সখীদল সহকারে ঝুলনের দোলনায় দুলছিলেন। তরুণ সুদর্শন হেলিয়োডোরাস মাধবিকাকে দর্শন করে মুগ্ধ হন, এবং রাজকুমারকে দেখে মাধবিকাও অনুরাগে অভিভূত হন। অতঃপর নানা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে উভয়ের বৈবাহিক মিলন ঘটেছিল। মধ্যভারতে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত ভীলসার নিকটে দু'হাজার বছরেরও আগে কুমার হেলিয়োডোরাসের নির্মিত 'গরুড়স্তম্ভটি আজও তার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বহন করে।

একশো বছর ধরে গির্জাতন্ত্রী ইংরেজ সমস্ত পৃথিবীতে রটনা করেছিল, ভারতবর্ষ হলো যোগী-ফকির, মারণ-উচাটন, যাদু-ভোজবাজি, বাঘ-ভাল্লুক-সাপ-কুমীর আর কিম্ভূতকিমাকার রাজা-রাজড়ার দেশ। এখানে সতীমেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়, কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেয় ন্যাংটা সন্ন্যাসী, লতাপাতার সঙ্গে গোবর খায় দেশের লোক, সাপ নিয়ে খেলা করে সাপুড়ে, এবং নাগা-ফকিররা 'শিরাসন' করে ঠ্যাং দুখানা শূন্যে তুলে রাখে। কিন্তু এই কথাটা কোথাও তারা বলেনি,—উল্‌কির ছাপ সর্বাঙ্গে মুদ্রিত করে ইংরেজ নরনারী অর্ধনগ্ন চেহারায় নর্মাণ্ডির তীরে-তীরে নৌকা নিয়ে যখন 'বোম্বেটে' হয়ে ঘুরে বেড়াতো, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন জগতের শীর্ষস্থানীয়। মানবাত্মার অবাবিত মুক্তিসাধনায় আজকের মতো সেদিনও ভারতবর্ষ সর্বাগ্রগণ্য ছিল!

প্রাচীন ভারতকে নিয়ে জাবর কাটতে বসিনি, কিন্তু এ কথাগুলি মাঝে মাঝে মনে করা ভালো।

তিব্বতের কথায় ফিরে আসি। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় পাই, একটি বৌদ্ধমঠ মানে একটি ছোটখাটো শহর, লামা-নিয়ন্ত্রিত। সেই শহরে যেন ভূত প্রেত পিশাচ না ঢোকে—এই চেষ্টা প্রধান। সোয়েন হেডিনকে তিব্বত থেকে তাড়াবার সময় এক প্রধান লামা বলেছিলেন, আমরা 'সভ্য' হতে চাইনে, কারণ 'সভ্য' জগতকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারিনি। আমাদের ধ্যানধারণা জপতপ বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমরা সকলের থেকে তফাতে থাকতে চাই; আমরা কারো সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চাইনে। দয়া করে একা থাকতে দাও।

শরৎচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে কয়েকটি কথাব এখানে পুনরুক্তি করি। 'তিব্বতের পথেঘাটে নগরে মঠে ও জনপদে প্রসন্ন বুদ্ধমূর্তি শত সহস্র। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত। দেবাসুবের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয়—এই হলো সাধনা। এই সাধনার জন্য তুহিন ঠাণ্ডা গুহাগহ্বরের অন্ধকারে সংখ্যাতীত ভিক্ষু লুক্কায়িত।"

'জো-খাং' নামক প্রধান মন্দিরের কথায় শরৎচন্দ্র বলছেন, দেড় হাজার বছর হতে চললো মন্দির। পুরাতন কাঠের মোহাচ্ছন্নকর প্রাচীন পৌরাণিক গন্ধ তার ভিতরে। অন্ধকার দেওয়ালগুলি অদ্ভুতভাবে চিত্রাঙ্কিত। পূজার স্বর্ণপাত্রগুলি দপদপ করছে ঘৃতপ্রদীপের ধূমেল শিখার আভায়।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে একদা কোনও এক অপরাহ্ণে ইয়ংহাসব্যান্ড এই মন্দিরে প্রবেশ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান। এখানে বলে রাখি, ইয়ংহাসব্যান্ড যদিও সমরঅধিনায়ক ছিলেন, তবু তিনি ছিলেন ভগবদ্‌ভক্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং একজন বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী। আধুনিক কালের যোগিশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ রক্ষা করে যোগনিমীলিত হন, সেই সংবাদের পর স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড বিলাতে শ্রীঅরবিন্দ

স্মৃতিসমিতির সক্রিয় সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস মাত্র কিছুকাল আগে বৃদ্ধবয়সে পরলোক গমন করেন।

স্যর ফ্রান্সিস তাঁর গ্রন্থে মুগ্ধকণ্ঠে বলছেন, এই মন্দিরে অধ্যাত্মবাদী তিব্বতের অন্তরাত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেদীপ্যমান। মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমি উদার উদাত্ত গম্ভীর ডম্বরুর গুরুগুরুধ্বনি শুনলাম,—তারই সঙ্গে পূজারীগণের করুণ মধুর এবং ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ এবং পার্বত্য উপত্যকার অসীম বিস্তারলোকে দূরদূরান্তরের শঙ্খঘণ্টারব! দেখলাম ভক্তিনম্র অনুরাগের ভাবাবিষ্ট বিহ্বলতা! সহসা আমারও সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করলাম, এই অপরূপ দৈবপ্রেরণার উৎস।...তিব্বতের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তাকে আবিষ্কার করলাম এই পরম বিস্ময়কর জরাব্যাধিবিকারহীন 'জোখাং' মন্দিরে!

দেখে নিতুম সে কেমন দেশ, যেখানে মানুষ কোথাও স্বীকৃত নয়। দু'একজন ভিন্ন এমন কোনও মানুষ তিব্বতে শ্রদ্ধালাভ করেনি, যে-ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মগত নয়। বুকের শিরা ছিন্ন করে একবার দেখে নিতুম সেই দেশকে, যেখানে মানুষ অবিশ্রান্ত কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে বুদ্ধভগবানকে,—কিন্তু মানুষের নারায়ণ যেখানে শ্রদ্ধালাভ করছে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লামা' হয়ে ওঠে! বলা বাহুল্য, অস্থির ক্ষুধায় তিব্বতকে দেখতে চেয়েছি অনেকবার। মানার গিরিসঙ্কটে, কুলুতে, কিন্নরে, জোজিলায়,—কতবার ঘাড় উঁচু করে তাকে দেখবার চেষ্টা করেছি। সিকিমে, ভুটানে, কুমায়ুনে,—তিব্বতের গন্ধ পেয়েছি অজস্র। দেখতে চেয়েছি কেমন সেই আশ্চর্য জগৎ—যেখানে পিশাচ-লোকের প্রতীকও পূজ্য,—কিন্তু গণদেবতা আরাধ্য নয়!

মনে পড়ে গেল একশো বছরেরও আগের থেকে একালের কথা,—১৮৪০ থেকে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ। মহারাজা গুলাব সিংয়ের প্রধান সেনাপতি আক্রমণ করেছিলেন পশ্চিম তিব্বত। সে-আক্রমণ নৃশংস—তার মধ্যে দয়া ছিল না। তিনি মঠ গুম্ফা মন্দির জনপদ—কোনও কিছুকে ক্ষমা করেননি। তিনি বীর কিনা জানিনে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রখ্যাত জোরোয়ার সিং। ধ্বংসের পর ধ্বংস,—ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল পশ্চিম তিব্বতের বহু অঞ্চল। সেটি ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ। জোরোয়ারের নির্মম হাতের মার খেয়ে তিব্বতের হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে পশ্চিম তিব্বত ওরফে 'লাডাখ' এলো ভারতের মধ্যে। কিন্তু জোরোয়ারের উপরে ভাগ্যের বিদ্রূপ সঞ্চিত ছিল। পরের বছরে বিজয়ী জোরোয়ার সৈন্যসামন্তসহ 'তীর্থাপুরী' থেকে গিয়েছিলেন 'তাকলাকোটে'। সেখানে তাঁর ক্যাপ্টেনের জিম্মায় সৈন্যদলকে রেখে জনকয়েক অনুচরসহ তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাখতে গেলেন 'গারটকে।' ফিরবার পথে বিরাট চীনা সৈন্যদল তিব্বতীদের সহযোগে জোরোয়ারকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। জোরোয়ারের অতিমানবিক শক্তি ও যুদ্ধপ্রতিভা দেখে সবাই ছিল হতবাক, এবং তিব্বতীদের ধারণা—জারোয়ার একজন তান্ত্রিক যাদুকর,—পিশাচসিদ্ধ! ওরা সেই পথের উপরেই জোরোয়ারকে গুলিবিদ্ধ করে মারে। সে-গুলিটি সিসার নয়, সেটি স্বর্ণমণ্ডিত। ওরা জোরোয়ারকে টুকরো টুকরো করে কাটে এবং তাঁর শরীরের এক একটি মাংসখণ্ড নিয়ে তাঁরই স্মৃতিফলক ও সমাধিমন্দির নির্মাণ করে। আজও 'শিম্বিলিং' ও 'শ্যাক্যগুম্ফায়' জোরোয়ারের দেহের একটি বিশেষ টুকরো এবং একখানা কাটা হাত সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র আজও লোকে প্রদর্শনীতে দেখে। জোরোয়ার 'অসুর' বলেই তিব্বতে অতিখ্যাত।

এই ঘটনার তেষট্টি বছর পরে কর্নেল ইয়ংহাসব্যান্ড পূর্ব তিব্বত আক্রমণ করেন—একটু আগে যেকথা বলেছি। সেই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার তিব্বতীর মৃত্যু ঘটে, এবং দলাই লামা পোটালা প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান। অতঃপর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং ইংরেজ তিব্বতের উপর চীনের দখল (Suzerainty) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। পঁয়তাল্লিশ বছর এইভাবে কাটে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। চীন পুনরায় এসে তিব্বতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরেজ সম্পাদিত সর্বপ্রকার চুক্তি নাকচ করে নেহরুগভর্নমেন্ট ইয়াটুং, গেয়ানৎসী ও গারটকের ভারতীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলিসহ সৈন্যরক্ষাব্যবস্থাও প্রত্যাহার করে নেন।

মাত্র পনেরো বছর আগেকার আরেকটি গল্প বলি। সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল,—১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ। রাশিয়ার অন্তর্গত 'কারগিজ কাজাক' থেকে তিন হাজার মুসলমান যাযাবর দস্যু চৈনিক তুর্কীস্তানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমগ্র পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করে। মানস সরোবর অঞ্চলের আটটি প্রসিদ্ধ মঠ তাদের লুণ্ঠিত হয় এবং তীর্থাপুরী গুম্ফা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ভারতীয় অন্ধ্রপ্রদেশী সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ছিলেন। সকল ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেশব্যাপী লুটতরাজের পরে দস্যুদল যখন লাডাখে পৌঁছয় তখন তাদের দখলে রয়েছে "এক লক্ষেরও বেশী ভেড়া ও ছাগল, চার হাজার ঝব্বু, দু'হাজার ঘোড়া ও অশ্বতর, পাঁচ শত রাইফেল ও বন্দুক, হাজার-হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত বিগ্রহ, অলঙ্কারাদি, মণিরত্নাদি এবং সোনা রূপা ও রৌপ্যমুদ্রা।" তারা লাডাখের সীমানায় এসে পৌঁছলে কাশ্মীর গভর্নমেন্ট তাদেরকে নিরস্ত্র করে ভারত প্রবেশে অনুমতি দেন। তৎকালে বৃটিশ-রুশ মৈত্রীচুক্তি বলবৎ থাকায় বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্ট সীমান্তের 'হাজারা' জেলায় তাদের বসবাসের জন্য নির্দেশ করেন, এমন কি তাদের জন্য খরচপত্রেরও দায়িত্ব নেন। কিন্তু তৎকালে দুটি 'ঘরের শত্রু' ছিল ভারতে—তারা হায়দারাবাদের নিজাম ও ভূপালেব নবাব। তাঁরা উক্ত দস্যুদলকে আপন আপন অঞ্চলে পরিপোষণ করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু হাজারা জেলাই তাদের উপযুক্ত বাসস্থান বলে মনোনীত হয়। এই দস্যুদলই ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তানের সাহায্যে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করে।

পশ্চিম তিব্বতের উত্তর অঞ্চলটি হলো লাডাখ। বৌদ্ধ-হিন্দু সম্রাট ললিতাদিত্য—যিনি ছিলেন অত্যুত্তর ভারতের অধিপতি—তিনি মধ্য এশিয়া ও তিব্বতে অভিযান করেন। লাডাখসহ অধিকাংশ পশ্চিম তিব্বত তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। সেটি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পরে সম্ভবত মুসলমান আমলে পশ্চিম তিব্বত ভারতের বাইরে যায়। এখন মাত্র লাডাখ ভারতের সীমানাভুক্ত। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মালভূমিপ্রদেশ হলো লাডাখ। এর উচ্চতা অনেক স্থলেই পনেরো ষোল হাজার ফুট। লে-শহর এগারো হাজার ফুট উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রদেশ আগাগোড়া তিব্বতী। সংস্কারে, সামাজিক চেহারায়, আচার আচরণে ও ধর্মনীতিতে—তিব্বতের সঙ্গে লাডাখের পার্থক্য কম।

লাডাখ হলো উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পার্বত্যভূভাগ—যেটি মূল হিমালয় ও কারাকোরামের মধ্যবর্তী জাস্কার এবং লাডাখ গিরিশ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। লাডাখের দক্ষিণ সীমানা অনির্দিষ্ট। শিপকির গিরিসঙ্কটে রংচুং উপত্যকায় পা বাড়ালে হয়ত বা তিব্বতের এলাকা—যেটির ক্যারাভান পথ গারটক অবধি প্রসারিত। এটি তিব্বত-ভারতীয় বাণিজ্যপথ। কিন্তু রূপসু, হান্‌লে, দোমেত ও রংচুং ইত্যাদি উপত্যকার 'মা-বাপ' আছে কিনা বলা কঠিন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্নেল ল্যাম্‌বটন্ ভারতের প্রথম

জরীপ করেন। তাঁর সেই পরিমাপটির অদ্যাবধি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং ভারত গভর্নমেন্টের এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক নীতি গ্রহণ করা আছে কিনা বলা কঠিন। উত্তর লাডাখ এবং উত্তর ও পশ্চিম কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের দ্বারা অবরুদ্ধ। এর মধ্যে পড়ছে স্কার্দু, বালতিস্তান, ব্রাল্‌দা, হুন্‌জা, গিলগিট, দারেল, টাঙ্গির, সোয়াত কোহিস্তান, চিত্রল, কাফিরিস্তান ইত্যাদি। এগুলি এক একটি বিরাট পার্বত্য ভূভাগ, অসংখ্য নদীপ্রবাহিত উপত্যকা এবং মালভূমি; অসংখ্য হিমাঙ্গ এলাকা, সংখ্যাতীত ছোট বড় পার্বত্য জনপদ,—এবং এই সকল অঞ্চলে সর্বপ্রকার সংবাদ চলাচলের বাইরে বৌদ্ধ ও হিন্দুকীর্তির অগণিত ভগ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক ভূভাগে শত শত বছরের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। উত্তর লাডাখের বাল্‌তিস্তান উপত্যকার উত্তরপূর্বাঞ্চল আবহানমানকাল থেকে হিমবাহের দ্বারা অবরুদ্ধ। পৃথিবীর উচ্চতম শিখর গৌরীশৃঙ্গের দক্ষিণবাহিনী নদীগুলি তুষারস্তূপে পরিণত হয়নি, কিন্তু মধ্যএশিয়ার সর্বনাশা তুহিন বাতাসের অবারিত পথ পেয়ে কারাকোরাম শৈলশ্রেণীর ক্রোড়ভূভাগে শত শত মাইল অবধি বিপুল পরিমাণ জলধারা কঠিন হিমবাহে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বিয়াফো, হিসপার, সিয়াচেন, বালটোরো, রাইমো, বাটুরা, চোগো ইত্যাদি বিশালাকায় দেশজোড়া হিমবাহগুলি প্রধান। এগুলি কখনও গলে না। এই হিমবাহলোকের ভিতরে-ভিতরে একেকটি তুষারমণ্ডিত গগনচুম্বিত শিখরলোক,—এবং তাদের প্রত্যেকটি কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এই অনধ্যুষিত মনুষ্যপদচিহ্নহীন হিমপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে ইতালীয় অধ্যাপক 'দেশিয়োর' নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী 'গডউইন অস্টিনের' শিখরে (২৮,২৫০ ফুট) আরোহণ করতে সমর্থ হন। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বতশৃঙ্গ। এই অভিযানে একাধিক অভিযাত্রী অপমৃত্যু ঘটে। পাকিস্তান-অবরুদ্ধ কাশ্মীর এলাকা কেবল যে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত তা নয়,—সিন্ধুনদের পরপারে সমগ্র কাশ্মীরের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব এলাকাও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। 'স্কার্দু' অঞ্চল থেকে তার আরম্ভ এবং 'চিত্রলের' দক্ষিণে 'অর্ণব অঞ্চল ও 'কুনার' নদীর প্রান্তে তার শেষ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং কল্পনা অপেক্ষা কাশ্মীর ভূভাগ অনেক বড় এবং পূর্ব-পশ্চিমে অধিকতর প্রসারিত—যার সুনির্দিষ্ট জরীপ আজও অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত।

পশ্চিম তিব্বতে 'গারটক' হলো একটি অতি প্রধান সম্মেলনক্ষেত্র। লাডাখ থেকে এখানে এসেছে সিন্ধুর সীমানাপথ সোজা দক্ষিণে। টিবেট্‌-হিন্দুস্থানপথ এসেছে পশ্চিম থেকে শিপ্‌কির ভিতর দিয়ে। পূর্বপথে তিব্বতের প্রসিদ্ধ সোনার খনি 'থোক্‌ জালুং' থেকে একটি পথ এসে এখানে যুক্ত হয়েছে। এই সবগুলি একত্র হয়ে সোজা দক্ষিণে ষোল হাজার ফুট উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে মানস সরোবরের দিকে চলে গেছে! একথাগুলি হিমাচল শিমলা এবং কিন্নরেব আলোচনায় পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলে এসেছি।

মানস সরোবর! সংশয়াগ্রহীকে থমকে দাঁড়াতে হলো!

মানসের প্রাচীন পৌরাণিক নাম, 'অনবতপ্তা'—আবার কোথাও এর নাম 'পদ্মহ্রদ'। অনেকে বলেন, এ দুটি নাম প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈনদের দেওয়া। পরমাশ্চর্য আলোকের পরকলায় স্বর্ণকমলের দল চিরকাল মানসের উপরে টলমল করে উঠেছে তীর্থযাত্রীর অশ্রুসজল দৃষ্টিতে! অথচ এটি নিছক চোখের ভ্রম—সবাই জানে। কিন্তু উচ্চ ভূভাগের বায়ুস্তরে সূর্যরশ্মির বৈচিত্র্যহেতু এবম্বিধ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে থাকে। কৈলাসের চূড়ায় আদি

অন্তহীনকাল বসে রয়েছেন 'বজ্র-বরাহী',—শিব এবং পার্বতী,—পুরুষ ও প্রকৃতি। তাকলাকোটের পথ ধরে গেলে কুড়ি মাইল দূর থেকে ভূ-প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় আলোক-বৈচিত্র্যবর্ণা মানস ও রাবণসরোবরের উর্মিতরঙ্গায়িত জল ঝলমল করে ওঠে, —তার প্রখর স্বচ্ছতার মধ্যে আরও কুড়ি মাইল দূরবর্তী বজ্র-বরাহী কৈলাসের ধবলমুকুট প্রতিবিম্বিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের ইতিহাস কত লক্ষ বছরের জানিনে, কিন্তু মানব ইতিহাসের প্রথম আবিষ্কৃত হ্রদ হলো মানস,—যেখান থেকে রাজহংসের দল স্বর্ণপক্ষ বিস্তার করে অনন্ত নীলিমায় বলাকার আয়তনে উড়ে যায়। কোটি কোটি মানুষের চক্ষে এই সরোবর "সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও প্রেরণাদায়িনী, পৃথিবীর সকল হ্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং প্রথম মানববংশের জন্মকাল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।" ভারতীয় জরীপ কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রাক্তন কর্ণধার এবং হিমালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ হেডেন বলেন, "ভূগোলের প্রথম পরিচিত হ্রদ হলো মানসসরোবর। হিন্দুপুরাণে মানস প্রসিদ্ধ। বস্তুত, সভ্য মানুষের কাছে ইউরোপের জেনেভা হ্রদ সুখ্যাতি লাভ করার বহু শতাব্দী পূর্বে মানসসরোবর মানবজাতির নিকট যশোলাভ করে। ইতিহাসের উষাকালেরও পূর্বে মানস সরোবর অতি পবিত্র প্রতিভাত হয় এবং এই ভাবেই এই সরোবর রয়ে গেছে চার হাজার বৎসরকাল।"

আলমোড়া থেকে উত্তরপূর্বে দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে শাবদা, কালী ও ধবলীগঙ্গার তীরে-তীরে উপত্যকার পাশ কাটিয়ে এবং আসকোট, ধরচুলা প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে 'গার্বিয়ং' নামক উপত্যকায় পৌঁছতে হয়। এখান থেকে তুষারসীমানা ও দুঃসাধ্য চড়াই আরম্ভ। গার্বিয়ং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট ত্রিশ মাইল। সরকারি হিসাবে প্রায় ১৬,৭৫০ ফুট উঁচুতে (সমুদ্রসমতা থেকে) লিপুলেক গিরিসঙ্কটে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ে আরোহণ করতে হয়। এখানে কোনও একটি বিশেষ স্থলে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণে অনন্ত গিরিমালাময় ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে 'রৌপ্যমণ্ডিত' শুভ্রতুষারাবৃত তিব্বতের গিরিশৃঙ্গদল উজ্জ্বলন্ত নীলিমার নীচে প্রখর সূর্যালোকে দেদীপ্যমান। আলমোড়া থেকে কৈলাস ও মানস সরোবরের দূরত্ব হলো যথাক্রমে দুশো আটত্রিশ ও দুশো আঠারো মাইল, এবং লাসানগরী থেকে আটশো মাইল। কৈলাসের তিব্বতী নাম, 'কাং রিন্‌পোচে।' মানসসরোবর সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। এর গভীরতা হলো তিনশো ফুট, পরিধি চুয়ান্ন মাইল এবং মোট দুশো বর্গমাইলে সীমাবদ্ধ।

কৈলাসের যিনি আদি দেবতা, তিনি 'ধর্মপাল'। ব্যাঘ্রচর্মাবৃত এবং নরকপালভূষিত। এক হাতে তাঁর ডম্বরু, অন্য হাতে ত্রিশূল। যিনি শক্তি, তিনি 'বজ্রবরাহী',—তিনি ধর্মপালের সহিত ঘন অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনের মধ্যে 'যৌনসংযোগে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে রয়েছেন।' কৈলাসের শিখরলোকে কান পেতে থাকলে শোনা যায় অপার্থিব শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও খঞ্জনী করতাল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতঝঙ্কার।

যিনি মানস-রসিক সন্ন্যাসী, যিনি প্রকৃতভাবে যুক্তিহীন সংস্কার থেকে বর্জিত, যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাবাবিলতা থেকে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত—তিনি বলছেন, বিশ্বাস করো, —"যত তীর্থ আছে হিমালয়ে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো কৈলাস ও মানস। চতুর্দিকব্যাপী সমগ্র অঞ্চল পরমাশ্চর্য লোক। হও তুমি অস্থির অসন্তোষে নিত্য চঞ্চল; তুমি যে কোনো ধর্মের, জাতির, সমাজের হও; তুমি সংশয়াচ্ছন্ন অবিশ্বাসবাদী হও, হও আস্তিক কিংবা

নাস্তিক—এক সময় হয়ত তুমি উপলব্ধি করবে, অজ্ঞানে অচৈতন্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে কখন যেন তুমি একাগ্রমতি হয়ে উঠেছ। কেউ তোমাকে পিছন থেকে ঠেলছে সম্মুখের মহাদেবতার নাটমন্দিরে,—সে হয়ত ঝড়ের হাওয়া, হয়ত অদৃশ্য শক্তি, হয়ত-বা বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রানুগ মহৎ কামনা।''

সন্ন্যাসী বলছেন, ''আজন্ম যার ঘ্রাণশক্তি পঙ্গু,—গোলাপের গন্ধ কেমন, সে জানে না! বেতারযন্ত্রের কাঁটা বিশেষ বিন্দুর উপরে নির্দিষ্ট না থাকলে দূর দেশের কোনও সঙ্গীত-অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াও! পঙ্গুনাসা মানুষ প্রথম 'গোলাপের' গন্ধ পেয়ে শিউরে উঠবে। তার সত্তার মধ্যে একটি নিগূঢ় অধ্যাত্মবাসনার কাঁটা একটি বিশেষ বিন্দুর উপরে এসে থরথর করে কাঁপতে থাকবে।''

বুকফাটা আর্তনাদ করে চলেছে সিন্ধু উত্তর-কৈলাসের পথে। সিন্ধুর আদিঅন্ত দিশাহারা। মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি ওর অনেক তীরে শত শত বছরে। সভ্যতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—এমন অজানা অনামা ভূভাগের ভিতর দিয়ে চলেছে সিন্ধু। সিন্ধু অপরিণামদর্শী। ভারতের ভৌগোলিক সীমানাকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সিন্ধুনদ। সিন্ধুর উৎপত্তি কৈলাস-মানস অঞ্চলেই।

সিন্ধু চলে গেছে লাডাখের ভিতর দিয়ে। বহু উচ্চমালভূমির উপরে লে শহর। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুম্ফা সমগ্র লাডাখে বর্তমান,—তাদের মধ্যে ফিয়াং, কাউচি, লিকির এবং হেমিস প্রধান। হেমিস গুম্ফা লে-শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দুস্তর ও লোকশূন্য পার্বত্যপথের উপরে অবস্থিত। এটি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। এই গুম্ফার মধ্যেই মহামানব যীশুখ্রীস্টের ভারতভ্রমণের প্রকৃত তথ্যাবলীসমন্বিত প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন জনৈক রুশ পর্যটক ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তুর্ক-রুশযুদ্ধের কালে তিনি একাকী ককেশাস ও মধ্যএশিয়া পেরিয়ে ভারত প্রবেশের পথে লাডাখের একটি অঞ্চলে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। তাঁকে হেমিসগুম্ফায় এনে দীর্ঘকাল শুশ্রূষা করা হয়। সুস্থ হবার পর তিনি একখানি দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধান সেইখানেই পান এবং দোভাষীর সাহায্যে তিনি পুঁথিখানি পাঠ করেন। তাইতে জানা যায় কিশোর বয়সে যীশুখ্রীস্ট বিবাহবন্ধনে ধরা না দিয়ে মধ্যএশিয়ার বণিকদলের সঙ্গে বেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আবাল্য গৌতমবুদ্ধের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণে তাঁর প্রায় ষোল বছর কাটে। তিনি পুরী, কাশী, কপিলাবস্তু, কুমায়ুন, নেপাল এবং কাশ্মীরে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল কথা—জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষই সমান, এই নীতি প্রচার করতে থাকেন। সনাতনীদের সঙ্গে যীশুর বিরোধ বাধে। উনত্রিশ বৎসর বয়সে যীশুখ্রীস্ট যেরুশালেমে ফিরে যান। অতঃপর ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যীশুকে তাঁর ভক্তরা ক্রুশ থেকে নামিয়ে গুল্মলতাশিকড়ের রসের সাহায্যে তাঁর ক্ষতস্থানগুলি নিরাময় করেন এবং পুনরুজ্জীবিত যীশু পুনরায় চলে আসেন তাঁর স্বপ্নভূমি ভারতে। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীনগরের নিকটবর্তী 'খানা-ইয়ারী' নামক স্থানে যীশুখ্রীস্টের নামে একটি কবর আছে এবং আর একটি বিশ্বাসযোগ্য কবর আছে করাচী শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে। এই পুঁথিবর্ণিত আনুপূর্বিক চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম—"The unknown life of Jesus Christ." দুইজন মাত্র

বাঙালী এই পুঁথিখানি হেমিসগুম্ফায় দেখে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ এবং অন্যজন অভেদানন্দজীরই নিত্যসেবক ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য।

হেমিসগুম্ফায় প্রধান পুরোহিত বলেন, যীশুখ্রীস্ট পালিভাষা শিখে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন এবং তাঁর ভারতে অবস্থানকালের শেষদিকে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি বৌদ্ধনীতিকে ভিত্তি করে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। যীশুখ্রীস্টের "Sermon on the Mount" নামক ধর্মনীতি-কথনটি অবিকল এবং হুবহু বৌদ্ধ তথা হিন্দু ধর্মনীতিবাদের একটি নকল মাত্র।

সিন্ধুর জন্ম কৈলাসে, ব্রহ্মপুত্রের জন্ম ব্রহ্মাসৃষ্ট মানসসরোবরে। এই নদের দক্ষিণে হিমালয়, উত্তরে কৈলাস ও 'নিয়েনচেনটাংলা।' গগনের অনন্ত নীলিমার ছায়া বক্ষে ধারণ করে সন্ন্যাসী ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মালোক থেকে ছুটে চলেছে দেবভূমি ভারতের দিকে। শীতের দিনে অধিকাংশ নদ তুষারাচ্ছন্ন। ওর দুই পাশের পার্বত্যগুহাগহ্বরে থাকে শ্বেত পীতাভ ভল্লুক; নামহারা অতিকায় জন্তুরা ধূসরবর্ণ রাত্রির ছায়ায় এসে শ্বেতনীলাভ নদের গন্ধ শুঁকে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে ভয়াবহ তাড়কাপক্ষী, অনেক জন্তু তাদের ভয়ে পাহাড়ের ফাটলে লুকোয়। কখনও কখনও খুঁজে পাওয়া যায় তীর্থযাত্রী ও বণিকদলের কঙ্কাল,—পর্বতবিচ্যুত হিমবাহের আক্রমণে তারা স্থির হয়ে আছে চিরকালের মতো। কখনও আসে ভয়াল পার্বত্য মহানাগ, কখনও বা পথভ্রান্ত ঈগল। ওরা আসে জলের পিপাসায়। কিন্তু জল না পেয়ে রক্তের খোঁজে ছোঁক ছোঁক কবে বেড়ায়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাঞ্চল অগম্য। ভীষণাকৃতি পাতালপথ শূন্য অন্ধকার গহ্বরলোক, বালুপাথরের কর্কশ প্রান্তর—এরা আচ্ছন্ন করেছে শত শত বর্গমাইল। পৃথিবী এখানে মৃদুগতি, মহাকালের জপের মালা ঘোরে অতি ধীরে, কর্মচাঞ্চল্য কোথাও নেই, মানববসতি চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আসে মঙ্গোলীয় কিংবা তিব্বতী ঘোড়সওয়ার ডাকাতের দল, আক্রমণ করে উটের ক্যারাভান,—রেখে যায় ওই লবণাক্ত বালু-কাঁকর-পাথরের মরুভূমিতে রক্তের করুণ কাহিনী। আসে হিমালয় আর কৈলাস আর নিয়েনচেনটাংলার তলায়-তলায় লবণের ঝড়, আসে তুষারের ঝঞ্ঝা,—আসে ঝাপটা আকস্মিক মেঘে, বিদ্যুতে, বজ্রে, অন্ধকারে ইয়ারখন্দে আর খোটানে, তাকলা মাকানে আর তুর্কিস্থানে, কৈলাসে আর মানসে।

রৌদ্রের প্রচণ্ড জ্বলজ্বালার মধ্যে হঠাৎ প্রবল তুষারপাত ঘটতে থাকে তিব্বতে। হঠাৎ নেমে আসে করকা প্রবল বর্ষণের সঙ্গে। দিনান্তের তমসায় হঠাৎ ভলকে ভলকে লালাভ অগ্নিপ্রবাহ ওঠে কৈলাস আর মান্ধাতার শিখরে,—সেই অগ্নিপ্লাবনের পাশ দিয়ে ওঠে ঘনকৃষ্ণ ধূম্রপুঞ্জ। একটি দিনমানের মধ্যে অগ্নিক্ষরা রৌদ্র, প্রলয়নৃত্যরূপিণী বর্ষা, নির্মল নীলিমা শরতের, প্রচণ্ড শীতের সাংঘাতিক তুষার,—এবং তার সঙ্গে বসন্ত সমীরণের মধুর স্বগত প্রলাপ উদ্বেলিত মানসহৃদয়ের রক্তকমলদলকে টলোমলো করে তোলে। উপর থেকে নেমে আসে শুক্লপক্ষের অসহ্য প্রখর চন্দ্রচ্ছটা। সেই জ্যোতির্বিকিরণের নীচে কৈলাসশিখরস্থিত দেবাদিদেবের ক্রোড়বদ্ধা বজ্রবরাহীর নিবিড়-নিমীলিত মৈথুন-যন্ত্রণা তীর্থবাসীগণের প্রাণসত্তাকে আবেগ-উদ্বেলিত করে তোলে। তারা কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করে নব বিশ্বসৃজনের।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রানীক্ষেত, রূপকুণ্ড, কৌসানী (কুমায়ুন)

গাগর গিরিশ্রেণীর নীচে-নীচে পথ চলে এসেছে অনেকদূর। কোথাও কোথাও ছোটখাটো উপত্যকা, সেখানে পথটি নানা শাখায় প্রসারিত। পাহাড়ের পর পাহাড়, তাদেরই ভিতর দিয়ে মানুষের পায়ের দাগ চলে গেছে শিরা-উপশিরার মতো। পাহাড়ের গায়ে ফসলের ক্ষেতগুলি এক একটি ধাপের মতো উপর থেকে নীচে অবধি স্তরে স্তরে সাজানো।

'কাইঞ্চি' আর 'রাতিঘাট' পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। অরণ্যসীমানার গা বেয়ে 'গাধেরা' নামক গিরিনদী ঝিবঝিরিয়ে চলেছে। নানাবর্ণের পাথরের প্রদর্শনীতে নদীর সর্বাঙ্গ ভরা। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কালো,—সব রকমের পাথর। ওর মধ্যে কষ্টিপাথর খুঁজতে আসে নানান দেশের লোক। ওপারে বনখেজুরের অরণ্য, তারই সঙ্গে চীড় গাছের জটলা। উপত্যকার রঙীন পাখিরা নদীতে নেমে এসেছে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দল বেঁধে স্নান করতে ব্যস্ত। চাষী মেয়ে এখানে ওখানে সাজিয়ে নালীপথে জল নামিয়ে আনছে ছোট্ট খামারটিতে। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ছোট ছেলে। নদীর কাছাকাছি নেমে এলে সংসারযাত্রার চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন বন্য কৌমার্য,—চারিদিকে সতেজ তারুণ্য। মুগ্ধচক্ষু কেবল যেন কিছু খুঁজে বেড়ায়,—এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে মন বসাবার চেষ্টা পায়।

কুমায়ুন পর্বতমালা বিশ্ববিশ্রুত। অনেক পর্যটক আর পণ্ডিত বাইরে থেকে এসে বলে যায়, কুমায়ুন প্রাচ্যের ভূস্বর্গলোক! কেউ বলে, শোভা ও সৌন্দর্যের অমরাবতী,—ভারতের ললাটে কুমায়ুন যেন বৈদূর্যমণির মতো ঝলমল করছে। এই ভূখণ্ডের উত্তরে গাড়োয়াল, মধ্য-উত্তরে আলমোড়া, দক্ষিণে নৈনীতাল; দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগটি হলো গাড়োয়ালের সীমানা। উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, প্রাণীশূন্য তুষার-উপত্যকা, ভয়ভীষণ অরণ্যানী, ভয়াল গভীর খদ, বন্য পার্বত্য নদীর উন্মত্ত রণরঙ্গ,—এরা এই ভূভাগকে পরমাশ্চর্য করে রেখেছে। আবার অন্যদিকে পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে ঋষির তাপোবন, নিঃসঙ্গ উপত্যকায় হরিণ আর ময়ূরের আনাগোনা,—পতঙ্গ সরীসৃপদলের বিশ্রম্ভালাপ। গিরিনির্ঝরিণীর সুস্বাদু জল, বনে বনে ফুলের শোভা, গাছে গাছে সুমিষ্ট ফল। জন-মনুষ্য যে-পথে নেই, হঠাৎ ফিরে দেখো—সাধু বসে রয়েছে জপের আসনে, নয়ত জ্বেলেছে ধুনি, আর নয়ত সংসারহারা বৈরাগী বানিয়েছে মনের মতন আশ্রম। কোনও গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের ধারে ডালপালা আর পাথরের সাহায্যে 'কুট্‌রী' বানালো সন্ন্যাসী,—মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করে রইলো 'পিপল গাছ,—সেখানে সে রয়ে গেল অনেকদিন। অধিকার কিছু নেই, দাবিও জানায় না,—কিন্তু কোনও না কোনও অনুগত এগিয়ে এলো গ্রাম থেকে। 'ভুরা' কিংবা চরসের কলকেতে আগুন দিয়ে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে দিল। সেই চরস টানলো সন্ন্যাসী তার বুক ভরে। দেখতে দেখতেই 'অসার খলু সংসার।' জয় শিব শম্ভো! ভিজা 'সাঁপিজড়ানো আঙুলের মতো সরু কল্‌কেটা হাত-ফেরতাই হয়ে চললো

কিছুক্ষণ। কেউ বা বললে, 'অওর এক ছিলম্ বনা দে।' ওর মধ্যে কেউ নিয়ে এলো কাঁচা তামাক, কেউ বা কাঁচা সিদ্ধি। আগে 'মৌজ' হওয়া চাই, পরে মুখ খুলবে। আগে গৌরচন্দ্রিকা, পরে কীর্তন। নেশায় বুঁদ হওয়া চাই, নইলে সংসারকে 'মায়া' বলে প্রতীতি হবে কেমন করে? ছেলেপুলে, কর্তা গিন্নী, ঘর-সংসার,---এদের স্বীকার করি, সেইটিই ত মায়া! তারই বাঁধন মনে-মনে। চরসের ধোঁয়ায় এই মায়াময় মনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, নাভিকেন্দ্রে প্রলয়-বিপর্যয় দেখা দেয়। সেই মধুর 'প্রলয়ের' মধ্যে হয়ত বা এসে বসলেন গ্রামের গৃহিণী সাধুর আকর্ষণে। তিনিও ওই কল্‌কেতে গোটা দুই টান দিয়ে অনিত্য সংসারের মায়াবদ্ধ জীব সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় যোগ দিলেন। গ্রামের সাধু এসে পৌঁছলেই গ্রামের পুণ্য, গ্রামের যশ। গ্রামবাসীর সেইটিই হলো বৈঠকখানা, সেইটি বৈচিত্র্য। সাধুর অবমাননা কুমায়ুনে নেই।

মেঘ করে এসেছে পাহাড়ের কোলে-কোলে, কিংবা চূড়ায়। মেয়েরা উতলা হয়ে উঠলো। ডাক দিল পাহাড়ে-পাহাড়ে। 'ভেড়ী-বক্‌রিরা' গিয়েছে অনেক দূরে, কিন্তু তারা ওই মেয়ের গলার আওয়াজ চেনে। মালভূমির তলা থেকে ডাক শুনে তারা মুখ তুলে তাকায়। মহিষের পিঠে চড়ে উঠে এলো ছোট ছেলে-মেয়ে। ঘণ্টা বেজে উঠলো ছাগলের গলায়। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে।

বয়েল্-গাড়ি কোন্ দূর দেশ থেকে ছেড়েছে এক মাস আগে। শরৎকালের শেষ দিকে পাহাড়ী-শ্রমিক তার সংসার নিয়ে উঠেছে ওই গাড়িতে। দশ-বিশখানা গাড়ি এক সঙ্গে যাত্রা করেছে এক মুলুক থেকে অন্য মুলুকে। ওরা চলেছে ফসল কাটতে ভিন্ দেশে। দুমাস ধরে চলবে ওদের গাড়ি। ওরা শ্রমিক। গাড়ির ভিতরে থাকে শিশু, কিংবা মেয়ে। পাহাড়ে-পাহাড়ে রাত্রিবাস, গাছের ছায়ার নীচে রান্নাবান্না আর বিশ্রাম, গাড়ির নীচে শয়নশয্যা পাতা। লাঠি আর সড়কি নিয়ে পুরুষ পাহারা দেয় রাত্রিকালে---পাছে জন্তু-জানোয়ার আসে। গরু-ছাগল-কুকুর—সকলের গলাতেই ঘণ্টা বাঁধা। কোনটা আক্রান্ত হলেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে ওরা এই পথে আবার ফিরবে। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বছরের সংস্থান করে নিয়ে আসবে। যেতে-যেতে পথে দেখেছি একদল পর-পর গাড়ির মধ্যে কয়েকটি পরিবার দিনের বেলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে, এবং বলদগুলি আপন মনে গাড়ি টেনে-টেনে চলেছে পাহাড়ের সঙ্কটসঙ্কুল পথের বাঁকে বাঁকে। চালকের কোনও তোয়াক্কা তাদের নেই। বলদ চলেছে, চলেছে ওদের কাঁধে-কাঁধে সংসারযাত্রা,—ওরই মধ্যে কোনও নারী প্রসব করছে, কারো হয়ত বা মৃত্যু ঘটেছে, কারো পিঠে পাহাড়ী চিতা ধারালো নখের আঁচড় দিয়ে গেছে, হয়ত বা কোনও গাড়ির একটি বয়েল্ হঠাৎ মারা পড়েছে,—-ওরা দমেনি। দানা চিবিয়ে, বাজরা-জোয়ারের ডেলা কিংবা 'মাক্কাই' পুড়িয়ে খেয়ে ওরা চলেছে আপন পথে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওদের ওই পথের উপরে চিরকালের একটি গতির স্পর্শ লেগেছে; জন্ম-মৃত্যুর অবিশ্রান্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ওদের ওই মন্থর গতি কতদিন আমার ভাবনাকে দিশাহারা করে দিয়েছে। আমার বক্ষোপটে ওরা রেখে গেছে আবহমান কালের পায়ের চিহ্ন।

পথের বাঁক একটু ফিরলেই আবার সেই নিবিড় স্তব্ধতা। কোনও একটি উড্ডীন পাখির ডাক, সরীসৃপের সাড়া, ঝিল্লির ঝনক—সেই স্তব্ধতাকে আরও গভীর করে তোলে। চারিদিকের ব্যাপক বন্যতায় ছমছমিয়ে ওঠে মন। কিছু যেন দেখছি আশে-পাশে, কেউ যেন লক্ষ্য করছে আমাকে প্রতি পাথরের অন্তরাল থেকে। আমি যেন অনধিকার প্রবেশ

করেছি একটি বিচিত্র সংসারে। প্রতি ঝোপের অন্ধকারে, প্রতি গুহার গহ্বরে, প্রতি বৃক্ষের কোটরে,—আছে কেউ, যাকে চিনিনে, জানিনে, বুঝিনে। একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহসা যেন নিঃশব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কথা বলছে না কেউ, সাড়া পাচ্ছিনে কোথাও,—আমি যেন তাদেরই পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে চলেছি। পাছে ওদের ধ্যানভঙ্গ হয়, তাই সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়েছি।

কুমায়ুনের পশ্চিমসীমানা বোধ করি তমসানদীর দ্বারা চিহ্নিত। 'বন্দরপঞ্চ' পর্বতমালা থেকে নেমে দক্ষিণে হরিপুরে এসে তমসা নদী মিলেছে যমুনার সঙ্গে। এই বন্দরপঞ্চেই হলো যমুনোত্রিতীর্থ। হরিপুর থেকে একটি পথ গিয়েছে চক্রতায়, এবং সেখান থেকে সেই পথটি সোজা উত্তরে অন্তহীন গিরিমালা ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে 'রাওয়াইন্' ও 'পাখড়ি' হয়ে কিন্নরদেশের দিকে শতদ্রুতীরবর্তী 'ওয়াংটায়'। পাখড়ি থেকে ওয়াংটার পথ খুবই দুঃসাধ্য। কুমায়ুনের উত্তর ভূভাগ হলো পশ্চিম তিব্বতের সীমানা। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালার প্রায় দুই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে কুমায়ুনের মতো এত অধিকসংখ্যক ঘনসন্নিবিষ্ট তুষারচূড়া অন্য কোথাও নেই। এমন গৌরব-গরিমা, এমন সৌন্দর্যশ্রী, এমন গিরিনির্ঝরিণীর শোভা, এমন অধ্যাত্ম আনন্দ এবং উপলব্ধির পটভূমি—অন্য কোথাও দেখিনে। কুমায়ুনের প্রতি পর্বত দেবতার মতো, প্রতি জলধারা গঙ্গার মতো, প্রতি প্রস্তরখণ্ড বিগ্রহের মতো, প্রতি গুহাটি মন্দিরের মতো। সাধু, মহাত্মা, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষু, সেবক,—এদের নিয়ে কুমায়ুন পরিপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি অধিবাসী ধর্মসেবী, সত্যবাদী, সরল এবং অতিথিপরায়ণ। হিমালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুমায়ুনেরই অন্তর্গত। কৈলাস মানসসরোবরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও নিরাপদ পথটি কুমায়ুনেরই ভিতর দিয়ে চলেছে। এই কুমায়ুনে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যে-তুষারচূড়াগুলি প্রতিনিয়ত মানুষের পূজা পায় তাদের মধ্যে যমুনাপর্বত, শ্রীকান্ত, গঙ্গোত্রি, কেদারনাথ, শতোপন্থ, বদরিনাথ, নীলকান্ত, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি, কামেত, হাতীপর্বত, গৌরীপর্বত, পঞ্চচুলী, নন্দাঘুণ্টি, নন্দকোট—এইগুলি অতি প্রধান। এর বাইরে আছে শত শত গিরিশিখর, শত-সহস্র মন্দির। আছে তুষার উপত্যকার কোলে সাধুর আশ্রম, আছে সন্ন্যাসীর তপোবন, আছে বৈরাগীর কুটির, আছে মৌনীর গুহা। দার্শনিক, পণ্ডিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যোগী, নাঙ্গা, ভাবুক, সত্যাশ্রয়ী, সর্বত্যাগী, নৈরাশ্যবাদী, আশাহত, ব্যর্থপ্রণয়ী, সন্তানশোকাতুর, পুণ্যকামী, তীর্থবাসী, মৃত্যুকামী, শিল্পী, কবি, রাজনীতিবিদ—কে নেই কুমায়ুনে? কুমায়ুনের আকাশ নিত্য 'শিবশম্ভোর' নামে মন্ত্রিত, প্রতি গিরিনদীর কলতানে গঙ্গার স্তব মুখরিত, প্রতি পাখির কণ্ঠে দেবতার মন্ত্র গুঞ্জিত,—কুমায়ুন ভারতের শ্রেষ্ঠতম তীর্থলোক। কামনায়, বাসনায়, বেদনায়, পিপাসায়, তুমি জরোজরো,—এসো কুমায়ুনে, শীতলশ্বাস মধুর সমীকরণে তোমার সমস্ত দহনের উপরে শান্তির প্রলেপ যাবে বুলিয়ে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি পঙ্গু, এসো নীলধারার কোলে,—নবজীবনের আশ্বাস খুঁজে পাবে। এখানকার মৃত্তিকায় চন্দনের গন্ধ, তপোবনের কুসুমশয্যায় দেবসৌরভ, লতায় পাতায় বীজমন্ত্রের কানাকানি, মন্দিরে-মন্দিরে উদাত্ত ওঁঙ্কারধ্বনি। প্রতি তুষারশিখরে দেবসিংহাসন। প্রতি পথের বাঁকে শিব ও শক্তি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বন্দনা।

কোশী নদীর তীরে-তীরে চলেছি। কেউ বলে এ নদীর নাম 'কৌশিক', কেউ বা বলে 'কৌশল্যা'। ছোট্ট রামগড় পেরিয়ে যাচ্ছি,—আশে-পাশে সামান্য পাহাড়ী বস্তি। তারপরে

পাচ্ছি বিশ্রাম নেবার মতো গ্রাম—'গরমপানি'। আবার এগিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে। নালানদী ছাড়িয়ে আদিম অতিপ্রাকৃত বন্যতা দেখে যাচ্ছি ওপারের পাহাড়তলীর ছায়ায়-ছায়ায়। মন কেঁদে উঠেছে কতবার মায়ার কাঁদনে। ভিতরের পাখি পোষ মানেনি কোনওদিন। হিমালয়ের বৃহত্তর প্রাকৃতলোকে এসে ভিতর থেকে সে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে, ডাক দিয়েছে বিদীর্ণকণ্ঠে আকাশলোকের দিকে তাকিয়ে। পিঞ্জরের বিহঙ্গ নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েও স্থির থাকতে চায়নি। আপন জগৎকে সে আবিষ্কার করছে থেকে-থেকে।

দক্ষিণ বাঁকপথে ঘুরে সামনেই পাওয়া গেল 'খয়েরনা' সাঁকো। এপারে দক্ষিণ কুমায়ুন, ওপারে মধ্য-কুমায়ুন। 'খয়েরনা' হলো নৈনীতাল ও আলমোড়ার অন্যতম সংযোগ-সেতু। দেখতে দেখতে এসে পৌছলুম 'পিলখোলি'-র ঘাঁটি পাহারায়। এখানে খাজনা দিয়ে সেলাম ঠুকে যেতে হবে। চড়াইপথ এখান থেকে চলে গেছে রানীক্ষেতের দিকে।

এ আমার পরিচিত পথ। পরিচিত, কিন্তু চিরকালের অচেনা। প্রতি পাহাড়ের বাঁক চব্বিশ বছর ধরে নতুন ভাষ্য দিয়েছে আমাকে। বৃক্ষ পরিণত হয়েছে বনস্পতিতে, নতুন কালের ঝরনা নেমে এসেছে, নদীর পাথর আরেকটু মসৃণ হয়েছে,—মহাকালের ধারাবাহিকতা ওদের উপরে রেখে গেছে তার গতির দাগ,—তবু অজানা রয়ে গেল যা কিছু প্রাণের প্রিয়। ওই পাথরে কান পেতে শুনে গেছি যেন কতবার কার পায়ের ভাষা, নদীতে-নদীতে আগমনী, ঝাউ-পাইনের বনে-বনে মন্ত্রপাঠ,—আর চারিদিকের অনাদি অনন্ত অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কোথায় যেন কার পরম আহ্বান। জানিনে কিছু, ভাষা ছিল না কণ্ঠে, নির্দেশ দিল না কেউ, খুঁজে পেলুম না কিছু কোনওদিন,—কেবল আমার মর্মলোকের বাসাছাড়া সেই পাখি এক আকাশ থেকে অন্য আকাশপথে রক্তঝরা কণ্ঠে ডেকে-ডেকে ক্লান্ত হয়ে এলো।

চড়াইপথ উঠে এলো অনেক দূর। দিগন্ত এবার বিস্তৃত হয়েছে। অবরোধ সরে গেছে। হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া উঠেছে গিরিশিখরে। উত্তর পথের বাঁক পেরিয়ে 'রানীক্ষেত' শহরে এসে পৌছলুম। হিমালয়ের তুষারচূড়ারা আবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পুরনো বন্ধু যেন দুহাত বাড়িয়ে ডেকে নিল আপন আলিঙ্গনে। এবার এসে দাঁড়ালুম অনেক দিন পরে। প্রাচীন প্রসন্ন স্নেহের দ্বারা যেন মধুর অভ্যর্থনা জানালো 'রানীক্ষেত'—ভালো আছ ত?

মনে মনে জবাব দিতে হলো,—না, ভালো নেই। কোনওদিনও ছিলুম না। পায়ে কাঁটা ফুটেছে অনেক, মাথা ঠুকেছে তার চেয়েও বেশি। চোখ বেয়ে ঝরেছে অনেক রক্ত, বুক বেঁয়ে নেমেছে অনেক বেদনা। কপালে বলিরেখা, সর্বাঙ্গে জরা! চেয়ে দেখো মুখ তুলে।

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললাটে লেখা?"

হঠাৎ ছিটকে এসে পড়লুম আধুনিক উপকরণের মধ্যে। ঠিক বলা কঠিন,—বোধ হয় রানীক্ষেত সমস্ত কুমায়ুনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহর। মন নেচে উঠলো স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে। অনেক মানুষ দেখছি একত্র, পাকা ঘর-বাড়ি সর্বত্র, পাইনের বনে-বনে সাহেবসুবোর বাংলো, এখানে ওখানে সরকারী ব্যারাক। মস্ত বড় মার্কেট।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মোটর স্ট্যান্ডের সামনে 'লতিফ মঞ্জিল' নামক বাড়িটি আমার

পরিচিত। আজ আমি রাজসিক চেহারা আর পোশাক নিয়ে এসেছি। একা নই, সঙ্গে আছেন বন্ধুবর শশাঙ্কমোহন চৌধুরী। তিনি দড়াদড়ি ছিঁড়ে এবার বেরিয়ে পড়েছেন। আমরা 'লতিফ মঞ্জিলে'র দোতলায় একটি ঘর নিলুম। সমস্তই এবার সহজলভ্য। এবার পাচক আসুক, চাকর আর চাপরাশি আসুক।

লোভের উপকরণ চারিদিকে সাজানো। চারপাই খাটিয়া জুটলো কপালে,—একেবারে স্বর্গরাজ্য। ভোজ্যবস্তু যখন যা কিছু চাই। কাঁচের প্লেট্ সাজানো হোটেল, পেয়ালা-পিরিচের ঠুনঠুনানি, বেতার বোম্বাই গান, দোকানে-দোকানে রঙ্গীন পানীয় ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্বসিত। সমস্তটাই সহজলভ্য এবং অনায়াস। কোথাও পরোয়া নেই, কেউ প্রশ্ন করছে না, কৌতূহল দেখছিনে কোথাও,—চারিদিকে ভোগের উপকরণ থরে থরে সাজানো। বাজারে যা খুশি কেনো, যা চাও এনে দিচ্ছি, যাকে খুশি ডাক দাও, যখন খুশি বেরিয়ে পড়ো।

প্রশস্ত উপত্যকার টুকরো রানীক্ষেতে কোথাও নেই। এর ঠিক উল্টো,—শিলং শহরে গিয়ে মনে হয় না যে, পাহাড়ে আছি। এমন কি দার্জিলিংয়ের ওই চাঁদমারী বাজারও অনেকটা প্রশস্ত সমতল, আরেকটু নেমে গেলে লেবং-এর ময়দান। শিমলাতেও পাওয়া যায় আনানদেলের মাঠ। রানীক্ষেত সেই সুযোগ হতে বঞ্চিত। হয় ওপরে ওঠো, নয়ত নীচে নামো। উত্তর দিয়ে উৎরাই পথে একটু নেমে গেলে সামান্য সমতল,—নইলে রানীক্ষেত শহর হলো পাহাড়ের গা। পথের দুধারে দোকান, উপর দিকে অভিজাত পল্লী, নীচের দিকে জনবসতি। সমুদ্রসমতা থেকে রানীক্ষেত হলো ছয় হাজার ফুট উঁচু, এবং কাঠগোদাম স্টেশন থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী।

প্রশস্ত সমতলের ক্ষুধা চিরস্থায়ী হয়ে বানীক্ষেত থেকে যাবে, ইংরেজ গভর্নমেন্ট এটি বরদাস্ত করেনি। রানীক্ষেতের প্রচুর অরণ্য, জলের সুবিধা, প্রাকৃতিক শোভা এবং জল-বায়ুর আশ্চর্য গুণপনা লক্ষ্য করে এককালে লর্ড মেয়ো ভেবেছিলেন, শিমলার বদলে রানীক্ষেতকে বড়লাটের পার্বত্য কেন্দ্র বানালে মন্দ কি? তাঁর সেই অভিপ্রায় অবশ্য কার্যে পরিণত হয়নি, তবে এই শহরটিকে প্রায় একশো বছর আগে ইংরেজ সৈন্যসামন্তের ছাউনীতে পরিণত করা হয়েছিল, এবং এখানকার গোরা হাসপাতালটি ভারতবিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। একান্তভাবে ইংরেজদের জন্যই অতঃপর রানীক্ষেতের উপর তলার দিকে কুচকাওয়াজের মাঠ, পোলো খেলা ও গল্ফ্‌খেলার ময়দান নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া পাইনবনের মধ্যে স্বল্পনগ্না তরুণী মেমদের চলাফেরার জন্য পুষ্পবীথিকা, আমোদ আহ্লাদের জন্য নিভৃত নিকুঞ্জ, শীতের দিনে মধুরহাসিনীদের স্নানের জন্য স্ফটিকাধার তপ্তধারাকুণ্ড, এবং গিরিশিখরচূড়ায় উন্মুক্ত আকাশতলে জ্যোৎস্নারাত্রি যাপনের আনন্দের জন্য 'রক্তকমলদলকে' আনা হতো অনেক দূরের থেকে। তাদেরই ছিন্ন পাপড়ীর অবশেষ আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে কোনও কোনও শূন্য বাংলোর আশে পাশে।

> "জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
> কোথাও ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।
> জানি তার পণ্যবাহী সেনা
> জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।"—

রবীন্দ্রনাথ যাবার আগে বলে গিয়েছেন। আজ অবশ্য তল্পিতল্পা নিয়ে ইংরেজ চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে তার রুচি। প্রত্যেক পাহাড়ী শহরকে ইংরেজ অতি যত্নে

অলঙ্কৃত করে গেছে, তেমন আর কেউ করেনি। মুসৌরী, নৈনীতাল, ডালহাউসী, শিলং, শিমলা, সর্বত্র ইংরেজেরই রুচির পরিচয়। যেখানটিতে দাঁড়ালে হিমালয়ের শোভা সব চেয়ে ভালো ভাবে দেখা যায়, ইংরেজ ঠিক সেখানে 'আসন' নিয়েছিল। শিমলায় 'মাসোব্রা', নৈনীতালের টিফিন্-টপ, মুসৌরীর লাণ্ডুর, দার্জিলিংয়ের রাজভবন, ডালহাউসীর উপরতলাটা,—এমন কি ওই সোমেশ্বর থেকে এগিয়ে 'কৌসানী' পাহাড়ের চূড়ায় ডাকবাংলোটি,—ইংরেজের রুচি সর্বত্র সমানভাবে কাজ করছে। কৌতুকের বিষয় এই, ইংরেজের পক্ষে এ দেশে পার্বত্য শহরে বসবাসের ব্যাপারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানরা সাহায্য করেছিল বেশী। হিন্দুরা ওদের শাসনযন্ত্রে থেকে মুন্সীর কাজ নিয়েছিল, আর মুসলমানরা মোতায়েন ছিল ওদের ঘরোয়া জীবনে। হোটেলেই হোক, বাড়িতেই হোক, আর লাটপ্রাসাদেই হোক,—ওদের পাচক, ভৃত্য, আরদালি, চাপরাশি ইত্যাদি সবাই মুসলমান। এর প্রধান কারণ হলো গরু। গরু খায় ওরা উভয়েই। সামাজিক জীবনে আহার্যের ব্যাপারটা খুবই প্রধান। সুতরাং গোমাংস ছিল উভয়পক্ষের রুচির সংযোগসেতু। ওদিকে হিন্দুরাও শূকর ঘাঁটে। অনেক হিন্দু শূকর খায়, এবং ইংরেজও শূকরভক্ত। অতএব শূকরেরাও অনেক সময়ে হিন্দু আর ইংরেজের মিলন ঘটাতো। মুরগীর কথা বাদ দিচ্ছি। এটার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সবাই পাশাপাশি পাত পেতে বসে গেছে! যাই হোক, আগে অতটা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু প্রত্যেকটি আধুনিক পার্বত্য শহরে এলেই একটি মুসলমান সমাজের দেখা পাই। তাদের অধিকাংশই আগে ছিল মাংসবিক্রেতা, রুটিওয়ালা, হোটেল-বয়, বাবুর্চি, আরদালি ইত্যাদি। সমগ্র ভারতীয় হিমালয়ে মুসলমানের দেখা মেলে খুবই কম, কিন্তু শহরে এলেই ওদেরকে ওইসব কাজে নিযুক্ত দেখা যায়। ইংরেজ চলে যাবার পর মুসলমানদের অনেক কাজ চলে গেছে। এ আলোচনায় আমি কাশ্মীরকে বাদ দিচ্ছি।

রানীক্ষেত শহরটি অনেকটা যেন বারান্দার মতো। উত্তর অংশটা সম্পূর্ণ অবারিত। এই বারান্দায় দাঁড়ালে তুষারমৌলী হিমালয়ের অনেকগুলি চূড়া পাশাপাশি দেখা যায়। নীলকান্ত, বদরিনাথ, হাতীপর্বত, গৌরীপর্বত, ত্রিশূল, নন্দাদেবী ও নন্দাকোট—একটির পর একটি সাজানো। কখনও দুগ্ধশুভ্র, কখনও গৈরিক, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও পীত-নীলাভ, কখনও বা মেঘময়। রূপে, বর্ণে, সৌন্দর্যে, মহিমায়,—সে যেন নিত্যকাল ধরে রানীক্ষেতকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে। বস্তুত, কুমায়ুনের আর কোনও শহর থেকে এমনভাবে দিগ্বলয়-প্রসারিত হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য দেখা যায় না। দিন দুই আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

রানীক্ষেত থেকে একটি পথ উত্তর-পশ্চিম দিয়ে নীচের দিকে চলে গেছে, এইটি বদরিনাথ যাবার প্রধান পথ,—'বদরিনাথ মার্গ'। একদা কেদার-বদরি পরিক্রমায় হৃষিকেশ থেকে হাঁটতে আরম্ভ করে ঠিক এই পথের মুখে পৌঁছতে চারশো মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। আজ এ পথ পরিত্যক্ত, কারণ 'কোটদ্বার' থেকে 'কর্ণপ্রয়াগ' হয়ে এখন 'চামোলি' পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। রানীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে সোজা বদরিনাথ ছিল পায়ে হাঁটা একশো সাতাশ মাইল পাহাড়। আজ আর এপথে কেউ যায় না। পুরনো কথা স্মরণ করে আমি গেলুম কিছুদূর, এবং দেখতে দেখতে অনেক নীচের দিকে। চিনতে পারলুম না বিশেষ কিছু,—কেননা চলে গেছে অনেককাল। পথ ভেঙে পাথর বেরিয়ে পড়েছে, শ্রী নেই কোথাও। বস্তির চিহ্ন নেই, এক-আধখানা পরিত্যক্ত

চালাঘর। কাঠের খুঁটি গেছে ভেঙে, ছাদ ধসে পড়েছে। মানুষের সমাগম সহসা চোখে পড়ে না। নিতান্ত দেহাতী ছাড়া যাত্রীরা কেউ আর এপথ মাড়ায় না। মাইল দেড়েক দূরে গিয়ে পাওয়া গেল 'কোট্‌লি' আর 'কিল্‌কোট' চটি। এক আধটি দোকান, দু'একটি লোক। এ আমার গত জীবনের পথ। জন্মান্তরে এসে আর কিছু চিনতে পারিনে। এই পথে ঝুলি কাঁধে নিয়ে একদা ফিরেছিলুম। আনন্দে, ভাবনায়, নৈরাশ্যে, কৌতূহলে,—এই পথে ছিল সেদিন অনন্ত বিস্ময়। আকাশের অগ্নিবর্ষণে, জ্যোৎস্নাকিরণে, ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে, যন্ত্রণায় আর অগ্নিবাসনায়, ভ্রান্তিপ্রমাদে আর আশীর্বাদে,—এই দুঃসাধ্য কর্কশ পিপাসার্ত পথ সেদিন ছিল প্রাণের প্রলাপে উদ্বেলিত।

পথ প্রশস্ত ও প্রসারিত, কিন্তু তার 'বেন্ড' গুলি বিপজ্জনক। একটির পর একটি বেন্ড্। শুধু ভয় করে না, সমস্ত মন ও শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। একটু অসতর্কতা, একটু অনবধানতা, হিসাববোধের ঈষৎ গরমিল,—আর রক্ষা নেই। এই বিপজ্জনক পথ আরম্ভ হয় 'মাজখালি' এবং 'কালিকা' এস্টেট পার হয়ে গেলে। পথ সুন্দর, মসৃণ, চিক্কণ—কিন্তু উদ্বেগজনক। প্রতি বিপদসঙ্কেতের মুখ থেকে গাড়ি যেন নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে। নীচের দিকটায় অনেক সময় তল দেখা যায় না। যখন দেখা যায়, তখন শীতের দিনেও কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে চীড়-পাইনের অরণ্য, মাঝে মাঝে নদীর পাথুরে খদ,—প্রকৃতি যেন সর্বত্র ইন্দ্রজাল বুনে রেখেছে। বাঁদিকে মাঝে মাঝে তুষার-শৃঙ্গগুলির সুদূরবর্তী শোভা, মাঝে মাঝে অস্তিত্বের আবরণের বাইরে অমর্ত্য মহিমা, নন্দনের সিংহদ্বার।

দেখতে দেখতে আমরা আবার এলুম প্রায় কোশী নদীর তীরে। এখান থেকে পথ গিয়েছে উত্তর পশ্চিমে। সকালের তরুণ সূর্যের আলো পড়েছে নীল নদীতে। চারিদিকের পাহাড়ের নীচে নদীর সুবিস্তৃত দুই পারের উপত্যকায় চাষের কাজ চলছে। সভ্যতার সীমানা থেকে অনেকদূর। মহাকাল যেন এখানে স্তব্ধ কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নদীর কোলে-কোলে সেই বিচিত্র বর্ণের পাথর, দূরে দূরে চিরকৌমার্যব্রতধারী মহারণ্য দাঁড়িয়ে যেন অতিকায় কালপ্রহরীর মতো। তারই নীচে-নীচে শিশু মানব আর মানবী যুগ থেকে যুগান্তরে আপন আপন অন্ন খুঁটে খেয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি গৃহপালিত পশুর চোখেও যেন সৌরবিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের পরম বিস্ময়।

একে একে 'পাট্‌লিবাজার', 'সাকার', 'মানান' ইত্যাদি জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছি। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে নরনারী ও শিশুর মুখের আকার বদলাচ্ছে। গরুর মুখের ও শিরদাঁড়ার ভঙ্গী, শিংয়ের আকার ও গঠন, মেয়েপুরুষের মুখের চোয়াল এবং গালের হাড়—একে একে ভিন্ন চেহারা নিচ্ছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মঙ্গোলীয় রক্তের ধারা এখানকার হিমালয়ের দক্ষিণ সীমানাতেও এসে পৌঁছেছে। পরিবর্তনের এই দ্রুতগতি দেখে অনেক সময় বিস্ময়বোধ করেছি। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ি 'রান্‌মান্‌' ও 'টানা' গ্রাম পিছনে রেখে শিবের মন্দির আর ছোট ছোট বস্তি-বেসাতি ছাড়িয়ে চললো অনেকদূর।

হিমালয়ের গহনলোকে এটি একটি বিস্তৃত অধিত্যকা এবং সমস্ত পাহাড়ের দ্বারা অবরুদ্ধ। হিমালয়ের বন্যা এখানে অতি বিস্তারলাভ করে, এবং সেটি ভয়ের কথা। এখান থেকে গাছকাটা গুঁড়ি, পাথর এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ বাইরে চালান যায়। লগ্‌গুলিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জ্বালানি কাঠ এবং পশুর খাদ্যও নিয়ে যায় এখান থেকে।

'সোমেশ্বরে' এসে পৌঁছলুম। এটি ক্ষুদ্র শহর এবং চারিদিকের এই অধিত্যকার মাঝখানে কোশীর প্রান্তে এটি অনেকটা নাভিকেন্দ্রের মতো। সোমেশ্বর হলো স্থানীয় তীর্থ। নিকটেই সোমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। চারিদিকেই পাহাড়, শহরটি শান্ত। মন্দিরের পিছনে ক্ষেতখামার। কথায় কথায় আমরা মন্দির দেখতে পাচ্ছি, কথায় কথায় পাহাড়তলীর আশে-পাশে শিবস্থাপনা। সোমেশ্বর শহরের ভিতর দিয়ে আন্দাজ চার মাইল দূরে হলো 'ছেন্দাগ্রাম'। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শুভ্রায়তন শিবমন্দির। মাঝপথে পাওয়া গেল একটি 'গান্ধী আশ্রম।' তারপরে ছাড়িয়ে চললুম কোশীর একটি পুল। আমরা কোশী ধরেই যাচ্ছি। নদী না পেলে জনপদ সহসা দাঁড়ায় না। জল হলো জীবনের পরিচয়। একবার উঠছি, আবার নামছি। বাঁকে-বাঁকে নদী, পাশে পাশে খদ, চলতে চলতেই চড়াই আর উৎরাই। আমরা 'কৌসানী' পাহাড়ের চূড়ার নীচে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এ অঞ্চল বনময় নির্জন। বনের ভিতর দিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁকে হঠাৎ এক এক সময় দূর আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তুষারচূড়া,—ত্রিকোণাকার 'ত্রিশূলের' শোভা ঝলমলিয়ে উঠছে। ছবির মতো মনে হচ্ছে, একথা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। নিজেদের চক্ষুকেও অবিশ্বাস করছি, কেননা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে এমন সুষমামণ্ডিত, এরূপ ক্বচিৎ দেখা যায়। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাইনবনের কোলে কোলে নেমে গিয়েছে সুদূর গভীর অধিত্যকা অন্তত পঁচিশ মাইল দূরে। এই পঁচিশ মাইল অধিত্যকা-প্রান্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি—যেন এই 'বাতায়ন' থেকে। সেই শস্যপ্রান্তরশীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলতুষারমৌলী ত্রিশূলশৃঙ্গের বিরাট সর্বকালজয়ী গৌরব। আনন্দে আমাদের কণ্ঠ শুকিয়ে উঠছে বার বার।

উৎরাই পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একসময়ে আমরা এসে পৌঁছলুম 'গরুড়' শহরে। এইটি হলো এ অঞ্চলের শেষ শহব—এর পরে কোনও চাকার গাড়ি হিমালয়ের মধ্যে আর প্রবেশ করে না। পাহাড়ের অবরোধের মাঝখানে এই বিশাল 'কাত্তুরী' অধিত্যকা, কিন্তু সমুদ্রসমতা থেকে এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু—সুতরাং একে মালভূমি বলতে অসুবিধা নেই। 'গরুড়ের' বাজারটি বড়। এখান থেকে পশম, কাঠ ইত্যাদি চালান যায়। কাছেই গরুড় নদী। আমরা পায়ে হাঁটা পথ ধরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলুম। 'কাত্তুরী' রাজাদের আমল থেকে এই অধিত্যকাকে 'কাত্তুরী' বলা হয়।

তিনটি নদী হিমালয় থেকে নেমে এখানে এসে মিলেছে। 'গরুড়' ছাড়া আর দুটি হলো 'কোশী' এবং 'গোমতী'। আমরা যাচ্ছিলুম 'বৈজনাথ' মন্দির দর্শনে। প্রায় মাইল খানেক পথ, 'কোশী' পুলের পর এখানে আমরা গরুড় এবং গোমতীর সাঁকো পার হলুম। মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্নার সংসার ফেলে এসেছি অনেক পিছনে, এসে পড়েছি বিরাটের কোলের মধ্যে—যেখানে দাঁড়িয়ে কোনও একটা মহৎ জীবনকে ডাক দেওয়া যায়। উদার অনন্ত গিরিমালা, বিশাল এক একটি অতিকায় পাথর, উপলাহত নীলাভ স্রোতস্বতী, অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্যে রঙ্গীন পাখিদলের কূজনগুঞ্জন,—এদেরই মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি। মুখ বুজে চারিদিকে যেন স্তবপাঠ চলছে। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গোমতীর লৌহসেতু অতিক্রম করে বৈজনাথের মন্দির এলাকায় এসে দাঁড়ালুম। চেয়ে দেখছি হিমালয় থেকে গোমতী প্রথম নেমেছে মর্ত্যে বিশাল গর্জের বাঁধন ভেদ করে। এই সংযোগস্থলে বৈজনাথের গৈরিকবর্ণ প্রাচীন মন্দির দাঁড়িয়ে। এখানে নদীর দুই পারে মন্দির। বৈজনাথের 'তল্লীহাটে' লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও 'রাক্ষস দেউল'। এখানে মোট সতেরোটি

মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। সমস্তই প্রাচীন পাথরের, তোড়জোড় একেবারে আল্‌গা—বড় একটা ভূমিকম্প, গোমতীর একটা বড় বন্যা,—তারপরে হয়ত আর কিছু থাকবে না। কিন্তু এইভাবেই নাকি চলে এসেছে প্রায় সাত আটশো বছর। এ মন্দির প্রথম নির্মিত হয় চন্দ্রবংশের কোনও এক রাজার আমলে। তার কোনও ইতিহাস আছে কিনা জানিনে। যেমন কাংড়ায় দেখে এসেছি 'বৈজনাথকে',—এখানেও ঠিক তেমনি। বৈজনাথকে 'বৈদনাথও' বলা হয়। এ ছাড়া রয়েছে 'বামনী' ও 'কেদারনাথের' দেউল। ভিতরে একটি শ্বেতবর্ণা 'পার্বতী'র মূর্তি, কেউ বা বলেন অন্নপূর্ণা,—মূর্তিটি জয়পুরী ছাঁচে নির্মিত—কিন্তু এমন সুশ্রী সুন্দর ও পেলব শ্বেতপাথরের মূর্তি হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। বৈজনাথ এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নিকটবর্তী পাহাড়ে এক মাইল থেকে দেড় মাইলের মধ্যে 'রানচুলকোট' দুর্গ, 'ভ্রামরীদেবী' ও 'নাগনাথের' মন্দির। বৈজনাথ থেকে বাগেশ্বর হলো তেরো মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে—সেই পথ গিয়েছে গাড়োয়ালে। চব্বিশ বছর আগে রুদ্রপ্রয়াগের আশ্রমে বসে সন্ন্যাসিনী নারায়ণগিরিমায়ি আমাকে 'বাগেশ্বর' হয়ে কৈলাসের পথ নির্দেশ করেছিলেন। এই পথ হলো সেই। এখান থেকে সোজা উত্তরে দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগের দিকে—যেখানে 'পিন্দার' গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। 'বাগেশ্বর' জনপদটি হলো এই গোমতী এবং সরযূর সঙ্গমস্থলে অতি রমণীয় অঞ্চল। সেই সঙ্গমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাগনাথ, ভৈরবনাথ; গঙ্গামাতা এবং দত্তাত্রেয় মন্দির। সরযূর উপরে অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির শোভার মধ্যে রয়েছে লছমনঝুলা'র মতো কাছিবাঁধা সাঁকো,—তারই নীচে সরযূর গর্ভে রয়েছে অতিকায় 'মার্কণ্ডেয় শীলা'—যেখানে তপস্যার আসনে বসে ঋষি মার্কণ্ডেয় রচনা করেছিলেন 'দুর্গাসপ্তসতী' পুরাণ। লোকপ্রবাদ এই, সরযূনদীর এই সঙ্গমস্থলে 'দক্ষ হিমবান' তাঁর কন্যা দুর্গার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে বাগেশ্বরে ভূটিয়াদের বিরাট মেলা বসে। তিব্বত থেকে বিপুলপরিমাণ পণ্যসম্ভার এখানে এসে পৌঁছয়।

বাগেশ্বরের পরেই ওঠে 'পাতাল-ভুবনেশ্বর' এবং 'যজ্ঞেশ্বরের' কথা। 'যজ্ঞেশ্বর' আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দূরে, এবং এটিও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে আছেন অনেক তপস্বী। মৃত্যুঞ্জয়, নবগ্রহ, মার্তণ্ড ইত্যাদির মন্দির এখানকার প্রধান আকর্ষণ, এবং শিবরাত্রি ও বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে। একদা মুসলমানরা এই জনপদটিকে আক্রমণ করে, তাতে অনেক মূর্তি ধ্বংস হয়। 'পাতাল-ভুবনেশ্বর' এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল পার্বত্য পথ। কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ভিন্ন সেখানে আছে একটি মস্ত গুহা, তার মধ্যে নানা দেবমূর্তি খোদিত। অন্ধকার গুহার ভিতরকার কঠিন ঠাণ্ডায় অদ্ভুত রকমের প্রাচীন পাথর ও ধাতবের গন্ধ। তারই মধ্যে দেওয়ালে-দেওয়ালে মহাভারতের কয়েকটি কাহিনীও উৎকীর্ণ।

বৈজনাথ থেকে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবার যে পথটির কথা বলছিলুম, সেটি ক্রমশ দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে উঠেছে। মাইল দশেকের পর 'গোয়াল্‌দম' নামক একটি পার্বত্য জনপদ পাওয়া যায়। 'গোয়ালদমের' উত্তরপ্রান্তে সম্ভবত মূল পিন্দার গঙ্গার ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিয়ে পুনরায় উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই পথটি ধীরে ধীরে চলে গেছে নদী পার হয়ে। পূর্বদিক থেকে পিন্দার গঙ্গারই অপর একটি প্রশস্ত উপনদী এসেও এখানে মিলেছে। উত্তুঙ্গ এবং প্রায় দুঃসাধ্য শৈলশ্রেণীর ভিতর দিয়ে এই

দুর্গম পথ চলে গেছে চড়াইয়ের পর চড়াই উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিশূল পর্বতের তুষার হিমবাহের কোলে। এই অঞ্চল বৈজনাথ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তরে। ত্রিশূলের দক্ষিণে হলো পিন্দার গঙ্গা ও হিমবাহ এবং উত্তরে ঋষিগঙ্গা,—যে-গঙ্গা গিযে মিলেছে যোশীমঠের নীচে ধবলীগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গায়। ভারতেব সীমানার অন্তর্গত হিমালয়ের যে কয়টি উচ্চতম চূড়াকে আমরা জানি, তাদের মধ্যে তিনটিকে পাই এখানে কাছাকাছি। প্রথমটি ত্রিশূল, —উচ্চতা ২৩,৫০০ ফুট; দ্বিতীয়টি নন্দাদেবী,—২৫,৬৪৫ ফুট; এবং তৃতীয়টি হলো দ্রোণগিরি,—২৩,১৮৪ ফুট। কাশ্মীবের নাঙ্গা ও কারাকোরামকে (কৃষ্ণগিরি) বাদ দিলে বর্তমানে ভারতীয় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখব হলো, নন্দাদেবীর চূড়া।

সম্প্রতি ত্রিশূল পর্বতের হিমবাহের প্রান্তবর্তী 'রূপকুণ্ড' নামক একটি তুষার সরোবরকে নিয়ে ভারত গভর্নমেন্ট নাড়াচাড়া করছেন। 'রূপগঙ্গার' তীরবর্তী এই তুষারাচ্ছন্ন রূপকুণ্ডের আশে-পাশে বহুসংখ্যক নব-কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ (Skeletal remains) সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কঙ্কালগুলি বছরের মধ্যে দশমাসেরও বেশী বরফের নীচে সমাধিস্থ থাকে; কেবল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তুষারবিগলনকালে তারা দৃশ্যমান হয়। এরা কতকাল আগেকার মানুষ কেউ জানে না, কবে এদের মৃত্যু ঘটেছে তাও অজ্ঞাত। অনেকের ধারণা, এরা পরাজিত সৈন্যসামন্তের দল,—পলায়মান অবস্থায় এদের উপরে অতিকায় হিমবাহেব আক্রমণ ঘটে। আবার অনেকে বলে, এবা ছিল তীর্থযাত্রী। ত্রিশূল পর্বতের পাদদেশে 'হোমকুনি' তথা 'ত্রিশূলী' নামক অঞ্চলে গিয়ে এই তীর্থযাত্রীর দল নন্দাদেবী তথা গৌবীদেবীর পূজা দিতে চলেছিল এমন সময় তারা তুষারঝঞ্ঝা ও বর্ষণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বৈজনাথ থেকে ত্রিশূল পর্বতেব দিকে আজও প্রতি বৎসর একদল তীর্থযাত্রী নন্দাদেবীর মূর্তিসহ শোভাযাত্রা নিয়ে যায় 'ত্রিশূলী' তীর্থে। এদের নাম 'নন্দাজাত'। রূপকুণ্ড হ্রদের নিকটবর্তী রূপগঙ্গার তুষারবিগলিত ধারায অবগাহন করা এদের অপর লক্ষ্য। এরা কখনও সেখানে পৌঁছয়,—পৌঁছয় অতি কম, কেননা তুষারবর্ষণের সঙ্কেত পেলেই অভিযানে বিরত হয়। বিগত ত্রিশ বছর আগে একটি যাত্রীদল সাফল্যলাভ করেছিল। তারপর আবাব একটা প্রচেষ্টা হয় ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে—কিন্তু তাবা সমর্থ হয়নি। এই 'ত্রিশূলী' তীর্থের অন্তর্গত 'রূপকুণ্ডের' ধারে শুধু যে ওই কঙ্কালগুলি পড়ে আছে তাই নয় ওদের নিয়ে নানাবিধ প্রবাদ, জনশ্রুতি এবং লোকসঙ্গীতও নীচেকার অঞ্চলে প্রচলিত। ওরা যে তীর্থযাত্রী ছিল এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের মনে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেন্টেব নৃতত্ত্ববিভাগের পরিচালক ডাঃ এন দত্তমজুমদার মহাশয় সদলবলে দ্বিতীয়বার 'রূপকুণ্ড' এলাকায় গিয়ে কতকগুলি চর্মাবৃত কঙ্কাল সংগ্রহ করে কলিকাতায় এনেছেন। এগুলি নাকি দুশো বছরের পুরনো, এবং তুষার আবরণের জন্য আজও নষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকার সংবাদ গবেষণা করে এইটি সিদ্ধান্ত করেন যে, রূপকুণ্ডের নরকঙ্কালগুলি 'ত্রিশূলী' তীর্থেরই অভিযাত্রী ছিল। দুই শতাব্দী পূর্বে এই তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে ছিল সালঙ্কারা বহু নারী ও শিশু, কয়েকজন মেষপালক ও কয়েকটি জন্তু। তাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রীর পক্ষে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি ও লাঠি ইত্যাদিও ছিল। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি অন্যান্য তথ্যাদিও প্রকাশ করেছেন। এই তদন্ত এবং গবেষণার ব্যাপারে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিভাগের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই অন্যান্য ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করবেন শোনা যাচ্ছে। কৈলাস পর্বতের মধ্যে যেমন তুষারাবৃত সরোবর 'গৌরীকুণ্ড' দেখা যায়, এখানেও ঠিক তেমনি। রূপকুণ্ডও এক প্রকার

জমে থাকে বছরের অধিকাংশ কাল। তবে গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট, রূপকুণ্ড ওর চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। বৈজনাথ থেকে 'গোয়াল্‌দম' হয়ে 'রূপকুণ্ড' পৌঁছতে পায়ে হাঁটা পথে তিন-চার দিন লাগে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল উঁচু পথ। সম্প্রতি একটি সংবাদে শুনেছি, এলাহাবাদের একটি অভিযাত্রীদল রূপকুণ্ডের কঙ্কালাকীর্ণ স্থলে পৌঁছে 'ব্রহ্মকমল' প্রমুখ শতাধিক বর্ণের দুষ্প্রাপ্য ফুল ওখান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

'কৌসানীর' নীচে এসে আমরা দাঁড়ালুম। পথ চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চারদিকে নিঃঝুম পার্বত্য প্রকৃতি। সামনেই একটি ছোট পোস্ট আপিস, তার পাশে ছোট ছোট চালাঘরে দুটি দোকান। একটিতে চা পাওয়া যায়। তাদেরই পিছন দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে উপর দিকে। দোকানের সামনেই একটি চশমাপরা শীর্ণকায় পথ-প্রদর্শককে পাওয়া গেল।

শশাঙ্ক এবং আমি চললুম চড়াইপথ ধরে। চড়াই সামান্য, হয়ত মোট শ' তিনেক ফুট উঁচু হবে। চীড়গাছের জটলার ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ চূড়ার দিকে উঠেছে। উপর দিকে উঠে গিয়ে আমরা যে বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবো, নীচের দিকে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক অতটা আন্দাজ করতে পারিনি। নীচের দিকে যে সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে ছমছমে ভাবটি ছিল, উপর দিকে উঠে ধীরে ধীরে আকাশ যেন তার সমস্ত অর্গল খুলে সামনে দাঁড়ালো। সেই আকাশপথ কুমায়ুনের গিরিশৃঙ্গচূড়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না। অবশেষে আমরা একটি মালভূমিতে এসে পৌঁছলুম, এবং সেই সমগ্র মালভূমিটি হলো একটি বৃহৎ সুসজ্জিত এবং আধুনিক ডাকবাংলারই প্রাঙ্গণ। মানুষের সমাগম কোথাও দেখছিনে। নীচে থেকে উপরে ওঠবার আগে ছিন্নজীর্ণ পোশাকপরা যে কৃশকায় লোকটি আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল, তার চোখে মোটা চশমা,—এবং এত মোটা যে, চোখ দুটো খুব ছোট দেখায়। চেহারা উপবাসে আর অভাবে শীর্ণ এবং অকালবার্ধক্যে একটু আনত। কথা বলে কম, এবং অনেকটা যেন আত্মগত। লোকটি পথ দেখিয়ে যখন আমাদের ডাকবাংলার সিঁড়ির উপরে তুললো, তখন জানলুম সে এখানকার খানসামা তথা চৌকিদার। লোকটি যেমনই শান্ত, তেমনই নিরীহ।

কিন্তু অনেক বড় বিস্ময় আমাদের জন্য সঞ্চিত ছিল, যখন আমরা উত্তর দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। বস্তুত, সমুদ্রে সাঁতার দিলে সমুদ্রের শোভা উপলব্ধি করা যায় না। হিমবাহ দেখেছি, তুষারনদী অতিক্রম করেছি, তুষারলোকের মধ্যে রাত্রিবাসও করতে হয়েছে বার বার,—কিন্তু তখন তার শোভা-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অপেক্ষা আত্মরক্ষা করার দিকেই ঝোঁক থাকে অনেক বেশী। কতকটা দূরে দাঁড়িয়ে পরম রমণীয় চিত্রপট না দেখলে প্রকৃত রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। গগনচুম্বী ত্রিশূলশৃঙ্গ যে আমাদের আলিঙ্গনের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে নীচে থাকতে আমরা বুঝতে পারিনি। কিয়ৎক্ষণের জন্য দুজনেই আমরা হতচেতন ও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমরা যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খানসামা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে তখনকার মতো চলে গেল।

আনন্দে আর উল্লাসে শশাঙ্কর দুটো চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

ডাকবাংলার ভিতরে ঢুকে দেখি কলকাতার শ্রেষ্ঠ 'বোর্ডিং হাউসকেও' হার মানায়। বড় বড় আলমারি, বড় বড় ড্রেসিং টেবল্, অনেকগুলি খাট পালঙ্ক, অসংখ্য ফায়ার প্লেস, মস্ত বড় ডিনার টেবল, ভালো ভালো কুশন্ চেয়ার, মাথার উপর টানা পাখা, সুসজ্জিত

বাথরুম, বহুমূল্য কার্পেট দিয়ে প্রত্যেক হল্-এর মেঝে মোড়া। যেখানে যেটি দরকার। জানলা দরজা আসবাব—প্রত্যেকটি যেন ঝলমল করছে। আমরা দুজনে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। এটি গোলাকার পাকা বারান্দা এবং আমাদের বিশ্বাস, এই একটি বারান্দায় বসে বাকি জীবন অতি আনন্দে কাটানো চলে। কখনও দুঃখ পেয়েছি, কেউ ব্যথা দিয়েছে, কারও কথার আঘাতে কখনও বুকের মধ্যে ঘা লেগেছে, কারও নিষ্ঠুর বঞ্চনায় জীবনকে কখনও শূন্য মনে হয়েছে,—এই বারান্দা থেকে উদার হিমালয়ের দিকে চেয়ে একটি পলকের মধ্যে মানুষের বিরুদ্ধে সমস্ত নালিশ যেন মুছে নিয়ে গেল। নীচের পৃথিবী নীচেই পড়ে থাক, এই স্বর্গলোক থেকে বিদায় নেবার আর ইচ্ছা রইলো না।

খানসামা এসে চা দিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা পাকা করে গেল।

চূড়ার উপরে বারান্দায় বসে আমাদের সময় কেটে চললো। ঠিক এই বারান্দায় এবং এই ইজিচেয়ারে বসে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব এগারো দিন অতিবাহিত করেছিলেন ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে,—তিনি মহাত্মা গান্ধী। এই বারান্দাটিতে বসে-বসে অতি যত্নে তিনি তাঁর 'অনাসক্তি যোগ' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। বোধ হয় অনাসক্ত ভাবনার এমন একটি নিভৃত ক্ষেত্র হিমালয়ে আর কোথাও নেই, অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঈশ্বরকে যারা খুঁজে-খুঁজে হায়রান হয়, এখানকার সন্ধান বোধ হয় তারা আজও পায়নি। যদি তাঁকে ডাকতেই হয়, তবে এখান থেকে ডাকামাত্রই তাঁর কানে উঠবে। সামনেই ঠিক বারো মাইল শূন্যপথে গেলে ত্রিশূলের শুভ্র চূড়া। পশ্চিম দিকে কেদার ও বদরিনাথ, গৌরী আর হস্তী, পূর্বে নন্দাদেবী, দ্রোণগিরি আর নন্দকোট। দেবতারা দল বেঁধে এক একটি সিংহাসনে বসে রয়েছেন। সমগ্র হিমালয় ভ্রমণকালে এত স্বাচ্ছন্দ্য, এমন নিবিড় আনন্দ ও সীমাহীন অখণ্ড স্তব্ধতা আর কোনওদিন কোথাও পাইনি।

খানসামা এসে সামনে দাঁড়ালো। মালভূমির প্রান্তেই ওর বাসস্থান। ওর কে আছে আর কে নেই—প্রশ্ন করিনি। লোকটাকে এবার দেখলুম চোখ তুলে। বয়স কত ঠাহর করা যায় না। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি কিছু একটা হবে। গায়ের কোট আর পাজামা ছিন্নভিন্ন। চেহারায় কোনও চাঞ্চল্য নেই, কিছুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। মোটা চশমার ভিতর থেকে ছোট ছোট ধারালো চোখ দেখলে সমীহ হয়। অথচ চাহনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, কপালে গভীর চিন্তার রেখা, এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। গান্ধীজির সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম, মুখে চোখে একটি চাপা গৌরব ফুটলো, কিন্তু তার সংযম দেখে আমরা অবাক। গান্ধীজি এসেছিলেন, ওর বাবা তখন বেঁচে। কিন্তু ও থাকতো গান্ধীজির তদারকে। বারান্দায় গান্ধীজির আসন পেতে দিত, বিছানা করতো, দুই আনতো নীচের থেকে, স্নানের জলের ব্যবস্থা করতো, বই-কাগজ গুছিয়ে রাখতো, এবং রাত্রে পাহারায় থাকতো। ওর বয়স তখন কুড়িবাইশ। ওর কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজি বেড়িয়েছেন অনেকবার। লোকটা ধীরে ধীরে কথা বলছে, কিংবা কাঁদছে বলা কঠিন। ওর ওই আনম্র চেহারার মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটি দার্শনিক আত্মগোপন করে, আমরা মন দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পারছি। লোকটা চেয়ে ছিল 'ত্রিশূলের' দিকে। কৈলাসের হরপার্বতীর কথা তুলতেই সে ঈষৎ উৎসাহ পেলো। তীর্থযাত্রীদের প্রতি তার কী গভীর দরদ! দেখিয়ে দিল কেদারনাথ আর বদরিনাথ আর নন্দাদেবী। তারপর মৃদুকণ্ঠে নিজের ভাষায় বলতে লাগলো, মানুষ নিজের দুঃখ আর অভাব নিজেই সৃষ্টি করে, বেদনা পায়, বিবাদ বাধায়,

আবার অনুশোচনায় নিজেই কাঁদতে বসে। মানুষের জন্য মানুষ আত্মোৎসর্গ করছে, আবার মানুষই মানুষের দুর্গতি টেনে আনছে। গান্ধীজির পায়ের কাছে নৈবেদ্য দিয়ে মানুষ তাঁকে বললে, তুমিই মহাত্মা, তুমি দেশের পিতা! সেই মানুষই আবার মহাত্মাজীকে হত্যা করে সবাই মিলে কাঁদতে বসলো!

চুপ করে লোকটার শান্ত আলাপ শুনছিলুম। ভাবছিলুম লোকটার বয়স হাজার-হাজার বছরেরও বেশী। সভ্যতার ছেলেখেলা যতদিন ধরে চলেছে, লোকটা যেন তার চেয়েও বৃদ্ধ। যখন চলে গেল, আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

কৌসানীর চূড়া এবং স্বামী আনন্দের কথা শুনেছিলুম শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আলমোড়ায়। স্বামীজি থাকেন এখানে স্থায়ীভাবে তাঁর 'গঙ্গাকুটিরে'। খানিকটা অরণ্যপথ অতিক্রম করে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর দেখা পেলুম অতি সহজে। বয়স বোধ করি সত্তর হয়নি। ধবধবে চেহারা। তিনি বোম্বাইয়ের অধিবাসী, এবং প্রকৃত নাম হলো 'অমৃতলাল শেঠ'। বাণিজ্য জগতে তাঁব প্রচুর খ্যাতি। স্বামী আনন্দ গান্ধীজির একজন বিশেষ গুণমুগ্ধ অনুরাগী, এবং গান্ধীজির অপমৃত্যুকাল অবধি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গান্ধীজির সঙ্গে তিনি ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি রক্তের চাপের রোগী এবং গান্ধীজির পরামর্শেই তিনি এখানে রোগমুক্ত হবার জন্য আসেন। গান্ধীজির মৃত্যুসংবাদে তাঁর শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তিনি শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং গান্ধীদর্শনের সুযোগ্য ভাষ্যকার মাশরুওয়ালার মৃত্যুসংবাদ যেদিন তাঁর কানে এলো, সেইদিন থেকে স্বামী আনন্দ এই কৌসিনীতে তাঁর চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। হিমালয়ের এই পরমাশ্চর্য শোভা ছেড়ে তিনি আর কোথাও যেতে চান না। তিনি তাঁর বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। অধ্যাত্ম আদর্শের দিক থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করেন। এখানে তিনি দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য স্পর্শ করেন না। তাঁর বাকি জীবনের একমাত্র কামনা হলো, শান্তি সাধনা। পড়াশুনোয় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

অনেক গল্প তিনি করলেন আমাদের সঙ্গে তাঁর বারান্দায় ওই ত্রিশূলের চূড়ার সামনে বসে। বোম্বাই থেকে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় মহিলা ও যুবক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, সেজন্য কিছু সোরগোল সেদিন ছিল। আমাদের জন্য চা-বিস্কুট ইত্যাদি এলো। বললেন, এসব কিন্তু এ তল্লাটে পাওয়া যায় না, ওরা এসব সঙ্গে এনেছে—ওই ছেলেমেয়েরা। আমার এখানে কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু সঙ্গে আনিনি, কিছু সঙ্গেও রাখবো না যাবার আগে।

স্বামীজি আসবার আগে আমাদের হাতে হিমালয়ের কয়েকখানি ছবি উপহার দিলেন। এমন সুশিক্ষিত, ভদ্র, আদর্শবাদী এবং অমায়িক সজ্জন সহসা কোথাও চোখে পড়ে না। মনে মনে বহুবার প্রণাম জানিয়েছিলুম।

আসবার সময় তিনি বললেন, ত্রিশূলের ওপরে মেঘ করেছে, সেজন্য মন খারাপ করো না,—ও মেঘ থাকবে না, ভোর রাত্রের আগেই সরে যাবে।

সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা। দেওদারের অরণ্যের উপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে নীল আকাশে বড় বড় তারা। কয়েক টুকরো মেঘ অলকাপুরীর দিকে ভেসে ভেসে চলেছে। চন্দ্র জ্বলছে। জ্যোৎস্নায় ফিন্ ফুটছে তুষারলোকে। সেই আনন্দলোকে পথ চিনে চিনে আমরা ডাকবাংলায় ফিরে এলুম। সেই রাত্রি ছিল অতি শীতল। আমাদের বিবাগী মনের ভাবনা

জ্যোৎস্নায় দিশাহারা হয়ে হিমালয়ের চূড়ায়-চূড়ায় কেঁদে বেড়াতে লাগলো। ঘুম এলো না পোড়া চোখে। মেঘ বোধ হয় আর কাটলো না এবার। আমাদের নিরাশ চক্ষে অবসাদ এলো।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বিছানার মধ্যে। রাত যখন প্রায় দুটো বাজে, হঠাৎ শশাঙ্ক বারান্দা থেকে চীৎকার করে ডাকলো। ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটে এলুম বারান্দায়। কেন, কি হয়েছে? কোনও বিপদ?

সহসা দুজনে চুপ। মেঘের আবরণ সরে গেছে! দেবাদিদেব ত্রিশূলী চোখ মেলেছেন মহাশূন্যের বিপুল জ্যোৎস্নালোকে। পলকের মধ্যে দেখে নিলুম, যা কখনও দেখিনি কোনওদিন!

উভয়ে আমরা স্তব্ধ, হতবাক। আনন্দের নিবিড় যন্ত্রণায় শুধু থরথর করে কাঁপছিলুম। স্বামী আনন্দের শুভ কামনায় যাত্রা আমাদের সার্থক হয়েছে।

পরদিন বিদায় নেবার আগে খানসামা এসে দাঁড়ালো। আমরা তার হাতে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পাওনা ইত্যাদি চুকিয়ে দিলুম। পাওনা পেলেই তার চলবে। বকশিস চায় না, দাবি জানায় না। কিন্তু যখন নিতান্তই তার সুখ্যাতিতে আমরা একটু উচ্ছ্বসিত হলুম, তখন সে একটি খাতা বার করে বললে, এখানে আপনাদের কেমন লাগলো, একটু লিখে রেখে যান।

সেটি হলো ডাকবাংলার 'লগবুক'। লিখতে লিখতে একবার প্রশ্ন করলুম, তোমার নাম কি, ভাই?

লোকটি সবিনয়ে বললে, হবিব আহমেদ।

তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার ভূটান

শূন্যলোকে বিমানযোগে চলেছি কোচবিহারের দিকে।

আকাশপথে প্লেন থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম দিগ্বলয়প্রসারিত হিমালয়ের অন্তহীন শুভ্র কেশরজাল। সংখ্যাতীত শ্বেতচূড়ার উপরে পড়েছে তরুণ সূর্যরশ্মি, গলিত গৈরিক স্বর্ণপ্রবাহ নামছে দেবাদিদেবের কপাল বেয়ে। ডিসেম্বর-শেষের একটি প্রভাত। তখনও ঘুম জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গে। পৃথিবী আমাদের অনেক নীচে, রাত্রির শেষ প্রহর তখনও তার বিশাল ছায়া মেলে রয়েছে। মহাব্যোমের অনন্ত শূন্য থেকে শুধু চেয়েছিলুম শুভ্র-নীল-রক্তিম হিমালয়ের পরম বিস্ময়ের দিকে। ভেসে যাচ্ছিলুম আকাশপথে। নীচে অনন্ত নিদ্রা, পৃথিবীর পাখি তখনও ঢুলছে!

কোচবিহার বিমানঘাটি থেকে তুষারমৌলী 'সিংহচুলাকে' দেখা যায়। বেলা বেড়েছে। রৌদ্রে ঝলমল করছে তুষারের স্থির তরঙ্গ। কেউ ওটাকে বলে, 'চেনচুলা', কেউ বা বলে, 'সিনচুলা'। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ওই সিনচুলার নীচে দাঁড়িয়ে তদানীন্তন বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্ট ভূটানের সঙ্গে সন্ধি করেছিল। ইংরেজ কেবল যে রাজত্ব জয় করেছিল তাই নয়, রাজ্যের আশেপাশে বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বতকেও তারা বিশ্বাস করেনি। কে জানে কোথা দিয়ে কখন বাঘের থাবা বেরিয়ে আসে। সেই কারণে নিস্পৃহ প্রতিবেশীর শক্তির পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য তারা তার গায়ে খোঁচা দিয়ে দেখতো, তার দৌড় কতদূর। নেপাল, তিব্বত, সিকিম, ভূটান, গাড়োয়াল, আফগানিস্তান,—সর্বত্র ওই একই কথা। সুবিধা ঘটলে রাজ্য কেড়ে নিত, আর নয়ত একপ্রকার অপমানজনক সন্ধিচুক্তি চাপিয়ে দিত তাদের ঘাড়ে।

ভূটানের দিকে যাচ্ছিলুম।—

সেই সিনচুলা চুক্তি, তারপর থেকে ভূটানের খবর আর তেমন পাওয়া যায়নি। পূর্বোত্তর ভারতের সীমানায় আঠারো হাজার বর্গমাইল ব্যাপী এই পার্বত্য ভূভাগ আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে—এটি কৌতুকের বিষয় বৈকি। চাকার গাড়ি আজও ভূটানের কোনও অঞ্চলের ঘুরছে না, এটিও বিস্ময়। ভারতের সঙ্গে এতকালের মধ্যে তার কোনও প্রকার যোগাযোগও নেই, এর জন্য উদ্বেগও কিছু দেখা যায় না। শোনা যায় মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র আজও সেখানে অব্যাহত। রাজা সেখানে সর্বাধিনায়ক। মন্ত্রী নেই, বিচারালয় নেই, রাজনীতিক দল নেই, শাসক সম্প্রদায় নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। শুধু আছেন রাজা, আছেন জনকয়েক প্রতিনিধি,—আর আছে প্রজাসাধারণ। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে ভূটানরাজ মহামান্য 'জিগ্‌মা ওয়ানচুক দোরজী' ভারত গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন জানিয়েছেন কয়েকটি বিষয়ে সাহায্যের জন্য। তাদের মধ্যে প্রধান হলো শিক্ষা, যোগাযোগপথ এবং ঔষধপত্রাদি। রাজা মহাশয় ভূটানে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করতে চান। এতকাল অবধি ভূটানের সঙ্গে তিব্বতের আত্মীয়তা চলে এসেছে অব্যাহত ভাবে। উভয়ে একধর্মী। উভয়েরই সমগোত্রীয়,—যেমন সিকিম। উভয়ের প্রাণের ভাষাব সঙ্গে উভয়ে পরিচিত। ফলে, তিব্বত এবং ভূটানের মধ্যে এতকাল ধরে যে একটি অন্তরঙ্গ

রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, এবং লোক-ব্যবহারিক সম্পর্ক চলে এসেছে, সেটি দুই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার দুইজনের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ, তার একজন হলেন দলাই লামা এবং অন্যজন হলেন ভূটানরাজ। ভাষায়, জীবনযাত্রায়, সমাজচিন্তায় ভারতের সঙ্গে ভূটান-তিব্বত-সিকিমের মিল হয়নি মধ্যযুগে, এর ওপর দুস্তর পার্বত্য ভূভাগ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। সেইজন্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ভারতের নিকট ওরা আজও একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গেছে। সিকিমের মতো তিব্বতের সঙ্গে ভূটানের সম্পর্ক হলো বৈবাহিক। আচার ব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-প্রকৃতি,—এদের একটু আধটু ব্যতিক্রম ছাড়া,—তিব্বত, ভূটান এবং সিকিম প্রায় একাকার। কিন্তু আধুনিক জগতের সঙ্গে সিকিম যতটুকু ভয়ে-ভয়ে মিশেছে, ভূটান তাও করেনি। ভূটান অনুসরণ করে এসেছে তিব্বতকে। রাস্তাঘাট কোথাও বানায়নি, পাছে বাইরের লোক গিয়ে ঢোকে। কারো সঙ্গে সে লেনদেনের চুক্তি করেনি, কারো সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়নি, পাছে সামাজিক মেলামেশা ঘটে এবং বাইরে থেকে ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি গিয়ে ভূটানে বাসা বাঁধে। রুচি, প্রকৃতি এবং বিদ্যাবুদ্ধির স্তর মেলে বলেই তিব্বতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ভারতবর্ষ থেকে অত্যুগ্র আলোকরশ্মিকণা যদি কখনও ঠিক্‌রে গিয়েছে ভূটানে, তবে রাজার চোখে ধাঁধা লেগেছে, তিনি সযত্নে সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কিন্তু সম্প্রতি ভূটানরাজ 'জিগমা দোরজি' মহাশয় তার প্রাসাদভবনের উত্তরমুখী বাতায়ন থেকে উত্তরের হাওয়ায় কেমন যেন বিষাক্ত গন্ধ পাচ্ছিলেন। হাওয়া উঠেছে চীন থেকে তিব্বতে এবং তিব্বতের 'সান-পো' উপত্যকা পেবিয়ে সেই হাওয়া আসছে ভূটানের উত্তুঙ্গ এবং ভয়ভীষণ বন্য পাহাড়ের আশে-পাশে। তিব্বত থেকে ছোট বড় নানা পাথুরে নদী নেমে আসছে ভূটানের শিরা-উপশিরায়, কিন্তু বর্তমান তিব্বতের নদীর জলকেও সম্ভবত ভূটানরাজ বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি জানি ওই সব নদীর জলেও হয়ত বা হিমালয়োত্তর রাজনীতির বিষাক্ত বীজাণু ভূটানের রক্তে প্রবেশ করতে পারে। একারণে মহামান্য ভূটানরাজ বরাবরই উৎকর্ণ ও সতর্ক জীবন যাপন করছিলেন। এবার সম্প্রতি একথা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল, তিব্বতের সঙ্গে তিনি তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করবেন কিনা।

কিন্তু সম্পর্কটা রয়ে গেছে তিনশো বছরেরও বেশী, এবং খুব সম্ভব এমন একটি যুগ থেকে যেটি মধ্যযুগীয় ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমন একটি কাল ছিল প্রাক্-পাঠান তথা বৌদ্ধ-হিন্দু আমলে,—বিশ্বাস করা যাক এক হাজার বছরেরও অনেক আগে—যখন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আঞ্চলিক সীমানা নিয়ে অতটা কেউ মাথা ঘামায়নি, এবং যে যুগে ভারত-গান্ধার-তিব্বত-নেপাল-সিকিম-ভূটান-ব্রহ্মাদি ছিল একটি অখণ্ড এবং অবিভক্তিবাদী রাজগোষ্ঠী—যারা আপন আপন রাজতন্ত্রকে একটি কেন্দ্রীয় চেতনায় মিলিয়েছিল,—সেটি হলো ভারত এবং বহির্ভারতীয় অধ্যাত্মধর্মের চেতনা। ঠিক জানা নেই, এই চেতনার যোগসূত্র বোধ হয় হারাতে থাকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ থেকে। ভূটানের ইতিহাসও এই সব কারণে অনেকটা ধূম্রাচ্ছন্ন। জানা যায় না বিশেষ কিছু। যেসব ভূটানী মাঝে মাঝে দল বেঁধে কলকাতায় পড়াশুনো করতে আসে, তাদের অধিকাংশই দেশছাড়া। নিজেদের দেশের ইতিহাস নিয়ে তাদের অত মাথাব্যথা নেই। তারা সিকিমে, পূর্ব নেপালে, দার্জিলিঙে ঔপনিবেশিক হিসাবে মানুষ হয়েছে, এবং ইংরেজ মিশনারীরা তাদেরকে বহু সময়ে খ্রীস্টানও করেছে, খরচও যুগিয়েছে। কলকাতায় মিশনারী স্কুল-কলেজগুলি ভূটানীদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

বিমানঘাটি থেকে আমাদের জীপ গাড়ি ছেড়েছিল উত্তরদিকের মধুর রৌদ্রপথে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি, মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক পাওয়া যাচ্ছিল। দক্ষিণ হিমালয়ের তরাইয়ের দিকে আমাদের পথ, এই পথ আলিপুর দুয়ারের উত্তরপ্রান্তে পার্বত্য অরণ্য এবং মানবচিহ্নহীন গিরিজটলাময় নদীর সীমানায় শেষ হয়েছে।

বাঁদিকে পশ্চিম দুয়ারের উত্তর প্রান্ত। ওখানকার পথ উঠে গিয়েছে দুই শাখায়। একটি সিকিমে, অন্যটি কালিম্পঙে। যদি শিলিগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায় তবে কালিম্পঙ-সিকিম একই পথ। পশ্চিম দুয়ারের ভিতর দিয়ে দুটি শাখাপথ অবশেষে মিলেছে একত্রে—যেখানে 'নাথুলা' গিরিসঙ্কট,—যেটি ভারত তথা সিকিম-তিব্বতের সংযোগস্থল, এবং 'চুম্বি' উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্ত। এটি অতি প্রাচীন ক্যারাভান পথ,—তিব্বতের ভিতর দিয়ে নানাশাখায় বহুদূর-দূরান্তরে চলে গেছে। 'ফারিজং' থেকে 'চমলহরির' বিশাল চূড়ার তলা দিয়ে, 'বাম'হ্রদ এবং 'কালা'হ্রদের মধ্যালোক ছাড়িয়ে 'গুরু' থেকে 'ত্রাংপো',—তারপর 'গিয়ানৎসি' থেকে 'নাগারৎসির' পূর্বপথে—যেখানে 'যামদ্রোকের' বিশাল জলাশয় নীলকাচের মতো স্থির হয়ে রয়েছে ষোলহাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে। সেই যামদ্রোকের পশ্চিম সীমানা বেয়ে ক্যারাভানপথ ব্রহ্মপুত্র তথা 'সানপো'-র দক্ষিণ তীরে পৌঁছেছে, তারপর নদী পার হয়ে 'কাইচু' নামক আরেকটি নদীর তীরে তীরে উত্তরে লাসানগরীর পথ। এই পথে বৃটিশ-ভারত গভর্নমেন্ট ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ডের নেতৃত্বে ১৯০৩-০৪ খ্রীস্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন, তারপর উভয়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্বরচনায় এসব কাহিনী আলোচনা করে এসেছি।

আমরা ডানদিকে হিমালয়ের পূর্ব দুয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। এ অঞ্চল ভূটানের ঠিক দক্ষিণে। উত্তর ভূটানের সংবাদ কেউ জানে না। কিন্তু সেই অঞ্চলের গিরিশৃঙ্গমালার ভিতর দিয়ে ভূটান থেকে নানা পার্বত্যপথ তিব্বতের মধ্যে চলে গেছে। এই পথগুলিই ভূটান-তিব্বতের যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। এইগুলি প্রধানত ভূটানী চাউল এবং তিব্বতী লবণের বাণিজ্যপথ। কিন্তু এই 'নুন-ভাতের সম্পর্ক ছাড়াও উভয়ের মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক আছে যেটি কিছু বিস্ময়জনক। কমবেশী তিনশো বছর আগে জনৈক প্রসিদ্ধ ভূটানী লাসা কৈলাসের পথে তীর্থযাত্রা করেন। ভূটান থেকে কৈলাস-মানসসরোবর অল্পবিস্তর এক হাজার মাইলের ব্যবধান বৈকি। সেদিনও চাকার গাড়ি ছিল না তিব্বতে, এবং আজও নেই। সেই লামা তাঁর তপস্যার স্থান খুঁজে পান কৈলাসচূড়ার নিকটবর্তী অঞ্চল 'তারচেন্' নামক পল্লীতে। তিনি ছিনে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এবং পারিপার্শ্বিক নানা অঞ্চলে তাঁর ক্রমশ প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। তিনি সেখানে কয়েকটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। কালক্রমে কৈলাস এবং মানস সরোবর অঞ্চলে ওই 'তারচেন্‌কে' কেন্দ্র করে অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ, গুম্ফা, পল্লী এবং গ্রাম, তথা পশ্চিম তিব্বতের কয়েকটি অঞ্চল ভূটানরাজের অধীনে আসে। ওই স্থানগুলিকে সম্মিলিতভাবে এখন 'ক্ষুদ্র ভূটান' বলা হয়। ভূটানরাজের একটি অট্টালিকা রয়েছে এখন 'তারচেনে', এবং জনৈক 'ভিক্ষু' ভূটানী শাসনকর্তা বর্তমানে 'ক্ষুদ্র-ভূটানের' সর্বপ্রকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পশ্চিম এবং পূর্ব দুয়ারে সীমানারেখার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে। সমতল প্রান্তর পথ। প্রান্তরের পূর্বদিকে রেলপথ চলেছে কোচবিহার থেকে 'রাজাভাতখাওয়ার' ওদিকে। পশ্চিমে মাদারিহাটের পথ। মাদারিহাট পশ্চিম দুয়ারের অন্তর্গত। মাদারিহাটের পূর্বপ্রান্তে নেমে এসেছে 'আমো-চু' নদী,—এ নদী নেমেছে 'চুম্বি' উপত্যকা থেকে।

পথ অনেক দূর। বোধ করছি তিরিশ মাইলের কাছাকাছি। দূরে দূরে একটি আধটি চাষীগ্রাম চোখে পড়ে। ধানকাটা হয়ে গেছে, শূন্য প্রান্তর পড়ে রয়েছে। ভালো লেগেছে এই জনশূন্যতা। মানুষ দেখছিনে বলেই আনন্দ। কেননা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চলে আমরা বাস করি। মানুষের ঢেউ এসে আমাদের উপব আছাড় খায় কথায়-কথায়; মানুষের বন্যা আমাদের সমাজ-জীবনের দুই তট ভেঙে দিচ্ছে প্রায় প্রতিদিন, পরিপ্লাবিত করতে বসেছে চারিপাশ। নিত্য দুই হাতে প্রাণপণে ঠেলে দিচ্ছি মানুষেব সেই ভীড়, জনতার সেই চাপ। মানুষের গন্ধে কণ্ঠরোধ হচ্ছে আমাদের, মানুষের ধাক্কায় আহত-প্রতিহত হচ্ছি, ছিটকে যাচ্ছি, হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। আমাদের ঘবদোর, আনাচ-কানাচ, নালা-নর্দমা-আঁস্তাকুড়, বন-বাগান-মাঠ-ঘাট-ক্ষেতখামার,—মানুষের চাপে সব ভবে গেল। তবঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে মানুষের, ধাক্কার পর ধাক্কা,—কোনওমতে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই আবার দিচ্ছে মানুষের ধাক্কা। বাঁচবার পথ নেই, পালাবাব স্থান নেই, নিশ্বাস নেবার বায়ু নেই,—মানুষের উৎকট দুর্গন্ধের দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আমবা অন্তিমশয়ান যক্ষ্মারোগীর মতো আনন্দোজ্জ্বল মুক্তির মুহূর্ত গুনছি। আমরা বাঙালী।

ভালো লাগছিল উদার শূন্য প্রান্তরের স্নিগ্ধ হাওয়া। গাড়ি ছুটে চলেছে। ক্রমে এসে পৌঁছলুম পথেব শেষ দিকে। এই অঞ্চলের কয়েক মাইল প্রচুর ধূলিময়। কিন্তু নতুন দেশের আকর্ষণ এমন যে, ধূলিমালিন্যের দিকে দৃষ্টি থাকে না। সেই ধূলিময় গ্রামের পথ পেরিয়ে একসময় মোটর এসে দাঁড়ালো কালজানি নদীর মৃন্ময় তটে। খেয়া নৌকায় আমাদেরকে গাড়িসমেত পার হতে হবে। রেলপথের একটি সাঁকো আছে, কিন্তু সেটি কিছু দূরে।

ছমছমে কেমন একটি আবছায়া নদীব এপারে ওপারে। জঙ্গল জটিলায় কোথাও কোথাও আচ্ছন্ন। ফলনের প্রাচুর্যে চারিদিক পবিপূর্ণ, কিন্তু খুব নিরিবিলি। নদীরা নেমেছে প্রথম পাহাড়ের জটাজটিলতা ছেড়ে সমতলে। সেজন্য শীতের দিনেও প্রবাহের প্রখরতা কম নয়। আলিপুর হলো তরাই অঞ্চল, এবং মৃৎপ্রধান। আলিপুর দুয়ারে এসে পৌঁছলুম।

নদী পার হয়ে বৃক্ষচ্ছায়াময় গ্রামের পথ। এটি শহরের সীমানা। চালাঘরের নীচে-নীচে দোকান, এপাশে-ওপাশে গৃহস্থপল্লী। পাকা ইমারত চোখে পড়ছে না কোথাও। করোগেটের চালা, কাঠের খুঁটি, ছেঁচাবাঁশের দেওয়াল,—কিন্তু দেখতে সুশ্রী। মাচানের উপর সবজি, অথবা একটু ফুলবাগান,—প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়িতেই দেখছি। জীবন বড় নিরিবিলি,—সভ্যতাব বিড়ম্বনা থেকে অনেকটাই যেন বিচ্ছিন্ন। আপন মনে একা থাকে আলীপুর—অবণ্য আর নদীকে কোলে নিয়ে; শিয়রে বসে রয়েছে অন্ধকার ভূটান,—বিরাট হিমালয়ের প্রাকারঘেরা।

বাবুপাড়ায় সুধীর বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়িতে আশ্রয় নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেল একে একে। এখানে একটি সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে এসেছি বটে, কিন্তু অরণ্য ও পর্বত অভিযানের কথায় আশে-পাশে সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। ভ্রমণ এবং অভিযানের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে কিছুকাল আগে অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি।

আলিপুর হলো জলপাইগুড়ির মহকুমা, এবং সমগ্র জলপাইগুড়ি, বিশেষ করে আলিপুর,—চেয়ে থাকে ভূটানের দিকে ভীত নয়নে। যেমন অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে এসে নরখাদক জন্তু আক্রমণ করে, তেমনি অতর্কিতভাবে উত্তুঙ্গ ভূটানের নদীরা ছুটে আসে আলিপুবের উপর,—তারপর সেই বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় যা কিছু সব। ভূটানের

পাহাড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলে আলিপুরের গৃহস্থদের হৃৎকম্প হয়। ঘরকন্না, মাঠ-ময়দান, গরু-মহিষ, ধান-চাল,—ভেসে যায় সেই বন্যার তাড়নায়। পাকাঘর কেউ বাঁধে না,—বাঁশ আর খুঁটির সাহায্যে মাচান তুলে তার ওপর সবাই নির্মাণ করে বেড়াবাঁধা ঘরদোর। বন্যার কালে গৃহস্থদের বাসস্থানের তলা দিয়ে কেবল যে জলস্রোত যায় তাই নয়, জন্তু-জানোয়ার এবং বড় বড় সরীসৃপও হাবুডুবু খেয়ে চলে যায়। অনেক গৃহস্থের অনেকবার ঘর ভেঙেছে, ঘরকন্না ভেসে গেছে, এ পাড়া থেকে ও-পাড়ায় লোক পালিয়েছে, লণ্ডভণ্ড হয়েছে গৃহস্থালী। সংসারযাত্রার এই অনিশ্চয়তার উত্তরে বসে রয়েছে ওই পার্বত্যরাজ্য,—সে নিস্পৃহ, তার চক্ষু নিমীলিত,—দক্ষিণের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দিকে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই।

ভূটানের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে সিকিম, উত্তরে তিব্বত। এই অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূটান কখনও এ কামনা করেনি, বাইরের লোকের সঙ্গে সে মিশবে। বাইরের আলো পড়েনি ভূটানে, বিদ্যুৎ নিয়ে যায়নি, কল-কারখানা বসায়নি, এক ফোঁটা এলোপ্যাথী ওষুধও খায়নি। বিজ্ঞান ওদের দরজায় কখনও মাথা গলায়নি, এজন্য দুঃখও পায়নি। কারণ, তিব্বতের মতোই, ওরা সভ্যতাকে সন্দেহ করে এসেছে চিরকাল। ভূত-প্রেত-পিশাচকে ওরা শ্বেতপতাকা তুলে পাহাড়ী রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে,—যেমন দেখেছি নেপাল আর সিকিমের পাহাড়ে-পাহাড়ে, যেমন কুলু আর উত্তর কুমায়ুনে, যেমন কিন্নরে-লাডাখে,—যদিও তাদের অনেকে সভ্যতার স্পর্শকে ভয় পায়নি। তারা গ্রহণ আর বর্জন দুই করেছে। কিন্তু ভূটানে ভিন্ন কথা। প্রশস্ত প্রবেশপথ এখানে কোথাও নেই। পথ আছে, কিন্তু সে-পথ হলো বন্য হস্তীর, সেই পথে পড়ে থাকে পাহাড়ী ময়াল শিকারেব অন্বেষণে, ভয়াল ভাল্লুক আর ক্ষুধার্ত চিতারা সেই পথে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। সেই পথে ভূটানে অভিযান কবেছে অনেকে, অনেকে পৌঁছয়নি, অনেকেই ফেরেনি।

এতকাল পরে মন ফিরেছে ভূটানের। ওদের চোখ পড়েছে নীচের দিকে—যেখানে ভারতবর্ষ। ওরা রাজি হয়েছে ছেলেদেরকে ভারতে পাঠাবে শিক্ষার জন্য এবং ভারতের সঙ্গে যোগরক্ষার ব্যাপারে ভারতকে দিয়েই দুই একটি রাজপথ বানিয়ে নেবে। কিছুকাল আগে ভূটানরাজ এসেছিলেন দিল্লীতে ভারতের আমন্ত্রণে,—হয়ত তাঁর মনের সন্দেহ কতকটা ঘুচেছে।

যতদূর দেখা যাচ্ছে 'নাগরাকাটা' থেকে ভূটানের মধ্যে কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়া যায়; এবং বিশেষ বাধাও দেয় না কেউ। কে যেন বলছিল, 'রাঙ্গামাটি' নামক একটি জনপদ ভূটানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রেখেছে। ওখানে এসে ওরা 'নুন' কিনে নিয়ে যায়, আর বোধ হয় অতি-আবশ্যকীয় কিছু কিছু সামগ্রী। দেওয়ানগিরি হলো ভূটানের দক্ষিণ-পূর্বের সীমান্ত শহর,—উপত্যকায় অবস্থিত। এতকাল ধরে এই ক্ষুদ্র শহর ছিল ভারতের এলাকায়,—মাত্র সাত বছর আগে এই দেওয়ানগিরির বত্রিশ বর্গমাইল এলাকা ভারত গভর্নমেন্ট ভূটানকে ফেরত দেন। ভূটান ভারতের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করবে না, এজন্য নেহরু গভর্নমেন্ট ওদেরকে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা করে দিচ্ছেন। ওরা এখন ওদের পররাষ্ট্রনীতি স্থির করবে ভারতের পরামর্শে,—এই হলো সর্ত। ওরা অস্ত্র আমদানি করবে ভারতের মাধ্যমে, এবং অস্ত্রাদি বাইরে চালান করতে পারবে না। ভূটান থাকবে ভারতের 'রক্ষা-ব্যবস্থাদির' মধ্যে,—ওর গায়ে কেউ না হাত দেয়। রাজনীতিক নিস্পৃহতা রক্ষার মূল্য পেয়েছে ভূটান।

কিন্তু দেওয়ানগিরি থেকে ভূটানের রাজধানী 'পুনাখা' অনেকদূর। এ গাড়োয়াল নয় যে, পথে-পথে তীর্থমন্দির; কুলু অথবা কাংড়া নয় যে, মানালি পর্যন্ত মোটরপথ গিয়েছে। নেপাল নয় যে, 'নামচে-বাজার' আর 'থিয়াংবোচে' পর্যন্ত যাত্রীদল পাওয়া যাবে,—এ হলো অন্ধকার জলা-পার্বত্য ভূমি। নীচের তলাকার উপত্যকায় জন্তু আর মানুষের নিত্য সংগ্রাম বেধে উঠছে কথায় কথায়। খাবার নিয়ে টানাটানি করছে বাঘে আর মানুষে। গাছ-পালা ক্ষেত-খামার আক্রমণ করছে হাতীর দল,—বিনা নোটিশে তারা হানা দিচ্ছে বস্তিতে-বস্তিতে। বর্শা, বল্লম, টাঙ্গি আর কুক্‌রি নিয়ে বন্য ভূটানী উন্মত্ত হয়ে খুনে বাঘের পিছনে ছুটছে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল বড় ভয়ঙ্কর।

তামুলপুর থেকে এগিয়ে দেওয়ানগিরি পৌঁছতে প্রায় ষাট মাইল পড়ে। মাঝপথে পাহাড়ী নদী পার হতে হয়। দেওয়ানগিরি থেকে 'তাসিগং' একশো মাইল উপত্যকা পথ,—তারপর উঠে গেছে দুস্তর হিমালয় ভূটানের উত্তরদিকে। ওদের শহরে-জনপদে, বস্তি-পল্লীতে গিয়ে পৌঁছলে সহসা বুঝতে পারা যায় না, ওরা বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু। ওদের একদিকে বাঙলা, অন্যদিকে অসম। আসামের একটা অংশ বৈষ্ণব, অন্যটা শাক্ত। ভূটান বৌদ্ধ, কিন্তু সে নিয়েছে বাঙলার শাক্তনীতি। চণ্ডী, কালী, তারা,—এরা ওদের পূজ্য। পশুবলি ওদের ধর্মাঙ্গ। সকল পাহাড়ীজাতির মতো ওরা সাধারণত খর্বকায় এবং বলিষ্ঠ। ওদের প্রকৃতিগত সরলতা হিংস্রতায় রূপান্তরিত হতে বিলম্ব ঘটে না।

তাসিগং থেকে পশ্চিম উপত্যকাপথে বহু নদ-নদী ও দুর্গম পথ পেরিয়ে প্রায় তিনশো মাইল অতিক্রম করলে 'কৃষ্ণগিরির' দক্ষিণে এসে পৌঁছনো যায়। কিন্তু এই পথে নানাবিধ জানোয়ারের এবং হিংস্র কুকুরের অবাধ রাজত্ব। মাঝপথে 'খাঙ্কার' ও 'মিলি' গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে আসতে হয়। খাঙ্কারে এসে মিলিত হয়েছে দুটি বৃহৎ নদী,—দুটি নদীর মূল উৎস হলো তিব্বতে। সিন্ধুনদ যেমন দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, 'অরুণ' নদ যেমন গৌরীশৃঙ্গ থেকে সোজা কুড়ি হাজার ফুট নেমে পৃথিবীর গভীরতম খদ সৃষ্টি করেছে, অথবা—মনে পড়ে গেল বন্য শতদ্রুকে,—সে যেমন মানসসরোবর থেকে বেরিয়ে সমগ্র পাঞ্জাব আর বাহ্বলপুরকে কেটে অবশেষে গিয়ে মিলেছে সিন্ধুনদে, তেমনি এই দুটি নদী। এরা এত দীর্ঘ নয়, কিন্তু দুঃসাহসিকা। এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে তিব্বতী ব্রহ্মপুত্রের—যার তিব্বতী নাম হলো সাংপো। এরা কোথাও কোথাও বিশহাজার ফুট উঁচু পাহাড় দ্বিখণ্ডিত করেছে, পেরিয়ে এসেছে দুর্গম দুস্তর গিরিমালা,—তারপর এসেছে দক্ষিণ ভূটানের তাসিগঙ উপত্যকায়। সেখান থেকে সাজগোছ খুলে নিজের নাম নিয়েছে, 'ডাঙমে'। ওদিকে আবার কৃষ্ণপর্বতের গা ঘেঁষে ছুটে এসেছে 'টঙসা' উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই দুই নদীর সঙ্গমক্ষেত্র থেকে নতুন নামে একটি বিস্তৃত ধারার জন্ম হলো—তার নাম মানস। প্রতি বর্ষায় এই মানসের প্রবল বন্যাস্রোতে আসামের গোয়ালপাড়ায় এসে নানা ধারায় ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়।

আমরা নদী প্রান্তর আর অরণ্যলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি দিন তিনেক। দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার ভূটান। তার মধ্যে প্রবেশপথ পাইনে। মাঝে মাঝে বন্যায় ভেসে ছুটে নেমে আসে ওখান থেকে গ্রাম, গাছ-পালা-পাথর গড়িয়ে আসে বজ্ররবে, পাহাড়ের চাংড়া ভেঙে এসে ছারখার করে বিপ্লব বাধিয়ে দেয়, জলের স্রোতের মধ্যে মানুষে-জানোয়ারে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম বেধে ওঠে। কিন্তু ছায়াবৃত ভূটান। জানবার জো নেই,

ওখানে মানুষের সংখ্যা কত, বোঝবার জো নেই ওদের সংসারযাত্রার সত্য পরিচয়। অরণ্যে, তুষারে, জানোয়ারে, আকাশস্পর্শী পর্বতচূড়ায়,—ওরা চিরদিন রয়ে গেল অজানা রহস্যের ছায়ার পাশে। শত শত বর্ণের পতঙ্গ-প্রজাপতির দল ওরা নীচের দিকে পাঠিয়ে দিল, ওরা ছড়িয়ে রাখলো হাজার হাজার বর্ণের বন্যলতা, অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ ওরা লুকিয়ে রাখলো গুহায়-গহ্বরে, পাথরে-কন্দরে এবং ওবা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি টুকরোকে বেঁধে রেখে দিল ওদের অরণ্যে আর পর্বতে। বিদ্যুতের আলো ওরা জ্বাললো না, পাছে তার অত্যুগ্রতায় আরণ্যক ভূটান আপন স্বরূপকে দেখতে পায়! ওরা চাকার গাড়ি নিয়ে গেল না স্বদেশে, পাছে স্বজাতি তার জীবনে দ্রুতগতি লাভ করে। ভারতের যুগ-যুগান্তের উত্থান-পতন, প্রতি শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিপ্লবঝঞ্ঝা, সভ্যতা ও শিক্ষা,—এরা নীচের তলায় পড়ে রইলো,—ভ্রূক্ষেপ নেই ভূটানের। রাজার ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে রাজনীতি নেই, তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কারা যেন এর মধ্যে কবে 'ভূটান-কন্গ্রেস' অত সহজে রাজাকে ছাড়েনি। তারা শস্যের অংশ দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে আর প্রস্তুত নয়, নগদ টাকায় তারা রাজস্ব দিতে চায়। তারা বলছে, মন্ত্রিসভা যদি না করো, তবে প্রতিনিধিসভা বানাও,—তুমি থাকো অভিভাবক হয়ে,—মেনে নিচ্ছে তোমাকে। তারা বলছে, রাত্রির অন্ধকার নামলে কেউ আপত্তি জানায় না, কিন্তু চারিদিকে যখন আলো জ্বেলে উঠছে, তখন আমাদের ঘরের অন্ধকার আমরা বরদাস্ত করবো না। আলো চাই, পথঘাট চাই, ঔষধপত্র চাই, শিক্ষাসভ্যতা চাই। ভূটানের 'হা' নামক অঞ্চলে এই নিয়ে হাহাকাব ওঠে।

মহারাজা অত সহজে এসব কথায় কান দিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি একটি কারণ ঘটেছে। বছর দেড়েক আগে তিব্বতে ভূটানী চাউল রপ্তানীর বাণিজ্যযোগ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তেমনি তিব্বত থেকে ভূটানে লবণ এসেও আর পৌঁছয় না। এই লবণ-দুর্ভিক্ষই মহারাজাকে সচেতন করে তুলেছে। খাদ্যজগতে সর্বাপেক্ষা 'মিষ্ট' সামগ্রী হলো লবণ। চিনি অথবা গুড় যত মিষ্টই হোক, লবণ তার চেয়েও 'মিষ্ট'। কেননা লবণ ভিন্ন মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অচল। অতএব লবণভিক্ষার জন্য মহারাজা ভারতের দরজায় নেমে হাত পাতেন। কিন্তু পথঘাট না থাকার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট প্লেন থেকে লবণের বস্তা ভূটানে ফেলতে বাধ্য হন।

মোট নয়জন প্রশাসক আছেন ভূটানে—তাঁদের নাম পেন্‌লপ। তাঁরা মহারাজার অধীনে এক একটি অঞ্চলের অধিনায়ক—যেমন এককালে ভারত-সম্রাটের অধীনে থাকতেন 'ভাইসরয়'। এই নয়জন পেন্‌লপ ও তাঁদের কর্মসচিব—যাঁরা অধিকাংশই রাজপরিবারভুক্ত এবং মহারাজার অনুগত,—এঁদের সাহায্যেই মহারাজা তাঁর আঠারো হাজার বর্গমাইলব্যাপী পার্বত্য ভূভাগের শাসনকার্য চালান।

এখানেও ভূটান-কন্গ্রেস মহারাজাকে চেপে ধরেছে। কায়েমী স্বার্থের ব্যবস্থা বদলাতেই হবে। আইন-কানুন রাজার ইচ্ছানুবর্তী হলে চলবে না, 'লিখিত' আইন চাই। আইন-আদালত চাই, বিচারশালা ও বিচারপতি চাই। শাসন ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী না হয় নাই রইলো, কিন্তু মন্ত্রি পরিষদ না হলে চলবে না। রেখে দাও তোমার ওই তাঁবেদার 'পেন্‌লপ', স্বেচ্ছাতন্ত্রকে আর আমরা স্বীকার করিনে। এবার চাই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, চাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

ভূটান-কন্গ্রেসের অনেকগুলো দাবি মহারাজা স্বীকার করেছেন, এবং শীঘ্রই ভূটানের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার কথা চলছে। এবার তিব্বতকে ছেড়ে

মহারাজা ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত হয়েছেন। জনসাধারণ প্রথম মাথা তুলছে ভূটানে।

উত্তর ভূটান পর্বতমালায় বেষ্টিত,—যেমন দুরারোহ, তেমন জনশূন্যপ্রায়। পশ্চিম ভূটানের চেহারা প্রায় একই প্রকার। দুঃসাধ্য পাহাড়, নদী এবং অতলগহ্বর খদের দ্বারা সিকিমের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক ব্যবধান। উত্তর সিকিমের উত্তুঙ্গ পার্ডহুনরী পর্বতের থেকে নেমে এসেছে 'আমোচু' নদী সোজা দক্ষিণে সিকিম পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভূটানের মধ্যে। এই নদীর ধারাপথে সিকিমে আর ভূটানে দুই ভূভাগ একত্রে জড়িত। দুয়ের মধ্যে সীমানানির্দেশ কিছু নেই,—আছে শুধু পর্বতের পর পর্বত, এবং পাঁচ থেকে আট হাজার ফুট উচ্চ মালভূমি। আমোচু নদী দক্ষিণ পথে মাদারিহাট হয়ে কালজানির দিকে চলে গেছে। অপর দুটি প্রধান নদী হলো বায়ডাক এবং মোচু। ঠিক মনে পড়ছে না 'রায়ডাক' নদীর ভিন্ন নাম 'কালচিনি' কিনা। এই রায়ডাক নদী নেমে এসেছে জয়ন্তী অরণ্যের উত্তর প্রান্তে—সে অঞ্চলের নাম হয়েছে 'ভূটানঘাট'।

চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম ওই ভূটানঘাটে রায়ডাক নদীর তটে। ওপারে ভূটান পাহাড়, নীচে নদীর নীল ধারা বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গেছে অনেক দূর। সেই কোথায় যেন গুহালোকে পাওয়া যায় 'ফাঁসখাওয়া মহাকাল',—সেখানে আছে আশ্রম,—পথ গিয়েছে কালচিনি নদীর উপর দিয়ে। বাঁশের পুল বেঁধে তবে সেই অন্ধ গুহাশ্রমে প্রবেশ করা যায়। আছে তার আশ-পাশে আরণ্যক ভূটানী বস্তি। আর ওই দেখে নিয়ে গেলুম কালচিনির পুলের ওপারে ভূটানের অরণ্য, দিনের বেলাতেও ভয়ের বাসা,—ও অঞ্চলে নাকি রাজবোড়ারা হাতীর শুঁড় জড়িয়ে ধরে ফণা বিস্তার করে।

সামনে বন্য নদী পাথরে-পাথরে আকীর্ণ, ঘন বিশাল অরণ্য চতুর্দিকে। দিনমানেও এই নদীতটে একা আসতে অনেকে সাহস পায় না। চারিদিক রুদ্ধশ্বাস, গভীর নিস্তব্ধ। একটু আগে হাতি গেছে এই পথে, 'নাদ' ফেলে গেছে,—তার থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। নদীর ওপারে ভূটান পাহাড়ে উঠে গেছে হাতির পথ। পাহাড় থেকে ওরা যখন-তখন লুট করতে আসে শস্যভাণ্ডার। দরকার হলে ওরা গ্রাম লুট করে, বন-বাগানকে তচনচ করে, এবং বাধা দিতে গেলে মানুষকে পদদলিত করে চলে যায়।

পলাশবাড়ি থেকে শামুকতলার পুল, আর বাবুপাড়া থেকে 'মাঝেরদাবড়ি'—এদের মধ্যে ঘুরছিলুম। আছে মহকুমার আদালত আর আপিসপাড়া, আছে এখানে-ওখানে পল্লী আর লোকযাত্রা,—কিন্তু শহর-নগর একে বলে না,—সব মিলিয়ে এ যেন কতকটা আধুনিক গ্রাম। কিন্তু গ্রামের বাইরে সন্ধ্যার পর থেকে সংশয়াচ্ছন্ন। নরখাদক বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে দেখা যায়। কেননা বাঘ আসে কথায় কথায়। চারিদিকে নদী আর অরণ্য, পাহাড় আর জলাভূমি,—মাঝখানে ছোট্ট আলিপুর দুয়ার। কিছুদূর এগিয়ে গেলে দমনপুর, তারপর তরাইয়ের অরণ্যলোক আরম্ভ। হিমালয় প্রায় সর্বত্র তার উদার মহিমাকে প্রথম প্রকাশ করে ধ্যানগম্ভীর অরণ্যসম্পদে। দমনপুর থেকে চললো পথ 'বক্সাদুয়ারে'র দিকে, আর বাঁ দিকে উত্তর-পশ্চিমে রেলপথ এবং বনপথ চলে গেল রাজাভাতখাওয়ার ওদিকে! রাজাভাতখাওয়া! থমকে গেলুম বটে। ঠিক মনে পড়ছে না গল্পটা। সমগ্র আলিপুর দুয়ার ছিল নাকি একদা ভূটানের অধীনে। একদিন এলেন এখানে কোচবিহারের মহরাজা ব্যাঘ্রশিকারের অভিযানে। বোধ করি তাঁর এই প্রবেশ ছিল

বে-আইনী। অন্য ভাষ্য হলো এই, আলিপুর দুয়ারের উপর উভয়পক্ষেরই নাকি দাবি ছিল। সে যাই হোক, ভূটান রুখে দাঁড়ালো কোচবিহারের বিপক্ষে। সন্দেহ নেই, রাজরক্ত আর রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর,—এবং এর চেহারা দেখে বেড়িয়েছি রাজস্থানে। ফলে, যুদ্ধ বেধে উঠলো, এবং যথাকালে সন্ধিও হলো। আলিপুর দুয়ার এলো কোচবিহারের অধীনে। বোঝাপড়াটা নাকি উভয়পক্ষেরই আনন্দের কারণ হয়েছিল। কিন্তু এই আনন্দকে স্মরণীয় করে রাখা দরকার। সুতরাং ভূটান আর কোচবিহার স্থির করলেন, ভোজনের আসর বসিয়ে এই বন্ধুত্বকে পাকা করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। দুজনে একাসনে বসে অন্নগ্রহণ করলেন যেখানে, সেই অঞ্চলের নাম রাখা হলো, 'রাজাভাতখাওয়া!' এই নামেই স্থানীয় রেলস্টেশনটি পরিচিত রয়েছে।

অরণ্যসমাকীর্ণ পথে আমাদের মোটর দ্রুত চলেছে অনেকদূর। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল চল্লিশেক পথ। সঙ্গে আছেন শ্রীযুক্ত দে-সরকার,—আলিপুর দুয়ারের সর্বপরিচিত মাস্টার মশাই। প্রবীণ বয়সে তাঁর পর্বতারোহণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক তরুণকে হার মানায়। তিনি পাহাড় আর নদী আর দুর্গমের গল্পে মেতে উঠেছিলেন। 'সঙ্কোশ'নদীর উপত্যকাপথ ধরে অরণ্য জলাভূমি আর পাহাড়তলী পেরিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে দুঃসাহসীর পথ। বনময় জলাময় ভূভাগ; দুই ধারে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গদল,—হাতির দল নেমে আসে শীতকালে, বাইসন তাড়া করে ভূটানীকে, হরিণ আর বনশূকরের পাল এধার থেকে ওধারে ছুটে যায়, বন্য কুকুর খরগোশকে খুঁজে বার করে, হায়না এগিয়ে এসে জন্তুর কঙ্কাল শুঁকে চলে যায়,—ওদেরই ভিতর দিয়ে অভিযান-পথ 'চীরঙ' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। 'চীরঙ' হলো ভূটানী জনপদ,—সেখানকার মানুষ দারিদ্র্যে আর ক্ষয়রোগে শুকিয়ে মরে,—জল আর জন্তুর সঙ্গে লড়াই চলে তাদের অহরহ। 'চীরঙ' থেকে 'সঙ্কোশ' নদীর নাম হয়েছে মো-চু,—যেমন ব্রহ্মপুত্রের নাম 'সান্‌পো'। এই 'মো-চুর' পূর্বদিকে গগনচুম্বী কৃষ্ণপর্বতের অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হয়েছে দূরদূরান্তরে। এই নদীব তীরে-তীরে পথ চলে গেছে 'ওয়াংদু' জনপদ পেরিয়ে সোজা উত্তরে 'পুনাখা' শহরে। নামটি পুণাখা অথবা 'পুণ্যাক্ষ'—ঠিক জানিনে। মন্দির, গুম্ফা, বাজার, রাজভবন—সবই আছে। দারুময় মঙ্গোলীয় স্থাপত্যেরও অভাব নেই। পুণাখা থেকে একটি অশ্বপথ ফারোজঙ হয়ে চলে গেছে কালিম্পঙের দিকে। ভারতের সঙ্গে ভূটানের এটি অন্যতম সুদূরবর্তী যোগসূত্র।

গহন ভীষণ অরণ্যানীর শোভা দেখে চলেছি। দুই ধারে কেমন যেন অপ্রাকৃত অনৈসর্গিকের ইন্দ্রজাল বিস্তারিত। অরণ্যের নীচে দিয়ে এখানে ওখানে রহস্যপথ চলে গেছে। ওদের প্রত্যেকটি যেন সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্নের মতো। শীতের দিনে বিশাল শালপ্রাংশু আর সেগুনের পাতা ঝরেছে অনেক। ক্বচিৎ এক-আধজন আরণ্যক কাঠুরিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ছায়াচ্ছন্ন পথে হঠাৎ বেরিয়ে আসে কৃষ্ণকায় মাটির সন্তান,—চেহারায় জংলী, অর্ধনগ্ন,—হাতে একটা হাতিয়ার। তার পিছনে আরও এক-আধজন। ওরা এ অঞ্চলে একা চলে না। মনে পড়ে যাচ্ছে শুক্‌নো আর আমলেক্‌গঞ্জের অরণ্য, মনে পড়ছে দেওদার পর্বতের নীচে দ্রোণভূমি, সোমনাথের পথে গিরনারের সিংহ-বন। দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম বক্সাপাহাড়ের নীচে 'সাঁতরাবাড়ির' পুলিশ ফাঁড়িতে।

আশে-পাশে দুচার ঘর বস্তি নিয়ে ছোট্ট একটি পল্লী। শুনলুম গতকাল এখানে বাঘ এসে একটি নরহত্যা করে গেছে। লাস পাওয়া যায়নি, ফসলের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে

তাকে নিয়ে বাঘ পালিয়েছে। এ অঞ্চলে এসব গা-সওয়া। জনৈক সশস্ত্র পাহাবাদার আমাদের বলে দিল, পাহাড় এখানে নিরাপদ নয়। আপনারা পাহাড়ে যাচ্ছেন বটে, তবে বেলা চারটের মধ্যে ফিরবার চেষ্টা করবেন।

তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমরা অগ্রসব হলুম। পায়ে পায়ে আমাদের উৎসাহ, মনে-মনে উদ্দীপনা। এ অঞ্চল এই সেই দিন অবধি ছিল ভূটানে,—প্রায় বছর তিরিশেক আগে ইংরেজরাজ এই অঞ্চলের মাইল পাঁচেক পাহাড়ী অঞ্চল জুড়ে একটি দুর্ভেদ্য কারাগার তৈরী করে। এই কারাগারের নাম দেয় 'বক্সাদুর্গ'। চতুর্দিকে হিমালয়ের চূড়া, একদিকে শুধু দেখা যায় দূর-দূরান্তর। এই পথে রয়েছে বিপ্লবী বাংলার রক্তের ইতিহাস এখানে-ওখানে ছরিয়ে। স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয়, এবং বরণীয়,—এইখানেই বসে বসে তারা নৈরাশ্যের দিন গুনেছে। প্রেন্‌টিস, পোর্টার, জ্যাকসন, এন্ডারসন, হার্বাড, লিটন, রেডিং, উইলিংডং, লিনলিথগো ইত্যাদি—এদের অমানুষিক আচরণ আজও এই পাহাড়ে রক্তের অক্ষরে লেখা। ঠিক মনে নেই, বোধহয় লর্ড বেডিং-এর আমলে এই কুখ্যাত বন্দীশালা খোলা হয় এবং তাঁরই আদেশক্রমে বাঙলার শত শত শ্রেষ্ঠ কর্মবীরকে গোপনে এখানে এনে রাখা হয়। লোকলোচনের অন্তরালে মধ্যরাত্রে অথবা অরণ্যের ছায়াপথ ধরে বন্ধ গাড়ির মধ্যে বন্দী অবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এবং লাঞ্ছনায় আর প্রহারে জর্জরিত করে এই পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে তাদেরকে বাধ্য করা হত। না জানত দেশবাসী, না জানত বন্দীরা নিজে,—এই অঞ্চলের নাম ও পরিচয়। বহুদিন অবধি ইংরেজ এই সংবাদ জনসাধারণের কানে তুলতে দেয়নি এবং তাদের যথেচ্ছ বর্বরতা যখন বরদাস্ত করতে না পেরে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই বন্দীরা মাথা তুলতে বাধ্য হয়,—তখন, যতদূর মনে পড়ে ওদের পিছনে সশস্ত্র গুর্খাকে লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ফলে কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ বাঙালী যে নেয়নি তা নয়, কিন্তু তার পরিমাণ বড় অল্প। অকল্যাণ, অন্যায় এবং অনাচারকে সংহার করার জন্য আমাদের দেশে গীতাধর্ম প্রচলিত। অসুরকে নিধন করার জন্য হাত যদি না কাঁপে, দয়া-মায়া-কৃপা-মোহ যদি অন্তরকে আচ্ছন্ন না করে, ফলাফল সম্পর্কে হৃদয় যদি নিরাসক্ত ও নিস্পৃয় থাকে,—তবে সার্থক সেই অসুরসংহার! বাঙালীর অনেক বীর সন্তান সেদিন অনেক ক্ষেত্রে এই গীতাভাষ্যকে জীবনের ব্রত করে তুলেছিল। রোগে উপবাসে প্রহারে উৎপীড়নে আশাভঙ্গে সেদিন বক্সাদুর্গের নির্জন প্রকোষ্ঠে অনেকের অপমৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তাদেরই পুণ্য রক্তে কলম ডুবিয়ে লেখা হয়েছিল আজকের স্বাধীনতার কাহিনী!

আন্দাজ করতে পারি তিন মাইলের বেশী চলার পথ। প্রথম দিকের মাইলখানেক পথ কতকটা দুস্তর পাকদণ্ডি,—অনেকটা দম লাগে। একটি মস্ত ঝরনা নেমে এসেছে মাঝপথে,—পাহাড় ঘনময় এবং জনচিহ্নহীন। বুঝতে পারা যায় এখান থেকে কোথাও পালাবার পথ ছিল না সেদিন। সমতলে কোনও কোলাহল এখানে পৌঁছায় না, সভ্যজগত থেকে অনেক দূর হলো এই পাহাড়ের সীমানা। দেশ ও জাতির সংস্পর্শ থেকে বিপ্লবীবাদী-দলকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অজ্ঞানালোকে নির্বাসিত করে রাখার মত এমন আদর্শ জায়গা আর কোথাও নেই।

প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে গেল বক্সা ডাকঘরে এসে পৌঁছতে। ছায়াচ্ছন্ন পার্বত্যভূমি; দূর পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অতি দরিদ্র কয়েকঘর ভূটানীর বাস। একটি বাঙালী পোস্টমাস্টার আছেন ডাকঘরে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাঁর পরিবার জর্জরিত। নির্জন বনতল ছমছম করছে

চারিদিকে। ভূটান পাহাড় অবরোধ করে রয়েছে এই ক্ষুদ্র বস্তি অঞ্চলটি। আমরা চড়াই পথে আবও অনেকটা উঠে চললুম। শ্রমিক মেয়ে-পুরুষ চলেছে কাঠ বোঝাই নিয়ে। কান পেতে শুনলে বুঝতে পারা যায়, বাঙলা আর হিন্দীর অপভ্রংশ তাদের ভাষা। শুনতে পাওয়া গেল এখানে নানাবিধ দূরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ,—পেটের পীড়া অত্যাধিক। খাদ্যসামগ্রী আনতে হয় বহুদূর নীচের থেকে।

দুর্গের সীমায় এসে উঠলুম। সারিবদ্ধ একতলা অনেকগুলি ঘর দেখা যাচ্ছে একটি মালভূমিতে। আজও তেমনি রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, তেমনি সুরক্ষিত প্রবেশপথ, তেমনি নানাবিধ বাসব্যবস্থা। মাঝখানে দু'তিনটি কাঠের গম্বুজ, ওখানে সদাসতর্ক পাহারা থাকত। আমরা ভিতরে যাওয়ার আগে কিছুদূর এগিয়ে ফরেস্ট অফিসারদের বাংলোয় এসে উঠলুম। এঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী। এঁদেরই একজনের নিকট আমাদের জন্য পূর্বব্যবস্থামতো ভূরিভোজনের আয়োজন ছিল। পথের বাঁক ঘুরলে প্রথমেই নজরে পড়ে একটি মস্ত বারান্দাওয়ালা খয়েরি রঙের সরকারী ভবন। বুঝতে পারা যায় সরকারী তদন্তকালে ওটাই ছিল বড় কর্মচারীদের বাসস্থান। এখন সমস্তই জনশূন্য। ও অঞ্চলে বন্দীশালা, এ অঞ্চলে লাইব্রেরী, স্কুল, কর্মচারীদের কোয়ার্টার, খেলাধূলার জায়গা,—এবং যেখানে যেটুকু অত্যাবশ্যকীয় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন। একটি সরু পথ মাঝখান দিয়ে ভূটানের বিশাল পাহাড়ে উঠে গেছে।

এপারে এসে প্রবেশ করলুম বন্দীশালায়। মাঝখানে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কাঁটাতারের বেড়া চতুর্দিকে, বাধার পর বাধা। কোনও দিন কল্পনা করিনি, এখানে পৌঁছতে পারবো। বক্সা মানে ছিল ভয়, বিভীষিকা, দেশপ্রেম, বিপ্লব, উৎপীড়ন, নির্বাসন,—মনের বিচিত্র চেহারা ছিল এই পাহাড়টিকে ঘিরে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম সর্বত্র। নির্জন স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠ কাকে বলে, তার ভিতরে ঢুকে লৌহকপাট বন্ধ করে দেখলুম। আজ সে-মন নেই, সে-বেদনাবোধ নেই, সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ছায়ারা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে ধকধক করে জ্বলে না সেদিনের সেই আগুন আর ঘৃণা—রাত্রির পর রাত্রি দাঁতের উপরে দাঁত ঘষা, একটি ইংরেজকে গুলিবিদ্ধ করে মারলে সেই সংবাদ শুনে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো, অন্তরে অন্তরে সেদিনের বীর-পূজা,—প্রাণের সেই উত্তাপ জাতির মন থেকে আজ জুড়িয়ে গেছে।

ঘুরে বেড়ালুম আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ। বোধহয় কিছু খুঁজছিলুম। শুকনো রক্তের একটি ফোঁটা, হৃৎপিণ্ডের এতটুকু অবশেষ, জরো-জরো যন্ত্রণার এক ঝলক আর্তকণ্ঠ, দধীচিদলের এক টুকরো বজ্রাস্থি, কোনও কাতর নয়নের শেষ চাহনি! কিন্তু কিছু নেই,—ইতিহাসের নতুন পরিচ্ছদের পৃষ্ঠায় আজ এসে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীন ভারতে আজ সেই তারা গল্পের মতো। সমগ্র পাহাড়শীর্ষের মালভূমিটি আজ বড় বড় অজগর সাপ এবং সরীসৃপের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

জীবহিংসা মহাপাপ একথা জানি বৈকি। ভালোবাসার দ্বারা পৃথিবীবিজয়ের ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা সবাই জানে। ইংরেজের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ আজকে আর কোনওমতেই খুঁজে পাওয়া যায় না,—তারা চলে গেছে ইংরেজের সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু অপমানে উৎপীড়নে অরাজকতায় সেদিনের শাসকসম্প্রদায় বাঙালীর মনোজগতে যে দারুণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, ইংরেজের সেই হিংস্রতাকে হিংসার দ্বারাই বাঙালী যোগ্য মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছে। লোহাকে কাটতে গিয়ে লোহার অস্ত্র ছাড়া উপায় ছিল না।

এবার পঁচিশ বছর আগের ইতিহাসে ক্ষণকালের জন্য ফিরে যেতে চাই।

ইংরেজ শাসকগণের প্রচণ্ড নিগ্রহের কালে বাঙালীজাতি সেই সময় আপন স্বভাবধর্ম অনুযায়ী একটি আত্মিক আনন্দের অবারিত মুক্তির পথ খুঁজে ফিরছিল। রাজনীতিক জীবনে যে-অবরুদ্ধ গ্লানি, নৈরাশ্য এবং অবমাননা তাকে শাসকগণের বিরুদ্ধে তিক্তমতি করে তুলেছিল, সেই রাহুচ্ছায়াকে অপসারিত করার জন্য বাঙালী চেয়েছিল একটি যুগজয়ী সাংস্কৃতিক ও চিৎপ্রাকর্ষিক অভিব্যক্তি—যেটি সর্বব্যাপী আনন্দ ও মুক্তিবোধের সাড়া তুলতে পারে। তৎকালে এই আনন্দ, আশ্বাস ও মুক্তির একটি প্রতীক ছিলেন জাতির সর্বোত্তম ভাবনায়ক ও অভিভাবক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তখন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। সেটি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি থেকে মুক্ত হলেও অন্তরে-অন্তবে রাজনীতিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সে যাই হোক, এই আনন্দের হাটে এসে দাঁড়াল সবাই,—সকল দল, সকল মত, সকল পথ, এবং দেশের সকল মনীষী ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। তাঁরা একটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সংস্থা গঠন করলেন, এবং তার অন্যতম কর্মসচিবস্বরূপ মনোনীত করলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়কে। হোম মহাশয়ের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্দীপনা এবং সংগঠনশক্তি সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে উৎসাহ সঞ্চার করতে সেদিন সমর্থ হয়, সেটি কেবল যে স্মরণীয় তাই নয়, সেটি ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। ফলে, দেশব্যাপী রবীন্দ্রঅনুরাগীগণের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতায় 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্যাবধি কোনও কবি তাঁর জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন জাতিবর্ণনির্বিশেষে এইপ্রকাব বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেননি। মহাকবির তখন সত্তর বৎসর বয়েস। বস্তুত, সেদিন পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ ও সর্ববরেণ্য মনীষীগণও এই উপলক্ষে ভারতকবিব উদ্দেশ্যে তাঁদেব শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। তাঁদের সকলের বাণী বহন কবে একখানি 'সুবর্ণগ্রন্থ' স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শতসহস্র—স্বদেশী ও বিদেশী—সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিবেদন করেছিল মহাকবির পদপ্রান্তে। বাঙলার ঘোরতর দুর্দিনে সেদিন 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠান কেমন যেন স্বস্তি ও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ দিয়েছিল। এই সময় বক্সাদুর্গে রাজবন্দীরাও চুপ করে থাকতে পারেননি। তাঁরা কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের দাবি ও উপরোধ জানালেন, মহাকবিকে তাঁরাও অভিনন্দন জানাতে চান। কাবণ মহাকবির অমোঘ স্বদেশীমন্ত্রে তাঁদের জীবন দীক্ষিত। কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। সুদূর ভূটানের হিমালয়ের চূড়া থেকে একদল পিঞ্জরাবদ্ধ রক্তাক্ত পাখির আর্তকণ্ঠ ও অভিনন্দনের ভাষা এসে পৌঁছালো মহাকবির চরণোপান্তে! সেই আর্তকণ্ঠের ডাকে সেদিন মহাকবির হৃৎপিণ্ডে লেগেছিল দোলা। অপমানিত এবং যন্ত্রণাদগ্ধ মানবাত্মার বেদনায় তাঁর দুই চক্ষে নেমে এল অশ্রু। তিনিও তখন ছিলেন হিমালয়ের আর এক চূড়ায়,—দার্জিলিংয়ে। হিমালয়ের সেই শীর্ষস্থলে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মহাকবির বজ্রকণ্ঠ যে অভয়বাণী সেদিন উচ্চারণ করেছিল, সেই বাণীবাহিনী কবিতাটি সমগ্র বাঙলা ও ভারতের দিকবিদিক প্লাবিত করে ছুটে গেল পৃথিবীর মর্মলোকে। বাঙালীর আর্তপ্রাণ সেদিন তাঁর ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল :

প্রত্যভিনন্দন

বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাকাল রুদ্রাসীন
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী॥

"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনাল বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দার্জিলিং

১২ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮

সেদিনের শাসক ইংরেজরা কাব্যরসিক অথবা সাহিত্য-বিচারক ছিল না। সেইজন্য এই কবিতাটি বারম্বার গোপনে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়েও তারা এর প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু প্রত্যেক বাঙালী সেদিন এই কবিতার প্রত্যেকটি শব্দের রাজনীতিক মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিল। তামসপ্রকৃতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অমৃতের সন্তান বিপ্লববাদীগণের উদ্দেশ্যে মহাকবি তাঁর এই কালোত্তীর্ণ কবিতায় আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন!—যাই হোক, এই কবিতাটির মধ্যে বিপ্লববাদীগণের প্রতি মহাকবির আন্তরিক অনুরাগের গন্ধ পেয়ে তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এটি বক্সাদুর্গের বন্দীগণের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি হননি। কবিতাটি যথাসময়ে অমল হোম মহাশয়ের হাতে ফিরে আসে, এবং 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এক নিরীহ জাতি বাস করে ভূটান পাহাড়ের গহনলোকে। ওদের নাম 'টোটো' জাতি। আপাতত এই 'টোটো বস্তিটির' দুস্তর অঞ্চল আলিপুর দুয়ারের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র জাতির লোকসংখ্যা অল্পবিস্তর সাড়ে তিনশো থেকে চার শো'র বেশী নয়। এরা একদা পাহাড়পর্বতে কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পেয়ে প্রবাদমতো টো টো করে ঘুরে বেড়াতো বলেই এদের নাম 'টোটো',—অর্থাৎ আশ্রয়চ্যুত ভবঘুরে। এরা চিরকাল মার খেয়েছে পাহাড়ে-পাহাড়ে নেপালী আর ভূটানীদের হাতে। পাথরে পাথরে মাথা ঠুকে বেড়িয়েছে অন্নবস্ত্রের অভাবে। দারিদ্র্যে কুষ্ঠব্যাধিতে অন্নাভাবে অনেকে বিকলাঙ্গ। ওদের ভাষা ওদের নিজস্ব,—না ভূটানী, না নেপালী, না বা সিকিমী। ওরা প্রায় এবার সবংশে ধ্বংস হয়ে এলো, আর দেরি নেই! হয়ত বা ওদেরকে বাঁচাবার জন্য এক আধজন মানবপ্রেমিক ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়,—কিন্তু সে মার খেয়ে ফিরে আসে। পাহাড়ী নেপালী আর ভূটিয়া ওদের ভাগ থেকে জমি আর অন্ন কেড়ে নেয়, ভেঙে দিয়ে যায় ওদের ঘরকন্না। কিছুদিন আগে একটি বাঙালী যুবক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গিয়েছিল 'টোটো' বস্তিতে, কিন্তু বাগে পেয়ে নির্মমভাবে বিরোধীপক্ষ তাকে হত্যা করে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আলিপুর দুয়ারের কর্তৃপক্ষ টোটোদেরকে বাঁচাবাব চেষ্টা করছেন, —তারা যেন দ্রুততর গতিতে নিশ্চিহ্ন না হয়। 'টোটো'দের জাতিপরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

'টোটো' পাহাড়ের বস্তি জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে পড়ে, কিন্তু তবু এটি ভূটানী অঞ্চল। সমস্ত প্রকৃতি হলো ভূটানী। এখানে খরস্রোতা 'আমো-চু'ব নাম হয়েছে 'তরসা'। এরই কোনও এক তটে 'টোটো' পাহাড়,—মানবসমাজের বাইরে। জলা জঙ্গল পাহাড়—এ ছাড়া আর কিছু নেই। এর বাইরে জগৎ আছে, টোটোরা জানে না। সভাসমাজের লোকেরা অনেকে হাতিব পিঠে চড়ে টোটোবস্তির চেহারা দেখে আসে। ওই মানহারা মানবগোষ্ঠীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে সভ্য মানুষের মাথা হেঁট হয় বৈকি।

খুঁটির সাহায্যে মাচান বানিয়ে তার ওপব ওরা চালাঘর তৈবী করে। যেমন আলিপুরে, যেমন শিলিগুড়ি আর আসামে। জলের ভয়, জন্তুর ভয়, সরীসৃপের ভয়। ওরা ডাকলেও আসবে না সভ্য জগতে, ওরা মিলতে চাইবে না কারো সঙ্গে,—পাছে ওদের ধর্মবোধ আপন স্বাতন্ত্র্যকে হারায়, এই আশঙ্কা। ওবা ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক, অতিশয় আত্মবাদী, জাতি-অভিমানী, স্বকীয়তার অনুবাগী,—সম্ভবত এই সব কারণে ওরা মার খেয়ে আসছে যুগে যুগে। ওই বস্তিতেই ওদেব এক একটি পাড়া,—তার কর্তা হলো এক একজন মোড়ল। মোড়লরাই ওদেব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওদের দেবতা আছে, পালপার্বণ আছে, নাচ গান বিবাহ আছে, সমাজব্যবস্থাও আছে। ওদেব প্রধান জীবিকা হলো পরের জন্য খাটা। এ ছাড়া ক্ষেতখামার আছে কিছু কিছু। ওইতে ওরা শাকসবজি বানায়, অল্পস্বল্প লাঙল চষে। এমনি করেই দিন যায়। সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ওদেরকে বাঁচাবার জন্য নানাবিধ সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে শুনতে পাওয়া যায়। ঔষধ পথ্য পানীয় এবং আশ্রয়—এদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, মানুষ করে তোলার সাংস্কৃতিক দায়িত্বও পালন করা চাই।

দেবাদিদেব হিমালয় তাঁর সহস্র জটা বিস্তার করে চোখ বুজে রইলেন ভূটানের হিমালয়ে। রইলো চমলহরি আর কৃষ্ণপর্বতের গগনভেদী রৌপ্যচূড়া, রইলো 'মনিউল, কাংটো আর মাগোর' দুরতিক্রম্য গিরিসঙ্কট, রইলো পুণাখা থেকে সুদূর দুর্গমলোকে ক্যারাভান পথ,—যে-পথ গেছে তিব্বতের অজানা অনামা বালুপাথরের প্রান্তরে,—কিন্তু

তাঁর পায়ের নীচে রয়ে গেল সহস্র সর্বনাশা নদীর ধারা, অনধ্যুষিত অপরিচিত বিশাল জলাজঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ,—যেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, হায়না, অজগর, শূকর, হরিণ, সম্বর, সরীসৃপ ইত্যাদির অবাধ স্বচ্ছন্দ রাজরাজত্ব। তিনি নিমীলিতনেত্র যোগাসীন, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই কল্পে কল্পান্তে। চরাচরব্যাপী পশুদল রইলো তাঁর আসনের নীচে,—প্রসন্নবদন পশুপতি রইলেন ধ্যানগম্ভীর!—

বিংশ পরিচ্ছেদ

কূর্মাচল আলমোড়া

কোশীর সাঁকো আরেকবার পার হচ্ছিলুম। পাহাড়ের প্রাকার-চক্রান্ত ভেদ করে সাঁকোর তলা দিয়ে কোথা থেকে যেন আলো এসে পড়েছে। পাহাড়ের শিরদাঁড়ার এটা পশ্চিম পার, আমরা যাবো পূর্বপারে। নদী পেরিয়ে গাড়ি চললো আবার চড়াইপথে।

যাচ্ছিলুম আলমোড়া শহরের দিকে। শশাঙ্কবাবু সঙ্গেই আছেন।

আটমাইল চড়াইপথ আর বাকি। কিন্তু এবার একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম, পাহাড় জরীপ করে একদা যারা মোটরপথ বার করেছিল তাদের উদ্দেশে ধন্যবাদও জানাই, ক্ষুরে-ক্ষুরে নমস্কারও করি। মনে কৌতূহল ছিল বটে, কিন্তু ভয় আর অপঘাতের দুর্ভাবনা সর্বশরীরকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল ঘণ্টা কয়েক। যকৃতে মোচড় লেগেছে বার বার, কাঠ হয়েছে মেরুদণ্ড, বিপ্লব বেধেছে অন্ত্রেতন্ত্রে কতবার। আর হৃদ্‌যন্ত্র,—থাক, হৃদয়ের কথা আর নাই তুললাম। পাহাড়ের প্রতেক 'বেন্ডে' মৃত্যুর ভয় পেয়ে আমার অন্তর্যামী বাঁধন কেটে পালাবার চেষ্টায় ছিল। শশাঙ্কবাবুর সুবিধা এই, ভয়-ভাবনা তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করে না। গাড়ির জানালা দিয়ে ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া পেলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তে জানেন।

'গাগর' গিরিশ্রেণী ছেড়ে 'কূর্মাচলে' এসে ঢুকেছি। এটি আলমোড়ার অপর নাম। কুমায়ুন নামটি এসেছে কূর্মচল থেকে, লোকে বলে। নাম কেন বদলায় বার বার, জানিনে। কিন্তু বদলায়। দেশের নাম, নগর ও পাহাড়ের নাম, আঞ্চলিক নাম,—সবই বদলায়। হস্তিনাপুর থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, তারপর দিল্লী। লক্ষ্মণাবতী হলো লক্ষ্ণৌ। পাটলীপুত্র পাটনা। কাশী, 'জীত্বরী', বারাণসী, বেনারস, বানারস—এখন আবার নাকি ফিরেছে 'বারাণসীতে'। পিটার্সবাগ, পেট্রোগ্রাড, লেনিনগ্রাড। সিন্ধু, হিন্দু, ইন্দো, ইন্দা, ইন্ডিয়া,—অথচ 'ভারত' সকলের আগে। পাহাড়ের নামও বদলেছে যখন খুশি। গৌরীশিখর হয়েছে এভারেস্ট। কৃষ্ণগিরি হলো কারাকোরাম। কালদণ্ড হলো ল্যান্সডাউন। আরও আছে অনেক। কূর্মাচলকে কেউ আবার বলে 'কূর্মাঞ্চল'। কিন্তু নদীর নাম কথায়-কথায় বদলেছে এখনও শুনিনি। ওটা স্থাণু নয়, ধারাবাহিক—তাই হয়ত টিকে আছে, গঙ্গা হলো গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর,—এই দুহাজার মাইলে হাত দিতে হয়ত কেউ ভরসা পায়নি। অনেকের নিজের নামটি বদলাবার সখ আছে, কিন্তু বাপের নামটি বদলাতে ভয় পায়। প্রথমত সম্পত্তি আর পরিচয় নিয়ে টানাটানি, দ্বিতায়ত জননীর প্রতি অবিচার।

এলোমেলো কথা নিয়ে চলে এসেছি অনেকটা পথ। গাড়ি হাঁসফাঁস করতে করতে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। মধ্যাহ্নকাল সমাগত, দক্ষিণ পাহাড়ের প্রায় শিখরে হেমন্তের সূর্য। এবার দূরের থেকে দেখা যাচ্ছে আলমোড়া। কিন্তু শহর তখন অনেক উঁচুতে। আমাদের সামনে সুদীর্ঘপথের রেখা উত্তরে প্রসারিত। উত্তর দিয়ে ঘুরে আমরা যাবো পূর্বে।

মধ্যাহ্ন প্রখর, শীতের হাওয়া এখনও ওঠেনি আলমোড়ায়। আমরা উঠে এলাম

আলমোড়া শহরের প্রধান রাজপথে—এটির নাম 'গান্ধীমার্গ'। শহর মস্ত বড়। নৈনীতালকে ছেড়ে দিলে আলমোড়ার মতো বড় শহর কুমায়ুনে আর নেই। কাঠগোদাম স্টেশন থেকে আলমোড়ার দূরত্ব পঁচাশী মাইল মোটরপথে,—বরং কিছু বেশী। কিন্তু রামগড়ের পথ দিয়ে এলে পথ অর্ধেক কমে যায়। তবে সে-পথটি পায়ে হাঁটা কিংবা ঘোড়া অথবা ডাণ্ডি।

'আনন্দময়ী' ধর্মশালা ছাড়িয়ে আমরা এসে উঠলুম 'রয়াল' হোটেলে। প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে সেটি হলো জলাভাব। জল আলমোড়ায় বড় কম—মানে, আমি শহরের কথা বলছি,—জেলার কথা নয়। যেটি কালীগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, কোশী, গোমতী ইত্যাদির দেশ, সেখানকার সর্বপ্রধান শহরে জলের অভাব—বৈজ্ঞানিক যুগে এটি মন মানতে চায় না। সম্ভবত এর প্রধান কারণ, শহরের সঙ্গে উচ্চতর কোনও বড় পর্বতের ভূসংযোগ কম। জলের ব্যবস্থা করতে হয় নীচের থেকে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, যে সমস্ত উঁচু পাহাড়ে ঝরনা নেই, কিংবা যে সকল শিখরলোকে জলের সংস্থান কম, তার ত্রিসীমানায় যায় না কেউ—সে সব পাহাড় ভীতিজনক। সেই কারণে সাধুসন্ন্যাসী হোক আর পার্বত্য অধিবাসী হোক,—সবাই খোঁজে সুউচ্চ পাহাড়ের কোল। যেখানে ঝরনারা নামে, যেখানে গুহাগহ্বরের আশ-পাশ একটু বনময়,—যেখানে নির্মল জলের ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার, ঝরনামাত্রই নিবাপদ নয়। অনেক প্রকার বন্য এবং ঔষধিলতার ধোয়াট নামে অনেক ঝরনায়, অনেক প্রকার ধাতব মিশ্রিত থেকে যায়। বিশেষ করে পাহাড়ের উপর দিকে যদি জনবসতি থাকে, তবে সেই পাহাড়ের নীচেকার ঝরনাগুলি অত্যন্ত দূষিত জল নিয়ে নামে। উদরের পীড়া হলো পাহাড়ের মারাত্মক পীড়া। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকেও পাহাড়ে তিলে তিলে পেটের ব্যামোয় মরতে দেখেছি। সাধু সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা। যানবাহনের প্রবল ভিড়েব মধ্যেও কলিকাতার স্বল্পবেতনভোগী হতভাগা কেরানীরা যেমন গাড়িচাপা পড়ে না, সেইরূপ অর্ধাহারী অর্ধনগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীরাও ঝরনার জলের হাত থেকে বাঁচে।

বেশ আছি 'রয়েল হোটেলে।' একটু বড়মানষী, একটু বিলাস,—একটু বা ছড়ি ঘুরিয়ে পাহাড়ের 'রীজের' ওপর দিয়ে অনেক দূর চলে যাওয়া,—দিন কেটে যাচ্ছে ভালোই। শহর বড় আকর্ষণ নয়,—কেননা কলকাতার চৌরঙ্গী দেখা আছে, বহুবাজার স্ট্রীটেও চিনি। এটি জেলার প্রধান কর্মকেন্দ্র, সুতরাং কোর্ট কাছারি থেকে আরম্ভ করে গোরাছাউনী ও বাজার-হাট সবই আছে। আবহাওয়ার দিক থেকে নৈনীতাল অপেক্ষা এখানে ঠাণ্ডা বোধ হয় একটু কম। নৈনীতালে এরই মধ্যে কনকনানি এসে গেছে, কিন্তু আলমোড়ায় এখনও হাওয়া ওঠেনি। অনেক মন্দির এবং অনেক দেবস্থানে মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে। পশ্চিম তিব্বতের পথ এখান থেকে সর্বাপেক্ষা সহজ। তিব্বতের সঙ্গে আলমোড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত্র বিদ্যমান।

আলমোড়ার একান্তে রয়েছে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজাদের একটি পুরাতন দুর্গ। মন্দির অনেকগুলি। তাদের মধ্যে নন্দাদেবী, ত্রিপুরাসুন্দরী, পাতালদেবী, কাসারদেবী, বদ্রীশ্বর—এগুলি প্রধান। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি অতি রমণীয় এবং নিরিবিলি পাহাড়ের কোলে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কোনও কোনও সময়ে অভ্যাগতরা বাসস্থান পেয়ে যান।

নানাপথ এখান থেকে নানাদিকে চলে গেছে। কিছুদূরে কাসারদেবী পাহাড়ের কোলে জনৈক আমেরিকান সাধু একটি পাইনের বনে তাঁর একটি আশ্রম বানিয়ে রয়েছেন।

আরো রয়েছেন কয়েকজন পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী ব্যক্তি, এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে তাঁরা অধ্যাত্মসাধনা করেন। আলমোড়ায় যে বন্য প্রকৃতির একটি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, সেটি নৈনীতালে ঠিক তেমনটি নেই। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে যে স্থূল উপকরণ বাহুল্য দেখা যায়, তার থেকে সরে যেতে চাইছে সৌন্দর্যপিপাসু মন—যে-মন দার্শনিক। সম্ভোগের প্রচুর উপকরণ দেখে ভয় পেয়েছে অনেক চিন্তাশীল মন, পাছে তাদের তলায় চাপা পড়ে মানুষের মহৎ বৃত্তি, পাছে সুখভোগের বিপুল বস্তুসম্ভার তাদের পরমার্থ পিপাসা ও তত্ত্বজ্ঞানের পথে বিঘ্ন ঘটায়। আলমোড়া থেকে প্রায় কুড়ি-বাইশ মাইল দূরে পাহাড় প্রকৃতির একটি অতি মনোরম নিভৃত কোণে আরও কয়েকজন পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিত ও সাধক অপর একটি আশ্রম বানিয়েছেন। আশ্রমটির নাম হলো 'উত্তর বৃন্দাবন'। এখানে আছে শ্রীকৃষ্ণের একটি মন্দির। চিতোরের রাণাকুম্ভের পত্নী মহীয়সী মীরাবাঈ যে ধরনের সাধন-ভজনের পথে আপন জীবনকে সার্থক করে তুলেছিলেন, এখানকার সজ্জন সাধুগণ অনেকটা যেন সেই প্রকার আপন জীবন ও সত্তাকে বিলীন করে রেখেছেন। এঁদের মধ্যে একজন তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং অধ্যাত্ম তপস্যার জন্য বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। তাঁর নাম কৃষ্ণপ্রেম, ওরফে রোনাল্ড নিক্সন্; আরেকজন আছেন, 'আনন্দপ্রিয়', ওরফে মেজর আলেকজান্দার। 'উত্তর বৃন্দাবনে' আরও অনেকেই আছেন তাঁদের সঙ্গে। বিস্ময়ের কথা এই, যে কাশ্মীরকে কথায়-কথায় ভারতের 'ভূস্বর্গ' বলা হয়,—সেখানে সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমসংখ্যা খুবই কম। হিমাচল প্রদেশে, পাঞ্জাবে, পেপসুতে,—অর্থাৎ হিমালয়ের দুস্তর উত্তর অঞ্চলে ঠিক সাধুর আশ্রম, তপোবন, কুটির প্রভৃতি বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা খুব গণ্য নয়। সংসারত্যাগী, বৈরাগী, গৃহবিমুখ, সন্ন্যাসী—এঁরা সবাই আপন আপন আবাসস্থল নির্বাচন করেছেন প্রধানত কুমায়ুনে। আবার কুমায়ুনের মধ্যে নৈনীতালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁদের কম। তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে আর কূর্মাচল আলমোড়ায়। হয়ত এ দুটি অঞ্চল 'গাঙ্গেয়', সে কারণেও হতে পারে। এ দুটি অঞ্চলে এসে পৌঁছলে চিন্তা ও ভাবনার পথ সহজেই যেন অধ্যাত্মগতি লাভ করে। সভ্যতার থেকে দূরে, সকল প্রকার লোককোলাহলের বাইরে, বাস্তব প্রয়োজনের অতিক্রান্ত যে জীবন আপন সৌরবিশ্ব রচনার একটি স্বাচ্ছন্দ্য পায়, গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার পাহাড়ে ও গিরিনদীতটে তার সন্ধান মেলে।

কুমায়ুনের দুই সীমানায় দুটি প্রধান নদী। পশ্চিমে শতদ্রু, পূর্বে কালীগঙ্গা। দুইয়ের মধ্যে দুশো মাইলের ব্যবধান। এই দুশো মাইলব্যাপী সমগ্র উত্তরলোক কমবেশী পনেরো থেকে ষোল হাজার ফুট উচ্চ পর্বত প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাকারের ওপারে হলো পশ্চিম তিব্বত। পশ্চিম তিব্বতের একটা বড় অংশ একশো পনেরো বছর আগে ভারতীয় কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটি হলো লাডাখ পর্বতমালা এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল। সেখান থেকে দক্ষিণে নেমে শতদ্রু পার হয়ে আবার ভারত-তিব্বত সীমানা সোজা এসেছে দক্ষিণে। এখানে তিব্বতে প্রবেশকালে প্রথম যে গিরিসঙ্কট পাওয়া যায় তার নাম হলো 'শিপ্‌কি'। শিপ্‌কি বুশাহর রাজ্যের শেষ সীমানা। শিপ্‌কির পর থেকে সুদীর্ঘ দুশো মাইল অতি দুর্গম পর্বতমালার দেশ। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায় এই দুঃসাধ্য এবং ভয়ভীষণ প্রাণিশূন্যপ্রায় গিরিশৃঙ্গদলের ভিতরে-ভিতরে আরও অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম একে একে

আবিষ্কার করেছে। তারা হলো 'ঠাগা, মানা, নিতি, শল্‌শল্‌, আস্তধুরা, দরমা, লামপিয়া,'—এবং অবশেষে হলো লিপুলেক। লিপুলেকের পাশেই কালীগঙ্গার পূর্বপারে হলো নেপাল, কিন্তু কালীগঙ্গার ধারাটি ভারতসীমানাবই অন্তর্ভুক্ত।

লিপুলেক থেকে টনকপুর—উত্তর থেকে দক্ষিণ—কমবেশী প্রায় দুশো মাইল হাঁটা পথ। এই দুশো মাইল দীর্ঘ হলো কালীগঙ্গার ধারা। সম্প্রতি টনকপুর থেকে পিথোরাগড় অবধি মোটরপথ গেছে, এবং পিথোরাগড় থেকে আশকোট পর্যন্ত মোটরপথ নিয়ে যাবার কথা এই সেদিনও চলছিল। যদি পথটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে কৈলাস-মানসের তীর্থযাত্রীর পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। কেননা আলমোড়া থেকে 'আশকোট' অবধি সত্তর মাইল পায়ে হাঁটা পথ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের টনকপুর থেকে 'আশকোট' পর্যন্ত নব্বই মাইল পথ তারা মোটরযানে অতিক্রম করতে পারবে। হয়ত শীঘ্র এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে, আলমোড়া শহরকে ছেড়ে দিয়ে 'আশকোট' হবে কৈলাস-মানস যাত্রার প্রধান প্রারম্ভ-কেন্দ্র।

কৈলাস এবং মানস সরোবর তীর্থযাত্রার আলোচনাটা, বলা বাহুল্য, আলমোড়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষের যে কোনও অঞ্চল থেকেই কৈলাসের পথে যাওয়া চলে—এমন কি কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, সিকিম, দার্জিলিং ও আসাম থেকেও যাওয়া সম্ভব। এই সকল অঞ্চল দিয়ে কৈলাস ও তিব্বতে যাবার জন্য ক্যারাভান পথ আজও চালু আছে। অভিযাত্রিকের যাবার পথ চিরদিনই অবারিত। কিন্তু সেই অতিমানবিক কষ্টস্বীকারের ধৈর্য এবং অসীম অধ্যবসায় গৃহগতপ্রাণ বাঙালী চরিত্রে কম। যদি কেউ কাশ্মীর থেকে কৈলাস-মানসে যায় তাকে ছয়শো মাইলেরও বেশি অতিক্রম করতে হবে। পথ হলো শ্রীনগর থেকে 'লে' (লাডাখ) এবং সেখান থেকে দক্ষিণে 'তাসিগঙ', গারটক, 'তীর্থাপুরী' ও কৈলাস। পাঞ্জাব দিয়ে গেলে শিমলা, নারকান্দা, চিনি, শিপ্‌কি ও গারটকের পথ। এই সব দুস্তর অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ক্যারাভানেব সঙ্গে সঙ্গে অভিযান করলে কেউ বাধা দিচ্ছে না! পথ ডাকছে, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে কে? সেই দুরন্ত যৌবনের আত্মবিদারণ সকলের জীবনে ঘটে না। আখড়ায় গিয়ে কুস্তি শিখলে মাংসপেশী ফোলে,—ডন-বৈঠক-মুগুর ভাঁজলে সুন্দর দেহ তৈরী হয়,—কিন্তু ওতে কি দুর্জয় সৎসাহস বাড়ে? দুঃখ-দুর্যোগ-ভয়—এদেব জয় করার মতো উদ্দীপনা ওতে আসে কি? ব্যায়ামের দ্বারা ধৈর্য ও অধ্যবসায় পাওয়া যায় কি?

'নিতি' গিরিসঙ্কট হলো গাড়োয়ালের উত্তরে। 'হোতি-নিতি', 'গুন্‌লা-নিতি' এবং 'দামজান-নিতি।' যোশীমঠ থেকে অগ্রসর হলে এই তিনটি পথে তিব্বতে প্রবেশ করা যায় এবং এক একটিতে দেড়শো থেকে দুশো মাইল পর্যন্ত গেলে কৈলাস-মানস। আহার, আশ্রয় এবং ঘোড়া—এ তিনটেই নিয়মিত মেলে না বটে, কিন্তু তবু অনেকে যায়। হিমালয়ের টান হলো অপ্রতিরোধ্য টান। যে ব্যক্তি শোনে, সে ঘরে থাকে না। যে-ব্যক্তি একবার যায়, সে ওখানকার ওই দুঃখে, দুর্গমে, দুর্যোগে গিয়েই আনন্দ পায়,—ঘরে তার সুখ নেই। ওই ছিন্নভিন্ন পোশাকপরা ধূলিমলিন পার্বত্যসন্তানদের দরিদ্র ঘরের কাঠের আগুনের আভায় বসে তারা আনন্দ পায়। ওই দুরারোহ গিরিমালার আশে-পাশে, গুহাগহ্বরে, গিরিনদীর তটে-তটে, এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে—তারা ঘুরে বেড়ায়। আনন্দের অসহ যন্ত্রণা, সুখের নিবিড় অশ্রুসজলতা, বেদনার বিচিত্র আনন্দ,—এরা তাকে ফিরতে দেয় না, স্থাণু থাকতে বলে না,—আঁচলের তলায় ফিরে যাবার পথ দেখায় না। কত কঠিন মন গলে গেছে হিমালয়ের পাথরে-পাথরে মাথা ঠুকে, কত দস্যুরত্নাকর

মহামুনি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছে,—কেউ তার খোঁজ রাখে না। জীবনের পণ্য হারিয়ে গেছে কত মানুষের, কত বিশ্বাস ভেঙে গেছে, কত ঈশ্বর কতবার পথের ধুলোয় আসন নিয়েছে,—কেউ কি তার খবর জানে? মেঘলোকে উধাও হয়েছে, তুষারদেশে হারিয়ে গেছে, কেঁদে-কেঁদে নিরুদ্দেশ পাহাড়ে মিলিয়েছে,—তাদের সংখ্যাও ত কম নয়! দার্শনিক তার জ্ঞানকে ঘষেছে হিমালয়ের কষ্টিপাথরে, কত নারীতপস্বিনী তাদের কঠিন জপের মন্ত্র পাঠিয়েছে ওই রণোন্মত্তা পার্বতীনদীর সফেন ধূম্রজটার স্তবকে স্তবকে,—হিসাব রেখেছে কি কেউ?

কৈলাস-মানস কঠিনসাধ্য,—কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পথ আলমোড়া। আলমোড়ার নীচে দিয়ে গেছে দু'একটি পথ,—কোনটি সরযূ, কোনটি বা গোমতীর তীরে তীরে,—কিন্তু বিশেষ একটি অঞ্চলে গিয়ে তাদেরকে মিলতেই হয়েছে। প্রধান এবং সুবিধাজনক পথ হলো আলমোড়া থেকে থাল, আশকোট, জওলজিবি, ধরচুলা, খেল্লা, মাল্‌পা, গারবিয়াঙ, লিপুলেক ও তাকলাকোট। কিন্তু মাঝখানে একটি শাখাপথ 'খেলা' অঞ্চল থেকে ধবলীগঙ্গার তীরে তীরে চলে গেছে 'পঞ্চোলী ওরফে 'পঞ্চচুলীর' উত্তুঙ্গ শিখরলোকের পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে সোজা উত্তরে 'দরমা' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে। এই পথে পাওয়া যায় পশ্চিম তিব্বতের একটি প্রধান বাণিজ্য শহর। নাম, 'গিয়ানিমা মণ্ডি'। এই কেন্দ্র থেকে কৈলাসের দূরত্ব বোধ হয় প্রায় সত্তর মাইল, এবং মানস-সরোবরের দূরত্ব খুব সম্ভব পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু এ পথটি ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক,—তীর্থযাত্রীর পক্ষে দূর হয় একটু বেশী।

আলমোড়া থেকে কুড়ি মাইল দূরে সরযূ নদী পার হয়ে চলে গেছে 'থাল'-এর পথ। মাঝখানে পেরিয়ে যেতে হয় 'ভেরিনাগ'। 'ভেরিনাগ' থেকে হিমালয়ের কয়েকটি তুষারচূড়া দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। নন্দাদেবী, নন্দকোট, ত্রিশূল ও পঞ্চচুলীর শোভা এখানে হিমালয়ের চিররহস্যকে কথায়-কথায় প্রকাশ করতে থাকে। এর পরে আশকোট, জওলজিবি ও ধরচুলার পথ। নদী, ঝরনা, উপত্যকা, অরণ্য, মন্দির এবং বিভিন্ন দেবস্থান—সমস্ত মিলিয়ে ধীরে ধীরে তীর্থযাত্রীকে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন করতে থাকে। এ হলো ডাকিনী মায়ার টান। স্নেহমমতার টান, সংসারের প্রতি আসক্তি, বিষয়-বৈভবের প্রতি আকর্ষণ, সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, সমস্তই যেন লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে, গতকালের কথা গত জীবনের মতো বিলীন হয়ে যায় যেন জন্মান্তরে। তুমি নিজে যাচ্ছ না, কোনও শক্তি তোমার নেই,—কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি তোমাকে ঠেলছে পিছন থেকে, এবং অন্য শক্তি টানছে তোমাকে সামনের দিকে। হিঁচড়ে-হিঁচড়ে টানছে! ক্ষতবিক্ষত হচ্ছ, কিন্তু নিজে তুমি দায়ী নও। দুর্গম পার হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু নিজের শক্তিকে নয়। মৃত্যু লেলিয়ে দিচ্ছে কেউ, মুখ দিয়ে রক্ত আর ফেনা তুলে দিচ্ছে, শরীরকে শীর্ণতর করছে। দুঃসহ দুঃখ, ভয়, বাধা—এরা পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে, দুঃস্বপ্ন আর চিত্তগ্লানিতে ঘুলিয়ে উঠছে তোমার প্রতি পদক্ষেপ। পাহাড়ী সাপ দিচ্ছে ছেড়ে কোথাও কোথাও তোমার পায়ের তলায়, ঘোড়া কিংবা ঝব্বু থেকে ফেলে দিচ্ছে তোমার অসতর্কক্ষণে, অন্ন আর আশ্রয় কেড়ে নিচ্ছে কোথাও কোথাও। বিরাট খদের মৃত্যুগহ্বরের নীচে তোমার সাংঘাতিক অবলুপ্তির জন্য ডাকছে তোমাকে পিশাচীর করাল দৃষ্টি,—কিন্তু তবু তুমি সমস্ত অস্বীকার করে এগিয়ে যাচ্ছ। তুমি নয়, অন্য কেউ। যে ব্যক্তি গারবিয়াং-কালাপানির দিকে এগোচ্ছে,

যে-ব্যক্তি গৌরীগঙ্গা আর কালীগঙ্গার ধারে ধারে চলেছে,—সে তুমি নয়, তোমার থেকেই বেরিয়ে এসেছে আরেকজন,—তাকে তুমি চিনবে না! সে দুঃখের আগুনে জ্বলে-পুড়ে এবার খাঁটি হয়েছে, সে প্রকাশ করেছে তার দুঃখদীর্ণ প্রাণের একাগ্রতা, প্রমাণ করেছে তার প্রবল আন্তরিকতা। দৈত্য-দানব প্রেতিনী-পিশাচীর ভয়ে আপন যজ্ঞ সে পণ্ড করেনি, প্রবল প্রাণ এবং অটল বিশ্বাসকে শত দুর্যোগেও সে হারায়নি। আতঙ্কের ভিতর থেকে সে বীর্যলাভ করেছে, মৃত্যুভয়ের চক্রান্ত থেকে লাভ করেছে সে অভয়মন্ত্র। একথা সে প্রমাণ করার চেষ্টা পেয়েছে যে, দুর্গম তীর্থপথে যাত্রা করাই হলো আত্মশুচিতা সম্পাদনের প্রধান পথ। তুমি তাকে চিনবে না! তার জন্য দ্বার খোলা হচ্ছে অলকায়, ডাক দিচ্ছে তাকে 'স্বর্ণভূমি'। সে এবার উঠে এসেছে মৃত্যুর থেকে জীবনে, জীবন থেকে চলেছে মহাজীবন। কিন্তু সেখানেও হবে তার শেষ পরীক্ষা। তুষাররাজ্যে প্রবেশ করে লক্ষ লক্ষ বৈদূর্যমণির জ্বলজ্বালায় তার চোখের মণি হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু তারপরে তার দৃষ্টিতে আসবে প্রশান্তি। দর্শন করবে সেই দীপ্যমান বিভা, যার ফলে পলকের মধ্যে তার যোগসমাধিলাভ ঘটবে, সমগ্র জীবন আর দর্শনমাত্র শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করবে।

কৈলাস ও মানসসরোবর যাত্রাই হলো তীর্থযাত্রীর পরম সার্থকতা!

'চিতাই' রোড ধরে ফিরে আসছিলুম। 'নারায়ণ তেওয়ারি দেওয়াল' পেরিয়ে গণেশ মন্দির ছাড়িয়ে চলেছি। ভরা শুক্লপক্ষে মায়ারহস্য ফুটেছে পাহাড়ে এবং পূর্ব-পাহাড়তলীর উপত্যকায়। ডানদিকে সরকারী এক একটি কর্মকেন্দ্র। আরেকটু এগিয়ে এলে সরকারী জেল। জেলের ভিতরে কয়েদীদের জীবনযাত্রা জানার উপায় নেই বটে, কিন্তু এমন নিভৃত অঞ্চলে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে জেলখানা দেখলে কয়েদীদের প্রতি একটু ঈর্ষা হয় বৈকি। দার্জিলিঙের কথা মনে পড়ছে। লুইস জুবিলীর বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের দিকে জেল; চম্পাবতীর সেই ময়দানের ধারে দাঁড়ালে ইরাবতীর কোলে সেই জেল। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিশেষ করে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি জেলখানা দেখে খুবই আনন্দ পাওয়া যায়।

পথ নির্জন চন্দ্রালোকিত। কতকটা পরিশ্রমসাধ্যও ছিল। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে বনবাগান ঘুরে শশাঙ্কর সঙ্গে ফিরছিলুম। শহরে এসে পৌঁছতে আর বাকি নেই। এমন সময় দূরের থেকে দুটি লোককে কাছে আসতে দেখা গেল। একজন কথা বলছে গলগলিয়ে, আরেকজন অসীম ধৈর্যসহকারে শুনছে। কাছাকাছি এসে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় বাক্যবাগীশ লোকটি সহসা থামলো, এবং আমাদের দিকে ফিরে বিনা ভূমিকায় পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করলো, আপনারা বাঙালী নিশ্চয়।

ঈষৎ বিস্মিত হলুম। ভদ্রলোকটি সুশ্রী এবং সৌম্যদর্শন। তাঁর পোশাকটি ঘোড়সওয়ারের মতো। পরনে 'ব্রীচেস'। নীচের দিকে বুট, এবং হাতে একটি ছড়ি। পল্টনের লোক মনে করেছিলুম। প্রশ্নের জবাবে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলোক বললেন, আমি বলদেও যোশী। বহুদিন বাঙলায় ছিলুম। ভারতের মধ্যে আমার সকলের বেশী প্রিয় বাঙলা দেশ।

প্রশ্ন করলুম, আপনি কি পাটের কারবার করেন?

হাসিমুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, একেবারেই না।

সবিনয়ে জানালুম, যাঁরা পাট, কাপড়, বনস্পতি কিংবা সরষের তেল এসব নিয়ে

কারবার করেন—বাঙলা তাঁদেব কাছে খুবই প্রিয়।

এ আপনার ভুল ধারণা!—যোশী কলরব করে উঠলেন, তারাই সব চেয়ে বেশি হেনস্তা করে বাঙলাকে। তাবাই বাঙলাকে নির্বোধ বানিয়ে লাখো লাখো টাকা নিয়ে যায়। দেখুন, এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে, আমি বেশী বাড়াতে চাইনে। কিন্তু আমার কাছে বাঙালী নমস্য। বাঙালীর পায়ের কাছে বসে একদিন আমি পলিটিক্স-এ দীক্ষা নিই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আমার পরম গুরু। গান্ধীজির পরে তিনিই বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ভদ্রলোক তাঁর সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের কাহিনী আরম্ভ করলেন। একটা সময়ে তিনি নাকি সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সেটি ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ,—'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের' জন্মকাল। বিরাট শোভাযাত্রাসহ আবেদন নিয়ে যাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র সেবারকার কলকাতার কংগ্রেসমণ্ডপে। সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করছেন জওয়াহরলাল। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জওয়াহরলালের পিতা পণ্ডিত মোহিলাল নেহরু। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেস সভাপতিব শোভাযাত্রার 'জেনাবেল অফিসার কমাণ্ডিং ইন্ চীফ।' অশ্বারোহী সুভাষ, সৈনিকেব পোশাকে সুভাষ,—এবং সেই পোশাকেব সম্মান তিনি রেখেছিলেন পবে আজাদ হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে। যাই হোক, আমি সেই 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের' প্রধান অফিসার ছিলুম'—মিঃ যোশী সোচ্ছ্বাসে গল্পটা বলতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি আমাদের কারোকে কথা বলতে দিলেন না এবং এমন চমৎকাব করে তাঁর গল্প বলতে লাগলেন যে, আমি আর শশাঙ্ক যেমন অভিভূত, তেমনই মুগ্ধ। চাঁদের আলোয় ভদ্রলোকের বয়সটি ঠাহর হচ্ছে না, মাথায় ছিল সৈনিকের টুপি।—কিন্তু তাঁর সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান চেহাবাব মধ্যে একজন বিশেষ বিক্রমশীল যোদ্ধা যে আজও রয়েছে, এতে ভুল নেই। তাঁর কথায় আমাদেব প্রতি এমন স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমরা তন্ময় হয়ে ঘণ্টাখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আজ আমাদের সারাদিনের পরিভ্রমণটি যে সার্থক হয়েছে,—শশাঙ্ক একথাও স্বীকাব করে নিল।

নমস্কার, প্রতি নমস্কার এবং বিদায় সম্ভাষণের হিড়িকে আরও মিনিট দশেক লেগে গেল। দেড় বছরের আনাগোনার ফলে যে প্রকার প্রায়কাহিনী গড়ে ওঠে, দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মধ্যে সেই অন্তরঙ্গতা জন্মে গেল। উভয় পক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলুম, প্রতি সপ্তাহে উভয়ের মধ্যে অন্তত একখানা চিঠি বিনিময় যদি না হয়, তবে পরস্পরের জীবন ব্যর্থ মনে হবে।

পুরুষে-পুরুষে অথবা মেয়েতে-মেয়েতে যখন প্রণয় হয়, তখন সে-বস্তু বোধ করি বড়ই গভীর, উপরতলায় তার কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু পরবর্তী চার বছরের মধ্যে চিঠিপত্র ত দূরের কথা, কেউ কারও খোঁজ-খবরও রাখিনি। চাঁদের আলোয় ভদ্রলোককে দেখেছিলুম, দিনের আলোয় তাঁকে আজ দেখলে চিনতেও পারবো না, এই আমার ধারণা।

এর মধ্যে আবার দিন তিনেক থেকে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে, তাঁর নাম নীলাম্বর পন্থ। তিনি এককালে কলকাতায় ছিলেন, সামান্য কাজকারবারও ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হলো এই, বাঙলার গ্রামের দুঃখদুর্দশার সঙ্গে তিনি খানিকটা পরিচিত। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকালে তিনি নিজের খরচে একটি 'খাদ্যবিতরণ

কেন্দ্র' খুলেছিলেন শহরতলীতে। এখন তিনি থাকেন এখানে একটি পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে তিনি কয়েকটি গরু পালন করেন, এবং দুধ ভিন্ন আর কিছুই খান না। বৈচিত্র্য হিসাবে একটু আধটু ছানা, একটু আধটু মালাই। তিনি অবিবাহিত। বয়স তাঁর প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভদ্রলোক প্রত্যেকদিনই শহরে আসেন বেড়াতে। এখানকার 'গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের' তিনি একজন সভ্য। অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক, এবং হাসিখুশী। এখানে আমাদের কোনও অসুবিধে হলে তাঁর ওখানে যে কোনও সময় গিয়ে আতিথ্য নিতে পারি, একথা তিনি বারম্বার জানিয়েছেন। তীর্থ এবং মন্দিরের গল্প তাঁর খুবই প্রিয়। তিনি মৃত্যুর আগে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁর সামান্য যা কিছু আছে দিয়ে যেতে চান—একথা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ভদ্রলোক বাঙলা বলতে পারেন।

দূরের থেকে তাঁকে দেখে আমরা নমস্কার করে বললুম, বহু ভাগ্যে আবার দেখা মিললো!

পন্থজী বললেন, মিলতেই হবে। সমস্ত আলমোড়ায় পাবেন দুটি প্রধান সম্প্রদায়—রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র। এক হলো যোশী, অন্য হলো পন্থ। পন্থ আর যোশী শুনলেই জানবেন, ওদের বাড়ি আলমোড়া। ওরা হলো পাহাড়ী।

আমরা বললুম, একজন যোশীর সঙ্গেও আমাদের খুব আলাপ হয়েছে। খুব চটপটে আর বাকপটু। মিলিটারী পোশাকে থাকেন। একদিন রাজনীতিতে ছিলেন। আমরা খুব রস পেয়েছিলুম।

পন্থজীর প্রসন্ন মুখখানি সহসা গম্ভীর হয়ে এলো। বললেন, কবে আলাপ হয়েছে?

কাল রাত্রে!

তিনি বললেন, বলদেও যোশীর কথা বলছেন ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি চেনেন? কেমন লোক? কী ধারণা আপনার?

পন্থজী এ নিয়ে কথা বাড়াতে চান না। শুধু বললেন, আমার বয়স হয়েছে। আর কদিনই বা। অপরের নিন্দে করার আগে নিজের জীবনেই ত দেখছি কত ত্রুটি, কত ভুল। শুধু এইটুকুই বলি, বলদেও আপনাদের ওপর চোখ রেখেছে তার নিজেরই প্রয়োজনে। মানুষের বাহ্য পালিশ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।

তাঁর সাঙ্কেতিক ভাষা শুনে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হলুম। সেদিন যাবার আগে পন্থজী বলে গেলেন, দেশে ফিরে যাবার জন্য যদি আপনাদের টাকাকড়ির দরকার হয়,—মনে হচ্ছে দরকার হবেই,—তাহলে আমাকে বলবেন! এখানে বেড়াতে এসেছেন, জুয়া-টুয়া খেলার ফাঁদে যেন পা দেবেন না।

পন্থজী চলে গেলেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই বেড়ে গেল। তবে পরবর্তী যে কয়দিন আমরা আলমোড়ায় ছিলুম, বলদেও যোশীকে আর দেখিনি।

ভারাক্রান্ত মনে আমরা ফিরে এলুম আমাদের সেই পরিচিত চায়েব দোকানটিতে। আজও দেখছি আসর জমিয়ে বসেছেন সেই বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র মহাশয়। তাঁর কৌতুক কাহিনী শোনার জন্য দোকানে এবং দোকানের বাইরে পর্যন্ত লোক জমে গেছে। তাঁর কীর্তিকলাপ হলো আন্তর্জাতিক ধরনের। লোকজন হেসেই অস্থির। বিগত ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তিনি সৈনিক হয়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। বাইশটি ভাষা তিনি শিখেছেন। তাঁর মুখে চীনা, জাপানী, জর্মান, মৈথিলী এবং চাটগেঁয়ে

আলাপ শুনে আমরা সবাই আমোদ পাচ্ছিলুম। দুর্বোধ্য স্কচ্ এবং ফরাসী শুনে হেসে সবাই লুটোপুটি। পার্বত্য 'অহোম্' ভাষায় তিনি পারদর্শী। মিশরীয় আরবী এবং মুরজাতির ভাষায় তিনি আশ্চর্য দক্ষ। তাঁর মুখে তামিল ও তেলেগু শুনে আমাদের চায়ের আসর জমে উঠলো। তিনি এখন সরকারি পেনসন্ পান। অত্যন্ত সাধু এবং ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি। তিনি আলমোড়ারই স্থায়ী বাসিন্দা।

একজন বিশিষ্ট বাঙালীর নাম আমরা প্রায়ই শুনছিলুম কথায়-কথায়। এখানে একটি পাহাড় তাঁর নিজস্ব। সেখানে তাঁর মস্ত বড় ক্ষেতখামার এবং গবেষণাগার। অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক সেখানে মোতায়েন থাকেন। সেখানে নানা-যন্ত্রপাতি, কলকবজা এবং তার জন্য মস্ত অফিস। ফুলে ফলে ফসলে ফলনে সেই পাহাড়টি একেবারে পরিপূর্ণ। সেই পাহাড়ে বাগান যত বড়, অট্টালিকা নাকি তারই অনুরূপ। ভদ্রলোকের নাম বশীশ্বর সেন।

সাহস করে একদিন সকালে, তাঁর সেই পাহাড়ের ফটক পেরিয়ে শশাঙ্কর পিছনে পিছনে গেলুম। কুকুরের ভয়, দারোয়ানের ভয়, এবং তার চেয়েও ভয় বেশী যাঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। কেন? কী দরকার ছিল এখানে আসার? যদি অনামুখো হয়? যদি সাহেবী মেজাজ দেখিয়ে 'দেঁতো' আলাপ করে? আমরাই বা চড়াও হতে যাই কেন গায়ে পড়ে? থাক্, ফিরে চলো, শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক বললে, আরে এসোই না! মানুষ ত!

মানুষ! কিন্তু বনমানুষ যদি হয়?

ক্রমশ দেখা গেল পথ অবারিত। কুকুর অথবা দারোয়ানের দেখা মিলছে না। কোটপ্যান্টপরা মালী কাজ করছে ফুলবাগানে। হাসিমুখে এগিয়ে এলো দুটি যুবক। দু'একটি কর্মচারীর প্রসন্ন মুখ। আমাদের সংবাদ গেল ভিতরে। এক মিনিটের মধ্যেই এসে দাঁড়ালেন একজন বর্ষীয়সী মেম-সাহেব। সস্নেহ দৃষ্টিতে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বাগানেই আমাদের বসবার জন্য দুখানি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচয় পরে আমরা পেলুম। তিনি সুপ্রসিদ্ধা আমেরিকান লেখিকা 'শ্রীমতী গার্ট্রুড্ ইমারসন্ সেন'। তাঁর অতি বিখ্যাত গ্রন্থ 'Voiceless India'-র নাম আমাদের জানা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের চমৎকার ভূমিকা লিখেছিলেন। মিসেস সেন একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ভগ্নীও বটে।

মিনিট দুই পরেই এলেন বশীশ্বর সেন মহাশয়। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ,—বয়স ষাট বছরের কম নয়। তিনি এসেই একেবারে উদার স্নেহে আমাদের দুজনকে আলিঙ্গন।—কী খবর? কি ভাগ্যি আমাদের! বসুন, বসুন,— অনেককাল পরে নতুন মানুষ দেখে আনন্দ পেলুম। আপনাদের কোনও কষ্ট হয়নি ত? কোথায় এসে উঠেছেন? এসব কাজের কথা নয়। আমার এখানে আহারাদি করতে হবে। লোকে আমাকে বলে, 'বটানিস্ট', আসলে আমি চাষাভুষো। কিন্তু খবরদার, পালিয়ো না যেন ভাই,—পাহাড়ীলোকের খপ্পরে পড়ে গেছো। চুপ করে বসে এখানে চা-বিস্কুট চালাও, তারপর আমার ঘরের ভাত-চচ্চড়ি! যদি অনুমতি করো তবে মাল্‌পো খাওয়াবো! রাত্রে মাংস পোলাও! ওরে ওই, চুপ করে আছিস কেন রে? দুটো প্রাণের কথা বল্‌রে ভাই! হাঁপিয়ে উঠেছি যে!

আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছি। অনেকটা যেন বন্যাস্রোতে ভেসে গেছি। মনে পড়ে গেল বহু বছর আগেকার কথা। তরুণ বয়সে একবার এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় যাচ্ছিলুম। বোম্বাই মেল-এ থার্ড ক্লাসে একটি লোক আমাকে ডেকে অনেক ভিড়ের মধ্যে জায়গা দিল।

বললে, বসুন গুছিয়ে, একটা রাত্রের ত মামলা!

বর্ধমানে পৌঁছে লোকটা বললে, এসো ভাই, খাবার খেয়ে নিই!

পরদিন সকালে মোগলসরাইতে পৌঁছে সে বললে, মাইরি, আমার পয়সায় কিন্তু তোকে চা খাওয়াবো। আপত্তি শুনবো না।

তারপর এলাহাবাদে পৌঁছেই সে এমন দু'একটি মধুর ঘবোয়া সম্ভাষণ করতে আরম্ভ করলো যে, আমি যেন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলুম। এমন মানুষ কালে-ভদ্রে জোটে বৈকি।

বশীশ্বর সেন মহাশয় কখন যে নিঃশব্দে আমাদের পবম প্রিয় 'বশীদা' হয়ে পড়েছেন, আমরা নিজেরাও জানতে পারিনি। তাঁর এই 'আপনি' থেকে 'তুমি', এবং 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ পরিণত হতে ঠিক কয় মিনিট লেগেছিল, এখন আর মনে পড়ে না।

সব কাজ ফেলে স্বামী-স্ত্রী এসে গল্পে মেতে উঠলেন। একটি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলো। বশীদার বহুকালের অনুরোধক্রমে মহাকবি প্রথম আলমোড়ায় আসেন তাঁব মৃত্যুর বছর চারেক আগে। তাঁর প্রথম পদার্পণের কাহিনীটুকু উপভোগ্য বৈকি। মহাকবি একবেলা রাগ করে বশীদার সঙ্গে কথা বলেননি। যখন বললেন তখন প্রথম ভাষণ হলো এই প্রকার,—তোমার সঙ্গে আমার কি কোনও শত্রুতা ছিল, বশী?

কবির গম্ভীর মুখচ্ছবি দেখে বশীদা ভয়ে আড়ষ্ট। আমরা প্রশ্ন করলুম, তারপব?

শোন্ ভাই কী কাণ্ড!—বশীদা আরম্ভ করলেন, কবির রাগ দেখে ভয়-ভাবনার আব কূল পাইনে, কী অপরাধ করলুম রে বাবা! কিন্তু তারপর আমার ভ্যাবাচ্যাকা চেহারা দেখে কবি আবাব বললেন, এখন বুঝতে পারছি বিদেশ-বিভুঁয়ে এনে আমাকে জব্দ করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল!

নাও ঠ্যালা! ঠ্যালার নাম বাবাজি! কাঁদবো, কি পায়ে ধরবো, কি ডিগবাজি খাবো,—ভেবে ঠিক পাচ্ছিলুম না। কিন্তু কবি খুব রসিক ছিলেন ত? আমার কাঁচুমাচু চেহারাটায় উনি বেশ রস পাচ্ছিলেন। এবার বললেন, পাহাড় ঠেলে আমাকে এনেছো, কিন্তু পাহাড়ের 'বেন্ড্'গুলো সমান করে কেটে রাখতে পারোনি!

তখ—ন ব্যাপারটা বুঝলুম রে, ভাই। এখানকার 'বেন্ড্'গুলো কী সাংঘাতিক দেখে এলে ত! আহা, বুড়ো মানুষ, নার্ভের ওপর স্ট্রেন্ হয়েছিল খুব! আমি ত আজও ভয়ে কাঠ হই! তোদেরও ভয় হচ্ছিল ত?

আর বলবেন না!

কবির গল্প শুনতে শুনতে মিসেস ইমারসন্ সেন এতক্ষণ খুব হাসছিলেন এবার তাঁর পরম যত্নরক্ষিত একখানি বেতের আরাম চেয়ার বার করে আনলেন। বললেন, এই চেয়ারখানি আমাদের এখানে মহাকবির আসন ছিল।

আমরা অতঃপর ঘুরে ঘুরে দেখলুম, বশীদার বৈজ্ঞানিক সব্জির ক্ষেত। একটি পেঁয়াজ ওজনে পাঁচপো, একটি বেগুন আড়াই সের। এই অনুপাতে অন্যান্য সবজি। আমরা দেখেশুনে অবাক। এসব নাকি গবেষণালব্ধ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানসম্মত 'ক্রস্-ব্রীডিং'। বশীদা ছিলেন আচার্য জগদীশ বসুর প্রিয় ছাত্র। গুরুর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি কায়মনোবাক্যে দুইজন ব্যক্তির শতায়ু কামনা করেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে বশীদাই প্রথম 'ফলনবীজস্বত্ব' নিয়ে আনুবীক্ষণিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া (micro-manipulation) আরম্ভ করেন।

কবিকে ঘরে এনে আমি বলেছিলুম,—বশীদা আবার আরম্ভ করলেন,—মশাই, আমি

লেখাপড়া তেমন শিখিনি, আপনার ওই সব কাব্য-টাব্য আমার মাথায় ঢোকে না! কিন্তু একশো বচ্ছর অন্তত আপনাকে বাঁচতে হবে, নইলে শুনবো না! কবি বললেন, তোর এমন অহেতুক দাবি কেন রে, বশী?—বললুম, ঠাকুর সামনে আছে তাই ত কাজকর্মে জোর পাই। চোখের সামনে থেকে সরে গেলে সবই ত অন্ধকার!—আহা, কী রূপ, কী চোখ, কী বিরাট পুরুষ! চারদিকে নেংটি ইঁদুরের দল, তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল পশুরাজ সিংহ! সত্যি নয়, ভাই?

বশীদার মুগ্ধ হৃদয় আর চক্ষুর দিকে আমরাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম।

পুনরায় তিনি বললেন, আহা, আমাদের গর্বের ধন, অন্ধের নড়ি, শিবরাত্রির শল্‌তে! মুনিঋষিকে দেখিনি, কিন্তু রবিঠাকুরকে দেখার পর মুনিঋষিকে আর না দেখলেও চলবে। কি বলিস, ভাই?

রবীন্দ্রনাথ কেমন তা পৃথিবীবাসী জানে, কিন্তু বশীদা যে কেমন—একথা একান্ত করে জেনে গেলুম শশাঙ্ক আর আমি। আর সেই জানার সাক্ষী রয়ে গেল দিগন্তের কোলে ওই তুষারচূড়ারা,—গৌরীপর্বত আর নন্দাদেবী, ত্রিশূল আর পঞ্চচুলী। ওরা আজকে আমাদের এই আনন্দের নিত্য সাক্ষী হয়ে রইলো।

যাবার আগে আমরা মিসেস সেনের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। বশীদা যাবার সময় ডেকে বললেন, ওরে, ওই পাগ্‌লা, সন্ধ্যেবেলা ঠিক আসবি, এখানে না খেলে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে!

আমরা হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছিলুম। তিনি পুনরায় বললেন, আর এক পাগলা আসছে আজ বিকেলে। ছেলেটা বে'থা করেনি, কিন্তু খাঁটি সোনা! ওই যে আমাদের উমাপ্রসাদ রে! হিমালয়ের পোকা! ছেলেটাকে দেখলে আমার বুকের ছাতি ফুলে ওঠে!

বলতে বলতে চলে গেলেন বশীদা। আমরাও তখনকার মতো বিদায় নিলুম। আমাদেরও বুক ফুলে উঠেছিল শ্রদ্ধায়।

নিজেদেরকে ধিক্কার দিচ্ছি শতবার। সেদিন কেন অন্যমনস্ক ছিলুম, কেনই বা উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ের একটি পথ আমাদেরকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল,—ওই যেদিকে একদা নর্তকশ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর তাঁর নাচের শিক্ষালয়টি গড়েছিলেন একটি মালভূমিতে—এবং কেন আমরা মতিচ্ছন্নের মতো দুর্বার মোহের টানে বনময় পাহাড়ের আশে-পাশে আত্মসন্ধানীর মতো ছোঁক ছোঁক করে বেড়ালুম, আজ আর সেসব কথা মনে নেই। কিন্তু বশীদার ওখানে সেদিনকার সান্ধ্যভোজে না যাওয়ার জন্য অনুশোচনার আর শেষ ছিল না। হয়ত আমাদের মনে একথা হয়ে থাকবে, স্বভাববৈষ্ণব বশীদার প্রাণখোলা আমন্ত্রণ এক জিনিস, এবং ওই প্রবীণা আমেরিকান মহিলা মিসেস গার্ট্রুড্ ইমারসন,—ওঁকে মেহন্নত করে সমস্তটা আয়োজন করতে হবে, সে অন্য বস্তু। কিন্তু আমাদের এই অমার্জনীয় উদারবুদ্ধির পিছনে যে-সূক্ষ্ম আড়ষ্টতা বোধ ছিল,—সেটির দিকে আমাদের মনশ্চক্ষু সেদিন পড়েনি,—সেটির সম্বন্ধে বহুকাল আগে এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করে গেছেন, "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" একটু ঘুরিয়ে কথাটা এই ভাবে বললে কেমন লাগে?—সহজ হওয়া যায় না মোটেই সহজে।

এর জন্য আমাদের শাস্তি তোলা ছিল, সেই কথাই বলি। সেদিন আমরা গিয়েছিলুম হাঁটতে হাঁটতে সেই পাহাড়ের একটু নীচে—যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের ফুলবাগানভরা নিরিবিলি আশ্রমটি পাহাড়ের গায়ে গেঁথে উঠেছে। সেখানে ছিলেন সদ্য পাশ্চাত্যদেশ-

প্রত্যাগত শচীন মহারাজ এবং পূর্ণ মহারাজ। তাঁদের মধুর আতিথেয়তায় অসীম আনন্দ পেয়ে সবেমাত্র হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় আমাদের দরজায় ধাক্কা পড়লো। দরজা খুলতেই নিত্যপ্রসন্নবদন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেসে উঠলেন। এই অকৃত্রিম হিমালয়প্রেমিক সম্বন্ধে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা বরাবর অটুট থেকে গেছে, আমার বিশ্বাস একথা তিনি জানেন না। মধ্য হিমালয়েব একটি বিশেষ ভূভাগে তাঁর প্রায়শ আনাগোনার কথা আমার ভ্রমণকালে অনেক সময়ে শুনতে পাই। কুমায়ুন পর্বতমালা তাঁর বিশেষ প্রিয়, এবং তিনি এই অঞ্চলকে তন্ন তন্ন করে দেখার চেষ্টা পেয়েছেন। তাঁর কৈলাস ভ্রমণের গল্প তাঁর মুখ থেকে শুনে অনেকেই আনন্দ পান। তাঁর মতো হিমালয়োৎসাহী বাঙালীর মধ্যে সংখ্যায় কম।

ধমক দিয়ে উমাপ্রসাদ বললেন, শিগগির বেরিয়ে আসুন বাইরে, আপনার শমন এসে দাঁড়িয়ে। খাবার নেমন্তন্ন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন, করেছেন কি? মানুষ চেনেননি?

বাইরে এসে দেখি মোটর থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সহাস্যমুখে মিসেস ইমারসন সেন। হাস্যমুখ হলে কি হবে, ভিতরে আগ্নেয়গিরি! কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দুজনে দাঁড়ালুম অনেকটা যেন নির্লজ্জের মতো। সন্তোষজনক কোনও কৈফিয়ৎ হাতে ছিল না, এমন কি হাতের কাছে এমন কোনও মিথ্যা গল্পও নেই যে, তৎক্ষণাৎ ফেঁদে বসবো। নানা গঞ্জনার মধ্যে মহিলা একসময় বললেন, আমিই বকে মরছি, কিন্তু কই, তোমাদের মুখে চোখে অনুশোচনার ভাব ত দেখছিনে? বেশ, তাহলে এক কাজ করো, আমার শিঙাড়া আর মাল্‌পোর দামটি দিয়ে দাও, খুশি হয়ে চলে যাই!

উমাপ্রসাদ খুব হাসলেন। বললেন, বটে, আপনি মাল্‌পো বানিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কিন্তু ওঁদের হাতে নেই। সুতরাং আর একবার খাইয়ে সেটা প্রমাণ করুন?

মিসেস ইমারসন হাসতে হাসতে কি যেন বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় উমাপ্রসাদের দিকে চেয়ে যেন বলে উঠলেন, "Oh, you birds of the same feather!"

কথা রইলো, আজ সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে গিয়ে জলযোগ না করলে মহা অনর্থ কাণ্ড ঘটবে। মহিলা যাবার সময় আবার হুমকি দিয়ে গেলেন, এবং আমরা সেই হুমকির মধ্যে জননীব মধুর তিরস্কারের আস্বাদ পেলুম। মোটর চলে গেল।

উমাপ্রসাদকে বহুদিন পরে পেয়ে আমরা আনন্দে মশগুল হয়ে গেলুম।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি তিনজনে। ওক্, আখরোট আর শিশমের ছায়াপথে পাহাড়ী শেগুনের ফাঁকে ফাঁকে আসন্ন সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্নাময়ী। নীচের দিকে রেলওয়ে আউট-এজেন্সির পাড়া, উপরদিকে বসবাসপল্লী—উভয় অঞ্চলই এখন শান্ত। ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বশীদার সঙ্গে দেখা। উমাপ্রসাদকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, ধরে এনেছিস দেখছি। ছোঁড়াদুটোর কান ধরে তুর্কিনাচন নাচিয়ে দে ত? শিঙাড়া-মাল্‌পো ফেলে পাহাড়ে পাহাড়ে কাব্য করতে ছুটেছিলি, পাষণ্ড?

তাঁর তিরস্কারে সবাই হেসে লুটোপুটি। বশীদা বললেন, নে, এখানে বসে গল্পগুজব কর, আমি চট্ করে একবার 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে আসি।

গোপালের ব্যাগার!—শশাঙ্ক প্রশ্ন করলো, সে আবার কি, বশীদা?

তবে শোন্—বশীদা থমকে গেলেন,—আমি ভাই বাঁকুড়ো জেলার লোক। গোপাল নামে আমাদের দেশে এক রাজা ছিল। তিনি বললেন, আমার রাজ্যে সবাই হবে বোষ্টম, হরিনাম জপ ছাড়া আর কিছু চলবে না। তারপর রাজা আর তাঁর গুপ্তচরেরা বেরিয়ে

খবর নিতো, সবাই হরিনাম জপ করছে কিনা। কিন্তু ধরে বেঁধে কি প্রেম হয়? অথচ গুপ্তচরের গতিবিধির খবর পেয়ে এখানে ওখানে সবাই হঠাৎ চোখ বুজে মালা ঠকঠক করতো! আর যারা কেজো লোক, তারা কাজ ফেলে ছুটতো ঘরের দিকে। বলতো, যাই, 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে আসি! আমারও ভাই তাই। তোরা বোস, একবারটি মালা ঠকঠক করে আসি।

সেই সন্ধ্যারাতটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শচীন মহারাজ, পূর্ণ মহারাজ, প্রমুখ আরও দুজন সাধু এলেন। একটি ঘরের ভিতর দিয়ে আরেকটি ঘরে এসে আমরা বসলুম। এঘরটি চারদিকেই প্রায় বন্ধ,—শীত পড়েছে বাইরে,—ভিতরে মধুর উত্তাপ জড়ানো। মেঝের উপর মাদুর ও কার্পেট পাতা, ভিতরটি পাশ্চাত্যরুচিতে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। পাশের ছোট্ট ঘরে স্বামী স্ত্রীর উপাসনাগৃহ, তাঁরা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের পূজারী, ওর মধ্যে ঢুকেই বশীদাকে 'গোপালের ব্যাগার' দিতে হয়। গোল হয়ে বসেছেন সবাই চেয়ারগুলিতে। চারজন গৈরিকবাসা সুপণ্ডিত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, আর এধারে বশীদা, উমাপ্রসাদ, মিসেস গার্ট্রুড্ ইমারসন্ সেন, এবং শশাঙ্ক। মাঝে মাঝে তাজা খাবার আসছে। আলো জ্বলছে ভিতরে। বাইরে নিবিড় হয়েছে জ্যোৎস্না। অনুভব করলুম পাহাড়ে-পাহাড়ে আলমোড়া স্তব্ধ হয়ে গেছে, এবং বহুদূর দিগ্বলয়ের কোলে ত্রিশূলী আর নন্দাদেবীর তুষার চূড়াসনের উপর অনন্ত সৌরবিশ্বের মহামন্দিরে আরতির ঘণ্টাও হয়ত শেষ হয়ে গেছে। সেখান থেকে চোখ ফিরে এলো সন্ন্যাসীদের উপর। তাঁদের একজনের নির্বাক দৃষ্টির উপরে যেন অনন্ত গভীরতার একটি আশ্চর্য ছায়া পড়েছিল।

উমাপ্রসাদ তাঁর সর্বশেষ হিমালয় ভ্রমণকালের দুটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। মিসেস ইমারসন্ সতর্ক করে দিলেন, যুক্তি ছাড়া কোনও কাহিনীর বাস্তবতা স্বীকার করবো না। তোমার চিন্তায়, কথনে, নিশ্বাসে, কণ্ঠে ও বর্ণনায় অলৌকিকতার প্রতি প্রশ্রয় দেবে না কিন্তু।

মিসেস সেনের প্রখর বৈজ্ঞানিক মন উমাপ্রসাদের কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে চুলচেরা বিচার করতে লাগলো।—

"উত্তরকাশীর সেই কৃষ্ণাশ্রম সাধু। বয়স একশো বছরেরও অনেক বেশী। চেহারা তাম্রবর্ণ, কিন্তু জ্যোতির্ময়। নিশ্চল, যোগাসীন—চক্ষু নিষ্পলক। সন্দেহ হয় বুঝি বা পাথরের মূর্তি। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাঁর সঙ্গে থাকেন এক ব্রহ্মচারী। চেহারাটি রুক্ষ, কিন্তু সুশ্রী। বয়স বাইশ অথবা বিয়াল্লিশ জানা যায়নি। কিন্তু একথা জানা গেল, সে মেয়ে,—বার দুই স্বামীপরিত্যক্তা। মৌনীসাধুকে ছেড়ে ঘরসংসারে তার মন বসেনি কোনওদিন। ওই সাধু তাকে সংস্কৃত শিখিয়েছে পাথরের উপর জলের অক্ষর লিখে-লিখে। সাধু শুধু চেয়ে থাকে গঙ্গার দিকে, মেয়েটি দেখাশোনা করে।"

ইমারসন্ প্রশ্ন করলেন, অন্ধ মোহ?

উমাপ্রসাদ জবাব দিলেন, জানিনে। ঘটনা শুধু এই।

চুপ করে গেলুম আমরা সকলে। দ্বিতীয় গল্পটা বদরিকাশ্রমের। উমাপ্রসাদ বললেন, আমার এক বন্ধু ধরে নিয়ে গেলেন আমাকে তপ্তকুণ্ডের ওদিকে। এখানে এক সাধু আছেন, তাঁকে কেউ না খাওয়ালে তিনি কিছু খান না। তপ্তকুণ্ডের কোলেই ছোট্ট একটি ঘরে তিনি থাকেন। আমি গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি বয়সে তরুণ সম্পূর্ণ এক উলঙ্গ সাধু,—বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। অনেকটা যেন যুবক পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো চেহারা। একটুখানি

দাড়ি আছে মুখে। হিন্দি এবং ইংরেজিতে আলাপ করেন, কিন্তু আমার ধারণা তিনি বাঙালী। তাঁর সেই নগ্নকান্তি যৌবনশ্রী দেখে যে কেউ চমকে উঠবে। পরীক্ষা করে দেখলুম, তিনি পণ্ডিত এবং সুশিক্ষিত। ইংরেজি বলেন চমৎকার।

হঠাৎ মিসেস ইমারসন্ প্রশ্ন করে বসলেন, উলঙ্গ কেন? কাপড় জোটে না? নাকি effect নেবার চেষ্টা করে?

উমাপ্রসাদ বললেন, জানিনে, প্রশ্নও করিনি। দেখলুম, তাঁর আশ্রমটির খাঁজে-খাঁজে নানাবিধ কাগজপত্র, চিঠি, লেখাপড়ার সরঞ্জাম। তাঁকে নানা প্রশ্ন করলুম। তিনি জানেন, বিলেতের সর্বশেষ খবর; তিনি জানেন, দু'বছর পরে কোন্ ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর পর যা ঘটবে, তা তিনি জানেন। তাঁর কথা অনেকগুলো সত্য হয়েছে, আমি মিলিয়ে দেখেছি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দেখলুম, দিল্লীর উচ্চতম শাসনকর্তা এবং বড় বড় কন্‌গ্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক চিঠিপত্র। চীন, জাপান, ইউরোপ—এসব জায়গা থেকে তাঁর কাছে চিঠিপত্র এসেছে মাত্র আগের দিনে। অন্তরঙ্গ আলাপ হলো।

মুখ তুললেন শ্রীমতী ইমারসন্।—হিমালয়ের কোন্ ছদ্মবেশী গুপ্তচর? Trans-Himalayan guard? কিন্তু কাপড় পরে না কেন? খায় না কি জন্য? ব্যাগ-বাক্স কিছু আছে দেখলে? কিছু পুঁজিপাটা?

কিচ্ছু নেই! সম্পূর্ণ নিঃস্ব।—উমাপ্রসাদ বললেন, খোঁজ করলুম সেদিন অনেক; কিছুই জানতে পারিনি!

শীতকালে নেমে আসে?

শুনিনি সেকথা। তবে শীতকালে তুষারপাতের মধ্যে সে গভর্নমেন্টের আইন অমান্য করেও থাকতে চায়!—ব্যস, সেদিন ওই পর্যন্তই আমার জানা!

আলোটা জ্বলছিল। উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সকলের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। জ্যোৎস্নাহসিত হিমালয়ের অনন্ত গগনে সেই প্রশ্ন তারায় তারায় ঘুরে বেড়ালো নিরন্তর।

একবিংশ পরিচ্ছেদ
চম্পাবতী হিমাচল

দিল্লী মেল অনেকক্ষণ লেট। সেপ্টেম্বর হলেও শরতের আভাস এখনও তেমন পাচ্ছিনে। মেঘ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। কানপুরে আকাশ ডাকলো, টুণ্ডুলায় বৃষ্টি নামলো। আলিগড়ে রীতিমতো বর্ষা। গাজিয়াবাদে মুষলধারা। মনে করেছিলুম আরেক পেয়ালা চা চলবে,—কিন্তু বৃষ্টিতে গা ঢাকা দিয়েছে রেস্টুরেন্ট কার-এর 'বয়',—জলের ঝাপটায় 'মেটেভাঁড়ের' চা-ওলাও পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শাহদারায় গাড়ি থামতে দেখা গেল আকাশ একটু ধরেছে। বড় নির্জন শাহদারা। যমুনার এ প্রান্তে বসে সে যেন করুণ নয়নে চেয়ে থাকে 'লাল কেল্লার' দিকে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে শাহদারা থেকে গাড়ি ছেড়ে যমুনা পেরিয়ে লালকেল্লার প্রাকারের ওপব দিয়ে দিল্লীমেল ঢুকলো এসে রাজধানীর প্লাটফরমে। দিল্লীমেলের আভিজাত্য ভিন্ন রকমের। বৃষ্টি এবার থেমেছে। আবার সেই দিল্লী।

দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিলুম। সহসা প্লাটফরম থেকে উচ্চকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দিলেন শ্রীমতী মায়া! গাড়ি থামার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলেন শ্রীমতী ও তাঁর তরুণ স্বামী। তাঁদের পিছনে আরেকজন পাঞ্জাবী বন্ধু। মিঃ গুপ্তর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। কথা বলার আর কোনও অবসর ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে মিঃ গুপ্তর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলুম। স্পর্শমাত্র মনে হলো, আলাপ এবং আত্মীয়তা যেন আমাদের বহুকালের। স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী, শ্যামবর্ণ যুবক। এমন সজ্জন এবং ভদ্র যুবক সচরাচব চোখে পড়ে না। পায়ে হাত দিতে গেলেন স্বামী-স্ত্রী,—হাত ধরে তুলে নিলুম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি মধুরভাষণে আলাপ করলেন।

অপরিচিত ছিলেন বটে মিঃ গুপ্ত, কিন্তু সেই ব্যবধান কাটিয়ে গত এক বছরে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে কয়েকখানি। চিঠির মতো মানুষটিও সুন্দর। শ্রীমতী মায়ার দিকে ফিরে বললুম, মেয়েদের সৌভাগ্যে কখনও ঈর্ষাবোধ করিনি, কিন্তু আপনার স্বামীভাগ্য দেখে বড় হিংসা হচ্ছে!

তবে যে বড় তামাসা করেছিলেন?

হাস্যমুখর এবং মধুর হয়ে উঠলো দিল্লী স্টেশন। মিঃ গুপ্ত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাইরে, টেনে তুললেন মোটরে।

শ্রীমতী মায়া গত এক বছরের মধ্যে গিয়েছিলেন কলকাতায়, এবং আমার বাসস্থানেও অনুগ্রহ করে পদার্পণ করেছিলেন,—দেখাশুনো হয়েছে বার কয়েক, এবং অনেকটা যেন পারিবারিক আত্মীয়তাও ঘটেছে। আজ তাঁর স্বামী কেশব হলেন আমার কাছে নতুন।

দিল্লী স্টেশন থেকে তাঁদের বাসস্থান অনেকটা দূরে। সবাই জানে আরাবল্লীর জটলা এবং শিরাউপশিরা দিল্লীকে বহুক্ষেত্রে অসমতল করে রেখেছে। আমাদের গাড়ি এদিক ওদিক ঘুরে আরাবল্লীর পাথুরে বনজঙ্গলের ডাঙা পেরিয়ে 'রাজেন্দ্রনগর' আর 'প্যাটেলনগর' ছাড়িয়ে সেই রাত্রে এসে ঢুকলো 'পুষা ইনস্টিটিউটের' বৃহৎ বন-বাগানে।

তার সুদূর পূর্বপ্রান্তে ফটকটি খোলা পাওয়া গেল, এবং সেই ফটকে পেরিয়ে একটি অতি নির্জন ও নিষ্প্রদীপ অঞ্চলের প্রান্তরে গাড়ি প্রবেশ করলো। এটি আরাবল্লীর একটি মনোরম উপত্যকা, নাম ইন্দ্রপুরী, স্টেশন থেকে আন্দাজ মাইল দশেক। অন্ধকার রাত্রে কোথাও কিছু দেখা গেল না, বিদ্যুৎ এখানে আজও এসে পৌঁছায়নি,—তাদেরই ভিতর দিয়ে কোনও একটি ছোট্ট বাগানবাড়ির ফটকে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। কেশব আমাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করামাত্র অনুভব করা গেল, আতিথেয়তার সমস্ত ব্যবস্থাদি গুছিয়ে রেখে তাঁরা স্টেশন থেকে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন।

আবহাওয়াটি এতই উল্লাসপ্রধান যে, সে-বর্ণনা বাহুল্য। বুঝতে পারা গেল, শ্রীমতী মায়া আমার অসংখ্য কাহিনী স্বামীকে আগে থাকতে বলে রেখেছেন। শ্রীনগরের বন্যায় তাঁর ঘরকন্না ভেঙে যাওয়ার গল্প, জম্মুর হোটেলের বর্ণনা, হিমাচল প্রদেশের অভিযান, কাংড়া আর কুলুর কাহিনী, ক্ষীরভবানী আর পহলগাঁওয়ের ইতিবৃত্ত,—এবং পরিশেষে আমার বিব্রত ও বিরক্তিভাব, মেজাজ-মর্জির ঈষৎ রুক্ষতা,—কোনওটাই বাদ যায়নি। পাঞ্জাবী বন্ধুটি বিদায় নেবার পর রাত দুটো পর্যন্ত হারিকেন লণ্ঠনজ্বালা ঘরে আমাদের গল্পের আসর মুখর হয়ে রইলো। শ্রীমতী মায়া বোধ করি এবার আমাকে বাগে পেয়েছিলেন। তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমার হাতের রান্না যে তেমন ভালো হয়নি, এটি তিনি স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন এবং আমিও বলে বসলুম, আমার স্বভাব-প্রকৃতির অপবাদ বরং সইব, কিন্তু আমার রান্নার নিন্দা একেবারেই অসহ্য।

ঘরময় হাসির তুফান উঠলো।

স্ত্রীর সর্বপ্রকার কাজকর্মে এবং আতিথেয়তার আয়োজনে কেশবের সর্বাঙ্গীণ সাহায্যদানের চেষ্টা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এমন আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের স্বচ্ছন্দ ও সুখী চেহারা দেখতে আমার বাকি ছিল। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে এমন শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের সম্পর্ক আধুনিক কালে যখন তখন চোখে পড়ে না। মায়াদেবী গল্প বর্ণে বর্ণে সত্য।

পরদিন ছিল রবিবার। কেশবকে সারাক্ষণ পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো গেল পাহাড়ের আশেপাশে। এই পাহাড় পেরিয়ে তাঁকে সাইকেলে যেতে হয় 'পালম বিমানঘাঁটিতে',—সেটি তাঁর চাকরিস্থল। তিনি হলেন সার্জেন্ট, এবং জনৈক গ্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়র। এখান থেকে বাজার-হাট বেশ খানিকটা দূর। মাঝে মাঝে শ্রীমতী মায়া সাইকেল চড়ে ঘুরে আসেন প্যাটেলনগর থেকে। আগ্রায় থাকতে মায়া ঘোড়ায় চড়ে খুব বেড়াতেন। মেয়েমহলে এখানে তিনি নাচ শেখান, এবং 'গীটার-বাজনায়' তিনি পারদর্শিনী। হারমোনিয়ম ছোঁন না, কিন্তু 'তম্বুরা' তাঁর প্রিয়। কেশব বললেন, পুজোর সময় আপনি এখানে থাকলে ওঁর নাচ দেখতে পাবেন। বেশ নাম-ডাক আছে।

হাসিমুখে বললুম, ভ্রমণকালে তাঁর এই সব গুণপনার আভাসমাত্র পাইনি। দুঃখের কথা বইকি। আমাকে উনি ঠকিয়েছেন!

আমার মন্তব্যে সরস পরিহাস বোধ করে কেশব খুব হাসতে লাগলেন। তিনি ধরে বসলেন, এবার পুজোয় আমাকে দিল্লীতে কাটিয়ে যেতে হবে।

অপরাহ্নের দিকে খানদুই সাইকেল-রিক্‌শা যোগাড় করে আনলেন কেশব, এবং আমরা পালম-এর এয়ার-অফিসার্স ক্লাবের উদ্দেশে রওনা হলুম। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল দুই হবে। প্রসারিত বন-বাগান এবং সরকারী কোয়ার্টারগুলি একে একে পেরিয়ে

গিয়ে আমরা অবশেষে এসে উঠলুম ক্লাবের বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে ঘন্টাতিনেক বসে গান বাজনা এবং 'পথের দাবী' নাটকের মহড়া দেখা গেল। আগামী পূজায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। কিন্তু এই 'পথের দাবী' নাটকে শ্রীমতী মায়া 'সুমিত্রার' ভূমিকায় আগাগোড়া যেমন চমৎকার অভিনয় করলেন,—আমি সেটি দেখে হতচকিত। মেয়েদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা সুশ্রী এবং দীর্ঘাঙ্গী। 'সুমিত্রার' ভূমিকায় তাঁর চেহারার লাবণ্য কাজ করেছে অনেকখানি। বাস্তবিকই, আমি যেন তাঁকে এই প্রথম আবিষ্কার করলুম। একত্র ভ্রমণ করেছি এতদিন, কিন্তু কোনওদিনই তাঁর সঠিক পরিচয় পাইনি। নিজেকে কখনও তিনি প্রকাশ করেননি যে, তিনি শিল্প ও ললিতকলার অনুরাগিণী,—তাঁর এই সংযমের কথা স্মরণ করে আমি অভিভূতের মতো চেয়েছিলুম। কেশব আমার পাশে বসে তন্ময় হয়েছিলেন কতক্ষণ।

এ যাত্রা ভ্রমণের তালিকা ছিল কিছু দীর্ঘ। হিমালয়ের চাম্বা উপত্যকা থেকে ফিরে পশ্চিম রাজস্থানে পাকিস্তানের সীমানা অবধি যাবো। সেখান থেকে যাবো সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে, এবং অতঃপর বোম্বাই ও পঞ্চবটী হয়ে ফিরবো। মোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল হিসাব করা আছে। হাতে দু-মাস সময়। চিতোর উদয়পুর যাবার চেষ্টাও রয়েছে। সুতরাং মনে কিছু তাড়া ছিল। আগামীকাল আমাকে রওনা হতে হবে।

পরদিন সকাল থেকে দিল্লীর কয়েকটি কাজ সারতে প্রায় গেল সারাদিন। 'ইন্দ্রপুরীতে' ফিরে এলুম অপরাহ্নে। কেশব উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে আটটায় কাশ্মীর মেল আমাকে ধরতে হবে, তারজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা স্বামী-স্ত্রী করে রেখেছিলেন। কিন্তু একটি 'নাটকীয় পরিস্থিতি' আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, এবং সেটির জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না।

কেশব বললেন, আপনি বলছিলেন যে, পাঁচ মিনিটে আপনি আপনার সকল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিতে পারেন। কথাটা কি সত্যি?

হেসে বললুম, বোধ হয় পাঁচ মিনিটও লাগে না!

কেশব বললেন, সবিনয়ে জানাই, আপনি বোধ হয় খবর রাখেন না, সংসারে আরও দু'একজন আছে—তারাও এটি পারে।

শুনে খুশী হলুম।

আমাদের চায়ের আসর বসেছিল। অনুভব করা গেল, পিছনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়ে হাসি টিপে স্বামীকে কি যেন ইশারা করছিলেন। আমাদের আলাপ চলছিল ছদ্মগাম্ভীর্যের সঙ্গে, এর পাশে হাসি পুঞ্জিত রয়েছে।

কেশব বললেন, যদি অভয় দেন তাহলে একটি অনুরোধ করি।

এবার হেসে ফেললুম,—ভূমিকাটা একটু দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

আপনাকে আর একবার জব্দ করতে চাই। মায়া যাবেন আপনার সঙ্গে।

মুখ তুললুম,—মানে? ঘর সংসারে মন নেই?

কেশব বললেন, আপনার অসুবিধে যাতে না হয় সেদিকে উনি দেখবেন। হিমালয় ওঁর ভালো লেগেছে। আপনার সঙ্গে যাওয়াটাই ত গৌরব।

থামুন দেখি?—প্রতিবাদ করে উঠলুম,—আপনার ঘরকন্না, রান্নাবান্না—এসব দেখবে কে?

কোনও অসুবিধে হবে না, আপনি বিশ্বাস করুন। আমাদের ক্যানটিন্ দেখেননি,—

সেখানে খাওয়া খুব ভালো।—কেশব আশ্বাস দিয়ে বললেন, রাত্রে পাশের বাড়িতে খাবো। ওঁরা আমার বিশেষ বন্ধু!

তেড়ে উঠলেন শ্রীমতী মায়া,—আপনাকে কষ্ট না দিলেই ত হলো! এবার আমিই সব দেখাশোনা করবো, আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। ভয় নেই, আর কিচ্ছু আপনার কাছে খেতে চাইবো না। নিজের মোটঘাট নিজেই বইবো। যদি দরকার হয়, একখানা কম্বল শুধু আপনার কাছে ভাড়া করে নেবো!

কেশব বললেন, আপনার জন্যই ওঁর হিমালয় বেড়ানো হলো।

বুঝতে পারা গেল আগে থেকেই স্বামী-স্ত্রী এ সম্বন্ধে পরামর্শ করে রেখেছেন এবং সেইমতো প্রস্তুতও হয়েছেন। সুতরাং ভালো করে সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করে নেবার আগেই দেখতে পেলুম সেই পাঞ্জাবী বন্ধুটির সাহায্যে 'প্যাটেলনগর' থেকে একখানা ট্যাক্সি আনা হলো, এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা চারজনে মিলে গাড়িতে উঠে দিল্লী স্টেশনের দিকে রওনা হলুম। হয়ত একেই বলে, ঘটনাস্রোতে ভেসে যাওয়া। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে দশ মাইল পথ গাড়ির মধ্যে বসে রইলুম। অবশেষে টিকিট কিনে গাড়িতে দুজনকে বসিয়ে দিয়ে গাড়ি ছাড়বার সময় জোর করে পায়ের ধুলো নিয়ে কেশব হাসিমুখে বিদায় নিলেন। কথা রইলো, পূজার ঠিক আগে ফিরবো।

গাড়ি ছাড়লো। প্রবল ভীড় ইন্টার ক্লাসে। নতুন ধরনের আজকাল-কার বাক্স-আকৃতি গাড়িগুলির মধ্যে যেন দম আটকায়। সেই ভয়ানক ঠাসাঠাসির মধ্যে কোনওমতে হাত দেড়েক স্থান পাওয়া গেল একমাত্র এই কারণে যে, জনৈক সুশ্রী তরুণী আছেন সঙ্গে! আরও জনতিনেক মহিলাযাত্রী ছিলেন ওই বাক্সের মধ্যে, তাঁরা একবার তাকালেন মায়ার প্রতি,—কিন্তু এক ইঞ্চি পরিমাণ নড়েও তাঁরা বসতে রাজি হলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ঘুমের মধ্যে আমার নাকের কাছাকাছি পা ছড়িয়ে ছিলেন।

ভিড়ের চাপে কষ্টের রাত্রি একসময়ে শেষ হলো। সকালে যখন পাঠানকোটে এসে পৌঁছলুম, মনে হলো কঠিন কারাগারের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলুম। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিলুম কিছুক্ষণ।

সেই অতি পরিচিত পাঠানকোট। সকল দৃশ্য থেকে চেনা জিনিসের ইশারা পাচ্ছি। প্রাচীন বন্ধুরা চারিদিক থেকে যেন দুজনকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন করছে, ভালো আছো ত? এই নিয়ে এক বছরে ছয়বার ঘুরলুম পাঠানকোট।

সেই পরিচিত হোটেলে এসে ঢুকলুম। হোটেলের সেই ছোকরা চেনামুখ দেখে হেসে নমস্কার জানালো। সেই ভিতর দিকের ছমছমে ঘরটিতে সেই ময়লা টেবিল—যার পাশেই হলো হাত ধোবার কল। ছেলেটা টোস্ট আর চা আনলো। টোস্টে মাখন লাগিয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

মায়াদেবী বললেন, বড্ড জব্দ হয়েছেন, না?

কোনটা শুনলে খুশী হন?

তিনি খুব হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সত্যি বলছি, ভ্রমণের কষ্ট লোকে ভুলে যায়, আনন্দটাই মনে থাকে। আজ অদ্ভুত লাগছে, যেন গেল বছরের ভ্রমণের সূত্রটাই ধরে আছি,—মাঝখানের এক বছরটা হারিয়ে গেছে।

বললুম, এবার কিন্তু আপনার গুপ্তসাহেব আমাকে অবাক করেছেন।

স্বামীর উল্লেখমাত্র মায়াদেবী উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, উনি ভাবেননি আপনি রাজি হবেন। ওঁর আনন্দ বলবার নয়। এই এক বছর ধরে উনি আমার কাছে আপনার গল্প শুনেছেন। কিন্তু আমার ভয় ছিল, আপনি রাজি না হলে উনি হয়ত একটু আঘাত পেতেন।

এবার প্রতিবাদ জানালুম,—কিন্তু স্ত্রীর মনে হিমালয়ের নেশা ধরলে তাঁর ঘরকন্না সামলাবে কে?

মায়াদেবী হেসে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, ভ্রমণে যে এত আনন্দ আগে জানতুম না।

মোটর বাসে গিয়ে উঠলুম, বেলা তখন প্রায় আটটা। এখান থেকে তিনটি পথ গেছে তিনদিকে। প্রথমটি জম্মু হয়ে সোজা শ্রীনগর, দ্বিতীয়টি ধরমশালা, কাংড়া ও মণ্ডিরাজ্যের দিকে, তৃতীয়টি 'চাম্বা' উপত্যকার পথে। কাশ্মীর হলো উত্তর-পশ্চিমে, চাম্বা উত্তর-পূর্বে এবং কাংড়া হলো পূর্ব-দক্ষিণে। 'চাক্কি' থেকে আমাদের পথ ঘুরলো উত্তরে। আমরা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তীয় উপত্যকায় প্রবেশ করবো। পঞ্চনদীর মধ্যে আমরা দক্ষিণবর্তী শতদ্রু ও বিপাশা দেখেছি বহুদূর পর্যন্ত, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উৎসঅঞ্চল প্রায় ঘুরে এসেছি,—এবার আমরা চললুম ইরাবতীর পথ ধরে। গিরিশ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে ইরাবতী নদী কোন্ পথ দিয়ে এসেছে আমাদের কিছুই জানা নেই। কিন্তু এইটুকু জানি, কুলু উপত্যকায় জন্ম নিয়েছে বিপাশা, লাহুল উপত্যকায় জন্মলাভ করেছে চন্দ্রভাগা তথা চন্দ্রা, এবং 'চাম্বা' উপত্যকার কোনও একস্থল থেকে বেরিয়েছে ইরাবতী।

'চাক্কির' ঘাঁটি-পাহারা ছেড়ে আমাদের মোটর চলেছে 'ভাটোয়া' হয়ে 'দুনেরা' গেট-এর দিকে। এটি নাতিউচ্চ উপত্যকাপথ। পার্বত্য, কিন্তু প্রায় সমতল। সমুদ্রসমতা থেকে এ অঞ্চল কমবেশী দু-হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু বোঝাবার জো নেই। এখানে পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ উভয়ে মিশ্রিত। একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর কোথায় ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক হদিশ মেলা ভার। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। হিমালয়ের স্বভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে ধীরে-ধীরে, কিন্তু উচ্চতা এসে পৌঁছয়নি। পাহাড়ের কোল এসেছে, এসেছে তার গায়ে-গায়ে অজস্র ফলন। গ্রামের সরোবরে কোথাও শ্বেত, কোথাও রক্তকমল ভেসে উঠেছে। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পৌঁছলো 'দুনেরা' বস্তিতে। এবার থেকে পথ একতরফা। ঘাঁটি-পাহারা এখানে গেট্ খোলে,—ওপক্ষের গাড়ি এসে পৌঁছলে এপক্ষের গাড়িকে যাবার অনুমতি দেয়! এটি হিমাচল প্রদেশের সঠিক সীমানা কিনা বলতে পারিনে।

কথা ছিল, শ্রীমতী মায়া এ যাত্রায় ভ্রমণটি পরিচালনা করবেন। সুতরাং আমি অক্রিয়, তিনি সক্রিয়। তিনি চায়ের হুকুম করলেন, এবং তিনিই জলযোগাদি আনালেন। পুরুষের প্রাধান্যের যুগ বোধ করি এবার শেষ হয়ে এলো, এবার নারীসমাজ। মেয়ে-পুলিশ, মেয়ে-উকিল, মেয়ে-হাকিম। ঝাঁসীররানী-ব্রিগেড্ দেখেছি নেতাজীর কৃপায়, নেহরুর কৃপায় দেখেছি মেয়ে-রাজদূত, গান্ধীজির কৃপায় দেখেছি মেয়ে-রাজ্যপাল, বিধান রায়ের কৃপায় মেয়ে-মন্ত্রী। এটি মহিলা যুগ। শ্রীমতী মায়া তদ্বির-তদারক করছিলেন। বলাবাহুল্য, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর লাভ হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছলুম প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পেরিয়ে 'বানীক্ষেতে'। বানীক্ষেত, —'রানীক্ষেত' নয়। এর মধ্যে থেমেছে অনেকবার, পেরিয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই। হিমালয় অনেকবার তার রাজমহিমা প্রকাশ করেছে, কোথাও কোথাও খরস্রোতা গিরিনদী

ত্বরিৎ গতিতে সামনে দিয়ে ঘুরে অভিসারিকার মতো ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। আমরা এতক্ষণে ইরাবতীর সীমানা পেলুম।

'বানীক্ষেতে' নামলুম। এখান থেকে ভিন্ন গাড়ি যাবে 'চাম্বায়'। আমাদের গাড়িটি চলে গেল নিকটবর্তী 'ডালহাউসী' পাহাড়ের চূড়ার দিকে। হাতে সময় অনেকক্ষণ। সুতরাং হাতের কাছেই এক ফার্লং এগিয়ে বাজারের ধারে 'জয়হিন্দ' হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা গেল।

বানীক্ষেত থেকে বাঁ-হাতি 'চাম্বা'র পথ। ইংরেজ আমলে সাহেবসুবোদের আনাগোনা কম ছিল বলেই 'চাম্বা' উপত্যকার পথটি ভালো হতে পারেনি। 'ডালহাউসী'র পথটি কিন্তু কলকাতার চৌরঙ্গী অপেক্ষা কম সুন্দর নয়, তবে অপ্রশস্ত। গাড়ি ছাড়লো,—তখন প্রায় বেলা পৌনে দুটো। এবার আমরা ইরাবতীর পথ ধরলুম। 'চাম্বার' পাহাড়ের কোলে তখন মেঘ নেমে আসছে। এখান থেকে আন্দাজ তিরিশ-বত্রিশ মাইল পথ। শ্রীমতী মায়া এবার গুছিয়ে বসলেন।

প্রায় মাইলখানেক পর্যন্ত এগিয়ে সহসা অনুভব করলুম, সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন আমাদের সামনে থেকে মুছে গেছে, এবং উন্মত্তা ইরাবতীর পাশে পাশে হিমালয় যেন এবার তার প্রকৃত অন্তঃপুরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে। শব্দজগৎ স্তব্ধ। একমাত্র শব্দ হলো ইরাবতীর প্রমত্ত গর্জন, এবং অন্য আওয়াজ মোটরের। সকালের জগৎ অপরাহ্নে যেন নিশ্চিহ্ন। এই পথ দিয়ে আমরা কোনও কালে কোথাও জনপদ আবিষ্কার করতে পারবো এমন মনে হচ্ছে না। বর্ষার আক্রমণে পথ ভেঙে গেছে পদে পদে, পাহাড় থেকে বড় বড় 'ঝোরা' নেমেছে, ধস নেমে পথ ভেঙে নীচের দিকে অতিকায় পাথর গড়িয়ে গেছে। অতি সঙ্কীর্ণ পথ। কোথাও ছায়া ছমছম করছে, কোথাও আতঙ্কজনক বাঁক। গাড়ির পিছনের চাকা এক-এক সময় সঙ্কট পেরিয়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ বোধ করছিনে। জন দশ বারো যাত্রী আমরা, কিন্তু সকলের মুখ শুকনো, এবং উদ্বিগ্ন। শীতকালে এ পথ এমন দুঃসাধ্য নয়। শুনলুম দু-তিনটি লোক সম্প্রতি পাহাড়ের ধস পড়ে এখানে মারা গেছে। গত তিনদিন আগেও গাড়ি চলাচল এদিকে বন্ধ ছিল। মনে পড়েছে তিস্তা-বাজার থেকে সিকিমসীমান্ত রংগীত নদীর পথ। বনময়, বন্য, জনহীন, প্রস্তরপরিকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথের সেই ভাঙন। যাত্রী সম্পূর্ণ নিরুপায়, সামনে ও পিছনে পার্বত্যপথের রেখাটি যোগচ্ছিন্ন। তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদো। কান্না শুনে জন্তু যদি বা আসে, একটি মানুষেরও দেখা পাবে না। দু-চারদিন পরে হয়ত আসবে পি.ডব্লু.ডি.-র লোক তদন্তে—দেখবে তোমার নাজেহাল। তারপর খবর যাবে যথাস্থানে। পাহাড়ের পথ যদি খদ থেকে অনেক উঁচু হয়, এবং সামনে-পিছনে ধস নামে,—তবে শিবের অসাধ্য! ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র দার্জিলিং ও সিকিমে এই ঘটনা ঘটে গেছে। দু-বছর লেগেছিল নিরাপদ করতে।

আজ এখানে সেই চেহারা দেখে যাচ্ছি। ফাটল দেখা দিয়েছে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, জল ঢুকেছে ভিতরে-ভিতরে। পাথরের ওজন কতক্ষণ টেনে রাখতে পাববে কে জানে, কতখানি ধস নামতে পারে তাও জানা নেই। ড্রাইভার মাঝে-মাঝে গাড়ি থামাচ্ছে, ডানপাশের পাহাড় এক একবার পর্যবেক্ষণ করছে, তারপর স্টার্ট দিচ্ছে গাড়িতে। কে জানে, সতর্ক থাকা ভালো। একটি ধস নেমে আসার অর্থ,—মোটরবাস ও যাত্রীর দল ইরাবতীর মধ্যে সমাধিস্থ! তার চেয়ে বড় কথা,—ছেঁচে-কুটে অপঘাত মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু এড়িয়ে আমাদের গাড়ি পালাচ্ছে পদে-পদে। ফিরে দেখি, মুখে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে

মায়াদেবী হেঁট হয়ে পড়েছেন। পাহাড়ের ঘূর্ণি লেগেছে তাঁর। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, গাড়ি কেমন করে পড়ছে গর্তের মধ্যে, কেমন কাত হচ্ছে, কেমন ভাবে আবার উঠছে। অপঘাত যদি ঘটে, তবে আনন্দের কথা এই—শ্রীমান কেশবের শোকতাপ দেখার জন্য আমাকেও বেঁচে থাকতে হবে না। ভয়ে ভয়ে কেবল এই কথাই ভাবছিলুম, এ যাত্রায় মায়াদেবীর আসা উচিত হয়নি। পথঘাটের চেহারা আগে জানলে ভালো হতো।

পাথরে-পাথরে মাথা ঠুকছে ইরাবতী, রণোন্মত্তা ভৈরবী যেন অসহ্য যন্ত্রণায় অবরোধ ভেঙে ছুটছে। ধবলাধার ছেড়ে পীরপাঞ্জালের প্রান্তগিরিলোকে প্রবেশ করছি। চম্পাবতীর সংবাদ আনছে ওপারের পাহাড়ী পাখিরা। দেওদারের অরণ্যে মাঝে মাঝে দলছাড়া পাইন উঠেছে আপন সৌন্দর্যমহিমা নিয়ে।

ঘন্টা তিনেক পরে এক স্থলে এসে সহসা গাড়ি থমকে দাঁড়ালো,—এর পর গাড়ি আর যাবে না। তখনও মাইল চার পাঁচ বাকি। এ অঞ্চল পাহাড়তলী, সুতরাং এরই মধ্যে দিনান্ত এসেছে ছমছমিয়ে। সামনেই ইরাবতীব ধারে বসেছে পুলিশ চৌকি। অদূরে একটি বড় পাহাড়ের বিরাট এক ধস নেমে এসেছে,—পথ বন্ধ। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে নেমে এলুম মালপত্র নিয়ে। দেখা গেল, আমরা ছাড়া অনেকেরই নিকট এ সংবাদটি বিদিত, অতএব তারা একে একে যে যার পথে পা বাড়ালো। আমরা পড়লুম একা। শূন্য মোটববাস পড়ে রইলো এক পাশে, ড্রাইভার গা ঢাকা দিল।

এটি নাকি বস্তি, নাম 'প্রেল্'। কিন্তু ওই পুলিশ চৌকির একটি সশস্ত্র লোক এবং একটি ঘোড়া,—এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখছিনে কোথাও। হঠাৎ এসে দাঁড়ালো দুটি কিশোর পাহাড়ী বালক পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে। তারা মাল বইতে পারবে জানালো। কিন্তু তাদের শীর্ণ চেহারা দেখে একেবারেই উৎসাহ পেলুম না। এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন।

কেমন যেন একটু বিব্রতই বোধ করে এবার ফিরে তাকালুম মায়াদেবীর দিকে। আর কিছু নয়, একজন ভদ্রমহিলার নিরাপত্তার প্রশ্ন! তাঁর স্বামী পাঠিয়েছেন গৌরবের সঙ্গে,—আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্ব—কোনও পর্যায়ই ইনি পড়েন না, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ সম্মানে রাখার স্বাভাবিক দায়িত্ব আছে বইকি। সুতরাং আসন্ন অন্ধকারের চেহারা দেখে একটু যেন ভয়ই পেলুম। বিরক্তিপূর্ণ অনুশোচনাও বোধ করলুম।

আমি আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।—এই বলে তিনি একদিকে একা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই আমি বাধা দিলুম ,—না, একা যাওয়া হবে না আপনার। আপনি বরং দাঁড়ান, আমি দেখি।

তিনিও মুখ তুলে তাকালেন। সে-মুখে হাসি। শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনি আমাকে একা ছাড়তে চান না, কিন্তু গুপ্তসাহেব আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন! কেন জানেন? তিনি চেনেন আমাকে!

পুলিশ চৌকির ওই সশস্ত্র লোকটিকে ডেকে নিয়ে মায়াদেবী এগিয়ে গেলেন, এবং দূর পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হলেন।

পাঁচ মিনিট গেল! দশ মিনিট কাটলো! পনেরো মিনিট হতে চললো। ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা ডেকে উঠলো সন্ধ্যায়। চৌকির ঘোড়াটা একবার সাড়া দিল। পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। বন্য পাখি পাহাড়ের কোথায় যেন ডানা ঝাপটিয়ে উঠলো। তিরিশ মি...হ্যাঁ, দূর থেকে এবার আসছে যেন দুটি ঘোড়া এদিকে। একটির উপরে নারীর আয়তন! আরেকটির

উপরে সশস্ত্র সেই পুলিশ। দম আটকে ছিল এতক্ষণ, এবারে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেললুম।

কাছে এসে লোকটি নামলো। পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালো দুটি ঘোড়াওয়ালা। পাশের ঘোড়াটির উপরে একদিকে দুই পা ঝুলিয়ে সহাস্যে বসে রয়েছেন মায়াদেবী। পুলিশের ওই লোকটির সাহায্যে বস্তি থেকে তিনি ওই ঘোড়া দুটি ও তাদের রক্ষীকে ধরে এনেছেন।

বিছানা পুঁটলী খুলে দু-খানা কম্বল বার করে দুটি ঘোড়ার পিঠে পাতা হলো। আরেকখানি গরম চাদর মায়াদেবী চেয়ে নিলেন। এবারে ভাগাভাগি করে সেই দুটি বালক ও অশ্বরক্ষী মিলে মালপত্রগুলি পিঠে তুলে নিল। পুলিশের লোকটিকে কিছু বকশিস দেওয়া হলো। মায়াদেবী এবার হঠাৎ জিম্‌নাস্টিক দেখিয়ে নিজেই টপাং করে উঠলেন ঘোড়ার পিঠে, তারপর চাদরখানা দিয়ে সামনের দিকে ঢেকে বসলেন। অশ্বরক্ষী একবার আমার দিকে তাকালো, তারপব তার 'চাম্বিয়ালী' ভাষায় বললে, মেমসাহেব ঘোড়ায় চড়াটা জানেন ভালো।

ঘোড়া দুটি না পাওয়া গেলে হয়ত হোঁচট খেয়ে-খেয়ে রাত্রে একসময় 'চাম্বা'য় পৌঁছতুম, কিন্তু খোয়ারের শেষ থাকতো না। মধ্যপথে একটি গিরিনদীর জলে খালি পায়ে নামতে হতো, অন্ধকার পথে সরীসৃপের ভয় থাকতো,—এবং পরিশেষে মালপত্রের কোনও ব্যবস্থাই করা যেত না। পথ এখন খুবই অন্ধকার। নদীর গর্জন শুনছি, কিন্তু দেখতে কিছু পাচ্ছিনে। ঝোপজঙ্গল এবং একটি পাহাড়ী বস্তির গা ঘেঁষে আমাদের ঘোড়া দুটি এগোচ্ছিল। কোথাও কিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। আলোর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

পাঁচ মাইল অত নয়, তার চেয়ে কম। সামনের দিকে একটি মস্ত পাহাড়ের অবরোধ ছিল, তাই অমন অন্ধকার জনশূন্যতা ছিল। আমরা পশ্চিম পথে মাইল দুই ঘুরে বনভূমির একটা অংশ পার হয়ে আসতেই দেখা গেল, দূরের পাহাড়ে রাত্রির আলো ঝিকমিক করছে। আর মাইল দুই। অশ্বরক্ষীরা সতর্কভাবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ছেলে দুটিও যাচ্ছে সাধ্যমতো মালপত্র পিঠে নিয়ে। মায়াদেবীর ঘোড়া সামনে এগিয়ে চলেছে। ঘোড়ার সঙ্গে তিনিও দুলছেন।

ক্রমে আমবা এসে পৌঁছলুম ইরাবতীর পুলের কাছে। এটি লছমনঝুলারই মতো কাছিটানা সাঁকো। কিন্তু আশে-পাশে সব অন্ধকারে একাকার। লোকজন এবার দেখা যাচ্ছে। দোকানপত্র দেখছি। পুলের নীচে দিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে নদী বয়ে চলেছে। পুল পার হয়ে ডানহাতি শহরের চড়াইপথ। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় অতি মৃদু ইলেকট্রিকের আলো জ্বালা হয়েছে। কিন্তু সেই আলো শ্রীনগবের রাত্রির আলোর মতোই মৃদু। ইলেকট্রিকের আলোর কথা আমার স্মরণ নেই,—আমাদেরকে তেলের আলো জ্বালতে হয়েছিল।

চড়াইপথে ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী পেরিয়ে আমরা উঠে এলুম শহরে। শহরে-প্রবেশের ঠিক মুখে একটি বিশাল তোরণদ্বার, কিন্তু তোরণটির বর্তমান নামকরণ কবা হয়েছে 'গান্ধী-তোরণ'। তোরণ পার হলেই ডানদিকে প্রশস্ত এক ময়দান, এটি নাকি পোলোখেলার মাঠ। শহরের বাজার আরম্ভ হয়েছে ঠিক তোরণের পর থেকে।

কিন্তু হঠাৎ রাত্রিকালে শহরের মধ্যে একজন অশ্বারোহীর সঙ্গে আরেকজন সুন্দরী অশ্বারোহিণী এসে প্রবেশ করবেন, এবং তিনি নিতান্ত অবলা লজ্জাজড়িতা নন—এটি বোধ করি চম্পাবতীর অধিবাসীমহলে কিছু কৌতূহল সঞ্চার করেছিল। সেজন্য মিনিট দুয়েকের মধ্যে শ'দুই লোক একটি মস্ত জনতার আকারে ঘিরে দাঁড়ালো, এবং তারা যখন

জানলো—আমরা পরিভ্রমণ করতে এসেছি তাদের এই সুন্দর ও মনোরম পার্বত্য উপত্যকায়, তখন তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থানটি দেখিয়ে দেবার উৎসাহে এগিয়ে এলো।

বাসস্থানটি হলো রেস্ট-হাউস, এবং সেটি ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোলে একটি নিরিবিলি মস্ত বাগানের মধ্যে। বাগানের ঠিক নীচে ইরাবতীর খদ, গভীরতলে নদী বয়ে চলেছে। এই বাগানে অজস্র পুষ্পলতা, সূর্যমুখী, গোলাপ এবং ডালিয়া থরে থরে প্রস্ফুটিত। মাঝে মাঝে রয়েছে ওক, আর পাইন, মাঝে মাঝে এক আধটি চীড়। নানাবিধবর্ণ অসংখ্য ফুল ও পুষ্পলতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দুই পাশে, কিন্তু এদের নাম মনে রাখতে পারলুম না কোনও কালে। যাই হোক, উদ্যানের এই শোভা আজও থেকে গেছে বোধ করি একটি কারণে। মাস দেড়েক আগে পণ্ডিত নেহরু এসেছিলেন চম্পাবতীতে,--ফলে, সর্বালঙ্কারভূষিতা হয়েছে চম্পাবতী! বন্য কৌমার্যের গায়ে জড়ানো হয়েছে মণিরত্নখচিত আভরণসজ্জা।

বাগানে এসে যখন আমরা ঢুকছি, দেখি রাত্রি সাড়ে সাতটা। দুইধারে বিশাল পর্বত বেষ্টন করে রয়েছে,—সেই কারণে এই উপত্যকায় রাত্রি ঘনিয়েছে একটু অকালে। বারান্দার উপরে টিপটিপ করছে একটি আলো, তার বাইরে সমস্তই আবছা। সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে একটি প্রকাণ্ড তির্যক ছায়া বাগানে নেমে এসেছে দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। দেখি, দ্বিতীয়ার অতি শীর্ণ বঙ্কিমচন্দ্র--রমণীর নখাগ্রের মতো—দূর পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হবার আগে তার শেষ সঙ্কেতটুকু রেখে যাচ্ছে। আকাশ ঝলমল করছে জ্যোতিষ্কে আর তারকায়।

অশ্বরক্ষীরা জিনিসপত্র নামালো। খানসামা এসে দাঁড়ালো সামনে। একটি অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ যুবা,—ভদ্র এবং লাজুক। আমরা যা কিছু প্রস্তাব করি , তাইতেই সে নতমুখে সম্মত হয় এবং সেটি প্রতিপালন করে। করে বটে, কিন্তু দেরি করে—এই যা অসুবিধা। দু-জন অশ্বরক্ষী এবং দুটি বালককে তাদের পারিশ্রমিক ও বকশিস দিয়ে বিদায় করা হলো। মায়াদেবী ছেলেদুটিকে কিছু খাদ্যও দিলেন।

ঠিক মনে নেই, খানসামার নামটি বোধ করি মহেন্দর।। সে এসে দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিল। পাশের ঘরটিতে এসেছেন একজন সৌম্যদর্শন 'এগ্রিকালচারাল ইনস্‌পেক্টর'। তাঁকে ডেকে আমরা আলাপ করলুম। আমাদের এ ঘরটি বেশ বড় এবং সুসজ্জিত। এধারে ওধারে প্রচুর আসবাবপত্র সাজানো। ঘরের দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড বাঘের ছবি,—স্বল্প আলোয় তার জ্বলজ্বলে চেহারাটা দেখলে ভয় করে। দূরের থেকে একজন শিকারী তার দিকে বন্দুক তুলেছে।

মহেন্দর পাঁচ মিনিটের চা পনেরো মিনিটে আনলো, তারপর স্নানের ঘরে গরম জলের ব্যবস্থা করতে লাগালো ঘন্টাখানেক। সব কাজেই তার দেরি। একটি ঘটি আনতে লেগে গেল দশ মিনিট। মায়াদেবী তাকে নৈশভোজনের ব্যবস্থা করতে বললেন বটে, তবে রাত বারোটার আগে সেই খাদ্য আমাদের মুখে উঠবে কিনা গভীর সন্দেহ।

দিনের আলোয় নতুন দেশে পৌঁছলে সমস্তটা আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া যায়। আলোয় হাওয়ায় তার প্রকাশের সঙ্গে একটি আত্মীয়তা ঘটে। আমরা রাত্রের দিকে এসেছি বলেই সমস্তটা সন্দেহে ভরা। কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, সেজন্য অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। ঘরের অথবা বারান্দার আলোটুকুতে যেটুকু প্রকাশিত, তার বাইরে এ জগৎটি হলো

ভৌতিক। সেই কারণে একজন কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আরেকজন তার সাড়া নিচ্ছি। ইচ্ছা করেই অনাবশ্যক কথা বলছি, কেননা ওইটুকু সোরগোলের মধ্যেই সাহস। রাত আন্দাজ সাড়ে নটার সময় ইনস্‌পেক্টর ভদ্রলোক তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করার আগে অনুগ্রহ করে বললেন, যদি কোনও দরকার হয় আমাকে ডাকবেন। আপনারা অবশ্য এ অঞ্চলে নতুন লোক, তবে এখানে ভয়ের কিছু নেই। আমি পাশেই রইলুম।

মায়াদেবী ভ্রূকুঞ্চন করে সহাস্যে বললেন, ভয় নেই বলে লোকটা যেন আরও ভয় পাইয়ে দিল! কই, আপনার মহেন্দরকে একবার হাঁক দিন দেখি!

বাইরে এসে হাঁক দিলুম, কিন্তু চমকে উঠলুম নিজের হাঁকে। সামনে কখন যেন সেই শীর্ণ চন্দ্রের ছায়া কৃষ্ণকায় ময়দানবের বক্ষপট থেকে মিলিয়ে গেছে। শুধু চরাচরব্যাপী রয়েছে নিঃঝুম অন্ধকার। বারান্দার আলোটা আর জ্বলছে না। চেতনার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে এলো আর একটি লোক,—মহেন্দর নয়। লোকটি বয়স্ক, রেস্ট হাউসের পাচক। তাকে বললুম, আমরা স্নান সেরে বসে আছি, বুঝেছ? খাবার-দাবার কই? মহেন্দর কোথা?

বাজার গিয়া।

বাজারে গেছে এতক্ষণে? মানে? জিনিসপত্র কিনতে?

জি হাঁ।

এর পর আর কিছু বলবার রইলো না। সঙ্গে আমাদের আর কোনও খাদ্য নেই। মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ঘরে গেলেন, আমি বারান্দার ধারে বসে অপেক্ষা করে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরেই এলো অবশ্য মহেন্দর। ঠাহর করে দেখলুম, কি-কি যেন তার সঙ্গে। রাগে গসগস করছিলুম। ছোকরা নিজের মনেই লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভিতর দিকে কোথায় যেন গিয়ে ঢুকলো।

ঘন্টাখানেক বাদে অনেক হাঁকাহাঁকির পর এবার সে খাবার আনলো আমাদের ঘরে। আলোটা বাড়িয়ে দিলুম। মুখখানা তার সত্যই সুশ্রী। বয়স বছর পঁচিশ। স্বাস্থ্যে ঝলমল করছে। কিন্তু আমরা উভয়েই তার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলুম। দুজনের একজন—কে তা আর মনে নেই—ফস করে প্রশ্ন করলুম, ঠোঁট দু-খানায় অমন করে রং মেখেছ কেন? তুমি কি মেয়ে?

মুখ তুললো মহেন্দর,—ক্যা?

মায়াদেবী হেসেই অস্থির। হাসিমুখে তিনি প্রশ্ন করলেন, এতক্ষণ কি করছিলে? আমরা যে ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করছিলুম!

মহেন্দর সবিনয়ে জানালো, সে 'নিমক' আর মাখন আনতে গিয়েছিল বাজারে, তবে পথে একটুখানি তাস খেলতে বসে গিয়েছিল!

তার এবম্বিধ সরল স্বীকারোক্তি শুনে আমরা অভিভূত হলুম। কিন্তু একথা সত্য, তার ওষ্ঠাধরের এ প্রকার লালবর্ণ পুরুষ মানুষের মুখে আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। আহারাদির পর যথারীতি সে এসে তেমনি বিনীত ভাবটি বজায় রেখে থালাবাসনগুলি নিয়ে চলে গেল।

রাত্রে শীত পড়েছিল। কিন্তু দিল্লী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম আবিষ্কার করলুম, বিছানার

কোনও পুঁটলী মায়াদেবীর সঙ্গে নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় ওটার কথা তাঁর মনেই পড়েনি। তাঁর এই শিল্পীজনোচিত জীবনবৈরাগ্য নিয়ে পরিহাস করতেই তিনি বললেন, বিশ্বাস করুন, আমার ঠাণ্ডা লাগে না, অসুখও করে না। শীতের রাত্রেও এক-একদিন নাচের আসর থেকে ফিরে গলগল করে ঘাম পড়েছে, গায়ে ঢাকা না দিয়েই ঘুমিয়েছি।

'চাম্বা' উপত্যকার প্রকৃত নাম 'চম্পাবতী'। দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনীটির সত্য-মিথ্যা কখনও নিরূপণ করার চেষ্টা পাইনি, কিন্তু তারই অনুরূপ একটি কাহিনী এককালে এই উপত্যকায় ঘটেছিল। চম্পাবতী ছিলেন রাজদুহিতা, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। কোনও এক ভিনদেশী সৌমদর্শন তরুণের সঙ্গে তিনি প্রণয়াসক্ত হন, এবং সম্ভবত গোপনেই তাকে বিবাহ করেন। রাজকন্যার এবম্প্রকার বিবাহ এবং জীবনযাত্রা পিতার পক্ষে আনন্দদায়ক হয়নি এবং যখন সেই তরুণের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে,—চম্পাবতীও সেই চিতার আগুনে ঝাঁপ দেন। এখানকার প্রধান একটি মন্দিরের নাম 'চম্পাবতী'—ভিতরে যাঁর মূর্তি রয়েছে তিনি হলেন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা।

পরদিন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। দূর হিমালয়ের অন্তরালে,—জনতার সর্বপ্রকার কলরব-কোলাহলের বাইরে চম্পাবতী যেন তপস্বিনী। চারিদিকে বিরাট হিমালয়ের অন্তহীন একটির পর একটি উত্তুঙ্গ স্তর,—পৃথিবী এখানে অচল অবরোধে সম্পূর্ণ বন্দিনী। 'লস্ট্ হোরাইজন্' গল্পটি মনে পড়ে, হিমালয়ের আকাশপথে একটি উড্ডীন বিমান যখন 'লাসা'নগরী আবিষ্কার করে। চম্পানগরীও তেমনি হিমালয়ের গহনলোকে যেন একটি নিরুদ্দেশ হারানো শহর।

চম্পাবতীর এই পার্বত্য পরিবেষ্টনের একদিকে জম্মু ও কাশ্মীর, অন্যদিকে লাহুল, জাস্কার ও লাডাখ,—এই দুইয়ের মধ্যালোকে দুর্গম ও গগনস্পর্শী পীরপাঞ্জালের নীচে দিয়ে চলে গেছে চন্দ্রভাগার প্রবাহ। এপারে চম্পাবতী, ওপারে লাহুল। সমগ্র পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা এই অঞ্চলে কুড়ি থেকে বাইশ হাজার ফুট। চম্পাবতী, লাহুল ও কুলু উপত্যকাই হলো পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা। লাহুলের দক্ষিণে কুলু। চম্পাবতীর দক্ষিণে ধবলাধার অতিক্রম করলেই কাংড়া উপত্যকায় পৌঁছনো যায়। গত বছর এমন দিনে আমরা কাংড়া ও কুলু ভ্রমণ করছিলুম।

চম্পাবতীর পার্বত্য উপত্যকার আয়তন হলো ৩,২১৬ বর্গমাইল, এবং জনসংখ্যা সওয়া লক্ষর কিছু বেশী। চম্পা শহরে মাত্র ৬,০০০ নরনারীর বসবাস এবং চাষবাস পশুপালনাদি তাদের উপজীবিকা। এই উপত্যকা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত, এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতে এর উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র উপত্যকাকে বেষ্টন করে রয়েছে বিরাট এক একটি গিরিশৃঙ্গ,—হাতীধর, ধবলাধর, পাঙ্গীশ্রেণী, মণিমহেশ, দাগানিধর, ছত্রধর এবং জাস্কার। চম্পার অধিবাসীগণের মূল পরিচয় হলো, তারা রাজপুত এবং রাঠোরবংশীয়। চম্পাবতীতে এরা 'রাঠ' নামে পরিচিত। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, তাতার, পাঠান এবং মোগলযুগে রাজস্থানের একটা বড় অংশ যখন টুকরো-টুকরো হয়ে হিমালয়ের নানা পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আঞ্চলিক আদিবাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করতে থাকে,—এই 'রাঠ' সম্প্রদায় তখন হয়ে ওঠে তাদেরই একটি ভগ্নাংশ। নেপালে, কাংড়ায়, মণ্ডিতে, বিলাসপুরে, কুলুতে এবং আরও অনেক অঞ্চলে রাজস্থানী রাজপুতরা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। পাঞ্জাবী হিন্দু,

যাদের অনেকটা অংশ রাজপুত, এবং রাজস্থানী রাজপুত,—এই দুইয়ের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য থেকে গেছে বইকি। হিমাচল প্রদেশে ভ্রমণকালে যে কেউ অনুভব করবে, পাঞ্জাব অপেক্ষা বাঙলার আবহাওয়া ওখানে সুপ্রত্যক্ষ। বাঙলায় যেমন মনসা ও শীতলাদেবীর পূজা চলে, চম্পাবতীতেও প্রায় তাই। শীতলা ওখানে হিংস্র ও কঠোর মূর্তিতে প্রকট; বহু অঞ্চলে বাঙলার 'নাগ-পঞ্চমীর' মতো মূর্তির সঙ্গে সাপ জড়িয়ে সাপের পূজা দেওয়া হয়। 'নাগ' এবং 'মহানাগ' মন্দির অথবা 'দেওল' যেখানে সেখানে। জাতিতে বা সম্প্রদায়গতভাবে এরা 'নাগ' অথবা 'নাগা'—এমন কোনও খবর পাইনি। এরা আমাদের মতোই সর্পপূজারী মাত্র। সাপের উৎপাতও চম্পাবতীতে প্রচুর। গোখরো, বোড়া, শঙ্খচূড় এবং 'রাতির' নামক সাপ খুব দেখা যায়। চম্পাবতীর নিজস্ব যেটি ভাষা, সেটির নাম 'চাম্বিয়ালী'। সেটি পার্বত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী মেশানো। একই ভাষা ঘুরেছে অনেক দিকে এবং অনেক দেশে, মাঝে মাঝে কেবল তার আঞ্চলিক আওয়াজটি বদলেছে।

চম্পাবতীর 'বর্মা' রাজবংশ এককালে ছিল অভিজাত। তারা ছিল প্রবল শক্তির পূজারী। কোনও কালে এরা কেন্দ্রীয় প্রভুত্বের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেনি। এরা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতের থেকে এরা নিজেদেরকে কখনও পৃথক মনে করেনি। ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে এরা বৃহতের সঙ্গে আত্মিক যোগ কখনও হারায়নি। ইউরোপের খ্রীস্টান রাজনীতিতে আমরা যে অসভ্যতা দেখে আসছি একশো বছর কাল থেকে, এদেশে সেই প্রকার রাজনীতি অনেক কম। হিমালয়ে তার চেয়েও কম। পররাজ্যের প্রতি লোভ ও জুলুম, পরের ঘরে অশান্তি বাধাবার ফন্দি, পরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ও হুমকি, পরের উপরে প্রভুত্বের চেষ্টা,—এই রাজনীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধাতে সয়নি। বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র দেশ ভারতবর্ষ যেখানে দুই প্রকার মহাসম্মেলন আহ্বান করে মানুষের সঙ্গে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মিলনের চিরকালীন চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো ধর্ম মহাসম্মেলন এবং অন্যটি হলো 'মহাকুম্ভের মেলা'। ভারতের প্রায় সর্বত্র আজও সেই সম্মেলন এবং শত-সহস্র বাৎসরিক 'মেলা' তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এইসব সম্মেলন এবং 'মেলা'র না আছে বিজ্ঞাপন, না বা প্রচারকার্য,—হয়ত পঞ্জিকার এক কোণে ছোট্ট একটি উল্লেখ আছে, এবং সেইটিই যথেষ্ট। শতে, সহস্রে, লক্ষে—ছুটে আসবে নরনারী দেশ-দেশান্তর থেকে। তখন দেখি একটি মাত্র তীর্থপথে ভারতের সকল জাত এবং শ্রেণী একাকার হয়ে থাকে।

চম্পাবতীর প্রাচীন রাজধানী হলো, ভ্রামর। কেউ বলে, ব্রহ্মহর। চম্পানগরী থেকে ইরাবতীর তীরে তীরে পূর্বপথে অগ্রসর হলে আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল দূরে 'ভ্রামর'। এই নগরীর বন্য পার্বত্য শোভা অতি মনোরম। এখানে 'বর্মা' বংশ ছিল বহুকাল। আদিত্য বর্মা, লক্ষ্মী বর্মা, শহিলা, সোম, উদয়, গণেশ, প্রতাপ সিং, বলভদ্র, পৃথ্বী সিং, ছত্র সিং, শ্রী সিং, গোপাল সিং, শান সিং, ভুরি সিং ইত্যাদি বহু নরপতির শাসনকাল ছিল। চম্পানগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে, তাও বহুকাল। এই উপত্যকার দুইদিকে, অর্থাৎ ধবলাধার ও পীরপাঞ্জালের মধ্যস্থলে বহু দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থস্থান আজও এখানকার শিবশক্তি উপাসনার গৌরব বহন করে চলেছে। তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর, শিখর, লছমণ, শক্তি, চামুণ্ডা, ভগবতী, বংশীগোপাল ইত্যাদি প্রধান। চম্পাবতীর সর্বপ্রধান যে কটি উৎসব, তাদের মধ্যে পহেলা বৈশাখের নববর্ষ উৎসব একটি। এছাড়া পহেলা ভাদ্রে

একটি উৎসব হয়, সেটির নাম 'পত্ররু' সংক্রান্তি,—সেটির সঙ্গে বোধ করি বর্ষার সাফল্য ও সার্থকতার যোগ আছে। তারপর হলো 'মণিমহেশের' বিরাট উৎসব ও মহাসম্মেলন। এটির নাম 'মাশরু'। এই মেলাটি শিব-পার্বতীর নামে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকটা 'কুলুর' দশহরা উৎসবের মতো। 'মণিমহেশে'র এই মেলায় সমগ্র চম্পাবতীর নর্তকীরা এসে জড়ো হয় এবং তাদের আলুথালু ও জীবনমরণ মাতানো নাচ দেখার জন্য বহু দূর দেশ থেকেও পর্যটকরা আসে। সেই নাচের নাড়া খেয়ে কমলকোরক রক্তপদ্মে পরিণত হয়। জ্যোৎস্নারজনীতে পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যসভা বসে যায়।

'খাজিয়ার' তথা 'খাজার' এখান থেকে প্রায় আট মাইল চড়াই পথ। সেখানকার পাইনবন এবং সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে কাশ্মীরের গুলমার্গ মনে পড়ে। অতি নিরিবিলি এবং নিভৃত নিকুঞ্জলোক। নিকটেই একটি প্রাচীন দেবস্থান,—নাম 'খাজিনাগ'। সেখানকার জনবিরল ডাকবাংলার বারান্দায় বসে অনেক পথের অনেক পথহারানো পাখি তাদের প্রাণের প্রলাপ-গুঞ্জন করে চলে যায়।

দিন দুই ঘুরে-ঘুরে আমরা বেশ পরিশ্রান্ত। গত বছর মায়াদেবী ছিলেন গম্ভীর, এবার হুজুগে মেতেছেন। কলরব তুলছেন পথে-ঘাটে। নাচ দেখছেন, গান শুনছেন, ফটো যোগাড় করছেন। টিলাপাহাড়ের ওপর চম্পাবতীর রাজপ্রাসাদ,—তার মধ্যে রয়েছে চিড়িয়াখানা,—সেখানে নানা পশুপক্ষীর মেলা। মায়াদেবী ঘুরছেন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে আর অন্তঃপুরের আশে-পাশে। সঙ্কীর্ণ পথ পেরিয়ে মস্ত দেউড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকছেন লছমীনারায়ণের মন্দিরে, এদিকে গণেশের মন্দির, ওধারে চামুণ্ডা, তারপর ভগবতী। কোথাও পুজো দিচ্ছেন, কোথাও বা মেয়েদের জড়ো করছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি হাটতলার পাশ দিয়ে দোকানপাতি ছাড়িয়ে ছোট ময়দানের সামনে 'ভুরি সিং' যাদুঘরে,—যেখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং তৎসংলগ্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী সুরক্ষিত।

আমরা বড় শহুরে মানুষ,—এখানকার কোনওটাই আমাদের কাছে নতুন নয়। এখানে সব রকমের প্রতিষ্ঠান প্রায় পাশাপাশি,—আধঘন্টার মধ্যে দেখা শেষ হয়ে যায়। প্রাসাদে আর কোনও বিস্ময় নেই,—বিস্ময় আছে মানুষের বৈশিষ্ট্যে এবং সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য পরিচয়ে। ঠিক তথ্য-সংগ্রহ নয়। কিন্তু দেখতে চাচ্ছি সেই বস্তু, যা দেখিনি কোনওদিন। জীবনের নিবিড় পরিচয়টুকু জানতে চাচ্ছি, যেটি রয়েছে পাহাড় পর্বতে জড়িয়ে, যেটি রয়েছে আদি অধিবাসীদের ঘরকন্নার মধ্যে ছড়িয়ে। যাদুঘর, হাসপাতাল, পৌরভবন, প্রসূতিসদন,—এসব দেখার জন্য আসিনি, এসেছি চম্পবতীর প্রাণের ইতিহাস পাঠ করে যেতে,—যেটি তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

চম্পাবতীর সামন্ত নরপতি ছিলেন এই সেদিন অবধি; এখন ভারত গভর্নমেন্টের নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার বসে রয়েছেন শাসনকার্য নিয়ে। তাঁরই সৌজন্য ও সহায়তায় আমরা জানবার ও বুঝবার সুবিধা পেলুম অনেক। চম্পাবতীর পায়ে ছিল শৃঙ্খল,—আজ শৃঙ্খলের পরিবর্তে নূপুর। ইরাবতীর তীরে-তীরে সেই নূপুর 'ঝুমুর-ঝুমুর মধুর' হয়ে বেজে চলেছে। চম্পাবতী আজ চোখ মেলেছে। কাজ তুলে নিয়েছে অনেক। কুটির-শিল্পের নানাবিধ ফরমাশ নিয়ে সে নতুন জীবন আরম্ভ করেছে। ডেপুটি কমিশনার মহাশয় চম্পাবতীর সমস্ত পরিচয় আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। অনেক ক্ষেত্রে দলিলপত্রও তিনি

বার করে দেখতে দিলেন।

'হরিরায়ের' মন্দিরের পাশ কাটিয়ে ময়দান পেরিয়ে আমরা রেস্ট হাউসের সেই নন্দনকাননে এসে ঢুকলুম রাত্রের দিকে। সেই এগ্রিকাল্‌চারাল্ ইন্‌স্‌পেক্টর ভদ্রলোক চলে গিয়েছেন। অন্ধকারে থমথম করছে দু-খানা শূন্য হলঘর। মহেন্দর তাদের মহলে আছে কিনা কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাগানের গায়ে বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে একটি আবছা পথ উঠে কোন্‌দিকে যেন হারিয়ে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে একবার হাঁক দিলুম মহেন্দরকে, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। আজকে আর আলোও জ্বলেনি বারান্দায়।

আন্দাজে-আন্দাজে এগিয়ে ঘরের চাবি খুললুম, কিন্তু হারিকেন লণ্ঠনটি খুঁজে বের করার জন্য চার-পাঁচটি দেশলাইর কাঠি জ্বালাতে হলো। হঠাৎ এতক্ষণ পরে মনে পড়ে গেল, কেরোসিনের অভাবে গত রাত্রে আলোটা কখন এক সময় নিভে গিয়েছিল। লণ্ঠনটা তেমনি শূন্য অবস্থাতেই রয়ে গেছে। মোমবাতি কেনার কথা মনেই পড়েনি।

মায়াদেবী বোধ করি আমার মুখের চেহারাটা অনুমান করেছিলেন। বললেন, মহেন্দর আসবে ঠিক সময়, ভাববেন না। শুনুন, বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে আপনি যেন রাগারাগি করবেন না! আর ত আজকের রাত্তিরটা!

পরদিন প্রভাতেই আমাদের যাত্রা। কাল রাত্রের তিরস্কার মহেন্দর ভোলেনি। আজ প্রত্যুষে চা ও কিঞ্চিৎ প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে দিল। নির্দিষ্ট সময়ে ঘোড়াওয়ালারা দুটি ভদ্রগোছের ঘোড়া এনে বারান্দার নীচে হাজির করলো। সকাল তখন সাতটা। রাঙা রৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। নীচের উপত্যকায় তখনও প্রভাত এসে পৌঁছয়নি। মধুর ঠাণ্ডায় চম্পাবতীর চোখে তখনও সুখের তন্দ্রা জড়ানো। মহেন্দরের পাওনা এবং বকশিস মিটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

ঘোড়াওয়ালারাই আমাদের মালপত্র সঙ্গে নিল। মায়াদেবীর একটি সুটকেস এবং ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা উৎরাই পথে ইরাবতীর তীরে নেমে সাঁকো পার হয়ে ঘোড়ায় উঠলুম।

পাখির কণ্ঠে প্রভাতী বন্দনা চলছিল। বনময় বস্তি ও পাহাড়তলীর ধারে ধারে আমাদের ঘোড়া দুটি চললো। আবার আমাদের যেতে হবে সেই 'প্রেল্' নামক পুলিশ চৌকি পর্যন্ত, সেখানে মোটরবাস পাবার কথা। গিরিনদীটি পার হয়ে দূর পথে অগ্রসর হলুম। সূর্যকিরণ নেমেছে তখন ইরাবতীতে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ডালহাউসী (চাম্বা)

ধবলাধারের প্রান্তভাগেই নামছি। নীচে নেমে আবার ঘুরে যাবো পশ্চিমে। সেই একই ইরাবতীর ধারাপথে ফিরে যাচ্ছি,—প্রেল্ থেকে 'বানীক্ষেত',—রানীক্ষেত নয়। সেই পাহাড়ের তলায় তলায় ভাঙন, আর ধস নামা। সেই সঙ্কট আর অপমৃত্যুর ভয়,—সেই পাশে-পাশে বন্য আর পার্বত্য ছায়াচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে লীলায়িত ইরাবতী পাথরে-পাথরে আছাড় খেয়ে ছুটেছে। কালো-কালো অতিকায় পাথর পড়ে রয়েছে নদীতে এক একটি মহিষাসুরের মতো,—মহিষমর্দিনী ইরাবতী রণোন্মত্তা হয়ে তাদেরকে দলন করে চলেছে।

ভয় আর পাচ্ছিনে। ভয়েতেও অভ্যস্ত। ড্রাইভারের হাতে যদি স্টিয়ারিং ঠিক থাকে, তবে আমাদের মৃত্যু ঘটানো শিবেরও অসাধ্য। সুতরাং আর ভয় পেতে চাইনে, ওটা হলো মনের একটি বিশেষ অংশের পঙ্গুতা। মৃত্যু কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে মৃত্যুভয় কমে যায়। হাসপাতালের ডাক্তার মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত। মানুষ মরছে, সহকারীদের সঙ্গে তিনি চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছেন। শ্মশানের মুর্দাফরাস চিতার আগুনে বিড়ি ধরায়। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে মড়া সাজিয়ে নীচের দিকে সিঁড়ি বানিয়ে সৈন্যরা মাথা তুলে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে। সবই এক সময় অভ্যাস হয়ে যায়। সাধুসন্ন্যাসী যখন নদী-পাহাড়ের ধারে কোথাও মরে পড়ে থাকে, তখন আরেক সাধু সেই পথ দিয়ে যাবার সময় অবশ্য মৃতের ঠ্যাং ধরে নদীতে ফেলে দিয়ে যায়,—কিন্তু মৃতের শেষ সম্পত্তির সেই হয় উত্তরাধিকারী। হয়ত সে খুঁজে পায় একটি ছোট্ট কল্‌কে, এক খাবল কাঁচা তামাক, কিংবা এক টুকরো গাঁজার জট, আর নয়ত বা এক বড়ি অহিফেনসদৃশ চরস,—ব্যস। ওইখানে বসেই কল্‌কেটি সেজে আগুন দিয়ে দম্‌ভোর টানে দুই টান। চোখ রাঙা করে ওই পরলোকগত উলঙ্গ অদ্বৈতবাদীর দিকে একবার তাকিয়ে বলে যায়,—ইয়া, বোম্ শিউয়াশঙ্কর!—মৃত্যুভয় ও শোকের সংস্কার তাকে স্পর্শ করে না।

সবই অভ্যাস। মন আমাদের নিত্যই জীর্ণ হতে থাকে কয়েকটি সংস্কারে। ভয় তার মধ্যে প্রধান,—কেননা পিতামাতার অশিক্ষাদানের ফলে শৈশব থেকে ভয় চেপে বসে সন্তানের মনে। ভূতপ্রেতের ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়, সেপাই-সান্ত্রীর ভয়, অপঘাত সম্ভাবনার ভয়,—আরও নানাপ্রকারের ভয়। তার সঙ্গে জোটে ব্যাধি ও বেদনাবোধ, সুখ-দুঃখবোধ, শোক-তাপবোধ, জরা-বিকার-হিংসা-ঘৃণা-লোভ-কামবোধ ইত্যাদি এরাও পেয়ে বসে ওই সঙ্গে। ফলে, মানুষ হয়ে ওঠে বিভিন্ন বৃত্তির একটা সংমিশ্রণ। এদের থেকে মুক্তিই হলো প্রকৃত মুক্তি। এইটিই মানুষের চিরকালীন ক্ষুধা। সংসার পিছন থেকে টানছে এদেরই চক্রান্তে টেনে ফেলবার, ওদিকে বেদান্তবাদ টানছে অসীম আদি অন্তহারা মুক্তি চৈতন্যের দিকে। দুইদিকের দুই টান,—মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ। এই দোটানার মধ্যে পড়ে মানুষ গুরু খোঁজে, সাধুসন্তর কাছে ধরনা দেয়, তীর্থপথে ছোটে, মন্দির বানায়, কীর্তনের আসরে গিয়ে বসে, কিংবা পিঁপড়ের গর্তে চিনি দেয়। সব পেয়েও আনন্দ নেই, এই হলো

সুখী মানুষের দুঃখ; সব ছেড়েও আনন্দ পাওয়া যায়, এই হলো জ্ঞানী মানুষের ভাষ্য। সেই কারণে সুখী মানুষরা যখন আনন্দলাভের অসীম ক্ষুধায় দুঃখ বরণ করে, সংসারী লোকরা তখন চমকে ওঠে। শাক্যসিংহের পলায়ন দেখে ভারতবর্ষ একদা তেতে উঠেছিল। নিরাসক্ত, স্বচ্ছ এবং নির্বিকার আনন্দই একমাত্র বস্তু,—যেটি আপন অন্তর্যামীকে ঘিরে মধুর স্বর্গ রচনা করে।

ছাব্বিশ মাইল পথ। ওই পথটিতে পড়েছিল অমর্ত্যলোকের ছায়া। যা কিছু দেখি,—বস্তুমাত্রই অভিজ্ঞতা। জীবনের পরম আস্বাদ হলো অভিজ্ঞতায়। অনেক বই পড়েছে অনেকে, অনেক পণ্ডিত অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছে। কিন্তু পৃথিবীকে সে পাঠ করেনি, জীবনের পৃষ্ঠা ওলটায়নি। শাস্ত্র দেয় ভাষ্য আর ব্যাখ্যা, কিন্তু অভিজ্ঞতা দান করে না। অভিজ্ঞতাই জীবন। তার বৈচিত্র্যে অপরিসীম কৌতুক, তারই সংঘাতে আশ্চর্য নাটকীয়তা। গতি আছে বলেই গ্রহণ করতে পাচ্ছি, দেখছি বলেই অভিজ্ঞতালাভ করছি। বুদ্ধিতে পাই, চেতনায় পাই, জ্ঞানে পাই, দুঃখ ও আনন্দে পাই, দুর্যোগে-বেদনায়-ভালোবাসায় সর্বপ্রকারে পাই। পাণ্ডিত্যের মধ্যে এই পাওয়া নেই,—সেইজন্য পাণ্ডিত্য হলো শূন্য, জ্ঞান হলো সমৃদ্ধ। জ্ঞানের জন্ম অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানের প্রকাশ জীবনসাধনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রিলাভের কালে স্নাতকরা যখন আশীর্বাদ লাভ করে, তখন প্রথম কথাটাই হলো—বাইরে এসে দাঁড়াও জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, ওইখানেই তোমাদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রথম আরম্ভ। তোমরা গতিলাভ করো, অভিজ্ঞতা অর্জন করো,—সেই হবে তোমাদের জ্ঞানের প্রথম সোপান।—স্নাতকরা সেই মন্ত্র কানে নিয়ে নবজীবন রচনার কাজে এগোয়।

সভ্য জগতের চেতনার মধ্যে যখন এসে পৌঁছলুম, তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শেষের ছাব্বিশ মাইল পথ একপ্রকার প্রাণিশূন্য ছিল। পাহাড়ী উপত্যকার বহুদূর নীচের দিকে এক আধটি শ্লেট-পাথরের ছাদওয়ালা ঘর দেখতে পেয়েছিলুম, কোথাও কোথাও এক-আধ টুকরো আকস্মিক ফসলের ক্ষেত,—নইলে সবটাই আদি প্রকৃতির বন্যতায় আর পাথরের জটলায় একাকার। নীচে দিয়ে উঠে গেছে পাহাড়, দিগন্তকে অবরোধ করে রেখেছে চারিদিক থেকে। বিস্ময়ের সীমা নেই।

মায়াদেবী এবার বললেন, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! বেপোট্ জায়গায় না গেলে বুঝি আপনার হিমালয় দেখা হয় না?

হাসলুম। বললুম, মেজাজটি আপনার ভালো নেই। কারণটাও বুঝেছি। আসুন, সেই আমাদের 'জয়হিন্দ্' হোটেল!

তিনিও তাড়না করতে ছাড়লেন না।—বটে? ক্ষিধের জ্বালায় আপনিও চুপ করে গিয়েছিলেন ঘন্টা চারেক। মনে নেই?

বানীক্ষেত বাজারের সেই হোটেলওয়ালা আমাদের চিনে রেখেছে। ফর্সা পাতলা চেহারা, সামনে উনুন জ্বালিয়ে সে খাবার বানাচ্ছিল। ভিতরে কয়েকখানি ময়লা বেঞ্চি ও হাতল-ভাঙা চেয়ার। ঘরের দুই ধারে খান দুই চারপাই, তার থেকে ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। এক কোণে একটি জলের 'টাঙ্কি'। তারই উপরে কয়েকটি পিতল-দস্তায় বানানো গেলাস। ভাত-রুটি-তরকারি এখানে মিলবে। দোকানের সামনে সুন্দর ও মসৃণ রাজপথ,—পাঠানকোটের দিক থেকে এসে ডালহাউসীর দিকে গেছে। হিমাচলের কোলে আবার মেঘ নেমেছে।

হোটেলের ভিতরে ঢুকলুম। খাদ্যাদির সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অনেককাল পরে একটি নতুন ধরনের গন্ধ পাচ্ছি, সেটি হলো খাঁটি ঘিয়ের। আজ বোঝা গেল, শাস্ত্রবাক্য কত সত্য,—অর্থাৎ ঘ্রাণের দ্বারা আমরা অর্ধভোজন করে থাকি। দোকানে হিন্দু এবং মুসলমানী দু-রকমেরই আহার্য থরে থরে সাজানো,—ঘৃত এবং মসলা সহযোগে তারা বর্ণাঢ্য। প্রশ্ন করলুম, কোন্‌টা খাবেন, বলুন? হিন্দু, না মুসলমান?

মায়াদেবী আজ ফোয়ারার মতো অনর্গল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ওদিকে চেয়ে বললেন, উভয়ের মিলনেই ত আনন্দ!

হোটেলওয়ালার আনুকূল্য ছিল প্রচুর। চিবিয়ে, চুষে, চেটে এবং গিলে অবশেষে যে প্রকার কায়িক অবস্থা দাঁড়ালো, তাতে আর যাই হোক—ভ্রমণ করা চলে না। কেউ যদি তখন বলতো, থাক তোমার ডালহাউসী, চলো প্লেনে চড়িয়ে তোমাকে সেই কলকাতার বাড়ির ছাদে নামিয়ে দিয়ে আসি, বোধ হয় রাজি হয়ে যেতুম।

আহারাদির পর উদ্গার উঠলো। মায়াদেবী বললেন, জয়হিন্দ্‌!

কথাটা শুনে হোটেলওয়ালাটি হাসলো বটে, কিন্তু আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একটি দিনের গল্প। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। কলিকাতার পথে পথে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা। চারিদিকে যানবাহন আর কলরব। সেদিন মদের দোকান বন্ধ ছিল কিনা জানিনে। কিন্তু পথের ধারে সেই বিপুল জনতার একান্তে বসেছিল একটি লোক এক বোতল মদ হাতে নিয়ে। কানে তার জবাফুল গোঁজা। সেই জনতার দিকে তাকিয়ে লোকটা নিজের মনেই আনন্দ করে বলছিল, অনেক দুঃখে স্বাধীনতা পেলুম, বাবা!—জয় হিন্দ্‌!—এই বলে মদের বোতলটি ধরে সে ঢালতে লাগলো গলার মধ্যে!

হোটেলওয়ালার কাছে শুনলুম, এখানে কোথায় যেন পান পাওয়া যায়। ভাবলুম, পান কিনে এনে মায়াদেবীকে চমক লাগাবো। পান আনবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। খুঁজে খুঁজে এক সময় দোকানও পাওয়া গেল। কিন্তু সেই পান নিয়ে ফিরে এসে দেখি, দড়ি ছেঁড়া সেই খাটিয়াখানায় শুয়ে মায়াদেবী অগাধে নিদ্রা যাচ্ছেন। অত্যন্ত ময়লা একটি তুলোবারকরা লেপ তলায় পাতা, এবং তিনি গায়ে তুলে নিয়েছেন সব চেয়ে নোংরা একখানা ছিন্নভিন্ন কম্বল। এটি হোটেলওয়ালারই সংসারযাত্রা, এবং এইটুকুরই মধ্যে,—কিন্তু হোটেল-ওয়ালাও মায়াদেবীর নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে একটু অবাক।

স্বামী-স্ত্রী মিলে ভেবেচিন্তেই এই দুরবস্থা ঘটিয়েছেন, সুতরাং আমার ভাববার আর কিছু রইলো না। থমকে একবার দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ছত্র স্মরণ করে সান্ত্বনা পেতে হলো,—"সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

একটু পরেই ডালহাউসীর গাড়ি এসে পড়লো। কিন্তু মায়াদেবীকে ডেকে তোলবার কোনও উৎসাহই পেলুম না। ডাকলে বোধ হয় একটু অবিচারই হতো। সুতরাং মিনিট পাঁচেক নিয়মমতো দাঁড়িয়ে গাড়ি চলে গেল উত্তর-পশ্চিম পথে। আমি সেই জিনিসপত্র আগলে পথের ধারেই একখানা পাথর আশ্রয় করে বসে রইলুম।

আন্দাজ মিনিট পনেরো পরেই আচমকা মায়াদেবী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। গাড়ির সময়টি তাঁর জানা ছিল। কিন্তু গাড়ি যে চলে গেছে এটি তাঁকে জানাতে হলো। তিনি মহা লজ্জিত, কিন্তু মনোভাবটি চেপে রেখে তারস্বরে বললেন, আপনি এমন মুখচোরা তা ত জানতুম না? ডাকলেন না কেন?

বললুম, আপনার এই 'নেপোলীয়নী' ঘুম জানা থাকলে ঠিকই ডাকতুম। তবে

আরেকখানা গাড়ি আছে চারটের সময়। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বেশ করেছেন ঘুমিয়ে। ওটা হলো 'ভাত-ঘুম'।

মায়াদেবী উঠে এলেন। সময় হাতে ছিল দু'ঘন্টারও বেশী। তিনি বললেন, মালপত্র এখানে থাক, চলুন ঘুরে আসি।

ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম হলো 'বানীক্ষেত'। মোটর চলাচলের পথটিই হলো তার নাভিকেন্দ্র। তিন ফার্লংয়ের মধ্যেই তার ব্যবসায় বেসাতি। এই বাইরে হলো দুদিকের পাহাড়তলী এবং চাষীবস্তি,—বেড়াবার মতো জায়গা তার কোথাও নেই। কেউ কম্বল বুনছে, কোথাও দর্জির ঘর, ফল বিক্রি করছে কেউ, কোনও মেয়ে কাঠের বোঝা নিয়ে চলছে, কোথাও বা বৃদ্ধা রৌদ্রে বসে তার নাতনীকে দিয়ে মাথার উকুন বাছিয়ে নিচ্ছে। পথের ধারে গান গাইতে বসেছে এক অন্ধ বোরেগী, আরেক জায়গায় পাথরের টুকরো আর জন্তুর হাড় দিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছে একটি লোক। ঘুরে বেড়ালুম খানিকক্ষণ ওদেরই পাড়ায় পাড়ায়। চাষী মেয়ে আগাছার বাণ্ডিল তুলে আনছে গিরিনদীর পাথর জটলার ফাঁকে ফাঁকে,—এগুলি গরু মহিষের খাদ্য। এটি তরাই অঞ্চল, সুতরাং ফলন অনেক বেশী। পাহাড়তলীর পাশে পাশে চলে গিয়েছে বনজঙ্গলের পথ ইরাবতীর পাবে পারে। পল্টনের লোকেরা মাঝে মাঝে এদিকে আসে শিকারের সঙ্গী খুঁজতে। সাপ উঠে আসে এদিকে বড় বড়। ওই যতটুকু ঘুরে এলুম ততটুকুই পরিচয়, ততটুকুই সত্য। তার বাইরে সবই রয়ে গেল, সবটুকুই অজানা। আমরা যাত্রী, আমাদের কৌতূহল ক্ষণকালের,—সেকথা ওরাও জানে, আমরাও বুঝি। অভব্য কৌতূহল প্রকাশ করতে গিযে আমরাই ছোট হই, ওরা অবাক হয়ে থাকে। ওরা চিরকাল দাঁড়িযে রযেছে শক্ত ভিত্তির ওপব, আমাদের মতো নোঙর ছেঁড়া অগণিত যাত্রী ওদের চোখের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত ভেসে চলেছে। কেউ ওদের প্রাণেব পরিচয় নেয় না, ওরাও সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু এই পরিচয়ের অভাব এবং অনুৎসাহ থেকে ভুল বুঝাবুঝির জন্ম ঘটে। একপক্ষের অনিচ্ছা এবং অন্যপক্ষের ঔদাসীন্য—এর থেকেই অবশেষে দেখা দেয় রাজনীতিক কচকচি। সামাজিক জীবনে না মিললে রাজনীতিক সম্পর্ক মধুর হয় না, এটি ছেলেমানুষেও বোঝে। উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙলার সামাজিক জীবন চিরকাল অচ্ছেদ্য বলেই রাজনীতিক জীবনে উভয়ের মধ্যে কখনও বিবাদ বাধেনি। উভয়ের মন জানাজানি বহুকালের।

যথাকালে গাড়ি এলো, এবং যখন ছাড়লো তখন বেলা সাড়ে চারটে। চার পাঁচ মাইল মাত্র পথ। কিন্তু তখন পাহাড়ে মেঘে রৌদ্রে আকাশে অরণ্যে—শরৎকালের লুকোচুরি আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিকে বিষণ্ণ মুখ, অন্যদিকে হাস্যোজ্জ্বল। একটু পশ্চিমে, একটু উত্তরে আরম্ভ হলো চড়াইপথ। পথ মসৃণ এবং সুন্দর,—রাজপুর থেকে মুসৌরীর পথেব মতো। কোথাও ক্ষমা নেই, নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই,—কেবল চড়াই। গাড়ির গতি মন্থর, কিন্তু শব্দ কানফাটা। চাব মাইলে প্রায় চার হাজার ফুট চড়াই, সোজা কথা নয়। ওই যে সেবার উঠলুম বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে—জৈন ধর্মশালাটার পাশ দিয়ে চড়াই আরম্ভ হয়েছিল। সেও চার হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু ছ' মাইলে পথটা ছড়ানো,—এবং মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল কতকটা উপত্যকা। এখানে কিচ্ছু নেই, শুধু চড়াই। এ পথে ফিরবার সময় পেট্রল খরচ নেই। স্টিয়ারিং ধরে রইলো, ব্রেক্ টিপে রইলো, গাড়ি নেমে এলো গড়গড়িয়ে। সব পাহাড়ের ড্রাইভাররাই এই সুযোগ নেয়।

দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি। উঠছি উঁচুতে। দক্ষিণে

পাঞ্জাবের বিরাট সমতল অনেকটা যেন কুহেলী ঢাকা। ধবলাধার শ্রেণীর উপরে উঠে পীর-পাঞ্জাল দেখতে পাচ্ছি। জম্মু থেকে কাশ্মীরের পাহাড় উঠে গেছে পশ্চিম থেকে উত্তরে,—একটির পর একটি হরিৎবর্ণ দানব পাশাপাশি শুয়ে যেন বিশ্রাম নিচ্ছে, ওরা যেন দেবতাত্মা হিমালয়ের মন্ত্রে বশীভূত। একটি হিমাচল প্রদেশ,—সমতল অঞ্চলের ধার ধারে না। এদিকে এমন বহু সহস্র নরনারী আছে যারা রেলপথ দূরের কথা, চাকার গাড়ি কখনও দেখেনি। তারা হিমালয়ের সন্তান, পৃথিবী তাদের থেকে বাইরে পড়ে থাকে। সংবাদপত্র কেমন, তারা জানে না, সাহেবসুবো দেখেনি এ জীবনে,—এবং সারা বছরে একবার যদি কখনও কোনও পাহাড়ের শীর্ষলোকের ধার দিয়ে একটি এরোপ্লেনকে চকিতে পার হয়ে যেতে দেখে, তবে তারা পাহাড় পেরিয়ে ঘরের দিকে পালায় আতঙ্কে। চলতি যুগের ইতিহাসই ওরা পৌরাণিক কাহিনীর মতো শোনে।

সহসা সচেতন হলুম। আমাদের গাড়িতে যাত্রীর সংখ্যা মোট দশ-বারোজন। কিন্তু অধিকাংশেরই লেগেছে ঘূর্ণি,—পাহাড়ের পথে যেমন হয়। মায়াদেবীর মাথা এরই মধ্যে হেঁট হয়েছে, তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই। অন্যান্য আরোহীদের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে জনাতিনেক। একজন দশাসই ভদ্রলোক শিবনেত্রে একেবারে অসাড়। কেউ কেউ জানলা দিয়ে যথাসম্ভব মুখ বাড়িয়ে গলা চিরে,—ও-য়া-ক্—না, থাক্ দেখবো না! ওর ছোঁয়াচটা যেন নিজের মধ্যেও কিলবিলিয়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি গাড়ি না থামলে মায়াদেবীর আর সুস্থ হবার আশা নেই।

গাড়ি ঘুরে-ঘুরে ক্রমেই উঠছে উপর দিকে। ভুজঙ্গভূষণের দেহ জড়িয়ে সাপ যেমন ক্রমশ তাঁর জটার শীর্ষে ওঠে। ঠাণ্ডায় এবার সবাই জড়োসড়ো হচ্ছে। মেঘ নেমে যাচ্ছে ইরাবতীর দিকে; পাইনের বনে মেঘ ঢুকছে। মেঘ ঢুকছে আমাদের গাড়িতে। ড্রাইভার ঝাপসা মেঘে গাড়ি চালাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ঝলক দিয়ে যাচ্ছে। নীচেকার রৌদ্রকান্ত জীবন ভুলে গেলুম। জামার বোতাম বন্ধ করতে হলো এতক্ষণে। পাহাড়ে-পাহাড়ে শরতের কুসুম সমারোহ পথের দু-ধারে এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। একটি-আধটি বস্তির দেখা পাচ্ছি।

পল্টনের পাড়ার ধারে এসে একবারটি গাড়ি দাঁড়ালো। আমরা শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। অসংখ্য মিলিটারী ব্যারাক, এবং তাদের আনুষঙ্গিক উপকরণ চোখে পড়ছে। অফিসারদের আনাগোনা দেখছি। এটি বোধ করি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কেন্দ্র। পাঠানকোট থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে।

গাড়ি সেখান থেকে আবার ছাড়লো এবং আঁকাবাঁকা সুন্দর পথ ধরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দেখতে দেখতে শহরে এসে পৌঁছলুম। মোটর স্ট্যান্ডের পাড়ায় কিছু কিছু লোকজন দেখছি বটে, কিন্তু চারিদিকেই জনবিরল। এমন কোলাহলবিহীন স্তব্ধতা কোনও পাহাড়ী বড় শহরে দেখিনি। একটু যেন বিস্ময়বোধ করলুম।

নানা হোটেলের দালাল এসে দাঁড়ালো, কিন্তু ওদের মধ্যে আমরা 'গ্রান্ড-ভিউ-হোটেলটি' পছন্দ করলুম। নির্বাচনে তখনকার মতো ভুল ঘটলো, সেটি পরে টের পেলুম। কিন্তু মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে বিশ্রাম নেবার বিশেষ দরকার ছিল। প্রায় বারো থেকে তেরো ঘন্টা হলো, আমরা পথে-পথে ঘুরছিলুম।

ডাকঘরের গা দিয়ে একটি পায়ে-হাঁটা ঢালুপথ উঠে এলো মস্ত এক হোটেল-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে। কিন্তু এটি এত নিভৃত অঞ্চল যে, একটু যেন আড়ষ্ট হলুম। একটি গুজরাটি

পরিবার নীচের তলায় এসে ভালো দুটি ঘর আগেই নিয়েছেন। সুতরাং উপরতলায় গিয়ে একটি বড় ঘর নিতে হলো। মস্ত বড় বারান্দা,—কিন্তু এপাশে ওপাশে কোথাও মানুষ নেই। চতুর্দিকে এত বিলাসসজ্জা এবং অপ্রয়োজনীয় ঝকঝকে আসবাবপত্র যে, চোখ ঠিকরে যায়। এই হোটেল থেকে হিমালয়ের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা সুন্দর,—ওরা বললে। কিন্তু মাথাপিছু দৈনিক পনেরো টাকা লাগবে,—এ যেন একটু বেশী। হোটেলে যাত্রীসংখ্যা যত, তার চেয়ে খানসামার সংখ্যা অধিক। ভিতরে লাউঞ্জের আসবাবপত্র দেখে আমরা হতচকিত। এ হোটেলে আজকাল সাধারণ উচ্চ মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা আসে, এবং তার জন্য রেট্ কমিয়ে পনেরো টাকা করতে হয়েছে,—এজন্য কর্তৃপক্ষের মনে চাপা দুঃখ রয়েছে। সাহেবসুবোরা টাকা দিতে জানতো; তারা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে,—সেজন্য অনেকেই বিমর্ষ।

ঘরখানা মস্ত। ভালো ভালো গদিআঁটা কৌচ, দেওয়ালের নীচে ফায়ার প্লেস, পরিপাটি শয্যা ব্যবস্থা, ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘর, মেঝের উপরে কার্পেট, মখমলের বড় বড় পর্দা, একাধিক ইলেকট্রিক আলো,—অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের উপকরণ প্রচুর। এদিক ওদিক ঘুরে দেখে এলুম, আমাদের ঘরটিই শ্রেষ্ঠ মনে হলো। কিন্তু এই বিরাট এবং সুদীর্ঘ দোতলাটিতে লাউঞ্জের দরজাটি সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের এ মহল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। অজানা এবং অপরিচিত পাহাড়ের প্রান্তে যদি কোনও অভাবনীয় বিপত্তি ঘটে, বহু ডাকাডাকি সত্ত্বেও কেউ ছুটে এসে দাঁড়াবে, এমন মনে হচ্ছে না। হোটেল-নির্বাচনে ভুল ঘটেছে, এই ধারণা আমাকে পেয়ে বসেছিল। উৎসাহের অভাব বোধ করছিলুম।

ঠাণ্ডাকে রোধ করার জন্য চারিদিক থেকে বন্ধ; সমস্ত বারান্দায় কাঠের দেওয়াল এবং কাঁচের জানলা। সমস্ত মেঝে কাঠের, সিঁড়িও কাঠের। পাহাড়ী শহরে কাঠ ছাড়া উপায় নেই। কাঠের বাড়ি হলো সর্বত্র। কাঁচ না থাকলে জানলা হয় না। কাঠের মেঝে থাকার জন্য বহুদূর থেকে পায়ের শব্দ এবং কাঁপন অনুভব করা যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে ভালো বাড়ি মানেই ভালো এবং মোটা কাঠের বাড়ি। আরাম এবং মধুর উত্তাপ সৃষ্টির জন্যই এই কাঠের কাজ।

সন্ধ্যার চা এবং জলযোগাদির পর ঘন্টাখানেকের মধ্যে মায়াদেবী চাঙ্গা হলেন। আমার ধারণা ছিল বিপরীত। ভাবছিলুম রাত্রির মতো তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু হোটেলের ভিতরে গিয়ে নৈশভোজনের ফরমাশ দিয়ে এসে দেখি, তিনি বাহির হবার জন্য প্রস্তুত। বললেন, চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আমি সত্যিই বলি, চাম্বার চেয়ে ডালহাউসী আমার বেশি ভালো লাগছে।

বললুম, বড্ড বেশি সাহেবী নয় কি? একটু যেন উগ্র আধুনিক?

তিনি রাগ করলেন,—এ যুগের অন্নজল খেয়ে বাঁচবো, অথচ একশো বছরের পেছনে চেয়ে থাকবো,—এ কেমন কথা? এবার বুঝতে পারছি আপনার গাম্ভীর্যের আসল কারণ। চলুন, পথে বেরিয়ে কথা হবে। আমার সন্দেহই ঠিক, আপনি একটু সেকেলে!

ঈষৎ দিনের আলো তখনও রাঙা হয়ে রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। কিন্তু সেই সূর্যাস্তকাল যে কত সুন্দর, পথে বেরিয়ে বুঝতে পারা গেল। 'সীডার' ও পাইনের বিশাল অরণ্য পাহাড়ের সীমানা ধরে দূর-দূরান্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাদের ফাঁকে ফাঁকে দিনান্তের রক্তবরণ দিগন্ত সর্বত্র রক্তিম আভা প্রসারিত করেছে। বাঁ-হাতি সুন্দর পথ উঠে গেছে

অন্ধকার পাহাড়ের জঙ্গল জটলার ভিতর দিয়ে। এত নিরিবিলি যে, এখন পর্যন্ত একটি মানুষেরও দেখা পাচ্ছিনে। আমরা আস্তে আস্তে চড়াই পথে উঠে যাচ্ছি। 'সীডার' বৃক্ষের পাতায় বায়ু সঞ্চালনে মর্মর শব্দ হচ্ছে, মুখ তুলে দেখি পশ্চিম দিগন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকার হবার আগেই প্রথম শুক্লপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র আকাশপথে এসে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ প্রায়ই লতাগুল্মজড়িত এবং শৈবালাচ্ছন্ন। পথের বাঁকে-বাঁকে আলো জ্বলেছে। বড় বড় পাখির ডানা ঝাপটের আওয়াজ পাচ্ছিলুম। কিন্তু তাদের সেই পক্ষ-সঞ্চালনের ফলে গাছের থেকে যে গন্ধের ঝলক এসে নাকে লাগবে, এটি ভাবিনি। ফুল নয়, গাছের গন্ধ। ফুলের মতো গন্ধ নয়, কিন্তু এমন একটি নিবিড় তন্দ্রাজড়ানো অপরিচিত গন্ধ, যেটি সমতলবাসীরা কখনও পায় না। হতে পারে 'সীডারের' গন্ধ, কিন্তু এইটি ছড়ানো রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সর্বত্র। মৃগনাভির উগ্র গন্ধের ঝলক দু-চারবার পেয়েছি; রাজস্থানে গিয়ে জেনেছি আসল চুয়ার গন্ধ কেমন; প্রাচীন বট যেখানে জরাজীর্ণ মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে বাইরে এসেছে—সেই মন্দিরের ভিতরকার বন্য সোঁদা গন্ধও জানি;—ছোটবেলায় যেদিন বড়দাদার বিয়ে হলো, তাদের ফুলশয্যার পরের দিন বাসিফুলের মাড়ানো গন্ধের কথাও মনে আছে; এমন কি দিদির শ্বশুরবাড়ির সেই শ্যাওলাধরা প্রাচীন পুকুরঘাটের বাঁধানো ইমারতের ফাটলে যে-গন্ধটা পেতুম বোবা পুকুরের কোলে,—তাও ভুলিনি। কিন্তু এ গন্ধের সঙ্গে তাদের কারও মিল নেই। এ পাওয়া যায় কেবলমাত্র হিমালয়ে এলে। কুমায়ুনের উত্তর পাহাড়-পথে, নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে, উত্তর সিকিমের লা-চেন অঞ্চলে, কাশ্মীরে,—এবং ওই যেটি আজ পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত,—মারী, নাথিয়াগলি অথবা হাভেলিয়ানের পরম রমণীয় পার্বত্য অঞ্চলে। আমার ধারণা, বিনিদ্র রোগীকে ঘুম পাড়াবার মতো এমন গন্ধ আর নেই। আমার ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রার বিহ্বলতা ছিল।

অন্ধকার হয়েছে, কিন্তু ঠিক যাচ্ছি কোনদিকে ঠাহর হচ্ছে না। এখানে ওখানে আড়ালে আবডালে বাগানবাড়ি এক একটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আলো জ্বালা দেখে মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণও পাচ্ছি,—কিন্তু সমস্তটাই নিস্তব্ধ। পথটি কোথায় গিয়ে এবং কতদূরে উঠে শেষ হয়েছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মায়াদেবীর ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। তাঁর চলনের উৎসাহে সমস্ত দিনমানের ক্লান্তির কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এখানে পা দিয়েই যেন তাঁর কাশ্মীরকে খুঁজে পেয়েছেন। স্পষ্টই বলেছেন, চাম্বা অর্থাৎ চম্পানগরী তাঁর ভালো লাগেনি। বন্য ও দুঃসাধ্য পর্বতপ্রাকারের মধ্যে বন্দিনী 'চম্পাবতী' তাঁর প্রিয় হতে পারেনি। ডালহাউসীর এই আধুনিক সুসভ্য সাজসজ্জা তাঁর ভালো লেগেছে। আমার মনে সান্ত্বনা ছিল এই, ডালহাউসী চম্পাবতীরই অন্তর্গত। নামে মাত্র পাঞ্জাবের অধীন।

আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মায়াদেবী। এবার থমকে দাঁড়িয়ে ধমক দিলেন,—তখনকার কথাটা কিন্তু ভুলিনি।

আমিও দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ, আপনার মধ্যে সেই পুরনো পৈতেধারী ব্রাহ্মণটি ঠিকই বেঁচে আছে।

থাকলে ক্ষতি কি?

আপনার গাম্ভীর্যের কারণও ওইখানে।

এবার খুব হেসে উঠলুম সকৌতুক। ধনুর্বাণ তুলে তিনি সোজা আক্রমণ করেছেন।

পুনরায় বললেন, গুপ্তসাহেবের মুখে যেদিন থেকে আপনি শুনেছেন, আমি নাচ-বাজনা-অভিনয় এসব জানি—সেদিন থেকেই আপনার মুখ ভার। বুঝতে পারি, আপনি এসব পছন্দ করেন না!

প্রাদেশিক ভাষায় একে বলে, 'বেধড়ক' আক্রমণ। হাসিমুখে শুধু বললুম, সাংঘাতিক অভিযোগ বটে। আপনার স্বামী এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর সঙ্গে ঠিক আপনার ঝগড়া হতো।

কেন?

আমার ওপর এই আক্রমণ তিনি সইতেন না!

মায়াদেবী আবার কিছুদূর এগিয়ে চললেন। দু-দিকের ঘন বৃক্ষচ্ছায়ার অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। বহু দূরের আলোর একটু আভা পড়েছে গাছের শীর্ষে। উপর দিকে তাকিয়ে মায়াদেবী এবার নিজেই থামলেন,—না, আর নয়—চলুন ফিরি। আচ্ছা, বলুন ত, আপনি কি সত্যিই মেয়েদের নাচ-গান পছন্দ করেন না?

উৎরাই পথ ধরলুম এবার। পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর। তাঁর কথা শুনে কিন্তু হাসতেই হলো,—পছন্দ করি—একথা শুনলে কি আপনি ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করবেন?

উচ্চ হাস্যে পথ মুখরিত হলো। অতঃপর নীচের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন 'ডালহাউসী ক্লাবের' পাশ কাটিয়ে হোটেলে এসে উঠলুম, তখন বেশ রাত হয়েছে। গুজরাটীরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সন্ধ্যার পর থেকে শীত পড়েছে প্রচুর।

উত্তরে বহুদূরে চম্পাবতী উপত্যকার ললাটলোকে দেখা যাচ্ছে তুষারশুভ্র 'পাঙ্গী পর্বতমালা'। সমুদ্রসমতা থেকে 'পাঙ্গীর' উচ্চতা প্রায় ২৩,০০০ হাজার ফুট,—চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন। তার নীচে থেকে দক্ষিণ পার্বত্যালোকের নাম 'চম্পাবতী উপত্যকা'। ডালহাউসী এই উপত্যকারই মধ্যে পড়ে। আগে চম্পাবতী ছিল একটি সামন্ত রাজ্য, এখন ডেপুটি কমিশনারের অধীন। এটি এখন হিমাচল প্রদেশের একটি জেলামাত্র। যেমন মণ্ডি, বিলাসপুর, শিরমুর ইত্যাদি।

বারান্দায় এক ফালি মধুর রৌদ্র এসে পড়েছে। সন্দেহ ছিল, দিনমানে হয়ত মানুষের কলরব-কোলাহল শুনতে পাওয়া যাবে। সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়নি। শূন্য ডালহাউসী চারিদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে। সমস্ত দিন ধরে চেয়ে থাকা 'পাঙ্গী'র দিকে, সমস্ত দিন পাখির ডাক শোনা,—সমস্ত দিনরাত্রি নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করা। যদি কিছু বৈচিত্র্য থাকে তবে সে বাইরের পথে পথে। প্রাতরাশ সেরে আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

ওক্ আর পাইনের বন আলোছায়ার ঝিলিমিলিতে ঝলমল করছে। পথ তেমনি নিরিবিলি, তেমন বনময়। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে খদ। আমাদের বসবাসের অঞ্চল হলো 'বাক্রোটা' পাহাড়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চার-পাঁচটি পাহাড় পরস্পর সংলগ্ন, এবং তাদেরকেই কেন্দ্র করে ডালহাউসী গড়ে উঠেছে। 'চম্পা' উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হলো নিকটবর্তী এই ডালহাউসী, এবং এখান থেকে নেমে অরণ্যপথ ধরে আন্দাজ কুড়ি মাইল গেলে 'চম্পানগর'। কিন্তু এর চারিপাশের অরণ্য অত্যন্ত গহন গভীর,—হিংস্র জানোয়ারদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। ওদিকে অসুরনাশিনী চামুণ্ডা দশপ্রহরণ ধারণ করে

আছেন, এদিকে পাশব রাজ্যের পশুপতিনাথ তাঁর বিরাট পশুশালা সৃষ্টি করে রেখে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসে রয়েছেন। সমগ্র চম্পাবতী অরণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

আমরা 'নিম্ন-বাক্‌রোটা' থেকে উঠতে উঠতে 'শীর্ষ-বাক্‌রোটার' দিকে চললুম। অন্য পাহাড়গুলির নাম হলো 'ভান্‌জার, পট্‌রাইন, তেহরা, কাঠলাগ' ইত্যাদি। রানীক্ষেত, মুসৌরী, নৈনীতাল সম্বন্ধে সাধারণত যে ধারণা হয়, এখানেও তাই। হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি সুন্দর শহর ইংরেজের গ্রীষ্মাবাসের কল্পনায় তৈরী। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব—এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে ইংরাজ দেখতে পেয়েছিল 'চাম্বা' উপত্যকা। এই উপত্যকার সামন্তরাজ্যের হাত থেকে একশো বছর আগে পূর্বোক্ত পাহাড়গুলি আদায় করে নেন কর্নেল চার্লস্ নেপিয়ার। তখন ছিলেন বড়লাট লর্ড ডালহাউসী,—সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক আগে। তখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল চলছে। তারপর নগর নির্মাণ করতে তিন বছর লাগে। আমরা এখানে দৈবাৎ এসে পড়েছি ঠিক একশো বছর পূরণের কালে। সম্প্রতি কিছুদিন আগে 'ডালহাউসী' প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসবকালে পণ্ডিত নেহরু এখানে এসেছিলেন। তাঁর আগমন-সমারোহের ধাক্কা এখনও এখানকার অধিবাসীরা কাটিয়ে ওঠেনি। বাজারে এখনও উত্তাপ রয়েছে।

চড়াই ভাঙতে ভাঙতে উঠছি উপর দিকে। গাছপালার ফাঁকে, পাহাড়ের কোলে, ঝোপজঙ্গলের আড়ালে,—এক একটি বাংলো রয়েছে লুকিয়ে। কিন্তু প্রত্যেকটিতে মানুষের সংখ্যা কম। কোনও বাংলো একেবারে শূন্য, কোনটি মালী অথবা রক্ষীর তত্ত্বাবধানে, কোনটিতে বা বাইরের দু-একটি লোক। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব হচ্ছে, পাঁচশোখানা বাংলোর মধ্যে চারশোখানারও বেশী শূন্য পড়ে রয়েছে। এই ডালহাউসী মানুষের সোরগোলে গমগম করেছে দশ বছর আগে,—ভারত যখন স্বাধীন হয়নি। স্থানীয় 'বালুন' গোরা ছাউনীতে ছিল ইংরেজ সামরিক অফিসারদের প্রবল কর্মতৎপরতা; পাহাড়ে-পাহাড়ে সাহেব-সুবোদের বাংলো,—তাদেরই ছেলেমেয়েদের ইস্কুল পাঠশালা; মিশনারীদের কন্‌ভেন্ট আর গির্জার প্রার্থনা-সমারোহ। এই একমাত্র পাহাড়ী শহর যেখানে নোংরা বস্তি চোখে পড়ে না, দারিদ্র্য যেখানে সর্বাপেক্ষা কম, যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিচ্ছন্নতা। প্রত্যেকটি বাংলোয় সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারের বসবাস ছিল, এটি দৃষ্টিমাত্রই ধারণা হয়। স্কটল্যান্ড দেখিনি, দক্ষিণ কানাডাও দেখিনি,—কিন্তু তাদের ছবির সঙ্গে ডালহাউসী হুবহু মিলে যায়। বনে, কাননে, উদ্যানে, গিরিনির্ঝরে, ওক্-পাইনের বীথিকায়, ছায়ানিবিড় নিভৃত নিকুঞ্জলোকে—ডালহাউসী শহর মুসৌরীকে পদে পদে হার মানায়।

'বাক্‌রোটা' পাহাড়ের শীর্ষে উঠে এলুম। দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ঘন রৌদ্র, কিন্তু স্নিগ্ধ হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এখান থেকে পথ নানাশাখায় গেছে নানা দিকে। এ অঞ্চলটি দার্জিলিংয়ের 'অবসারভেটরীর' পাড়ার মতো চারিদিকে প্রসারিত,—অনেকটা যেন মালভূমি। খাদ্যসামগ্রীর বাজার একটু নীচের দিকে। উপরদিকের ম্যাল্-এর বাজারটি কলকাতার চৌরঙ্গীর অপভ্রংশ। কাজকারবার বড় ছিল, কিন্তু এখন লোকজন অতি কম। মায়াদেবীর ভালো লেগেছে এই জনবিরলতা। তিনি ডালহাউসীর গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছেন। চারিদিকের পাখিসমাজে বোধ করি এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়েছে যে, ডালহাউসী বোধ করি এমনি জনবিরল থেকে যাবে চিরদিন! তারা গাছে-গাছে আদিবাসীর মতো দল পাকিয়ে সম্ভবত তারস্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করছে,—তোমরা সভ্যতা আর সংস্কৃতির

ধ্বজাধারী হতে পারো, কিন্তু তোমরা পরদেশী,—তোমরা এসেছ বাইরের থেকে। বস্তুত, কোনও পাহাড়ে এত বিচিত্রবর্ণের পাখিসমাবেশ দেখিনি।

'পাঙ্গীর' বিশাল শুভ্র পর্বতশ্রেণী দেখছি উত্তরে। চোখ চিক্‌রে যায়—এত সাদা। প্রত্যেকটি চূড়া পাশাপাশি সাজানো,—প্রত্যেকটি ঝলমল করছে রৌদ্রে। উত্তর পার্বতের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে চন্দ্রভাগা, ডালহাউসীর ঠিক নীচে দিয়ে গেছে ইরাবতী, এবং দূর দক্ষিণ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সমতল ভূভাগে বেরিয়ে এসেছে বন্য বিপাশা। বিপাশা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে গেলেই মানস সরোবরের সন্তান মহানদ শতদ্রু। চূড়ায় দাঁড়িয়ে কাছেই দেখা যাচ্ছে জম্মুর গিরিশ্রেণী,—পীরপাঞ্জালের দক্ষিণ প্রান্ত। 'উধমপুর' ও 'চিনেনি' অঞ্চলে চন্দ্রভাগার একপারে ধবলাধার, অন্যপারে পীরপাঞ্জাল,—এবং এটি কেবলমাত্র ডালহাউসী থেকেই সুপ্রত্যক্ষ। দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যে সেতু রচনা করেছে চম্পাবতী।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ডালহাউসীর চতুর্দিকে হলো 'চাম্বা ভ্যালীর' দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু লর্ড ডালহাউসী এই শহরকে সংযুক্ত করে গেছেন পাঞ্জাবের সঙ্গে। ডালহাউসী পৌঁছতে গেলে চাম্বাই অতিক্রম করতে হয়, এবং চাম্বার সঙ্গে সমতল ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্ক ডালহাউসীর দ্বারাই হওয়া সম্ভব। পাঞ্জাবের সঙ্গে ডালহাউসী শহরের এই অসঙ্গত সম্পর্ককে আজও লালন করছেন ভারত গভর্নমেন্ট সম্ভবত এই কারণে যে, সমগ্র ডালহাউসী শহর এবং 'বালুন' গোরা ছাউনীটি নির্মিত হয়েছিল 'চাম্বার' সামন্ত নরপতির টাকায় নয়,—ভারত গভর্নমেন্টেরই অর্থে। বিতর্কটা আজও চলেছে। কিন্তু হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেন্ট বোধ করি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে বিব্রত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ফলে, পাঞ্জাব এবং হিমাচলের রাজ্যসীমানা অদ্যাবধি অনেকটা জটিল হয়ে রয়েছে।

নানাকথা নিয়ে আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসেছি অনেকদূর। কয়েকটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে ডালহাউসীর সঙ্গে—সেগুলি স্মরণ করে আমাদের মনে ছিল রোমাঞ্চ কৌতুক। বহুকাল পূর্বে—সেও প্রায় চুরাশী বছর পেরিয়ে গেল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন তাঁর কিশোরপুত্র রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। এখানে তাঁর একটি সাধনার স্থল ছিল। সকালের দিকের শীতে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন,—সেটি অতিমানবিক ধৈর্য বলে আজও মনে করি। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে এসেছিলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু,—সেটি লর্ড রেডিংয়ের স্বেচ্ছাচারের কাল,—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের বছর,—সেই সময় মোতিলালের সঙ্গে ছিলেন পুত্র জওয়াহরলাল—ভাবী ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধাব। এখানে তাঁরা অনেকদিন কাটিয়েছিলেন।

থমকে এসে দাঁড়ালুম দুইটি পথের একটি সংযোগস্থলে। একজন বৃদ্ধ ঘোড়াওয়ালা সেখান থেকে নির্দেশ করে দেখিয়ে দিল, অদূরে ডাঃ ধরমবীরের বাড়ি। এই বাগানবাড়িতে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের ভাবী নেতাজী সদ্যকারামুক্ত সুভাষচন্দ্র অসুস্থ দেহে ধরমবীর এবং তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর আতিথ্য নিয়ে বাস করেছিলেন অনেকদিন। ওই বাড়িটির সঙ্গে আমার নিজের মনের সামান্য যোগ ছিল এই, ওখান থেকে সুভাষচন্দ্র সেদিন খানদুই স্মরণীয় পত্র আমাকে লিখেছিলেন! কিন্তু এখানে আমার সহসা থমকে দাঁড়াবার হেতু বারম্বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মায়াদেবীকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারা গেল না।

সেই ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের পর ডালহাউসীর জীবনের উপর দিয়ে গেল আরও কয়েক বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন হয়ে এলো। পূর্ব-পাঞ্জাব রয়ে

যাচ্ছে ভারতের মধ্যে। অতঃপর কাশ্মীর ঘোষণা করলো ভারতের অন্তর্ভুক্তি। ক্রমে সাম্প্রদায়িক সর্বনাশের আগুন জ্বলে উঠলো পাঞ্জাবে। ইংরেজ চলে গেল দেশ ছেড়ে। কিন্তু এই ডালহাউসীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ছিল সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মুসলমান পরিবারগণের দখলে। পাহাড়ের এই চূড়ায় চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁরা বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর উপর আবার উপজাতীয়দের দ্বারা কাশ্মীর আক্রান্ত হলো ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ফলে, স্থানীয় মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 'চাম্বার' এই অঞ্চল ছেড়ে দিগ্বিদিকে চলে যেতে লাগলো।---মুসলমানরা গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে শিয়ালকোট অভিমুখে। সমস্ত চলাচল ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, বাজার হাট এবং গভর্নমেন্ট পরিচালিত নানা জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও শাসনযন্ত্র—সমস্তই ভেঙে পড়লো। ডালহাউসীর সেই থেকে দুরবস্থা আরম্ভ। অসংখ্য ভূসম্পত্তি অনাদরে পড়ে রয়েছে,—কিন্তু ভোগ করার মানুষও নেই, এবং ভোগের অধিকারও বিশেষ কেউ পায়নি।

বিশ্রাম নিয়ে এক সময় মায়াদেবী গাত্রোত্থান করলেন। বললেন, চলুন।

মন টিকছে না কোথাও, এত জনবিরল। হোটেলের ওই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সর্বত্র যেন সকরুণ শূন্যতা জড়ানো। অরণ্যে, প্রান্তরে, মরুভূমে, দুস্তর পর্বতের কোথাও,—কেউ মানুষের কলরব আশা করে না। কিন্তু একটি জনকোলাহলমুখরিত নগর এবং তার শত শত অট্টালিকা যদি সহসা জনপ্রাণিশূন্য হয়ে যায়, তবে তার আনাচে কানাচে ঘুরতেও ভয় করে। পরিত্যক্ত ডালহাউসী, কিন্তু অনাদৃত নয়। সাজানো পুষ্পোদ্যান সর্বত্র রয়েছে পরিচ্ছন্ন, প্রায় প্রতি বাংলোর ভিতরে প্রচুর আসবাবপত্র, বিলাসের পর্যাপ্ত উপকরণ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিখুঁৎ আয়োজন,—শুধু মানুষ নেই! যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তিনভাগের একভাগ মূল্যে এক একটি সম্পত্তি কিনতে পারে, তার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও কাজ করছে,—কিন্তু কেনবার লোক কম। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি পার্বত্য শহরে এই দুর্গতি ও অভিশপ্ত জীবন দেখে আমাদের দিন কাটছে।

যিনি সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মনোভাবটি কিন্তু বিপরীত। তিনি একপ্রকার আনন্দ পাচ্ছেন এই জনশূন্যতায়। পাখির কলরব তাঁর শুনতে শুনতে লেগে যায় ঘন্টাখানেক। শূন্য বাংলোর আশেপাশে গিয়ে তার ইতিহাসটি ঠাওরাতে লেগে যায় বহুক্ষণ। বনজঙ্গলের ছমছমে পথ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় অনেকদূর। তাঁর আনন্দ ভিন্ন রকমের।

'কালাপাহাড়' এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল বনপথ। অনেকে বলে, 'কালাটপ'। এখন শরৎকাল, ছায়ালোকের বাঁকে বাঁকে এখনও গিরিনির্ঝরের নির্মল সুশীতল জল ঝরঝরিয়ে নামছে নীচেকার খদে। ছোট ছোট বস্তির গায়ে গায়ে সামান্য ফসলের খামার পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে দেখা যায়। এই অঞ্চল থেকে পাইনবনের আরম্ভ। এই পথ চলে গেছে আরও অনেক দূর—'দইনকুণ্ড' ছাড়িয়ে। এখানকার অধিবাসীরা অতি সুশ্রী রাজপুত এবং ধর্মভীরু। এরা সকলেই 'চাম্বা উপত্যকার লোক বলেই নিজেদেরকে জানে; ডালহাউসী অথবা পাঞ্জাবকে তারা স্বীকার করে না। 'দইনকুণ্ডে' কতকটা সমতল পাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে হিমালয়ের দুর্লভ দৃশ্য অবারিত ভাবে চোখে পড়ে। ঠাণ্ডা প্রচুর। কিন্তু 'পাঙ্গী' পর্বতশ্রেণীর আশ্চর্য শোভা সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক করে তোলে। মায়াদেবী অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠেছেন ডালহাউসীর, সুতরাং তিনি সবিস্তারে জানালেন, ঘোড়ায় চড়ে

সমস্ত দিন ঘুরলেও তাঁর ক্লান্তি আসবে না।

'খাজিয়ারের' সুন্দর শোভা এখান থেকে দেখা যায় সীডার আর পাইনের ঘন অরণ্যবেষ্টিত 'খাজিয়ার'-এর দূর্বাদলশ্যাম মালভূমি অনেকটা নীচে। মাঝখানে একটি মস্ত সরোবর, এবং সেই সরোবরে একটি ভাসমান ক্ষুদ্র দ্বীপ। চারিদিকের ঢালু মালভূমির জল ধীরে ধীরে 'খাজিয়ার'কে পূর্ণ করে তোলে। পাইনসমাকীর্ণ পাহাড়ের ঠিক নীচে একটি ডাকবাংলো। খাজিয়ারে এসে দাঁড়ালে চম্পানগরীর দূরত্ব আর থাকে মাত্র নয় মাইল। 'দইনকুণ্ডের' উচ্চ ভূখণ্ডে দাঁড়ালে দূর পর্বতের তলায় তলায় পাঞ্জাবের পূর্বোক্ত চারিটি নদীর ধারা চোখের উপরে ঝলমল করে রৌদ্রকিরণে। ভূস্বর্গ দেখেছি অনেকবার, অনেকবার মর্ত্যের সঙ্গে নন্দনলোকের সেতু রচনা করেছি। কিন্তু সেদিনকার কুসুমিত কাননের বন্য প্রকৃতি হতবিস্ময় এনেছিল চোখে। ফিরবার পথে সেদিন মায়াদেবী বললেন, অনেক পাহাড়ে ঘুরলুম আপনার সঙ্গে ওবছরে আর এবছরে,—কিন্তু ডালহাউসী ভালো লেগেছে সব চেয়ে বেশি। একে ছেড়ে গিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত মন বসবে না ঘরকন্নায়।

সেদিন রাত্রে হোটেলের সেই সুবিস্তৃত ডিনার হল্-এর টেবিলে বসে তিনি একটি হাসির কথা তুলতেও ছাড়লেন না। কথা উঠেছিল হিমালয় ভ্রমণ নিয়ে। বিগত ত্রিশ-বত্রিশ বছরের হিমালয় ভ্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব লিখতে বসেছি 'দেশ' পত্রিকায়, এবং ভ্রমণের শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি এতদিনে এই 'চাম্বা' উপত্যকায়,—এই সব আলোচনার কালে তিনি একসময়ে বললেন, আমার অহঙ্কার কিন্তু আর বোধ হয় রইলো না। কাশ্মীর থেকে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে ভেবেছিলুম, লেখক মানুষটি কেমন তাই দেখবো,—আমরা স্বামী-স্ত্রী কখনও লেখক দেখিনি। কিন্তু আপনাকে দেখবার সময়ই পেলুম না। হিমালয়ের আড়াল পড়ে গেল। এক বছর এমনি করেই আপনি আমাকে ঠকালেন!

প্রকাণ্ড হলের মধ্যে উচ্চ হাসির আওয়াজ কিছুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু আহারাদির পরেও ওই বিতর্কটা সেদিন দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত চললো, এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আমি জর্জরিত হতে লাগলুম।

'বাক্‌রোটার' উপরে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলোয় দেখেছিলুম, উত্তর পীরপাঞ্জালের পর্বতশ্রেণী, এবং আকাশ ঘনবর্ষার মেঘে মলিন। কিন্তু তার ফলাফল পরে ভোগ করতে হবে, সেকথা ভাবিনি।

সেদিন মধ্যাহ্নের পর আমরা ডালহাউসী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। পাখিডাকা পাহাড়ের বনলোক পড়ে রইলো পিছনে, আমরা গোরাছাউনী পেরিয়ে মধুর স্নিগ্ধতার দেশ ছাড়িয়ে নেমে চললুম সেই পুরনো পথ দিয়ে। বিদায় সম্ভাষণ জানালো চম্পাবতীর কুসুমবল্লরীর দল। সেই জয়হিন্দ হোটেল, সেই ডানদিকে চম্পানগরীর সঙ্কটসঙ্কুল গিরিসঙ্কট হাতছানি দিল। অপরাহ্ণের দিকে 'ডুনেরা'য় এসে পাওয়া গেল প্রচুর জনসমারোহ,—যেন ভিন্ন গ্রহলোকের অপরিচিত প্রাণিসমাজে এসে পৌঁছলুম। কিছু চিনতে পারছিনে। জীবনের একটি ছোট টুকরো নিরুদ্দেশ পাহাড়ের মধ্যে মিলিয়ে রইলো।

ঘাঁটি পাহারার অবরোধ ছাড়িয়ে আরও প্রায় কুড়ি মাইল পেরিয়ে 'চাক্কি' ঘাঁটিতে এসে একবার গাড়ি থামলো। এখান থেকে অন্য একটি পথ গেছে কাংড়ার দিকে—যেটি আমাদের দুজনেরই অতি পরিচিত। কাংড়া, জ্বালামুখী, বৈজনাথ, মণ্ডি, কুলু—সমস্তই জানা পথ। ওপথে গত বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দুইজনেরই মনে।

পাঠানকোটে এসে গাড়ি যখন থামলো, বেলা তখনও পাঁচটা বাজেনি। দিল্লীর গাড়ি

এসে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর-দিল্লী মেল। ঠাণ্ডা থেকে নেমে এসে গরমে কষ্ট পাচ্ছিলুম।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গেল, প্রবল বৃষ্টি নেমেছে কাশ্মীরে, এবং গত তিনদিন অবধি কাশ্মীর-পাঠানকোটের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আজ প্রথম সেই পথ দিয়ে যাত্রী নেমে এসেছে। স্টেশন এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল লোকে লোকারণ্য,—রেল কর্তৃপক্ষ দিশাহারা। আমরা বিপন্নভাবে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলুম। হিমালয় ভ্রমণের আনন্দ মাথায় উঠে গেল। এ গাড়ি না ধরতে পারলে কোনমতেই চলবে না।

ট্রেনে ইতিমধ্যেই তিলধারণের ঠাঁই নেই। সবাই যাচ্ছে দিল্লী, আর নয়ত লুধিয়ানা জলন্ধর, অথবা ওই কাছাকাছি। ফার্স্ট ক্লাস অথবা সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কোনওমতেই পাওয়া গেল না। প্রত্যেকটি 'বোগী' পরিপূর্ণ,—এবং তালাচাবি লাগানো। আগে থেকে আমরা ব্যবস্থা করিনি, সেই আমাদের মস্ত ত্রুটি। কাশ্মীর থেকে নেমেছে জলের বদলে মানুষের বন্যাস্রোত। আমাদের অবস্থাটা একেবারে নিরুপায়। গাড়ির পাদানে পর্যন্ত মানুষ ঝুলছে।

আমার এক বন্ধু বলেন, যৌবনকালে হলো জীবনের রাজবেশ! কথাটার প্রমাণ আজ প্রথম পাওয়া গেল। মেয়েদের গাড়ি থেকে দুটি পাঞ্জাবী মহিলা মায়াদেবীকে ইশারায় ডাকলেন,—তাঁদের গাড়িতে একজন মাত্র মহিলার মাথা গোঁজবার মতো জায়গা মিলতে পারে। এতেই আমরা কৃতার্থ,—কেননা আগে থেকে মিঃ গুপ্তকে জানানো আছে, আগামীকাল প্রভাতে তিনি দিল্লী স্টেশনে এসে দাঁড়াবেন স্ত্রীর প্রতীক্ষায়। স্ত্রীকে যদি দেখতে না পান তাহলে হয়ত তিনি ভাববেন, মায়াদেবী নাচ-গান ফেলে তপস্বিনী হয়ে গেছেন হিমালয়ে! সুতরাং সর্বাগ্রে দেবীকে গাড়িতে তুলতে হলো বহু সংগ্রামের পর। আমার কপালে ওই পাদানি! ঝুলতে ঝুলতেই যেতে হবে সারারাত!

ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম সমস্ত প্লাটফরমে মরিয়ার মতো। কোনও পাদানিতেও পা রাখার জায়গা নেই। একজন শিখ ভদ্রলোকের পায়ের ভিতর দিয়ে পা গলাবার চেষ্টা করলুম,—তিনি ল্যাং দিয়েই আমার পা সরিয়ে দিলেন। ঠ্যাং ভাঙেনি এই রক্ষে!

আশ্চর্য, বিপদের সমস্ত আয়োজন ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও আমার বিপদ সচরাচর ঘটে না। কয়েকমাস আগে কলকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছিলেন, আপনার হার্টের ব্যামো! পাহাড়ে আর কখনও যাবেন না, গেলে নির্ঘাত মৃত্যু!—কিন্তু পাহাড়ে না গেলে যে হার্টের ব্যামো বাড়ে,—এটি তাঁকে বলা হয়নি! যাই হোক, হঠাৎ চোখে পড়লো প্লাটফরমে আমাদের এক পুরনো বন্ধু দাঁড়িয়ে। তিনি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুপ্ত, একজন বিশিষ্ট কৃতী সাংবাদিক। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি গিয়েছিলেন শ্রীনগরে সপরিবারে। তিনি দিল্লীর 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের' স্পেশাল অফিসার। ফিরে যাচ্ছেন দিল্লীতে।। দেখেই তিনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

—কোন্ গাড়িতে উঠেছেন?

হেসে বললুম, চেষ্টা আছে ওঠবার, তবে এখনও উঠতে পারিনি।

বেশ ত, আসুন না আমার গাড়িতে,—আমার জন্য সম্পূর্ণ কামরা রিসার্ভ করা আছে!—অশ্বিনীকুমার তাঁর সহৃদয় প্রস্তাব জানালেন।

তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে তিনচারটি তাঁদের পুত্র-কন্যা। তাঁদের সেদিনকার উদার ও স্নেহশীল আচরণ সত্যই স্মরণীয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমি সেই সন্ধ্যায় যেন হাতে স্বর্গ,—না থাক, নির্বিঘ্নে আগে টিকিট-

চেকারের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেন ছাড়ুক, তারপর ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঈশ্বরকে সুবিধামতো ধন্যবাদ দেওয়া যাবে!

মায়াদেবী ও তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে কথা উঠলো। জানা গেল, ওঁরা অশ্বিনীবাবুর যেন কি প্রকার কুটুম্ব হন।

গাড়ি ছেড়ে দিল যথাসময়ে। মায়াদেবী জানতেও পারলেন না, আমি পরম স্বাচ্ছন্দ্যে গদির উপরে পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচলুম। রাখে কেষ্ট মারে কে!

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় গাড়ি এসে পৌঁছলো দিল্লীতে। একটু মুখ ফেরাতেই দেখা গেল, হাস্যমুখে শ্রীমান কেশবচন্দ্র স্ত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। প্রবল জনতার ভিতর থেকে দুজন নামলুম দুই কামরা থেকে। এর পর অধিক বাহুল্য। শ্রীমান আমাকে সহাস্যে জড়িয়ে ধরলেন।

ওদিকে আমাকে তাঁদের পাহাড়গঞ্জের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন প্রিয়দর্শন তরুণ বন্ধু শ্রীমান বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য।

অশ্বিনীবাবুর বদান্যতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ তোলা রইলো।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কালদণ্ড কোটদ্বার

গাড়োয়ালের ভিতর দিয়ে আবার অগ্রসর হচ্ছিলুম। হেমন্তের হাওয়া নেমেছে তরাইয়ের বনে বনে। কোটদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করেছি। সেই আত্মতাড়না আবার ছুটিয়ে এনেছে এদিকে। সেই নতুনের টান, বিচিত্রের সেই ঘরছাড়ানো আকর্ষণ। আমি আসিনি, আমাকে এনেছে কেউ। আমি যাচ্ছিনে, যাচ্ছে অন্য কেউ আমার পায়ে পায়ে। সেই দেখছে, সেই দেখাচ্ছে, জানাচ্ছে সেই,—আমার অস্তিত্ব তারই চেতনায়। আমি আছি চর্মচক্ষু মেলে,—দেখছে সে।

কোটদ্বারের পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছিলুম।—

হিমালয় পরিক্রমা শেষ হয়ে এলো বইকি। ডায়েরীও প্রায় শূন্য হ'তে চলেছে। এই ঝুলি সম্পূর্ণ শূন্য করে যেতে চাই এই যাত্রায়। কিন্তু দক্ষিণ গাড়োয়ালের হৃষিকেশে না পৌঁছতে পারলে সর্বস্বান্ত হবার পরম আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই পরিক্রমা শেষ হোক হৃষিকেশে। তেত্রিশ বছরের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে শূন্য ঝুলিটি ফেলে দিয়ে যাবো নীলধারায়। ওইটি আমার শেষকৃত্য।

*　　　　*　　　　*

'কালদণ্ড' পর্বতের চূড়ায় উঠেছি। আধুনিক মানচিত্রে 'কালদণ্ড'র উল্লেখ নেই কোথাও, তার স্থলে বসানো হয়েছে 'লান্সডাউন'। কোটদ্বার থেকে লান্সডাউন পঁচিশ মাইল পার্বত্য ও উপত্যকাপথ। গাড়ি যায়।

সুদূর সমতল ভারত দক্ষিণে, এবং উত্তরে তুষার গিরিশ্রেণীর কয়েকটি পরিচিত শিখর,—এই দুই দৃশ্যের সন্ধিস্থল হলো 'কালদণ্ড' পর্বত। এদিকে চোখ ফেরাও, ওদিকে মুখ ঘোরাও—দেখে নাও বিরাটের আনন্দস্বরূপ। মহাকালের অতন্দ্র প্রহরী।

তবু স্বীকার করবো, কোনও আমন্ত্রণ নেই লান্সডাউনে। কেউ ডাকে না,—এসে পড়লে কেউ জায়গা দিতেও নারাজ। সেইজন্য লান্সডাউন থাকে অনেকটা যেন লোকলোচনের বাইরে। সন্দেহ নেই, এককালে কর্তৃপক্ষও এটি চেয়েছিল। এটি 'গাড়োয়াল রেজিমেন্টের' প্রধান কেন্দ্র। এই রেজিমেন্টের সঙ্গে বাইরের অন্যান্য পার্বত্য অধিবাসী অথবা সমতলবাসীর যোগাযোগ না থাকে—এই ছিল উদ্দেশ্য। ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ আমলে ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

ছোট্ট এই শহরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়; বুঝতে পারা যায় এই অসমতল মালভূমিটি প্রস্তুত করতে এককালে সময় লেগেছিল। সরু সরু পথ এখানে ওখানে পাহাড়ী বস্তির গা ঘেঁষে নীচের দিকে নেমে গেছে। ক্ষুদ্র এক পাহাড়ী শহরের দোকান বাজার যতটুকু হওয়া সম্ভব—এখানেও তাই। অভাব এবং দারিদ্র্য চারিদিকেই প্রকট। ওদেরই আনাচে কানাচে আবশ্যিক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার নিয়ে বসে গেছে মাড়োয়ারির দোকান,—দরিদ্র এবং স্বল্পবিত্ত পল্লীবাসীর মাঝখানেই নাকি খুচরো ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটে কিছু দ্রুতগতিতে।

মালভূমিটি প্রশস্ত, কিন্তু এর বাইরে সমতল বলতে আর বিশেষ কিছু নেই। এর পাশেই গাড়োয়াল রেজিমেন্ট-এর সুবিস্তৃত গোরাছাউনী। লান্সডাউনের ওটাই সকলের বড় পরিচয়। কাঁটাতারের বেড়া-দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে, ভিতরে ভিতরে পাকা বাংলো অসংখ্য,—ওদেরই মধ্যে কুচকাওয়াজের ময়দান, অস্ত্রশালা আর দপ্তর। বোধ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে একমাত্র গাড়োয়াল রেজিমেন্ট,—যার সৈন্যদল পাহাড়পর্বতের বাইরে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বসবাস করতে চায় না। নেপালী গুর্খারাও বরং উত্তাপ সইতে শিখেছে, কিন্তু গরমের দেশের কথা উঠলে গাড়োয়ালীরা আতঙ্কিত হয়। এই রেজিমেন্ট-এর চিরস্থায়ী বসবাস এবং হিসাব নিকাশের দপ্তর হলো এই লান্সডাউন, —এবং হিমালয়ের ভিতরে ভিতরে বহু অঞ্চলে এরা পাহারা দেয়। কঠিন পরিশ্রম, কঠোর জীবনযাত্রা, অনন্যসাধারণ নির্ভরযোগ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতা—ইত্যাদি গুণাবলী এদেরকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। মনে পড়ে গেল একটি ঘটনার কথা। বোধ হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। সেটি আইন অমান্যের যুগ, এবং গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত পাঠান খোদা-ই-খিৎমদগারগণের সীমান্তব্যাপী আন্দোলন। বোধ করি পেশাওয়ার রেল স্টেশনের নিকট দাঁড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি গাড়োয়ালী সেনাদলের উপর হুকুম দিলেন, শোভাযাত্রাকারী নিরস্ত্র এবং অহিংস পাঠানদের উপর গুলি চালাও! সম্ভবত সেই প্রথম গাড়োয়াল রেজিমেন্ট বেঁকে বসলো, কারণ অহিংস ও নিরস্ত্র পাঠানদেরকে তারা হত্যা করতে প্রস্তুত নয়!

সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপীড়িত হৃদয় চাপাকণ্ঠে এই গাড়োয়ালী রেজিমেন্টকে আশীর্বাদ করেছিল। কিন্তু এই 'অবাধ্যতার' জন্য সেই বিশেষ গাড়োয়ালী সেনাদলটি পরবর্তী সতেরো বৎসরকাল অবধি নিঃশব্দে ইংরাজের হাতের শাস্তি বহন করেছে, তার কঠোরতা আমাদের অনেকেরই অগোচরে ছিল।

আগেই বলেছি লান্সডাউনের প্রাচীন নাম 'কালদণ্ড' পর্বত, এবং এই 'কালদণ্ডে'র ঠিক নীচেই ছিল দুটি প্রাচীন তীর্থমন্দির—কুমারী শাকম্ভরী ও কালেশ্বর মহাদেব,—যার উল্লেখ পাওয়া যায় কেদারখণ্ডে। এককালে অরণ্যে আকীর্ণ ছিল পাহাড়ের নীচের দিক,— জন্তুজানোয়ার বছরের অধিকাংশকাল এখানে অবাধে রাজ্যপাট চালাতো। তখন বছরের বিশেষ-বিশেষ পর্বে গাড়োয়ালীরা এসে পাহাড়ের তলায় এই দুটি মন্দিরে কেবল পূজা দিয়ে যেত। এমনি করে গেছে বহুকাল। কেউ বলে পাঁচশো বছর, কেউ বা বলে আরও বেশী। আধুনিক কালে এসে দেখি, ঠাণ্ডা পাহাড়ের নিরিবিলি অঞ্চল খুঁজতে বেরিয়েছে ইংরেজ। ডালহাউসী, মুসৌরী, নৈনীতাল, শিমলা, রানীক্ষেত—এরা একে একে গড়ে উঠেছে দুটি শ্রেণীর জন্য। একটি হলো শাসক ইংরেজ, অন্যটি রক্ষক ইংরেজ। শাসক হলো বড়লাট, রক্ষক হলো জঙ্গীলাট। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'কালদণ্ড' নামটি অপসারিত করে তার স্থলে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লান্সডাউনের নামে এই পর্বতচূড়াটির উপরে গাড়োয়াল রেজিমেন্টকে বসিয়ে ক্ষুদ্র একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। লান্সডাউন থেকে পঁচিশ মাইল পথ নীচে নেমে গেলে কোটদ্বারের ক্ষুদ্র রেলস্টেশন। ইদানীং এই কোটদ্বার থেকে বদরিনাথ যাবার জন্য মোটরবাস চলাচল করছে। এ গাড়ি কর্ণপ্রয়াগ ও চামোলী হয়ে পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাচ্ছে, সেখান থেকে বদরিনাথ আর মাত্র বাকি থাকে আটত্রিশ মাইল। হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য পথ প্রতিনিয়তই সুগম ও সহজসাধ্য হচ্ছে।

কালেশ্বর মহাদেবের নিভৃত বনময় মন্দিরটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। বনে বনে

পাখির কূজনগুঞ্জন ছাড়া আর কোনও প্রকার কলরব নেই। সামনে রয়েছে বলীবর্দ মূর্তি: একটি ঘন্টা দুলছে—ওটার মৃদু গম্ভীর রবে গাড়োয়ালীরা মাঝে মাঝে এসে কালেশ্বরের যোগতন্দ্রা ভাঙাবার চেষ্টা পায়। এখানে ওখানে ছায়ানিরিবিলি দু-তিনটি পাকা ঘর, একটি অঙ্গন,—এর বাইরে পাহাড়ের তলায়-তলায় চলে গেল বনপথ। এদের নিয়েই থাকেন পূজারী,—তিনি অতি ভদ্র একটি আত্মভোলা মানুষ। মন্দিরটির কোনও চাকচিক্য নেই বলেই সহজে শ্রদ্ধা আসে। হয়ত এর বয়স বছর ষাট সত্তরের বেশী নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, কেদারখণ্ডে উল্লিখিত ঠিক এই স্থলেই পঞ্চাশ বছর আগে ওই কালেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় বনের মধ্যে,—সেই লিঙ্গই পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সত্য মিথ্যার সমস্ত দায়িত্ব রয়ে গেল স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে,—যাদের শ্রদ্ধায়, সেবায়, পূজায়, ভালোবাসায় কালেশ্বর জাগ্রত। দেবতার অস্তিত্ব হলো বিশ্বাসে,—বাইরে কিছু নেই।

বিদায় নিচ্ছিলুম শাকম্ভরী মন্দিরের কাছে—লান্সডাউন বাজারের নীচের দিকে মন্দির। পাশ দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ী বস্তির পথ। কোথাও কোথাও সপরিবারে থাকে কয়েকজন গাড়োয়ালী সৈনিক,—যারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়। রেজিমেন্ট আছে বলেই শহর আছে, প্রাণধারণের সংস্থান আছে। সৈন্যদলের মধ্যে গাড়োয়ালী গুর্খার সংখ্যাও কম নয়। কালক্রমে গাড়োয়ালীর মধ্যে নানা শ্রেণী মিশে গেছে।

যূথভ্রষ্ট লান্সডাউনের শিখরলোক—চারিদিকে এর অন্তহীন অবকাশ। হঠাৎ চূড়াটি যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে হাজার ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতাব উপরে,—যেন দলছাড়া। ফলে, দক্ষিণে দেখা যায় অনন্ত অরণ্যসমাকীর্ণ তরাই, এবং উত্তরে তুষারমৌলী হিমালয়। যে-দৃশ্যটি রানীক্ষেত এবং কৌসানী থেকেও পুরোপুরি দেখা যায় না,—এখানে তারা অধিকতর প্রত্যক্ষ। সেটি হলো কেদারনাথ এবং বদরিনাথের পাশাপাশি দুটি শ্বেতচূড়া। ওরা হলো গাড়োয়ালের আদি দেবতা,—ওরা নিত্যপূজা।

কালদণ্ডের কাছে বিদায় নিয়ে পাকদণ্ডী পথে ঘুরে ঘুরে নামছিলুম। সুন্দর ও মসৃণ প্রশস্ত পথ চারিদিকের দিগ্বলয়কে যেন চোখের সামনে ঘোরাচ্ছে। এমন নির্জন বনময় পথও যেমন সহসা চোখে পড়ে না, তেমনি এই অল্পসংখ্যক মাইলের মধ্যে এমন চড়াইও সচরাচর দেখা যায় না। এর বাইরে দেখা যাচ্ছে লান্সডাউনে দ্রষ্টব্য আর কিছু নেই,—কিছু রাখাও হয়নি। কেউ যেন লান্সডাউনের আকর্ষণ খুঁজে না পায়, এই ছিল লক্ষ্য। সেই কারণে যদিও একটি সামান্য ও শৃঙ্খলাহীন ক্ষুদ্র হোটেল আবিষ্কার করা যায়, ভদ্র বাসস্থান কোনও মতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইরের লোকের অভ্যর্থনা এখানে কোথাও নেই।

অবকাশ সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো, ঘুরে-ঘুরে তলিয়ে নেমে যাচ্ছি, চীড়বনের ভিতর দিয়ে নেমে যাচ্ছি 'দুগাড্ডার' দিকে। একদিকে পার্বত্য অবণ্য, অন্যদিকে বিস্তৃত অতিকায় পাহাড় তার অতিপ্রকৃত মহিমা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছায়াছমছমে পথ ঝিল্লিমুখরিত। পথের পাশে পাশে গভীর খদ, নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে 'খো' নদী। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যেন ঘুম জড়িয়ে রয়েছে গুহায় গহ্বরে পাথরে,—সেই ঘুম হাজার হাজার বছরের। চারিদিকের আকণ্ঠ স্তব্ধতার মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে রয়েছে অমৃতের পরম আস্বাদ,—সেটি খুঁজে পাবার জন্য উৎসুক অধীর মন যেন ছোঁক ছোঁক করে। এবারের মতো বিদায় নিয়ে যাচ্ছি হিমালয়ের কাছে।

'উমরাওখান' নামক একটি ঘাঁটি পাহারা পার হলুম, এ পথ দিয়ে যাবার সময়

একবার সেলাম ঠুকে 'ষোল আনা' প্রবেশমূল্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এটি পাহাড়ী ছোট্ট বস্তি, চতুর্দিকে অরণ্য। গাড়ি কিছুক্ষণ থামে বলেই এখানে একটি চায়ের দোকান পাওয়া যায়। পাশে পাশে 'খো' নদী বয়ে চলেছে। তার ধারা কখনও বাঁ দিকে, কখনও বা দক্ষিণে। এখান থেকে 'দুগাড্ডা' পৌঁছবার মাইল দুই আগে একটি শাখাপথ চলে গেছে বদরিনাথের দিকে, এটি বহুদূর অবধি পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

'দুগাড্ডায়' এসে পৌঁছলুম। 'খো' নদীর উপরেই একটি জনবহুল ছোট প্রাচীন শহর। এই শহরের দু-দিকে খদ বলেই হয়ত এর নাম দুগাড্ডা। যেটি বাজার অঞ্চল সেটির নাম 'গান্ধী চৌক'। বস্তি, নালা, ঘিঞ্জি এবং দারিদ্র্য,—সমস্ত মিলিয়ে যেন হতশ্রী। এটি উপত্যকা, এবং চাষবাস আছে। অদূরের পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে একটি শ্বেতবর্ণ শিবমন্দির, এবং 'খো' নদীর ধারে একটি মসজিদ। 'দুগাড্ডা' থেকে একটি পথ বেঁকে চলে গেছে গাড়োয়ালের প্রধান কেন্দ্র 'পৌড়ী'র দিকে। 'পৌড়ী' এখান থেকে চল্লিশ মাইল, এবং কোটদ্বার দক্ষিণে দশ মাইল মাত্র। 'খো' নদীর ধার দিয়ে-দিয়েই আমাদের মোটরবাস কোটদ্বার শহরের দু-মাইল দূরে এসে পৌঁছলো। এই পথটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অশোক মার্গ', এবং আমরা যে প্রশস্ত রাজপথটি ধরে 'গান্ধীভবন' নামক হোটেলে এসে পৌঁছলুম, সেটির নাম 'রবীন্দ্র মার্গ'। বস্তুত, গত পনেরো বছরের মধ্যে চারজন ব্যক্তির নামে ভারতের সংখ্যাতীত শহরে এবং হিমালয়ের নানা অঞ্চলে অনেকগুলি রাজপথ উৎসর্গ করা হয়েছে,—তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র এবং পণ্ডিত নেহরু।

অরণ্যের সীমানায় হলো কোটদ্বার। ছোট্ট রেলস্টেশন—তাও যেন অনেকটা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শহরটি যেন মোটরবাসেরই একটি প্রধান আড্ডা। বদরিনাথের যাত্রীর কলরবে ইদানীং এই শহর গ্রীষ্মকালে মুখরিত থাকে। অধিকাংশ যাত্রী পায়ে হাঁটা তীর্থ পরিক্রমা এখন ত্যাগ করেছে, তারা গাড়িতে যায় 'চামোলী' ছাড়িয়ে। ফলে, মধ্যপথে যে সকল যাত্রীশালা ও 'চটি' ছিল, যাত্রীদেব মুখ চেয়ে সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে যারা অন্নসংস্থান করতো, তারা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। মাঝপথের গ্রাম, বস্তি, মন্দির, চটি—এদের দুর্গতি বেড়ে উঠছে যেমন দিন-দিন, তেমনি যাত্রীদের পক্ষে এখন পথের দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রমও কমছে। তীর্থপথ অপেক্ষা তীর্থক্ষেত্রই এখন তীর্থযাত্রীদের প্রধান লক্ষ্য।

অরণ্যের সীমানা দিয়ে কোটদ্বার থেকে একটি পাকা রাস্তা চলে গেছে হরিদ্বারের দিকে। পঁয়ত্রিশ মাইল পথ, এবং এপথে মোটর বাস চলে। কিন্তু অসুবিধা এই, বর্ষার ভাঙনে এ পথটি অগম্য হয়ে ওঠে, সেই কারণে নভেম্বরের মাঝামাঝির আগে এটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এটি অরণ্যপথ, এবং পাহাড়ের তলায়-তলায় এটি এঁকে-বেঁকে গঙ্গার মূলধারার দিকে চলে গেছে। পথে ছোট বড় অনেকগুলি গিরিনদী পার হয়ে যেতে হয়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

হৃষিকেশ নীলধারা

হিমালয় শত পাকে বেঁধে রেখেছিল বহুকাল। সেই বাঁধন কাটতেও লেগে গেল অনেকদিন। ক্লান্ত দুই পা এবার বিশ্রাম চাইছে সেইখানে, যেখানে তেত্রিশ বছর আগে একদা যাত্রা শুরু হয়েছিল। অতএব আবার সেদিন হরিদ্বার ছাড়িয়ে এসে পৌঁছলুম হৃষিকেশে। এই হৃষিকেশেরই উত্তর প্রান্তের বিশুষ্ক চন্দ্রভাগার নুড়ি তুলে একদা কপালে ঘষে মনে-মনে স্থির করেছিলুম, হিমালয় পরিক্রমা এখান থেকেই শুরু হোক। কিন্তু ঠিক এইখানে এসে সেই পরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটবে, তরুণ বয়সে এ কথাটা সেদিন মনে হয়নি। জীবনের অপরাহ্নকাল ঘনিয়ে এসেছে, বেলা আর বাকি নেই, চূড়ায় চূড়ায় রাঙারৌদ্র দেখা যাচ্ছে। সুদূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিহঙ্গের ডানায় এসেছে ক্লান্তি। সৌরবিশ্বব্যোমের অনন্ত নিদ্রা তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। এবার বিদায় নেবো।

ঝোলাঝুলি নিয়ে দাঁড়ালুম পথে। কর্কশ পাথর-কাঁকরের রুক্ষরৌদ্রপথ, কিন্তু এর টান হলো জীবনজোড়া। কতবার এসেছি এখানে, সংখ্যা গণনা করিনি। যতবার গান গেয়েছি, সব শেষে সমে এসে ঠেকেছি এই হৃষিকেশে। দুঃখে অপমানে আঘাতে নরকযন্ত্রণায় কতবার অভিশপ্ত পৃথিবীকে ফেলে পালিয়ে এসেছি এখানে,—সহসা পরম বিস্ময় যেন তার রহস্য তোরণদ্বার খুলে ভিতরে ডেকে নিয়েছে। ঝোলাঝুলিকেও মনে হয়েছে বাধা, ফেলে চলে গেছি বার বার,—কিন্তু একবারও হারায়নি, এই দুঃখ। এখানে আজ দেখতে দেখতে পাকাবাড়ি উঠে গেল অনেকগুলি, আধুনিকের অনেক ছাঁচ এসে পৌঁছে গেল, সেতু বাঁধা হলো চন্দ্রভাগায়, রাস্তা পাকা হলো নানাস্থলে, দোকানপাট আর বাজার বসে গেল যেখানে সেখানে, রেলপথ এসে পৌঁছলো 'রাড়েওয়ালা' থেকে, মোটরবাস হাঁসফাঁস করে ছুটে এলো নানাদিক থেকে। এখানেও কালের চাকার সঙ্গে কলের চাকা ঘুরলো। সেই হৃষিকেশকে আজকে যেন আর চিনতে পারা যায় না।

'কালীকম্বলীবাবার' বিরাট ইমারতের পূর্বপাশ দিয়ে অতি পরিচিত পথটি গেছে ঘাটের দিকে, এরই উপব একটি ছবির দোকানের পিছনে থাকতেন সেই আৎমানন্দ, কে যেন তাঁকে এনে দিত 'সদাব্রত' থেকে খান চারেক রুটি আর একটু ডাল,—ওই খেয়ে তিনি রইলেন ছ'বছর। তাঁর দেশ ছিল মধ্যভারতে এবং দু-খানা ছেঁড়া কম্বল ছিল ভরসা। সন্ধ্যার পরে একটি মোমবাতি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। সেই মোমবাতির আলোয় জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নিয়ে আৎমানন্দ উঠে বসতেন। তখন রাত্রির নীলধারার ঝুমুর-ঝুমুর আওয়াজ আসতো ঘরের পাথুরে দেওয়ালের ফাটলে-ফাটলে, আর ছবির দোকান থেকে লছমণের বুড়ি পিসি দোলাই গায়ে জড়িয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসতো গরম কল্‌কেটি হাতে নিয়ে—আৎমানন্দ তখন আরম্ভ করতেন প্রাণায়াম আর যোগসাধনার কথা। একে একে আসতো দেহতত্ত্ব আর অধ্যাত্মবাদ,—বুড়ির চক্ষু বেয়ে জল নামতো, আমিও মুগ্ধমনে বসে থাকতুম। মোমবাতিটি নিভে যেত অনেক রাত্রে। মাঝে মাঝে কোথাও বেজে উঠতো ঘন্টা, কোথাও বা উদার গম্ভীর কণ্ঠে শোনা যেত, বোম শঙ্কর, জয় শম্ভো!

কিছুকাল পরে একবার গিয়ে শুনি, বুড়ি আর আৎমানন্দ দুজনেই মারা গেছে, এবং ছবির দোকান তুলে দিয়ে লছমণ গিয়ে কাজ নিয়েছে কোন্ স্টেশনে। ওখানে বসেছে এখন ছোট ছেলের খেল্‌নার দোকান।

ত্রিশ বছর আগে যখন একবার আসি হৃষিকেশে—বোধ হয় সেটি তৃতীয়বার—তখন 'কালীকম্বলীর' সদাব্রতে ঢুকতে গা ছমছম করতো। ঝুপসি ঘর নিঃসঙ্গ, ভাঙা ভাঙা দালান, পুরনো পাঁচিল, কালো কালো দরজা জানলা,—এ বাড়ির কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ, খোঁজ পাওয়া যেত না। সেই কালের ওই এক অন্ধকার খুপ্‌রি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল এক অতি সুশ্রী ধনবান যুবক। আমারই সমবয়সী, কিছু বড় হতে পারে। নাম কিশোর জৈন, বাড়ি তার আওরঙ্গবাদে। অবাক করে দিল সে আমাকে, যখন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো। নাবালক বয়সে বাড়ির লোকের সঙ্গে আমি কবে গিয়েছিলুম একবার তারকনাথে, কিশোর জৈন নাকি সেই প্রায় বারো বছর আগে আমাকে দেখেছিল তারকনাথে,—সেখানে সে বাপের অসুখের জন্য ধরনা দিতে গিয়েছিল। আমার মনে নেই, কিন্তু কিশোর ভোলেনি। সে-যাত্রায় তিনদিন ধরনা দিয়ে 'ওষুধ' সে পেয়েছিল, সেই ওষুধের জন্যই নাকি তার বাবা বেঁচেছিল পরবর্তী পাঁচ বছর। কিশোর আমাকে কিছু ভাবতে দিল না, এখানে তার আসার উদ্দেশ্য কি জানতে দিল না, কেবল দিনআষ্টেক ধরে ঘূর্ণিবাত্যায় আমাকে টান মেরে উড়িয়ে নিয়ে ঘুরলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে, ঘুরলো নীলধারাব তীরে তীরে. সাধুদের আশ্রমের আনাচে কানাচে। নিয়ে গেল সেই কনখলের আশ্রমে আর গুরুকুলে; নিয়ে গেল দক্ষঘাটে, আর ওই তার দক্ষিণ দিকে 'সতীসমাধিক্ষেত্রে',—যেটির নাম 'সতীকুণ্ড', যেখানে অগণিত সতীমেয়ের অস্থি ও চিতাভস্মের উপবে স্মৃতিফলক বানানো। নিয়ে গেল তেলের আলো-জ্বালা হরিদ্বারের অন্ধকার পথে পথে। রাত্রিবাস করতে লাগলো যে কোনও ধর্মশালায়। পান আর জর্দা খাচ্ছে সে প্রচুর, পানের রস গড়াচ্ছে তার গরদের জামায়, ধুলোয় আর মালিন্যে ওই পরম সুন্দর রূপ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। টাকা পয়সা খরচ করছে অজস্র, প্রয়োজনের বহু অতিরিক্ত। তার হাসিতে আর প্রাণের প্রাচুর্যে পথঘাট মুখরিত। আমি নাকি পৃথিবীতে তার একমাত্র বন্ধু। মোতিবাজারের কোণে এক পানের দোকানে তার নাম হয়ে গেল, 'পানুয়া শেঠ'। সত্যি বলতে কি, অত পান খাওয়া সে-বয়স অবধি আমি দেখিনি। তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলুম তিন সপ্তাহ পর। কিশোর তার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আমার মনে গভীর রেখা টেনেছিল।

পর-পর দু-বার আবার গেলুম হৃষিকেশে,—কিশোর জৈনকে পাওয়া গেল না। ওর মনের মধ্যে আত্মনাশের বীজ ছিল জানতুম। একথাও মনে হতো, ওর একটা পরম মূল্যবান কথা আমার কাছে যেন চেপে রাখলো। আমার অনেকদিনের অনেক প্রশ্ন কিশোর এড়িয়ে গেছে। আমার ধারণা, ওর কোনও একটা পারিবারিক কলঙ্ক ছিল। কিন্তু শিক্ষিত যুবক বলেই সেটি আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

কিন্তু সেইটি শেষ নয়। ডায়েরীতে দেখছি, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে ওর সঙ্গে শেষবার দেখা। ওই পথে 'সত্যনারায়ণের' মন্দিরে গাছপালার ছায়ায় বসে যে-ব্যক্তি ভাঙা গলায় ভজন গান করছিল, সহসা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে দেখি, সে-ব্যক্তি কিশোর জৈনের প্রেতমূর্তি! বয়স ত্রিশ হতে তখনও অনেক বাকি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ষাট হতে দেরি নেই। এক মুখ দাড়ি গোঁফ, ময়লা তামার পয়সার মতো গায়ের রং, শীর্ণকায় চেহারা,

রাশিকৃত ময়লা চুল ঝুলে পড়েছে মাথার চারিদিক থেকে। সেই পদ্মপলাশ চক্ষু আজ দেখলে ভয় করে,—যেন গিলতে আসছে! যাত্রীদের কাছে বোধ হয় কিছু ভিক্ষার আশায় ছিল। আমার ধারণা, আমাকে সে লক্ষ্য করেনি। আমি আত্মগোপন করে ছিলুম।

দু-চারজন ভিক্ষা অবশ্য দিল। কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে একজন হঠাৎ ওর দিকে একটুখানি মনোনিবেশ করে তাকাতেই ও যেন আগুন হয়ে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ একটা বিশ্রী গালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু হট্টগোল বাধবার আগেই মন্দিরের চত্বর থেকে ছুটে এলো একজন সেবক। উভয়ের মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিয়ে সে কিশোরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পথে বার করে দিয়ে এলো। তারপর সেই ভদ্রলোটিকে বললে, উনকো দেমাক ঠিক নহি হ্যায়, শেঠজি। বেহুঁস আদ্‌মি হুঁ।

পা দু-খানা পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিশোর জৈন বার দুই ফিরে-ফিরে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। তার সেই খুনে চেহারা লক্ষ্য করে কেউ-কেউ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেবকটির কাছে খবর নিয়ে জানলুম, ও হলো এক বোরেগী, এই অঞ্চলেই থাকে। তবে ওর মাথার কিছু দোষ আছে। লোকটা ক্ষয়রোগে ভুগছে, এবং রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে।—এইটুকুর মধ্যেই কিশোর জৈনের সমস্ত জীবনের পরিচয় ধরা রয়েছে।

কিশোর জৈনের জন্য কাঁদবার কেউ থাকলে সেদিন আমিও কাঁদতুম বইকি।

মীনবাহিনী গঙ্গার নীলধারা হিমালয়ের জটিল জটাবন্ধন খুলে ছুটে নেমে এসেছেন হৃষিকেশে,—প্রথম মর্ত্যলোকে নেমেছেন জাহ্নবী। যত গঙ্গা আছে উত্তরে,—সকলকে ধারণ করেছেন তিনি আপন নীলধারায়। যদি কেউ বলে এটি স্বর্গ আর মর্ত্যের সন্ধিস্থল,—বিশ্বাস করে নেবো। এই নীলধারার ঘাটে বসে অনেকদিনের বেলা গিয়েছে কেটে,—অনেক সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে রাত্রে। এই হৃষিকেশের ঘাটে নেমে অবগাহন করেছে ভারতের সকল সম্প্রদায়,—মারাঠী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, বিহারী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, উত্তরপ্রদেশী,—সবাই। কিন্তু স্থানীয় লোকরা বলে, হৃষিকেশের সর্বাপেক্ষা ভক্ত হলো বাঙালী। বাঙালীর আশ্রম, বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, বাঙালীর সেবা ও শিক্ষাদান,—এ অঞ্চলে সুবিদিত। হৃষিকেশ এবং লছমনঝুলা অঞ্চলে বাঙালীর একাধিক ভূসম্পত্তি আজও রয়েছে, এবং লছমনঝুলার নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা মনোরম অঞ্চলে পাহাড়ের কিনারায় দু-খানি বাঙালীর বাড়ি আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঔষধ বিতরণের কেন্দ্রটির কথা কে না জানে! স্বর্গাশ্রমের পথে বহু বাঙালী সাধু এবং শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মপরিচয় গোপন করে অধ্যাত্ম তপস্যায় রত আছেন,—একথা কারো অবিদিত নেই। তাঁরা ভিন্ন ভাষা এবং অবাঙালী পরিচ্ছদের অন্তরালে নির্জন পাহাড়ের আশে-পাশে কুটির বানিয়ে থেকে গেছেন অনেককাল। বছর পনেরো ষোল আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক প্রৌঢ়া বাঙালী গৃহিণী এই অঞ্চলে খুঁজতে খুঁজতে এসে তাঁর গৃহত্যাগী স্বামীকে সাধুর বেশে সহসা এক কুটিরে নাকি দেখতে পান। স্বামী তখন যোগসাধনায় নিমীলিতনেত্র ছিলেন। কিন্তু চোখ খুলে তিনি তাঁর গৃহিণীকে সহসা সামনে দেখেই আঁৎকে ওঠেন, এবং উঠে দাঁড়িয়ে ভগ্নকণ্ঠে চেঁচান, 'তুমি এখানেও ধাওয়া করেছ?'—এই বলে তিনি পাগলের মতো একদিকে ছুটতে থাকেন। স্ত্রী এবং কর্তার শ্যালক অনেক ছুটোছুটি করে বুঝি পুলিশের সাহায্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু দু-দিন পরে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ গঙ্গার জলে খুঁজে পাওয়া যায়। দু-তিনখানা বড় বড় পাথরের খাঁজে লাসটি আটকে ছিল।

'কালীকম্বলীর' নীচের তলাকার ওই পশ্চিমের এঁদো ঘরখানায় একদা এসে উঠেছিলেন কাশীর পাঁড়ে-হাউলীর পুষ্পদিদিরা। বিধবা পুষ্পদিদির সঙ্গে ছিল তাঁতীবৌ আর স্নেহলতা। স্নেহলতার চোখ ছিল কটা, পরনে থাকতো খদ্দরের থান, মানুষটা ছিল ক্ষণমর্জি এবং একগুঁয়ে। শাসন মানতো না স্নেহলতা, এবং সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ওই নীলধারার তুহিন ঠাণ্ডা জলে সাঁতার দেবার চেষ্টা পেত। নিজের বয়স এবং বৈধব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল। কায়স্থ মেয়ে ছিল সে, সুতরাং পুষ্পদিদির শাশুড়ি একদিন তাকে ইঙ্গিতে মানা করেন, ব্রাহ্মণের রান্না জিনিস ছুঁতে নেই। সেই অপমানে স্নেহলতা পাশের ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে সারাদিন। সন্ধ্যার সময়ও দেখি, সে একা ঘরে পড়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। সান্ত্বনা দিতে গেলুম, সে ধমক দিয়ে উঠলো। কিন্তু এক সময় নিজেই সে উঠে বসলো। সারাদিন কেঁদে-কেঁদে মুখখানা ফুলেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, তীর্থে সে আসেনি, তীর্থের বয়স তার হয়নি—সে জানে। সে এসেছে তার স্বামীর সন্ধান পাবার জন্য!

চৌকাঠের বাইরে বারান্দায় তামাক সাজতে বসেছিলুম। ঠক্ করে আগুনটা পড়ে গেল হাত থেকে। অবাক হয়ে স্নেহলতার দিকে তাকালুম। আগেই জানতুম কতকগুলো কথাবার্তা বলবার জন্য সে দিনতিনেক থেকে উসখুস করছিল। আজ অনেকটা যেন নিজ মনুষ্যত্বের উপর আঘাত খেয়ে বেদনাবোধটা তার ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। সহসা উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসে সে একপ্রকার চেঁচিয়ে উঠলো, এবং আমাকে নিকট-সম্ভাষণ করে তিরস্কার করলো,—তুমি যদি বিশ্বাস না করো, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। ফের বলছি আমিও বিশ্বাস করিনি! পৃথিবীসুদ্ধ লোক বললেও বিশ্বাস করব না।

ফরিদপুরের সেই মেয়ে তার কটা-কটা কান্নাভারাতুর চোখ তুলে সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে ফুঁপিয়ে আবার বলতে লাগলো, না, আমি বিশ্বাস করিনে—সে মরেছে! সে মরেনি, সে মরতে পারে না, তার মরবার কথা নয়। এই তার বুকের ছাতি, এই ডাকাবুকো চেহারা, রূপ যেন ঠিক্‌রে পড়ছে,—সে অমনি মরলেই হলো? কখনই না, কিছুতেই না,—আমি তাকে যেখানে পাই খুঁজে বার করবো! তারই জন্যে ঘুরছি আজ এক বছর। তার ওপর রাগ করে বাপের বাড়ি গিছলুম, তারই শোধ সে নিচ্ছে। যাও, আমি কারো কথা শুনবো না!

স্নেহলতা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তাকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া, তাকে খাবার জন্য অনুরোধ করা, তার এই যুক্তিহীন অর্থহীন ছুটোছুটি,—কোনও কথা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া সম্পূণ বৃথা। সেদিন তাঁতীবৌকে আড়ালে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠিক ব্যাপারটা কি বলুন ত?

তাঁতীবৌ হাসিমুখে বললে, মরবার সময় স্বামীকে দেখতে পায়নি, তাই সকলের ওপর আক্রোশ। একবার যখন রোখ্ চেপেছে, দিন দুই পড়ে-পড়ে কাঁদবে, মুখে অন্নজল দেবে না,—ভয়ানক রক্তের তেজ! আসলে মেয়েটা কিন্তু ভারি সরল!

সরল, না বোকা?

তাই হবে।—তাঁতীবৌ চলে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চামচিকারা ছুটোছুটি করছিল। তামাকের সজ্জা হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেলুম।

এরই বছর তিনেক পরে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে স্নেহলতাকে হঠাৎ দেখেছিলুম

কলকাতায় হাজার হাজার নরনারীর ভিড়ের মধ্যে। পরনে ময়লা খদ্দরের থান, ধুলোয় ভরা দুই পা, কালিবর্ণ গায়ের রং, খড়ের আঁটির মতো মাথার চুল, কোমরে একটি ছোট্ট পুঁটলী, শীর্ণকায় চেহারা,—স্নেহলতা একা যেন কোন্দিকে চলেছে হনহনিয়ে। ভিড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

ওর এই কাহিনীটি নিয়ে কবে কোথায় যেন একটি ছোট্ট লেখা লিখেছিলুম,—সেই লেখাটা আর খুঁজেও পাইনি।

এই 'কালীকম্বলীর' সদাব্রতের রান্নামহলটি দেখলে আজও অবাক হই। বিশাল এক চুল্লি, ভয়াবহ তার ডালের কড়াই আর বিস্তৃত তার আটা শানবার পাত্র, বিপুল পরিমাণ খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা। আয়োজনের ব্যাপারটা আগাগোড়া সমস্তই বৃহৎ। বৈরাগী, সন্ন্যাসী, সাধক,—এরা বিনামূল্যে খেতে পায়। কেউ বসে খায়, কেউ নিয়ে যায়, কেউ বা রসদ নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে প্রস্তুত করে খায়। যতদূর যাও গাড়োয়ালে, কালীকম্বলীর 'সদাব্রত' যেখানে সেখানে। নেড়িকুকুরের দল ছোঁক ছোঁক করে ভিতরে আসে, আসে বেপরোয়া পাহাড়ী বানরের পাল,—আসে পরিচয়হীন সর্বহারা অজানা দেশের দুর্বোধ্য ভাষাভাষী মানুষ,—অনেকেই এসে তাদের অস্থায়ী বাসা বাঁধে এই বিশালায়তন প্রাচীন ইমারতের গুহায়-গুহায়। কখনও কখনও ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় একখানা ছেঁড়া কম্বল বা চাটাই, কোথাও একখানা গেরুয়া লেংটি কিংবা টিনের কৌটা, হয়ত কোনও নিরুদ্দেশ বৈরাগীর পরিত্যক্ত পুঁটলী, কোনও তীর্থযাত্রীর উনুনের পোড়া কাঠ কিংবা ভাঙা মাটির ঘট। এরই একটা ঘরে মরে পড়েছিল পণ্ডিত শীৎলাপ্রসাদ,—তার ছেঁড়া কম্বল, গামছা আর রবারের জুতোজোড়াটা নিয়ে গা ঢাকা দিল এক বৈরাগী। আবার এখানকারই ওই নোংরা চাতালে এক আমাশয়গ্রস্ত বৃদ্ধ বেণীনন্দনকে ফেলে পালিয়েছিল তার সহযাত্রীরা। ওরই পাশের ঘরখানায় এসে উঠেছিলেন কলকাতার এক 'রায়বাহাদুর' তাঁর জন পাঁচেক চাকরদাসী নিয়ে। সেদিন তাঁর প্রতাপে এই প্রাচীন ইমারত কেঁপে উঠেছিল। এসেছিল উদাসী আখড়ার সন্ত বামাদাস—একখানা ছবি টাঙিয়ে তার দিকে চেয়ে সে হাসতো আর কাঁদতো। আর এসেছিলেন নাগপুর থেকে আম্মল বাঈ—তাঁর সঙ্গে ছিলেন চারজন জামাই, নয়টি সাবালক পুত্রকন্যা, এবং গুনে দেখেছিলুম, চৌদ্দটি নাতিনাতনী। তাঁদের দেখে স্থানীয় একটি লোক পথের ধারে তাড়াতাড়ি একটি পুরি আর তরকারির দোকান বানালো। ওরা সবাই দাঁদুড়ে খেয়েছে যত, তার চেয়ে বেশি বানর তাড়িয়েছে। তারপর সবাই যেদিন চলে গেল, দেখা গেল সমস্ত ঝুপসি ঘবখানার দেওয়ালগুলিতে কাঠকয়লার অসংখ্য আঁচড়ে ওদের বৃহৎ গোষ্ঠী ও বংশাবলীর নাম লেখা। অঙ্গারের সেই পাণ্ডুলিপি হয়ত আজও মোছেনি।

সন্ন্যাসীর কোনও জাত নেই,—ওরা সমস্ত মুছে দিয়ে হৃষিকেশে চলে এসেছে। ওরা আছে চারিদিকে ছড়িয়ে—পাহাড়ের পাশে, নদীর বাঁকে, পাহাড়তলীর গুহায়, মুনি-কি-রেতির তপোবনে, বাঁধা নিয়মের আশ্রমে, মন্দিরের চাতালে,—এবং লোকলোচন ও জনকোলাহলের বাইরে। মাঝে মাঝে কোনও পর্ব উপলক্ষ্যে ওদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। দশহরায়, অক্ষয়তৃতীয়ায়, মাঘী অমাবস্যায়, রামনবমীতে, জন্মাষ্টমীতে, শিবরাত্রিতে ইত্যাদি তিথিতে ওরা শতে শতে বেরিয়ে আসে। ওদের ওই গেরুয়ার বর্ণে আর চেহারায় সমগ্র হরিৎবর্ণ পাহাড়তলী আর নীলধারার নয়নবিমোহন সৌন্দর্য—সব মিলে দূরের থেকে মনে হয়, চার পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাসে যেন পিছিয়ে গেছি,—যখন

আর্যরা নেমে আসছে নদীপথের সূত্র ধরে ভারত সভ্যতার প্রথম উদ্বোধন করতে। সমগ্র পাহাড়ের ক্রোড়ভূমিগুলি, নদীতীর, মন্দির ও আশ্রমঅঙ্গন,—সব যেন রক্তবরণে ভরে ওঠে। তারপর আবার আসে কুম্ভমেলার সময়। তখন বিশাল ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সহস্র সহস্র সাধু এসে পৌঁছয় এই 'গঙ্গাবতরণ' অঞ্চলে,—তখন হৃষিকেশ, কনখল আর হরিদ্বার সব একাকার। ওঁঙ্কারধ্বনি ওঠে তখন হাজার হাজার কণ্ঠে।

এই হৃষিকেশের প্রবেশপথে একদা এসে পৌঁছেছিলেন গান্ধীজির অনুগতা শিষ্যা ইংরেজ নারী শ্রীমতী মীরাবেন। তিনি কর্মযোগিনী, তাই গুরুর নির্দেশ পালন করতে এসেছিলেন এতদূরে। তিনি এখানে একটি গোশালা গড়ে তোলেন গঙ্গার একটি প্রান্তপ্রাঙ্গণে,—সেটি আজও এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। তিনি নাকি অপর একটি গোশালার উদ্বোধন করেছেন হিমালয়ের আর একটি গহন অঞ্চলে গিয়ে, শুনতে পাই। এটি তাঁর সাধনারই একটি অঙ্গ,—সমস্ত পরিচয় মুছে দিয়ে সর্বপ্রকার খ্যাতির বাইরে গিয়ে একটি কর্মজীবনের পরম সার্থকতার পথ বেছে নেওয়া,—বিদেশিনীর পক্ষে বিচিত্র বইকি। তবু তিনি একা নন,—ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, মার্কিন, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়,—অনেক দেশ থেকে এসেছে জ্ঞানপিপাসু, সজ্জন, দার্শনিক, সাধু,—তারা ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে, তাদের অনেকেই রয়ে গেছে হৃষিকেশের এখানে ওখানে। মোটরবাসের ধুলো, পর্যটকের কৌতূহলী চক্ষু, বাস্তব জীবনের লাভ-ক্ষতি-টানাটানির কোলাহল,—এরা তাদের আশ্রম পর্যন্ত পৌঁছয় না। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ অবধি বহু সাধুসন্ন্যাসীর কুটিরদ্বার রুদ্ধ থাকে। অনেকে সরে যায় দূর পাহাড়ের দিকে,—কারণ এই সময়টায় থাকে বায়ুবিলাসী ও স্বাস্থ্যান্বেষীর জনতা,—তাদেব মধ্যে এক শ্রেণীর নরনারী নোংরা কৌতূহল আর প্রমোদপ্রবৃত্তি নিয়ে ওদের আনাচে কানাচে ঘুরে ওদেরকে অস্থির করে তোলে। তথাকথিত সভ্য আর শিক্ষিতকে দেখলে ওরা ত্রস্ত হয়। ওরা থাকে জীবনজোড়া জিজ্ঞাসা নিয়ে,—অস্তিত্বের তত্ত্বানুসন্ধানে ওদের দিন কাটে, ওদের প্রাণচৈতন্য আকাশের তারায় তারায় নিবিড় অস্থির পিপাসাবিন্দুর মতো নিত্য ঘুরে বেড়ায়,—তোমার-আমার ক্ষুদ্র কৌতূহল পিপীলিকার দংশনের মতো ওদের নিকট বিরক্তিকর।

নীলকণ্ঠ পর্বতের নীচে দুই বিশাল পাহাড়ের বক্ষ বিদীর্ণ করে দিগ্বিজয়িনী নীলবর্ণা গঙ্গা ছুটে এসেছেন মর্ত্যে তাঁর নাচের ঝঙ্কার তুলে,—সেই ঝঙ্কার-ঝনকে হৃষিকেশ নিত্যকাল ধরে মুখরিত। হিমালয়ের প্রস্তর-চক্রান্ত হার মেনেছে তাঁর কাছে। অতিকায় পাথরের অন্তরায়, উত্তুঙ্গ উচ্চতাব বাধা,—এরা তাঁর দুরন্ত রণরঙ্গের কাছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, একে একে তিনি ব্রহ্মলোক দেবলোক তপোলোক পেরিয়ে ছুটে এসেছেন মর্ত্যের মানবসংসারের দিকে। কিন্তু শূন্য হস্তে তিনি নেমে আসেননি। ওই অমৃতরসধারার সঙ্গে এনেছেন ভারতের মহাজীবনের প্রাণ, এনেছেন বেদ-বেদান্ত-দর্শন-উপনিষৎ, এনেছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। হৃষিকেশ হলো সেই প্রথম মর্ত্যভূমি—যেখানে গঙ্গার ঝঙ্কারে শোনা যায় ভাগীরথীর প্রথম প্রতিজ্ঞার ভাষা,—তিনি প্রাণের দ্বারা প্লাবিত করবেন আর্যসভ্যতাকে, কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যহের জীবনকে তিনি সঞ্জীবিত করবেন, তিনি আনবেন শুচিতা, স্বাস্থ্য, আয়ু, আনন্দ ও কল্যাণ। জাহ্নবীধারার দুই প্রান্তে জন্ম নিয়েছে নগরসভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বিবিধ শিল্পকলা, সাহিত্য ও মহাকাব্য। গঙ্গার মূলধারা ও তার শাখানদী উপনদী প্রশাখানদীর কূলে-কূলে চিরকাল জন্ম নিয়েছে অতিমানব, সাধক, শিল্পী, মহাকবি, দার্শনিক ও তত্ত্ববিদ্। সেই গঙ্গার প্রথম অবতরণক্ষেত্র হলো এই ব্রহ্মপুরা

গাড়োয়ালের ভূস্বর্গপ্রান্ত হৃষিকেশে।

ওই হৃষিকেশের ঘাটে চন্দ্রপক্ষ কেটে গেছে কতবার। ওই নীলধারার আকুলিবিকুলির মধ্যে বিগলিত চন্দ্র কেঁদে কেঁদে বয়ে গেছে তেত্রিশ বছর। পাথরের আসনে বসে দেহতত্ত্বের গান গেয়ে উঠে গেছে জীবনবৈরাগী, রাতজাগা কোন্ অস্থির পাখি হিমালয়ের অনন্ত আনন্দ-মহিমার সংবাদ বিতরণ করেছে আমার কানে কানে। বটের ঝুরির নীচে সন্ন্যাসী তার ধুনি জ্বালিয়ে বসে তন্দ্রাজড়ানো কণ্ঠে 'শিবশম্ভোর' উদ্দেশে ডাক দিচ্ছে, দূর কোনও দেবালয়ে বেজে যাচ্ছে মৃদু উদাত্ত ঘন্টারব। তখন ওই জ্যোৎস্নার নীচে প্রতি ছায়াচারীকে মনে হয়েছে দেবতার প্রতীক, প্রতি সন্ন্যাসীকে মনে হয়েছে অজর অমর মহর্ষি বেদব্যাস, প্রতি পাথর হয়েছে শিবলিঙ্গ, প্রতিটি ধুনিকে মনে হয়েছে তপোবনের হোমাগ্নি আভা।

স্বর্ণলঙ্কার রাজা রাবণ ছিলেন ত্রিভুবনবিজয়ী; তাঁকে সম্রাট বলতে বাধে না। তিনি ছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এবং আনুষ্ঠানিক। দশ দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল, তাই তিনি দশমুণ্ড। তিনি সাধক, পণ্ডিত, প্রেমিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শক্তি ও সাধ্যে তিনি ছিলেন অজেয়, তাঁর বীর্যবত্তা কৈলাস পর্বতের প্রান্ত থেকে শ্রীলঙ্কা অবধি সুবিদিত ছিল। ব্যক্তিত্বে, বিক্রমে, প্রবল প্রতিষ্ঠায়, অনন্যসাধারণ রণকৌশলে তৎকালে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন। আত্মশক্তিব প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। কিন্তু শক্তি তাঁর আসুরিক, দৈব নয়,—ওইখানেই ছিল বিতর্ক। তাঁর রাজনীতির মূল আদর্শটা দাঁড়িয়েছিল স্বৈরাচার হিংসার উপরে, সেটি উদারনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না। সম্ভবত আর্যজাতির সঙ্গে তাঁর বিবোধের মূল কারণ এইখানে। আর্যরা চেয়েছিল সর্বভারতীয় ঐক্য, তিনি চেয়েছিলেন অসুরশক্তির প্রভুত্ব। সুতরাং রাম-রাবণের যে সংগ্রাম সেটি নর এবং বানরের গদাযুদ্ধের কৌতুকের মধ্যে শেষ হয়নি, সেটি সকল দেশের চিরকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের ন্যায়নীতি ও আদর্শের বিশাল পরীক্ষার ক্ষেত্র। ভারত সংস্কৃতির এই মূল ভাষ্যটি বিবর্তিত হয়ে এসেছে কল্পে ও কল্পান্তে। পুরাণে, ইতিহাসে, আধুনিকে এরই পুনরাবৃত্তি। প্রাক্‌বৈদিক যুগে সমুদ্রমন্থনে মহাদেবকে যে হলাহল পান করতে হয়েছিল, একালে এসে গান্ধীজিকেও প্রায় সেই প্রকার বিষ গলাধঃকরণ করতে দেখি। হিটলার এবং স্টালিনের মধ্যে রাজা রাবণের ছায়াও অনেকটা পড়েছিল বইকি।

রক্ষকুলপতিকে সংহার করে আর্যজাতির নেতা সদলবলে এসেছিলেন হৃষিকেশে। এই হৃষিকেশে পৌঁছে রাজা রামচন্দ্র শিবের তপস্যা করেছিলেন,—দেবাসুরের সংগ্রামকালে যিনি হলাহল পান করে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। সম্ভবত নীলকণ্ঠই রামচন্দ্রকে এই নির্দেশ দেন, ব্রাহ্মণকে তুমি হত্যা করেছ, সেজন্য তোমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। রামচন্দ্র হৃষিকেশ থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে 'তপোলোকে'র প্রান্তে গিয়ে দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হন এবং গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানকালে বোধকরি ব্রহ্মহত্যারও প্রায়শ্চিত্ত করেন। ব্রহ্মপুরার পথে এই হৃষিকেশ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় ভরতজীর মন্দির, লছমনঝুলার সাঁকোর পাশেই লক্ষ্মণের মন্দির, মুনি তথা 'মৌনি-কি-রেতির' তপোবনে শত্রুঘ্নজীর মন্দির, এবং দেবপ্রয়াগে রয়েছে রামচন্দ্রের মন্দির।

পরবর্তী যুগে মহর্ষি বেদব্যাস এসে হৃষিকেশে আসন নিয়েছিলেন। তিনি এখানে দুটি প্রধান কর্ম সম্পাদন করেন। প্রথমটি হলো বেদবিভক্তি। বেদকে তিনি এখানে বসে চার ভাগে ভাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় কর্ম হলো 'কেদারখণ্ড' রচনা। সম্ভবত কেদারখণ্ডের

দ্বিতীয় নাম শিবপুরাণ। কিন্তু এই রচনায় শিবস্তোত্রই প্রধান নয়, এটি হলো সমগ্র ব্রহ্মপুরা তথা গাড়োয়ালের একটি প্রামাণ্য এবং পরোক্ষ মানচিত্র। পৌরাণিক কালের কাহিনী এবং ভূগোলের এমন সার্থক পরিচয় বোধহয় অপর কোনও গ্রন্থে নেই। সেই কারণে মহাভারতের পাশে দাঁড়িয়েও এই 'কেদারখণ্ড' আপন স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য এতকাল ধরে বজায় রেখে এসেছে। জনৈক পণ্ডিত এই গ্রন্থখানির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানি গাড়োয়ালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'গেজেটীয়র'। গাড়োয়ালের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন তীর্থপথ এবং দেবস্থান 'কেদারখণ্ডে' উল্লিখিত রয়েছে।

হৃষিকেশ ছাড়িয়ে উত্তর দিকে পা বাড়ালেই চন্দ্রভাগার ধারা। এই গিরিনদীটির আর কোনও পৃথক নাম আছে কিনা আমি শুনিনি। বৎসরের অধিকাংশকাল এই ধারাটি প্রায় শুষ্ক এবং পাথরের প্রচুর জটলায় আকীর্ণ থাকে, কিন্তু বর্ষায় এই নদীতে ঢল নামে। সম্প্রতি কয়েক বছর হলো এর উপরে সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে, এবং এখান দিয়ে মোটরবাস নরেন্দ্রনগর হয়ে দেবপ্রয়াগের দিকে যায়। এই মোটরপথে বিগত কয়েক বছরে কয়েকটি অপঘাতও হয়ে গেছে। যাই হোক, এই সাঁকো পেরিয়ে আন্দাজ মাইল দেড়েক পাহাড়ের ভিতরে এগিয়ে গেলে এক সময় ডান দিকে লছমণঝুলার পথ, এবং বাঁদিকে চলে যায় আরেকটি পথ কোটদ্বারের দিকে। এই পথের বাঁ দিকে সম্প্রতি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ওঠার জন্য একটি সোপানশ্রেণী নির্মিত হয়েছে, এবং মন্দিরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে গঙ্গার ওপারে স্বর্গাশ্রমের মন্দিরটিকে বড় সুন্দর মনে হয়। মানুষের মহৎ ভাবনাকে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকাল ধরে কত সহায়তা করে এসেছে, এই অঞ্চলটুকুতে আনাগোনা করলে তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। হৃষিকেশের প্রায় প্রত্যেক যাত্রী এই অঞ্চলে লছমণঝুলার সাঁকো পেরিয়ে ডানপথে সাধকদের আশ্রম দেখতে দেখতে স্বর্গাশ্রমের প্রশস্ত মন্দিরপ্রাঙ্গণে নানা প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হন, অতঃপর বিনামূল্যে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে আবার হৃষিকেশে ফেরেন। এই পরিক্রমাটি খুবই আনন্দদায়ক।

পথটি কেবল যে মনোরম তাই নয়। হৃষিকেশ থেকেই যেন আধুনিক ভারত সহসা রূপান্তরিত হয় প্রাচীন ভারতে। একটি অনাদিঅন্তহীন কালের হাওয়া লাগে গায়ে। নির্জন পাহাড়ের মধ্যে পাখির ডাক, উদাস হাওয়ায় এবং নদীর কলধ্বনিতে—এমন একটি মধুর অবসাদের ক্লান্ত সুর মনের মধ্যে কাঁদতে থাকে, যেটি অনির্বচনীয়। হিমালয়ের হাজার হাজার বর্গমাইলের মধ্যে এইপ্রকার পর্বতরহস্যনির্গত নদীপ্রাকৃতের শোভা আছে শত শত,—কিন্তু তারা এখানকার মতো এমন অধ্যাত্ম আনন্দের মহিমা ধারণ করে না। বহু পার্বত্য-ভূভাগ আছে যেগুলি পরম বিস্ময়ের ক্ষেত্র, যেখানকার অপার্থিব রূপ দেখলে রুদ্ধশ্বাস হতে হয়। এমন অগণ্য উপত্যকাপথ আছে,—যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চক্ষু অপলক হয়, এবং পর্যটক হয় হতবাক,—কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। এটি যেন অধ্যাত্ম ভারতের প্রথম প্রবেশপথ। এখানে পদার্পণ করামাত্র অনুভব করা যায়, অতি পরিচিত বাস্তব জীবনের সর্বপ্রকার অভ্যস্ত সংস্কারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছি। এসে দাঁড়িয়েছি নরলোক এবং তপোলোকের সন্ধিস্থলে। যে কেউ একটিবারের জন্য এ অঞ্চলে এলেই হলো,—সমস্ত বাকি জীবনের মধ্যে এর স্মৃতি ক্ষুধার মতো ঘুরে বেড়ায়। অনেককাল আগে এই অঞ্চলে এক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর নাম শিউদৎ ত্রিপাঠী। তিনি একসময় কিছুকালের জন্য লাহোরের কলেজে পড়াতেন। পণ্ডিত, সুরসিক, কিন্তু ভয়ানক

নাস্তিক। কোনও বিষয়ে তর্ক করতেন না, কিন্তু দু-চার কথায় তাঁর কঠোর নাস্তিকতা প্রকাশ পেত। একদা স্বর্গাশ্রমের একটি গাছের ছায়ার নীচে বসে তিনি বললেন, আমাদের মন হলো আধুনিক। বিজ্ঞানের বাইরে কিছু ভাবিনে, কারণ ভাবতে জানিনে। এখানে এলে মনোবিকলন কেন ঘটে, এর স্পষ্ট কৈফিয়ৎ শারীর বিজ্ঞানে পাই, মনের যোগও তারই সঙ্গে। তবু এখানে এলে বস্তুতন্ত্রবাদকে অরুচিকর লাগে কেন—আমি বলতে পারবো না। বিজ্ঞানের বাইরে এসে নিরুপায় মন যেন অহেতুক কান্না কাঁদতে চায়,—আশ্চর্য; এর কিন্তু কোনও কৈফিয়ৎ নেই। সমস্ত পাবার পরেও মানুষের তৃপ্তি নেই, এখানে একথা বিশ্বাস করি। জীবনের বাইরে কোনও পরমার্থ নেই, এখানে এসে সেটি ভাবতে ভয় পাই। নিয়ন্ত্রণ করছি, কিংবা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, এ প্রশ্ন এখানে ওঠে। এতকাল ধরে যে-বিশ্বাসটি পোষণ করে এসেছি,—এখানে এলে সেই বিশ্বাসের ভিত কাঁপে।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময় পণ্ডিত শিউদৎ ত্রিপাঠী হৃষিকেশ অঞ্চলে একটি আশ্রম নির্মাণ করে সেখান থেকে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করতে থাকেন। ওই নেশা তাঁকে পেয়ে বসে, এবং তিনি নাকি ওরই জন্য সর্বস্ব খোয়ান। তাঁকে ঘিরে ওদিকে একটি মস্ত দল গড়ে ওঠে। অতঃপর তিনি দলীয় লোককেই একসময় গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন এবং সেই গালির চোটে কৌতুকজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমি গিয়ে তাঁকে পুনরায় আবিষ্কার করেছিলুম,—কিন্তু তাঁর ছিন্নভিন্ন ও সর্বহারা চেহারা দেখে তাঁকে চেনবার উপায় ছিল না। তিনিও আমাকে চিনতে পারিননি। এর পর হঠাৎ তিনি একদিন আশ্রম ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কেউ বলে এক ভৈরবী গেছেন তাঁর সঙ্গে।

আবার এই মাত্র কিছুকাল আগেকার ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে। শশাঙ্ক সঙ্গে ছিলেন। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের দিকে যাবার সময় শুনলুম, একটি বাঙালি মেয়ে একাকিনী রহস্যজনকভাবে লছমণঝুলার ওদিকে সম্প্রতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিরুদ্দিষ্টভাবে। মেয়েটি বি. এ. পাস করা, এবং চমৎকার ইংরেজিতে আলাপ করেন। অতিশয় বুদ্ধিমতী, এবং মিষ্টভাষিণী। তিনি সন্ন্যাস নিতে চান কিনা বলা কঠিন, তবে মনে হয় নিজের জীবনে কোনও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে আঘাত পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। বয়স কম, বোধ করি অবিবাহিত। আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠলুম।

লছমণঝুলার ওখানে এসে জানা গেল অনেকেই মেয়েটির সংবাদ রাখে এবং এ নিয়ে একটা চাপা আলোচনাও রয়েছে। সেই মহিলাকে আমরা আবিষ্কার করলুম লছমণঝুলার সাঁকো পেরিয়ে ডানহাতি বাঁকের মুখে একটি চালা ঘরে। জনদুই 'বাবাজি' তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। একজন বাঙালী শ্যামানন্দ,—পান খাচ্ছেন তিনি প্রচুর; অন্যজন সিলেটী বোরেগী,—বসে বসে গঞ্জিকাসেবন করছিলেন। মহিলা ঈষৎ গৌরবর্ণা এবং স্বাস্থ্যবতী। বয়স পঁচিশের বেশী। কিন্তু তাঁর পরনে একখানি শতছিন্ন ধুতি ও সেমিজ, মাথার চুল 'বব'-করার মতো ছাঁটা,—চোখ দুটি শান্ত। আমাদের দেখে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালেন। কোনও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত নারী এমন ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদে বাইরে এসে দাঁড়ায়, এটি বিস্ময়কর। ফলে, মুখ তুলে কথা বলা কঠিন ছিল। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য এবং অবস্থিতির কারণ জানতে চাইলুম, তিনি সন্তোষজনক কারণ দিতে পারলেন না। বললেন, পথঘাট সবই খোলা, কোথাও যাবার বাধা নেই। প্রায় সপ্তাহ তিনেক এখানে আছি, এখান থেকে ফিরবো না!—তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জানতে চাইলুম, কিন্তু তিনি একটি কথাও

বলতে প্রস্তুত নন। বাবাজি দুজন বললেন, মা আমাদের এখানে কোথাও একটি আশ্রম করতে চান, আমরা সেখানে ওঁকে রেখে ওঁর চরণসেবা করবো। মা আমাদের জগদম্বা, জগদ্ধাত্রী জননী। আহা, মুখ তুলে চাও, মা। সাক্ষাৎ ভগবতীর আবির্ভাব!

একটু সংক্ষেপেই কাহিনীটুকু বলি। এখানে এভাবে তাঁর থাকাটা বিসদৃশ, এটি জানালুম। এবার তিনি বিশুদ্ধ এবং শ্রুতিমধুর ইংরেজি ভাষায় আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি আমাদের নিকট কোনও প্রকার সাহায্য নিতে চান না,—তথাপি আমরা কিছু টাকা ও বিশেষ করে কাপড় চোপড় এনে দিতে চাইলুম। কোনও দান তিনি গ্রহণ করবেন না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ এবং আত্মরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আছে কিনা, অথবা এখানে অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য তাঁকে হীনতা স্বীকার করতে হচ্ছে কিনা—এ সকল প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, এবং অন্ন না জুটলে তিনি উপবাস করবেন ও আশ্রয় না পেলে তিনি পথে পড়ে থাকবেন। বর্তমানে তিনি লছমণজীর মন্দিরে পাণ্ডার বৃদ্ধা জননীর নিকট বাস করছেন। পরিচয়াদি দিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ, এবং নিজ নামটিও তিনি বলতে প্রস্তুত নন। এভাবে জীবনযাপন করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা অধিকতরো শ্রেয়,—আমার এই প্রস্তাব শুনে তিনি এক সময় সহসা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, এবং আমার কণ্ঠস্বরে তিনি তাঁর সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতার কথা স্মরণ করে আমাকে ডেকে নিয়ে ওই চালাটার উত্তর পাশে একটি পাথরের আসনে এসে বসলেন। অদূরে ঘাটের ধারে শশাঙ্কবাবু অপেক্ষা করে রইলেন।

খর মধ্যাহ্নকাল। ঈষৎ কঠোর ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। মহিলা অতি ভদ্র, কিন্তু কঠোরপ্রতিজ্ঞ। তিনি বিবাহিত, এবং নয় বছরের একটি কন্যার জননী। তাঁর এই অজ্ঞাতবাসের সংবাদ স্বামী অথবা পিতামাতা যদি কেউ পান, তবে তাঁরা এই মুহূর্তে ছুটে আসবেন, একথা তিনি বললেন। তাঁর এই পলায়নের পিছনে কোনও প্রকার সামাজিক অথবা নৈতিক কলঙ্ক নেই—স্পষ্টই জানালেন। এক সময় তিনি বললেন, তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করা আর কোনওমতেই সম্ভব হচ্ছে না, কারণ ভিতরটা তাঁর প্রতি মুহূর্তেই পচে যাচ্ছে,—'am constantly rotting within myself'. বুঝতে পাচ্ছি আমাকে সেজন্য সবাই সরিয়ে দিতে চাইছে।—এই কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর rotting অবস্থাটা জানাবার জন্য শরীরের একটি বিশেষ অংশের কাপড় সরিয়ে দেখালেন—যেটি কোনও যুবতী নারীর পক্ষে সহসা সম্ভব নয়। তাঁর সর্বাঙ্গে অসুস্থতার কোনও চিহ্ন নেই, কেবল পায়ের নীচের দিকে একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল মাত্র। কিন্তু আত্মহত্যা করার প্রস্তাবটি তিনি সোৎসাহে গ্রহণ করেছিলেন, এবং আমার একটি হাত ধরে তিনি এ বিষয়ে সাহায্য চাইলেন। আমার প্রস্তাব ছিল, পাহাড়ের উপর থেকে খদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া, অথবা একখানা পাথর কোমরে বেঁধে নীলধারার মধ্যে তলিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ দুটিই যন্ত্রণাদায়ক বলে তৃতীয় একটি উপায় তিনি জানতে চাইলেন। মুশকিল এই, মহিলা কাঁদছিলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অবশেষে তাঁকে যখন জানালুম, চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ার মতো দু-একটি 'ড্রাগ' আমার জানা আছে, এবং তাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণাবোধ নেই, তখন তিনি অত্যন্ত উৎসাহে আমার পায়ে ধরার জন্য চেষ্টা করলেন। আমি বাধা দিলুম।

দর্শনশাস্ত্রে মহিলার অনার্স ছিল,—সঙ্গীতবিদ্যায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁর অপমৃত্যু আমার কাম্য ছিল না। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়স্বজন ও সন্তানের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাম্য ছিল। বিকাল প্রায় চারটে পর্যন্ত তাঁর পরিচয় নেবার চেষ্টা

করলুম, এবং একসময় যখন তিনি সন্দেহ করলেন, বিষ দেবার নাম করে ভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁকে হরিদ্বারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তখন তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন, মিথ্যে চেষ্টা! All your efforts will be fruitless.

তিনি বিদায় নেবার আগে কেবল আমাদের অনুরোধে নিকটবর্তী একটি ছোট্ট দোকানে এক পেয়ালা চা খেলেন, এবং যাবার সময় অশ্রুসজল চক্ষে মৃদু গলায় বলে গেলেন, স্থানীয় অদ্বৈতবাদী এবং নারীবিদ্বেষী সন্ন্যাসীর দল তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। যদি তারা আমাকে অতর্কিতে হত্যা করে সেই আমার আনন্দ!

চোখের জল মুছে তিনি লছমণঝুলার সাঁকো অতিক্রম করে চললেন। শশাঙ্ক স্তব্ধবাক। আমি রুদ্ধশ্বাস। ঘন্টা চারেকের চেষ্টায় কেবলমাত্র দুটি কথা তাঁর মুখ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমটি হলো, তিনি একসময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের ছাত্রী ছিলেন; এবং দ্বিতীয়টি, তাঁর পদবী হলো, 'ভট্টাচার্য'।

সেবার কলকাতায় ফিরে একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে বন্ধুবর ভবেশ নাগ মহাশয়ের নিকট গল্পচ্ছলে এই কাহিনীটি ফেঁদেছিলুম। তিনি একটু অন্যমনস্কভাবেই বললেন, তাঁর এক বন্ধুকন্যা কিছুদিন আগে নিরুদ্দেশ হন, এবং তাঁর পিতাও অবশ্য 'ভট্টাচার্য'। ভবেশবাবুর নিকট থেকে তৎক্ষণাৎ ঠিকানা নিয়ে আমি আশুতোষ মুখার্জি রোডের এক বাসায় যাই সেই সন্ধ্যায়ই। আমার বর্ণনার সঙ্গে সেই বাড়ির বৃদ্ধ পিতামাতার কন্যার চেহারার সঙ্গে মিলে যায়, এবং তাঁরা একখানি অতি সুশ্রী ফটো আমাকে দেখান। কলিকাতা পুলিশের জনৈক অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সেই রাত্রে হরিদ্বারে বেতারবার্তা পাঠান, এবং পরের দিন শ্রীমতী ভট্টাচার্যের বাবা ও ছোটভাই রওনা হন। কিন্তু কাহিনীটি ততদিনে জটিল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে হলো এই, শ্রীমতী ভট্টাচার্যকে নিয়ে ইতিমধ্যে জনৈক নাগা সন্ন্যাসী দূর পর্বতের দিকে কোথায় যেন পলায়ন করে, এবং নির্জন নদীগর্ভের দিকে এক গুহায় তাঁকে লুকিয়ে রাখে। অতঃপর কোটদ্বার পুলিশ এ বিষয়ে দায়িত্ব নেন এবং স্থানীয় প্রায় একশত লোকের 'প্রবল বিরোধিতার' ভিতর থেকে একদিন সেই মহিলাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই সব ঘটনাচক্রে পড়ে ঠাণ্ডা লেগে কয়েকদিনের মধ্যে ছোট ভাইটি অসুখে পড়ে, এবং সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, শ্রীমতী ভট্টাচার্য হলেন বাঙলার এক সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর শেষপক্ষের স্বামীর একমাত্র সহোদরা।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত হলেও গল্পটি এখানে শেষ নয়। তাঁর বৃদ্ধ পিতার অনুরোধে একবার কাশী গিয়ে কেদারনাথের গলির এক বাড়িতে দেখি, গেরুয়া পরিহিতা শ্রীমতী ভট্টাচার্য,— চেহারাটি তখন তাঁর আরও সুশ্রী,—বসে আছেন একটি অন্ধকার ঘরে একরাশি মৃন্ময় দেবমূর্তির মাঝখানে। তিনি কলকাতায় ফিরতে চাননি, কাশীতেই বসবাস করছেন। আশ্চর্য, জীবন-বৈচিত্র্যের অনন্ত আধার হলো কাশীধাম! আমাকে দেখে বৃদ্ধ পিতা অভ্যর্থনা করলেন, এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর হাতের জ্বলন্ত কাঁচি সিগারেট লুকিয়ে এক মস্ত গাঁদাফুলের মালা তুলে আমার গলায় ঝুলিয়ে প্রণাম করে বললেন,— Ah, you, my saviour! Never you are fruitless! Thy will is done!

এই প্রথম জানলুম, তাঁর মস্তিষ্কের বিকার। মাঝে অনেকদিন তিনি ছিলেন পূর্ব কলকাতার 'লুম্বিনী পার্কে'। এখন কতকটা বুঝি সুস্থ,—পিত্রালয়ে বাস করছেন। বালিকা কন্যাটি সঙ্গেই আছে!

ভারতের মহাজনতার আকার হলো বিপুল। তারা ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের বিশাল সমতলে। কিন্তু হিমালয়ের গিরিসঙ্কটে, সঙ্কীর্ণ পথের বাঁকে, বিরাট পটভূমির তলায় তলায় ওই মহাজনতার ভগ্নাংশের দেখা মেলে। তারা আপন আপন ইতিহাস নিয়ে যায় সঙ্গে। তখন তাদেরকে একান্ত করে দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তখন হয়ে ওঠে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আশ্চর্য অভিব্যক্তি। জনতার মধ্যে যারা হারিয়ে থাকে, বহুর মধ্যে যারা মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকে, ওখানে গিয়ে তারা পেয়ে যায় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোনও দিন যার কোনও পরিচয় নেই, সে পেয়ে যায় একটি অনির্বচনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

কিন্তু এই অন্তহীন জীবনবৈচিত্র্যের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় আপন বিপুল প্রাণসম্ভার নিয়ে। আনন্দ, সৌন্দর্য, পরমার্থ, অনুরাগ, উল্লাস, উদ্দীপনা—এরা রয়েছে একদিকে; এদেরই সঙ্গে রয়েছে দুঃখ, দুর্যোগ, সঙ্কট, আতঙ্ক, যন্ত্রণা। এই দুই পরিচয়ের ভিতর দিয়েই ডাক এসে পৌঁছয় হিমালয়ের প্রাণলোক থেকে। ডাক দেয় উত্তুঙ্গ চূড়া, গিরিনদীনির্ঝর, তুষারঝঞ্ঝার ঝাপটা, হিমবাহর আকর্ষণ, রোমাঞ্চকর ধবলশৃঙ্গ গিরিসঙ্কটগামী ঋক্ষবুদলের মন্থরগতি, তীর্থযাত্রীদলের দীর্ঘবিলম্বিত সমারোহ,—এদেরই দুর্বার টান অস্থির করে তোলে। এরা চাঞ্চল্য আনে মানুষের মনে চিরকাল। এরা ঘর ছাড়ায়, পথ ভোলায়, দুর্গমে ভাসায়, যন্ত্রণায় কাঁদায়! আনন্দের অপরিসীম আকর্ষণ মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় হিমালয়ের পথে পথে।

* * *

তেত্রিশ বছরের অল্পস্বল্প ডায়েরী এখানেই শেষ হচ্ছে, কিন্তু হিমালয়ের বিশাল পরিক্রমা এখনও সাঙ্গ হয়নি। ঘুরছি-ফিরছি আজও ওর আনাচে-কানাচে। অনেক কাহিনী অসমাপ্ত রয়ে গেল, বহু জীবনের ছোট ছোট পরিচয় প্রকাশ করা গেল না। অনাস্বাদিত রহস্যপথ, অনাবিষ্কৃত পর্বত, অপরিচিত নদীপথ,—এদের টান অচ্ছেদ্য। নিরভিমান কণ্ঠেই বলি, জেনেছি অতি সামান্য, উপলব্ধি হয়ত তার চেয়েও কম। শুধু দেখবার চেষ্টা করেছি হিমালয়কে। সেইটিই ছিল প্রধান লক্ষ্য। হিন্দুকুশের সীমানা থেকে আসামের সীমানা—আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ধারণ করবো, এই দুরাশা বাসা বেঁধেছিল এক তরুণ মনে,—যাকে ফেলে এসেছি তেত্রিশ বছর আগে।

হৃষিকেশের দিকেই আবার যাচ্ছি, আবার টিহরী গাড়োয়ালের দিকে। কেননা সেই পরিক্রমা যদি আবাব আরম্ভ হয় হোক,—জানার পথটা অবারিত থাক, আবার রক্তক্ষরণ হয়ে চলুক। এটি আনন্দের পথ। কান্না পেলেও আনন্দ, কারণ আমি তীর্থগামী। অতৃপ্তি আর অসন্তোষ থাক জীবনজোড়া, থাক নিবিড় নৈরাশ্য আর অসীম কালের বিরহবেদনা, থাক অনন্তলাভের প্রবল ব্যাকুলতা,—এরা তীর্থযাত্রার পাথেয়। কোথায় পৌঁছবো, সঠিক জানা নেই। কিন্তু আপন চিত্তের অশ্রান্ত গতি কামনা করি। যে-গতি গঙ্গার, যে-গতি সৃষ্টিলোকের, সেই গতিই জীবনের। একথাটি জেনেছি, গতিহীনতাই অপমৃত্যু!

হৃষিকেশের পথেই যাচ্ছি, ওটাই দেবতাত্মার সিংহদ্বার!

॥ 'দেবতাত্মা হিমালয়' সমাপ্ত ॥